রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র

রণেশ দাশগুপ্ত রচনাবলি

১ম খণ্ড

রণেশ দাশগুপ্ত
১৯১২-১৯৯৭

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৯ / জুন ২০১২

বাএ ৪৯৯১
(২০১১-২০১২ গসফো: সংকলন ০৪)

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
সমীরকুমার সরকার
ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

মূল্য
৩২৫.০০ টাকা

....

Ranesh Dasgupta Rachanabali (Protham Khando) [Complete Works of Ranesh Dasgupta (Vol. I)]. Edited by Dr. Soumitra Sekhar. Published by Published by Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published: June 2012. Price: TK 325.00 only.

ISBN-984-07-5009-7

রণেশ দাশগুপ্ত রচনাবলি
১ম খণ্ড

সম্পাদনা
সৌমিত্র শেখর

বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

১৯৪৭-এর দেশভাগ, পাকিস্তানি শাসনামলের নিপীড়ন-নির্যাতনসহ নানা বৈরী পরিবেশের কারণে দেশত্যাগ করেন অনেকে। কিন্তু বৈরী সময়ের অভিঘাত মোকাবেলা করেই রণেশ দাশগুপ্ত হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালেও তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনির্মাণে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। সাতচল্লিশ-উত্তরকালে তাঁর মতো অনেকেই যখন দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছেন, তখন ভারতে জন্ম নিয়েও তিনি থেকে যান তৎকালীন পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে। আপাত দৃষ্টিতে এ এক বিপরীত সিদ্ধান্ত। তবে তা এ অঞ্চল এবং এর মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসা থেকে জাত।

শেষজীবনের কিছু সময় তাঁর কলকাতাবাস ঘটলেও তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি নিয়েই ভাবিত ছিলেন, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল প্রতিনিয়ত। যে কারণে তাঁর শব এসেছে বাংলাদেশে এবং তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে এদেশের মানুষ, বাংলাদেশেরই মাটিতে।

কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকালে (১৯৯২-১৯৯৭) অজস্র দিন সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউস্থ পদ্মপুকুর বাসস্টপের কাছেই লেনিন স্কুলে রণেশ দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি, ঘরোয়া আলাপে-আলাপে ঋদ্ধ হয়েছি, জেনেছি অনেক কথা– তাঁর জীবনের, তাঁর সমকালের।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর, রোববার কলকাতায় তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ঢাকার দৈনিক *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর সেটি প্রকাশ পায় (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট ২)। সেটি ছিল তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকার এবং তাঁর স্মৃতিকথা *কখনো অতসী কখনো চম্পা*-র আলোকে রণেশ দাশগুপ্তের 'জীবনকথা' তুলে ধরা হলো।

ক.

রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি। তাঁর মা ইন্দুপ্রভা (সেন) দাশগুপ্ত প্রসব-পূর্বকালে গিয়েছিলেন নিজের পিত্রালয় আসামের ডিব্রুগড়ে। ইন্দুপ্রভার পিতা কালীমোহন সেন ছিলেন ঐ অঞ্চলের নামকরা লোক। অবশ্য কালীমোহনের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের সোনারঙ গ্রামে। তাঁর আসামের বাড়িতেই রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম।

ছেলেবেলায় রণেশ দাশগুপ্তের ডাকনাম ছিল খোকা। তাঁর পিতা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত ছিলেন নামী ফুটবলার। মোহনবাগান, কুমারটুলি ইত্যাদি নামকরা দলের মতো আর একটি দল 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন' ক্লাবের হয়ে তিনি খেলতেন। সেই

ভূমিকা

'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা
যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে'।
–সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২–১৯৯৭)। তিনি একাধাওে অনুসরণীয় সাংবাদিক, তাত্ত্বিক-রাজনীতিক, সৎ-সংগঠক, সাহিত্যবোদ্ধা ও সমালোচক। বহুক্ষেত্র-বিচরিত মানুষ হলেও তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের আত্মপ্রণোদনার উৎস কিন্তু চিন্তার নির্দিষ্টতা থেকে; আদর্শের নিগূঢ় আন্তঃপ্রেরণা যেখানে কার্যকর। সে-অর্থে 'সাহিত্যশিল্পী' হয়তো তিনি নন, তবে সাহিত্য-বিবেচক, সংস্কৃতিচিন্তক নিশ্চয়। তাঁর এ বিবেচনার মূল নিজস্ব চিন্তনের উর্বর ভূমিতেই প্রোথিত; রসের অমিত উৎস যেখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। শুদ্ধতর অর্থে বাংলাসাহিত্যচিন্তার প্রকাশটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকেই শুরু,– রবীন্দ্রনাথে সৌন্দর্য, মনুষ্যত্ব আর ব্যাপকতার প্রতিষ্ঠা। প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ একে নিয়ে এলেন বিকাশশীলতার মোহনায়, ব্যক্তি-জিজ্ঞাসার অম্বুজে। এরপর এই সাহিত্যচিন্তার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো আমাদের বোধে। কালক্রমে এই সাহিত্যকে শুধুই 'অন্তর হতে আহরি বচন' বলতে না-রাজ যাঁরা, যাঁরা বলেন– সাহিত্যও হতে পারে সমাজবিকাশের অন্যতম মাধ্যম, শান্তির প্রণোদনা লুকিয়ে থাকে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, যাঁরা আরো একটু এগিয়ে মেহনত বা শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাকে– তাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিয়ে এলেন প্রগতির ধারায়, সমাজবদলের বাঁকে। প্রকৃত প্রস্তাবে রণেশ দাশগুপ্ত এই প্রগতি সাহিত্যের ধারারই অগ্রণী পুরুষ।

আর এক জেঠু সত্যানন্দ দাশের বাড়িতে। সত্যানন্দ দাশ কবি জীবনানন্দ দাশের বাবা। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ রণেশ দাশগুপ্তের জেঠতুতো দাদা। ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন রণেশ দাশগুপ্ত। বিজ্ঞান ত্যাগ করে মানবিকী শাখায় ভর্তি হলেও তাঁর ভাষাজ্ঞান, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার ওপর দখল অন্যদের চমকে দিতো এবং সে-সূত্রেই তিনি 'ভালো ছাত্র' বলে কলেজে পরিচিতি পেয়ে যান। কিন্তু বিদেশি সাহিত্য পড়া আর পরীক্ষায় পাস এক নয়। তাই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ওখানেই শেষ।

প্রকৃত পক্ষে, বরিশালে বাস করার সময়ও রণেশ দাশগুপ্ত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন গভীরভাবে। জেঠুর বাড়ি 'সর্বানন্দ ভবন'-এ তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুদের সমাগমের কারণে মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে তাঁকে জেঠুর বাড়ি ত্যাগ করে কলেজ হোস্টেলে উঠতে হয়। সত্যানন্দ দাশ ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই পরিবারটি রাজনীতিমুক্ত এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সদাচারী পরিবার হিসেবে বরিশালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিল। এই পরিবার রণেশ দাশগুপ্তের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভালো চোখে দেখে নি। বি.এ. পাস না করেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল থেকে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রণেশ দাশগুপ্তের বাবা আহত হয়ে চাকরি থেকে অবসর নেন এবং বিক্রমপুরের বাড়ি নদীতে ভেঙে যাওয়ায় পরের বছর পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ১৪ কে. জি. গুপ্ত লেনের একটি বাড়ির দোতলায় বাসা ভাড়া দিয়ে বাস করতেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পিতা অপূর্বরত্নের মৃত্যু হলে তাঁরা তাঁতিবাজারে চলে আসেন। বরিশাল থেকে ঢাকায় এসেও তিনি সম্পর্ক রাখেন অনুশীলন গ্রুপের সঙ্গে এবং কমরেড গোপাল বসাক, নলিনিন্দ্র সেন, মুকুল বোস প্রমুখের নেতৃত্ব প্রখরতায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।

কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাতে তখন বিচ্ছিন্নভাবে আধুনিক সাহিত্যচর্চা হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত ছাত্রাবস্থাতেই বেশ নাম করেছেন। এঁদের আধুনিক সাহিত্যের বাইরে যেমন গেলেন, তেমনি আবার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে প্রগতিবাদী সাহিত্যের বাতাবরণ প্রথম সৃষ্টি করলেন রণেশ দাশগুপ্ত এবং তাঁর কয়েকজন সহচিন্তক। তাঁরা বুদ্ধদেব বসু-জীবনানন্দ দাশদের সাহিত্যধারার বাইরে, কলাকৈবল্যবাদের অতি 'মাখামাখি'কে অস্বীকার করে নতুন সাহিত্যধারার পত্তন করেন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (১৯২৬) সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: ''সাহিত্য-সমাজের' আন্দোলন প্রগতিশীল ঠিকই কিন্তু তা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে নয়। মুসলিমদের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করার লক্ষ্যে এর গঠন। পরে

খেলার সূত্রেই তাঁর কলকাতায় বসবাস। ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করেছিলেন তিনি, পরে রণেশ দাশগুপ্তের জেঠামশাই নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের কল্যাণে বিহারের রাঁচিতে সরকারের হিসাব বিভাগে অপূর্ব্বরত্নের চাকরি হয়। রণেশ দাশগুপ্তের জন্মের আগেই অপূর্ব্বরত্ন স্ত্রীসহ রাঁচিতে চলে যান। নিবারণচন্দ্র ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মনেপ্রাণে গান্ধীবাদী। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বিশিষ্ট লেখক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, একসময় সংসদ সদস্যও হয়েছিলেন।

রণেশ দাশগুপ্তের জন্মের পর চাকরির কারণে অপূর্ব্বরত্নকে রাঁচি থেকে পুনায় যেতে হয়। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপে উত্তপ্ত ভারত। শংকা সবার মনেই। সিদ্ধান্ত হয় ইন্দুপ্রভা সন্তানসহ থাকবেন নিবারণচন্দ্রের বাড়িতে, পুরুলিয়ায়। তাই রণেশ দাশগুপ্তের শৈশব কাটে এই পুরুলিয়াতে, জেঠুর তত্ত্বাবধানে। চার ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান, কিন্তু প্রথম পুত্র। এই পরিবারের প্রথম সন্তানের নাম প্রতিভা দাশগুপ্ত, ডাকনাম ডলি। রণেশ দাশগুপ্তের অন্য ভাইবোনের কয়েকজন হলেন: শেফালি দাশগুপ্ত (খুকি), প্রবীর দাশগুপ্ত, অজিত দাশগুপ্ত (ছুটু)। পুরুলিয়ায় রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালায় রণেশ দাশগুপ্তের হাতেখড়ি হয়। পরে রাঁচি জেলা স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাস করেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। বিজ্ঞান বিভাগে পড়বেন বলে ভর্তি হলেন বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজে। রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন পরেই তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হলে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রণেশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তিনজন ছাত্র বাঁকুড়ায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আর এই 'অপরাধে'ই বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। রাজনীতির সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত জড়িয়েছিলেন স্কুলজীবনেই। পার্শ্ববর্তী টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র হরিপদ দে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পথে আকৃষ্ট করেন। হরিপদ দে'র কাছ থেকে প্রাপ্ত বই ও নানা রাজনৈতিক রচনা পাঠ করে রণেশ দাশগুপ্ত গুপ্ত-সংগঠন 'অনুশীলন'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে বহিস্কৃত হবার পর তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হলো কলকাতা সিটি কলেজে। থাকতেন রামমোহন ছাত্রাবাসে। সেখানেও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক গ্রন্থ সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের কারণে এ সময় পুলিশি হানা হয় তাঁর কক্ষে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে আই.এসসি. পাস করেন ঐ কলেজ থেকে। পাস করার পর রণেশ দাশগুপ্তকে পাঠিয়ে দেয়া হলো বরিশালে। সেখানে তিনি ভর্তি হলেন ব্রজমোহন (বি.এম.) কলেজে। বরিশালে তিনি উঠলেন তাঁর

আয়োজন করা হলো ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন। সোমেন চন্দ এই সম্মেলনে রেল-রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যোগ দিতে আসার পথে নিহত হন। সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রগতি লেখক সংঘে অজিত গুহসহ অনেকে যুক্ত হন এবং এটি ঢাকার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-বিভক্তির (আগস্ট, ১৯৪৭) পর মা, চার বোন ও এক ভাই অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকাতেই থাকেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ওপর পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। হিন্দুদেরও বিবেচনা করা হয় পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে। এ সকল সূত্রে রণেশ দাশগুপ্তের ওপরও নেমে আসে নানা সরকারি নির্যাতন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য বিপদ্‌জনক বিবেচনায় ১০ই মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে তিনি গ্রেফতার হন। পরে শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই মার্চ রণেশ দাশগুপ্ত ও বন্দি ধরণী রায় মুক্তি পান। চার মাস পর আবার এ দুজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিনাবিচারে আটক থাকেন তাঁরা। পাকিস্তানে এ দুজনই প্রথম বিনাবিচারে আটক রাজবন্দি। অবশ্য পরে বাঙালিদের বিনাবিচারে আটক রাখা পাকিস্তান সরকারের জন্য 'স্বাভাবিক কর্মে' পরিণত হয়েছিল। বিনাবিচারে নানা জেলে দীর্ঘ সময় আটক থাকাকালে রণেশ দাশগুপ্ত রাজবন্দিদের শিরোমণিতে পারিণত হন। এ সময় কখনো তিনি বন্দিদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন, কখনো তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য, রাজনীতি বা সংস্কৃতির রূপান্তর-প্রসঙ্গ। এ সময়ে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলন দানা বাঁধে, যাঁরা সফল পরিণতি পায় ১৯৫২ সালে। এ আন্দোলন-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে যশোর ও রাজশাহী-সহ দেশের বিভিন্ন জেল থেকে বদলি হয়ে রণেশ দাশগুপ্তের ঠাঁই হয় ঢাকা জেলে।

১৯৫৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে জেলখানাতেই অভিনয় করার উপযোগী একটি নাটক লেখার জন্য রণেশ দাশগুপ্ত অনুরোধ করেন আরেক বন্দি মুনীর চৌধুরীকে। রণেশ দাশগুপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত এবং জেলখানাতে অভিনীত হয় মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক *কবর*। জেলখানাতে অবস্থানকালেই রণেশ দাশগুপ্ত উর্দু ভাষা ভালোভাবে শিখে ফেলেন। এর ফলে উর্দু কবিদের কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৯৫৫ সালে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্ত মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে কমিউনিস্টরা ন্যাপে যোগ দেন। প্রায় এ সময় থেকেই দৈনিক *সংবাদ*

তো এর নাম হলো 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'। আমরাই প্রথম সম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে শোষণহীন সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে মেহনতি মানুষের জন্যে সাহিত্য– এই স্লোগানে এগিয়ে গেলাম।'

হীরেন মুখার্জি লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে এসে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় মুক্তমনা কবি-সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে 'প্রগতি' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ঐ বছরই গড়ে ওঠে 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এটি মূলত লন্ডন-ফেরতদের সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আবু সয়ীদ আইয়ুব এতে যোগ দিলে সর্বস্তরে সংগঠনটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভারতের মুন্সি প্রেমচান্দ, সাজ্জাদ জহীর প্রমুখের লেখা এই সংগঠনের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঢাকাতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রণেশ দাশগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর যৌথ সম্পাদনায় *ক্রান্তি* নামে একটি সংকলন প্রকাশ পায়। *ক্রান্তি* এর পরও বের হয়েছে। আগে বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার পর লেখকদের কাছ থেকে *ক্রান্তি*র লেখা নেয়া হতো। রণেশ দাশগুপ্ত *সোনার বাংলা* পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; এর সম্পাদক ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ। *সোনার বাংলা* অনুশীলন সমিতির সদস্যদের পরিচালনায় প্রকাশ পেতো। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়। এই পত্রিকাতেই রণেশ দাশগুপ্তের প্রথম লেখা– গোর্কির ওপর, প্রকাশ পায়।

স্মরণার্হ, *সোনার বাংলা* পত্রিকাতেই শামসুর রাহমানের প্রথম লেখা প্রকাশ পায়। এই পত্রিকাতে লেখা দিতে আসা তরুণ অচ্যুত গোস্বামী পরে প্রগতিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে এই চিন্তার প্রতি আকর্ষণ করেন রণেশ দাশগুপ্ত। পরে অচ্যুত গোস্বামীর ঘরই হয়ে ওঠে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম ঠিকানা। *বাংলা উপন্যাসের ধারা* অচ্যুত গোস্বামীর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অচ্যুত গোস্বামীকে রণেশ দাশগুপ্ত প্রগতি লেখক সংঘের দিকে আকৃষ্ট করলেও এই পথে রণেশ দাশগুপ্তকে আকৃষ্ট করেন সোমেন চন্দ। সৃষ্টিশীল লেখক সোমেন চন্দ রণেশ দাশগুপ্তের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। আর এ সময় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও মূলত তাত্ত্বিক আলোচক হিসেবেই বিবেচিত ছিলেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এর প্রতিরোধে উদ্যোগী হন প্রগতি লেখক সংঘের সবাই। কাজী আবদুল ওদুদ এই সংঘের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' গল্পটি এ সময়ই লেখা। দাঙ্গাবিরোধী জনমত সংগ্রহের সময় তিনি অনেক উদার মুসলিম লিগারের সাহায্যও পেয়েছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় 'জনযুদ্ধ' তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই তত্ত্বকে সামনে নিয়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে

সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত ও শ্রীসত্যেন সেন দীর্ঘ আড়াই বৎসরাধিক কাল কারাগারে আটক থাকার পর গতকাল (শনিবার) অপরাহ্ণে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীসত্যেন সেনকে দেশরক্ষা আইনে আটক করা হয়। ঢাকার ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উভয়ের গতিবিধি ঢাকা পৌর এলাকার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৬০ বৎসর বয়স্ক শ্রীসত্যেন সেন বিভিন্ন সময় প্রায় বিশ বৎসর এবং শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত প্রায় বার বৎসর কারাগারে অতিবাহিত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সত্যেন সেন টিউমার, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত ও শ্রীসত্যেন সেন গতকল্য এক বিবৃতিতে প্রদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করিয়াছেন। এই সকল রাজবন্দীর মধ্যে রহিয়াছেন ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মী এবং ছাত্র নেতা ও কর্মী।'

বিভিন্ন সময় যাঁদের সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত জেলে ছিলেন তাঁরা হলেন: শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, কোরবান আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা, সত্যেন সেন, মুনীর চৌধুরী, জ্ঞান চক্রবর্তী, শহীদুল্লা কায়সার, সরদার ফজলুল করিম, কামাল লোহানী, মহাম্মদ আমিন প্রমুখ।

জেলে বাসকালেও তিনি সমাজবাদী সাহিত্যচর্চা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা অব্যাহত রাখেন। এই জেলবাসের সময় বাদ দিলে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রে যে মানুষটি ছিলেন, তিনি রণেশ দাশগুপ্ত। একই সঙ্গে তিনি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রগতিশীল চিন্তা ও আন্দোলন-সংগ্রামের আলো দিয়ে আলো জ্বালিয়েছেন। নবীন সাহিত্যকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, সংবাদকর্মী, রাজনৈতিককর্মী সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা প্রাতঃস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। পাকিস্তানী আগ্রাসন থেকে মুক্তি ও বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে তিনি অন্যতম পথদ্রষ্টা।

স্বাধীন বাংলাদেশে রণেশ দাশগুপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির প্রধান বুদ্ধিজীবী। স্বাধীনতা-উত্তর সংবাদপত্রের পাতায় প্রায় প্রতিদিনই তাঁর কোনো না কোনো বক্তব্য-বিবৃতির উল্লেখ পাওয়া যাবে। এ সময় প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের বিশেষ সংখ্যা, বিশেষত শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবসে প্রকাশিত শত শত সংকলনে রণেশ দাশগুপ্তের কোনো না কোনো লেখা ছিলই। তাঁর লেখা না থাকলে পত্রিকার গুরুত্বই যেন কমে যেত। ঢাকাসহ দেশের নানা স্থানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ স্বাধীন

বামপন্থীদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ হতে থাকে এবং রণেশ দাশগুপ্ত এ পত্রিকায় যোগ দেন। এর পর *সংবাদ*-এর সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের বাংলাদেশে অবস্থানকালে সম্পর্ক আর কখনো ছিন্ন হয় নি। শহীদ সাবেরের পর 'মধুব্রত' ছদ্মনামে *মনে মনে* শিরোনামে কলামটি *সংবাদ*-এ লিখেছেন তিনি। নিয়মিত অন্য লেখাতো ছিলই। *সংবাদ*-এর সাহিত্যপাতা 'রবিবাসরীয়' সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। পরে তিনি 'লোক লোকালয়ে' শিরোনামেও নিয়মিত একটি কলাম লিখেছেন বেশ কিছুদিন ধরে।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের প্রার্থীকে পরাজিত করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল্টির কমিশনার নির্বাচিত হন রণেশ দাশগুপ্ত। নির্বাচনে পঁয়ত্রিশটি পদের মধ্যে পঁচিশটি পদ পায় মুসলিম লীগ, বাকি পদগুলো পায় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই নির্বাচিত হন। জ্ঞান চক্রবর্তী পোস্টার ছাপানোর দায়িত্বে ছিলেন এবং রণেশ দাশগুপ্তকে 'প্রখ্যাত লেখক' বলে অভিহিত করে পোস্টারের কথা লিখেছিলেন। কমিশনার নির্বাচিত হবার পর তাঁতিবাজারে তিনি বাস করতেন। যাতে মানুষ সহজেই তাঁর দেখা পেতে পারে। কিন্তু তাঁর থাকবার ঘরটি ছিল অতিছোট ও আড়ম্বরহীন। এ সময়ই তিনি দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং এর পর থেকে এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ একজন হয়ে ওঠেন। পরে জমিল শরাফী নামে অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তিনি।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে *সংবাদ* পত্রিকার অধীনে প্রতিষ্ঠিত লালন প্রকাশনী থেকে *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংকলন* প্রকাশিত হয় জমিল শরাফীর সম্পাদনায়। অবশ্য স্বনামে তিনি পাকিস্তান আমলে বাংলাবাজার খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি থেকে 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার' (১৯৬৯) সম্পাদনা করেন। এক বছরের মধ্যে এই গ্রন্থের দুটো সংস্করণ শেষ হয়। এটিই বাংলাদেশে জীবনানন্দচর্চার প্রথম উদ্যোগ। তাঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ এক গ্রন্থে পুরো জীবনানন্দ-কাব্য প্রথম হাতে পায়। 'রেজা' ছদ্মনামেও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় নিবন্ধ রচনা করেছেন।

১৯৫৫ সালে বিনাবিচারে আটক অবস্থায় জেলখানা থেকে মুক্তির পর ১৯৬২ সালে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, ১৯৬৩ সালে মুক্তি পান তিনি; ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করলে ১৯৬৮ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯শে মে, ১৯৬৮ তারিখে দৈনিক *সংবাদ*-এর প্রথম পাতায় 'শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেনের মুক্তিলাভ' শিরোনামে এই খবর ছাপা হয়: 'প্রখ্যাত

বাংলাদেশে এসে পৌঁছে এবং পর দিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় তাঁর শেষকৃত্য। আজীবন সংগ্রামী, ধীমান সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব, প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক অকৃতদার রণেশ দাশগুপ্তের মরদেহে শেষশ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে স্মরণকালের বিশাল জনসমাবেশ ঘটে।

খ.

'রণেশ দাশগুপ্ত রচনাবলি ১ম খণ্ডে' স্থান পেয়েছে ৫টি গ্রন্থ। এগুলো হলো– 'উপন্যাসের শিল্পরূপ', 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা', 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' ও 'সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ'। পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে গ্রন্থপরিচিতি ও রণেশ দাশগুপ্তের শেষ সাক্ষাৎকার।

রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রথম গ্রন্থ *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৯৫৯) প্রকাশের আগেই পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশে সাহিত্য-বিষয়ক রচনার মাধ্যমে অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রন্থটির বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ এবং একাধিক পুনর্মুদ্রণ হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে *উত্তরণ* নামক সাময়িকীতে 'উপন্যাসের শিল্পকলাগত গতিপরিণতি' শীর্ষনামে রণেশ দাশগুপ্তের একটি প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধে লেখক উপন্যাস-বিচারের ক্ষেত্রে রাল্‌ফ ফক্‌সের *নভেল এন্ড দ্য পিপ্‌ল* এবং ক্রিস্টোফার কডওয়েলের *ইলিউশ্যন এ্যান্ড রিয়ালিটি* গ্রন্থ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। কিন্তু তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যে সেটাই প্রথম ও ব্যাপক অর্থে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যবিচারের একটি মানদণ্ড উপস্থাপন।

তবে এ-কথাও সত্য যে, ঐ প্রবন্ধে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ফক্‌স ও কডওয়েলের বক্তব্যকে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে নিজের স্বাধীন মত প্রদান করেছেন। ই.এম.ফর্স্টর, পার্শি লাবক, লর্ড ডেভিড সেসিল, কিউ ডি লেভিস প্রমুখ উপন্যাস বিচারের কয়েকটি মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছেন। ফর্স্টর উপন্যাসে পাঁচটি অপরিহার্য লক্ষণের কথা বলেছেন: গল্প, আখ্যান, চরিত্র, ফ্যান্টাসি ও রিদম্‌। এইচ জি ওয়েলস্‌-এর মতে উপন্যাসে থাকবে বিষয়-বৈচিত্র্য ও বহু বর্ণিল শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত হবে উপন্যাস-কম্পাসে, আর মানব মন ও আচরণ সম্পর্কে থাকবে পর্যবেক্ষণ। এ-রকম বহুমত পাওয়া যায় উপন্যাস-বিচারে। কিন্তু ফক্‌স ও কডওয়েল প্রভাবিত রণেশ দাশগুপ্ত বহির্বাস্তবের বিস্মৃতি, চরিত্রাবলির পরিপূর্ণতা ও লোকগদ্যের উচ্ছল উপস্থিতি খুঁজেছেন একটি শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে। তাঁর মতে এই ত্রয়ীগুণের ব্যত্যয় ঘটলে উপন্যাস তার স্বাভাবিকত্ব হারাবে। ফক্‌স কিংবা কডওয়েলের মতো তিনিও

বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ার কাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-মানুষ হয়ে ওঠেন রণেশ দাশগুপ্ত।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার মাধ্যমে সৃষ্ট হওয়া অন্ধকারের রাজনীতি তাঁর সে নিবেদনে ও কাজে ছেদ টেনে দেয়। এর পর দেশে প্রলম্বিত হয় হত্যার ঐ রাজনীতি। নভেম্বরে জেলখানায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানকে। এই গোপন হত্যার রাজনীতি এবং ক্ষমতার হাতবদল চলতেই থাকে। এ সময় ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রণেশ দাশগুপ্ত বিমানের ফেরত টিকিটসহ ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়। পঁচাত্তরের নভেম্বরে ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের ঘটনাবলি এবং বন্ধুদের অনুরোধ বাংলাদেশে ফেরা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করে। এর পর কলকাতা-জীবন তাঁর। এ সময় বেশ কয়েকবার তাঁর অবস্থান বদল হয়। প্রথমে ওঠেন দাদার কড়েয়ার ফ্ল্যাটে, পরে ভাগ্নেদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাসায়, সেখান থেকে ভাইপোর পলতার বাড়িতে বা সেখানেই বোনের বাড়িতে। কিছু দিন তিনি বঙ্গেশ্বর রায়ের ব্রাইট স্ট্রিটের বাসায় থাকেন এবং পরে ওঠেন *শান্তি-স্বাধীনতা-সমাজতন্ত্র* পত্রিকার ওরিয়েন্ট রো'র কার্যালয়ে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি এভাবে অবস্থান করার পর ওরিয়েন্ট রো থেকে রণেশ দাশগুপ্ত প্রায় একটি স্থায়ী ঠিকানা পান 'লেনিন স্কুলে'। এর ডাক-ঠিকানা: পি-৪৩, সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০14। কলকাতার এন্টালি এলাকার বাসস্টপ পদ্মপুকুর থেকে লেনিন স্কুল ছিল দুমিনিটের হাঁটাপথ। লেনিন স্কুল সিপিআইয়ের পরিত্যক্ত প্রশিক্ষণভবন এবং এর আগে মুখপত্র *কালান্তর*-এর কার্যালয় ছিল। অত্যন্ত আড়ম্বরহীনভাবে, অনেকটা পরমুখাপেক্ষী হয়ে বার্ধক্যতাড়িত শেষজীবন এখানেই তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে। বার্ধক্যজর্জর হওয়ার আগ পর্যন্ত কলকাতায় প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের কিছু অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিয়েছেন। তবে উল্লেখ করার বিষয়, অর্থকষ্টসহ কলকাতায় অবস্থান করলেও ভারতের নাগরিকত্ব বা মাসিক ভাতা গ্রহণের প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করেও বাংলাদেশের পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

১৯৯৭ সালের আগস্ট থেকে তাঁর শরীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। ৪ঠা নভেম্বর কলকাতার পিজি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ-ভারত সরকারের যৌথ আয়োজনে রণেশ দাশগুপ্তের মরদেহ ৫ই নভেম্বর

দাশগুপ্তের এ মন্তব্য। আসলে মানবসমাজে সংগ্রামশীলতা ও অগ্রবর্তী হবার মানবীয় কামনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

পূর্বপাকিস্তানের বাংলা উপন্যাস অর্থাৎ পরবর্তীকালে আমরা যাকে বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাস বলে থাকি, তার তিনটি– জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী*, শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক*, জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* সম্পর্কে একত্রে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁর এই গ্রন্থে।

'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গদ্যমহাকাব্য কথা' শিরোনামে প্রবন্ধে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে বলেছেন: 'এই তিনটি উপন্যাসেরই ইতিবৃত্ত যেমন সমসাময়িক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত, তেমনি এরা বিপ্লবাত্মক সম্ভাব্য ঘটনাকেও রেখেছে গুচ্ছ গুচ্ছ আফোটা ফুলের কুঁড়ির মতো বিন্যস্ত করে, যে ধরনের কুঁড়িরা অনাগত দিনের সচেতন মানব-মানবীর মনের ছোঁয়ায় কবিতায় উপন্যাসে নাটকে সাহিত্যে পাঁপড়ি মেলে।'

প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ *শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে* (১৯৬৬) মূলত চারটি বড় প্রবন্ধের সংকলন। পূর্বের গ্রন্থ থেকে আয়তনে ছোট। প্রবন্ধগুলো হলো: 'সাহিত্য', 'শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে', 'আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ', 'অকর্ষিত শিল্পীচিত্ত'। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে প্রথমটি বাদে বাকি তিনটিই পত্রিকায় প্রকাশিত, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। গ্রন্থ প্রকাশের আগে সেগুলোর তথ্য ও আয়তন বাড়ানো হয়েছে। রণেশ দাশগুপ্তের রক্তব্য– 'কুঁড়ির মধ্য দিয়ে যেমন পাঁপড়ি বেরিয়ে আসে, তেমনি সংস্কৃতির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলা। আর শিল্পকলার ক্রমবিকাশের মধ্য থেকে এসেছে সাহিত্য।'

রণেশ দাশগুপ্তের সময় কাঁপানো প্রবন্ধ 'শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে'। তৎকালে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা ও শিল্পের পরিধি নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন ছিল। এ ধরনের প্রশ্ন সামনে রেখে রণেশ দাশগুপ্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য-শিল্পীদের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে লেখেন: 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়াস একটি বহুমুখী ও জটিল বিষয়। তবে মীমাংসার পথ অনির্দেশ্য নয়, এ পথ অন্ধকার পথও নয়। এ পথ কখনো সোজাসুজি, কখনো আঁকাবাঁকা হয়ে অঝোরে ধারায় আলো এসে পড়ছে। এই আলোকধারায় আলো এসে পড়ছে। এই আলোকধারাগুলিকে কেন্দ্রিভূত করতে হবে সামনের দিকে।' আর আলোর সন্ধানেই তিনি এগিয়ে গেছেন– কাউকে খারিজ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল সমন্বয়ের মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান।

'আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ' প্রবন্ধে তিনি চিত্রকলার নানা তত্ত্ব ও প্রবণতাগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেন: 'বস্তুতপক্ষে বিমূর্তবাদী

লক্ষ করেছেন যে, মহাকব্যের ধারাই একদিন উপন্যাসের শিল্পরূপকে প্রতিবিম্বিত করেছিল।

রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর *উপন্যাসের শিল্পরূপ* গ্রন্থে উপন্যাসরচনায় বিশ শতকীয় কিছু চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে প্রগতিপন্থী উপন্যাস ধারার সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। 'নতুন বাস্তববাদ' সম্পর্কেও অভিমত দিয়েছেন তিনি। আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাস, চায়নার উপন্যাস, ফরাসি উপন্যাস, সোভিয়েত উপন্যাস ইত্যাদি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ও সুচিন্তিত বক্তব্য আছে এই গ্রন্থে।

বাংলা উপন্যাস নিয়েও আলোচনা আছে এই গ্রন্থে, বিশেষ করে– *আনন্দমঠ*, *গোরা*, *পথের দাবী*, *গণদেবতা*, *দর্পণ* উপন্যাস সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ওঠে এসেছে *উপন্যাসের শিল্পরূপ*-এ। রণেশ দাশগুপ্ত *আনন্দমঠ* সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি একটি স্ববিরোধপূর্ণ উপন্যাস কিন্তু আবার একথাও বলেছেন, বঙ্কিমী গদ্যে সাধু ও লোকগদ্যের মিশ্রণ সমকালে বঙ্কিমকে অনেক বেশি জনমুখী করেছে। *আনন্দমঠ* উপন্যাসে বাস্তবতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত যার সন্ধান পেয়েছেন তাতে মার্কর্সবাদী মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ স্থান দিতে হয়। *আনন্দমঠে*র মধ্যে বিশেষ একটি ধর্মীয় মন্ত্রোচ্চারণে গঠিত পৌরাণিক প্রলয় ও সৃষ্টির পটভূমি একদিকে যেমন প্রবল হয়ে উঠেছে, তেমনি আরেক দিকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে ছবি দেওয়া হয়েছে এতে তার বাস্তবধর্মিতার তুলনা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সচরাচর পাওয়া যায় নি। এই গুণটি আকৃষ্ট করেছে রণেশ দাশগুপ্তকে। তিনি *আনন্দমঠ*, *গোরা*, *পথের দাবী*, *পঞ্চগ্রাম*কে প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত করে এগুলোতে আবিষ্কার করেছেন চরিত্রকথার ধারাবাহিকতা, কথোপকথন-পদ্ধতির লৌকিকতা ও মনোবাস্তবতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নেও বেশ ব্যতিক্রমী তিনি। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় ধারা অবলম্বনকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন নানাভাবে বঞ্চিত মানবমানবীর আশাহত, ক্ষতবিক্ষত অন্তর্মুখী ক্ষুধার কুণ্ডলিনী বা ইপ্সিতকে না পেয়ে অতৃপ্ত অন্ত রাত্মার মাথা খুঁড়া হিসেবে। *দর্পণ* উপন্যাস সম্পর্কে তাই তাঁর বক্তব্য এ-রকম যে, এখানে ফ্রয়েড ও মার্কসীয় তত্ত্বের যৌথ উপস্থাপনায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব পেছনে পড়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অভিমত: ফ্রয়েডীয় ভাবধারার প্রাধান্যের আমলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন উপন্যাস লিখেছেন, যার মধ্যে মার্কসীয় প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিংবা এ কথাও বলা যেতে পারে যে, মার্কসবাদের প্রভাব শিল্পীর মনে অন্তঃশীল ছিল। মানিক-উপন্যাসের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত চরিত্রের সন্নিবেশ আর তাদের জীবনযাপন বিশ্লেষণ করেই রণেশ

ঔপন্যাসিকের প্রতিভায়, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপক্কতায়। এখানে প্রধান বিবেচনা হচ্ছে লেখকের 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'– যা সুপরিপক্ব এবং অবশ্যই তাঁর 'প্রতিভা'র অমৃত শিখায় পরিশুদ্ধ। তবে এই প্রতিভার খেলা দেখাতে গিয়ে তথাকথিত 'নন্দনতাত্ত্বিক আত্মকেন্দ্রিকতার প্রসার'কে তিনি মেনে নেন নি।

মনস্তাত্ত্বিকতার মাকড়সার জালের বিস্তারে এর বৃদ্ধি জেনেও মনস্তত্ত্বের সংযোগকে তিনি আহ্বান করেছেন। তবে তাঁর এ-কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অতিমনোকেন্দ্রিকতা উপন্যাস-শিল্পের মৌলিকতার দিক দিয়ে বিয়োগাত্মক ও বিপর্যয়মূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপন্যাসে বরং তিনি গণমানুষের উপস্থিতিই কামনা করেছেন বেশি। তিনি জানতেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রথম প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল উপন্যাস এবং তাতে 'ব্যক্তির কথা'ই মুখ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ও বিষয়বস্তুতে কাল আর সমাজের পরিবর্তন ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। তবে পুঁজিবাদী সমাজে যা-হয়, বুর্জোয়া ব্যক্তি ও সর্বহারা জনসাধারণ একইভাবে সমাজ অন্তর্গত মানুষ হিসেবে উপন্যাসে উঠে আসায় উপন্যাস জগতে উভয়ের অবস্থান কিছু দিনের জন্যে হলেও পাশাপাশি থাকে। রণেশ দাশগুপ্ত এ-অবস্থায় প্রশ্ন রেখেছেন যে, উপন্যাসে জনসাধারণকে পাওয়া যায় কি-না। যদি পাওয়া যায় তবে কোন অবস্থায় এবং সে-গুলো প্রকৃত চিত্র সত্যি কি ফুটিয়ে তোলে? এই প্রশ্নকে সামনে রেখে 'বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস' প্রবন্ধে উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন: 'উপন্যাস-পাঠকের জানা প্রয়োজন– কোন সামাজিক পরিবেষ্টনে, কোন শ্রেণী সন্নিবেশে কোন মানসিক ঘাত প্রতিঘাতে ঔপন্যাসিক কলম ধরেছিলেন অথবা ধরেছেন। প্রথম দিকটিতে আমরা দেখি, উপন্যাসে গণজীবন তরঙ্গিত কি-না, অথবা জীবন্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে কি-না।

দ্বিতীয় দিকটিতে দেখি, সামাজিক জীবন-প্রবাহের ভিতর থেকে উপন্যাস কত রকমে কতভাবে বেরিয়ে এসেছে।' রণেশ দাশগুপ্ত জানতেন যে, উপন্যাস যেমন ইতিহাস নয়, তেমনি নয় সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-পাঠ। এখানে চরিত্রের আধারে সমাজ ও সময়ের চালচিত্র যতোটা সম্ভব বিশ্বস্তভাবে উদ্ভাসিত হবে। উপন্যাসে আলাদা আলাদা চরিত্র-বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে তিনি গ্রহণ করেন নি। নিশ্চয়ই বিকাশশীল চরিত্র উপন্যাসের পটরচনার অত্যাবশ্যক উপদান, কিন্তু সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে শুধু চরিত্র-কেন্দ্রিক আলোচনা হতে পারে না। কারণ, 'এইভাবে দেখলে সমাজের ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে শুধু চরিত্রগুলির জীবন সংগ্রাম অথবা জীবন উপভোগের ব্যাপক ক্ষেত্র রূপে। আজ কিন্তু খুঁজতে হবে সমাজচিত্রের মাঝখানে গণজীবনকে। চরিত্রগুলিকে চরিত্র হিসেবে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ-জীবনের বিভিন্নমুখী গতিপরিণতির প্রতীক বা প্রতিনিধি হিসেবে

বা প্রতিরূপ-লক্ষ্মী চিত্রকলার পথিকৃৎ শিল্পীদের জীবন হচ্ছে ধনিকতন্ত্রী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জীবন।' এ প্রবন্ধ পড়ে বোঝা যায়, সাহিত্য সম্পর্কেতো বটেই চিত্রকলা সম্পর্কে, বিশেষ করে বিশ্বচিত্রকলা বিষয়ে তাঁর ধারণা ও জ্ঞান ছিল ব্যাপক।

'আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত বলেন যে, আবেগপ্রবণতাই শিল্পীকে পণ্ডিত ও সাধারণ সংসারী থেকে পৃথক করে। তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য: 'আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত যেন এক রামধনুর মতো যাতে ঝড়োমেঘের বিদ্যুৎজ্বালা যোজনা করা রয়েছে।'

আলো দিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০) গ্রন্থটি লেখকের বিভিন্ন সময় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচিত সাতাশটি প্রবন্ধের সংকলন। এখানে মূলত সাহিত্যশিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *মহুয়া* গ্রন্থের 'নববধূ' কবিতায় লিখেছেন: 'আলো দিয়ে জ্বেলে গেনু আলো'। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থনামটি এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। বিশের শতকের ছয়ের দশকে রবীন্দ্র-মূল্যায়ন নিয়ে প্রগতিশীলদের মধ্যেও নানা দ্বন্দ্ব ও তর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথকে সমাজবাদের পক্ষে কাজে লাগানোর পক্ষে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। কারণ তিনি মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা অন্য অনেকের মধ্যেই প্রকাশ পায় নি। তাই নাম-প্রবন্ধে এ-প্রসঙ্গে তিনি তার্কিকদের উদ্দেশে বলেছেন: 'আমরা কি রবীন্দ্রনাথের লেখার নবমূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের শিল্প ও জীবন-গত মূল্যকেও পুরোপুরি অনুধাবন করতে চেষ্টা করব না?'

'উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, মেহনতি মানুষ যখন থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসেবে উপন্যাসকে উচ্চমূল্য দিতে শুরু করেছে, তখন থেকেই এতে 'আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকতা'র নামে মাকড়সার জালের মতো একটি বিভ্রম সৃষ্টি করে উপন্যাসের শিল্পকলাকে ধরা ছোঁয়ার অতীত বলে প্রচার করা হচ্ছে। এই প্রচারটা আসছে মূলত– তাঁর ভাষায়, 'পরজীবী পুঁজিবাদীমহলগুলো' থেকে এবং তাদের উদ্দেশ্যে হলো মেহনতি মানুষের উপন্যাস সংক্রান্ত জাগ্রত আগ্রহকে নসাৎ করা। প্রাবন্ধিক এ-ধরনের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রিস্টোফার কডওয়েলের গ্রন্থ *ইলিউশ্যন এ্যান্ড রিয়্যালিটির* আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন, সঙ্গীত কবিতা ইত্যাদি থেকে উপন্যাস পৃথক; আর পৃথক বলেই এর শিল্পকলার সূত্রগুলোও অন্যরকম। তাঁর মতে, কবিতা ও গানের মতো উপন্যাসও ধ্বনি-প্রতীকের সাহায্যেই সৃষ্টি হয়, হবে তা বহির্বাস্তবে অবস্থিত বিষয়বস্তুর প্রতীক, যা কি-না উঠে আসে

প্রাণ ভাবেন, কিংবা বলেন যে, শব্দের স্বভাব টাকার মতো, বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জন্মে– তারা এ-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

কবিতার ভাষা-প্রশ্নে রণেশ দাশগুপ্তর অভিমতের সঙ্গে তাঁর উপন্যাস-ভাবনার একটা ঐক্য পাওয়া যায়। দুটো ক্ষেত্রেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন লোকভাষার। এই ভাষার শব্দাবলি উত্থিত হয় প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনচর্চার মধ্য থেকে। ইকবালের দর্শননির্ভর উর্দু কবিতায় প্রচুর ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলেও সত্যের-কবিতার দিকে যখন তিনি ঝুঁকে পড়েছেন তখন তাঁর ভাষা নিখাত উর্দু।

অন্যদিকে, ফিরদৌসিও কবিতায় মাতৃভাষা ফার্সি ব্যবহারে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন; পারতপক্ষে আরবি ভাষা তিনি বর্জনই করেছেন। এই মাতৃভাষা অর্থাৎ লোকভাষাকে রণেশ দাশগুপ্ত কবিতার প্রাণ হিসেবে মনে করতেন। তার কারণ- 'কবিতা ও মাতৃভাষাকে একত্রীভূতভাবে দেখার যে তাগিদ সেটি হচ্ছে মানবসমাজের মুক্তি সংগ্রামের অদম্য বিকাশের তাগিদ। মাতৃভাষা কবিতার সত্যের পদক্ষেপের প্রাণশক্তি। মাতৃভাষা অপহ্নবে কবিতার অপহ্নব। মাতৃভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য। মাতৃভাষার মুক্তি জনগণের মুক্তি। সুতরাং কবিতার এবং সত্যের মুক্তি।'

'অব্যাহত কবিতার জন্য' প্রবন্ধেও তিনি কবিতার শিল্পাধারের প্রশ্নে মাতৃভাবাকে কবিতার অন্যতম উপাদান হিসেবে চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছেন। তবে এখানে 'বিপ্লবী মানবতাবাদ'কে অন্যতম প্রধান বলে মনে করেন তিনি। ফরাসি সাহিত্যের লুই আরগঁ, পল এলুয়ার প্রমুখের সঙ্গে নবীন ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি আলোচনা করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবী মানবতাবাদ এঁদের সৃষ্টিকে কতটুকু অগ্রবর্তী করেছিল।

এই গ্রন্থে দেশি, বিদেশি লেখকদের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। নজরুলকে তিনি অভিহিত করেছেন 'গিরিফুল' বলে এবং লেখক তাঁর স্বভাবসুলভভাবে জিজ্ঞাসার ছলে তুলে ধরেছেন নজরুলের মাহাত্ম্য: 'গিরিফুলই কি স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ কাব্যিক মন ও পরিবেশের মাধুর্যের সঠিক সৌন্দর্য প্রতীক হিসেবে বাংলা-কাব্যের নতুন রূপসজ্জার সূত্রপাত করে নি?' 'সুকান্ত– নিকষিত হেম' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত সুকান্ত সম্বন্ধে বলেছেন: 'আরও স্পষ্টভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, সে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল ক্ষুধা থেকে, পরাধীনতা থেকে, যুদ্ধ থেকে, গুন্ডামি থেকে, দারিদ্র্য থেকে দেশবাসীর মুক্তির সংগ্রামে। সে জানতো যে, এ সংগ্রামে তার মৃত্যু এবং আরো অনেকের মৃত্যু হবে, কিন্তু এই প্রাণোৎসর্গেই অচলায়তন ধ্বংস হবে।' অন্যান্য প্রবন্ধেও শিল্পসাহিত্য

দেখতে হবে। সমাজকে এ-জন্য জনসমাজের নামে অভিহিত করে নেয়া যেতে পারে। সমাজকে এখানে পটভূমিকা থেকে সরিয়ে সামনা-সামনি হাজির করে উপন্যাসের সঠিক সামজিক বিচার করা সম্ভব।'

'ব্যক্তির কথা' নিয়ে যে-উপন্যাসের যাত্রা শুরু, তাতে শুধু ব্যক্তি-চরিত্র-বিশ্লেষণ পদ্ধতি নাকচ করে দেয়ার আর একটি কারণ হলো, পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধিদের ফ্রয়েড বা ঐ শ্রেণির দার্শনিকদের তত্ত্ব নিয়ে ব্যক্তিভাবের অতলস্পর্শতা ও শিল্প সৃষ্টির নামে স্থূল প্রচার কার্যে ব্যাপৃত হওয়া। উপন্যাসের আঙ্গিক বিবেচনার ক্ষেত্রেও তিনি এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করেছেন প্রচণ্ডভাবে। এই শিল্পমাধ্যমটির রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে তিনি সমাদর করেছেন সত্যি; কিন্তু বলেছেন: 'আজকের মূল কথাটা এই যে, জনসাধারণ এবং জনসমাজের গতিপথ ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে উপন্যাস লিখতে ও পড়তে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে, মূল্য নিরূপণ করতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।' অর্থাৎ আঙ্গিক হতে হবে বিষয় সম্পূরক, যে বিষয়ের নির্ভরতা সমাজ ও জনজীবনের বাস্তবতায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বোধ করি বলা চলে, জন-নন্দনতাত্ত্বিক-পারিমিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞান।

সত্যের-কবিতাই তাঁর কাছে ছিলো কবিতার-সত্য। তিনি, অর্থাৎ রণেশ দাশগুপ্ত মনে করতেন যে, সত্য নিশ্চিতভাবে অম্বিষ্ট হবে কবির– যেমন দার্শনিক অন্বেষণ করেন; কিন্তু কবির সত্য উদ্ভাসিত হবে কথাকে অবলম্বন করে। কথাকে ছাড়িয়ে নিরালম্ব সত্যের দিকে ধাবিত হতে পারেন দার্শনিক, তবে কবিতায় সত্য– 'কবির বাকসজ্জার মধ্য থেকেই উৎসারিত হয় এবং তাকে কথা থেকে কোনকালেই ছাড়িয়ে নেবার কথা উঠতে পারে না।' কবিতা রচনায় ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক বলে মনে করেন রণেশ দাশগুপ্ত। 'কবিতা ভাষা মাতৃভাষা' প্রবন্ধে এ-প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে তিনি মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ থেকে এলিয়ট-লুই আরগঁ-ইকবাল প্রমুখ কবির কবিতা-ভাবনা তুলে ধরেছেন। আসলে মানব মনের আবেগ ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত শিল্পবিভাবনা যখন বুদ্ধি ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত হয়ে যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপলাভ করে তখনই একটি কবিতা নির্মিত হয়। এবং এ-কারণেই সম্ভবত ইংরেজি কবি কোলরিজ বলেছেন: 'Poetry is the best words in the best order.' এই শব্দস্পন্দ নিয়েই গড়ে ওঠে কবিভাষা; রণেশ দাশগুপ্তর মতে এই ভাষা আসলে লোকভাষা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন: 'কবির অভিজ্ঞতা কিংবা নিরীক্ষাতে আরও একটি সত্য বেরিয়ে এসেছে। সেটি এই যে, কবিতার ভাষা মূলত মাতৃভাষা।' এই মাতৃভাষারই অপর নাম সংশ্লিষ্ট কবির দেশ বা অঞ্চলের লোকভাষা। এ-মত নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে; বিশেষ করে যারা শব্দের চেয়ে 'আইডিয়া'কে কবিতার

রণেশ দাশগুপ্ত এ-প্রসঙ্গে 'মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন: 'মার্কসাবাদীরা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে সমাজবিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করবে। কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে লোভ ও নীচতাকে অতিক্রম করে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ। মার্কসবাদীরা যে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চাইছে তার অঙ্গীকার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপস্থিত। কাঁটার ঝোপে ফুলের মতো।' কন্টকে রক্তাক্ত হবার সম্ভাবনাকে স্বীকার করেও স্নিগ্ধতা আর সৌন্দর্যের জন্যে রণেশ দাশগুপ্তর যে পিপাসা তার মূল্য কম নয়। এই গ্রন্থের প্রথম নয়টি প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক-বিশ্বের প্রধান সাহিত্যিকদের সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পাওয়া যায়।

রণেশ দাশগুপ্তের অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবীচেতনার প্রকাশ তাঁর সারাটা জীবনেই লক্ষ করা যাবে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে *সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ* (১৯৮৮) গ্রন্থটি। কলকাতা প্রবাস-জীবনে তিনি বেশ কয়েকজন গণচেতনাবিস্তারী উর্দু সাহিত্যিকের ওপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রপ্রদেশের উর্দু কবি মখদুম মহীউদ্দিন, জামসেদপুরের উর্দু কথাসাহিত্যিক শহিদ জাকি আনোয়ার, যুক্তপ্রদেশের মলিহাবাদের উর্দু কবি জোশ মলিহাবাদী, পাকিস্তানের উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, বিহারের পাটনার উর্দু কবি পারভেজ শাহেদী এবং লক্ষ্ণৌয়ে জন্মগ্রহণকারী প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উর্দু লেখক সাজ্জাদ জহীর। এই ছয়জন উর্দুভাষী লেখকের ওপর সাতটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে *সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ* গ্রন্থে। প্রত্যেকের ওপর একটি করে, সাজ্জাদ জহীরের ওপর দুটো প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে সাজ্জাদ জহীরের বোধ ও মূল্যায়নের ব্যাপারে রণেশ দাশগুপ্তের অভিমত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচিত ও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'সাজ্জাদ জহীর ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। উল্লেখ্য, গ্রন্থের সূচিপত্রে প্রবন্ধের নাম 'সাজ্জাদ জহীর ও রবীন্দ্রনাথ' ছাপা হলেও বইয়ে প্রবন্ধের শিরোনাম আছে 'রবীন্দ্রনাথ ও সাজ্জাদ জহীর'। সূচনায় প্রাবন্ধিক বলেছেন: 'এতে [সাজ্জাদ জহীর রচিত একটি প্রবন্ধে] রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য বক্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাজ্জাদ জহীরের মূল্যায়ন আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ নব নব প্রজন্মের কাছে কত প্রাসঙ্গিক।'

১৯৩৮ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী প্রেরণ করেছিলেন। সেই বাণীর মর্মার্থ নিয়ে উর্দু ভাষায় সাজ্জাদ জহীর একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে এ প্রবন্ধে যুক্ত করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত।

সম্পর্কে সমালোচক রণেশ দাশগুপ্তের নিজস্ব এবং অবশ্যই সুদৃঢ় বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬) গ্রন্থটি নির্বাচিত বিশটি প্রবন্ধের সংকলন। এখানেও মূলত সাহিত্যশিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে। *আলো দিয়ে আলো জ্বালা* থেকে এই গ্রন্থের সময়-পার্থক্যটিই প্রধান বিবেচ্য। *আলো দিয়ে আলো জ্বালা*-গ্রন্থে ছিল বিশের শতকের ছয়ের দশকে সাহিত্যশিল্প নিয়ে রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তার প্রতিফলন আর এই গ্রন্থে আছে স্বাধীনতা-উত্তরকালের তাঁর চিন্তা। এতে বিশ্বসাহিত্য নিয়ে আছে নয়টি প্রবন্ধ, বাংলাসাহিত্য নিয়ে এগারটি। 'মার্কসীয় বাতাবরণ: শতাব্দীকালের সাহিত্য' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত বলেছেন: 'তিরিশের দশকের শুরুতে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্ট হবার ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক ছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত মতাদর্শেরও সংঘাত। চল্লিশের দশকে এই মতাদর্শের সংঘাতকে পুরোভাগে রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে যে সম্ভাবনার কথা রণেশ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন, তারাশঙ্করের ব্যক্তি ও সৃষ্টির মধ্যে আরও গভীর করে সে অন্বেষা চলেছে। তিনি বাতিল করে দেন নি তারাশঙ্করকে, বরং অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঔপন্যাসিকের 'অন্তর্জ্বালা' এবং 'অসন্তোষে'র উৎস অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। এই চিন্তা মার্কসবাদী প্রথাগততা থেকে ভিন্নতর– অতিমাত্রায় মানববাদীগণ সম্ভবত এতে তুষ্টি পেতে পারেন। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা এক সময় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভাববাদ আপ্লুতায় অভিযোগ তুলে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মত্ত ছিলেন। কিন্তু রণেশ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে লক্ষ করেছেন জীবনের প্রতি শিল্পীর আনুগত্য এবং 'মৃত্যুকে জয় করার দৃঢ়তম প্রতীতি'। আর এ কারণেই তার মন্তব্য: 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মৃত্যু নেই, কারণ বহুমানবের মৃত্যু নেই।'

সুকান্ত ভট্টাচার্যও 'সব সময়েই মৃত্যুর ছায়াতে বসে জীবনের জয়গান গেয়েছে' বলে মনে করেন তিনি। জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতির কবি, ধূসরতার কবি, নৈরাশ্যেবাদী কবি ইত্যাদি বলা হলেও রণেশ দাশগুপ্তর বিশ্লেষণে জীবনানন্দ উদ্দেশ্যহীন বা উত্তরণহীন নন। তিনি স্বদেশে ও বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে মানবিক সামাজিক উত্তরণকেই আমল দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় অন্ধকার আছে, আছে মৃত্যু; কিন্তু জীবনের পরম প্রাপ্তি এটাই –একথা তিনি মনে করেন নি। আসলে জীবনানন্দ দাশের জীবন-জিজ্ঞাসায় দ্বন্দ্ব ছিলো, ক্রান্তিকালের ঘাত-প্রতিঘাত ও বৈচিত্র্যে এটা অস্বাভাবিক নয়। এই দ্বন্দ্বের জন্যে যে কবিমনে আক্ষেপ কম এ-কারণে বরং সমালোচিত হতে পারেন তিনি। কিন্তু তাঁকে বাতিল করা হবে ভুল।

থেকেও। রং লেগেছে কর্ম বিরতির সুরে নতুন করে কর্মের আহ্বানের। রং লেগেছে যৌবনেরও। [...] [...] বইটিতে আরও ব্যাপার ঘটেছে যার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার হাতে এসে হাত রেখেছে প্রভাত।'

'পারভেজ শাহেদী প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে উর্দু কবি পারভেজ শাহেদী রচিত *রাকসে হায়াত* (জীবননৃত্য) ও *তসলিসে হায়াত* (জীবন-ত্রয়ী) গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করে রণেশ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন: 'ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার পারভেজ শাহেদীর সীমাহীন ক্ষোভ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মতোই জ্বালাময়। পারভেজ শাহেদী মূলত সেই গণঐক্যের কবি, যা কমিউনিজমের সাম্যবাদী মানবসমাজের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংহতির সঞ্চালক শক্তি।'

সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ গ্রন্থটি মূলত উপমহাদেশীয় প্রগতিসাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের সংযোগ সৃজনপ্রয়াসে রচিত। ছয়জন উর্দুভাষী লেখকের লেখা পাঠ করে সেই লেখার সঙ্গে বাঙালি প্রধান লেখক, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের লেখার চেতনাগত মিল অনুসন্ধানের যে চেষ্টা তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। রণেশ দাশগুপ্ত ছাড়া এ অঞ্চলের আর কেউ উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে তুলনায় এনে এতো বিস্তৃত লেখেন নি।

গ.

রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন গণমুখী লেখক। তাঁর লেখা গ্রন্থাকারে যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে এর বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক। তাই বাংলা একাডেমীর কাছ থেকে ২০০২ সালে রণেশ দাশগুপ্তের রচনা-সংগ্রহের প্রস্তাব পাওয়ামাত্র বাংলাদেশ ও কলকাতার বহুজনের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে সময় ও অর্থ ব্যয় করে বহুবার যোগাযোগ ও স্থানমতো একাধিকবার গমন করি। রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার আবেগটি এখানে কাজ করে সত্যি, কিন্তু এর চেয়ে অধিক মনে হয়, তাঁর মতো একজন পবিত্র সাহিত্য-সংস্কৃতিবোদ্ধা ও আলোচকের রচনা-সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার! আমি বাংলাদেশের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করি, কিন্তু বলতে দ্বিধা হয়, সবার কাছ থেকে প্রত্যাশা মতো সহযোগিতা পাই নি।

রণেশ দাশগুপ্তের রচনা-সংগ্রহে ও প্রকাশে বাংলাদেশের যাঁরা আমাকে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন: প্রয়াত নারীনেত্রী হেনা দাস, অধ্যাপক ড. মো. তাইবুল হাসান খান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, ছড়াকার আখতার হুসেন, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, উদীচীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ সেলিম, অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী, কবি আমিনুর রহমান সুলতান,

সাজ্জাদ জহীরের ওপর অন্য প্রবন্ধের শিরোনাম– 'সাজ্জাদ জহীর: জীবনপঞ্জী ও দুটি বই'। এই প্রবন্ধে সাজ্জাদ জহীরের গ্রন্থ *লন্ডন কি রাত* (লন্ডনে একটি রাত) ও *মজামিনে সাজ্জাদ জহীর* (সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধাবলি) সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত আলোচনা করেছেন।

'সাম্যবাদী কবি মখদুম মহীউদ্দিন' প্রবন্ধে লেখক কবি মখদুম মহীউদ্দিনের জীবনী আলোচনা ও তাঁর লেখা গ্রন্থ পর্যালোচনা করে কবির সমগ্র কাব্যকে চার পর্বে চিহ্নিত করেছেন। রণেশ দাশগুপ্তের বক্তব্য: 'ছশ বছরের উর্দু কবিতার কিংবা হাজার বছরের ফার্সী কবিতার কয়েকটি বহু ব্যবহৃত প্রতীক ব্যবহার করেছেন মার্কসবাদী মখদুম, যিনি তাঁর সমস্ত কবিতাতে, যে-কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার। এখানে একটা বিশেষ প্রতীক লক্ষণীয়, যার মধ্যে তিনি ভরে দিয়েছেন আমাদের শতাব্দীর বিপ্লবী সারবস্তুকে।'

'শহীদ জাকী আনোয়ার' প্রবন্ধে তিনি এই উর্দু কথাসাহিত্যিকের *ফরেবি আরজু* (বাসনার ছলনা), *শিকস্ত্ হি শিকস্ত্* (পরাজয় শুধুই পরাজয়), *যহর* (বিষ) নামের তিনটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা-সূত্রে জাকি আনোয়ারের কথাসাহিত্য সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন: 'শহীদের রক্ত যে মুছে যাবার নয়, এই সত্যবাণীকে জাগ্রত রাখবে জাকী আনোয়ারের অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাবলীও। মানবতাবাদী প্রগতিবাদী লেখক নিজে অমর হতে চান কিংবা না চান, তার প্রধান লক্ষ্য থাকে অগণিত সাধারণ ও অসাধারণ মানব-মানবীকে অমর করার দিকে।'

'জোশ মলিহাবাদী: দুজনের একজন' প্রবন্ধে তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের মলিহাবাদে জন্মগ্রহণকারী উর্দু কবি শব্বীর হাসন খানের কবিকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। কবি শব্বীর হাসন খান মূলত উদ্দীপনার কবি। উদ্দীপনাকে উর্দু ভাষায় 'জোশ' বলা হয়। আর কবির জন্মস্থানকে যুক্ত করে অনুরাগীদের কাছে কবি শব্বীর হাসন খান পরিচিতি পান 'জোশ মলিহাবাদী' বলে। রণেশ দাশগুপ্তের পর্যবেক্ষণ হলো: 'কাজী নজরুল ইসলামকে পাশে রাখলে জোশকে অনেকগুলি বিষয়ে একেবারে এক ধরনেরই মনে হবে।' নজরুলের কবিতার সঙ্গে উর্দু কবি জোশের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা আছে এই প্রবন্ধে।

রণেশ দাশগুপ্তের অনেক প্রিয় ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা। তিনি *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা* নামে অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন, যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজ: উদয়াস্তরাগ' শিরোনামে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন মূলত কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ *শামে শহরে ইয়ারাঁ* (প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা) নিয়ে। প্রবন্ধকার বলেছেন: 'অস্তরাগে উদয়ের রং লেগেছে বস্তুসত্তার দিক

কবি তপন বাগচী, সংস্কৃতিকর্মী অমিত রঞ্জন দে, আমার ছাত্র মিলন রায় প্রমুখ। অমিত রঞ্জন দে পাণ্ডুলিপি কম্পোজ থেকে শুরু করে বানান শোধন এবং ট্রেসিং পর্যায় পর্যন্ত যথাদায়িত্ব পালন করেছে। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজ দুরূহ হয়ে পড়ত। রণেশ দাশগুপ্তের আদর্শের প্রকৃত অনুসারী বলেই তাঁর পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন সময়ে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন সোমেন চন্দের সহোদর কল্যাণ চন্দ, *মূল্যায়ন*-সম্পাদক অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুমিতা চক্রবর্তী, *ঐকতান*-সম্পাদক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম-নিবন্ধক নীতীশ বিশ্বাস, *ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জিডিআর* পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক পঞ্চানন সাহা, *এবং প্রতর্ক*-সম্পাদক দেবাশিস্ সেনগুপ্ত, *এবং এই সময়*-সম্পাদক অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতা সীমান্ত*-সম্পাদক দীপেন রায়, সিপিআই নেত্রী প্রণতি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আমি এঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণেই *রণেশ দাশগুপ্তের রচনাবলি* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক এবং সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ও সহপরিচালকের সহযোগিতাকে স্মরণ করছি। বিশিষ্ট শিল্পী অশোক কর্মকার এই গ্রন্থের জন্য প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রচনাবলির বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রণেশ দাশগুপ্তের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থগুলোতে তাঁর অনুসৃত বানানরীতিই রক্ষা করা হলো। এতে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে রণেশ দাশগুপ্তের গদ্যের রূপ ও মেজাজ উভয়ই বোঝা যাবে।

সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

উপন্যাসের শিল্পরূপ

সোনালি ব্যানার্জী

এক
গোড়ার কথা

উপন্যাসের শিল্পরূপ কি বরাবরই একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালা? এর মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা হীরকের মতো অনমনীয়? অথবা এর সবটাই একতাল পলিমাটির মতো নমনীয়! নমনীয় হোক আর না হোক, এর মৌলিক উপাদানগুলি কি ধরনের? উপন্যাস কি শুধু গঠন বা আকৃতির দিক দিয়েই কাব্য এবং নাটক থেকে আলাদা? কাব্য এবং নাটকের সঙ্গে কোন্ খানে এর মানবিক উপকরণ বা বিষয়ের মিল আছে? বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাস আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য মানব ও মানবীয় সুখদুঃখের তাড়নার দিক দিয়ে একেবারে তুলনার বাইরে নয়। কিন্তু এ স্থলে কোথায় উপন্যাসের স্বকীয়তা? কোথায় এবং কখন এই স্বকীয়তার সূত্রপাত এবং প্রতিষ্ঠা?

প্রশ্ন আরও আছে। যে সব উপাদান নিয়ে উপন্যাসের স্বকীয়তা, সেগুলিকে কি তার পক্ষে পূর্বাপর ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে? কিংবা তার পতন হয়েছে এবং বিশ শতকের উপন্যাস আঠেরো শতকের উপন্যাসের ছায়ামাত্র? বিজ্ঞানোপন্যাস কি প্রধানত বিজ্ঞান, অথবা প্রধানত উপন্যাস? এখান থেকেই একেবারে পিছনে গেলে প্রশ্ন আসে—রূপকথা, কিংবদন্তী কিংবা আরব্যোপন্যাসের ধরনের উপাখ্যান কিংবা মধ্যযুগের অন্যান্য কেচ্ছা কিংবা প্রণয় কাহিনী কি উপন্যাস-পদবাচ্য? তাহলে সমাজবিপ্লবের পর্যায়ক্রমে ইতিহাসকে যে যুগ-চিহ্নিত করা হয়, উপন্যাস তাকে অতিক্রম করেই চলে এসেছে?

এধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে দুইভাবে। প্রথমত, উপন্যাসের ঠিকুজিকুষ্ঠির সন্ধান করতে গিয়ে এইসব প্রশ্ন সমাধানের দাবী নিয়ে সামনে এসে পড়তে পারে একটার সঙ্গে আরেকটার উপর টান পড়ায়। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের যে নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছে বিশ শতকে, তাকে গত দুই তিনশত বছরের উপন্যাসের ধারার সঙ্গে মেলাতে না পারায় এই প্রশ্নগুলিকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়োক্ত প্রয়োজনেই 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' গ্রন্থের অবতারণা। কিন্তু প্রথমোক্ত তাগিদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে একান্ত বর্তমানের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্যে উপন্যাসের ঠিকুজিকুষ্ঠি ঘাঁটা দরকার। 'উপন্যাসের শিল্পরূপ'কে এই কারণে যেতে হচ্ছে তার জন্ম লগ্নে। বর্তমানের মুখোমুখি হওয়ার দরুনই যেতে হচ্ছে অতীতে।

যে বর্তমান এখানে মুখ্য, সেটা কী ধরনের? এখানে আমরা দেখবো উপন্যাসের শিল্পরূপ বিশেষ করে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে একটা বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকেও এই বিশেষ যুগের বলয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে প্রস্তুতি-পর্ব হিসেবে। পুরানো সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ হয়ে যাচ্ছে, নতুন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো

নির্মিত হচ্ছে। দিনবদলের এই পালাতেই উপন্যাস তার বিগত দুই তিন শত বছরের চিরায়তিক গঠনের ক্ষেত্রে ভাঙ্গা-গড়ার সন্ধিক্ষণে পুরানো ছাঁচ ভেঙ্গে নতুন ছাঁচ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। নতুন ছাঁচ এখনও নরম বলেই এর একাধিক রূপ গড়ে ওঠার প্রবণতা এবং সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই কারণেই মনে হয়, উপন্যাস বুঝিবা অনেকগুলি পৃথক পৃথক ছাঁচে বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছে। অজস্র প্রশ্নের সৃষ্টিও হয়েছে পৃথকীকরণে। এই পৃথক পৃথক প্রবণতার কোন্‌টা স্থায়ী এবং কোন্‌টা অস্থায়ী, কোন্‌টা নিতান্ত পরীক্ষমূলক এবং কোন্‌টাই বা পরীক্ষোত্তীর্ণ, সে সম্পর্কে শিল্পীরা স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত টানতে আগ্রহী। ব্যাখ্যাকারদের অবিশ্রান্ত বিশ্লেষণের পাশে পাশেই শিল্পীদের তরফ থেকে আত্মজিজ্ঞাসার আকারে হোক কিংবা অর্ন্তদ্বন্দ্বের সমাধানের তাগিদে হোক, উপন্যাসের শিল্পরূপ নির্ধারণের প্রয়োজনে প্রশ্ন উঠেছে, 'উপন্যাস কোন্ পথে?' শিল্পীদের মধ্যে কারও মনে যদিবা স্থির নিশ্চয়তা থেকে থাকে নিজস্ব প্রবণতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, তাতে পক্ষীয় এবং প্রতিপক্ষীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার আকর্ষণ বিকর্ষণকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিংবা বলা যায়, সহজ হলেও সহজসাধ্য হচ্ছে না শুধু একতরফা কোন কিছু করা।

যে বিশেষ তিনটি কারণে যেকোন যুগে যেকোন শিল্পরূপে পরিবর্তন আসতে বাধ্য এবং সমাজ বিপ্লবের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত শিল্পরূপের ক্ষেত্রে যে তিনটি তাগিদ পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুনের পত্তন করে, সেই প্রযোজকগুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতেও সক্রিয়। এই তিনটি প্রযোজকের প্রথমটি হচ্ছে এই যে, সৃজনশীল শিল্পী প্রচলিতের পুনরাবৃত্তি করে চলতে পারেন না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, পাঠকপাঠিকাদের সংখ্যাগত এবং গুণগত চাহিদা শিল্পীগ্রহীতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগ্বলয় সৃষ্টি করে শিল্পরূপের প্রচলিত বলয়গুলিকে ভেঙ্গে দেয়। তৃতীয়টি হচ্ছে এই যে, নতুন বিষয়বস্তু চায় নতুন প্রকাশভঙ্গী। এই তিনটি প্রযোজক অবশ্য বিংশ শতাব্দীতেই কার্যকরী হয়েছে এমন কোন কথা নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এই তিনটি তাগিদ কাজ করে আসছে এবং উপন্যাসের বিশেষত্বের মধ্যেও এনেছে অফুরন্ত বৈচিত্র্য। তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতাব্দীতে উপরোক্ত তিনটি প্রযোজকই পরিমাণগত এবং গুণগত দিক দিয়ে অনেক অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে। এই সক্রিয়তা যোগাত্মক (Positive), কারণ, জীর্ণ ও মরণোন্মুখ ধনতন্ত্রকে অপসারিত করে নবজীবনের ছাড়পত্র নিয়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। এত প্রাণ আছে, এত কথা আছে, এত মান আছে, এত সম্ভাবনা আছে এই নব সমাজে যে, আরেকটা শতাব্দী লাগবে এদের পুরোপুরি গুছিয়ে তুলতে। সুতরাং শিল্পরূপের ভাঙ্গাগড়ার প্রযোজকত্রয়ের সক্রিয়তা পাচ্ছে অপরিসীম প্রসারক্ষেত্র। এতে একদিকে যেমন সার্থকতা অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সমস্যাও দেখা দিতে বাধ্য। এই সমস্যাবলির নিরসন করে শিল্পীকে পথ করে নিতে হচ্ছে সামনে।

বর্তমান অতীতকে ভাঙ্গছে, ভাঙ্গবে। সাবেক শিল্পরূপের ছাঁচকে ভাঙ্গতে হচ্ছে নতুন সৃষ্টির জন্যে। সাবেক ছাঁচের ভাঙ্গন কিন্তু আরেক দিক দিয়েও চলে এসেছে। সেটা ক্ষয়ের ভাঙ্গন। এই ক্ষয়ের ভাঙ্গন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও চলছে। একে বলা যেতে পারে অবক্ষয়, ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া। ফাঁকা, ফাঁপা হয়ে যাওয়া।

দুইতিন শতাব্দী আগে সমাজের যে শ্রেণী বা স্তরের সঙ্গে উপন্যাসের ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল, তার মধ্যে ক্ষয় বা পচন ধরাতে কিংবা জীবনের নতুনের তাগিদের ক্ষেত্রে তা আলগা হয়ে যাওয়াতে, উপন্যাসের যে দিকটা বিশেষভাবে তার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল, সেদিকটাতে হয় ক্ষয় কিংবা পচন ধরেছে অথবা জীবন থেকে উপন্যাস সেদিক দিয়ে আলগা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং উপন্যাস যে কয়েকটি মূলসূত্রকে একত্রিত করে তার ভিত্তিতে দানাদার হয়ে উঠেছিল, সেই কয়েকটি মূলসূত্রকে সাবেক সমাজ ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষপাতীরাই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে এবং একটা শূন্যতার কৃত্রিম আবহাওয়াতেও উপন্যাসকে ধরে রাখতে প্রয়াসী হয়েছে। উপন্যাসের চিরায়তিক গঠন বিপন্ন হয়েছে এই নেতিবাচক রূপায়ণ প্রয়াসেও। উপন্যাসের একটা ন্যূনতম সত্তাও শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে কিনা, সে প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে এই কারণে। উপন্যাসের গত দুই শতাব্দীর কাঠামোটা যাতে ভেঙ্গে নিরবয়ব হয়ে না যায়, সেটা দেখবার দায়িত্ব এদিক দিয়ে এসে পড়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকাবাহী শিল্পীদের ওপর। সোভিয়েট উপন্যাসে তাই দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকীয় বাস্তববাদী উপন্যাসের ধারা বজায় রাখার দিকে ঝোঁক। শুধু এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শিল্পীদের তরফ থেকেই উপন্যাসের চিরায়তিক কাঠামোকে অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর চেষ্টা হয় নি কিংবা হচ্ছে না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো একক বিদ্রোহী শিল্পীর তরফ থেকেও এ প্রবণতা প্রকাশ করা হয়েছে দুই শতাব্দী পূর্বেকার উপন্যাসশিল্পী ফিল্ডিং-এর প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের মাধ্যমে। তবে সংশয়াতীত নয় এই মূল কাঠামো রক্ষা করার প্রচেষ্টা! ঠিক কোনখানে পচনের নিবৃত্তি সাধনের প্রয়োজন এবং ঠিক কোন্‌খানে ভাঙ্গার প্রয়োজন সমাজবিপ্লবের প্রয়োজনে, সে তর্কের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিপ্লবী শিল্পীদের।

যেমন ধরা যাক মনোবীক্ষণের কথা। মানুষের মনের গভীরের ছবি তুলে আনার জন্যে শুধুমাত্র মানুষের মনের মধ্যে-ই শিল্পীরা যখন, স্মৃতি আর স্বপ্নের জগতে বনের মধ্যে কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠুরিয়ার হারিয়ে যাওয়ার মতো বাস্তব জগত থেকে সরে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের লেখার মধ্যে এক ধরনের মনস্তত্ত্ববিদ তদীয় প্রতিপাদ্য বিষয়কে সঠিক প্রতিপন্ন করার খোরাক পাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু সে প্রতিপাদ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে মানুষের ব্যবহারিক জগৎ থেকে, ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তন সাধনের সংগ্রাম থেকে। এই বিচ্ছিন্নতাকে জীবনবিরোধী বলে অভিহিত করার ব্যাপারে শুধু যে সমাজতন্ত্রী শিল্পীরাই উদ্যেগ নিয়েছেন তা'নয়। ফরাসি মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক প্রুস্তকে অসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি সংশয়বাদী ইংরেজ ঔপন্যাসিক আলডুস হাক্সলিও। তাছাড়া অতি মনস্তাত্ত্বিকতার বিচ্ছিন্নতাকে পরিহার করতে গিয়ে কোন কোন মহলে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, মনোজগতের ছবি আঁকার প্রবণতা একটা বিপজ্জনক প্রবণতা। এই ধারণা থেকে মনোজগতের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শিল্পীদের সাবধানে পা টিপে টিপে পথ চলার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই অতি সাবধানতা উপন্যাসের মানব-মানবীকে কাঠের পুতুল করে তোলার তাগিদের শামিল। সুতরাং যে মানব মানবীর কাহিনী নিয়ে উপন্যাসের শিল্পরূপ, তার মধ্যে কতটুকু অন্দর আর কতটুকু বাহির এবং এই অন্দর ও বাহিরের যোগবিয়োগ কতখানি নব গুণাত্মক, সেটা নির্ধারণ করা সহজ সাধ্য নয়। জীবন প্রবাহের অবিশ্রান্ত প্রবাহের সঙ্গে গভীরতম সংযোগ রেখে একটা

সঠিক সমতায় পৌঁছবার দায়িত্ব বর্তেছে জীবনশিল্পীদের ওপর। উপন্যাসের শিল্পরূপের ভাঙ্গাগড়ার মূলে রয়েছে এই কর্মকাণ্ডটিও।

উপন্যাসের শিল্পরূপের ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান নির্ণয়ের কাজটি ঋজু সংজ্ঞার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকবে অথবা একটিমাত্র সংজ্ঞা যাদুকরের কথিত আয়নার মতো যে যা কিছুর খোঁজ করছে তাকে তাই পাইয়ে দেবে, এধরনের প্রত্যাশা করা যে ঠিক নয়, উপরোক্ত বিবেচনাগুলি তারই স্মারক। সংজ্ঞা যতই না কেন অর্থবোধক হোক, তার সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্যেই ধারাবাহিকভাবে নতুনতর সংজ্ঞার সোপান ধরে এগিয়ে যাওয়া দরকার। বিজ্ঞানকে নিরাসক্ত, শিল্পকলাকে আবেগ ও আসক্তি ভিত্তিক এবং উপন্যাসকে ভাষাভিত্তিক অন্যতম শিল্পকথা হিসেবে কবিতার পাশাপাশি সাজালেও, ক্রিস্টফার কডওয়েল শিল্পকলার বিভিন্ন বিভাগের গঠন নির্ণয় অগ্রসর হয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, উপন্যাসে আবেগ ও আসক্তি বহির্বাস্তবে আশ্রিত হয়ে এমন একটি বিশিষ্ট সত্তাপ্রাপ্ত হয়েছে, যা বিজ্ঞানেরই সগোত্র বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এর অর্থ এই যে, কবিতার বিভিন্ন প্রবণতাকে যদিবা কোন একটি ঋজু সংজ্ঞা দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব না হয়, উপন্যাসের বিভিন্ন প্রবণতাকে একটি সংজ্ঞায় ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও গৎবাঁধা অর্থে কোন সংজ্ঞা আশা করা হবে অবৈজ্ঞানিক। কারণ, প্রথমত, ফলিত বিজ্ঞানের কোন সূত্রও অলঙ্ঘনীয় নয়, চিরকালের জন্যে উচ্চারিত ও নির্বাচিত সূত্র নয়। ক্রিস্টফার কডওয়েল যে কোন ঋজু সূত্র বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে যে সাবধান বাণী দিয়েছিলেন, সেটি এখানে প্রযোজ্য। 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে কবিতার ভবিষ্যৎ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ভবিষ্যদ্বাণী খুব বেশি অবিকল ও চুলচেরা হওয়া উচিত নয়। কোন একটি গুণ তার বিপরীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে ছোট একটুখানি পরিবর্তনের ফলে।' কোন শিল্পরূপই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সামগ্রিক জীবনের গুণাত্মক পরিবর্তনের সময় উপন্যাসের শিল্পরূপের সংজ্ঞাতে গুণাত্মক পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। কোন একটা বিষয় কোন অবস্থায় কোন সময়ে এমন অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা হয়তো প্রথমাবস্থায় প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং কডওয়েল প্রদত্ত সংজ্ঞাকে সামনে রেখে উপন্যাসের শিল্পরূপ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা খেয়াল রাখবো, আমাদের বিচারের ধারাটি সবদিকে চোখ রাখলেও দিশেহারা হবে না, কারণ জীবন যে বিচিত্র সেকথা এই সংজ্ঞার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জানা আছে।

উপন্যাসের ঠিকুজিকুষ্ঠি ঘাঁটা 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, একথা আগেই জানিয়েছি। তবে একথাটাও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছি, যেখানে এই শিল্পরূপের চিরয়াতিক গঠনের সূত্রপাত, সেখানে যেতে হবে একান্ত বর্তমান এবং আগামী দিনের প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়ার জন্যেই। সুতরাং উপন্যাস যখন এবং যেখানে দানা বাঁধলো এবং এর এই দানাবাঁধা রূপ পরবর্তীকালেও বহুদিন পর্যন্ত যেভাবে শিল্পীদের শিল্পধারা জোগালো, সেই ধারা থেকে মূলসূত্র নিয়েই বর্তমানে এসে পৌঁছানোর চেষ্টা করা যাক।

দুই
জন্মকথা

সংলাপ এবং ঘটনা বর্ণনার এক অভূতপূর্ব নবগুণাত্মক সমৃদ্ধ সমাবেশে রচিত সাহিত্য-শিল্পরূপ যে উপন্যাস, তার মৌলিক অবয়ব বেরিয়ে এসেছিল সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে। বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কারে স্পষ্টতর হয়ে ওঠা জগৎ ও মানবজীবন এবং শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক যন্ত্রপুরীর ছাঁচের পণ্যোৎপাদক চুল্লীগুলি মধ্যযুগীয় রূপকথা, কিংবদন্তী, উপাখ্যান ও কেচ্ছার একক জবানবন্দীর ধারাকে বহুজনের জবানবন্দীর ধারায় পরিণত করে কিংবা একক জবানবন্দীতে বহুজনের সংলাপ আরোপ করে তাকে বহুকণ্ঠী করে পৌঁছে দিয়েছিল উপন্যাসে। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন ব্যতীত উপন্যাস-শিল্প সম্ভবপর হতো না। অবাধ ব্যবসায়ের অন্যতম পণ্য হিসাবে এর সরবরাহের ব্যবস্থা না হলে উপন্যাস ব্যাপক সংখ্যক পাঠক-পাঠিকার নিভৃত নিলয়ে নিলয়ে পৌঁছাতে পারতো না। সামন্ততান্ত্রিক-সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যে মাতৃভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গড়ার প্রবণতা গড়ে উঠেছিল শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতির মুখে, তার প্রয়োজনা না থাকলে উপন্যাস তার সর্বজনগ্রাহী মুখরতা পেত না। সুতরাং একটা বিশেষ যুগে বিশেষ অবস্থায় উপন্যাস দানা বেঁধেছিল এমন কয়েকটি সূত্র নিয়ে, যাতে পুরানো উপাখ্যান, রূপকথা, কিংবদন্তী ও কেচ্ছার স্বপ্নমঙ্গলের রোমাঞ্চকর মায়াজাল থেকেও বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। শিল্পী ও পাঠক পাঠিকার মনে মানব-মানবীর বাস্তব জীবনের সত্যকে নিরাবরণভাবে জানার আগ্রহী উদগ্র হয়ে উঠেছিল বলেই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। নিতান্ত যন্ত্রনির্ভর এবং তথাকথিত ঢালাওভাবে রচিত সুলভ সংস্করণের পুস্তকপণ্যের মধ্যে কথাশিল্পীরা মানব মানবীর প্রমুক্ত বা মুক্তিমুখী হৃদয়ের ইতিবৃত্তকে সংস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। মুদ্রণযন্ত্র আর কাগজ উৎপাদনের প্রাচুর্য হাতে লেখা পুঁথির সীমাবদ্ধতা থেকেও লেখনীকে মুক্তি দিয়েছিল। মধ্যযুগের অবসানকারী বৈপ্লবিক অবস্থায় মহাকাব্য-উপযোগী জীবনকে বাঙ্ময় করে তোলার তাগিদটিকে পয়ার কিংবা ত্রিপদীতে গাঁথতে হয় নি কিংবা ছড়িয়ে দিতে হয় নি মানব মানবীর রসনা ও স্মৃতি নির্ভর করে। ফিরে যেতে হয় নি দীর্ঘ কবিতায়। মানব মানবী যে গদ্যের ভাষায় কথা বলে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং ঘটনা বর্ণনা করে, সেই গদ্যের সঙ্গতেই ব্যাপক জীবনকে বাঙ্ময় করে তোলা তাই সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। অজস্র প্রতিলিপি তৈরি করা গিয়েছিল সুদীর্ঘ গদ্য কথনের। এই কারণেই ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাস টম জোনসের নাম দিয়েছিলেন গদ্য-মহাকাব্য। এর শতাব্দীকাল পরে বাংলার উপন্যাস লেখার মূলেও কাজ করেছিল বাংলাদেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার এবং কাগজের সহজ প্রাপ্যতা। শিল্প বিপ্লবের পরোক্ষ ছত্রছায়াতেই এ ব্যাপারটা সম্ভবপর হয়েছিল বাংলায়। যেখানে শিল্পবিপ্লবের কর্মকাণ্ড ছিল প্রত্যক্ষ, সেই ইংলাণ্ডে উপন্যাসের শিল্পরূপ রচনাতে এর প্রয়োজনীয় তীব্রতাকে সহজেই অনুমান করা যেতে

পারে। সেখানে একটা নদীর মুখ খুলে দেয়া হয়েছিল যেন। সেদিন প্রাচীন মহাকাব্যের সামগ্রিকতায় ফিরে যাবার প্রশ্ন আর ওঠে নি, যদিও অনুবাদ ও সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে মহাকাব্যের ধারা উপন্যাসের পাশাপাশি তার স্রোতধারাকে বজায় রেখেছিল। কবি মিল্টন এবং ঔপন্যাসিক ডানিয়েল ডিফোর আবির্ভাব কাছাকাছি হলেও, কিংবা উপন্যাসের সামগ্রিকতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা মহাকাব্যের স্মারক হলেও, উপন্যাস গদ্য বর্ণনা ও সংলাপের প্রায় কুলহীন প্রবাহে সমৃদ্ধ হয়ে পড়ার অথবা অমিত্রাক্ষরের তটে বাঁধা মহাকাব্যকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছিল। উপন্যাস সেই কালান্তরের নর-নারীর সম্মিলিত সাধস্বপ্নবিস্তারের বাধামুক্ত প্রগল্‌ভ শিল্পরূপ হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু এই প্রগল্‌ভ প্রকাশের পথে ছিল একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব। ইউরোপে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে সৃষ্টি ছাড়া কাহিনীর ছাঁচের মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা ও চরিত্রের অবতারণা দ্বারাই নরনারীর বাস্তব জীবন ও জগতের উপর থেকে পর্দা সরানোর প্রয়াস করেন কয়েকজন শিল্পী। ফ্রান্সের রাবেলাইস লিখেছিলেন 'গরগন্টুয়া ও পেন্টাগ্রুয়েল'। তাঁর অর্ধ-শতাব্দী পরেই স্পেনের সার্ভেন্টিস লিখেছিলেন 'ডনকুইক্সোট'। 'গরগন্টুয়া ও পেন্টাগ্রুয়েল' প্রায় অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হলেও তাদের মারফত রাবেলাইস সামান্ততন্ত্রের মধ্যযুগীয় সংস্কার ও রক্ষণশীলতার উপর থেকে সমস্ত রকমের মোহময় এবং মায়াময় আবরণগুলিকে চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলেন। এর দুইশত বছর পরে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জনতা যে মধ্যযুগীয় সংস্কার ও রক্ষণশীলতাকে অপসারিত করেছিল, তার উপর থেকে প্রথম পর্দা সরিয়েছিলেন রাবেলাইস তাঁর নায়কদের অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী করে, কারণ রাবেলাইসের সময়ে জনতার শক্তি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয় নি। মধ্যযুগীয় উপাখ্যানের উপযোগী আদিরস ও ভাঁড়ামির প্রয়োগ কোথাও কোথাও শ্লীলতার গণ্ডী ডিঙ্গালেও 'গরগন্টুয়া ও পেন্টাগ্রুয়েল' উপন্যাসে তদানীন্তন ফরাসি সামরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার অচলায়তনের চিত্রের পর চিত্র ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে রাবেলাইস নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। নায়কদের অসংখ্য অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাবেলাইস গদ্যের এক সার্বিক ধারার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে উপন্যাস যখন দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জীবনযাত্রার ভিত্তিতে দানা বাঁধলো, তখন তাতে রাবেলাইসের পদ্ধতি প্রযোজক হিসেবে কাজ করলো।

সার্ভেন্টিসের 'ডন কুইক্সোট' যেন রাবেলাইসের 'গরগন্টুয়া ও পেন্টাগ্রুয়েল' গ্রন্থের চাঁদের অপর পিঠ। সার্ভেন্টিস তাঁর উপন্যাসের ডনকুইক্সোট এবং তদীয় অনুচর সাঙ্কোপাঞ্জার যে চরিত্র উপস্থিত করেছেন তা হচ্ছে অকর্মা চরিত্র। মধ্যযুগে মানুষের মনের স্বপ্নসাধ যে ভাবপ্রবণতার ডানায় ভর দিয়ে আকাশ কুসুমের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থাকতো এবং নির্ভেজাল ভাল কিংবা মন্দের কাল্পনিক ছবি চোখের সামনে রাখতো, সেইগুলি দিয়ে ঠাসা থাকতো তখনকার উপাখ্যান, কিংবদন্তী, রূপকথা ও রহস্যলহরী। এই সব উপাখ্যান আর কিংবদন্তী পড়ে ডনকুইক্সোট বাস্তব জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানারকম উদ্ভট ধারণা নিয়ে যেদিন সত্যসত্যই সংসার দেখতে বেরুলো সেদিন তাকে পদে পদে ঠোকর খেতে হলো। সার্ভেন্টিস তাঁর উপন্যাসে

তুলে ধরলেন এই ঠোকর খাওয়ার অট্টহাস্যময় ছবির পর ছবি। সার্ভেন্টিসের এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দুটি বিষয়ের অবতারণা ঘটলো। প্রথমত, মধ্যযুগীয় স্বপ্নবিলাসী কেচ্ছা কাহিনীর ধারাতে ডনকুইক্সোটের 'জগৎ দর্শন ও জগৎ উদ্ধারের' কাহিনী বলা হলেও স্বপ্নবিলাসিতাকে পরিহার করার জন্য এতে এমন এক চূড়ান্ত তাগিদ দেওয়া হলো, যা রগড় এবং রসিকতার উদ্ভট কাণ্ডকারখানা ছাপিয়ে শিল্পীদের সামনে উদঘাটিত হলো উপন্যাসে বাস্তব জীবনকে নিরঙ্কুশ ভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রযোজক হিসেবে। দ্বিতীয়ত, স্পেনিশ মাতৃভাষার নিরাভরণ গদ্যে এত বড় একটি বই কিভাবে পাঠক-পাঠিকার মনকে টেনে রাখতে পারে, তার একটি পরিমাপ দাখিল হলো ডনকুইক্সোটের মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি যুগান্তকারী গ্রন্থের নাম করতে হয়। বইটি বোকাচিওর গল্পমালা। অনেকগুলি টুকরো টুকরো গল্প একটা জবানবন্দীতে আরব্যোপন্যাসের কায়দায় বর্ণিত হলেও ইটালির রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগের মানবতাবাদী ভাবধারাকেই সামনে আনে বোকাচিওর এই গল্পমালা। অবশ্য এই মানবতাবাদ প্রথমে মানুষকে স্বপ্নকল্পনার রাজ্য থেকে মাটির উপর নামাবার চেষ্টা করে নরনারীর রক্তমাংসের দেহকে মুখ্য করে তুলে। মধ্যযুগীয় ভাবপ্রবণতায় ধ্যানধারণা নরনারীর প্রেমকে অবাস্তব ও ধোঁয়াটে করে রেখেছিল। এটা ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভোগলালসারই একেবারে উল্টো পিঠ। কপটতা আর ভান দিয়ে ঘেরা নরনারীর পরস্পরের প্রতি আনুষ্ঠানিক ভদ্র আচরণের দিক। বোকাচিও এই ভান আর ভণ্ডামির পর্দাগুলিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি একটি বিশেষ উপাদানকে সামনে আনেন নরনারীর প্রকৃত চরিত্র চিত্রণে উদ্যোগী কথাশিল্পীদের সামনে। সেটি হচ্ছে কৌতুক বা পরিহাস।

রাবেলাইসের 'গরগন্টুয়া ও পেন্টাগ্রুয়েল'–সার্ভেন্টিসের 'ডনকুইক্সোট' এবং বোকাচিওর গল্পমালা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক করার ব্যাপারে শিল্পীর যে একটা প্রচ্ছন্ন অধিকার রয়েছে মানব মানবীর কাহিনী বর্ণনায়, সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেন। উপন্যাস যখন দানা বাঁধলো উদ্ভট ও অস্বাভাবিক চরিত্রের জায়গায় স্বাভাবিক নরনারী চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে, তখনও শিল্পীর হাতে রয়ে গেল মানবমানবীর আচার আচরণকে পরিহাসের রসে রসিয়ে পরিবেশন করার অধিকার।

এখানে বিশেষ করে রাবেলাইস এবং সার্ভেন্টিস যে বিদঘুটে চেহারার আমদানী করেছিলেন তাঁদের নায়কদের রূপ দেখার জন্যে, তা থেকে শিল্পীর এই কৌতুকী বা পরিহাসপ্রবণ ভূমিকা স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। রাবেলাইস এবং সার্ভেন্টিসের বিদঘুটে চেহারার নায়কেরা শিল্পীর কিংবা শিল্পী যে নবজাগ্রত মানুষের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার তাদের ছদ্মবেশ। ব্যাকরণগত অর্থে প্রথম পুরুষ এখানে তৃতীয় পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে জগৎকে ছদ্মবেশে পরখ করার জন্যে। বিদঘুটে চেহারা নিয়েই শিল্পী শুধু কৌতুক বা পরিহাস করেন নি। এদের মারফত শিল্পী যে লোকসমাজকে পাচ্ছেন, তাঁদের নিয়েই তাঁর কৌতুক ও পরিহাস। এ কারণেই দেখা যায়, যখন বিদঘুটে চেহারার বদলে স্বাভাবিক চেহারার নারনারী উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হয়েছে, তখনও উপন্যাসিক তাদের নিয়ে খেলা করেছেন। ফিল্ডিং এই উপাদানটিকে উত্তরাধিকার সূত্রে

রাবেলাইস এবং সার্ভেন্টিসের কাছ থেকে পাওয়া অপরিহার্য উপাদান হিসেবে দাখিল করেছেন তাঁর 'টম জোনস' উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রকে শিল্পী যখন ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর পরিহাসনিপুণতার দরুন চরিত্রগুলি স্বচ্ছন্দ থাকতে পেরেছে। কৌতুক (irony) এই কারণে আজও উপন্যাসের একটি স্থায়ী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তবু সার্ভেন্টিস, রাবেলাইস কিংবা বোকাচিও উপন্যাসের পথিকৃৎ মাত্র। তাঁরা পাঠকপাঠিকার মনকেও প্রস্তুত করার কিংবা প্রস্তুতির একটা আবহাওয়া গড়ে তোলার কাজ করে গিয়েছেন তাঁদের গ্রন্থগুলি দ্বারা।

উপন্যাস পুরোপুরি দানা বেঁধে উঠবার পথে উপরোক্ত লোকোত্তর প্রতিভারা ছাড়াও আরও এক ধরনের উপকরণ সহায়তা করেছে তার শিল্পরূপের স্বকীয়তা অর্জনে। বিশেষ করে ইংল্যণ্ডে সংবাদপত্রের প্রচলন হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে এবং এই সংবাদপত্রের জন্য যে দিনলিপি অথবা অভিজ্ঞতা চিত্রণের রেওয়াজ করা হয়, তাতে একদিকে বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করার জন্য পাঠকপাঠিকার মনকে তৈরি করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে হুবহু বাস্তব জীবনকে আকর্ষণীয় করে গদ্য লেখার মাধ্যমে একটা কুশলতা এবং শৈলীর প্রবর্তন হয়।

উপরোক্ত দুই ধরনের প্রস্তুতির ফলশ্রুতি নিয়ে এল উপন্যাসের প্রগলভ প্রকাশকে—অষ্টাদশ শতকে।

তিন

তিনটি উপাদান

উপন্যাস তখনই শিল্পকলাগতভাবে মধ্যযুগীয় উপাখ্যান ও কিংবদন্তী কিংবা নাটক অথবা মহাকাব্য থেকে একটা পৃথক সত্তা নিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বেরিয়ে এল যখন এর তিনটি উপাদান অজস্র ভাষিতার মাধ্যমে একটি চিরায়তিক শিল্পরূপ গড়ার আয়োজন সম্পন্ন করলো। এই তিনটি উপাদানের একটি বিস্তৃত বাস্তব; দ্বিতীয়তটি মানব মানবীর দ্বিতীয়জন অথবা বহুজন সম্পর্ক-সম্পন্ন সুদূর প্রসারী ব্যক্তিকতা; তৃতীয়টি লোকগদ্যের ভাণ্ডার থেকে মানবমানবীর অভিব্যক্তির যাবতীয় ভাষা বের করে আনা।

যাঁরা উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রবর্তক বলে অভিহিত হয়ে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধে কতিপয় প্রামাণ্য বক্তব্য দাখিল করে উপরোক্ত উপাদানগুলিকে যাঁচাই করে নেওয়া যেতে পারে :

(১) 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস' নামক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা কমটন রিকেট সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১) সম্বন্ধে লিখেছেন, "ডিফোর কল্পনা পাঠক পাঠিকার ওপর বাস্তবের মায়ারূপ আরোপ করেছে। গাল্পিকরা এযাবৎ এই বাস্তবের মায়ারূপকে তুচ্ছ করে এসেছেন। ডিফোর ক্ষেত্রে দেখা গেল, তিনি সব সময়ে পাঠক পাঠিকার কানে কানে বলেছেন, 'সত্য ঘটনা ... আমি নিশ্চয় করে বলছি তোমাকে।' সকলেই চায় অবিকল প্রতিচ্ছবি।

উপন্যাসের পাঠক পাঠিকা চায়, গ্রন্থ তাদের টেনে নিক নিজের মধ্যে এবং এ ব্যাপারটা সম্পন্ন হোক ভালভাবে। ডিফো তাঁর রচনাশৈলী দিয়ে এ ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।"

(২) ক্রিস্টফার কডওয়েলের যমজ-ভ্রাতৃসম ইংরেজ লেখক রাল্‌ফ ফক্‌স্‌ তাঁর 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক জোনাথান সুইফ্‌ট এবং হেনরি ফিল্ডিং' এর বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন নিম্নোক্তভাবে :

"ফিল্ডিং এবং সুইফ্‌ট উভয়েই তাঁদের সমসাময়িক জীবনের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এ জীবনকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার কদর্যতা ও ভয়াবহতাকে এফোঁড় ওফোঁড় দেখতে পেয়েছিলেন। সেদিনকার সদ্যাগত মানুষের প্রতি সুইফটের যে বিরাগের ভাব ছিল, ফিল্ডিং-এর মধ্যে সে ভাব ছিল না। তিনি নিজে যেমন জীবনে ভুলভ্রান্তি করেছিলেন এবং নিজেও ছিলেন পুরোপুরি রক্ত মাংসের মানুষ, তেমনি তাঁর চারখানা উপন্যাসেও তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক বিস্তৃত কল্পবাস্তব। এই চারখানা উপন্যাস শুধু তাঁর নিজের সমসাময়িক কালের নয়। সারা ইতিহাসেরই সৃষ্টির উপকরণ যে মানুষ, এ উপন্যাস তার শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। 'টম জোন্‌স্‌' উপন্যাসে ফিল্ডিং প্রথম আধুনিক মহাকাব্য লিখেছিলেন এবং উপন্যাসকে এমন এক শীর্ষস্থানে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন যেখানে একমাত্র উনিশ শতকের মহান রুশ ঔপন্যাসিকরাই পৌঁছাতে পেরেছেন।"

(৩) ইউরোপের বিভিন্ন ভূমিতে অবস্থিত সামন্ততান্ত্রিক নরপতি ব্যবস্থাকে বিদীর্ণ করে এবং সামন্ততান্ত্রিক নরপতিব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ খণ্ড খণ্ড ভুইয়া প্রথার অচলায়তনগুলিকে অপসারিত করার ব্যবস্থা করে, ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশসমূহে যে জাতি বা জাতিসত্তাভিত্তিক লোকঅভ্যুত্থানের সূচনা হয় সপ্তদশ শতকে, তাদের শানিত ও ভারাক্রান্ত এবং সূক্ষ্ম ও স্থূলে মিশ্রিত মর্মবাণীর বাহক হয়ে দাঁড়ায় লোকগদ্য। এই লোকগদ্যের নিঃশর্ত প্রয়োগ ও অপ্রচ্ছন্ন এবং সামগ্রিক ব্যবহারের আধার হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাস। রাশিয়াতে সামন্ততন্ত্র ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অষ্টাদশ শতকেও প্রায় অনড় ও অচলই ছিল। এই কারণে রুশ উপন্যাস ইংরেজি ও ফরাসির তুলনায় কিছুটা বিলম্বিত হয়। কিন্তু যখন উপন্যাসের সূত্রপাত হলো লোকগদ্যকে বাহন করে তখন তা সন্নিবেশিত হলো ইংরেজি ফরাসি পদ্ধতিতেই। ঊনবিংশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশের রুশ সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, পুশ্‌কিন তাঁর 'ইউজিন ওনেগিন' নামক কাব্যের পরিচয় দিয়েছিলেন 'কাব্যে উপন্যাস' বলে, কারণ এই কাব্যের প্রেমের পরিধির মধ্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখ স্পন্দিত হয়। কিন্তু রুশ উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে তিনি প্রকৃত স্বাক্ষর রেখে গেলেন 'ক্যাপ্টেনের কন্যা' নামক গদ্য কাব্যটি লিখে। অষ্টাদশ দশকের ইউরোপীয় উপন্যাসের ধারায় যখন তিনি ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে কতিপয় নরনারী-হৃদয়ের সুডৌল চিত্র আঁকলেন লোকগদ্যে, তখনই তা তাঁর গীতি কবিতা বা কাব্যনাট্য বা কাব্যকথা থেকে স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিল এবং সেই রুশ উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করলো যা অষ্টাদশ শতকীয় বাস্তববাদী মহাকাব্যিক

উপন্যাসের যোগ্য প্রযোজক এবং বিশ্ব-উপন্যাস সাহিত্যের বুনিয়াদের প্রসারমান প্রারম্ভিক ধারা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

(৪) ইংরেজি উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শুধু নয়, উপন্যাসের প্রথম তাত্ত্বিক হিসেবেও ফিল্ডিং নিজেকে দাখিল করেছিলেন। পুশ্‌কিন তাঁর 'ইউজিন ওনেগিন' কাব্যকে উপন্যাস বলে অভিহিত করেছিলেন এই কাব্যের নায়ক নায়িকার বাস্তব জীবন-পরিক্রমা উপন্যাসেই মানায় মনে করে, কিন্তু তিনি কোন ব্যাখ্যা দেবার দরকার আছে বলে মনে করেন নি। উপন্যাস নামক গদ্য কথাকাব্যের প্রবর্তক হিসেবে ফিল্ডিং কিন্তু শুধু ঘটনা ও চরিত্র পেশ করে ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর 'টম জোনস্' উপন্যাসে যখন তিনি টম জোনসের আহার বিহার প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন, তখন একই সঙ্গে তিনি যে একটি নতুন শিল্পরূপ পেশ করছেন সেকথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহাকবি হোমারের অনুসরণে তিনি শিল্পরূপের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে আহ্বান করেছেন তাঁর কলমে ভর করে তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে। কিন্তু হোমার যা করেছিলেন তিনি যে তা করতে রাজী নন সেকথাও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হোমার হোরেসের বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন মেনে চলে যদি অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহকে যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতেন, তাহলে তা আমার মনোমত হতো।' ফিল্ডিং এইভাবে মাঝে মাঝে স্বীয় বক্তব্য পেশ করে গদ্য মহাকাব্যের নিতান্ত সাধারণ পাত্রপাত্রীদের বিশ্বাসযোগ্য জীবনযাপনের চিত্র দাখিল করার পক্ষে যুক্তি খাটিয়েছেন। এই সঙ্গেই মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যান কিংবা ইতিহাসের ইতিকথা থেকে তাঁর প্রবর্তিত শিল্পরূপাশ্রিত কাহিনী যে সম্পূর্ণ পৃথক, সেকথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় কিংবদন্তী অথবা প্রণয়োপাখ্যানের দৈত্যদানবের কাণ্ডকারখানা তাঁর কাছে অলস কল্পনা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সনতারিখের বিস্তারিত বিবরণে ভারাক্রান্ত তথ্য তাঁর কাছে ক্লান্তিকর। ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে একদিকে যেমন আজগুবি ব্যাপারকে পরিহার করতে চেয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের বাঁধাধরা অধ্যায়ের খোপে জীবনকে ভারতে যে তিনি নারাজ সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবের মধ্যে যে সম্ভাব্য থাকে, তার উপরে তাঁর জোর। এই কারণে তিনি 'টম জোনস' উপন্যাসের একজায়গায় লিখেছেন যে, তাঁর উপন্যাস 'সেই তরুণীর জন্য লেখা যার পিতামহীর এখনও জন্ম হয় নি।'

(৫) কবি বায়রন ফিল্ডিংকে বলেছেন, 'মানব প্রকৃতির গদ্য হোমার।' ফিল্ডিং উপন্যাসকে যে একটি চিরায়তিক গঠন দিতে পেরেছিলেন, এ বক্তব্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়রনের বক্তব্যকে সার ওয়াল্টার স্কট আরেকভাবে বলেছেন। যে ওয়াল্টার স্কট কয়েকটি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক এবং মূলত কবি হিসাবে পরিচিত, তাঁর কাছ থেকে ফিল্ডিং সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বক্তব্য হয়তো আশা করা যায় নি। কিন্তু ওয়াল্টার স্কট একথা না বলে পারেন নি, কারণ, ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাসের সংজ্ঞায় দ্ব্যর্থবোধক কোন কিছুর অবকাশ রাখেন নি। স্কট 'টম জোনস' উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফিল্ডিং-এর সমসাময়িক ঔপন্যাসিক রিচার্ডসনের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন, "এমনকি রিচার্ডসনের উপন্যাসগুলিও পুরানো প্রণয়োপাখ্যানগুলি থেকে মাত্র এক পা বেরিয়েছে। একথা সত্যি যে, এদের ঘটনাবলি সাধারণ ধারার কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু সম্ভবপর নয় এমন সব ঘটনা কিংবা সাধারণ

মানবীয় গুণাবলিকে ছাড়িয়ে যায় এমন সব অতিস্ফীত চরিত্র নিয়ে এই উপন্যাসগুলি নাড়াচাড়া করে চলেছে। ফিল্ডিং-এর 'টম জোনস্' হচ্ছে সত্য এবং মূর্তিমন্ত মানব প্রকৃতি। এখানেই, এই বিশেষ ধরনের যেসব উপন্যাস লেখা হয়েছে তাদের সকলকে ছাপিয়ে যাবার ক্ষমতা ও কৃতিত্ব টম জোনসের রয়েছে।"

(৬) প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' ফিল্ডিং রচিত চিরায়তিক কাঠামোকে ভিত্তি করেই লেখা বলে মনে হয়। এই উপন্যাসে ভাষার ব্যবহারটাই আমাদের কাছে বেশি আলোচনাযোগ্য বলে মনে হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলির ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি ল্যাটিন ভাষার প্রতি ফিল্ডিং-এর শ্লেষের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যের দুটি বিপদ : (ক) এর ভাষা সংস্কৃতানুরাগিনী ও দুর্বোধ্য এবং (খ) এর বিষয় সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরেজির ছায়ামাত্র এই কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন : এই দুটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখক দিগের উচ্ছিষ্ট বিশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।'

(৭) অষ্টাদশ শতকে রচিত উপন্যাসের চিরায়তিক গঠনের উপর আলোকপাত করতে পারে এমন আর একটি উদ্ধৃতি এখানে দাখিল করা যেতে পারে। এই উক্তিটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে। বক্তব্যটি এই : 'উপন্যাস রচনার একটি প্রধান অভিপ্রায় তাহার সাহায্যে রচনায় মন আসক্ত হইবে, কল্পিত গল্পে সত্যের ভান হইবে এবং বর্ণিত নায়কনায়িকার প্রতি লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে অনুরাগ বা দ্বেষ জন্মিবে—এই প্রসাদগুণ, এই মানসাকর্ষণ শক্তিই সল্লোকের অসাধারণ মহিমা এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর রচনায় এই প্রসাদগুণ সম্পূর্ণ বর্তমান আছে।'

উপন্যাস কিভাবে এবং কি নিয়ে মধ্যযুগীয় কথকথা আর কিংবদন্তী কেচ্ছাকাহিনী উপখ্যানকে ছাড়িয়ে এসেছে, উপরোক্ত বক্তব্যগুলি থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এখানে ফিল্ডিংকেই উপন্যাসের মৌলিক সংজ্ঞা নিরূপণের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে। কারণ বিস্তৃত বহির্বাস্তব, পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন মানব চরিত্রাবলি এবং লোকগদ্যের যে উচ্ছ্বাসিত সমাবেশ নিয়ে উপন্যাস হোমারের মহাকাব্য কিংবা শেকস্‌পীয়রের নাটককেও শিল্পরূপের ব্যাপ্তি এবং গভীরতাতে অতিক্রম করে এল, সেই উপাদানত্রয়ের প্রথম সার্থক প্রয়োগকর্তা ফিল্ডিং। তবু মনে রাখতে হবে, প্রথমত, উপরোক্ত উপাদানত্রয়ের প্রতিভূ হিসেবে তিনি যে পরবর্তীকালেও বিবেচিত হতে পারেন, এমন কোন কথা হতে পারেনা। কারণ যে তিনটি উপাদান নিয়ে ফিল্ডিং কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে, সেই তিনটিরই পারস্পরিক-সম্পর্কিত বিকাশের পটভূমিকাতে ফিল্ডিং সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন, এটা ঠিক হলেও পাবর্তীকালে উপরোক্ত উপাদানত্রয়ের একক ও সামগ্রিক বিকাশের বৃহত্তর পটভূমিকায় ফিল্ডিং-এর মহাকাব্যিক গদ্যধারও অনেক অনেক পিছিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যেহেতু, বহির্বাস্তব, মানবচরিত্র এবং লোক-ভাষার ব্যাপারে গত দুইতিনশত বছরে

দেশ দেশান্তরে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে নব নব আবিক্রিয়া এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগ সংঘাত ও গুণাত্মক পরিবর্তনের মুখে মাঝে মাঝে অসম বিকাশ ঘটেছে, সেহেতু নতুনতর এবং উচ্চতর স্তরে নতুন ফিল্ডিং'এর প্রয়োজন হয়েছে সমৃদ্ধতর রসায়নের ঘটকালির জন্যে।

সুতরাং উপন্যাসের চিরায়তিক গঠনের ব্যাপারেও ফিল্ডিং'এর উপন্যাস কিংবা তত্ত্বকে হীরকের মতো ঋজু বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। উনিশ শতকে এসেই আমরা দেখতে পাবো, ফরাসি ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল ফিল্ডিং-সূত্রের একটা নতুনতর এবং উন্নততর সমাধান বের করার চেষ্টা করেছেন। অবিশ্রান্ত জীবন প্রবাহের এই দাবীকে কোন সচেতন শিল্পীই পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। স্তাঁদালের প্রচেষ্টা একটি উদাহরণ। এতদ্‌ব্যতিরেকে ফিল্ডিং-এর উপন্যাস যতই না কেন দানাবাঁধা হোক, তার মধ্যেও ফাঁক ছিল। তবে, এ ধরনের ফাঁক থাকা কোন সময়ের কোন শিল্পীর পক্ষেই অগৌরবের নয়। যে পরমাণুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আগে বলা হতো যে এ এমন একটি নিটোল বস্তুখণ্ড যাকে আর কাটা যায় না, তারই চেহারা বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছে একটা সৌরজগতের মতো একাধিক কণিকা আর তাদের সঞ্চরণ ক্ষেত্রকে। সুতরাং ফিল্ডিং-এর লেখা প্রথমত আপতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, ঠিক তেমন নিটোল সে নয়। তেমনি তার মধ্যে এমন শক্তি-উপাদন বা স্ফুলিঙ্গ রয়েছে যাকে বের করে নিয়ে এসে নতুনতর সম্ভাবনায় নিয়োজিত করা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীতেও। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "টরেন্টস অব স্প্রিং" নামক উপন্যাসের শুরুতে ফিল্ডিং থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক কি বলতে এবং কি করতে চেয়েছেন তা অবশ্য এখনও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়নি। তবে মনে হয়, হেমিংওয়ে কয়েকটা স্ফুলিঙ্গের মতোই ফিল্ডিং-এর কয়েকটা পঙক্তিকে তুলে নিয়ে তাঁর উপন্যাসের গোড়ায় বসিয়ে দিয়েছেন। ফিল্ডিং-এর সমস্ত প্রকরণ যে তিনি গ্রহণ করেননি, সে তো তাঁর লেখাতেই প্রমাণিত। ফিল্ডিং-এর পরিহাস-প্রবণতা আর হেমিংওয়ের যন্ত্রণার্ত মনোভাব এক জিনিস নয়। হেমিংওয়ে ফিল্ডিং-এর লেখা থেকে পছন্দ মতো একটা ধারা তুলে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। অর্থাৎ ফিল্ডিংকে ভাঙ্গা যায় অথবা তাঁকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করা যায়। ফিল্ডিং রসিকতা করে যে তরুণীর জন্যে তাঁর উপন্যাস লিখেছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন সে, মেয়েটির পিতামহীরই তখন পর্যন্ত জন্ম হয়নি, সেই তরুণীর দৌহিত্রী হয়তো আজ ফিল্ডিং-এর উপন্যাস পাঠের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হিসেবে দাবী জানিয়ে বলবে, 'তোমরা আড়াইশ' বছরে যা বোঝোনি, আমি তাই বুঝবো।'

একথার অর্থ এই যে, উপন্যাসের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় মূলসূত্রগুলির নতুন ধরনের ব্যাখ্যা দরকার হবে। এই প্রয়োজন পরিপূরণের দিকে একটা প্রবণতাও দানা বেঁধে উঠতে পারে। উৎসমুখে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন শিল্পরূপের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, প্রাচীন গ্রীক আমলে আসল সূত্র কি ছিল তা নিয়ে তত্ত্বতালাসী চলছে বিশেষ করে ইউরোপের বহু দেশে। কিন্তু একথাটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন প্রকারেই মূল সূত্রে ফিরে যাওয়া যায় না; মূলসূত্র থেকে নবজীবনের জন্যে প্রাণময় উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে।

উপন্যাসের অষ্টাদশ শতকীয় চিরায়তিক গঠন এবং শিল্পরূপের ভাঙ্গাগড়াকে বুঝবার জন্যে বিচারের প্রারম্ভিক যুক্তি হিসেবে এটা কাজে লাগতে পারে। কালসিদ্ধ চিরায়তিকের জন্যে অযথা তদ্বির তদারক না করে, নতুন নতুন কাল-বলয়ে জীবনের তাগিদে যা উঠে আসছে তাকেই উপন্যাসের শিল্পরূপে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টা করবেন সৃজনশীল শিল্পীরা। এই সৃষ্টিতে সাড়া দেবেন আজকের এবং ভবিষ্যতের পাঠকপাঠিকারা। তা নাহলে, নতুন জীবন ও তার নতুনতর প্রশ্ন চাপা পড়ে থাকবে এবং অতৃপ্তি নিয়ে আসবে শিল্পরূপের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি বিরূপতা।

গত দুই শত বছরে নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ কোন সময়েই বন্ধ থাকেনি। ফিল্ডিং প্রবর্তিত চিরায়তিক কাঠামো অবলম্বনে এখনও যেমন কাজ হচ্ছে, তেমনি অবিশ্রান্ত প্রয়াসও চলছে নতুন নতুন স্রোতের খাত বের করার।

তথাপি উপন্যাসের শিল্পরূপের বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা যখন আধুনিকতম প্রশ্নগুলির জবাব চাইব, তখন মাঝে মাঝে ফিরে যেতে হবে পিছন দিকে।

চার
সুমিত-অমিতের প্রশ্ন

উপাখ্যান, রূপকথা আর কিংবদন্তীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বহির্বাস্তব, প্রমুক্ত মানব চরিত্র আর মাতৃভাষার সহজ সাবলিল বিন্যাস সুদূরপ্রসারী নব-মানবিক বাস্তববাদের পত্তন করেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের মধ্যভাগের গোগোলের উপন্যাস 'মরেও মরেনা' (Dead souls) ফিল্ডিং, সার্ভেন্টিস বা রাবেলাইসের গল্প বলার পরিহাসপ্রবণ কৌশল অনুসরণ করেও ষোলআনা লৌকিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় এনেছিল আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত। সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়াতে ভূমিদাসরা মারা যাওয়ার পরেও জমি বিক্রি হওয়ার সময় নিয়মিতভাবে ফাটকাবাজারীর কল্যাণে জীয়ন্ত মানুষ হিসেবে হস্তান্তরিত হতো। এই সমস্যাটিকে চাবিকাঠি করে গোগোল তাঁর উপন্যাসের পাঠকপাঠিকাদের রাশিয়ার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে, মন থেকে মনান্তরে টেনে নিয়েছেন। জীবনশিল্পী গোগোল উপন্যাসের শিল্পধারা হাতে তুলে নিয়েছেন। স্বৈরাচারি সামন্ততন্ত্রের অধীনে গোলামির জিঞ্জির তাঁর সৃষ্টি। পথে কোন প্রতিবন্ধকতাই খাড়া করতে পারেনি। তিনি বরং দেখেছেন, 'গ্রামীণ জীবনে প্রভাত কালের ইশারা, রাশিয়াতে একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যা পৃথিবীতে ঘটেনি।' উপন্যাসের শিল্পরূপ তাঁকে এই পরিসর দিয়েছিল। শিল্পরূপের এই মানবিক বাস্তবতা বাদই লিও টলস্টয়কে প্রভাবিত করে প্রযোজিত করেছিল উপন্যাস রচনায়, যদিও মানুষের জীবন সত্যকে সূত্রাকারে ব্যক্ত করার দার্শনিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। উপন্যাস লিখতে বসে টলস্টয় কাগজের স্তূপের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি, পাঠকপাঠিকার অবকাশের হিসাব কষেননি, নিজের অধ্যাত্মসাধনার দামী দামী মুহূর্তের কথা ভাবেননি। ফরাসি ঔপন্যাসিক মোপাসাঁর মানব-চরিত্র-দর্শন-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে টলস্টয় হাজার হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাসমালা যোগ করেছেন প্রায় দুই

শতাব্দীর বাস্তববাদী ধারায় লেখা স্তূপীকৃত উপন্যাসে। উপন্যাস লিখতে বসে এর অন্যথা করার উপায় ছিল না তাঁর। যখন তিনি তাঁর দেশের কিংবা সমসাময়িক কালের নরনারীর দেহ এবং আত্মার ঐকান্তিক যুগ্মবিহার-কাহিনী বলার জন্যে উপন্যাসের মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন, তখন তিনি জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যময় পথে বহু মানুষের সঙ্গে শরিক হয়ে গিয়েছেন, অসংখ্য নরনারীর পূর্ণাবয়ব সমন্বিত আত্মিক বিকাশে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন নিজ আত্মাকে। তাঁর আধ্যাত্ম-নীতিমালামূলক গল্পগুলির সঙ্গে 'রিসারেকসান' উপন্যাসটি মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, উপন্যাস তাঁর কাছ থেকে কী পরিমাণে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে রক্ত মাংসে গড়া মানব মানবীয় ইহলৌকিক সুখদুঃখ সংগ্রামের জন্যে। একটা শিল্পরূপ যে শিল্পীর উপর কত বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, টলস্টয়ের উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে সে কথা বুঝতে পারা যায়। অবশ্য সেই শিল্পরূপই এ কাজ করতে পারে যা গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিল্পীর সাধনায় এবং দেশদেশান্তরের অগণিত পাঠকপাঠিকার আগ্রহে অগণিত মানব মানবীর জীবন সংগ্রামে সুখে দুঃখে সঞ্জীবিত হয়ে। শিল্পরূপ এভাবেই সার্থকতা ও জনতার মধ্যে যোজক স্বরূপ। উপন্যাস যে ইতিপূর্বে দানা বাঁধার পরে দেড়শত বছরে এরকম একটা শিল্পরূপসত্তায় উপনীত হতে পেরেছিল, তার প্রমাণ টলস্টয়।

একথা সত্য যে, বর্তমান শতাব্দীতে পৌঁছে ফ্রান্সের আনাতোল ফ্রাঁস কিংবা আঁদ্রে জিদের মতো ঔপন্যাসিকরা চেষ্টা করেছেন উপন্যাসকে 'গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করার' উপযুক্ত করতে, এবং এটা করতে গিয়ে যে যার নিজস্ব পদ্ধতিতে চেয়েছেন উপন্যাসের আঙ্গিকে গ্রীক নাটকের সুমিতি ও ঘটনা এবং কালের ঐক্যকে প্রয়োগ করতে। আনাতোল ফ্রাঁস বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য তত্ত্ব প্রয়োগ করে কয়েকটি সুপরিমিত উপন্যাস রচনা করেছেন কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতার মতো। তাঁর লেখা উপন্যাস 'দেবদূতদের বিদ্রোহ', 'পেঙ্গুইন দ্বীপ', 'থেইস' এবং 'দেবতারা তৃষ্ণার্ত' বিষয়বস্তুতে মহাকাব্যিক হলেও গঠনের দিক দিয়ে গ্রীক শিল্পকলার সূত্রে গাঁথা একেকটি 'জুঁইফুলের মালা'। আঁদ্রে জিদ তো গ্রীক জীবনেই প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে আধার নির্দিষ্ট করেছে আধেয়কে। কিন্তু শুধু শ্লেষ ও কৌতুকের ব্যবহারেই নয়, জীবনকে উপস্থাপিত করার ব্যাপারেও তাঁরা দুজনেই অষ্টাদশ শতকীয় চিরায়তিক গঠনকে ভাঙেননি। তাঁদের লেখা এই কারণে ঠাস-বুননের লেখা। বর্তমান শতাব্দীতে কেন, গত শতাব্দীতেও যে সব ঔপন্যাসিক চিরায়তিক গঠনকে ভেঙেছেন, আনাতোল ফ্রাঁস ও আঁদ্রে জিদকে তাঁদের দলে ফেলা যায় না। তাছাড়া তাঁরা ফরাসি উপন্যাসের উনিশ শতকীয় বিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করে আনলেও, এবং বহির্বাস্তব, মানব চরিত্র ও লোকগদ্যকে ছোট ছোট ছাঁচে ধরার শিল্প-শৈলীর প্রবর্তন করে ফরাসি উপন্যাসের শিল্পরূপকে প্রভাবিত করলেও, মূল উপন্যাসের বৃহৎ প্রগল্‌ভ বিস্তারের ধারাকে আটকাতে পারেননি। রোমাঁ রলাঁর উপন্যাস এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' এবং 'বিমুগ্ধ আত্মা' উপন্যাসের প্রথমটিতে একটি পুরুষ-চরিত্রের এবং দ্বিতীয়টিতে একটি নারী চরিত্রের সত্য-যাত্রা বহু মানুষের বিচিত্র জীবন ধারায় প্রসারিত। উপন্যাসের নরনারীর জীবনই শুধু নয়, বাক্‌বিন্যাসও সদাপ্রসারমান বিশাল নদী-প্রবাহের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। উপন্যাস এখানে মহাকাব্যিক। বীর ও

বীরাঙ্গনাকে নিয়ে এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলি উন্মীলিত হয়েছে শতদল পদ্মের মতো। এই মহাকাব্যিক ধারা কখনও ফরাসি উপন্যাসে শ্লথ হয়নি। জাঁ পল সার্ত্রের লেখার আলোচনাকালে এর আভাস পাব।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রগলভতা এমন একটা উপাদান যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন, কারণ এই প্রগল্‌ভতার মূলে রয়েছে গণবিপ্লবের প্রস্তুতি। শেকস্‌পীয়র যদিও নাট্যকারই থেকে যান রাবেলাইসের যুগে জন্মেও, তবু তিনি যুগের তাগিদে নাটকের গ্রীকসূত্র পরিহার করে এমন বিস্তার এনেছিলেন সেখানে যে, তাঁর নাটকে উপন্যাসের গুণ প্রকাশ পেয়েছিল। শেকসপীয়রের অধিকাংশ নাটকের বেপরোয়া ও আগোছালো ভাব লক্ষ্য করার মতো। লক্ষ্য করার মতো—গদ্য-পদ্যের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। শেকস্‌পীয়র পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালির পুনর্জাগরণের ঢেউয়ের দোলায় দুলেছিলেন। মধ্যযুগীয় ইউরোপে একদিকে বৃহৎ পরিমাপে পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার এবং আরেকদিকে ভূমিদাস প্রথা ও অন্যান্য সামন্তবাদী জোর জুলুম শোষণের বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট কৃষক অভ্যুত্থান ইউরোপীয় মানসে এবং তদানীন্তন প্রচলিত কথা-শিল্পকলার বন্ধ্যা পাষাণ-ভূমিতে বড় বড় ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছিল। গ্রীক মানবতাবাদী ধ্যানধারণার পুনরভ্যুদয় বা রেনেসাঁ কুসুমিত হয়েছিল এই বিদীর্ণ ভূমিতে। ইটালির কবি দান্তের আবির্ভাব ঘটেছিল এ যুগের প্রত্যুষে। গ্রীক মানবতাবাদী ধ্যানধারণা যে উপরোক্ত কারণে পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে নবগুণাত্মক রূপ পরিগ্রহণ করেছিল, তা দান্তের কাব্যে প্রমাণিত। ফ্রান্সের জনৈক নন্দনতাত্ত্বিক (Jacques Maritain) ভাববাদী হয়েও এই কারণেই দান্তের কাব্যে একটি অখণ্ড আধারে গীতি-কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের অবস্থিতিকে দেখতে পেয়েছেন। বলেছেন, 'উপন্যাসের সত্তা হচ্ছে বিস্তার পরিপূরণে। দান্তের দৃষ্টি সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষভাবে মানবাত্মার জীবনে নিবদ্ধ; এজীবন হচ্ছে মানবাত্মার পরিবর্তশীল রূপ-পরিগ্রহণের জীবন; এ জীবন তার চিন্তাধারার, তার দুঃখকষ্টের, তার ধ্যানধারণা সমূহের জীবন। এ দৃষ্টি একজন সত্যকার ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি।'

ইউরোপে গ্রীক ভাবধারার পুনর্জাগরণের সময়েই যখন গ্রীক শিল্পকলার সূত্রগুলি তাদের জাত রাখতে পারেনি, তখন উপন্যাসের ত্রিধারার সমন্বিত বিস্তার রেওয়াজে দাঁড়িয়ে যাবার পরে গ্রীক পরিমিতির সূত্রগুলি কী করে সর্বময় প্রভাব খাটাবে?

অষ্টাদশ শতকীয় উপন্যাসের ছাঁচ যে বিশ শতকেও অব্যাহত থাকতে পেরেছে, সেজন্যে দায়ী কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর বিশেষ প্রবণতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বুনিয়াদি আঙ্গিকেই উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। তাঁর লেখার ভিতরে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সে ভাঙ্গন অন্তর্ঘাতী ও গভীরাশ্রয়ী; শিল্পরূপ তাতে প্রভাবিত হয়নি। টমাস মানের উপন্যাসে বহু মানব-মানবীর ইতিবৃত্ত মহাকাব্যিক গদ্যের বিস্তার লাভ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ধরা যায় ভেনিসে মৃত্যু নামক খুদে উপন্যাসটিকে। এই বইটির নায়ক একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক। এই লেখককে দিয়ে টমাস মান একটি উপন্যাসও লিখিয়েছেন। এই উপন্যাস 'বহুসংখ্যক মানুষের ভাগ্যলিপির সূত্রগুলির একটি মাত্র ভাবের বুননে একত্রিত

করেছে।' শুধু তাই নয়, টমাস মান তাঁর এই খুদে উপন্যাসের লেখক-নায়কের চিন্তা স্রোতকে প্রাধান্য দিয়ে মন আর বাস্তব জগৎকে এমনভাবে মিশ্রিত করেছেন যে, মন যেমন একদিকে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে, তেমনি বাস্তব জগতের শক্ত ভিত্তিভূমিও তরলিত হয়ে গিয়েছে। আধুনিক এক ধরনের উপন্যাসে মানবমানবীর মনটাকে আলাদা করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাকে একটা ব্যাঙ কিংবা রাসায়নিক পদার্থের মতো নানাভাবে যাঁচাই করে দেখার যে ধারার পত্তন হয়েছে, টমাস মানের 'ভেনিসে মৃত্যু' উপন্যাসিকাটি তারই যেন একটি নিদর্শন। কিন্তু কম্বলকে ছাড়লেও, কম্বল ছাড়েনা। টমাস মান অষ্টাদশ শতকীয় পদ্ধতিকে ছাড়তে পারেননি, তাঁর এই খুদে বইটিতে। বইয়ের পরিণতির দিকে ভেনিস নগরীতে কলেরা মহামারীর বিস্তারের যে বর্ণনা আছে, তা যেন বেরিয়ে এসেছে ডানিয়েল ডিফোর কলম থেকে। এই কালেরাতেই প্রবীণ নায়কের মৃত্যু হয়। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন মানসের পরীক্ষাগার থেকে বেরিয়ে মহাকাব্যিক ধারায় ফিরে এসেছে।

বিশ শতকের উপন্যাসের অন্যতম দিকপাল ইংরেজ ঔপন্যাসিক আলডুস হাক্সলি তাঁর 'রাত্রিতে সুরসঙ্গীত' (Music at Night) নামক নিবন্ধ গ্রন্থে উপন্যাসের মৌলিক বিশেষত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে শেকস্‌পীয়রের নাটক যেখানে সত্যের রাসায়নিক বিশুদ্ধ রূপায়ণ মাত্র, উপন্যাস সেখানে সমগ্র সত্যের আধার। এদিক থেকে শেকস্‌পীয়রের নাটক অপেক্ষাও অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-তাঁর কাছে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী, বেশি সত্যাগ্রহী। হাক্সলির মতে, শিল্পকলাগতভাবে সমস্ত সত্যকে রূপায়িত করেছে হোমারের মহাকাব্য। তারপর আলডুস হাক্সলি নাম করেছেন অষ্টাদশ শতকের ফিল্ডিং' এর উপন্যাসের। উপন্যাসকে সমগ্র সত্যের আধার হিসেবে দেখাকে আলডুস হাক্সলি অবশ্য অষ্টাদশ শতকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। 'রাত্রিতে সুরসঙ্গীত' গ্রন্থের একজায়গায় বিশ শতকের ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'প্রুস্ত, ডি এইচ লরেন্স, আঁদ্রে জিদ, কাফকা, হেমিংওয়ে এঁরা পাঁচজন নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক লেখক। এই পাঁচজন গ্রন্থকার পরস্পর থেকে যথাসম্ভব উল্লেখ্যভাবে পৃথক। এঁরা শুধু একটি বিষয়ে এক; সে হলো এই যে, এঁরা কেউ বিশুদ্ধ ট্রাজেডি লেখেননি; এঁদের সম্পর্ক হচ্ছে সমগ্র সত্যের সঙ্গে।'

আলডুস হাক্সলি অবশ্য যখন আধুনিক উপন্যাসে শিল্পরূপের সংকটের কথা আলোচনা করেছেন তাঁর একটি উপন্যাসে, তখন বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বহির্বাস্তব বাদ হোক অথবা মনোবাস্তববাদী হোক, উপন্যাসের এই উভয় ধারাকেই সত্য বা সমগ্র সত্যকে জানার প্রয়োজনের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর বলতেও দ্বিধা করেনি। তাঁর 'রাত্রিতে সুরসঙ্গীত' গ্রন্থের মন্তব্যগুলি থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাস যে প্রগল্‌ভতার ধারাকে উন্মোচিত করেছিল, তাকে সেইসব শিল্পীও পরিহার করতে পারেননি, যাঁরা স্মৃতি, অবচেতনা, প্রবৃত্তি ও রক্তের ডাককে করেছেন তাঁদের জীবন-জগতের মূলধারা। এ প্রসঙ্গে প্রুস্ত, ডি এইচ লরেন্স এবং কাফ্‌কার নাম করা যায়।

পাঁচ
যোগ বিয়োগ

অষ্টাদশ শতকীয় মৌলিকতা বিশ শতকে অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও দুদিক থেকে এর উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন প্রশ্ন উঠেছে, তার একটা আভাস প্রথমেই দিয়েছি। এই কারণগুলি আলোচনার পর্যায়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবেই বেরিয়ে আসবে। এই সংশয়াত্মক পরিস্থিতি উপন্যাসের পক্ষে একদিকে যেমন সংকট ডেকে এনেছে, তেমনি আরেকদিক দিয়ে উপন্যাসের শিল্পরূপের একটা নববৈপ্লবিক উত্তরণের সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

এখানে আপাতত সংকটের দিকটাকেই দেখা যাক! কী এই সংকট? এই প্রশ্নের জন্যে পরিসর সৃষ্টি করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই দেখতে পাবো, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উপন্যাসের শিল্পরূপে একটা বিয়োগাত্মক (Negative) ধারা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে এবং উপন্যাসের মূল শিল্পরূপকে আংশিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছে, উপন্যাসকে সামগ্রিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং উপন্যাসের বিকল্প শিল্পরূপ প্রবর্তনের দাবী করে আসছে।

কী এই বিয়োগাত্মক ধারা?

সোভিয়েট ইউনিয়নের ভ্লাদিমির দ্‌নেপ্রভ পঞ্চাশের দশকে তাঁর 'বাস্তববাদের নন্দনতত্ত্বের পক্ষ সমর্থনে' নামক নিবন্ধে বিশ্ব-উপন্যাসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিরোধী ধারার মধ্যে একটির দরুন যে সংকট ও দ্বন্দ্বের ছায়া এসেছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কথাগুলি বলেছেন, তার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত মূল প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে।

দ্‌নেপ্রভ লিখেছেন, 'উপন্যাসের বাস্তববাদী ধারার মৌলিকতা ভ্রষ্ট হয়েছে কোন একটি ক্ষেত্রে এবং যেহেতু এই ক্ষেত্র উপন্যাসের মর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সেজন্যে এই ভ্রষ্টতা এক চরম সংকটরূপে আখ্যায়িত হবার যোগ্য।' কী এই ক্ষেত্র? দনেপ্রভ লিখেছেন, 'বাস্তববাদী শিল্পকলাকে যা যা বিকৃত করছে তাদের মধ্যে অন্যতম ধারা হচ্ছে নন্দনতাত্ত্বিক আত্মকেন্দ্রিকতার প্রসার। লেখক তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে এই ধারায় অতি রুচিবান মনের সূক্ষ্ম প্রবাহগুলিতে কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং এর ফলে তাঁর নিজেরই মনের বিভিন্ন আশ্লেষ, স্মৃতি ও মানসিক আবেদন তাঁর লেখার কাজকে অভূতপূর্ব বিঘ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছে। বিশাল এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণাগার একদিন শিল্পকলাগত রূপান্তরীকরণের কিংবা ব্যাপক মানবজনতা ও জনমন কর্তৃক অর্জিত চেতনার প্রতিনিধিরূপী বিশিষ্ট চরিত্রসৃষ্টির যন্ত্র বা উপায় হিসেবে কাজ করেছে। আজ দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে গবেষণাগারেরই চিত্রণে।'

এই বর্ণনা অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাব, প্রসারমান বহির্বিশ্ব এবং বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত নরনারী-চরিত্রাবলির যে নিগূঢ় সমাবেশে ঔপন্যাসিক তাঁর

রূপসৃষ্টির কাজ চালিয়ে আসছেন শিল্পীমনের অপরিমেয় আবেগ ও ভালবাসার সঙ্গে খানিকটা বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা ও কৌতুকের খাদ মিশিয়ে, তা এক ধরনের গুহাভিমুখী চিন্তা প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে তরলিত হয়ে গড়িয়ে ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে এবং ঊর্ধ্বমুখী মানব-চরিত্রের বিষয়বস্তু থাকছে না আর। এখানেই উপন্যাসের শিল্পরূপের মূল সংকট? এই সংকট কি আরও গভীর এ কারণে যে, উপন্যাসের মর্মধারাই শুধু ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত এবং ভ্রষ্ট হয়নি, অতিমনোময়তার দরুন লোকগদ্যও বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

তবে প্রশ্ন : দনেপ্রভ প্রদত্ত সংকট চিত্র কি বিচ্ছিন্ন চিত্র? নববৈপ্লবিক আশায় আশান্বিত সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে দেখা ধনবাদী দেশের অবক্ষয়জাত সংকটের ছবি? ধনতান্ত্রিক দেশের ভিতর থেকে দেখা কোন ছবি এসেছে কি, যাতে দনেপ্রভের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়?

উত্তর হবে, এসেছে। প্রথমে আলডুস হাক্সলির বক্তব্য সামনে আনা যাক। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'গায়যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসে আলডুস হাক্সলি তাঁর বুদ্ধিজীবী শান্তিবাদী নায়ক এনটনির ধ্যানধারণা মারফত নরনারী–ব্যক্তির বা ব্যক্তি-সত্তার হদিস নিতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শেকস্পীয়র তাঁর স্বভাবজাত চিন্তা এবং ফ্রয়েড তাঁর মনোবিকলন-বিজ্ঞান দ্বারা নরনারীর চরিত্রগুলিকে আনবিকীকৃত করেছেন। একেকজন নরনারী যেন একটা পাত্র এবং তাতে যেন চূর্ণীকৃত মানব ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এই মানবসত্তা হচ্ছে 'হওয়া কিংবা না হওয়া'। অথবা 'মানুষ যা হতে পারে' কিংবা 'অনবরত যা হচ্ছে'। মানব মানবীর দেহই হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের একমাত্র চিহ্ন। এখানেই আলডুস হাক্সলি আধুনিক ঔপন্যাসিক এবং বিশেষ করে ডি· এইচ লরেন্সকে সামনে এনেছেন 'চরিত্র চূর্ণকারী' হিসেবে। দেহে মনে দানাবাঁধা যে মানবমানবী চরিত্র তথা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাকাব্যিক উপন্যাসের অপরিহার্য উপাদান, তাকে ডি. এইচ. লরেন্স চূর্ণীকৃত করেছেন এই অর্থে যে দেহের মধ্যে যে মন রয়েছে সে একটা রক্তসত্তা বা প্রবৃত্তিসত্তা যা দেহানির্বিশেষ অভিন্ন। চরিত্র রূপী মুখচ্ছবি কোথায়? সে তো মুখোস মাত্র। দৈহিক খাঁচাটাই সেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যাকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায়, যাকে আলাদাভাবে বুঝতে পারা যায়। ভিতরের যে মানবসত্তা, তার কোন আকৃতি বা অবয়ব নেই, তা আনবিকীকৃত। তা নিরাকার সাকার যা কিছু আছে মানুষের, তার বাইরে। আলডুস হাক্সলি এই কারণেই মন্তব্য করেছেন যে, মানবসত্তার আনবিকীকাররা লরেন্সের মতোই খুব বেশি দেহধর্মী বা দেহ সর্বস্ব।

আলডুস হাক্সলি অবশ্য এই ব্যাপারটাকে স্থিতিস্থাপক বলে মনে করেননি। বিশেষ বিশেষ মানবমানবীর মধ্যে মানবসত্তা বিশেষ বিশেষ দানা-বাঁধা রূপ নিয়ে বিশেষ বিশেষ চরিত্র করে তোলে মানবমানবীকে, এই ধারণা যদি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়ে থাকে, তাতেও আলডুস হাক্সলি চিন্তিত হননি। কারণ তিনি মনে করেছেন, পুরানো ব্যক্তিসত্তার ধারণাটাই এতে বাতিল হচ্ছে, নতুন ব্যক্তিসত্তার ধারণা এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবার পথে রয়েছে। আলডুস হাক্সলি মানব-ব্যক্তিত্বের অবিশ্রান্ত 'হয়ে ওঠার' সম্ভাবনাকে বড় করে তুলে ধরেছেন।

অবশ্য ব্যাপারটা অনেকটা যেন এমন যে, 'মাটিতে পড়ে যাওয়া দুধের জন্যে' আলডুস হাক্সলি কান্নাকাটি করতে রাজী নন। হয়তো এই কারণেই লরেন্সকেও তিনি সমগ্র

সত্যের আধার উপনাস্যের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী হিসেবে নির্বাচিত করতে দ্বিধা করেননি, যদিও অষ্টাদশ শতকীয় মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রবর্তক ফিল্ডিংকে শেকসপীয়রের চেয়ে বড় বলে অভিহিত করেছেন তিনি। 'গায্‌যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসেরই আরেক জায়গায় অন্যতম প্রতি-নায়কের মুখ দিয়ে বাস্তববাদী কল্পনাচিত্র উপন্যাসের অবাস্তবতার কথা খুঁটে খুঁটে আলাপ করেছেন তিনি। ঠাট্টার ছলে বলেছেন, 'জীবন একটা খালি সিগারেটের বাক্স যা প্রণয়ীর অনুপস্থিতির চেয়ে অনেক বেশি কষ্টদায়ক হয়। কিন্তু উপন্যাসে তা হয় না।' একথাটা বিস্তারিতভাবে বুঝাতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, নরনারীকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু সুখী কিংবা দুঃখী করে, আনন্দ দেয় অথবা যন্ত্রণা দেয়, তার অনেক কিছুই বই-এর মধ্যে আসেনা। এই কারণেই 'আনা কারেনিনা' ভাল উপন্যাস হলেও অর্ধসত্য। আলডুস হাক্সলি নিজে ঔপন্যাসিক হিসেবে কি চেয়েছেন এবং কি করেছেন, সেকথাটা উপরোক্ত মন্তব্যগুলির পটভূমিতে যাচাই করে নিয়ে তাঁর বহুসংখ্যক নায়ক নায়িকার চরিত্র বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখবো, তিনি যেন মধ্যপথে উপনীত হয়ে একটা মাঝামাঝি সমাধান বের করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেহবাদী হতে পারেননি, এবং এরই উল্টো পিঠ মনোবাদীও হতে পারেননি। তিনি একদিকে যেমন ডি. এইচ. লরেন্সের মতো দেহচারী হতে পারেন নি, তেমনি প্রুস্তের মতো স্মৃতিচারী হতে পারেননি। আলডুস হাক্সলি যাচাই করতে চেষ্টা করেছেন কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা বেঠিক। এই কারণেই উপন্যাসের চিরায়তিক ধারা ভেঙ্গে যাওয়ার বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের সততা তর্কাতীত।

আধুনিক উপন্যাসে বিয়োগাত্মক ধারার প্রভাবের প্রতি দনেপ্রভ যেভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, আলডুস হাক্সলিও কোন কোন সময় তাই করেছেন আরও সোজাসুজিভাবে, যদিও সেখানে তিনি থেমে থাকেননি। 'গায্‌যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসে এক জায়গায় নায়ক এন্টনি ফরাসি মনোময় এবং স্মৃতিবাদী ঔপন্যাসিক প্রুস্তকে 'শ্বেতজরদ্‌গব' বলে অভিহিত করেছে।

উপন্যাসের শিল্পরূপের সংকটের একটা ছবি উপরোক্ত আলোচনায় পাওয়া গেল। যেকোন দিক দিয়েই দেখা যাকনা কেন, উপন্যাসের অন্যতম চিরায়তিক উপাদান মানব-চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সংকটই যে এই সংকটের মূল কারণ, সে সম্বন্ধেও কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেল। আধুনিকতম ফরাসি ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্রে তাঁর 'সাহিত্য কি' গ্রন্থে মনোবাস্তববাদী বা সুরিয়েলিস্টদের স্বতঃস্ফূর্ত মনোবাদী বা ভূতুড়ে লেখার পদ্ধতিকে সাহিত্য বিরোধী (Anti literature) আখ্যা দিয়েছেন, তার কারণ লেখক-পাঠক সম্পর্ক হচ্ছে তাঁর মতে সাহিত্যের মূলভিত্তি, আর ভূতুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত মনোবাদী লেখা এই সম্পর্কের বিরোধী। জাঁ পল সার্ত্রে অষ্টাদশ শতকীয় উপন্যাসের গদ্য মহাকাব্যিক ধারাকে কিভাবে নিজের লেখাতে প্রয়োগ করেছেন, সে আলোচনা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আসবে। এখানে একথাটা বলাই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, সার্ত্রে চারিত্রিক কাঠামো ঘাতী পদ্ধতিকে মহাকাব্যিক পদ্ধতির প্রতিকূল মনে করেছেন।

আমরা এই প্রতিকূলতা বা ভ্রষ্টতা বা বিকৃতির ধারাকে মূলত মনোকেন্দ্রিকতার সমস্যা বলে ধরে নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হবো। প্রশ্নগুলি হচ্ছে এই : এই ধারার উৎপত্তি হলো কি করে? উপন্যাসের মূল ধারার সঙ্গে কি এর কোন সংস্পর্শ বা সম্পর্কই নেই? যদি থাকে তবে কবে থেকে এই সম্পর্কের সূচনা?

এসব প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত জবাব নিশ্চয় এই হবে যে, যেহেতু সমস্যাটা হচ্ছে মনোকেন্দ্রিকতার, সেজন্যে উপরোক্ত বিয়োগাত্মক ধারা সেই মনোধর্মী বা ভাবলৌকিক উপন্যাসের একটি পরিণতি, যা বাস্তববাদী মৌলিক উপন্যাস থেকে কোন এক সময়ে বিশ্লিষ্ট হয়েছিল। অনুভূতিপ্রবণ ভাবলৌকিক বা রোমান্টিক উপন্যাসের বাস্তব জগৎ মনোমুকুরের প্রতিবিম্বমাত্র। এই মনোমুকুরই অবশেষে শতধা হয়ে গিয়েছে আধুনিক মনস্তত্ত্বের চাপে এবং এই কারণে মানবচরিত্র হয়েছে আনবিকীকৃত মানবসত্তা। মনোমুকুরের প্রতিফলিত বাস্তব জগতও বিকৃত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং উপন্যাসের শিল্পরূপের মানবিক উপাদানের মারফত অষ্টাদশ শতকেও যে ভাবলৌকিকতার সীমিত অবস্থিতি অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘটেছিল, তাকে বের করে নিয়ে উনিশ শতকের মহাকাব্যিক ছাঁচকে সামনে রেখে যে ভাবলৌকিক উপন্যাস লেখার সূত্রপাত হয়, তারই ধারা-উপধারা থেকে কি আধুনিক মনোকেন্দ্রিকতা পেয়েছে সম্মতি? অথবা চরিত্রের আনবিকীকরণের কিংবা সম্পূর্ণরূপে মনোময়তার বিশ শতকীয় প্রবণতাগুলি ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয় থেকে আগাছার মতো গজিয়েছে? এদের উদ্ভব ও পুষ্টি ঘটেছে একান্তই বিশেষ পরিবেশে? উনিশ কিংবা বিশ শতকের কালক্রমে নয়? মনোকেন্দ্রিক বলে যে আধুনিক উপন্যাস পরিচিত, তাকেও যেহেতু গড়পড়তায় ফেলে আড়াই শত বছরের উপন্যাস থেকে আলাদা 'বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি বা অনাসৃষ্টি' বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না, সে কারণে মনোকেন্দ্রিকতার উৎপত্তির দিকে যেতে হতে পারে।

জেমস জয়েস এবং উইলিয়ম ফকনারের লেখার সঙ্গে চলতে চলতে বারবার মনে হয় এঁরা উপন্যাসের অষ্টাদশ শতকীয় শিল্পরূপকেই এক পরম বিপজ্জনক পরীক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করে বিপর্যয়ের মরু কিনার ঘেঁষে বইয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়েছে, স্রোত ধারার শ্বাসরোধ হয়েছে মাঝে, কখনো বা মনে হয়েছে সার্ত্রের ভাষায়, 'এ লেখা সাহিত্য বিরোধী অর্থাৎ লেখক-পাঠক সম্পর্কের বিরোধী' নিছক আত্মকেন্দ্রিক আধুনিক কবিতা। তবু এদের কি পুরোপুরি মনোময় বলা যায়?

জেমস জয়েস তাঁর 'একটি দিন ও একটি রাত্রি'র ডাবলিন শহরের নাগরিক জীবনের পটভূমিতে যে মনো-গদ্যমহাকাব্য লিখেছেন, তাতে তিনি উপন্যাসের অষ্টাদশ শতকীয় গদ্য-শিল্পরূপকে মাঝে মাঝে আশ্চর্য উজ্জ্বল করে স্থাপিত করেছেন। একজন বুদ্ধিজীবী গ্রীকপন্থী কবি-শিল্পী এবং একজন ইহুদীজন্মা আইরিশ ফলিত-বিজ্ঞানমনা ব্যবসাজীবীর স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার যে দুটি সমান্তরাল ছবি এই বইটিতে পাওয়া যায়, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, জয়েস বিভিন্ন শিল্পকলা এবং শিল্পবিভাগের সারসত্তার উপাদান-সমাবেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি 'ইউলিসিস' গ্রন্থে মাঝে মাঝে এমন সম্পূর্ণ এক প্রগল্‌ভ অবভাষী অধ্যায়ে পৌঁছেছেন যে, এ বই

উপন্যাস, না তাঁরই সমসাময়িক কবি টি. এস. এলিয়টের মস্তিষ্কক্ষরিত কবিতা-নির্ঝরের এক সাগরিক রূপ তা নির্ণয় করা কঠিন হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ সমস্যার পটভূমিতে উইলিয়ম ফকনার চেতন ও অবচেতনের অবগুণ্ঠনে আবৃত রেখেছেন তাঁর অর্ধোচ্চারিত চিত্রস্রোতকে। কিন্তু ফকনার তাঁর লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একটি ভাষণে যে কথাগুলি বলেছেন, তাতে তাঁর লেখা মনোবিকলনের অনাসৃষ্টি, না ভাবলৌকিকতার সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। ফকনার এই ভাষণে বলেছেন, 'মানবহৃদয়কে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য আমাদের সকলের জন্যই এক রকম। যাঁরা সহজ সরল আমুদে লেখা লিখতে চেষ্টা করেছেন, অথবা যারা লিখেছেন 'শক' বা ধাক্কা দেবার জন্যে এবং যারা সোজাসুজি নিজেদের থেকে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত জ্বালাযন্ত্রণা থেকে পালিয়ে থাকতে চেয়েছেন, এখানে 'আমাদের সকলের' বলতে তাঁদেরই বোঝাচ্ছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা জানেন না যে, আমরা একই পথের পথিক। আমাদের কেউ কেউ জানেন, কিন্তু জানতে পেরেও একথাটা অস্বীকার করছেন, পাছে আমাদের কেউ দাম্ভিক প্রকৃতির অথবা ভাবপ্রবণ বলে নিন্দা করে সে ভয়ে। আজকাল লোকে ভাবপ্রবণ বলে অভিহিত হওয়াটাকে লজ্জাজনক বলে মনে করে। আমাদের মধ্যে কারো কারো হৃদয়ের সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা রয়েছে। অনেকে হৃদয়কে অন্যান্য নিকৃষ্ট গ্রন্থি কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু আমরা সবাই লিখছি হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই। অবশ্য একথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা মানুষকে বদলাতে চাচ্ছি, তাকে উন্নত করতে চাচ্ছি, যদিও এই আশা কিংবা (বলা যেতে পারে) ইচ্ছা আমাদের মধ্যে কারও আছে। ব্যাপারটা বরং বিপরীত। বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়াবে এই যে, মানুষের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করার এই আশা কিংবা ইচ্ছা পুরোপুরি স্বার্থপরতা-সঞ্জাত, পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার। লেখক নিজের উপকারের জন্যে মানুষের হৃদয়কে উদ্ধার করতে চান, কারণ একমাত্র এইভাবেই তিনি মৃত্যুকে 'না' বলতে পারেন। বিভিন্ন হৃদয়কে উদ্ধার করার আশা পোষণ করে কিংবা নিকৃষ্ট কতকগুলি গ্রন্থিকে উত্তেজিত করেও লেখক মৃত্যুকে ততখানি 'না' বলতে পারেন, যতখানি পর্যন্ত তারা বলতে পারে, 'আমরা সবজী নই।' সুতরাং আমাদের হৃদয় এবং গ্রন্থিগুলি এই উত্তেজনায় শরিক হতে পারে। এই উত্তেজনা স্থায়ী হতে বাধ্য। সুতরাং যে লেখক নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানের বিচ্ছিন্নতার উপবেশন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি নিজে তাঁরই নিজের উত্তেজনার অমরতার অংশীদার হতে পারেন। একদিন তিনি আর থাকবেন না, কিন্তু এতে কিছু যাবে আসবে না। কারণ, পৃথকীকৃত এবং দুর্ভেদ্য হয়ে নীরস ঠাণ্ডা ছাপার আখরে থাকছে সেই বস্তু, যা আগেকার দিনের মৃত্যুহীন উত্তেজনাকে হৃদয়ে হৃদয়ে কিংবা গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জাগিয়ে তুলে যেতে থাকবে।'

এখানে ফকনার হৃদয়কে যেভাবে দেহেরই একটা উন্নত গ্রন্থি হিসেবে অভিহিত করছেন এবং মানবমানবীর দেহের নিকৃষ্ট গ্রন্থিগুলিকেও উত্তেজিত করার ব্যাপারে লেখকের যে প্রবণতার উল্লেখ করেছেন, তাতে তিনিও শেষ পর্যন্ত চারিত্রিক কাঠামো ধ্বংসী প্রবণতাকে হয়তো বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রশ্রয় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখক-পাঠক

সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁকে কোন মতে 'সাহিত্য বিরোধী'দের দলে ফেলা যায় কি? সুতরাং জেমস জয়েস অথবা ফকনারের উভয়ের লেখাই উপন্যাসের মূল উৎস হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাসের দাবীদার হয়ে বসলে কতখানি আপত্তি করা যাবে?

ছয়
ভাবলৌকিকতার তাগিদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় এক দশক আগে লেখা 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে 'উপন্যাস মহাকাব্যের রূপে' অধ্যায়ে রালফ ফক্সের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'অষ্টাদশ শতক ছিল উপন্যাসের স্বর্ণযুগ। এসময়ের উপন্যাসে সার্ভেন্টিস ও রাবেলাইসের মতো উঁচু পর্দায় চড়ানো সৃষ্টি ছাড়া গল্পের অভাব ছিল। সার্ভেন্টিস এবং রাবেলাইস তাঁদের লেখায় দেখিয়েছিলেন, কল্পনা কি করে দানবীয় শক্তি বলে বাস্তবকে রূপান্তরিত করে নেয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাসে মানুষ ভয় পায়নি। আপোষহীন নির্ভীকতায় ভর করে জীবন সম্বন্ধে সত্যকথা বলেছিল এ উপন্যাস। এ উপন্যাসে পরিহাস ছিল; এ উপন্যাস পাঠ করে যে কেন লোক উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়েছে যে, ব্যক্তির যেমন রয়েছে অন্তর্জীবন, তেমন করে বহির্জীবনও রয়েছে। এ উপন্যাস মানুষের কাছে প্রকৃতিকে উদঘাটিত করেছিল এবং ফিল্ডিং, সুইফ্‌ট, ভলটেয়ার, দিদের এবং রুসোর লেখার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, দুনিয়াটা যথাসম্ভব ভাল হয়ে যায়নি এখনও। এ উপন্যাস মানুষকে অসময়ে ডাক দেয়নি, কারণ এদের সৃষ্টিকাল ইতিহাসের সে-পর্যন্ত-সর্বশেষ বিপ্লবের আবর্তে মরবার জন্য তৈরি হচ্ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী।

এই শতাব্দী কিন্তু একটি বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এ শতাব্দীতে এমন একটিও উপন্যাস লেখা হয়নি যার মধ্যে ফিল্ডিং-এর মানবীয় বাস্তবতাবাদের সঙ্গে তাঁরই সমকালীন রিচার্ডসনের অনুভূতি প্রবণতা, স্টার্নের কটাক্ষময় পরিহাসপ্রিয়তা এবং রুসোর আবেগোচ্ছল প্রকৃতি-প্রেম একত্রিত। এরপরে উনিশ শতকও এবিষয়ে খুববেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি যদিও বালজাক ও টলস্টয়ের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।'

একথার অর্থ এই যে, উপন্যাসের শিল্পরূপ অষ্টাদশ শতকে অসম্পূর্ণ ছিল। সেখানে অন্তরাত্মা বিস্তৃত বহির্বাস্তবে অভিযাত্রা করেছিল এবং বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে অনর্গল ভাষাপ্রবাহে বহুজনের জীবন-ধারাকে অভিব্যক্ত করেছিল, সেখানে সে নিজেকে নিয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারেনি, নিজেকে প্রত্যন্ত পর্যন্ত চিনতেও পারেনি; আবার যেখানে সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে, সেখানে সে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে নিজেকে, বাস্তবকে লঙ্ঘন করেছে। উপন্যাসের মৌলিকতা তাই বিচ্ছেদ বুকে নিয়ে জন্মেছিল। এ বিচ্ছেদ অন্তরাত্মার অন্তর্বিচ্ছেদ। অন্তরাত্মা একদিকে বিচিত্ররূপী, আরেকদিকে একাকী। এখানে উপন্যাসের মৌলিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত বলা যায়।

রালফ ফকস্ ফিল্ডিং-এর কল্পনার অভাব এবং রূঢ়তার পক্ষে ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার যুক্তি দিয়েও 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে লিখেছেন : 'অষ্টাদশ শতকের লেখকদের মধ্যে একটা দ্বৈতভাব ছিল। সেটা শুধু কৌতূহলোদ্দীপক নয়, গুরুত্বপূর্ণ বটে। ডিফো, ফিল্ডিং এবং স্মলেট জগতের নিছক প্রত্যক্ষ বাস্তবচিত্রণে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অঙ্কিত চরিত্রসমূহের অন্তর্জীবন ছিল সামান্য পরিমাণ মাত্র, অথবা ছিল না বললেই চলে। এই সব চরিত্রের স্রষ্টারা অনুভূতি অথবা অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে সময়ক্ষেপ করেননি। 'কেন' অপেক্ষা 'কিভাবে'র বর্ণনাতেই বেশি নিবিষ্ট ছিলেন তাঁরা। অবশ্য তাঁদের পদ্ধতিতে কেন'র বহিষ্কার ঘটাতো দূরের কথা, কোন একটি চরিত্র কি কারণে তার নিজস্ব ধারায় ক্রিয়াকল্পে প্রবৃত্ত হয়েছে, সেকথা পাঠকপাঠিকার কাছে সাধারণত পরিষ্কারই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে-চরিত্রের স্বরূপ এবং এই চরিত্র থেকেই মানুষের আচরণের ধারা উপচে পড়েছে। এই অষ্টাদশ শতকেই সম্পূর্ণ আর এক ধরনের উপন্যাসের উদ্ভব ঘটেছিল। এ উপন্যাসের কারবার শুধু ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং অনুভূতিগুলোকে নিয়ে। সাধারণ সামাজিক চিত্র উপন্যাসের গণনার মধ্যেই আসেনি।

ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো' ছিল ব্যক্তির সর্বোচ্চ স্বীকৃতি. কিন্তু সে আবার এমনই ব্যক্তি যে তার জীবনযাপন করেছে সম্পূর্ণ নিজের বাইরেই। একদিক দিয়ে ক্রুসো ছিল তদানীন্তন নতুন জগতের ছাঁচে ঢালা মানুষ, কিন্তু একটা দিক আবার শূন্য ছিল তার। ক্রুসো জেনেছিল যে, সে একলাই জগৎকে জয় করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি যে একলাই একটা জগৎ সেকথা জানানোর দায়িত্ব পড়েছিল স্টার্ন এবং রুসোর ওপর। আসল ব্যাপারটা এই যে, বাস্তব সম্পর্কে ফিল্ডিং-এর মনোভাব অথবা রিচার্ডসন স্টার্নের মনোভাব–এ দুয়ের কোনটিকেই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বলা যায় না। অনুভূতি ও বিশ্লেষণকে বাদ দেওয়ায় ব্যক্তির ভাবগত দিককে না দেখতে পারায় উপন্যাস সৃষ্টিশক্তিময়ী কল্পনা ও সৃষ্টিছাড়া ঘটনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে সমস্ত কর্মধারাকে ব্যক্তির চেতনায় কেন্দ্রীভূত করার ফলে উপন্যাস মহাকাব্যিক গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।'

রালফ ফকসের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যদি মনে হয় যে, রালফ ফকস্ ক্রিস্টফার কডওয়েলের দেওয়া উপন্যাসের মৌলিক শিল্পরূপের সূত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন, তাহলে ভুল করা হবে। রালফ ফকস তাঁর 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে এক জায়গায় খুব স্পষ্ট করে বলে নিয়েছেন, 'বইটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাত্মা চিত্রণে ঔপন্যাসিক যে বিঘ্নগুলির সম্মুখীন হন, তাদের ভাষা দেওয়া। আমাদের বিশ্বাস, একমাত্র মহাকাব্যের ধারাতেই মানবাত্মাকে যথাযোগ্য রূপে চিত্রিত করা যায়। শিল্পরূপের দিক দিয়ে উপন্যাসের যে সাফল্য, মহাকাব্যের ধারাই হচ্ছে প্রকৃত উৎস।' অর্থাৎ রালফ ফকস, যে অষ্টাদশ শতকীয় উপন্যাসের জয়গান গেয়েছেন, তাকে ফলবানতার পূর্বেই ফলবান বলেননি। বরং ফলবানতার ব্যাপার তার যে অপরিণতি, সেকথাটা বলতে তিনি দ্বিধা করেনি। অথবা কথাটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, যে মনোনিবদ্ধ ভাবলৌকিকতার ধারা শেষ পর্যন্ত মনোকণ্ডুয়নে অথবা মস্তিষ্ক ক্ষরণে অথবা নিছক মন-প্রবাহে পরিণতি পেয়েছে বলে ইদানীং ধারণা করা হচ্ছে, তা প্রাথমিকভাবে উপন্যাসের মৌলিক ধারারই বিচ্ছিন্ন অংশ ছিল এবং এক আত্মস্থ করতে

না পারায় গদ্য-মহাকাব্যিক উপন্যাস অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। ভাবলৌকিকতাও একদিন উপন্যাসের শিল্পরূপের সহজাত উপাদান ছিল। ভাবলৌককতার বা বিচ্ছিন্ন আত্মিকতা বা মানসিক আতিশয্যের এই উপাদান ছিল কখনও বাস্তবের প্রবাহে প্রবহমান, কখনও নব নব ভূমি-অভিসারী, বিচ্ছিন্নতার গহবরে আপতিত ও আবর্তিত এবং বিপ্লবাত্মকভাবে পৌনঃপুনিক অথবা সদামুক্তধার, ভাব ও বহির্বাস্তবের সরু মোটা দুটি তার জড়িয়ে গিয়ে কখনো সুরহারা, আবার স্বাতন্ত্র্যের নব নব আক্ষেপ চূড়ান্ত ঝঙ্কৃত।

কিন্তু এ কথার অর্থ আবার কি এই যে, উপন্যাসের বিস্তারে আধুনিক মনোকেন্দ্রিকতারও একটা যোগাত্মক দিক পাওয়া যেতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর পরে আসবে। প্রথমে ভাবলৌকিকতার উন্মেষের সময়কার চেহারাটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

এখানে জার্মান কবি গ্যেটের 'ভের্থেরের দুঃখ' উপন্যাসটির পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। উপন্যাসের নায়ক নবীন যুবা ভের্থের তার হৃদয়াবেগের ইতিবৃত্ত পেশ করেছে লিপিমালায়, উপন্যাসে যা একটি বিশেষ শৈলী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। লিপিমালার মধ্য দিয়ে অন্তরাত্মার উত্থান পতনের হাসিকান্নার চুনীপান্নাকে নিঃশেষিত করে ছড়িয়ে দেওয়া অনুভূতি-প্রধান উপন্যাসের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। ভের্থেরের চিঠি প্রকৃতি ও প্রেমে পরিপূর্ণ; কিন্তু শত সহস্র ব্যাপারে ব্যাপৃত এর স্পর্শ, এর আবেশ ও অনুভূতিপ্রবণতায় তারা রঞ্জিত। 'মানুষের পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ; যেটুকু বিচার শক্তি তার আছে তা তাকে সামান্যই সহায়তা করে; যখন আবেগ উচ্ছ্বাসিত থাকে তখন বিচার শক্তি কোন সহায়তাই করে না। মানবতার সীমাবদ্ধতাগুলিতে সে নিপীড়িত হয়। এই অন্তর্নিপীড়নই ভের্থেরকে শেষ পর্যন্ত টেনে নেয় আত্মহত্যায়।'

ভের্থের এক জায়গায় লিখেছে, 'কতবারই না আমি উড়ে যেতে চেয়েছি সেই সারস পাখিটার ডানায় চড়ে, যেটা আমার মাথার উপর দিয়ে অগাধ মহাসমুদ্রের সৈকতের দিকে চলে গেছে; কতবারই না চেয়েছি অন্তরের ফেনা উপচে পড়া পানপাত্র থেকে জীবনের ফুলে উঠা উচ্ছ্বাস পান করতে।'

আরেক জায়গায় সে লিখেছে, 'ইউলিসিস অগাধ মহাসমুদ্র এবং অসীম পৃথিবী সম্বন্ধে যে কথা বলেছিল, তা কি আজকালকার চেয়ে বেশি সত্য, বেশি মানবিক, বেশি আবেগোচ্ছ্বাস নয়? আজকাল অবশ্য 'পৃথিবী গোল' কথাটা আওড়াতে পারে বলে প্রত্যেকটা স্কুলের ছেলেই নিজেকে একটা বিদ্যাসাগর মনে করে। তা করুক। ..... হায়রে, আমি যা জানি তা, প্রত্যেকেই জানতে পারে, কিন্তু আমার হৃদয় আমার নিজের।'

ভাবলৌকিক উপন্যাসের এই স্বপ্নচারিতা অথবা ভাবের ঘোর অথবা ভাবোন্মত্ততা উনিশ শতকের ফরাসি লেখক ভিক্টর হিউগো, সুইডিশ ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, রাশিয়ান টুর্গেনিভের লেখায় মহাকাব্যিক হবার চেষ্টা করেছে। হিউগোর, 'টয়লার্স অবদি সি' (সাগরে যারা ঘাম ঝরায়), ষ্ট্রিণ্ডবার্গের 'গ্রোথ অবদি সোল' (আত্মার বিকাশ) এবং টুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল' (পোড়োজমি) ভাবলৌকিকতায় আকণ্ঠ নিমগ্ন অথবা ভাবের পাখায় ভর দিয়ে উড়ে চলা নরনারী তথা যুবাযুবতীর পৃথিবীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলার এবং এভাবে

চলতে গিয়েও বাস্তব জীবনে তাদের আবর্তিত ও যন্ত্রণার্ত হওয়ার কাহিনীতে চেয়েছে বিস্তার। স্বপ্ন-নরনারীরা এখানে যেন নানারঙের আলোকশিখা কিংবা মেঘাবয়ব সম্পন্ন আকাশচারীর দল; তবু সুস্পষ্ট একেকটি চরিত্র, যদিও বাস্তবাতীত এবং এই কারণে বাস্তব-বিমুখ এবং বিয়োগান্তক এবং বিয়োগাত্মক।

এই ভাবলৌকিকতার সংজ্ঞা পরিষ্কার হতে পারে বাংলা উপন্যাসের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' অথবা 'শেষের কবিতা' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ভাবলৌকিকতার সন্তান। ভাবের ঘোর কোথাও ভারী, কোথাও বা উচ্ছল। কিন্তু নায়ক নায়িকা অথবা অন্যান্য পাত্রী ভাবলৌকিকতার উপাদান নিয়েই বিশিষ্ট, অনন্য, দাগ রেখে যাওয়া, বাইরের চেহারা এবং ভিতরের মানুষকে নিয়ে নিবিড়ভাবে গড়া চরিত্র হয়ে উঠতে চেয়েছে। হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা, কিংবা কতটুকু পেরেছে সে অন্য কথা। এরা আনবিকীকৃত মানবসত্তার প্রতিভূ হতে রাজী নয় অন্তত স্বপ্নে, ধ্যানধারণায়, আকাঙ্ক্ষায়।

এই যদি পরিচয় হয় ভাবলৌককতার, তাহলে এর মধ্যে বিশেষ কোন যোগাত্মক দিক পাওয়া যায় কি? কোন সাধারণ গুণনীয়ক রয়েছে কি এই অভিনবত্বের এবং চিরায়তিক শিল্পরূপের মধ্যে? যদি থাকে, কী সে?

সাত

মানব চরিত্রের দ্বৈত সত্তা

গ্যেটের 'ভের্থেরের দুঃখ' উপন্যাসের তরুণ নায়ক ভের্থেরের মানবীয় সত্য সন্ধানের মূল ভাণ্ডার যেমন হোমারের 'ইউলিসিস' বা 'ওডিসি' মহাকাব্য, তেমনি সমস্ত অনুভূতি-প্রবণতার মধ্যেও সজাগ রয়েছে দৃঢ়সংবদ্ধ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যাদের নেই তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা। নতুন ধরনের ভাববাদী বীরত্ব বা অভিযান্ত্রিকতা ছন্দিত হয়েছে ভের্থেরের কোমল কুসুম মনে।

এই দ্বৈত উপাদান-সমন্বিত চরিত্র চিত্রণ ভাবলৌকিক উপন্যাস ও বাস্তববাদী উপন্যাসের সাধারণ গুণনীয়ক বা যোগসূত্র। ফ্রান্সের রুসো এবং ভলটেয়ারের বিপরীত মুখী উপন্যাসকে গেঁথেছে এই সাধারণ গুণনীয়ক।

রাফল ফকসের 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থের 'উপন্যাস-মহাকাব্যের রূপে' অধ্যায়ে বাস্তববাদের মৌলিক গুণসম্পন্ন উপন্যাসের নরনারী-চরিত্রাবলি সম্বন্ধে নিম্নোধৃত মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

'ভাল হোক আর মন্দ হোক, আধুনিককালে নাটক, সঙ্গীত এবং চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বিপুল প্রসার সাধিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পকলার এই বিভাগগুলির প্রসার সাধন ঘটে আসছে দীর্ঘকাল ধরে, অর্থাৎ সভ্যতার শুরু থেকেই। এদের প্রধান প্রধান শিল্পরূপ-সমস্যার সমাধান সূত্রও অতীতের কৃতিত্ব। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু অতীতে শুধু একটি মাত্র সমস্যার সমাধান ঘটেছিল। মধ্যযুগ যখন অস্তমিত প্রায়, তখনকার ইটালি এবং ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমূহ থেকে প্রথম আধুনিক ইতিকথা

রচয়িতারা বেরিয়ে এসেছিলেন। এঁদের লেখায় নরনারীর চরিত্রাবলি বা ক্রিয়াকলাপ-পদ্ধতি তাদের কৃতকার্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। 'বোকাচিও' এবং 'চসার' সর্বপ্রথমে ঔপন্যাসিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বকে অর্থাৎ নরনারী সম্বন্ধে কৌতূহলকে সামনে নিয়ে আসেন। জীবনের বিষণ্ন, কুতুহলী ও আনন্দময় যন্ত্র যে মানব শরীর, রাবেলবাইস তার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই শরীরের অভ্যন্তরস্থ মনকে প্রদান করেন একটি নতুন রণধ্বনি। এই মন সেদিন সবেমাত্র জীবনকে আবিষ্কার করছে। এই রণধ্বনি ছিল–'তোমার যা অভিপ্রায় তা করো।' সার্ভেন্টিস আর এক পা এগিয়েছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসের দুই চরিত্র ডন কুইক্সোট ও সাঙ্কোর নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ককে এবং বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে এদের দু'জনের সম্পর্ককে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন।'

রালফ্ ফকস তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার করার জন্যে এইচ. জি. ওয়েলস সম্বন্ধে একটি ভিন্ন প্রবন্ধে ওয়েলসের আত্মজীবনীর অন্তর্ভুক্ত, 'উপন্যাস সম্পর্কে ছিন্নপত্র' অধ্যায় থেকে যে উদ্ধৃতি দাখিল করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য : 'সর্বাত্মক চরিত্রধ্যায়ন হচ্ছে বয়ঃপ্রাপ্তের কাজ, দর্শনতাত্ত্বিক কাজ। আমার জীবনের এত বেশি সময় সুদীর্ঘ 'বয়:সন্ধি' হিসেবেই সাধারণ অর্থে জগতের সঙ্গে মোকাবেলা করতে কেটে গেছে যে, চরিত্রধ্যায়ন প্রাধান্য পেয়েছে শুধু আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে। যে কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনযাপন সমগ্রভাবে বিধৃত, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির কোন একটির উপর দৃষ্টি নিবৃদ্ধ করতে যাবার আগে আমাকে মনে মনে কাঠামোটি সম্বন্ধেই আঁচ করে নিতে হয়েছে।'

ক্রিস্টফার কডওয়েলের দুটি মন্তব্যও মানব চরিত্রের দ্বৈতসত্তাকে বুঝবার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত, তিনি তাঁর 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, 'অদিম গোষ্ঠীর যৌথ সদস্যেরা তাদের মূল আকাঙ্ক্ষা সমূহের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়নি। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে নেবার জন্যে তাদের পরস্পরের মধ্যে রফার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, আদিম গোষ্ঠীতে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বৈষম্যের সম্ভাবনাই ছিল না। ... বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীনতার কোন ব্যক্তিক বাড়তি বা অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না আদিম গোষ্ঠীতে। কিন্তু পরে শ্রমবিভাগ এবং তজ্জনিত উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন ব্যক্তি পার্থক্য জন্মানোর ফলে একেকটি প্রয়োজনীয় সমস্যার মোকাবেলায় বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। প্রথমে দেখা দিলো স্থির চিত্র এবং ন্যায়শাস্ত্রীয় সারল্যে প্রতিভাত বিয়োগান্ত নাটক। পরে, ধনিকতন্ত্রী সভ্যতায় এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষাকৃত বেশি সংযোজন ও পরিবর্তনশীল পদ্ধতি নিয়ে উপন্যাস শিল্প বিকশিত হলো। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঐকতান বা আর্কেষ্ট্রার উদ্ভব স্বাধীনতার পথ হিসাবে উপন্যাসের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ।'

আদিম যৌথ মানবসত্তা কিভাবে পৃথক পৃথক ব্যক্তি সত্তার চরিত্র সম্পন্ন হতে হতে উপন্যাসের শিল্পরূপে আত্ম প্রকাশ করলো এবং কেন করলো এবং উপন্যাসকে ব্যক্তি-মানব-মানবীর ইচ্ছা অনিচ্ছা ও রুচি অরুচিকে প্রকাশ করার পথ করে দিল, সমাজ বিকাশের গতিধারা বিশ্লেষণ করে কডওয়েল সে কথা উপরে বুঝিয়েছেন।

কডওয়েল তাঁর এই 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থেই ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে উপন্যাসের যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছেন, তা কিছুটা সিদ্ধান্তের আকারে হলেও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জন্য সহায়ক :

'একদিকে কবি ও গণিতজ্ঞ এবং অন্যদিকে ঔপন্যাসিক ও বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী–এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমোক্তেরা সাধারণীকরণ, সংবদ্ধকরণ, মানবীয় অন্তঃসার ও নির্গলিত বাস্তবে আগ্রহী এবং দ্বিতীয়োক্তেরা বিশেষীকরণ ও মানবীয় ব্যক্তিসত্তা এবং নিরেট বাস্তবে আগ্রহী।'

উপন্যাসে নরনারী-চরিত্রাবলির অবস্থিতি সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের একটি উপন্যাস সম্বন্ধে জনৈক মার্কসপন্থী ব্যাখ্যাকারের মন্তব্যটিও এখানে পেশ করে রাখা যেতে পারে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক রবার্ট ট্রেসেলের 'ছেঁড়া ইজার পরা বিশ্ব প্রেমিকবৃন্দ' নামক উপন্যাসটিকে ইংরেজি সাহিত্যে ষোলআনা সর্বহারা শ্রমিকের উপন্যাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের এক ধরনের ঘরামি বা দেয়াল-সাজ মেহনতী মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় ভরপুর এই বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণকে স্বাগত জানাতে গিয়ে লণ্ডনের 'মার্ক্সিষ্ট কোয়ার্টার্লি' পত্রিকার বিভাগীয় সমালোচক বইটিকে গোর্কির 'মা' এবং লুসুনের 'আঃ কিউ-এর গল্প' গ্রন্থের সমপর্যায়ে স্থান দিয়েছেন আধুনিক যুগসন্ধিতে অতীত ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র হিসেবে। মূল চরিত্রটি হচ্ছে কিছুটা ঢিলেঢালা ভাবুক ধরনের, কিন্তু অভিজ্ঞতা তার মনকে বাস্তব জগতের পরিবর্তনের জন্যে তাত্ত্বিক করে তুলেছে। দেয়াল-সাজের কাজ তাকে বহু ধরনের ঘর ও তার বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্যকার উপন্যাসের বাস্তববাদ ও নরনারী-চরিত্রাবলির ওপর যে আলো ফেলেছেন, তার মিল আছে রালফ ফক্স এবং কডওয়েলের সূত্রগুলির সঙ্গে। বক্তব্যটি এই :

'সম্প্রসারণশীল বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্যকে নির্গলিত করা এবং এই জীয়ন্ত সত্যকে কল্পিত চরিত্রাবলিতে মূর্ত করাই হচ্ছে বাস্তববাদের কৃতিত্ব। শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের সারসত্তা হচ্ছে বিকাশমান চরিত্র। এইজন্যে সম্প্রসারণশীল সমাজের সত্যকে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য হচ্ছে সামাজিকভাবে যেটা নতুন, তাকে ব্যক্তিরূপ দেওয়া। সদ্যোত্থিতকে স্বাগত জানাবার জন্যে ঔপন্যাসিককে সর্বদা প্রতীক্ষারত থাকতে হবে।'

বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এইভাবে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, উপন্যাসের মৌলিক শিল্পরূপে নরনারী-চরিত্রাবলি প্রবহমান এবং ঘনায়মান বহির্বাস্তবে পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মুখাবয়বে প্রকাশ পেয়েছে। 'ভের্থেরের দুঃখ' উপন্যাসের নরনারী চিত্রাবলি আবেগ-প্রবাহে ভাসমান, এই যা তফাৎ।

যে ঐতিহাসিক তাগিদে উপন্যাসের বিশাল শিল্পরূপায়তনের সৃষ্টি, তার অন্তর্ভেদী প্রাথমিক বিশ্লিষ্টতার দরুন ভাবাতিশয্যের ধারা যখন কথা বিস্তারের আধারকে প্লবিত করে বসেছে, বাস্তব যখন নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে ভাবতরঙ্গে, তুচ্ছ হয়ে গৌণ হয়ে গিয়েছে, তখনও তাকে উপন্যাস হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। বাস্তববাদী উপন্যাসের আত্মিক অপূর্ণতা ও ভাববাদী উপন্যাসের নরনারী-চরিত্রাবলির সূর্যোজ্জ্বল প্রকাশের সাধারণ গুণনীয়ক হচ্ছে চরিত্রাবলি। এই চরিত্রাবলির ব্যক্তিরূপায়ণই

ভাবপ্রবণ উপন্যাসে সাধিত হয়েছে 'বিভিন্ন বর্ণবিভাসমন্বিত অভিপ্রায় ও অভিরুচি এবং প্রবণতার বিবরণে; এ বিবরণের পদ্ধতি হচ্ছে একক সংলাপ অথবা স্বগতোক্তি। পত্র বা দিনলিপি এর আঙ্গিক। ঔপন্যাসিক গল্প বলেছেন বহুক্ষেত্রে প্রথম পুরুষে। বাংলা উপন্যাসে এ পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামনি' অনেক দিক দিয়ে পৃথক হলেও এই পদ্ধতিতে এক।

যদিও এসব নরনারী চরিত্র অনেক ক্ষেত্রে আত্মবিস্ফোরণের ফুলঝুরি মাত্র, তবু এদের প্রত্যেকের ভূমিকা এবং বক্তব্যের স্বীকয়তা ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে রেখায়িত। এ উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাকে হাতে ধরে যে মায়াজগতে নিয়ে যায়, সেখানে চরিত্রাবলি এসে দাঁড়ায় পরমাত্মীয়দের মতো। গ্রন্থের মলাট খোলা যেন স্বপ্নপুরীর দরজা খোলা। কিন্তু এর অধিবাসী অধিবাসিনীরা যদিও জমাট মেঘ-খণ্ডসম, তবু বাটালি দিয়েই খোদিত এদের প্রতিকৃতির স্বতন্ত্র, উদ্ধত সমুন্নত গিরি শিখরমালা। রবীন্দ্রনাথের 'নাম্নী' কবিতাও থই পায়না ভাবলৌকিক উপন্যাসের বিধুমুখীদের বিভিন্ন বিশিষ্ট প্রতিকৃতি বর্ণনায়।

এসব উপন্যাস অষ্টাদশ শতকীয় বুনিয়াদি চিরায়তিক বা ক্লাসিকাল উপন্যাস থেকে পৃথক সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের চরিত্রাবলি এবং বাস্তববাদী উপন্যাসের চরিত্রাবলি দুইই স্বগোত্র। একই ইতিহাসের ধারাতে বিশিষ্ট একেকটি পর্যায়ের অভিপ্রায়ে এরা প্রযোজিত। পার্থক্য এই যে, বাস্তববাদী উপন্যাস যেমন বহির্বাস্তবের বা পরিবেশের বা জাগতিক ব্যাপারের আধিক্য এবং আত্মিক ঋজুতার মিশ্রণ, অপর দিকের ধারায় ভাবলৌকিক উপন্যাস তেমনি আত্মিকতার আতিশয্য এবং বাস্তবের খণ্ডিত অস্তিত্বের মিশ্রণ। অতি আত্মিক বা অতি-কল্পনা প্রবণ রোমান্টিক উপন্যাসের পরিণতি সাংসারিক বাস্তব হিসেবে ট্রাজেডি বা ব্যর্থতা। বুনিয়াদি উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের জীবনেও ব্যর্থতা হচ্ছে নিদারুণ সত্য, কিন্তু তারা সদা গতিমান ও সদা প্রসারমান বাস্তবের সমগ্রতায় অগ্রগতির চিহ্ন এঁকে চলে আসছে। কারণ, তারা বাস্তবের মজ্জা দিয়ে তৈরি এবং বাস্তব পরিবর্তনশীল হলেও এক অবিনশ্বর বিস্তার। কিন্তু ক্লাসিকাল হোক অথবা রোমান্টিক হোক, উভয় ধরনের উপন্যাসই নিজ নিজ ঝাঁপির মধ্যে যে অসংখ্য বিশিষ্ট নরনারী চরিত্রকে একত্রিত করেছে, তারা দৃঢ় সংবদ্ধ–প্রথমত যেন ভাস্কর্যের শক্ত ভূমিতে, দ্বিতীয়ত চিত্রপটের আলো ছায়ায়। রবীন্দ্রনাথ তার 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে এই সাধারণ গুণনীয়ককে সেই উপাদান বলেছেন যা উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে : 'যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে যদি সে প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না সজীব মানবচরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তি আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক।'

বাস্তবের বিরাটতম বিস্তারে সমৃদ্ধ 'গোরা' উপন্যাসের যিনি লেখক তাকে মানব-মানবীচরিত্রের উপরোক্ত দিকটাই বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত রেখেছিল, প্রবৃত্ত করেছিল শেষ পর্যন্ত অতি ভাবলৌকিক 'শেষের কবিতা' রচনায়। উপন্যাসের চিরায়তিক শিল্পরূপ হয়তো তাঁকে সামগ্রিকভাবে কোন দিনই আশ্বস্ত করতে পারেনি।

প্রথম জীবনে 'বিলাত যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে তিনি বৃহৎকায় উপন্যাস নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন এই বলে যে, এধরনের বইকে সামলানো যায়না। পরবর্তীকালে 'সাহিত্যের মাত্রা' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একই ধরনের অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন শিল্পবিপ্লবজাত বৃহৎকায় উপন্যাসের ব্যাপারে 'বিরাট যন্ত্রশক্তি উদগার করছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড। ... কারখানা ঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে তার ভুরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারছে না। এই অপ্রাণ পদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোণঠাসা করে। উপন্যাস সাহিত্যের সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। ....পশ্চিম মহাদেশের এই কায়া বহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত হয়ে।'

উপন্যাসের দ্বৈতসত্তা তথা বাস্তবচারী ও ভাবচারী ধারার ঐক্য অনৈক্যের এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে, প্রকৃত পক্ষে আত্মিকতার দরুন উপন্যাসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি? উপন্যাস যদি তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে থাকে মনোময়তার কোন পর্যায়ে, এবং তার জন্যে যদি অন্য কোন সত্তার চিত্রণ দায়ী হয়ে থাকে, তবে তার কারণ নির্দিষ্ট হবে আত্মিক গুণগত ও চূড়ান্ত পরিবর্তনের সময়ে কোন এক ধরনের উন্মার্গগামিতার মধ্যে। কী এ পর্যায়? একি অবধারিত ছিল? বাস্তববাদী ধারাও কি এর দায়িত্ব এড়াতে পারে?

আট

বাস্তব ভেঙ্গেছে বাস্তবকে

কয়েকটি কারণেই উপন্যাসের উন্মার্গগামিতা বা ভ্রষ্টতা এবং তজ্জনিত সংকট অবধারিত ছিল। যে বহির্বাস্তবের বিস্তারে মানবাত্মার বিহারে বা অভিযাত্রায় উপন্যাস তার বিশিষ্ট শিল্পরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারই একটি তত্ত্বগত পর্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে ভ্রষ্টতার লক্ষণ। যে মনস্তত্ত্ব ছিল বরাবরই দর্শনের বিভাগ, তা উনিশ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানের বিভাগে স্থানান্তরিত হয়, যদিও সে একটি পূর্ণায়তন বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে সম্প্রতিও বিজ্ঞানপ্রিয়েরা সবাই একমত হতে পারেন নি। উনিশ শতকের শেষভাগে মানুষের মনও অন্যান্য যে কোন বস্তু উপাদানের মতো বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের তথ্যনির্ধারণ পদ্ধতি বা গণিত সূত্রের বিশ্লেষণযোগ্য পদার্থ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। ব্যক্তি নির্বিশেষে সর্বজনীন মনের উপাদান-সমাবেশ ও সংগঠনের গতি প্রকৃতির নির্দিষ্ট অনিবার্যতায় ব্যক্তিক অতি-বিশেষত্ব প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে মানবাত্মা বিভিন্ন অভিপ্রায়ের আধার হওয়ায় বাস্তববাদী বা অনুভূতিপ্রবণ উপন্যাসে মানব-শরীরের ইন্দ্রিয়গত সর্বজনীনতাকে দিয়ে এসেছে বিভিন্ন চরিত্র, সে তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে এক নির্বিশেষে সর্বজনীন মানব চরিত্রেরও মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মনের রসায়নবিদ এবং বাস্তব জীবনের সামগ্রিক প্রসারের

অন্তর্যামী হতে ইচ্ছুক শিল্পী-উপন্যাসিক যে এই বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বে প্রভাবিত হবেন, তাতো নিতান্তই স্বাভাবিক।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞানের দিক থেকে অথবা বলা যেতে পারে, বস্তুকে জানার পরিধিকে প্রসারিত করে মনকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে পরখ করতে গিয়েই এসেছে মনোময়তা। মন যদি ভেঙ্গে থাকে, তবে বড় ভাঙ্গার মারফত ভেঙ্গেছে, মন ভাঙ্গতে গিয়ে বস্তু ভাঙ্গেনি। কিংবা বলা যেতে পারে, দু'টি ক্রিয়াই পরস্পরের অনুপূরক হিসেবে ঘটেছে।

শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পৃথক হলেও তাদের পারস্পরিক সন্নিবেশ একটি বাস্তব সত্য। ক্রিস্টফার কডওয়েল তাঁর 'সৌন্দর্য' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'যে মেহনত-ক্রিয়াকলাপ মানবসমাজের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত জুড়ে রয়েছে, সত্য এবং সৌন্দর্য উভয়েই তার মধ্যে জন্ম নেয়, কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। এখানে তারা অবিভাজ্য। উভয়েই অবিরত পরস্পরের আওতায় গিয়ে পড়ে। যে সব ধারণা, যে সব সম্ভাবনা এবং যে জগতের সঙ্গে মানবদেহের কামনা বাসনা সংশ্লিষ্ট, বিজ্ঞান তাদের অবিরত সমৃদ্ধ ও গভীরাশ্রয়ী করে চলে। আর শিল্পকলা বাস্তবলোকের অভ্যন্তরে মানবদেহের অভিযাত্রাকে অধিকতর স্পর্ধাবান, অধিকতর কৌতূহলী অধিকতর দুর্দমনীয় করে দেয়।'

ফ্রান্সের সুররিয়ালিস্ট বা অতিবাস্তববাদী বা মনোবাস্তববাদীরা মনের গহনে আধুনিক মনোবাস্তবের নির্দিষ্ট পথে ঝাঁপ দেওয়াকে 'বাস্তব ও বাস্তবের মধ্যেকার প্রাচীর ভাঙ্গার' কাজ বলে দাবী করে বসেছেন। আর, যে ক্রিস্টফার কডওয়েল উপন্যাসের শিল্পকলাগত বৈশিষ্ট্য নিরূপিত করেছেন তাকে বহির্বাস্তবমুখী বলে, তিনিও যুং এবং ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্সকে একই ছাঁচে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান উপন্যাসের শিল্পরূপ যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার বিজ্ঞানের দিকটা তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে এসেছে অধ্যাপক জোয়াডের বিশ্লেষণে।

ইংরেজ অধ্যাপক জোয়াড তাঁর 'আধুনিক চিন্তাধারার সন্ধান সূত্র' গ্রন্থের 'মনস্তত্ত্ব ও আধুনিক উপন্যাস' অধ্যায়ে উপন্যাসের শিল্পরূপে আধুনিক মনস্তত্ত্বের তিন ধরনের ক্রিয়ার কথা বলেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জোয়াডের বইটি বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে অর্থাৎ তিরিশের দশকে লেখা।

(১) প্রথম ক্রিয়া সম্বন্ধে জোয়াড নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন। বক্তব্যটি ছাঁকাকথার মতোই মনে হবে, তবে যে কোন সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এধরনের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। যাইহোক, কথাটা এই :

'মনস্তত্ত্ব শিক্ষা দিচ্ছে যে, মানুষকে বিভিন্ন গুণের ঝাঁক না বলে নদী প্রবাহ বলাই শ্রেয়। কখনো দ্রুত, কখনো ধীর, কখনো নির্মল, কখনো ঘোলা– অবিরাম ছুটে চলেছে মানুষ। তার বহিঃপ্রকাশ প্রতিমুহূর্তে একেক রকম। এ শিক্ষা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও আবেগসমূহের সমষ্টি হিসেবে কোন একটি লোক যখন একইভাবে গঠিত অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ হয়, তখন তার মধ্যে ব্যক্তিক উপাদানগুলির পরিবর্তমান বিশেষত্ব পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। এধরনের ব্যক্তিমনের

পরিচয় দাখিল করলে দেখা যায়, এর মধ্যে থেকে সোজাসুজি এমন কোন গল্প বেরিয়ে আসছেন না যার গতিধারায় আপনাপন সুস্পষ্ট মুখবয়ব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী তাদের নির্দিষ্ট ও নির্ণয়যোগ্য ভূমিকা পালন করে যেতে পারে। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বহির্জীবনের চেয়ে অন্তর্জীবনের গুরুত্ব বেশি এবং কোন এক ব্যক্তির অভ্যন্তরে পরস্পর-বিরোধী উপাদান সমূহের যে সংঘাত চলছে সেটা বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাতের চেয়ে বেশি প্রকট। যখন বলা হয়, মানুষের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিষয়বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকাই হচ্ছে ঔপন্যাসিকের কাজ, তখন উপরোক্ত বক্তব্যই সামনে এসে হাজির হয়। বিশ্লেষণ করলে বক্তব্যটা দাঁড়ায় এই যে, ঔপন্যাসিকের কাজ হচ্ছে জীবনের প্রতিকৃতি আঁকা, জীবনে যারা লিপ্ত তাদের অভিজ্ঞতাময় জীবনধারার ছবি আঁকা।

ঔপন্যাসিকেরা সবসময়ই চেষ্টা করে আসছেন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে; আর এ হচ্ছে সে জীবন যাকে এর শরিকরা সত্য সত্যই যাচাই করে নিচ্ছে। ঔপন্যাসিকরা যখন পদ্ধতির পর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকেন এক এক করে তখন সাহিত্য মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। এত বেশি ঘনিষ্ঠ যে যেসব বইতে উপরোক্ত ভূমিকা চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পায়, সেগুলিকে দেখে মনে হয় এসব উপন্যাস লেখাই হয়েছে মনস্তত্ত্ব ও মানব শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যে।'

আধুনিক মনস্তত্ত্বের এই প্রথমোক্ত ক্রিয়াকে অধ্যাপক জোয়াড (ক) জীবনী উপন্যাস, (খ) মনের আণবিক বর্ণনা-ভিত্তিক উপন্যাস এবং (গ) চিন্তাস্রোত ও দিবাস্বপ্ন বর্ণনার উপন্যাস—এই ত্রিধারায় বিভক্ত করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে তিনি ইংরেজ ঔপন্যাসিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের নাম করেছেন। মনঃস্রোতের চিত্রমালা যতই জটিল ও বিক্ষিপ্ত হোক না কেন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বাইরের উপাদনের মিশ্রণকে পরিহার করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) অধ্যাপক জোয়াডের মতে উপন্যাসের ওপর আধুনিক মনস্তত্ত্বের দ্বিতীয় ক্রিয়া নিম্নরূপ :

'মানবীয় চিন্ময় জগতে অচেতন শক্তিসমূহের ক্রিয়াকলাপ হলো উপন্যাসের আধুনিক মনস্তত্ত্বের অন্যতম ধারা। এর মধ্যে মনঃসমীক্ষার প্রভাব চিত্রায়িত। এ ধারায় তাত্ত্বিক হচ্ছেন ফ্রয়েড, ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স।'

(৩) উপন্যাসে আধুনিক মনস্তত্ত্বের তৃতীয় ধারা সম্বন্ধে অধ্যাপক জোয়াড নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন :

'উপন্যাসে আধুনিক মনস্তত্ত্বের আরেকটি ধারা মানুষের জীবনকে বহির্জাগতিক ক্রীড়াপুত্তলিরূপে এবং মানবাত্মাকে মানব শরীরের ক্রীড়াপুত্তলিরূপে গণ্য করে। এর মধ্যে কর্মন্যবাদী দর্শনের প্রভাব চিত্রায়িত। এ ধারায় তাত্ত্বিক হলেন পাভলভ, আর ঔপন্যাসিক আলডুস হাক্সলি।'

জোয়াড প্রদত্ত উপরোক্ত ত্রিধারার পরিচয় আলডুস হাক্সলির 'গায্‌যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসেও আংশিকভাবে পাওয়া যায়। তবে স্বাভাবিকভাবেই এই ত্রিধারার গতিপরিণতিতে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ বিশ্লেষক-অধ্যাপক

জোয়াডের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে। আলডুস হাক্সলিকে জোয়াড একটি বিশেষ বিভাগে ফেলেছেন, সেতো ওপরের উদ্ধৃতিতেই প্রমাণিত। তবে 'গায্যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসের অবিশ্রান্ত সংলাপও মাঝে মাঝে এত ঋজু ও নিরাসক্ত যে, এর মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের আধুনিক মনস্তত্ত্বের সংস্পর্শজনিত মনোরাসয়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জোয়াডের বক্তব্যের যথার্থতা সমর্থিত হয়।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, জোয়াড উপরোক্ত মনস্তত্ত্ব-পরিপ্লাবিত উপন্যাস-শিল্পের একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাও দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তথা ইংলণ্ডীয় ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজি উপন্যাস এবং আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পার্থক্য দেখিয়ে জোয়াড লিখেছেন :

'ভিক্টোরিয়া-যুগের ঔপন্যাসিকগণ কর্তৃক অঙ্কিত নরনারীর সঙ্গে পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ কর্তৃক চিত্রিত নরনারী-চরিত্রাবলির পার্থক্য বিচার করতে গিয়ে আমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারি না। ভিক্টোরিয়া-যুগের চরিত্রাবলি পাঠক পাঠিকার মনে অঙ্কিত হয়ে যায়। এর কারণ হলো এই যে, প্রধানত বাঁধাধরা নিয়মে ঐ চরিত্রাবলির সৃষ্টি। প্রত্যেক চরিত্রেরই দুটি বা তিনটি সর্বাত্মক বিশেষত্ব থাকে, এর বেশি নয়। এক একটি চরিত্র মানব প্রকৃতির এক একটা বিশেষ দিকের প্রতিনিধি। কোন চরিত্রই সমগ্র মানবপ্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না। মোট কথা এই যে, উনিশ শতকীয় চরিত্রাবলির কোন ক্রমবিকাশ নেই। বই-এর শুরুতে যেমন ছিল, বই-এর শেষেও ঠিক তেমনি থেকে গেছে তারা সামান্য গৌণ পরিবর্তন বাদ দিয়ে। এই অর্থে উনিশ শতকীয় চরিত্রাবলি স্থিতিশীল। গতিশীল নয়।'

যদিও জোয়াড নিজেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব জেম্‌স জয়েসের উপন্যাসকে 'বাজে কাগজের ঝুড়ি'তে পরিণত করেছে, তবু তাঁর বক্তব্য মোটামুটি এই যে, চারিত্রিক বিশেষত্বকে ভেঙ্গে দিলেও আধুনিক মনস্তত্ত্ব মানুষের আত্মাকে দিয়েছে গতি। ভালমন্দের রূপ ও অপরূপের বিচার এখানেই।

কিন্তু এই আত্মিক গতি কি আবর্তের সৃষ্টি করেনি? এবং এইভাবেই উপন্যাসের মৌলিকতাকে বিপর্যস্ত করে দেয়নি?

মনোকেন্দ্রিকতা অনুভূতিপ্রবণতা বা ভাবাতিশয্যের ধারারই শুধু পরিণতি নয়, বহির্বাস্তবের প্রসারেও এই মনোকেন্দ্রিকতার উদ্ভব। তবু উপন্যাসের শিল্পরূপের মৌলিকতার দিক দিয়ে এই মনোকেন্দ্রিকতা বিয়োগাত্মক, বিপর্যয়মূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিভাবে, কোথায়?

নয়

মনস্তত্ত্বের বিয়োগাত্মক ধারা

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকরা বহুজনের অবয়বের অন্তরালের সর্বজনীন অন্তরাত্মার অনিত্য লীলাস্রোতকে চিত্রিত করেছেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে মুদ্রিত বিভিন্ন মুখচ্ছবি (Countenance) সরিয়ে তাদের মধ্যে থেকে টেনে বের করেছেন

মানুষের ভিতরকার মানুষকে, সাধারণ জৈব মানবের শোনিত প্রবাহ অথবা করোটিসম্ভারে উপচীয়মান আদিম প্রবৃত্তিপুঞ্জকে।

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে এই জন্যে চরিত্রাবলি ভাস্কর্যের দৃঢ়সংবদ্ধ পৃথক পৃথক গঠন পায়নি, অণু অণু হয়ে নদীতরঙ্গের মতো এ ওর গায়ে মিশে গিয়েছে।

অন্তরাত্মা ইস্পাতের ফলক থাকেনি, টলমল করেছে নানা ছাঁদের তরল ইস্পাতের মতো। এ উপন্যাসের তত্ত্ব-চিন্তাও এর ফলে অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হয়েছে। চরিত্র হয়েছে চেতনাস্রোত বা মনঃস্রোত। অবচেতন বেরিয়ে এসেছে তার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে, দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে অবচেতন ও চেতন। দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যজ্ঞান আর স্মৃতির মাধ্যমে মনঃস্রোত চেয়েছে দ্বন্দ্বের সমাধান।

বিশুদ্ধ না হলেও আধুনিক মনস্তত্ত্ব একটি বিজ্ঞান। কিন্তু উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান অতিবিশ্বাসের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এখানে ফ্রয়েড ও ডি. এইচ. লয়েন্সকে পাশাপাশি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করা যেতে পারে। ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞানে যে আদিম অতীন্দ্রিয়বাদের রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত রয়েছে, তা ডি. এইচ. লরেন্স প্রকাশ্যে ও প্রগাঢ়তর। ফ্রয়েডের তত্ত্বে প্রামাণ্যের গাঁথুনি আছে–ডি.এইচ. লরেন্সে তা অনুপস্থিত। কিন্তু এই এলোমেলা ভাবের মধ্যে দিয়েই লরেন্স ফ্রয়েডিয় মতবাদের মধ্যকার অবৈজ্ঞানিক রহস্যময়তার হাঁড়ি হাটের মধ্যে ভেঙ্গে দিয়েছেন। জানিনা ফ্রয়েড লরেন্সকে শিষ্য মনে করতেন কিনা। করে থাকলে বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করেছিলেন নিশ্চয়।

আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এ সম্বন্ধে।

জেমস জয়েসের উপন্যাস বাস্তববাদী মনঃস্রোতের চূড়ান্তস্বরূপ। বহির্বাস্তবের এবং সে সম্বন্ধে চেতনা ও তাত্ত্বিকতার শতধাবিদীর্ণ নক্সীকাঁথা-এর স্তোক আবরণ মাত্র? মাঝে মাঝে মনে হয়, বহির্বাস্তবের শক্ত ভূমিতে সুস্পষ্ট মুখাবয়বসম্পন্ন চরিত্র দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে শুরু করেছে বিশিষ্ট কোন অভিপ্রায়ে বিশিষ্টভাবে সংবদ্ধ হয়ে। কিন্তু সেটা মায়ামাত্র। অথবা মনঃস্রোতে একটা তরঙ্গ মাত্র। আসলে, মন মুখাবয়বকে আড়াল দিয়ে দিয়ে তখনও সিঁড়ির ধাঁধায় আরোহণ করেছে কিংবা অতীত স্মৃতির রোমন্থন করেছে। এই মন হচ্ছে একটি অবিশেষ জৈব মন। প্রধানত রোমন্থনের ক্ষেত্রে এই জৈব মন সক্রিয়। 'অথবা এ যেন মনের ভিতর শতখণ্ডিত আয়না। আয়নার ভিতর আয়না। এক একটা আয়না যেন বিসর্পিল পথে নেমে যাওয়া এক একটা ধাপ। একটা থেকে আর একটায় আত্মদর্শন ঘটে স্বতঃদৃষ্টভাবে, স্বতঃসূত্রায়িত হয়ে। যেতে হয় এ রং থেকে সেই রংএ, কারণ কোন বিশিষ্ট রং সংবদ্ধ নয়। জেমস জয়েস এই জন্যেই তাঁর 'ইউলিসিস' উপন্যাসে মানবাত্মাকে প্রতি মুহূর্তে বর্ণান্তরিত কৃকলাশ বলে বর্ণনা করেছেন।

জয়েস তাঁর নিজস্ব ভাষায় "সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম দ্বিপদজন্তুর মনের বিস্ময়াবলিকে "বর্ণনা করেছেন এক পলকের বর্ণধারণাপন্থি' (impressionist) চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। 'ইউলিসিস' উপন্যাসের এক জায়গায় জয়েস সর্বমানবীয় কিংবা খর্বমানবীয় মনঃস্রোতচিত্রকে অথবা পাপস্মৃতিকে বহির্বাস্তব-নিরপেক্ষ আখ্যা

দিয়েছেন। বাস্তব পরিবেশ দেহ এবং মুখাবয়বের ছদ্মাবরণের তলায় মন তার উর্ণাতন্তু বয়ন করে চলেছে কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। 'ইউলিসিস' উপন্যাসের দুই নায়ক, অন্যতম নায়কের পত্নী এবং অসংখ্য পাত্রপাত্রীর জীবন কাহিনী তাই একদিন এবং এক রাত্রির ভোজন আলাপন রমণ এবং ভ্রমণ এবং তন্দ্রা এবং তন্দ্রাস্বপ্নেই বিধৃত হতে পেরেছে। সমগ্র মানব সভ্যতা, ধনবাদী সভ্যতা (জয়েসের ভাষায় 'সিফিলিজেসন') আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ইহুদী সমস্যা, সমাজতন্ত্রবাদ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানব প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধকে মন্থিত করে চলা মনঃস্রোত হওয়া কিংবা না হওয়ার (to be or not to be) দিবারাত্রির আলোছায়ার চক্রের আবর্তে আবর্তিত। 'ইউলিসিস' উপন্যাসের অন্যতম নায়ক মিঃ ব্লুমকে বলা হয়েছে একালের হ্যামলেট। কিন্তু তার 'হওয়া না কিংবা হওয়া'র ব্যাপারটা শেকস্‌পীয়ারের নাটকের নায়ক হ্যামলেটের মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ধরনের তাগিদে উপনীত একটি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের উন্মার্গগামিতায় আক্রান্ত নয়। মিঃ ব্লুম হচ্ছে নিতান্ত স্বাভাবিক সাদামাটা আটপৌরে মানবাত্মা বা ছাপোষা ক্ষুদেমানুষ বা লিটল ম্যান', এর দিনগত পাপক্ষয়ের চলচ্চিত্র।

ফরাসি উপন্যাসিক প্রুস্তের মানস-পদ্ধতিটিও পরখ করে দেখা যাক এই প্রসঙ্গে।

(১) আলডুস হাক্‌সলির 'গায্‌যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসটিতে উপন্যাসের নায়ক এন্টনি একগাদা পুরানো পারিবারিক ফটো নাড়া চাড়া করতে করতে অন্যতমা নায়িকা হেলেনের কাছে প্রুস্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা ঝেড়ে বসলো; কোন মানে হয় অতীত অভিজ্ঞতার এই বোঝা টেনে চলার? বাড়তি স্মৃতি থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় থাকা উচিত। বুড়ো প্রুস্তকে আমি ঘৃণা করি, বাস্তবিকই ঘৃণা করি'। এন্টনি তার জমজমাট ঠাট্টাভরা বাচনভঙ্গী দিয়ে প্রুস্তের একটা ছবি ফুটিয়ে তুললো। প্রুস্ত অতিক্রান্ত হারিয়ে যাওয়া সময়ের সৌন্দর্যবাদী সন্ধানী। সব সময়ে লেটকে বসে আছেন তাঁর মনে পড়া অতীতের কবোষ্ণ স্নানাগারে। বাসি সাবানের ফেনা অতীতের বহু সংখ্যক গোসলের রেশ তাঁর চারদিকে ছিটকে বেড়াচ্ছে। যুগযুগের পুঞ্জিভূত ক্লেদ পানির গামলার কান্ধায় কিংবা পানিতে চটকে আছে। এসব কিছুর মধ্যে প্রুস্ত বসেই আছেন। পাণ্ডুর বদখত জরদগব। হেলেন এণ্টনির এই বক্তৃতা শুনে বলল "প্রুস্তকে তুমি ব্যক্তিগত শত্রু করে বসে আছো।" এন্টনি হাসলো।

(২) এখন দেখা যাক, প্রুস্তের নিজের বক্তব্যটি কি।

প্রুস্ত কিন্তু আলডুস হাক্সলির বক্তব্যের একটা বিপরীত দিককে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর 'জা সাঁতোয়া' (Jean Santeuil) উপন্যাসের নায়ক জাঁ মাঝে মাঝে একটা বই নিয়ে উদ্যানে বসে যা ভেবেছে তা নিম্নরূপ; "এই দীর্ঘ প্রহরগুলিতে লিলাক ফুলগুলি জাঁকে সাহচর্য দিয়েছে। ইতিমধ্যে এই ফুলগুলির পূবেলা সুরভিতে সে বিপুল পরিমাণ মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছে। কথায় বলে যে, বয়স বাড়াবার সাথে সাথে আমাদের অনুভবগুলি দুর্বল হয়ে যায়। তা হয়তো হতে পারে, কিন্তু অনুভবগুলির মধ্যেই আগেকার কোন কোন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কৃতিত্বের শীর্ষ থেকে অস্তাচলে নামবার সময় কৃতী গায়ক ও গায়িকাদের পড়ে-যাওয়া গলা যেমন একটা গোপন সমবেত সঙ্গীতের সহবতে ভর দিয়ে থাকতে চায়, এ প্রতিধ্বনির ব্যাপারটাও তেমনি।

ঠিক এমনি ভাবেই লিলাক ফুলের মধুর গন্ধ, তাদের শাদা-রং গা কিংবা তাদের পাপড়িগুলির উজ্জ্বল লাল আভা জাঁ-র মানের গভীরে একটা তারে ঘা দিয়েছে। যত সুস্বাদু হোকনা কেন, সহজ কোন অনুভব এত গভীরে যেতে পারেনা। অতীত এখানে তার হৃদয়কে খুলে দিয়েছে বর্তমানের কাছে, আর সাম্প্রতিক মুহূর্তটি এমন এক অনুপ্রেরণার জগতে পরিণত হয়েছে, যেখানে সে অনাবিল আনন্দে সন্তরণ করে ফিরছে। সুসজ্জিত লিলাক তরুগুলি যেন বহু দূর থেকে আসা কোন অপরূপ আর সুশ্রী সুন্দর অতিথি জাঁ-র শৈশবের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা ব্যক্তিগত এবং বিশেষ বিশ্বব্যাপ্তিতে পরিণত হয়েছে। লিলাক ফুলগুলোর সুরভি তাই জাঁর মনে অল্প বয়সের উত্তপ্ত আর প্রশান্ত গ্রীষ্মের দিনগুলিকে জাগিয়ে দিয়েছে।"

প্রুস্তের এই অতীতের স্মৃতির টান অনেক সময় মাদকতাময় পরিবেশের বদলে মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে এক মুর্হূতের জন্যে দিব্যজ্ঞান দ্যুতি দিয়ে গিয়েছে উপন্যাসের নায়কের মনে। এ দুটো ব্যাপারই সৌন্দর্য-চর্চা। আলডুস হাক্সিলির কাছে প্রুস্তের স্মৃতি এই জগৎটাকেই কিন্তু বাসি মনে হয়েছে। কারণ, তিনি খুঁজেছেন চরিত্র, যেখানে স্মৃতি যদি দানা বেঁধে উঠতে পারে তবে তা জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। 'গায্‌যাতে দৃষ্টিহারা' উপন্যাসের গঠন অতীত ও বর্তমানে বারবার আসা যাওয়ার ধারাবাহিকতা-লক্ষ্মী গঠন। এই অতীতে ও বর্তমানে সাঁতার বেড়াবার ব্যাপারটাকে এলোমেলো হতে দেয়নি কতকগুলি সুস্পষ্ট দানা বাঁধা চরিত্র। চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা যে এই উপন্যাসে কত বেশি! 'এক্কি' চরিত্র একজন আদর্শবাদী সংগ্রামী জার্মান কমিউনিস্টের চরিত্র। আলডুস হাক্সলির জীবন-দর্শন এই চরিত্রকে তাঁর নিজস্ব আদর্শ বলে প্রতিপন্ন করতে দেয়নি, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির প্রবণতার দরুন হাক্সলি "এক্কি" চরিত্রকে অর্পূব মমতা দিয়ে এঁকেছেন। এটা এক ধরনের স্ববিরোধিতা। কিন্তু এই স্ববিরোধিতার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন, অলস স্মৃতির কোন জায়গা নেই। বরং অলস স্মৃতির প্রতি বিরূপতাই আছে। অধ্যাপক জোয়াড তো বলেই দিয়েছেন যে, আলডুস হাক্সলি বিজ্ঞানী প্যাভেলভের সগোত্র। মানুষের মন আর যাই হোক, এই প্যাভলভ-তত্ত্বের কাছে চেতনা-নদীও নয়, আবার স্মৃতির সেই অসংখ্য-দুয়ারী স্বপ্ন-রাজ্যও নয়, যা হঠাৎ হঠাৎ খুলে গিয়ে অতীতের ফেলে আসা সোন্দর্যকে দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। কথাটা এর আগে বলার চেষ্টা করেছি। মানুষের মনের জগতে বিজ্ঞানীর এবং বিজ্ঞানী দার্শনিকেরা উনিশ শতকের শেষে কিংবা বিশ শতকের শুরুতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন তাকে বিভিন্ন বস্তুনিচয়েরই একটি হিসেবে ধরে নিয়ে এবং তার মধ্যে সেইভাবেই একটা সুস্পষ্ট নিয়মের বিধান বার করতে চেয়েছেন যেভাবে নিউটন তাঁর আলোক তত্ত্বকে গুণ ও পরিমাণগতভাবে নির্দিষ্ট করে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই কারণেই জয়েস যদিবা জীবন ও জগৎ-কে চেতনার নদীতে গড়িয়ে দিয়েছেন, প্রুস্ত যদিবা স্মৃতির গ্রন্থিতে বাসি-ফুলের মালার মতো করে জীবন ও জগৎ-কে গেঁথেছেন এবং ডি এইচ লরেন্স যদিবা যৌন-তাড়না ও অনুধ্যানের মধ্যে দিয়ে জীবন ও জগৎ-কে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন, তবু বাস্তবকে তাঁরা কাচিয়ে ফেলে দিতে পারেন নি। আলডুস হাক্সলি যে

প্রুস্ত কিংবা ডি. এইচ. লরেন্সকে সমগ্র সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেছেন, সেটা বোধ হয় এজন্যেই। একে ছদ্মবাস্তব (pseudo reality) বলা যেতে পারে। পাখি হয়তো আকাশে উড়ে মনে করে তাকে আর শক্ত মাটিতে নামতে হবেনা। সেটা সে মনে করতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ সে ডানা ঝাপটাতে পারছে অসীম শূন্যে। এইভাবে মানস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকরা মনোময় হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবের প্রসার কালে উপন্যাসে পরোক্ষভাবে হোক প্রত্যক্ষভাবে হোক বাস্তব জগতের সম্প্রসারণ থেকেই এসেছে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের লেখার দিশা যেমন বস্তুর বৈদ্যুতিক বা আনবিক তত্ত্বের তথা পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার প্রসারেও এসেছে মনোজগতের স্তরীভূত কিংবা তেজস্কর উপাদানে আলো ফেলার তাগিদ।

প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শিল্পীদের সমস্যা এখানেই। মনস্তাত্ত্বিকতার ধারা থেকে একটা বিশেষ প্রবণতা উৎসাহিত হয়েছে। সে প্রবণতা এই যে, মানুষের অভিপ্রায়কে জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে এবং সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্যে লক্ষকোটি নরনারী যে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে আসছে তা থেকেও ছিঁড়ে চিত্রিত কারা যায় উপন্যাসে। যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুদুটো ক্লেদাক্ত ও রক্তাক্ত বিশ্বযুদ্ধ এনেছে বিশ শতকে তারই প্রবক্তারা এই নিরালম্ব অভিপ্রায়ীতার ধারাকে উৎসাহিত করেছে। ধনতন্ত্রের পতনের শতাব্দীতে তার ক্ষয়ের অথবা অবক্ষয়ের চিহ্ন-গুলি উপন্যাসের শিল্পরূপে সংক্রামিত হয়েছে এই অভিপ্রায়বাদী পদ্ধতিকে অবলম্বন করে। যদিও উপন্যাস শিল্পী সমগ্র সত্যের শিল্পী হিসেবে তার উত্তরাধিকার থেকে নিজেকে একেবারে ছাড়িয়ে নিতে পারেন না বলে অভিপ্রায়বাদ নিখাদ হতে পারেনা, তবু এই প্রবণতা যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে, তার প্রকোপকে খাটো করে দেখা যায়না। প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শিল্পীদের তাই সমস্যা, উপন্যাসকে কি করে তাঁরা নিয়ে যাবেন নেতিবাচক প্রবণতাগুলি থেকে ছাড়িয়ে তার ইতিবাচক বিকাশকে সম্ভাবনা থেকে সার্থকতায় উত্তরিত করে।

দশ

নেতিবাচক ও ইতিবাচক—পাশাপাশি

কূলহীন সীমাহীন নৈর্ব্যক্তিক অনুভবতরঙ্গ মালা মনোময় উপন্যাসের শিল্পীদের সকলের সৃষ্টিতে একসঙ্গে উপচে পড়েনি। কারও লেখায় এই ধরনের অনুভব-তরঙ্গমালা নায়ক নায়িকার মন থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে নিঃশব্দে, যেমন ইংরেজ লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাসে। আবার কারও লেখার অনুভব তরঙ্গমালা সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গ রাশির মতো গর্জন করেছে, যেমন ডি.এইচ. লরেন্সে উপন্যাসে। কিন্তু এদিক দিয়ে এরা সতীর্থ। এই নৈর্ব্যক্তিক অনুভব-তরঙ্গ-মালা আশ্রয় করেছে একধরনের ব্যক্তিকতাকে অথবা ব্যক্তির ছাঁচকে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ জেমস জয়েস ডি.এইচ.লরেন্স ও প্রুস্ত সর্বজনীন মনের কারবারী হিসেবে যতখানি সমাজদর্শী, তদপেক্ষা অনেক বেশি ব্যক্তিদর্শী।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব জৈবদেহাশ্রিত মনের বিশ্লেষণে নিয়োজিত। এক এক করে বহু নরনারীর মনঃসমীক্ষা যোগবিয়োগ করে এই তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি নির্দিষ্টকৃত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তি বা চরিত্রকে নাকচ করলেও ব্যক্তিক উপাদানকে আধুনিক মনস্তত্ত্ব পূর্ণ মূল্য দিতে চেয়েছে। উপরোক্ত ঔপন্যাসিকরা এইভাবেই তাদের উপন্যাসের সাজকে ঢেলেছেন। ব্যক্তিক উপকরণের উপাদান ও রহস্যময়তার আবরণ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। এ এক ধরনের স্ববিরোধিতা বইকি।

ডি.এইচ. লরেন্স নরনারীর অনুভূতির উথাল পাথাল ভাব নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি কোন সমাজের যে কী চেহারা সে হিসাব কিতাব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ফোর্ড সাহেবের সঙ্গে একই কাতারে লেনিনকে ছাঁচে ঢালা মানুষ তৈরির এলাহি কাণ্ডের কারবারী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে নির্গলিত অভিপ্রায়ের তিমির প্রবাহে কিংবা আদিম সূর্য জ্বালার বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ব্যক্তিচরিত্রের বিরোধিতাই করেছিলেন। অপরদিকে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রসমূহই নতুনভাবে শিল্পরূপে প্রাণ পেয়েছে। এর কারণ পরে আসবে।

জার্মানির অতিজাতীয়তাবাদী নাৎসীরা যে ডি. এইচ. লরেন্সের উপন্যাসে গোষ্ঠীরক্তবাদের বিশ্ববীক্ষার গন্ধ পেয়ে উল্লসিত হয়েছিল, সেটা অকারণে ঘটেনি। আবার এও সত্য যে, ফ্রয়েডকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল নাৎসীদের উৎপাতের সম্ভাবনায়।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রভাব শুধু এ ধরনের স্ব-বিরোধিতাতেই সীমিত থাকে নি। আবর্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। কোন কথাই যেন এক ছাঁচে ঢেলে বলা সম্ভব নয়। বর্তমান শতাব্দীর গদ্য-মহাকাব্যপন্থী দুজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন স্টাইনবেক তাঁর 'গ্রেপস অব র‍্যাথ' উপন্যাসে আকাশচুম্বী সৌধসঙ্কুল আমেরিকার হতভাগ্য গৃহহীন ভিটাহীন সর্বহারাদের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন মহাকাব্যিক পদ্ধতিতে। এ উপন্যাসের নরনারী-চরিত্রাবলি তাদের দেহাবয়ব ও অভিপ্রায়ের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। এদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও জীবিকা, আশ্রয়, অন্ন ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত জগতে পৌঁছবার জন্যে এক শকট-যাত্রার যোগফলে শরিক হয়েছে এরা। এটা হচ্ছে তিরিশের দশকে ডলারের দেশের নীচতলার বাস্তব জীবনের কাহিনী। একটা পরিবারের চরিত্রচিত্রাবলি গভীর দরদ দিয়ে আঁকা। ফ্রান্সের কয়লার খনির শ্রমিকদের সংগ্রামী জীবন নিয়ে লেখা জোলার "জার্মিন্যাল" উপন্যাসের ধাঁচে গড়া এই চরিত্রাবলি।

স্টাইনবেকের বেশ কয়েকটি উপন্যাস আছে উনিশ শতকীয় চিরায়তিক উপন্যাসের শিল্পরূপের ছাঁচে ঢালা। যেমন 'সোনার পেয়ালা' প্রভৃতি। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস "উইণ্টার অব আওয়ার ডিস্‌কটেণ্ট"কে মনে হয় উনিশ শতকীয় বিয়োগান্ত উপন্যাসের এক দৃষ্টান্তমূলক লেখা, যার নিদারুণ পরিণতিতে পৌঁছবার জন্য তিনি সমস্ত বইর ঘটনাবলিকে স্তবকে স্তবকে সাজিয়েছেন। ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফাটকাবাজারীর দুর্নীতি যে কি নিদারুণ ব্যাপার এবং এর পাল্লায় পড়ে এবং বিত্তশালী

হবার তাগিদে নায়ককে শেষ পর্যন্ত কিভাবে আত্মহত্যা করতে হলো, তার কার্যকারণ সম্পর্কে বিবরণে কোথাও অস্পষ্টতা রাখেন নি স্টাইনবেক।

তবু মাঝখানে পা রাখতে পারেন নি স্টাইনবেক বাস্তব জগতের শক্ত মাটিতে নিজের শিল্পী জীবনে।

অথবা পা রাখাটা প্রয়োজন মনে করেন নি? মনোময় শিল্পরূপ-সৃষ্টির তাড়নায় কিংবা 'প্রেরণায়'?

আধুনিক মনস্তত্ত্বের সংস্পর্শে আধুনিক উপন্যাসের শিল্পরূপে যে নিরবয়ব আনবিক মনের প্রবৃত্তিগত লীলাখেলার ছবি আঁকা হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষ করে স্টাইনবেকের 'প্রদীপ্ত দাহ" (Burning bright) গল্প গ্রন্থে। তাঁর লেখা উপন্যাসেও এর ছাপ পড়ে। কোন দৃষ্টিভঙ্গিটির প্রভাব পড়েছে, তা বুঝবার জন্যে "প্রদীপ্ত দাহ" গ্রন্থের একটি মন্তব্য কাজে আসতে পারে। মন্তব্যটি এই : উন্মোচিত করো গোপন কথা। তাহলে হয়তো তুমি দেখবে, তুমি তোমার গোপন গুহায় একাকী নও। আমি আমার নিজের অন্ধকার সত্তায় ইঁদুরের মতো গর্ত করতে শিখেছি। বন্ধু এড, আমি জানি, যে কোন স্থানেই হোক না কেন যে কোন কালে যে কোন লোকের পক্ষেই এটা সম্ভব। সে কৃষাণ হোক কিংবা নাবিক হোক, কিংবা হোক সে কালাতীত মুখাবয়বহীন ব্যক্তি–এটা করা সম্ভব সকলের পক্ষেই। আমার মতোই হয়তো এদের সবাইকার নিঃসঙ্গতায় বন্দী রয়েছে গোপন কথা। আমাদের এই বিশৃঙ্খলাটাকে বাইরের আলোবাতাসে বার করে আনার সময় এসে গেছে।

জগৎ ও জীবনের সদাপ্রসারমান ক্ষেত্রে নরনারীর যে সংগ্রামী সক্রিয়তা গদ্য-মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পরূপে উন্মোচিত ও বিকশিত করেছে, তার বাহির ও ভিতরকে দ্বন্দ্ব-মিলনময় বিকাশের মধ্যে সম্পর্কিত করে গভীরভাবে বুঝবার জন্য যে চেষ্টা স্টাইনবেক তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে করেছেন, সেখানে উপরোক্ত গুহায়িত নৈর্ব্যক্তিক জৈব মনোদৃষ্টির প্রভাব পড়তে পড়তে এক সময় একটি সমগ্র উপন্যাসকেই সংক্রামিত করে বসেছিল। এই উপন্যাসের নাম "দ্বিধান্বিত সংগ্রাম" (The Dubious Battle)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গাছের ফলও একটা ছোট খাট 'বৃহৎ শিল্প'। এই শিল্পের ঠিকামজুরদের অনিশ্চিত জীবন আর বাঁচার লড়াইকে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের প্রস্তুতি এবং সে প্রস্তুতির টানা পোড়েন নিয়ে লেখা এই উপন্যাসকে এক দিক দিয়ে 'গ্রেপস অব র‍্যাথ' উপন্যাসেরই "চাঁদের উল্টো পিঠ" বলে মনে হয়। তবু তফাৎ এই যে, ঔপন্যাসিক এখানে যে শুধু সংগ্রামের সাফল্য সম্বন্ধেই সংশয় করে একটা ধোঁয়াটে ভাব সৃষ্টি করেছেন তা-ই নয়, উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রকেই তিনি মনোময় চরিত্রে পরিণত করতে চেয়েছেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, বিভিন্ন নরনারী, ঘটনা-পরিক্রমায় যতটা নিজেদের প্রকাশ করেছে, তার চেয়ে বেশি নিজেদের অপ্রকাশিত রেখেছে। জন স্টাইনবেক সম্বন্ধে সমস্যাটা বোধ হয় আসলে এই যে তিনি যত না গোপন কথা বার করে এনেছেন, সে অনুপাতে গোপনতার জটিলতার জালে জড়িয়ে গিয়েছেন বেশি, যদিও 'গ্রেপস অব র‍্যাথ" উপন্যাসের অন্যতম চরিত্রের মতো তাঁর আত্মার ছটফটানি খাঁচার মধ্যে অস্থির পাখীর অবিশ্রান্ত ডানা ঝাপটানোর মতোই শোনা যায় এখানেও।

এখানে আলোচ্য স্ববিরোধিতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, জার্মানির টমাস মান। পূর্বেই বলা হয়েছে, টমাস মান অবিশ্রান্তভাবে উপন্যাস লিখেছেন এবং তার উপন্যাসের মূল ধারা গদ্য-মহাকাব্যধর্মী। বাস্তব জগৎ ও জীবনের অতি মনোময় চিত্র দাখিল না করে নিরলসভাবে তাদের সর্বরূপ ফুটিয়ে তুলবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই তিনি মূলত অবলম্বন করেছেন। তিনি যত না অভিপ্রায়ী তার চেয়ে বেশি বিষয়ী। প্রথম যৌবনে লেখা 'বুডেন ব্রুক" নামক বৃহৎ উপন্যাস উক্ত নামীয় পরিবারের আখ্যানের মধ্যে একটি বৃক্ষের বহু দিকে বহুধা প্রসারিত শাখাসমূহের মতো। বিচিত্র অভিপ্রায় সম্পন্ন চরিত্রাবলির বিভিন্ন মানসের সুস্পষ্ট আলেখ্যাবলির ধারা টমাস মানের পরবর্তী প্রায় সব লেখাতেই উপন্যাসের মৌলিক শিল্পরূপকে অবিরত প্রসারিত করে এসেছে। তাঁরই অন্যতম উপন্যাস 'ম্যাজিক মাউন্টেন"বা 'যাদুর পাহাড়' বিশ শতকেও মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের শিল্পরূপে শক্তিকে উদঘাটিত করেছে। শুধু মানুষের সামাজিক পরিবেশই নয়, ব্যক্তিক পরিবেশই "বুডেন ব্রুক" এর মতো "ম্যাজিক মাউন্টেন" উপন্যাসে জঙ্গম জীবনের উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। 'বুডেন ব্রুক' সমুদ্রের তরঙ্গ রাশিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে চরিত্রাবলিতে। 'ম্যাজিক মাউন্টেন' পর্বতপুঞ্জের নিরাসক্তিকে ব্যবহার করেছে চরিত্রাবলির বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতাকে হাবেভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে। তাছাড়া 'বুডেন ব্রুক' উপন্যাসে উনিশ শতকের জার্মান সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের আলোকচিত্র আছে। বিশ শতকের জন্মযন্ত্রণার অধ্যায়ের আলোকচিত্রটি আছে 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' উপন্যাসে। যেহেতু টমাস মান কুড়িতে পড়তে না পড়তেই 'বুডেন ব্রুক' লিখেছিলেন, সে জন্য একটা বিস্ময় সূচক প্রশ্নই তাঁর বইটি সম্বন্ধে করা হয়ে থাকে। এরকম একটা মহাকাব্যিক কাহিনীর অভিজ্ঞতা তিনি পেলেন কোথা থেকে? কোন কোন মতে তাঁর লোকোত্তর জন্মগত সত্যদৃষ্টি দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু 'ম্যাজিক ম্যাউন্টেন' লেখার ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা হয়নি। 'ম্যাজিক মাউন্টেন' উপন্যাসে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার যে ছবির পর ছবি আছে, সে ছবি আঁকবার জন্য টমাস মনো চিকিৎসাশাস্ত্রের আগাগোড়া অধ্যয়ন করছিলেন।

কিন্তু এমন যে টমাস মান, তিনিও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের শতাব্দীর সন্তান হিসেবে প্রকারান্তরে নৈর্ব্যক্তিক ও কূলহীন ও অনাবৃত মনঃস্রোতের দিকটাকে কোন কোন সময়ে প্রাধান্য দিয়ে বসেছেন। টমাস মানের ভাষায় 'একাল হচ্ছে মসস্তত্ত্ব প্রভাবিত কাল'।

শিল্পীর জীবনের শেষের দিকে লেখা 'লিয়া ও র‍্যাকেল' উপন্যাসের নায়ক জেকবের মনঃস্রোতের তোড়ে মহাকাব্যোচিত চরিত্রের হীরক-ঋজু আবরণ মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ে খসে গিয়েছে জন্মমৃত্যু মিথুনের অতলস্পর্শী নৈর্ব্যক্তিক কলস্রোতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ : জেকব ভাবছে "এক নারীর দেহ ঠিক আরেক নারীর দেহেরই অনুরূপ। ভালবাসার পক্ষে, মাতৃত্বের পক্ষে উপযুক্ত এ দেহ। শুধু মুখাবয়বেই এক জনকে আরেক জনের কাছ থেকে পৃথক করে এবং আমরা একজনকে বাদ দিয়ে আরেক জনকে নির্বাচিত করি তার মুখাবয়ব দেখে। কিন্তু জীবন্ত ভাবাবলিতে অঙ্কিত মুখ হচ্ছে দিনের বেলার জিনিস। যে রাত্রি সত্যকে জানে, তার কাছে এই মুখাবয়ব অর্থহীন।"

টমাস মান অবশ্য চেতনাস্রোতের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিলেও তাঁর মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে স্বীকৃত হননি। তাঁর উপন্যাসে চিরায়তিকতার প্রভাব অনেক বেশি রয়ে গিয়েছে। 'ভেনিসে মৃত্যু' নামক ক্ষুদে উপন্যাসটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নিজে সামলে গেলেও তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি নিছক মনোময় উপন্যাস লেখার এক ধরনের বিশ শতক ধারাকে উৎসাহিত করেছে, যাকে মনোবাস্তবতাবাদী বা সুররিয়ালিস্ট বলা হয়ে থাকে। সুররিয়ালিস্টরা বর্ণনার দায়িত্বকেও অর্থাৎ লেখার কাজটাকেও ছেড়ে দিয়েছেন মনঃস্রোতের স্বতঃগামিতায়। ঔপন্যাসিক নিজে নয়, চরিত্রাবলি নয়, বর্ণনাকে যে পর্যায় থেকে পর্যায়ে টেনে নিয়ে চলেছে, সে হচ্ছে সদাচলমান এবং অন্তরের গুহা থেকে গুহায় ধাবমান অন্তরাত্মা (psyche)। এই স্বয়ং চিত্রকার অন্তরাত্মার ফষ্টি নষ্টি থেকে শুরু করে বৃহৎ ও মহৎ কর্মধারা নিয়েই গড়া সুররিয়ালিস্ট কাহিনী কাণ্ড। সুররিয়লিস্টরা প্রবর্তন করেছে 'অটোমেটিক' বা ভুতুড়ে লেখার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ফ্রান্সে একদল লেখক আঁদ্রে ব্রেঁতর নেতৃত্বে এই ভুতুড়ে লেখাকে চূড়ান্তে নিয়ে পৌঁছান।

'বনফুল' লিখিত 'নঞ তৎপুরুষ' নামক উপন্যাসে এ ভাবের অটোমেটিক বর্ণনার একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বনফুল বা বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা গত তিনশত বছরের বিশ্ব উপন্যাসের শিল্পকলাগত গতিপরিণতির এক ঝাঁক নমুনা স্বরূপ। সব লেখা না উত্‌রালেও এবং অধিকাংশই 'মডেল' বা নমুনা হলেও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাকে বুঝবার পক্ষে বনফুলের লেখা সহায়ক। সুররিয়ালিস্ট পদ্ধতিকে বুঝবার জন্যে বনফুলের দু-একটা লেখার সাহায্য নেওয়া যায়।

ফ্রান্সের প্রখ্যাত কবি ও নটশিল্পী জাঁ কক্‌তো (Jean Cocteau) তাঁর উপন্যাসে এই ধরনের ভুতুড়ে লেখার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র মানবিক মনোজগৎটাকে তার আবরণের কুয়াশার নীচে গিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

জাঁ কক্‌তো তাঁর 'Les Enfants Terribles' নামে উপন্যাসে কৈশোর-জীবনের ছবিগুলিকে এমনভাবে এঁকেছেন যে মনে হয়, তাঁকে ভূতে পেয়েছে এবং সেইভাবেই তিনি ছেলেবেলার আজগুবি ধ্যানধারণাগুলিকে নিয়ে একটা মায়া জগৎ সৃষ্টি করে বসেছেন। কক্‌তো'র উপন্যাসটি খুব ছোট। প্রুস্তের স্মৃতি স্বপ্নময়তা কক্‌তোর মনঃসমীক্ষার কাছে সহজ সরল বাস্তব কাহিনী বলে মনে হয়। লেখকের কিশোর মনের তাড়নাগুলি অল্প পরিসরের কারণে এত বেশি তীব্র হয়, বইটি পড়তে গেলে রীতিমত জ্বালাবোধ করতে হয়।

ককতো শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মনঃসমীক্ষার পদ্ধতিতে লেখা 'আফিম' বইতে উপরোক্ত উপন্যাস সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে অর্থবহ। মন্তব্যটি হচ্ছে এই : Les Enfants Terrbles লেখা হয়েছিল 'শোবোট' (গীতি নাট্য) থেকে সত্য বলে ধরে নেওয়া ভাবের ঘোরের চাপে। যারা এই উপন্যাসটাকে পছন্দ করবে তারা একটা শোবোটের রেকর্ড যেন কিনে নেয় এবং রেকর্ডটা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটা পড়ে যায়। যারা মনে করবে যে উপন্যাসটা তাদের ভালই লেগেছে তারা

বলবে, 'শেষের কয়েকটা পৃষ্ঠা বাদ দিলে না কেন।' ব্যাপারটা এই যে, শেষের পৃষ্ঠাগুলি নিজেরাই নিজেদের লিখেছিল। কথাটা বরং এইভাবে বলা যেতে পারে যে, লেখাটা হয়েছিল আমার মাথায়।'

অবশ্য কক্‌তো কবিতা, নাটক এবং ছায়াছবি থেকে শুরু করে সর্বত্র এই নতুনের পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং তাঁর উপন্যাসকে এ ধরনের পরীক্ষায় 'বাঘের উপর টাক' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই ধরনের যে সব উপন্যাসে স্ববিরোধিতার অবকাশ রয়েছে, তাদের শিল্পীরা স্ববিরোধিতা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন অনেক সময়। উপন্যাসশিল্পের চিরায়তিক গুণনীয়ক এই প্রয়াসে কোথাও আলোকস্তম্ভের মতো, কোথাও ফসফরাসের মতো জ্যোতিষ্ক হয়ে রয়েছে। ঝড় সৃষ্টি করেছে অনিশ্চয়তার; জাহাজ ডুবির। আবার মেঘের ফাঁকে দেখা গিয়েছে ধ্রুবতারা কিংবা অন্ধকার রাত্রির কোলে ঊষার আলোকচ্ছটা।

কিন্তু আবার এমন ধারাও বেরিয়ে এসেছে স্ববিরোধিতার ধারাতে আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও উপন্যাস শিল্পের সংঘাত থেকে, যেখানে চিরায়তিক সাধারণ গুণনীয়ক সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এখানে মানবিকতার রেণুগুলিকেও ছেঁকে বার করে ফেলে দেয়া হয়েছে। তথাকথিত নরনারী নামক আদিম জন্তুটার গায়ে আর তিলমাত্র আবরণ থাকেনি। চরিত্র কোন্ উপাদানকে উপস্থিত করবে?

এগারো
নব জন্ম যন্ত্রণা

একালের জাতীয় মহাকাব্যপন্থী মার্কিন ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্‌ট তাঁর 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' নামক নিবন্ধ গ্রন্থে অতি আধুনিক মনস্তত্ত্বে প্রভাবিত ধারায় লেখা আধুনিক এক ধরনের উপন্যাসকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় 'বিকার' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এ গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় ১৯৫৭-৫৮ সালের পরে সমগ্রভাবে অবশ্য বিতর্কমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের কিছু পরে লেখা তার উপরোক্ত নিবন্ধ পুস্তকে সোভিয়েট সাহিত্যকে বাস্তববাদী সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রতিভূ বলে অভিহিত করলেও ১৯৫৭-৫৮ সালে 'নগ্ন দেবতা' নামক নিবন্ধ পুস্তকে সোভিয়েট সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের সুপারিশ করেছেন। এ অবস্থায় 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' গ্রন্থে সমকালীন মার্কিন উপন্যাস সম্পর্কে যে অভিমত তিনি দিয়েছিলেন, তার যৌক্তিকতাকে নিজেই আলগা করে দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে নতুন কোন মতও তিনি দেননি। কাজেই আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক মার্কিন উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তাঁর নামেই উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সে দিনের বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ ছিল কিনা, সে কথা বক্তব্য পেশ করলেই বুঝতে পারা যাবে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করে রাখা দরকার যে, হাওয়ার্ড ফাস্‌ট তাঁর 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' গ্রন্থটি উৎসর্গীত করেছিলেন ক্রিস্টফার

কডওয়েলের নামে। যে কোন দিক দিয়ে দেখা যাক, 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত হালকাভাবে লিপিবদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের উপন্যাসের বিকৃতির কার্যকারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হাওয়ার্ড ফাস্‌ট 'সমসাময়িক মার্কিন গল্প সংগ্রহ' নামক একটি গল্পসংকলনের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর আগে তিনি অবশ্য চেক-জার্মান ঔপন্যাসিক ফ্রান্‌জ কাফ্‌কার 'কায়াবদল' (Metamorphosis) নামক বড় গল্পের একটি মার্কিনী তর্জমাকে বিকৃতির ব্যাপারে অত্যুৎসাহের নির্দশন হিসাবে পেশ করে নিয়েছেন।

গল্প সংগ্রহের লেখাগুলি সম্বন্ধে হাওয়ার্ড ফাসটের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেকটি লেখারই মূলসূত্র হচ্ছে এক এক ব্যক্তির অন্তরাত্মার এক একটা বীভৎস তাড়না বা উদ্ভট ও উৎকট স্নায়বিক আতিশয্য। অর্থাৎ গল্পের বর্ণিত ব্যক্তির ভঙ্গুর মানবিক আবরণের নীচে রয়েছে নরপশু এবং রয়েছে সেইসব আদিম পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহের হুঙ্কার ও আর্তনাদ যেগুলি চরিত্রবিনাশী। চরিত্র বলতে এখানে বুঝাতে চাইছি ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ মানবীয় গুণাবলি। চরিত্রের অর্থ কয়েকটি নৈতিক বিধানের যোগফল নয়। হাওয়ার্ড ফাস্‌ট আধুনিক মনস্তত্ত্ব তথা ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের প্রয়োগকে উপরোক্ত বিকৃতির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। একেবারে মূল কারণ অবশ্য 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' গ্রন্থের লেখকের মতে ধনিকতন্ত্র।

ফ্রয়েডিয় তত্ত্বকে উল্লেখিত বিকৃতির কারণ বলতে গিয়ে যে দ্রুত সিদ্ধান্তে আমরা স্বভাবতই চলে যেতে পারি, সেটা বোধ হয় এই যে, নরনারীর জীবনকে এই সব গল্পে একটি মাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি হচ্ছে যৌনতাড়না। ফ্রয়েড বলতেই সাধারণত যৌনতাড়না বোঝায়। ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর উপন্যাসে যে যৌন-জীবন উদঘাটিত করেছেন, সেখানেই তিনি ফ্রয়েড পন্থী এটাই সাধারণ ধারণা। প্রশ্নটা এখানে এসে ঠেকেছে এই ভাবে যে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব, যে বিকারকে প্রশ্রয় দিয়েছে, সেটা যৌনবিকার। ফাস্‌ট যেসব উপন্যাসকে বিকৃত বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলির মধ্যে যৌন তাড়না বিকৃতির অন্যতম অভিব্যক্তি। কিন্তু হাওয়ার্ড ফাস্‌ট অতি সঙ্গত কারণেই নরনারীর স্বাভাবিক যৌনজীবনকে বিকৃতির কারণ না বলে এতদ্‌সম্পর্কিত তাড়না-সহ অন্যান্য পাশবিক তাড়না এবং উৎপাতকেও বিকৃতির আশ্রয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অতি-আর্ত মনোভাবকেও চিহ্নিত করেছেন বিকৃতি বলে। হাওয়ার্ড ফাস্‌ট্ একজন সচেতন মহাকাব্যপন্থী ঔপন্যাসিক এবং নরনারীর জীবন শিল্পী হিসেবে যৌনজীবনকে তাঁর আলেখ্যের মধ্যে বিশেষভাবে এঁকেছেন তাঁর 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসে। একদিকে যেমন এই যৌনজীবন শোষক-শাসক-চরিত্র চিত্রণে জীবনকে খর্ব করার বিকৃত তাড়নায় রূপ নিয়েছে, তেমনি এই যৌনজীবন বিদ্রোহী চরিত্র চিত্রণে জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তোলারও রূপ নিয়েছে। তাছাড়া, হাওয়ার্ড ফাস্‌ট নিশ্চয় সমগ্র উপন্যাস-শিল্পের বিচারে বসে যৌনজীবনের ব্যাপারে নীতিবাগীশের ভূমিকা নিতে পারেননি। নীতিবাগীশ হওয়াটা মানব-নরনারীর পরিপূর্ণ জীবনের শিল্পী হওয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক, অস্বাভাবিক। উপন্যাসে যৌনজীবন অনির্বচনীয় (Sublime) অথবা হাস্যকর (Ridiculous) এই দুই ভাবেই চিত্রিত হয়ে

আসছে স্বাভাবিক (Natural) মূলধারার চিত্রাবলির পাশাপাশি। সবসময় সামঞ্জস্য সাধন করেনি এরা। এই কারণে, কোন কোন শিল্পীর কোন কোন উপন্যাসকে অথবা কোন কোন শিল্পীকেই মনে হয়েছে যৌনজীবন চিত্রণে বেহিসাবী। হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' উপন্যাস একদিকে দাসমুক্তি সংগ্রামের মহাকাব্য বিশেষ হলেও সেখানে তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় কিছুটা বেশি ঝোঁক দেখা দিয়েছে যৌনজীবনের আবরণ উন্মোচনে। কিন্তু আসলে হাওয়ার্ড ফাস্টের অন্যান্য উপন্যাসের নায়ক নায়িকার এদিক দিয়ে কিছুটা কাঠ কাঠ ভাব আছে, যেটা ঔপন্যাসিকের পক্ষে এক ধরনের অপরিণতি। সুতরাং হাওয়ার্ড ফাস্টের যে বক্তব্য তাঁর সমসাময়িক মার্কিন উপন্যাসের বিকৃতির প্রতিবাদ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে, তার তাৎপর্যকে সঠিক পরিমাপে সামনে রাখা দরকার বিকৃতির মূল পটভূমিতে।

বিকৃত মনস্তাত্ত্বিকতা-জাত উপন্যাস রচয়িতাদের সম্বন্ধে রালফ্ ফক্স যে সব মন্তব্য করেছেন তাঁর 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে, তার একটি তুলে নিয়ে হাওয়ার্ড ফাসটের বক্তব্যের তাৎপর্যকে যাঁচাই করা যেতে পারে। রালফ ফক্স বলেছেন, 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের প্রাথমিক ভ্রান্তিকে আধুনিক ঔপন্যাসিক সঠিক বলে গ্রহণ করে বসেন এবং উন্মাদ ও রুগ্নদের মধ্যেই তাঁর কল্পনার ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। কোন আশার ছবি থাকেনা তাঁর সামনে, কিংবা আশার ভিত্তি খুঁজে বার করার মত সাহস থাকেনা তাঁর।'

কথাটাকে এখানে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্যে বলা যেতে পারে যে, মনস্তত্ত্ব একটি বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে এবং এই বিজ্ঞান যেমন সত্যসন্ধী ও সত্যের উদ্ঘাটনকারী, তেমনি এই পদক্ষেপগুলি সত্যের দিগন্তে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। এই কারণে লঘুগুরু ধরনের বিভিন্ন ভ্রান্তি মনস্তত্ত্বে ঘটতে পারে। ঘটনার কারণও আছে এবং সেটা এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী ধনিকতন্ত্র বিজ্ঞানকে তার পরম্পরাগত সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছাতে দিতে নারাজ হয়েছে শতাব্দীর শুরুতেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বাস্তব সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে। একদল মনস্তত্ত্ববিদকে ধামাধরায় পরিণত করার জন্যেও ধনিকতন্ত্র চেষ্টা করেছে, উৎসাহিত করেছে মনস্তত্ত্ববিদের ছোট বড় ভ্রান্তিকে। এই ভ্রান্তিগুলি মূলত ধনতান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণুতা প্রসূত। সুতরাং উন্মাদ ও রুগ্নকে স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করার দিকে এর ঝোঁক, এর পরিকল্পনাও। হাওয়ার্ড ফাস্ট যে ফ্রয়েডিয় প্রবৃত্তির তাড়না বলতে বিকৃত যৌনতাড়নাসহ ক্ষয়িষ্ণুর এই নৈরাশ্যকেই সাধারণত বুঝাতে চেয়েছেন, সেকথা তাঁর 'কাফকার কায়াবাদল' গল্পের অবতারণা দিয়েই বুঝতে পারা যায়। কাফকার এই গল্পটি যাই হোক, যৌন তাড়নার গল্প নয়। এটি একটি উদ্ভট নৈরাশ্যজনক চিন্তার গল্প। এক জার্মান সওদাগরী কারবারীর ক্যানভাসার সকাল বেলায় বুকচাপা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখলো যে, সে 'আরসুলা' হয়ে গিয়েছে। এরপরে দরিদ্র পরিবারের গলগ্রহ হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের ঘরটিতে আবদ্ধ জীবনের তিমিরাচ্ছন্ন বাকী দিনগুলির কাহিনী হলো তার মনভাঙ্গা মনঃস্রোতের কাহিনী–শতধাবিদীর্ণ মনোমুকুরে বাবা, মা ও বোনের মমতা ও অন্তরাত্মার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কাহিনী।

যে মার্কিনীরা কাফকার এই গল্পটির তরজমা প্রকাশ করে নিজেদের অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের ঢাক পিটাতে চেয়েছে, তাদের লেখা উপন্যাস, গল্প কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাওয়ার্ড ফাস্টকে এক সময়ে এত বেশি উত্যক্ত করেছিল যে, তিনি কাফকার উদ্ভট গল্পের মাঝে মাঝে এবং শেষ লাইনে যে অপূর্ব মানবীয় মাধুর্যের জ্যোতিবর্ণ লেখা রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্যই করেননি। সে যাই হোক, কাফকা সম্বন্ধে পরে সামগ্রিক ধারণা করার সময় কাফকার শিল্পরূপকে সামনে আনা যাবে। এখন মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির প্রশ্নে হাওয়ার্ড ফাসটের বক্তব্য বুঝতে পেরে আমরা আমাদের বক্তব্যের উদঘাটনে এগিয়ে যেতে পারি।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের একধরনের সংস্পর্শ অথবা ধনিকতন্ত্রের পতনের যুগের ক্ষয় ও দেউলিয়াত্ব উপন্যাসের শিল্পরূপে যে ভাঙ্গনের (Disintegration) রাসায়নিক উপাদান হিসেবে উৎপাত ঘটিয়েছে, সামগ্রিক জীবনে যে অসংলগ্নতা এনেছে, সে সম্বন্ধে রালফ ফক্‌স ও কডওয়েলের দেশের প্রগতিবাদী অধ্যাপক আর্নল্ড কেটলের বক্তব্যটি জেনে রাখা যাক এখানে।

অধ্যাপক কেটল ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর 'ইংরেজি উপন্যাস প্রবেশিকা' নামক গ্রন্থে বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের ইংরেজি উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শিল্পী ও গ্রহীতার 'বিচ্ছেদের প্রশ্নটির' আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকতার একটা নেতিবাচক ভূমিকাকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। বক্তব্যটি চুম্বকাকারে বলতে গেলে নিম্নরূপ :

(১) 'বিশ শতকের উপন্যাসের বিকাশের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং কোন কোন দিক দিয়ে উদ্বেগজনক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'উত্তম' এবং 'জনপ্রিয়' লেখার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ। এক দিকে বুদ্ধিপ্রধান বিচারকরা যেসব উপন্যাসকে প্রশংসা করেছেন এবং মূল্য দিয়েছেন তাদের অধিকাংশেরই পাঠকপাঠিকা নেই জনতার মধ্যে। (স্কট কিংবা ডিকেন্সের যুগে এ অবস্থা ছিল না)। অপর দিকে মধ্যম মান বা মধ্যম ধরনের বুদ্ধি প্রবণ বিপুল জনপ্রিয় বই অথবা জনতার অধিকাংশের জন্যে পাইকারীভাবে তৈরি বই বুদ্ধিপ্রধানদের তাচ্ছিল্যই কুড়িয়েছে। বুদ্ধিপ্রধানরা এসব বই পড়েন না। এই পরিস্থিতির ফলাফল এর কারণগুলির মতোই বহুসংখ্যক। সাহিত্যের বাণিজ্যীকরণের দরুন শুধু যে জনসাধরনের বই পড়ার মান সাধারণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তাই নয়। ফল হয়েছে এই যে, উত্তম লেখক লেখিকারা ক্রমেই নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ক্ষণস্থায়ী নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন তারিফকারীর উপকারার্থে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাঁদের ক্রিয়াকলাপকে নিবদ্ধ রেখেছেন। এর উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হয়েছে এই যে, উত্তম সাহিত্য বলতে লক্ষ লক্ষ পাঠকপাঠিকা দুর্জ্ঞেয়তা, কৃত্রিমতা ও উঁচুকপালী বুদ্ধিপ্রধানতা এবং সামাজিক দিক দিয়ে ভ্রান্ত উচ্চমন্যতাকেই বোঝে। (এই বিবেচনা একেবারে অন্যায় নয়।) অপর দিকে চিন্তাশীল লেখক-লেখিকাদের কাছে জনপ্রিয়তা আর বিবেচনাযোগ্য বিষয় নেই। জনপ্রিয়তার কথা শুনলে তাঁরা বরং নাক সিঁটকান। জনপ্রিয়তা কথাটা তাদের কাছে সন্দেহাত্মক।

(২) এইভাবে যে কোন ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবার ফলে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজে জন্মের দরুনই হোক অথবা এই সমাজের

অভ্যাসগুলিকে আয়ত করার ফলেই হোক, বুদ্ধিপ্রধান লেখক লেখিকারা আরও বেশি আচ্ছন্নতা ও তীব্রতা নিয়ে তাঁদের একহারা এবং সাধারণভাবে পুরোপুরি অপ্রতিনিধি স্থানীয় ভাবনার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবিষ্ক্রিয়ায় নিয়োজিত করেছেন নিজেদের। ফ্রয়েডিয় এবং যুংগীয় মনস্তত্ত্বের বক্তব্যগুলি এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছে। ডস্টয়েভস্কি ও প্রুস্তের লেখাগুলি কিংবা কাফকার উল্লেখযোগ্য হলেও বিকারাত্মক সাহিত্য কীর্তি এই উৎসাহের যোগানদার। সমসাময়িক সমাজে শিল্পী বুদ্ধিজীবীর বিচ্ছিন্নতাবোধ চূড়ান্তে পৌঁছেছে কাফকার লেখায়। এখানে নিদারুণ দুঃস্বপ্নই বাস্তবতা নামে অভিহিত হয়েছে এবং ব্যক্তিসত্তা এমন এক জগতের ফাঁকে আটকে পড়েছে যেখানে পরিবেশ শুধু তার বৈরিতা করেই ক্ষান্ত থাকছে না, সামান্য মানবিক ক্রিয়াকলাপকেও আচ্ছন্ন করে রাখছে। নৈরাশ্যবাদ, স্নায়ুবিক বিকার এবং হতাশ্বাস চিন্তাশীল লেখার অধিকাংশের মধ্যেই স্বীকৃত মনোভাব হিসেবে সক্রিয় রয়েছে।

(৩) এই যুগের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল এবং যুদ্ধোত্তর প্রথম কয়েক বৎসরের) সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের, তথা কনরাড, লরেন্স এবং জেমস জয়েস প্রভৃতির লেখাতেও উপকরণের সঙ্গে ঊপন্যাসিকের বোঝাপড়া করার ব্যাপারটা একটা অসম সংগ্রাম। এই লেখকদের মধ্যে একজনও অনুগতচিত্তে সেই সমাজের অবক্ষয়-মূলক দিকগুলিকে মেনে নেননি, যে সমাজে তাঁদের জন্ম। কিন্তু এঁদের মধ্যে একজনও এমন একটা জীবনদর্শনে উপনীত হতে পারেননি, যেখানে সুবিধাজনক কোন শিল্পরূপের অবস্থান থেকে বিষয়বস্তু তথা জগতকে মনের সাধ মিটিয়ে আয়ত্তে আনা যেতে পারতো। এই কারণেই সমস্ত রকম চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও এঁদের লেখাতে রয়েছে স্নায়বিক চাপাচাপির ভাব—আশ্বাস ও আরাম বোধের অভাব। (ফিল্ডিং কিংবা টলস্টয়ের মধ্যে আরাম বোধ ছিল)। কনরাড, লরেন্স কিংবা জয়েসের লেখার মধ্যে রয়েছে সুস্থ মানবিকতার সীমানা ডিঙ্গিয়ে মানসিক কুহক, অশ্লীলতা কিংবা মূর্ছার মধ্যে গিয়ে পড়ার অপরিমিত, তীব্র আর অবিরাম প্রবণতা।'

অধ্যাপক কেটল আমাদের, উপন্যাস শিল্পের বিকাশের এবং নব জন্মযন্ত্রণার স্ববিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই সমস্যার সমাধান কোথায়? সমাধানের পথরেখা কিভাবে অঙ্কিত করে নিতে হবে? কিভাবে অঙ্কিত হয়েছে?

বারো
নব বাস্তববাদের তাগিদ

ইতিবাচক ধারার মানচিত্রকে চোখের সামনে আনতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, উপন্যাসশিল্পে মনস্তত্ত্বের সঠিক স্থান ও মূল্য-নির্ণয় দুচার কথার মধ্যে সেরে রাখার ব্যাপার নয়। এর কারণ, উপন্যাস বহির্বাস্তবে প্রসারিত হলেও মানবাত্মারই বিহার কাহিনী। আর আধুনিক মনস্তত্ত্ব মনোকেন্দ্রিক হলেও বাস্তবের দ্বন্দ্বমিলনাত্মক অগ্রগতির ফলস্বরূপ। অনুভূতি প্রবণতা ও মনোকেন্দ্রিকতার সামগ্রিক গতিপরিণতির মধ্যে

বহির্বাস্তব ও মানবাত্মার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল নির্ণয় করতে গিয়ে কোন শেষকথা কিংবা শেষ কথার আগের কথা চিরকালের জন্যে উচ্চারণ করা সম্ভব কি?

মনস্তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে উপন্যাসের শিল্পরূপের বিচারে এযাবৎ সংকট ও ভাঙ্গনই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। সংকট মোচন ও সংকোচন ফল্গু ধারা হয়ে রয়েছে শতাব্দীর মধ্যাহ্নেও।

অথচ, উপন্যাস শিল্পের মৌলিকতাই হলো তার ক্রমান্বিত ব্যাপ্তি এবং গ্রহণ ক্ষমতা। উপন্যাসের গ্রহণ ক্ষমতার এই ব্যাপ্তি মৃত্যুর বীজকেও গিলে বসতে কসুর করে নি।

রালফ্ ফকসের 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে এই ব্যাপ্তি ও ভাঙ্গনের গতিধারার কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে রালফ্ ফকসের দীর্ঘ বক্তব্যটি হুবহু পেশ করা যাক :

'(১) উপন্যাসের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ফিল্ডিং সব সময়েই উপন্যাসের মহাকাব্যিক ও ঐতিহাসিক সারসত্তার ওপর জোর দিতেন। ফিল্ডিং জোর দিয়ে বলেছিলেন, কর্মের মধ্যে না দেখালে মানুষকে পুরোপুরি দেখানো যায় না।

'টম জোন্স' উপন্যাসের প্রারম্ভিক একটি অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'ঔপন্যাসিক বিবরণ-সংগ্রহকারী মাত্র নন; তিনি একজন ইতিহাস-প্রণেতা, তাই তাঁর কাজ এবং সংবাদপত্রের কাজ এক নয়। সংবাদপত্রের শব্দসংখ্যার রদবদল হয় না। তাতে উল্লেখযোগ্য খবর থাক আর না থাক। উপন্যাসশিল্পকে কিন্তু বিবরণ সংগ্রহ করার বদলে এমন সব লেখকের লেখার ধারা আয়ত্ত করতে হয় যারা দেশদেশান্তরের বিপ্লব-প্রবাহকে ভাষা দিয়েছেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিককে অবহিত হতে হয় পরিবর্তন সম্বন্ধে, সংকট ও সংঘাত সম্বন্ধে। ঔপন্যাসিকের শুধু ঘটনা বর্ণনা কিংবা মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে অবহিত হলেই চলে না।'

ফিল্ডিং আরেকটি অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকের ভূমিকাকে আরও বেশি নির্দিষ্ট করেছেন :

যেমন, 'আমাদের আয়ত্তাধীন ও জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তাদের সবাইকার মর্মস্থলে প্রবেশ করার এবং অন্তর্নিহিত পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতায় রাখতে হবে ঔপন্যাসিককে।' এজন্য যে গুণের প্রয়োজন, ফিল্ডিং তাকে 'উদ্ভাবন এবং বিচার' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে নিয়েছেন যে, উদ্ভাবন বলতে শুধু ঘটনা ও পরিস্থিতি তৈরির ক্ষমতা বুঝায় না। 'উদ্ভাবন' ব্যাপারটা আবিষ্কার অথবা সন্ধানের চাইতে বেশি কিছু। কোন বিষয়ের ব্যাপক ব্যাখ্যা দেওয়া এবং আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে সমস্ত সত্যসত্তার মধ্যে বিচক্ষণতার সঙ্গে দ্রুত প্রবেশ করতে পারাই হচ্ছে এর অর্থ। আমার মনে হয়, উদ্ভাবন আর বিচার বিশ্লেষণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; কোন দুটি বস্তুর পার্থক্য বিচার না করে তাদের সত্তা আবিষ্কার করা অসম্ভব।'

(২) উপরোক্ত উদ্ধৃতির অর্থটি সুন্দর সন্দেহ নেই। উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে এরকম সুন্দর ও অর্থময় উক্তি কদাচিৎ পাওয়া গেছে। ফিল্ডিং'এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, জ্ঞান হলো সাচ্চা ঔপন্যাসিক ও ইতিহাসবিদের গুণাবলির অন্যতম। ফিল্ডিং

মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর শিক্ষাগুরু মহাকাব্য রচয়িতা হোমার এবং মিলটন তাঁদের সমসাময়িক সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উপন্যাসিকের আর একটি গুণ হলো, সমস্ত স্তরের এবং ধরনের লোকের মধ্যে সর্বজনীন হওয়ার ক্ষমতা।

আজ যখন কোন ঔপন্যাসিক শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে ফিল্ডিং-এর মতামত গ্রহণ করবেন, তখন আমরা পাব একটা নতুন বাস্তববাদকে। হ্যাঁ তাই। 'নতুন' বাস্তববাদ। বর্তমানের বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য দেখতে পাবার ক্ষমতা এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে এক হয়ে মিশে যাবার ক্ষমতা ফিল্ডিং অথবা ডিকেন্সের উপন্যাসের নিছক পুনঃপ্রবর্তনের ফলে জন্মাবে না। আজকের মৌলিক পার্থক্যের ভিতর প্রবেশের অর্থ হলো সেই সব অন্তর্দ্বন্দ্বকে উদ্‌ঘাটিত করা, যা কাজ করছে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের চালকশক্তি হিসেবে। এই সব অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন মানবচরিত্রের অভ্যন্তরীণ অর্ন্তদ্বন্দ্ব, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এরা মানবীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বাহ্যিক অন্তর্দ্বও বটে। ফিল্ডিং-এর আমলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, তা যে কতখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সে কথা না বুঝলে আমরা আজ সমস্ত মানুষের মধ্যে এক হয়ে মিশে যেতে পারবো না।

(৩) একথা নিঃসন্দেহ যে, আধুনিক মনস্তত্ত্ব মানব-স্বভাব সম্পর্কে এবং বিশেষ করে মানব মনের গভীরতর ও অবচেতন উপাদানসমূহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু একথার অর্থ মুহূর্তের জন্যেও এটা হতে পারে না যে তথ্যাবলি নিজে থেকেই মানুষের যাবতীয় কর্মধারা কিংবা চিন্তা ও আবেগের ব্যাখ্যা দেবে। ফ্রয়েড, হেভলক এলিস কিংবা প্যাভলভের গবেষণাসমূহও মনস্তাত্ত্বিকের উপর নিজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার জন্যে ঔপন্যাসিককে বাধ্য করতে পারে না। ইডিপাসের মানসিক অপরাধবোধ বা উচাটনতা (Oedipus Complex) অথবা মনঃসমীক্ষার জন্য যে কোন ধরনের বিকৃতির বিরাট ঘটা দেখিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা নিছক মনোভিত্তিক যুক্তির উপর মানুষী চিন্তার প্রক্রিয়া অথবা মানবাত্মার রূপান্তর ব্যাখা করবেন, একথাটাকে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। ফ্রয়েড-প্রদত্ত মনোজীবনের নিছক জৈব ব্যাখ্যা দিয়ে কিংবা প্যাভলভ ও অন্যান্য প্রতিফলন-ক্রিয়াতাত্ত্বিকের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সাহায্যে, ফিল্ডিং প্রদত্ত সূত্রে ব্যক্তির মধ্যেকার 'বিপ্লব' সমেত মানুষের চিত্রাঙ্কন অথবা উদ্ভাবনের মধ্যে মানবীয় ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ সম্ভব নয়।

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা যে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, এটা নিঃসন্দেহ। যে ঔপন্যাসিক এঁদের অবদানকে উপেক্ষা করেন, তিনি যেমন অজ্ঞ তেমনি মূর্খ প্রমাণিত হবেন। কিন্তু এই সব মনস্তত্ত্ববিদ ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে সামাজিক ব্যক্তি রূপে দেখতে পারেননি। এঁরা জীবন সম্পর্কে সে মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গীরই ভিত্তি জুগিয়েছেন, যার প্রভাবে শিল্পকলার লক্ষ্য প্রুস্ত এবং জয়েসের লেখায় মানবীয় ব্যক্তির রূপদানে নিবদ্ধ না হয়ে মানবীয ব্যক্তিকে বিশ্লিষ্ট করেছে।'

'রালফ ফকসের উপরোক্ত কথার সূত্র ধরে অগ্রসর হতে গেলে স্বভাবতই যে প্রশ্নটি তীব্র হয়ে জবাবের দাবীদার হবে সেটি এই যে, মন সম্বন্ধে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে গ্রহণ করে নরনারী-চরিত্রাবলির বিকাশ তথা উপন্যাসের বৈপ্লবিক

প্রসারশীল শিল্পরূপ আবার কোন্ পদ্ধতি নিয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে? নব বাস্তববাদের পথ কোনটি?

তের

ছিঁড়ে যাওয়া মালা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে একটি প্রস্তাব এসেছে এই যে, অতীতের ছিন্ন সূত্রকে জোড়া দিয়ে উপন্যাসের ছিঁড়ে যাওয়া মালা আবার গেঁথে নেওয়া যেতে পারে। এজন্য অবশ্য যেতে হবে শতাধিক বছর পিছনে। আমরা সেখানে পাব ফ্রান্সের স্তাঁদালকে। আজকের যে উপন্যাসে গত কয়েক শত বছরের গতিপরিণতির বিভিন্নমুখী শক্তির সামগ্রিক ও দ্বান্দ্বিক-মিলনাত্মক যোগফল সম্বৃত হলে তা প্রবল প্রাণবেগ নিয়ে বিপর্যয় অতিক্রম করে সম্মুখে নবতর জীবনের ছাড়পত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তার ভিত্পত্তন করেছিলেন বলে যে শিল্পীর নাম করা হয়েছে, সেই স্তাঁদাল (Stendahl) জন্মেছিলেন ১৭৮৩ সালে; মৃত্যু হয়েছিল তাঁর ১৮৪২ সালে।

পাস্তেরনাকের লেখা ডা: জিভাগো উপন্যাসের এক জায়গায় লিও টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' এবং ডিকেন্সের 'দুই নগরীর গল্প' উপন্যাসের সঙ্গে স্তাঁদালের 'লাল এবং কালো' বইখানি বারবার পড়ার উল্লেখ রয়েছে। তবে এই উল্লেখ নিতান্তই ইঙ্গিত।

১৯৫০ সালে হাওয়ার্ড ক্লিউয়িস নামে আমাদের কাছে প্রায় অজানা একজন লেখক স্তাঁদালের যে শিল্পীজীবনী প্রকাশ করেছেন, তাতে যেন উনিশ শতকের শিল্পী ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে বসেছেন।

ক্লিউয়িস তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন :

'আজকের উপন্যাস বস্তুত শুরু হয়েছে স্তাঁদাল থেকেই। তিনিই হলেন সেই প্রথম প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক যিনি দেহত্বকের নীচে প্রবেশ করে মানুষের মন-সজ্জায় মানবীয় আচরণের উৎস সন্ধান করেছেন। আর এই কারণে পরবর্তী উপন্যাস-সাহিত্য কম বেশি তাঁরই অঙ্কিত পথে চলতে বাধ্য হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এবং বিশশতকের প্রথমার্ধের সেই ধরনের ইউরোপীয় এবং রুশ লেখকের সংখ্যা বেশি নয় যাঁরা স্তাঁদালের ঋণ স্বীকার করেননি। বালজাক, গ্যেটে, টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি, টুর্গেনিভ, জোলা এবং আরো অনেকে স্বীকার করেছেন এই ঋণ। তাঁরা যে স্তাঁদালের উপন্যাসের পুনঃপ্রকাশে (উনিশ শতকের শেষে) লাভবান হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আমাদের একথাও জানা আছে যে, স্তাঁদালের 'ল্যামিয়েল' উপন্যাসের অধুনা প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা লেখক আঁদ্রে জীদ স্তাঁদালের প্রভাব স্বীকার করেছেন। স্তাঁদাল যে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছিলেন এবং ব্যাপকভাবে দেশদেশান্তর দেখে বেড়িয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করার জো নেই। একদিক থেকে তাঁর লেখার একটা বিশেষ ঐতিহাসিকতা রয়েছে। তবে স্তাঁদাল তাঁর সমসাময়িক কালকে কিংবা অন্যান্য যাবতীয় বস্তুকে যন্ত্রণার্ত চোখ দিয়ে ছাড়া কখনো

দেখেননি। তিনি যখনই কাগজে কলম ছুঁইয়েছেন তখনই নিজের অন্তরের ক্ষতকে নিরাবরণ করে দিয়েছেন।'

ক্লিউয়িস এভাবেই এক জায়গায় লিখেছেন : 'স্তাঁদাল নিরন্তর আত্মব্যবচ্ছেদ করে গিয়েছেন!' শেষোক্ত মন্তব্য দ্বারা ক্লিউয়িস একথাও বোঝাতে চেয়েছেন যে, আধুনিক যে 'নর্দমাবাদীরা' উপন্যাসকে তাদের ক্ষতপ্রদর্শনের জায়গা করে তুলেছেন, স্তাঁদাল তাঁদের স্বগোত্র।

এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, রালফ, ফক্স তাঁর 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে স্তাঁদালের উপন্যাসকে উনিশ শতকের মহীয়ান উপন্যাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুতরাং প্রশ্ন এই যে, আধুনিক 'মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ' এবং স্তাঁদালের মনঃসমীক্ষা কি একই বৃন্তের ফুল? অথবা স্তাঁদালের লেখাই আজকের উপন্যাসের উনিশ শতকের বৃন্ত? ইতিপূর্বেকার দ্বন্দ্বাত্মক উপাদানসমূহকে স্তাঁদাল তাঁর উপন্যাসে সত্যই কি সম্বৃত করতে পেরেছিলেন?

কী এ প্রশ্নের জবাব? কীই বা জবাবের তাৎপর্য?

এক এক করে দেখা যাক;

(১) ক্লিউয়িস লিখেছেন :

'কোন একটি অনুভূতি প্রবণ লোকের জীবনে যেসব আবেগ সঞ্চারিত হয়, তাদের রূপ ও মাত্রা যেরকমই হোকনা কেন, সেগুলির প্রত্যেকটির সত্য নির্ণয় করার জন্যে এবং এই সব আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার বশে মানুষ যে সব কাজ করে সেগুলির রূপ নির্ণয় করার জন্যে স্তঁদাল সংকল্পবদ্ধ ছিলেন? তবে আত্ম-অধ্যয়নেই প্রত্যাশা তাঁর বেশি ছিল এবং নিজেকেই তিনি দেখিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠতমভাবে, গভীরতমভাবে, নিরাসক্ত ও স্থির দৃষ্টিতে। তাঁর যেন তৃতীয় নয়ন উদ্ভিন্ন হয়েছিল। এ চোখ ছিল সদা উন্মুক্ত, আত্মরাত্মায় সদা নিবদ্ধ। একবার এই তৃতীয় নয়ন লাভের পরে তিনি আর নিজেকে এর কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। ইচ্ছা করলেও তিনি আর তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের অভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন না। এ অভ্যাস তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক আনন্দ উপভোগকে মাটি করে দিয়েছিলো। ... স্তাঁদাল 'মনোনিবদ্ধ'কে প্রত্যক্ষ বাস্তবের মতো বিশ্লেষণ করেছিলেন। ... স্তাঁদালের এটা স্থির বিশ্বাস ছিল যে, যদি তিনি তাঁর নিজের ভিতরে গভীরে পৌঁছতে পারেন, তাহলে সেখানে এমন এক সত্যকার আশ্বাসকে পাওয়া যাবে যা একাধারে আবেগসম্মত ও যুক্তিসম্মত, যা তর্কে টিকে থাকতে পারে, প্রাণবন্ত করে। এই ধারণা নিয়েই স্তাঁদাল নিজের গড়া আলো-আঁধারিতে অতিবাহিত করে যান তাঁর জীবন। আত্মসত্তার গভীর থেকে গভীরতর মর্মে প্রবেশ করতে থাকেন তিনি; কিন্তু যা কিছু খুঁড়ে বার করেন তাই দেখা যায় মুখোশ মাত্র। মুখোশ সরালে অতল গহ্বর। কিন্তু অতল গহ্বরটা অযৌক্তিক ব্যাপার। এজন্য স্তাঁদাল শেষ পর্যন্ত রচনা করেন নাস্তিক্যবাদের ভূমিপৃষ্ঠ।'

ক্লিউয়িসের উপরোক্ত বক্তব্যের পটভূমিতে স্তাঁদালের 'লাল এবং কালো' উপন্যাসের অসুখী বিবাহিত নায়িকার প্রেমাকৃষ্ট অবিবাহিত যুব-নায়কের চিন্তাধারার

সঙ্গে জেম্‌স জয়েসের 'যুবক শিল্পীর আলেখ্য' উপন্যাসের নায়ক স্টীফেনের চিন্তার তুলনা করার কথা মনে জাগে। স্টীফেন তার বন্ধুকে এক জায়গায় বলেছে : 'আত্মার জন্ম ধীর ও তিমিরাবৃত্ত; দেহের জন্মের চাইতে এই জন্ম অনেক বেশি রহস্যময়। এদেশে যখন মানুষের আত্মার জন্ম হয়, তখন সে যাতে উধাও না হতে পারে সেজন্যে তার উপর জালের পর জাল ছোঁড়া হয়। তুমি আমাকে জাতি, ভাষা আর ধর্মের কথা শোনাও। আমি চেষ্টা করবো এসব জাল টপ্‌কে পালিয়ে যেতে।'

অনুভূতি প্রবণ যুবা-মনের পরীক্ষাগারিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্তাঁদালের মতোই জয়েস নিজের যন্ত্রণার্ত চিন্তাধারার মীমাংসায় পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন।

তবে স্তাঁদাল গণ্ডুষে পান করেছিলেন নরকের নদী বৈতরণীকে, প্রবেশ করেছিলেন তিনি তাঁর মানবসত্তা নিয়ে নরকে। তাই বলে পাপস্মৃতির রোমন্থনে জয়েসের মতো ব্যাপৃত হন নি তিনি। স্মৃতির জালের মধ্যে আবদ্ধ হবার লোক ছিলেন না তিনি। স্তাঁদালের লেখার বিশেষত্ব এই যে, তাতে বিকৃতির মধ্যে সদা-অগ্রসর সদা-নবমুখিতা সত্ত্বেও দৃঢ় হাতে সামঞ্জস্যই চিত্রিত হয়েছে ঘটনাবলির সুদৃঢ় রেখায়। তাঁর উপন্যাসের মৌলিক শিল্পরূপের সূক্ষ্মতম তারগুলি মানব মনের বিবরে সর্পিল অন্ধকারে প্রবেশ করেও ছিঁড়েখুঁড়ে যায়নি।

ক্লিউয়িস স্তাঁদালের উপন্যাসের মতো দেখতে পেয়েছেন মানবাত্মার গহীন অন্ধকারে স্থানগুলির চিত্রমালা, দেখা পেয়েছেন আক্ষেপ ও উত্তেজনার, যা থেকে বুঝতে পারা যায় গ্রন্থকারের বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু করে নিংড়ে তৈরি হচ্ছে এক একটি বই। দেখতে পেয়েছেন তিনি মানুষের কার্যকলাপের বিস্তারকে, দেখতে পেয়েছেন তিনি মানুষের চিন্তার বিস্তারকে, দেখতে পেয়েছেন অবাধ্য স্বাধীন কল্পনাকে। ক্লিউয়িস লিখেছেন:

'স্তাঁদালের লাল এবং কালো' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। স্তাঁদাল জানতেন যে, শাসনতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের মনের যে সম্পর্ক, শাসনতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক তার চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাসনতান্ত্রিক বিষয় গুরুভোজনের শেষে লঘু আলাপের খোরাক সত্য, কিন্তু মানুষের আবেগকে জাগ্রত করার ব্যাপারেও শাসনতান্ত্রিক বিষয় কম উৎসাহ জোগায় না। স্তাঁদালের উপন্যাসের সমস্ত নরনারী-চরিত্রেরই এক একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মত রয়েছে এবং প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যে নিয়োজিত। কিন্তু স্তাঁদাল যেহেতু ঔপন্যাসিক, সেজন্যে কাহিনীর সূত্র ধরে তার উপসংহারে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি যে, রাজনৈতিক সংঘাতও যে কোন অবস্থাতেই চরিত্রাবলি এবং চরিত্র সঞ্জাত কার্যকলাপের নিজস্ব ব্যাপার। জটিলতাপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে—ধর্মসংস্থা ও রাষ্ট্র, উদারপন্থা ও রাষ্ট্র, উদারপন্থা ও আভিজাত্য এবং প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ব্যক্তির ভবিষ্যত এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে জড়িত যে, আমরা সব সময়ে এদের সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। যেসব নরনারী তাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে গভীরভাবে জাগ্রত এবং আপনাপন ভূমিকায় ব্যাপৃত, আমরা শুধু তাদেরই কাহিনী পড়ে যাই। আজকালকার রাজনৈতিক উপন্যাস পড়ে যে ক্লান্তি আসে, স্তাঁদালের উপন্যাস পড়লে সে ক্লান্তি আসে না। স্তাঁদালের উপন্যাস পড়লে তীব্র সমদৃশ্যবোধ জাগে। কাহিনীর বিস্তারেই

আরেকটি নতুন বিস্তার যোগ হয় এবং বাস্তব দ্বিগুণ প্রসারিত হয়ে যায়। আধুনিক উপন্যাস কিন্তু বিপরীত। আধুনিক উপন্যাস সাধারণত একটা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতায় প্রোথিত; এর কাছে বড়জোর এটাই আশা করা যায় যে, মাঝে মাঝে ভদ্র ভাষায় গণতন্ত্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ দ্বারা এবং নানান বিরূপ মন্তব্য দিয়ে এ শূন্যতা পূরণ করা হবে। এ ধরনের রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে চরিত্রাবলি কিংবা গল্পের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, পৃথিবীর দুই মেরুর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক ততটুকু।'

উপরোক্ত ব্যাখ্যা পড়ে স্তাঁদালের উপন্যাস আর টলস্টয়ের উপন্যাস পাশাপাশি মিলিয়ে পড়ার ইচ্ছা জাগে নিশ্চয়। কারণ টলস্টয় বিশেষ করে তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাস লিখেছিলেন নিকট অতীতে না হলেও সম-আত্মিকতার ভিত্তিতে। আর স্তাঁদাল নিজে ছিলেন নেপোলিয়ানের রুশ অভিযাত্রার ঘোড় সওয়ার। স্তাঁদাল সেই অভিযাত্রার কথা লেখেননি, কিন্তু তাঁর ঘরে ফিরে আসতে পারা অভিজ্ঞ হৃদয়টাকে তিনি উন্মোচিত করে দেন তাঁর উপন্যাসে।

(২) কৌতুক বা পরিহাস উপন্যাসের শিল্পরূপের জন্মগত উপাদান। কিন্তু স্তাঁদাল পরিহাসকে নিয়ে পরিহাস করেছিলেন। তিনি কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞায় ধরা দিতে চান নি। তাঁর উপন্যাসমালার পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের স্থবির অংশগুলিকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে নব-নব জীবনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। এ উপন্যাসের শিল্পরূপের ধারা অতি ধীর। কিন্তু হিমালয়ের চিরচঞ্চলা নদীমালার উৎস যে প্রস্তরিত হিমপ্রবাহ, তার মতোই অনিবার্য এর গতি। এর মধ্যেই আবার রয়েছে ভাব-লৌকিকতা (Romanticism) সঞ্চিত, যা মাঝে মাঝে হঠাৎ উপচে পড়ে পাঠকপাঠিকার মনে বাঁধ ভাঙ্গার তাগিদ জোগায়, জোগায় সবুজ স্বপ্ন। ভাবলৌকিকতা দিয়েই তাঁর লেখার শুরু। কিন্তু বাস্তবতায় তাঁর যাত্রা। তার পরেও আবার প্রচ্ছন্ন ভাবলৌকিকতা। যেমন শিমুলফুল–রক্তাভ বিস্তার, কালোফল, সাদা ফসল।

ক্লিউয়িস লিখেছেন:

প্রথমত : 'ভাবলৌকিকতা তার পরবর্তী-পরিণতি যোগাত্মক পর্যায়ে মানবাত্মার এক প্রচণ্ড আলোড়ন ও জটিল অভিব্যক্তির রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। আদিতে এই ভাবলৌকিকতা ছিল পুরোদস্তুর নেতিবাচক এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে তা ছিল অষ্টাদশ শতকের পিচ্ছিল গোঁড়ামি ও বুনিয়াদি তত্ত্বের রক্ষণশীল হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ। স্তাঁদাল গভীর আবেগ নিয়ে এর সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয়ত, 'বিপ্লব, নেপোলিয়নের উত্থান পতন ও সাম্রাজ্য স্থাপন এবং বুরবন বংশীয় রাজতন্ত্রীদের পুনরাভিষেক–একের পর এক কুড়িটা বছরের মধ্যে ফ্রান্সে ঘটে গিয়েছিল। নরকীয় এই বৎসরগুলি। সেদিন রাজতন্ত্রীদের পুনরাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের এখতিয়ার-বহির্গত 'গণতন্ত্র' সম্মত শাসনে সব কিছুই বাসি হয়ে গিয়েছিল। তরুণ বৃদ্ধ সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পকলার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপ্লব চাপা পড়েছিল। ভাবলৌকিকতা তাই দেখা দিয়েছিল শিল্পলোকের রূপে। কিন্তু সেদিন শুধু স্তাঁদালই একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে ভাবলৌকিকতার তাৎপর্য ছিল ব্যাপকার্থ সম্মত।'

তৃতীয়ত, 'শেষ পর্যন্ত ভাবলৌকিকতার পরিণতি দাঁড়ালো নিছক বাগাড়ম্বর। স্তাঁদালের ঘৃণা ধরে গেল। বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ধরনের নিজস্ব পথ। ভাবলৌকিকতার আন্দোলনে যা কিছু ভাল এবং সুস্থ লেগেছিল, স্তাঁদাল সেগুলিকে রেখে আর বাদবাকী সব কিছুকে করলেন পরিত্যাগ।'

(৩) ক্লিউয়িসের ব্যাখ্য আরও এক দিকে আলো ফেলেছে :

'উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে স্তাঁদালের মনে যে সব প্রশ্ন উঠতো, সেগুলি তিনি তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির কিনার দিয়ে লিখে রাখতেন। এই প্রশ্নগুলি দেখে জানা গিয়েছে যে, উপন্যাস ছিল স্তাঁদালের কাছে আংশিকভাবে মানব-প্রকৃতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যম বিশেষ। কিন্তু এতেই আত্মসন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। উপাদান যেমনই হোক না কেন, তাকে শিল্পকলা-সম্মত হতে হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আর এই শিল্পকলা উপন্যাসের শিল্পকলা। এই শিল্পকলাতে ঘটনার প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রবাহের তাগিদ খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে এবং ঘটনার স্রষ্টা হিসেবে দেখা দিয়েছিল চরিত্রাবলির সক্রিয় ভূমিকা। স্তাঁদাল তাঁর তৃতীয় উপন্যাস লুসিয়েন লিউয়েন (Lucien Leuwen) লেখার সময় সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি তাঁর এই গ্রন্থের ব্যাখ্যানকে বিশেষভাবে প্রসারিত করে নেবেন; উদ্দেশ্য, চরিত্রাবলির জীবনের সমারোহ-চিত্রণ। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিনারে তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'ফিল্ডিং একটি কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তা ও কাজের বর্ণনা দিতে পারতেন। বেশ তাই হোক, স্তাঁদালও তাই করবে।'

রাবেলাইস তাঁর সৃষ্টি ছাড়া ইতিকথার রসে ঢেলে যে কোন দশটা লোকের একটা লোককে বেছে নিয়ে তার দেহে 'জগজ্জয়ী' অভিপ্রায় ভরে অতি স্বাভাবিক ও অতিসাধারণের মধ্যে তাকে স্মরণীয় এবং অদ্ভুত চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। ফিল্ডিং এধরনের সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বাদ দিয়ে নরনারী-চরিত্রাবলিকে সাংসারিক জীবনের আলো-আঁধারিতে চিত্রিত করার যে পদ্ধতিকে প্রসারিত করে নিয়েছিলেন, স্তাঁদাল তাঁদের সেই চরিত্রায়নের গুণনীয়কটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন আরও বেশি মানবিকতা নিয়ে। স্তাঁদাল চেয়েছিলেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকার হতে এবং এজন্য তিনি ইংরেজ শিক্ষক রেখে শেকস্‌পীয়র পড়েছিলেন। তিনি যে শেষ পর্যন্ত সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন, সেটা তো উপন্যাস-শিল্পের চরিত্রায়ন-সূত্রকে সচেতনভাবে প্রাধান্য দেবার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। 'লুসিয়েন লিউয়েন' লিখতে বসে স্তাঁদাল অনুভব করেছিলেন 'লাল এবং কালো' লেখার সময় তিনি দর্শন ও রাজনীতির তত্ত্ব নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছিলেন, ফলে তাঁর এ বইটির ঘটনা ধারার সামান্য অংশ ছাড়া আর বাকী প্রায় সবটাই হয়ে পড়েছিল বুদ্ধিভিত্তিক, অগ্রগতি হয়েছিল মানসিক। প্রত্যক্ষ ও বিষয়গত অগ্রগতি প্রায় ঘটেইনি। কোন বিষয়ে ঘটনা কিংবা খুঁটিনাটি ব্যাপার স্থান পায়নি; স্বাভাবিক প্রাত্যহিক অর্থে কোন কাজকর্মেরই জায়গা হয়নি। দিনরাত্রির পরিক্রমা বাদ দিয়ে শুধু সামনে এসেছে নায়ক জুলিয়েন সোরেলের এক সারি সংকট। স্তাঁদালের ইচ্ছা ছিল একটি মানবীয় দলিল দাখিল করার। তার বদলে উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে যায় 'বুদ্ধির বাজীমাৎ-এ'। এক কথায় এ বইতে 'জুলিয়েন তত্ত্ব' পাওয়া গিয়েছে, পাওয়া যায় নি যথেষ্ট জীবন।'

ক্লিউয়িস স্তাঁদালের উপরোক্ত যে উপলব্ধিটিকে সামনে এনেছেন, সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুভূতিটির মধ্যে অবশ্য শিল্পীর অশান্ত মনের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ ক্রিয়া করেছে। স্তাঁদাল নিজের সৃষ্টিকে যতখানি বুদ্ধি নিবন্ধ মনে করেছেন ঠিক ততটা এই কারণেই সঠিক হয়নি। রালফ ফক্স্ তো তাঁর 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে 'জুলিয়েন সোরেল চরিত্রকে ফিল্ডিং'-এর টম জোন্সের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তবে স্তাঁদালের অতৃপ্তি বা আত্ম-অসন্তোষ তাঁকে এমন এক ধরনের উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত করেছে, যা বিশ শতকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসকে তার সংকট মুক্তির পথ দেখাতে পারে। স্তাঁদাল যেমন তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিংড়ে তেমনি ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই আয়ত্ত করেছিলেন তিনি উপন্যাসের শিল্পরূপের সেই সাধারণ গুণনীয়ক বা সূত্রকে যার অভাবে বিশ শতকে পৌঁছে, জয়েসের বিরাট সর্বাত্মক প্রতিভা ও উপন্যাস শিল্পকে অপহ্নবের কিনারে এনে পৌঁছিয়েছে। স্তাঁদালের মনোসমীক্ষা আঁদ্রে জীদের ভাষায় মনোবিকার-সমীক্ষা হলেও তিনি তাঁর লেখাকে সম্বৃত রেখেছেন। তাঁর চূড়ান্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিজ্বালা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রাবলির সংবদ্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়নি, পরিণত করেনি আবর্তনসঙ্কুল তিমিরগর্ভমুখী বাস্তবাত্মিক মনঃস্রোতে; উৎক্ষিপ্ত করে দেয়নি তাকে বিসর্পিত মনোভাবের উচ্ছ্বাসে। তাঁর প্রেম সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক দেহ ব্যবচ্ছেদ তাঁর উপন্যাসের নরনারীর প্রেমকে চরিত্রচ্যুত করে ব্যাকরণের অধ্যায়ে পরিণত করেনি। তাঁর উপন্যাস পড়ে মনে হয়, স্তাঁদালকে সচিব এবং সখা হিসেবে পেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের সাধনায় সেই সামঞ্জস্যের ভিত্তি খুঁজে পেতেন, যা তিনি খুঁজেছিলেন।

সুতরাং স্তাঁদালকে আমরা উনিশ শতকের 'ভবিষ্যতের ঔপন্যাসিক' হিসেবে চিহ্নিত করে নিতে পারি। স্তাঁদালের সমসাময়িক ফরাসি ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোকে এভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, যদিও ভাব-বাস্তবলৌকিক উপন্যাসের অন্যতম পুরোধা হিসেবে 'লা মিজারেবল্' উপন্যাসের রচয়িতা হিউগো উনিশ শতকের অন্যতম বিপ্লবাত্মক প্রতিভূ। ভিক্টর হিউগোর 'দি ম্যান হু লাফ্স্' বা 'হাস্য মুখ লোকটা' নামক উপন্যাস তির্যক ভঙ্গিতে লেখা এবং এ দিক দিয়ে শিল্পরূপে বিশেষ করে ঠেস দিয়ে লেখার শৈলির দিক দিয়ে একটা অনন্য নিদর্শন। স্তাঁদালের লেখা ততখানি হৃদয়গ্রাহি হতে পারেনি যতখানি হওয়ার দরুন হিউগোর উপন্যাস বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও জনপ্রিয়তা হারায়নি। কিন্তু স্তাঁদালের উপন্যাসের একটা বিশেষ মূল্য আছে, সে মূল্য হিউগোর বইতে নেই। স্তাঁদাল ছিলেন সেই শিল্পী যার সৃষ্টিপদ্ধতি বিশ শতকে পৌঁছে উপন্যাসশিল্পকে অধঃপতন বা ভাঙ্গন থেকে তুলে আনার শক্তি নিয়েই জন্মেছিল, বেড়েছিল এবং আজও বেঁচেবর্তে আছে ছাই'এর নিচে আগুনের ফুল্কির মতো।

ক্লিউয়িস-লিখিত স্তাঁদাল জীবনী পড়লে বুঝতে পারা যায়, স্তাঁদালের প্রতিভার উপরোক্ত সম্ভাব্যতা চাপা পড়েছিল তাঁর জীবিত কালে। ১৮৪২ সালে স্তাঁদালের মৃত্যু হয়েছিল ফ্রান্সেই অনেকটা নির্বাসিতের মতো। কবর দেয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র তিন ব্যক্তি। ফরাসি বিপ্লবের সময় (১৭৮৯-৯৫) স্তাঁদাল ছিলেন বালক মাত্র। যৌবনে তিনি হয়েছিলেন নেপোলিয়ানের সহচারী। কিন্তু তিনি লিখতে শুরু করলেন তখন যখন ফরাসি বিপ্লব চাপা পড়েছে, নেপোলিয়ানও নির্বাসিত, এবং রাজদরবারের

পারিষদবর্গের লোলচর্মের উপর চড়েছে আবার মখমলের পোশাক। স্তাঁদালের স্বপ্নযুবারা পারিষদী সমাজের কৃত্রিমতা ও মেকি ধর্মকর্মের ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। অকর্মন্য পরজীবী এবং অলস ইতিহাসের আবর্জনাগুলোকে সামনে তুলে ধরলেন স্তাঁদাল ছদ্মবেশ ছেঁড়ার কাহিনীতে আয়নার মতো। বিপ্লবের পরে ফিরে আসা নিশ্চিন্তমনা পারিষদী সমাজ আয়নাতে নিজেদের চেহারা দেখে হেসে গড়াগড়ি দিল। স্তাঁদালের বহ্নিমান ইউরোপকে তারা ঠাহর করতে পারল না; ঠাহর করতে পারল না ফ্রান্সের অনেভানো অগ্নিকে। তারা কেউ তাঁকে অভিশাপ দিল, কেউবা করলো উপেক্ষা। স্তাঁদালের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বজনমান্য, সেই বালজাকের প্রশংসাপত্র স্তাঁদালকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেনি। তাঁর উপন্যাসকে অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত। বিস্মৃতির সমাধি থেকে বার করে এনে শুরু হয়েছে তাঁর উপন্যাসের ব্যাপক বিচার কয়েক যুগ পরে।

(৪) কিন্তু শুধু মনস্তাত্ত্বিকতায় সম্বৃত শিল্পরূপায়ণই কি স্তাঁদালের উপন্যাসকে আদরণীয় করে তুলতে চলেছে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আরও কিছু আছে, যদিও তা সম্বৃত শিল্পরূপের আওতার মধ্যে পড়ে। স্তাঁদালকে তাঁর জীবনের অবিশ্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কুয়াসামুক্ত রেখেছিল লোক গদ্য। বিশ শতকে স্তাঁদালের লেখাকে উপন্যাসের সংকটমুক্তির সেতু স্বরূপ করবে এই লোকগদ্য? এই লোক গদ্যেই স্তাঁদালীর শিল্পরীতি স্থাপিত।

শিল্পরীতি সম্পর্কে স্তাঁদালের একটি বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য: 'শিল্পরীতি হবে শুধু স্বচ্ছ রং-এর প্রলেপ মাত্র। যারা বই পড়বেন, তারা এর রং-এর প্রলেপটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকবেন। বর্ণনা-পদ্ধতি হবে গাণিতিকভাবে সঠিক বিবৃতি। চরিত্রাবলির মনে এবং জীবনে কী ঘটছে, এই বর্ণনা সে কথা জানাবে।' এ প্রসঙ্গে আরেকটি উক্তিও প্রণিধান যোগ্য। জনৈক সমসাময়িক লেখককে স্তাঁদাল বলেছিলেন, 'আমার কাছে আদর্শ গদ্য হচ্ছে, 'শাসন বিধি' (Civil Code)। প্রতিদিন সকালে লেখা শুরু করার আগে আমি আধঘণ্টা এই শাসন বিধি পড়ি।'

আধুনিক মনস্তত্ত্বের চরিত্র বা মনের আনবিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বা জগতের আনবিকীকরণের দরুন উপন্যাসের শিল্পরূপে দানা বাঁধা রূপটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে উপন্যাসের উপন্যাসত্ব থাকা-না থাকার যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের সূত্র স্তাঁদালের উপন্যাসের উপরোক্ত লোক গদ্য ব্যবহারিকতার মধ্যে রয়েছে।' আধুনিক ফরাসি লেখক জাঁ পল সার্ত্রের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাব, তিনি স্তাঁদালীয় পদ্ধতিটিকে অবলম্বন করেছেন নিজস্ব কায়দায়। মনোময়তার যে কোন রকম ঘোলাটে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে তিনিও নারাজ, সেকথা তাঁর 'সাহিত্য কি'? গ্রন্থে বুঝিয়ে বলেছেন। হয়তো স্তাঁদালীয় পদ্ধতিটি উপন্যাসের অষ্টাদশ শতকীয় চিরায়তিক ধারা ছাড়া অন্য কিছু নয়। স্তাঁদালের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এর জোরদার সংজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন।

'ভারত যাত্রা' (Passage to India) উপন্যাসের লেখক ই. এম. ফরস্টার উপমহাদেশের অধ্যায় ঐতিহ্যকে পটভূমি করে তাঁর পরিচিত মণ্ডলের কয়েকজন ইংরেজ নরনারীর মানস সরোবরের উর্মিমালাকে চিত্রিত করেছেন; ঘটনার চেয়েও

মনের মধ্যে ঘটনার প্রতিফলন বা ঘাত প্রতিঘাতও তোলপাড়ের ছবি আঁকার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। তবু উপন্যাসের রূপ-বিচার করতে গিয়ে তিনিও গদ্যের স্বচ্ছতার উপরেই জোর দিয়েছেন। স্তাঁদালের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, ফরস্টার তাঁর বক্তব্য বলেছেন অতি-সন্তর্পণে।

তাঁর এ রকমের একটি কথাকে মধ্যমণি করে রালফ ফক্স্ লিখেছেন 'উপন্যাস শুধু কথা সাহিত্যের গদ্য নয়। উপন্যাস হচ্ছে মানুষের জীবনের গদ্য কথা। এ হচ্ছে সেই শিল্পকলা যা সর্বপ্রথম সমগ্র মানুষটিকে গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

ই. এম. ফরস্টার বলেছেন, অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, গোপন জীবনকে দৃষ্টিগোচর করার ক্ষমতা উপন্যাসের রয়েছে। এই কারণেই কবিতা, নাটক, ছায়াচিত্র, চিত্রকলা কিংবা সঙ্গীত বাস্তব সম্বন্ধে যে ধারণা দেয়, উপন্যাসের বাস্তবতা তা থেকে আলাদা। কবিতা ও নাটকাদি এমন বাস্তবকে প্রকাশ করতে পারে যেগুলি উপন্যাসের বাইরে। কিন্তু উপন্যাসের মতো এরা কেউ ব্যক্তিগত পুরুষ, নারী এবং শিশুর পরিপূর্ণ জীবনকে সন্তোষজনকভাবে প্রকাশ করতে পারে না।'

বিশ শতকের উপরোক্ত শিল্পরূপ-চেতনা তথা জীবনকে স্বচ্ছ গদ্য কথার মধ্যে ধরার শিল্পরীতিই কি স্তাঁদালকে শতাব্দীকাল পরে সজীব যোগাত্মক শক্তিতে পরিণত করতে যাচ্ছে? উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ফ্লবেয়ার (মাদাম বোভারী'র লেখক) যেহেতু রচনা শৈলী এবং ভাবকল্পনাকে প্রাধান্য দিতে গেলেন তাঁর অধিকাংশ লেখায়, সেজন্যই কি উপন্যাসের সংকটকালে তাঁর রীতিপদ্ধতি সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসেবে আলোচিত হতে যাচ্ছে না?

ক্লিউয়িস অবশ্য কয়েকটি দিক দিয়ে স্তাঁদালের লেখাকেও অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'স্তাঁদালের উপন্যাসে ধর্মপ্রাণতা এবং শিশু জীবনের কোন চিত্র নেই। এ দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বিশেষ করে ধর্মপ্রাণতার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে শিল্পীর মনে যে প্রশ্নই থাকুক না কেন, যেহেতু এটা একটা বাস্তব ঘটনা সে জন্যে এর চিত্রণের অভাব হচ্ছে বাস্তবতার অসম্পূর্ণতা। স্তাঁদালের উপন্যাস হচ্ছে বিশেষ করে বয়স্ক নরনারীরই কাহিনী এবং এ কাহিনীতে দু'একটি মৃত্যুহীন প্রেমের মাধুর্য ছাড়া সবই রূঢ় নির্মল। এ ধরনের লেখা আগাগোড়া পরিহাস দিয়ে মোড়া না থাকলে বর্বরতা দোষে দুষ্ট বলে পরিচিত হতে পারতো।'

ক্লিউয়িসকে ধন্যবাদ যে, তিনি স্তাঁদালীয় রীতিকে উপরোক্তভাবে একই সঙ্গে গ্রহণ ও বর্জনের আওতার মধ্যে রেখে সামনে এনেছেন। বিশ শতকের শিল্পীরা যদি সংকটাপন্ন হয়ে উনিশশতকের এক রূপকারের শরণাপন্নই হন, তাহলে তাঁদের অনুকারী হতে হবে না। অনুকারী হবেন না তাঁরা, কারণ চূড়ান্ত হুশিয়ার হওয়া সত্ত্বেও স্তাঁদাল অসম্পূর্ণ ছিলেন এবং সেকথাটা জানা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের আরেকজন ফরাসি উপন্যাসিকের বক্তব্যও বিবেচনার দাবীদার হয়ে উঠতে পারে। এই ঊপন্যাসিক হচ্ছেন মোপাসাঁ।

চৌদ্দ
মোপাসাঁ যেকথা বলেছিলেন

উনিশ শতকের ফরাসি কথাশিল্পী মোপাসাঁ তাঁর ছোট গল্পে নরনারীর মনের গভীরে যেভাবে প্রবেশ করেছেন, তাতে মনে হতে পারে যে, আধুনিক মনঃসমীক্ষার প্রবর্তকদের তিনি অন্যতম। বিশেষ করে নরনারীর যৌন আচরণের যে সব ছবি তাঁর অনেক গল্পেই তিনি দিয়েছেন, সেগুলি থেকে তাঁকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের পাশাপাশি স্থান দেবার একটা ঝোঁক দেখা দিতে পারে ব্যাখ্যাকার ও পাঠকপাঠিকাদের মনে মনে। স্বভাবতই উপন্যাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে যৌন আচরণকেও মৌল ভিত্তি করে আধুনিক মনঃসমীক্ষার ধারা মোপাসাঁর কাছ থেকে দৃষ্টান্ত স্থানীয় লেখা আদায় করে নিয়েছে, এটা অনেকেই ধারণা করতে পারেন। এ ধারণা করা স্বাভাবিক যে, বিশ শতকের আধুনিকতম মনোবাস্তববাদী উপন্যাসের হোতা হিসেবে চিত্রিত হতে পারেন মোপাসাঁই। পূর্বসূরী স্তাঁদালের চেয়ে মোপাসাঁ বিশ শতকে অনেক অনেক বেশি জনপ্রিয়। ব্যাখ্যাকারদের একটি মহল স্তাঁদালকে খুঁড়ে বার করেছেন আধোবিস্মৃতির পর্দার আড়াল থেকে উপন্যাসের শিল্পরূপের সংকট মুক্তির তাগিদে। অপর দিকে মোপাসাঁ কখনও পর্দার আড়ালে যাননি, বলা চলে। সুতরাং—মোপাসাঁর লেখাকে আঁকড়ে ধরে আধুনিক শিল্পীরা মনঃসমীক্ষার চারিত্রিক আনবিকীকরণ কিংবা মনোময় বাস্তবতার ঘোলাটে ঢলের মধ্যে উপন্যাসের শিল্পরূপের মৌলিক কাঠামোর অবলুপ্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে প্রয়াসী হবেন, এ প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। মোপাসাঁর লেখা উপন্যাস-বিচারে বসলেই দেখা যাবে লোকগদ্য, বাস্তব জগৎ-পরিবেশ এবং মনঃসমীক্ষার একটা স্বতঃস্ফূর্ত সামঞ্জস্য স্বচ্ছন্দভাবে রূপায়িত হয়েছে তাতে।

প্রশ্ন হতে পারে, মোপাসাঁ কিভাবে উনিশ এবং বিশ শতকের উপন্যাসের সেতু হিসেবে কাজ করতে পারেন?

এখানে সমস্যা এই যে, মোপাসাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত শিল্পীদের চোখে তাঁকে কিছুটা খেলো করে রেখেছে। যেসব শিল্পী নতুনকে গড়ার জন্যে পুরানো ছাঁচকে ভাঙবার পক্ষপাতী এবং এই কারণেই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী তত্ত্বের সন্ধানী, তাঁরা মোপাসাঁর লেখাকে 'সুখপাঠ্য কৌতুক মেশানো সৃষ্টি' বলে মনে করেন। হয়তো যখন কথা ওঠে যে, টলস্টয় তাঁর নরনারী জীবনের মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন মোপাসাঁর লেখা পড়েই, তখন আধুনিকতম বিদ্রোহীকেও ভুরু কুচকে ভাবতে হয়, কথাটা ওঠে কি করে? আছে কি কোন যোগসূত্র তাঁর নিজের সমসাময়িক ফরাসি উপন্যাসের অস্থির পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে?

এ প্রশ্নের একটা যোগাত্মক জবাবের জন্যে স্বয়ং মোপাসাঁর শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে এবং সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে গুরুতর ধরনের একটা দলিলের, যেটা মোপাসাঁর নিজের লেখা।

মোপাসাঁ তাঁর পিয়েরে এবং জাঁ (Pierre and Jean) নামক উপন্যাসটি প্রকাশ করার সময় এর সঙ্গে একটি ভূমিকা জুড়ে দেন। ১৮৮৭ সালে লেখা এই ভূমিকাটিতে তাঁর উপরোক্ত 'মনস্তাত্ত্বিক' উপন্যাসটি সম্বন্ধে একটি মাত্র লাইন আছে। বাদবাকী দীর্ঘ ব্যাখ্যায় উপন্যাসের শিল্পরূপের মৌলিক কাঠামোর নবনব পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। একজন প্রথম কাতারের শিল্পীর কাছ থেকে পাওয়া উপন্যাসের গতিপরিণতি সম্বন্ধে এ ধরনের বক্তব্য কেন যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় নি, তার কারণও সম্ভবত এই যে, মোপাসাঁর কাছ থেকে গল্প শোনা যেতে পারে, কিন্তু কোন গভীর এবং সুদূরপ্রসারী তত্ত্ব পাওয়া যাবে না, এ ধারণাটা খুব বেশি রকম প্রবল।

মোপাসাঁর উপরোক্ত লেখাটি উপন্যাসের আধুনিকতম শিল্পরূপ তত্ত্বেও আলোচনার উপাদান পর্যন্ত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য হবে, কোন উপাদান একালের মনে ধরবে, আর কোনটা ধরবে না?

মোপাসাঁ তাঁর যে 'পিয়েরে এবং জাঁ' বইটিতে মনঃসমীক্ষা রয়েছে বলে ধারণা দিতে চেয়েছেন তাঁর ভূমিকার শুরুতেই, তাতে উনিশ শতকীয় বাস্তববাদী উপন্যাসের ধারায় কোন ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়নি, আপাত দৃষ্টিতে একথাই বলা চলে। এই উপন্যাসটি পরিকল্পনা ভিত্তিক বা সূত্র ভিত্তিক। শিল্পীর হাতের পাকানো গুলি-সুতোর মুখটাকে ধরে টানতে শুরু করা মাত্র খুলে যেতে থাকে এর কাহিনীটা। অর্থাৎ শিল্পীর উদ্ভাবিত অথবা নির্দেশিত ধারায় এর কাহিনীর উন্মোচন। এর নরনারী-চরিত্রেরা নিজেরা নিজেদের পথ করে নেয়না ভুতুড়ে মনোবাস্তবতাবাদী পদ্ধতিতে। এরা তৈরি করে নেয়না নিজেদের কাহিনীকে। এক প্রবীণা জননী এবং তার দুই যুবা-বয়েসের ছেলেকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের ঘটনাবলি উদ্‌ঘাটিত। আবর্তের সৃষ্টি হয় ছোট ছেলের অবাঞ্ছিত জন্ম রহস্য নিয়ে। এদিক দিয়ে বিচার করলে, যেখানে জাঁ'র পরিণতি হওয়া উচিত ছিল কোন এক ধরনের শোচনীয় বিপর্যয়ে সেখানে গতানুগতিকভাবে জন্মানো সত্ত্বেও বড় ছেলের ওপর নেমে এল চূড়ান্ত ব্যর্থতার যবনিকা। কাহিনীকারের কলমে সহজ গুণের অঙ্কের মতো এই পরিণতি ধাপে ধাপে এগিয়েছে। প্রত্যেকটি ধাপই সহজবোধ্য। কিন্তু মনস্তত্ত্বিকতার ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে প্রত্যেকটি ধাপের মধ্যে এবং এই কারণেই সাংসারিক হিসেবে যেখানে ছোট ভাই-এর জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারতো, সেখানে বিপর্যস্ত হলো বড় ভাই-এর জীবন। মোপাসাঁ ফ্রান্সের ছোটখাট একটা সমুদ্র-বন্দরের পটভূমিকে সুনিপুণভাবে তাঁর এই উপন্যাসে সাজালেও এবং ঘটনার সূত্রকে সঙ্গতি রেখে হাত থেকে ছাড়লেও বেশি আলো ফেলেছেন বিশেষ করে মা এবং তাঁর দুই ছেলের আলোড়িত মনোজগতে। এই ত্রয়ীর মনোজগতের দ্বন্দ্বাত্মক গতি পরিণতি দেখে পাঠকপাঠিকারা বলতে বাধ্য হন যে, যেভাবে উপন্যাসের শেষ হলো সেভাবে ছাড়া অন্য কোন ধরনের যবনিকা হতো চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার। সুতরাং মোপাসাঁ সঠিকভাবেই তাঁর উপন্যাসটি মনঃসমীক্ষার কাজ বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসের বাস্তববাদী ধারায় এটা নিঃসন্দেহে নতুনত্বও।

কিন্তু মোপাসাঁ যে পরিমাণ ভাঙ্গতে এবং নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, ততটা তিনি কার্যত উপন্যাস লেখার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করতে পারেননি। আলোচ্য

ভূমিকাটিতে দেখা যায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে নতুন ধরনের লেখার তাগিদকে তিনি স্থাপন করেছিলেন বিভিন্ন ব্যতিক্রম-সৃষ্টির মাধ্যমে উপন্যাসের শিল্পরূপের অবিশ্রান্ত বিকাশের অনিবার্য ধারায়। শিল্পীর সৃষ্টির অস্থিরতা তাঁর মনের মধ্যে বিশেষ করে গতানুগতিক ব্যাখ্যাকারদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি করে রেখেছিল। উপন্যাসের বাইরে কথা বলতে পারায় সেই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

মোপাসাঁর বক্তব্যগুলিকে বিক্ষোভ থেকে আলাদা করে চুম্বকাকারে এক এক করে পেশ করা যাক :

(১) মোপাসাঁ প্রথমে লেখকের রূপসৃষ্টির স্বাধীনতার প্রতি স্বীকৃতি দানের জন্যে আহ্বান জানিয়ে নিয়েছেন, বলেছেন, 'সমস্ত লেখকই তা' তিনি ভিক্টর হিউগো হন অথবা এমি জোলা, তাদের ব্যক্তিগত শিল্পরূপ ধারণা অনুসারে কল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ করে তার ফলশ্রুতিকে রচনায় ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ এবং অলঙ্ঘনীয় স্বাধিকার দাবী করে আসছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে জেদ।'

(২) মোপাসাঁ এর পরে দুই ধরনের ঔপন্যাসিকের কথা বলেছেন। প্রথমত তিনি নিছক কুশলী শিল্পীর কথা বলে নিয়ে দ্বিতীয়ত প্রকৃত জীবন-শিল্পীর কথা সামনে এনেছেন। কুশলী শিল্পী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ঔপন্যাসিক অভেদ্য, আপোষহীন এবং অ-মনোরম সত্যকেই শিল্পরূপায়িত করেন এই সত্য থেকে একটি অনন্য এবং আনন্দদায়ক সাহসিক কাহিনীকে (Adventure) নিকষিত করে বার করে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁকে সম্ভাব্যতার দিকে অতিরিক্ত লোভ এড়িয়ে ঘটনাবলিকে নিজ-ইচ্ছা অনুযায়ী বিন্যস্ত করে নিতে হয়। পাঠক-পাঠিকাকে আকৃষ্ট, উত্তেজিত এবং প্রভাবিত করার জন্য ঘটনাবলিকে ছাড়িয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নেন এধরনের ঔপন্যাসিক। তার উপন্যাসের পরিকল্পনাটি হচ্ছে একসারি উদ্ভাবিত সূত্রধারা, যেগুলিকে তিনি মূল বক্তব্যে সুনিপুণভাবে পৌঁছে দেন।' প্রকৃত জীবনশিল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মোপাসাঁ বেশ খানিকটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'অপরদিকে যে ঔপন্যাসিক জীবনে যথাযথ চিত্র দিতে চান, তাঁকে যে কোনরকমের অনন্য ঘটনার বিন্যাসকে পরিহার করতে হয়। আমাদের আনন্দ দেওয়া কিংবা আমাদের অনুভূতিগুলিকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে গল্প বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের চিন্তা করতে এবং ঘটনাবলির রহস্যময় এবং গভীর অর্থকে বুঝতে বাধ্য করা। ... একটি সাহসিক কাহিনীকে সাজিয়ে নিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয় করে রাখার যে পদ্ধতি রয়েছে, সেদিকে না গিয়ে এই দ্বিতীয় ধরনের ঔপন্যাসিক তাঁর পাত্রপাত্রীদের জীবনের কোন একটি পর্যায় থেকে স্বাভাবিকভাবে চলে আসা পরবর্তী পর্যায়গুলিতে পৌঁছে দেন। এই পদ্ধতিতে ঔপন্যাসিক দেখাতে চেষ্টা করেন তাঁর পাত্রপাত্রীদের মনগুলি কিভাবে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, কিংবা কিভাবে তাদের আবেগ ও অনুভূতিগুলির জন্ম হচ্ছে, কিভাবে তারা ভালবাসছে কিংবা ঘৃণা করছে, কিভাবে তারা সমাজের সকল মণ্ডলীতে সংগ্রাম করছে, কিভাবে তাদের সামাজিক স্বার্থ, আর্থিক স্বার্থ, পারিবারিক স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ-সংঘাতে তারা লিপ্ত হচ্ছে। তাঁর পরিকল্পনার কুশলতা আবেগ অনুভূতি জাগানোর ক্ষমতা কিংবা যাদুগরিতায় নিহিত

নয়। সে কুশলতা নিহিত নয় কোন আকর্ষণীয় অবতারণীয় অথবা বিপর্যয়ের চিত্রণে। তাঁর কুশলতা ছোটখাট অচপল ঘটনাগুলির সঙ্গতিসাধনে, যেখানে সর্বশেষ উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তিনশত পৃষ্ঠার একটি বই-এর মধ্যে যদি একটি জীবনের দশ বছরের ছবি তুলে ধরে চারপাশের অন্যান্য মানব মানবীর মধ্যে ব্যক্তি-জীবনের বিশেষত্ব ও বিশেষ অর্থময়তাকে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে ঔপন্যাসিককে তাঁর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে বাদ দেওয়ার কায়দা আয়ত্ত করে নিতে হবে। ঔপন্যাসিককে আয়ত্ত করতে হবে সেই সব ঘটনাকে বিশেষ আলোকে সামনে আনার কৌশল, সেগুলি অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে এবং যেগুলি উপন্যাসটিকে দিতে পারে সামগ্রিকভাবে অর্থময়তা ও মূল্য।'

মোপাসাঁ প্রথমোক্ত উপন্যাসসিককে গতকালের শিল্পী হিসেবে এবং দ্বিতীয়োক্ত ঔপন্যাসিককে আজকের শিল্পী হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথাটা এই : 'গতকালের ঔপন্যাসিক জীবনের সংকট এবং মন ও হৃদয়ের তীব্রতীক্ষ্ণ পর্যায়গুলিরই চিত্রায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আজকের ঔপন্যাসিক লিখছেন হৃদয়, আত্মা এবং বুদ্ধির ইতিহাস যা তাদের স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত।'

(৩) মোপাসাঁ এই দ্বিতীয়োক্ত ধরনের ঔপন্যাসিকের মতে মত দিয়েও বলেছেন, 'এই বাস্তববাদী শিল্পীদের সঙ্গে একমত হয়েও আমরা তাঁদের তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কে ব্রতী হতে এবং এই তত্ত্বের বিরোধিতাও করতে পারি। পুরোপুরি অর্থে এই তত্ত্বটির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সমগ্র সত্য এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই বিবেচ্য নয়।' কিন্তু শিল্পীরা যে অচঞ্চল এবং সাময়িক ঘটনাবলির দর্শনকে তুলে ধরতে চান, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের সম্ভাব্যতার পক্ষ নিয়ে সত্যকে লঙ্ঘন করেও ঘটনাবলিকে সজীব করে তুলতে হবে। কারণ, সত্য কোন কোন সময়ে সম্ভাব্য বলে মনে না-ও হতে পারে।' বাস্তববাদী লেখক যদি শিল্পী হন তবে তিনি আমাদের শুধু জীবনের মামুলি আলোকচিত্র দেখাতে চেষ্টা না করে এমন কিছু উপহার দেবেন যা বাস্তবের চেয়েও বেশি পূর্ণ, বেশি আকর্ষণীয়, বেশি অর্থময় হবে। সবকিছু বলার চেষ্টা করার কোন অর্থই হতে পারে না। আমাদের অস্তিত্বকে যে সীমাহীন তুচ্ছ ঘটনাবলি আকীর্ণ করে রাখে, সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে গেলে প্রতিটি দিনের জন্যেই একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। একটা 'বাছাই' করতেই হবে এবং এই বাছাই হচ্ছে সমগ্র-সত্যের তত্ত্বের ওপর প্রথম আঘাত।'

আলডুস হাক্সলি উপন্যাসের শিল্পরূপে যে সমগ্র সত্যের তাগিদ দিয়েছেন, মোপাসাঁ তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এবং ব্যাখ্যার মারফত সেখানে একটা সীমানা টানতে চেয়েছিলেন। মোপাসাঁর বক্তব্য : "জীবন অধিকন্তু এমন সব জিনিস দিয়ে রচিত যেগুলির মধ্যে অমিলই খুব বেশি। জীবনে রয়েছে এমন অনেক জিনিস যেগুলি চূড়ান্ত রকমের অপ্রত্যাশিত, পরস্পর বিরোধী এবং খাপছাড়া। জীবন নির্মম। এর কোন পারম্পর্য অথবা সংযোগ নেই। জীবন অনির্বচনীয়, অযৌক্তিক এবং পরস্পর বিরোধী বিপর্যয় ভিত্তিক। এই সব কিছুকে 'বিবিধ ঘটনাবলি' নাম দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। এই কারণে শিল্পী যখন আকস্মিকতা ও তুচ্ছতায় ভারাক্রান্ত জীবন থেকে তাঁর

বিষয়বস্তু বেছে নেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বাদবাকী সবকিছুই পরিহার করেন, তখন তাঁকে শুধু বিশেষ ধরনের খুঁটিনাটিগুলিকেই বেছে নিতে হয় যেগুলি তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খায়।' ... এই ধরনের শিল্পকার্যে 'সত্য' হচ্ছে ঘটনাবলির সাধারণ যুক্তিসম্মত গতিধারার অনুসারী একটা সম্পূর্ণ মায়ারূপ। ঘটনাবলি এতে এ ওর গায়ে পড়ে না। আমার এই বক্তব্য থেকে আমি এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারি যে, বাস্তববাদী শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা সেরা তাঁদের উচিত নিজেদের 'মায়ারূপবাদী' নামে অভিহিত করা।"

এখানে মায়ারূপবাদীদের বলতে মোপাসাঁ যা বুঝিয়েছেন, তাতে বিশ শতকের মনোবাস্তববাদীদের একান্ত পছন্দসই কথা বলে ফেলেছেন তিনি। তাঁর এই ব্যাখ্যা এই কারণেও উল্লেখযোগ্য:

'এই বাস্তবতায় বিশ্বাস করা একেবারেই ছেলেমানুষি, কারণ আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের নিজের মনে, শরীরে সত্যের অবস্থান। আমাদের নিজেদের চোখ এবং কান, আস্বাদ এবং ঘ্রাণ এই পৃথিবীতে যতক'টা মানুষ আছে ততটা বিভিন্ন সত্য তৈরি করে নেয়। আমাদের মস্তিষ্কগুলিকে বিভিন্ন শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্নভাবে কবর দেয় এবং এই কারণেই মস্তিষ্কগুলি এমন বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করে কিংবা সিদ্ধান্তগ্রহণ করে যাতে মনে হয়, আমরা বুঝিবা প্রত্যেকেই একেকটা স্বতন্ত্র জাতি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে জগৎ সম্বন্ধে নিজস্ব মায়ারূপ। আমাদের প্রত্যেকের স্বভাব অনুযায়ী এরা কেউ কাব্যিক, কেউ অনুভূতি প্রবণ, উৎফুল্ল, বিষণ্ন, নোংরা কিংবা শোকাচ্ছন্ন। লেখকেরও সামনে তাই একটি মাত্র লক্ষ্য, সে হচ্ছে তাঁর আয়ত্তাধীন ও অতীত শিল্পকলার সমস্ত রকমের বিস্তারণ দ্বারা উপরোক্ত মায়ারূপের নবরূপায়ণ। সৌন্দর্যের মায়রূপ–যা মানুষের উদ্ভাবিত একটি রেওয়াজসিদ্ধ কথা। কুৎসিতের মায়ারূপ-যা হচ্ছে নানা মুনির নানামত। সত্যের মায়ারূপ-যা কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়। বিকারের মায়ারূপ-যা বহুসংখ্যক মনকে আকৃষ্ট করে। সমস্ত মহৎ শিল্পীই হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা অন্যান্য মানবমানবীকে তাদের নিজ নিজ মায়ারূপে দেখতে পারেন।'

(৪) উপরোক্ত বক্তব্য দাখিল করতে গিয়ে মোপাসাঁ কোন বিশেষ একটা তত্ত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কারণ, উপরোক্ত বিচারে যত শিল্পী তত তত্ত্ব বেরিয়ে আসতে পারে। তবু, তিনি ফিরে এসেছেন দুটি প্রধান তত্ত্বে। একটি তত্ত্ব চায় মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস, আরেকটি তত্ত্ব চায় বিষয়াত্মক বাস্তববাদী উপন্যাস। দেখা যাক, মোপাসাঁ এই দুটি তত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেছেন। কিছুটা বিস্তারিতভাবেই উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

"দুটি তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি তত্ত্বকে সমমর্যাদা না দিয়ে একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। একটি তত্ত্ব হচ্ছে বিশুদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসের; আরেকটি তত্ত্ব বিষয়াত্মক উপন্যাসের।

বিশ্লেষণের পক্ষাবলম্বীরা চান যে, সক্রিয়তা কিংবা ঘটনাবলির যে নিজস্ব মর্ম আছে রচনায় তাকে দায়সারা গোছের গুরুত্ব দিয়ে লেখক কোন একজনের মনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইতিবৃত্তকে কিংবা আমাদের প্রত্যেকটি কাজের সমস্ত গোপন অভিপ্রায়গুলিকে প্রকাশ করার ব্যাপারেই আত্মগোপন করুন। ঘটনার মর্মই শুধু লক্ষ্য, পথের দূরত্বের নিশানা, বই লেখার অছিলা। বিশ্লেষণের এই পক্ষাবলম্বীদের মতে,

তাদের অভিপ্রেত লেখা হবে একই সঙ্গে যথাযথ এবং ধ্যানকল্পনাভিত্তিক। এইসব গ্রন্থে কল্পনা পর্যবেক্ষণের মধ্যে একাত্ম হয়ে পড়ে। এসব গ্রন্থ লিখতে হবে সেভাবেই যেভাবে একজন দার্শনিক মনস্তত্ত্বের ওপর সন্দর্ভ রচনা করেন, যেভাবে তিনি কারণের অনুসন্ধান করেন তার দূরতম উৎসে, যেভাবে প্রত্যেকটি আবেগের 'কেন এবং কোথায়'কে বুঝিয়ে বলেন, কিংবা যেভাবে তিনি স্বার্থ প্রবৃত্তি কর্তৃক তাড়িত আত্মার গতিধারার ঘাত প্রতিঘাতের সূত্র খুঁজে বার করেন।

বিষয়াত্মক উপন্যাসের পক্ষাবলম্বীদের লক্ষ্য (বিষয়াত্মক ব্যাপারটা কারও কারও কাছে অনভিপ্রেত) কিন্তু বিপরীত।

জীবনে যা ঘটে তার সব কিছুকে এই বিষয়াত্মিকতার পক্ষপাতীরা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে চান আমাদের কাছে; এরা সযত্নে সমস্ত জটিল ব্যাখ্যাকে অভিপ্রায় সংক্রান্ত সমস্ত অনুসন্ধানকে পরিহার করে শুধু আমাদের চোখের সামনে ব্যক্তিবর্গ ও ঘটনাবলিকে মিছিল করিয়ে নিতে চান। এঁদের মতে, উপন্যাসের মধ্যে মনস্তত্ত্বকে লুকিয়ে রাখতে হবে, কারণ, বাস্তবের মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন ব্যাপারের তলায় মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে। এই ধরনের চিন্তা অনুযায়ী পরিকল্পিত উপন্যাস আকর্ষণীয় হয়; এ উপন্যাসে বেশি গতি, বেশি রং, বেশি জীবন চাঞ্চল্য থাকে। এই কারণেই কাহিনীর কোন পাত্র কিংবা পাত্রীর মনের অবস্থা সম্বন্ধে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেবার পরিবর্তে বিষয়াত্মক উপন্যাসের শিল্পী, কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত পাত্র কিংবা পাত্রীর মনের অবস্থা অনিবার্যভাবে যে সক্রিয়তা অথবা সক্রিয়তার সংকেতে গিয়ে উপনীত হয় সেটাকেই খুঁজে বার করার জন্যে চেষ্টা করেন। ঔপন্যাসিক তাঁর পাত্র কিংবা পাত্রীকে এমন একটি ব্যবহারিকতায় নিয়ে আসেন যে, বই-এর প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার সমস্ত কাজ ও সমস্ত চলাচলই হয় তার অন্তরতম স্বভাবের, তার সমস্ত ইচ্ছা ও ইতস্তত-ভাবের অভিব্যক্তি। এ ধরনের ঔপন্যাসিকরা এইভাবে মনস্তত্ত্বকে ঘটা করে প্রদর্শিত না করে লুকিয়ে রাখেন। তাঁরা মনস্তত্ত্বকে ঠিক সেইভাবেই তাঁদের বই-এর কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করেন যেভাবে অদৃশ্য অস্থিসংকুল কংকাল দেহের কাঠামো হিসেবে কাজে আসে। যে চিত্রশিল্পী আমাদের প্রতিকৃতি আঁকেন, তিনি আমাদের অস্থিগুলিকে মেলে ধরেন না। আমার কাছে এই ধরনের উপন্যাস আন্তরিকতার দিক দিয়েও প্রিয় বলে মনে হয়। প্রথমত, এ উপন্যাস বেশি বিশ্বাসযোগ্য, কারণ, যে সব ব্যক্তিকে আমরা আমাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখি তারা তাদের কাজকর্মের অভিপ্রায়গুলিকে আমাদের কাছে ফাঁস করে দেয় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। আমরা বিভিন্ন নরনারীকে খুব কাছে থেকে দেখে যথাযথভাবে তাদের চরিত্র নির্ধারণ করতে কিংবা যে কোন অবস্থায় তাদের আচরণ কি কিংবা যে কোন অবস্থায় তাদের আচরণ কি রকম হবে তা বলে দিতে পারি। আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারি যে, এই চরিত্র এই অবস্থায় একাজ কিংবা ওকাজ করবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা লোকটির মনের গোপন গতিপরিণতির সমস্ত ধাপ চিনিয়ে দিতে পারি। তার মন আমাদের নিজের মন নয়। আমরা পারি না লোকটির প্রবৃত্তির সমস্ত রহস্যময় অনুনয়কে উদ্‌ঘাটিত করতে। এরা আমাদের নিজেদের মনের ব্যাপার নয়। আমরা

পারি না স্বভাবের সেই সমস্ত মিশ্রিত তাগিদকে নির্দিষ্ট করতে, যেগুলির মধ্যে আমাদের থেকে ভিন্নতরভাবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্নায়ু, রক্ত এবং মাংস বিন্যস্ত।"

মোপাসাঁ যে কিভাবে মনোবাস্তববাদীদের কাছাকাছি পৌঁছে আবার ফিরেছেন অষ্টাদশ উনিশ-শতকীয়-চিরায়তিক উপন্যাসের অগ্রাধিকারে, তার প্রমাণ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেই স্থাপিত। বস্তুতপক্ষে তিনি তার ফরাসি বাস্তববাদী উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং 'মাদাম বোভারী' উপন্যাসের রচয়িতা ফ্লবেয়াবের (Flaubert) সাকরেদ হিসেবে সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন একথা কখনও ভুলতে পারেননি। 'পিয়েরে এবং জাঁ' উপন্যাসের ভূমিকার শেষের দিকে তিনি যা লিখেছেন, তাতে দেখা যায়, জীবনকে চুলচেরাভাবে দেখবার এবং জীবনের বাস্তবের আলোছায়ার ঝিকিমিকি ব্যক্ত করার জন্যে ফরাসি ভাষা থেকে সঠিক শব্দ তুলে নেবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তিনি ফ্লবেয়ারের কাজ থেকে, পাঠশালার বেত্রধর পণ্ডিতের কাছ থেকে শিক্ষানবীশ যেমন ব্যাকরণের সূত্র শিখে নেয় তেমনিভাবেই। অর্থাৎ মোপাসাঁ অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যে শিল্পরূপ আয়ত্ত করেছিলেন, তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার স্থান ছিল না। মনস্তাত্ত্বিকতার দিকে ঝুঁকলেও এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লিখে গতানুগতিক ব্যাখ্যাকারদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার ভাব দেখালেও তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে উপন্যাসের শিল্পরূপের চিরায়তিক ভিত্তিতেই। বড়জোর ফ্লবেয়ার অষ্টাদশ শতকীয় মহাকাব্যিক উপন্যাসের ধারাকে যেভাবে সেঁকরার মতো ঘষা মাজা করেছেন, সেরকমই করেছেন মোপাসাঁ। কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মোপাসাঁ উনিশ শতকে এমন সব কথা বলেছিলেন যেগুলি বিশ শতকের উপন্যাসের জটিলতা নিরসনের কাজে লাগতে পারে এই জন্যে যে, মনস্তত্ত্বিকতার স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিপদ সম্বন্ধে তিনি যেমন শিল্পীদের এবং পাঠক পাঠিকা ও ব্যাখ্যাকারদের সজাগ করেছিলেন, তেমনি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকতা যে একটি নতুন উপাদান হিসেবে উপন্যাসের শিল্পরূপের গতিশীলতাকে রসদ জোগাতে পারে, সে দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। মোপাসাঁর এই ইতিবাচকতা তাঁর একটি বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে বিধৃত রয়েছে :

'যদিও নির্বিশেষে যথার্থতার বিচারে বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, তবু অন্যান্য যে কোন পদ্ধতির মতো এ পদ্ধতিতেও সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের সামনে রয়েছে প্রতীকীয়তা-পন্থীরা (Symbolist)। থাকবে নাই বা কেন? এদের শিল্পকলাগত স্বপ্নের মূল্য আছে। এদের বিশেষ করে আগ্রহোদ্দীপক দিক আছে : এরা শিল্পকলার চূড়ান্ত বিঘ্নকে জানে এবং সে সম্বন্ধে এদের ঘোষণা রয়েছে।'

পনের
বিশ শতকের সঞ্জীবক ত্রিধারা

স্তাঁদাল, মোপাসাঁ কিংবা এই ধরনের আরও অন্যান্য শিল্পীর পুনর্মূল্যায়ন থেকে আমরা উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিকতা জনিত সংকট মুক্তির সূত্র পেতে পারি। কিন্তু তবু শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে কথাটা প্রায় নির্দেশাত্মক সেটা এই যে, এখানে নিছক পুনরাবৃত্তির কোন সৃজনশীল ভূমিকা নেই। বিগত যুগের উপাদান সৃজনাত্মক উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং হবে, কিন্তু নতুন সৃষ্টির উপকরণ এবং সাজসজ্জা এবং বক্তব্য আসবে সমাগত যুগ থেকে। সুতরাং বিশ শতকে যদি উপন্যাসের যোগাত্মক উপাদান গড়ে উঠে না থাকে, তাহলে স্তাঁদাল কিংবা মোপাসাঁ কিংবা ফিল্ডিং-এর উপন্যাসের রাসায়নিক উপাদান যতই না কেন জলজ্যান্ত থাকুক, বিশ শতকের উপন্যাসের ভাঙ্গন ও অবক্ষয় থেকে সেগুলি বাঁচতে পারবে না। সুতরাং দেখতে হবে বিশ শতকের উপন্যাসের যোগাত্মক (Positive) এবং বিপ্লবী দিকগুলিকে।

বিশ শতকের উপন্যাসের শিল্পরূপের যোগাত্মক দিকগুলিকে আমরা নিশ্চয় দেখতে চাইব সেই তেজস্ক্রিয় উপাদানকে যা শুধু যে ফ্রান্সের অথবা বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপন্যাসেই জীবনের জয়গান গেয়েছে তা নয়, আমাদের বাংলা উপন্যাসেও অর্থাৎ আমাদের একেবারে একান্ত ঘরের মধ্যেও সৃজনশীল ও সক্রিয়।

আমরা এমন সব বিপ্লবী সূত্রকে একসঙ্গে পেতে চাই, যেগুলি আমাদের পাশ কাটিয়ে ফেলে চলে যায়নি।

আমাদের এই প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই আমরা রালফ ফক্সের 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থখানি আবার তুলে নিতে পারি। রালফ্ ফক্স্ এদিক দিয়ে যে গভীর আন্তর্জাতিকতার পরিচয় এবং উপাদান দাখিল করে গিয়েছেন, সেজন্যে তাঁর লেখা আগামী দিনের শিল্পরূপসৃষ্টিতেও অনেক জটিলতর গিঁট খুলে দিতে পারবে নিশ্চয়। 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থের মূল্যায়ন বহুদিন ধরে হতে থাকবে।

এখন দেখা যাক, কি কি যোগাত্মক দিককে রালফ্ ফক্স্ উপস্থাপিত করেছেন এই প্রসঙ্গে আমাদের সামনে।

'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থে মূলত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-এর মহাকাব্যিক বাস্তববাদী পদ্ধতির উপরেই উপন্যাসের শিল্পরূপের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই মৌলিকতা দিয়ে রালফ্ ফক্স্ ফরাসি উনিশ শতকের উপন্যাসের যুগান্তকারী সৃষ্টিসমূহকে যাঁচাই করছেন; এরই কষ্টিপাথরে তিনি বালজাক, জোলা, ফ্লবেয়ার প্রমুখ বাস্তববাদী দিকপালের লেখার বিশুদ্ধতা ও খাদ ধরতে চেষ্টা করেছেন। এরই ক্রমাভিব্যক্তি হিসেবে বিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকে তিনি সন্ধান করেছেন নতুন সঞ্জীবককে। এই সঞ্জীবককে পাওয়া যাবে 'উপন্যাস ও জনসাধারণ'

গ্রন্থের 'সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' নামক অধ্যায়ে উল্লেখিত 'ত্রি ধারায়'। এই 'ত্রি ধারা' কি কি ছিল সেদিন? তিনি বলেছিলেন :

(১) এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ (ল্যাটিন) আমেরিকার দেশ-দেশান্তরের জাতীয় মুক্তির অভ্যুদয় সংক্রান্ত উপন্যাস; (২) ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদী বা অতিজাতীয়তাবাদীদের প্রভুত্বস্থাপনের বিরুদ্ধে লোক-অভ্যুদয়মূলক উপন্যাস; (৩) সোভিয়েট উপন্যাস।

এই ত্রিধারার প্রস্তাবক প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের ইউরোপের পারদ-চঞ্চল বাস্তব ও মনোভূমি থেকে উপন্যাস শিল্পের জন্যে বিপ্লবী যোগাত্মক বিকাশের পথ দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। উপরোক্ত ত্রিধারার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন অথবা ব্যাখ্যা তিনি করেননি; তাঁর পক্ষে সে সময়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না প্রধানত ফুরসতের অভাবে। উপন্যাসকে তিনি যে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম আত্মিক অস্ত্র হিসেবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন, সেই জনগণের পক্ষেই স্পেনে গিয়েছিলেন তিনি আন্তর্জাতিক মুক্তিবাহিনীর স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে এবং সেখানে প্রাণ দিয়েছিলেন ফ্যাসিবাদী অতিজাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের যুদ্ধ রণাঙ্গনে। সুতরাং ত্রিধারার খসড়াকে বড় করে লিখবার সময় তিনি পাননি।

সুতরাং এই ত্রিধারাকে ব্যাখ্যা করে সম্প্রসারিত করে নেবার দায়িত্ব রালফ্ ফকসের উত্তরাধিকারীদের ওপরেই বর্তেছে।

রালফ্ ফক্স্ যখন তাঁর ত্রিধারার উল্লেখ করেছিলেন, তখন আফ্রিকা এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সফলতার তোরণে পৌঁছেনি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সংক্রান্ত উপন্যাস আন্তর্জাতিকভাবে হাতে পাওয়া তখন কঠিন ছিল। সোভিয়েট উপন্যাস সে সময়ে তার প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। একমাত্র, ফ্রান্সের লোকঅভ্যুদয় মূলক উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ মূল্য বিচার তখন হয়তো বা সম্ভব ছিল। সুতরাং ত্রিধারার উল্লেখ করতে গিয়ে রালফ্ ফক্স্ ব্যক্ত করেছিলেন শুধু জ্বলন্ত বিশ্বাস। আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের অভিজ্ঞতা যোগ করে নিয়ে এই ত্রিধারাকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে নিতে পারি।

ষোল

আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকা

প্রথমত দেখা যাক এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাসের গতিপরিণতিকে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সব জায়গায় একই সঙ্গে শুরু হয় নি। এদের পরিণতিও একই ধরনের হয় নি। এই জাতীয় অভ্যুদয় সমূহের সময়সূচিতেই নয়, অবস্থা ও অবস্থানের ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে। সেই অনুসারে এইসব দেশে উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে শিল্পরূপের উপাদানগুলি একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও এদের স্তরভেদ ঘটেছে।

এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন দেশে জাতীয় অভ্যুদয় এখনও এমন অবস্থায় রয়েছে যে, সেখানে স্বাধীনতার পরেও লোকগদ্য দূরের কথা, মাতৃভাষার পোষাকী কোন ভাষা পর্যন্ত মতপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি সাহিত্যের বিভিন্ন মাতৃভাষী বিভাগ গড়ে তুলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সব দেশের জনসাধারণের মাতৃভাষার আত্মপ্রকাশের গবাক্ষপথগুলিকেও রুদ্ধ করে রেখেছিল মোড়লী, কায়েমী স্বার্থবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা। কালো আফ্রিকার কথাই বিশেষভাবে এখানে বলছি। বিদেশি শাসকদের ভাষাতে কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছেন এসব দেশের জাতীয় অভ্যুদয়ের চারণ কবিরাও, কারণ মুদ্রণযন্ত্র থেকে শুরু করে পত্রপত্রিকাগ্রন্থ সবই রয়েছে মাতৃভাষার আয়ত্তের বাইরে। উপন্যাস দানা বাঁধতেই পারেনি, কারণ, লোকগদ্য তথা মাতৃভাষা উপন্যাসের শিল্পরূপের একটি মৌলিক উপাদান। প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে, বিশ শতকে কালো আফ্রিকার কোটি কোটি নরনারী কথা বলেছে, কখনও কলস্বরে, কখনও অস্ফুটস্বরে মাতৃভাষাতেই, লোকগদ্যেই। কিন্তু মাতৃভাষী উপন্যাসের আধারে সেসব কথা স্থাপিত হয়নি গদ্য মহাকাব্যিক ধারায়। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের অভ্যুদয়ের পটভূমিতে উপন্যাস যে তৈরি হয়নি তা নয়, কারণ দুনিয়া জানতে চেয়েছে এই অভ্যুদয়ের মানবীয় গভীরতাকে এবং এই জন্যে চেয়েছে উপন্যাস এবং এই তাগিদের মধ্যে থেকে বেরিয়েও এসেছে কয়েকটি বই। কিন্তু এ বই লেখা হয়েছে ফরাসি নয়তো ইংরেজি ভাষায়। একথা ঠিক যে, অতি দ্রুতগতিতে উপন্যাস আসবে আফ্রিকার এ সব দেশ থেকে। যে মুহূর্তে শিল্পরূপের দেশীয় গদ্যের ছাঁচটিকে কেউ তৈরি করবেন, সেই মুহূর্তেই ইউরোপীয় উপন্যাসের শিল্পরূপের তিনশত বছরের বিকাশের ফলশ্রুতি এই দেশে দানাবাঁধা উপন্যাসের একটা ছক পাওয়া মাত্র বিশ শতক শেষ হবার আগেই ভরপুর হয়ে উঠবে। কারণ অষ্টাদশ শতকীয় ধনবাদী গণতান্ত্রিক বিপ্লব পেরিয়ে বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ফলবান করার জন্যে কালো আফ্রিকার মহাজাগরণের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে নব বৈপ্লবিক শক্তি। উপন্যাস এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য। ষাটের দশকে কিছু কড়চা বা জার্নাল 'ধরনের' কাজ হয়েছে বলে আভাস পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনার জন্যে এই ধরনের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। অপেক্ষা করতে হবে বিশ্ববাসীকে সত্তর দশকের ফলবানতার জন্যে।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশ দেশান্তরে কিন্তু মহাকাব্যিক ধারাতে শতাব্দীকাল ধরেই উপন্যাস লেখা চলে আসছে। সেখানেও গণতান্ত্রিক বিপ্লব জাতীয় মুক্তির কর্মসূচিকে অধিকাংশ দেশে বাস্তবায়িত করে উঠতে পারেনি ষাটের দশকেও; গণ-অভ্যুদয়ের পর গণ-অভ্যুদয় ঘটে চলেছে এবং উনিশ শতকীয় বাস্তববাদী জাতীয় বৈপ্লবিক উপন্যাসের ধারাই সঞ্জীবিত রয়েছে; কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরূপের নিরীক্ষার জন্যে কোন পূর্ণাঙ্গ একসারি বই না পাওয়াতে এখানে আপাতত স্থগিত রাখতে হচ্ছে এই উপন্যাসের গতি প্রকৃতির বিচার বিবেচনাকে।

তবে সাধারণত রালফ ফকস্ কর্তৃক উল্লেখিত জাতীয় অভ্যুদয় প্রসূত উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচারকে স্থগিত রাখার কোন প্রশ্ন উঠছে না। তার কারণ এই যে, প্রথমত,

আমাদের সামনে রয়েছে একশত বছরের বাংলা উপন্যাস। দ্বিতীয়ত, গণচীনের মতো একটি দেশের উপন্যাসের শিল্পরূপের বিকাশের মূল ধারাটিকে বুঝবার মতো মালমসলা হাতের কাছে পাওয়া যেতে পারে। গণচীন অবশ্য ১৯৪৯ সালে একটি সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে এবং এক দিক দিয়ে রালফ্ ফক্স্ যে সোভিয়েট উপন্যাসকে তৃতীয় যোগাত্মক ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তারই সংজ্ঞাগুলি সমাজতন্ত্রী চীনের উপন্যাসের ওপর প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। রালফ্ ফক্স্ সোভিয়েট উপন্যাস বলতে শুধু রুশ সমাজতন্ত্রী উপন্যাস বোঝেন নি। রালফ্ ফকস্ যখন 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থটি লেখেন, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশ। তবু আমরা গণচীনকে এশিয়ার জাতীয় অভ্যুদয়ের অন্যতম দেশ হিসেবে এবং চীনা উপন্যাসকে এই জাতীয় অভ্যুদয়ের চিহ্ন বুকে-আঁকা শিল্পরূপ হিসেবেই বিবেচনা করবো এখানে। বিশেষ করে যে চারটি প্রখ্যাত চীনা উপন্যাসের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশ শতকের উপন্যাসের সংকটমুক্তির যোগাত্মক ধারার খোঁজ করবো। সে চারটি উপন্যাসই ১৯৪৯ সালের আগে লেখা।

এখানে বাংলা এবং চীনা উপন্যাসের বিশ্লেষণে যাবার আগে দুটি কথা পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।

প্রথমত, যে কয়েকটি মূল উপাদান নিয়ে অষ্টাদশ-উনিশ শতকে ইতিপূর্বেকার মধ্যযুগী কাহিনীর স্বপ্ন কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনার খোলস্ থেকে বেরিয়ে আসা একটা নতুন শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের উদ্ভবের কথা বলেছি গ্রন্থের শুরুতে, বাংলা এবং চীনা উপন্যাসের উদ্ভবের এবং বিকাশের ইতিবৃত্তের ছক সেইভাবেই শুরু হয়েছে এবং সেইভাবেই এর বিচারও হওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত, এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাসের ইতিবৃত্তের ছকও শুরু হয়েছে একইভাবে। যদিও, যেকথা আগেই বলেছি, সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপন্যাসের মধ্যে বিকাশের ক্ষেত্রে উপাদান মিশ্রণের তারতম্য ও স্তরভেদ রয়েছে, বিভিন্ন কালভেদও রয়েছে। বাংলা কিংবা চীনা উপন্যাস ছাড়া এই ধরনের অন্যান্য দেশের উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় থেকেই এই সিদ্ধান্তটি টেনে নেওয়া যেতে পারে।

দুটো কথারই সূত্র এক। মধ্যযুগের রোমাঞ্চক ও অতিপ্রাকৃত পটভূমিসম্পন্ন নরনারীর কাহিনী রঙীন ফুলের মতোই উপন্যাসের শাঁসালো ফলের জন্যে বৃন্ত ছেড়ে দিয়ে খসে পড়েছে। এটাকে একান্ত বাস্তব সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, আমরা জাতীয় উপন্যাসের কোন কালনির্ণয় করতে পারবো না। মধ্যযুগের কাহিনীগুলির মায়া কিংবা এদের প্রতি প্রীতিকে যদি আমরা উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে কাটাতে না পারি, তাহলে অনেক সময় রোমাঞ্চক কাহিনীর সূত্র ধরে শুধু মধ্যযুগ নয়, তারও আগে চলে যেতে পারি। এর ফলে আমরা শিল্পরূপের সংজ্ঞায় অনির্দিষ্ট উপাদান আমদানী করে বসবো।

এই কারণে এ প্রসঙ্গে রালফ্ ফক্সের একটি সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই রীতিমতো বাজিয়ে নেবো আমরা।

রালফ্ ফক্‌স প্রাচ্যাদেশীয় কথা ও কাহিনীর বর্ণাঢ্যতা, মায়াজাল এবং পরিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীকে সার্ভেন্টিসের লেখার মালমসলা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপ প্রাচ্য সাংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসায় উপরোক্ত উপাদানে ইউরোপীয় মানস সমৃদ্ধ হয়েছিল। এমনকি শেকসপীয়রের লেখাতেও এই উপাদান সঞ্চারিত হয়েছিল, এটাই হচ্ছে রাল্‌ফ ফকসের অভিমত। এর কিছুটা ব্যাখ্যা তিনি তাঁর 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থের অন্যত্র দিয়েছেন এবং এর সত্যতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রাচ্যের দেশে দেশে জাতীয় স্বাধীনতার অভ্যুদয়ে যে উপন্যাস লালিত ও পালিত এবং বর্ধিত, তার মধ্যে দিয়েও উপরোক্ত উপাদানই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে আধুনিক বিপর্যস্ত উপন্যাসকে পুনরুজ্জীবিত করবে বলে যে আশা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে নবজাগ্রত প্রাচ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু তাতে জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাসের নব নব বৈপ্লবিক উপাদানের বিশ্লেষণ দিয়ে যাননি।

তাছাড়া জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাস প্রতীচ্য থেকে যা নিয়েছে এবং যাকে জীয়ন্ত করে রেখেছে এবং যাকে ভাঙ্গন এবং অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছে এবং যাকে নবজীবন দিয়ে ইউরোপে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পেরেছে, তার কথাটাও এখানে উল্লেখ করে রাখতে হবে।

বাংলা এবং চীনা উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই আমরা দেখবো, ফিল্ডিং-এর প্রত্যক্ষ বাস্তববাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে হোক অথবা গ্যেটের ভাবলৌকিকতায় পরোক্ষভাবে হোক উপন্যাসের যে শিল্পরূপ প্রসারিত হয়েছিল অষ্টাদশ ও পরবর্তী শতকের ইউরোপে, তাকে বাংলা ও চীনা উপন্যাসের শিল্পীরা দেশজ করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলা উপন্যাসের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে, তাতে সেই গদ্য মহাকাব্যের ধারা ক্রম-প্রসারিত হয়ে এসেছে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পরিপ্লুত-চিত্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব তার বহু মানব সম্পর্কিত কর্মপটভূমিতে স্ফুরিত হয়েছে সুপ্তোত্থিত অগ্নিগিরির মতো। উপন্যাসের নায়কনায়িকার জীবন এবং শিল্পের মূল পৌঁছেছে দেশের 'পাতালেও।'

সতেরো
চীনা উপন্যাস

চীনা উপন্যাসের কথাই আগে আলোচনা করে নেয়া যাক।

চীনের কথা মনে এলেই মনে হয়, এখানে সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক উপাদান ও উপকরণের সূত্রপাত কয়েক হাজার বছর আগে; সুতরাং উপন্যাসও নিশ্চয় শুরু হয়েছে এখানে কোন এক ধরনের প্রথম প্রভাতে, এ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যে সংজ্ঞা দিয়ে উপন্যাসের কালক্রম ঠিক করে নিয়েছি, তদনুসারে চীনা কথাশিল্পীরা উপন্যাসের কাজ শুরু করেছেন বর্তমান শতাব্দীতে। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে রচিত হয়েছে এই গদ্যমহাকাব্য মালা। উনিশ-বিশ শতকের জাতীয়

অভ্যুদয়মূলক মুক্তি সংগ্রাম, সমাজ বিপ্লব, বিপর্যয় ও যুদ্ধে মন্থিত চীনা গণজীবনের সর্বস্তরের তিক্ততম ও মধুরতম অনুভবে উচ্ছ্বসিত আষাঢ়ের জলভারাবনত মেঘের মতো উদ্দাম, চঞ্চল ও শতযোজনচারী, গম্ভীর ও উচ্চশির ও উৎসর্গীত নরনারীর আত্মচরিত উন্মোচিত হয়েছে সুভাষিত ও অতিভাষিত হয়ে। সবেমাত্র হাতেখড়ি দিয়ে বিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকের মধ্যে 'আঃ কিউ', 'আগস্ট মাসে গ্রাম' এবং 'রিকসা ওয়ালা'র মতো মহাকাব্যিক চরিতকথার সৃষ্টি একটা বিস্ময় বৈ কি! এ বিস্ময় আরও উল্লেখযোগ্য এ জন্যে যে, চীন হচ্ছে একটি দেশ যেখানে আমরা সাধারণত যাকে মঙ্গলকাব্যও বলি, তার নজির খুব বিরল। চীনের কাব্য অথবা চিত্রশিল্পকলার নিজস্বতা স্মরণীয় কাল থেকে বিকশিত হয়ে এসেছে ক্ষুদ্রায়তনের (miniature) অনুপম কারুকার্য সাধানে। মানবাত্মার বর্ণনায় হোক অথবা গজদন্তের চিত্রণে হোক, চীনা লেখক ও শিল্পীর হাতের তুলি বহু সজস্র বছর ধরে অক্ষরে ও রেখায় চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা ও গাম্ভীর্যকে তরঙ্গিত করে এসেছে অত্যদ্ভুত সংযম ও অতিসূক্ষ্মতার সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে। যে শিল্পীরা এই সৌন্দর্য ও সুষমার পার্বত্য নির্ঝয় থেকে অতর্কিত অবতরণ করে উপন্যাসের শিল্পরূপ সাগরে অকাতরে সোনার তরীকে কাঠের জাহাজের মতো ভাসিয়ে দিতে পারেন, তাঁরা গদ্য মহাকাব্যিক রীতিতে লিখলেও শুধু ফিল্ডিং-পদ্ধতির যান্ত্রিক সূত্রধার হিসেবেই চিহ্নিত থাকতে পারেন না। ইউরোপে যে সময়ে উপন্যাসের চরম বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে, তখন চীনে মহাকাব্যিক ধারায় উপন্যাস রচনার সার্থক সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই চীনা উপন্যাসের শিল্পরূপ এমন কি রয়েছে যা বিশ্ব উপন্যাস শিল্পে বুনিয়াদি বা চিরায়তিক রূপাধার রচনার মহৎ পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দিতে পেরেছে নতুন মুক্তধারার দিগন্ত? নতুন বিষয়ের সঙ্গে শিল্পরূপের দিক দিয়ে এমন কিছু আছে কি, যা ইউরোপীয় উপন্যাসের অবক্ষয়ের ছোঁয়াচকে প্রতিহত করে বিকাশকেই বড় করে তুলতে পেরেছে? যদি না থাকে, তাহলে চীনের নরনারীরা চরিতকথায় চীনকে আরও কিছুকাল হাসিকান্নায় দোদুল দোলায় দোলাবে, কিন্তু সাধারণভাবে উপন্যাসের ভ্রষ্টতার সংকটকে কাটিয়ে উঠবে কি করে?

চীনের উপন্যাসের রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম এবং মানবমানবীর মনের গহনের ছবি দেখার যে বিশেষত্ব রয়েছে তা থেকে সূত্র নিয়ে উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে যদি বলা যায়, ফরাসি লেখক স্তাঁদালের পদ্ধতিকে চীনা উপন্যাস শিল্পীরা তৈরি পেয়েছেন এবং একটা গোটা শতাব্দীর ঢাকনা খুলে তাকে তুলে নিয়েছেন, তাহলে অবক্ষয় মুক্ত একটা সম্ভবপর প্রস্তাবও এসে যায়। স্তাঁদালের উপন্যাসে রাজনীতি এবং মনস্তাত্ত্বিকতা যে রকম অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে রয়েছে, তারই নিশানা নিয়ে বিশশতকে জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাস তৈরি করতে গেলে উপন্যাসের শুরুতেই পরিণত রূপে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগার কথা নয়। বিশ্ব উপন্যাসকেও সে দিতে পারে মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে উদ্ভুত জটিলতা থেকে মুক্তির হদিস। কিন্তু স্তাঁদাল সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে, সেরকম কিছু জাগেনি চীনা উপন্যাসের জন্মকালে। স্তাঁদালের সঙ্গে চীনা উপন্যাসের শুধুমাত্র রাজনৈতিকতার উপাদানের মিলের দিক দিয়ে সংযোগের

চহিদারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না শিল্পীদের কোন বক্তব্যে। সুতরাং–ঘটনাকে এদিক দিয়ে দেখা ঠিক হবে না।

আসলে চীনা উপন্যাস জন্মেছে এমন এক সময়ে যখন জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বা জাতীয় অভ্যুদয় বুর্জোয়া বা ধনবাদী প্রভাবিত জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষায় নিবদ্ধ থাকেনি এবং এই কারণেই বুর্জোয়া বা ধনবাদী অবক্ষয় তাকে জন্মলগ্নেই ছেঁকে ধরতে পারেনি। অর্থাৎ চীনা উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছে এমন এক সময়ে যখন দেশ দেশান্তরের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহচর্যে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে এবং এই কারণেই নতুন প্রাণের ছাড়পত্র পাওয়া সমাজব্যবস্থার সতেজতা ও সজীবতা ও স্বচ্ছতা জাতীয় গণ অভ্যুদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত বঞ্চনা বা দারিদ্র্যের দরুন জাতীয় অভ্যুদয়ের সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসেরও যত খেদই থাকুক না কেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে যে কোন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামভিত্তিক উপন্যাস বাস্তবতার পুরোপুরি চিত্র দিতে গিয়েও পিছনে ডুবে যেতে পারে না। বিপ্লবেরই জয়গান গাইতে হয় তাকে, যাতে ক্ষয়ের ছাপও পড়ে না। চীনা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

প্রথমে লুসুনের লেখা "আঃ কিউ'র সত্যিকার কাহিনী" নামক উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত বক্তব্যের সারবত্তা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই বইটিতে লুসুন এক অজ-গ্রামের অসামাজিক ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনকারী ঠিকা মজুর বা কামলার মনের গভীরের অবচেতনার কুণ্ডলীকে যেন কিছুটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগাবার চেষ্টা করেছেন একজন কৌতূহলী বিজ্ঞানীর মতো তার সমগ্র চরিত্রটিকে সামনে আনার উদ্দেশ্যে : কিন্তু এ মনো-কুণ্ডলিনী বিবরাশ্রয়ী হলেও বিবরমুখী নয়। এর দৃষ্টি-রশ্মিতে ঝলকিত হয়েছে এমন এক ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত ব্যবস্থা যা আধোস্বপ্নে আধো-জাগরণে আধো-দুর্বোধ্যাতায় চীনের নরনারীর জীবনে অবধারিত হয়ে উঠেছে এবং যাকে চীনের নরনারী একই সঙ্গে মনের গহীনে কন্দর থেকে সবেমাত্র বার করে এনেছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রাচীন চীন বিশ শতকে উপনীত হওয়ার দরুন এর খোলসের মধ্যে জনতা যখন আছাড়ি পিছাড়ি করছে, তখন এক সাধারণ দিনমজুরের মস্তিষ্কে যেসব কথা খেলতে পারে, লুসুন শুধু সেইটুকুই দেখিয়েছেন। বিষয়টাকে আরও কিছুটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯১১ সালে চীনে যে বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, সেটা সাধারণ নিপীড়িত মানুষকে একটা অনির্দিষ্ট মুক্তির নিশানা দেখিয়েছিল। কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীগুলি এবং তাদের ধারক বাহক আমলাতন্ত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আঃ কিউ'র মতো নির্বিত্ত মানুষেরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল এবং তাদের কথাবার্তার আদবকায়দা পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল। কিন্তু হা-হতোস্মি। এ বিপ্লব যে উপর তলার বিপ্লব। সমাজটা যেমন ছিল, রাজনৈতিক কাঠামো যেমন ছিল রয়ে গেল। পান থেকে চুন যেখানে খসলো, সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তথাকথিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষুদে কর্মকর্তারা দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী শাস্তির ব্যবস্থা করলো। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপলো। ডাকাতির অভিযোগে বাঁধা হলো আঃ কিউকে। গাড়িতে চড়িয়ে শহর ঘুরিয়ে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সমাজতান্ত্রিক প্রাচীন প্রথায় খড়্গাঘাতে তার মস্তক ছিন্ন না করে গুলি করে মারা হলো

তাকে। বুর্জোয়া ধনবাদী বিপ্লব এই যা একটা নতুন কিছু করলো। এ সব কিছু ঘটে যাবার মধ্যে আ: কিউ'র মতো এক বদখত 'কামলা' যা কিছু ভাবতে পেরেছিল, লুসুনের কলমের মুখে তা বেরিয়ে এসেছে।

উপরোক্ত ইতিবৃত্তের ছাঁচের মধ্যে লুসুন একদিকে যেমন তাঁর কাহিনীর নায়ক আ: কিউ'র চেহারা-ছবি থেকে শুরু করে তার মদ খাওয়ার বদভ্যাসসহ নানারকম অভ্যাসের ছবি দিয়ে তার চরিত্রকে স্পষ্টাস্পষ্টি আঁকতে চেয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে দৃষ্টি দিতে গিয়ে সেখানে যে একটি অনির্দিষ্ট চীনা লোকমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে উপরে উঠতে চাইছে, তার কিনারাও খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। এই আ: কিউর' কাহিনী বলতে গিয়েই লুসুনকে আরও কয়েকটি স্থানীয় চরিত্র সামনে আনতে হয়েছে। নিপুণ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা চীনা সমাজের কয়েকটি উঁচু নীচু স্তরের নরনারীর চরিত্র চিত্র। এই সমস্ত চিত্রণ ছিল চীনের সেই সমাজে আশ্রিত, যা ১৯১১ সালে ভেঙ্গেও ভাঙ্গলোনা। অন্তর ও বাইরের এই দুই উপাদান নিয়ে লুসুন তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপ গড়েছেন লোক গদ্যেই। অর্থাৎ যে তিনটি উপাদানে অষ্টাদশ-উনিশশতকীয় ইউরোপীয় উপন্যাসের মহাকাব্যিক ধারা দানা বেঁধেছে, লুসুন সেই তিনটিকে নিয়োজিত করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে লুসুনের কৌতুক-প্রবণতা যাকে তাঁর ভাণ্ডারে বিশেষ করে জমা করেছিলেন তিনি তির্যক নিবন্ধ লেখার জন্যে। উপরোক্ত সমস্ত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিকতা-প্রবণতা; এর সন্ধানী আলোগুলি অবচেতনার এমনও সব স্তরে পড়েছে যা থেকে মনে হতে পারে, লুসুন বুঝিবা ফ্রয়েডিয় মনোবীক্ষণ তত্ত্বে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আ: কিউ' উপন্যাসের প্রথমাংশে একজায়গায় আ: কিউ গ্রাম্য কর্তাব্যক্তির বাসায় কামলার কাজ করতে করতে হঠাৎ বিধবা যুবতী দাসী আমা ইউর কাছে শয্যাসঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বসে। গৃহকর্তার হাতে বেদম প্রহৃত হবার পর কাজের অভাবে উপোস করার দরুন তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছাড়তে হয়। ভাগ্য পরিবর্তন করে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ফিরে এসে বিধবা যুবতী দাসী আমা ইউকে সে দেখতে পায় না। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া বিপ্লবের পর উদোরপিণ্ডি বুদোর কাঁধে নিয়ে সে যখন বধ্যভূমির দিকে রওনা হয় বন্দুকধারী প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় রাস্তায়-রাস্তায় মজা-দেখতে-জমায়েত ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সরকারি গাড়িতে চড়ে, তখন দর্শকবৃন্দের মধ্যে আমা ইউকে দেখতে পায়। আমা ইউর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়না, কারণ, আমা ইউর নজর ছিল প্রহরীদের বিলিতি বন্দুকগুলির দিকে। এই দুটি ঘটনার ছবিতেই ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের যৌন অথবা অবদমিত চেতনা বা প্রবৃত্তি ও কামনার প্রতিফলন আছে বলে মনে হতে পারে। 'আ: কিউ' কি শুধুমাত্র নারী দেহধারিণী আমা ইউ'র কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ মুহূর্তে এক কণা অনুরাগ না হলেও সহানুভূতি চেয়েছিল? এ প্রশ্ন হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়।

লুসুন তাঁর এই উপন্যাসটি লেখেন ১৯২১ সালে, অর্থাৎ রাশিয়াতে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবার পরে তার প্রভাবে প্রভাবিত চীনের ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র গণতান্ত্রিক বিক্ষোভের অব্যবহিত পরে। এই গণতান্ত্রিক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে চীনা চিন্তাধারা যে নবসূর্যের আলোকে আলোকিত সুস্পষ্ট দিগন্তরেখা নিয়ে বেরিয়ে আসে,

লুসুন তাকে 'আ: কিউ' উপন্যাসে আরোপিত করেননি, যদিও এ ধরনের কোন একটা ধারণা দিলে কেউ তাঁর দোষ ধরতে পারত না সেই ঘুমভাঙ্গার দিনে। লুসুন 'যে সময়ের কথা সে সময়ে'র ছাঁচেই রাখতে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেন তিনটি কারণে। প্রথমত, লুসুন বাস্তবতার পাঠ নিয়েছিলেন বিশেষ করে ম্যাক্সিম গোর্কির কাছ থেকে, যিনি বিপ্লবের পতাকা নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন রুশ জনগণের তিমিরাবৃত জীবনে তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্প এবং নাটক মারফত। দ্বিতীয়ত, লুসুনের লেখার কাজ শুরু করার ব্যাপারটা তাঁকে সব সময় মনঃসমীক্ষা কিংবা ভাবাবেগের ক্ষেত্রে বাস্তবের একটি পর্যায়কে পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার ইচ্ছাকে সংযত করে রেখেছে। লুসুন অধ্যয়ন-জীবন শুরু করেছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র হিসেবে। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন গত শতাব্দীর শেষের দিকে, কারণ তাঁর বাবা বিজ্ঞাসম্মত চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর দেশ এ ব্যাপারে ছিল চূড়ান্ত রকমের অভাবী। কিন্তু তিনি সে সময়ে তাঁর দেহ সম্পর্কে একটি ছবি থেকে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর দেশবাসীর দৈহিক শক্তি সামর্থ যদি বা আছে, আত্মার শক্তি নেই। তিনি তাঁর দেশবাসীর মূর্চ্ছিত মনকে জাগিয়ে তোলার সংকল্প নিয়ে লেখক-শিল্পীর কলম তুলি তুলে নিয়েছিলেন হাতে। সুতরাং লুসুন চীনা লোকমনকে যখন যে পর্যায়ে পেয়েছিলেন তাকে সেখান থেকেই তুলে আনতে চেয়েছিলেন। একজন চিকিৎসকের মতোই, তিনি ভিতরে পূঁজ রেখে ক্ষত সেলাই করতে চাননি। যে তৃতীয় কারণে লুসুন ১৯২১ সালে উপন্যাস লিখতে বসেও ১৯১১ সালের ঘটনাবলিকে হুবহু চিত্রিত করতে চেয়েছেন জনচেতনার উপাদানের ক্ষেত্রেও, সেটি হচ্ছে এই যে, লুসুন এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে, একটি চরিত্র-চিত্র দিতে গিয়ে যে শিল্পরূপের আশ্রয় তিনি নিচ্ছেন তা চীনের এতাবৎকাল-যাবৎ চলে আসা জীবনচরিতমূলক লেখা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা–গালগল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেকটা ফিল্ডিং-এর মতোই লুসুন 'আ: কিউ' গ্রন্থের রূপনির্ণয় করেছেন বই-এর শুরুতেই। এতে তিনি বলেছেন, উপন্যাসের নাম তাঁকে দিতে হচ্ছে 'আ: কিউ'র সত্যিকার কাহিনী। এই 'সত্যিকার কাহিনী' কথাটার ওপর তিনি এত বেশি জোর দিয়েছেন যে, রূঢ় সত্যের খাতিরেও তাঁকে ১৯১১ সালের পল্লবস্পর্শী বিপ্লবের ব্যর্থতার দিকটাকে অত্যন্ত নির্মম ও রূঢ়ভাবে সামনে আনতে হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন আসে, যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপাদান লুসুনের উপাদানকে অবক্ষয়মুক্ত রেখেছে বলে দাবী হয়ে থাকে তার চিহ্নটা 'আ: কিউ'তে কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, লুসুনের এই উপন্যাসে একটি বিশেষ বিপ্লবাত্মক উপাদান আসে যা তিনি পেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে। লুসুন উপন্যাসটি লিখেছেন বিপ্লবী শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী থেকে। পুরানো শ্রেণীগুলি ইতিহাসের গতিপথে বৈপ্লবিক সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। বইটি সেই নতুন বৈপ্লবিক শ্রেণীর চাহিদাকে অনিবার্য করে তুলেছেন যে না আসাতে ১৯১১ সালের চীনের দেশব্যাপী আলোড়ন গুমরে গুমরে থিতিয়ে গিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে নতুন দেশ ও নতুন জগৎ গড়ে তুলবার যে ইতিহাস সম্মত সম্ভাবনা পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর পতন-উত্থানের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে,

এখানে তাকেই স্থাপন করেছেন লুসুন। এখানে ক্ষয় ও অবক্ষয় বাস্তববাদী শিল্পীর কলমের তিক্ততম চিত্রগুলিকেও আশ্রয় করে থাকতে পারেনি।

উপরোক্ত কথাগুলিকে মনে রেখে আমরা এবার লাও চাঅ'র 'রিকশাওয়ালা' উপন্যাসটিকে কাটাছেঁড়া করে দেখতে পারি।

'রিকশাওয়ালা' 'আ: কিউ'র সত্যিকার কাহিনী'র দুই দশক পরে চীনের অসমাপ্ত বিপ্লবের পটভূমিতেই লেখা। তবে এই পর্যায়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহিত্য বা রূপরেখা ১৯১১ সালের আনুষ্ঠানিক প্রজাতান্ত্রিকতার তুলনায় অনেক বেশি সারসত্তা ও সুস্পষ্টতা দাবী করেছে। বুর্জোয়া বা ধনিক-বণিক সামরিক বেসামরিক আমলাদের নিরঙ্কুশ প্রধান্য থাকলেও ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। আ: কিউ'র সঙ্গে 'রিকশাওয়ালা' উপন্যাসের নায়কের পার্থক্য এই যে, তার চিন্তাধারাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করার প্রয়োজন হয়নি। রিকশাওয়ালার সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তা 'আ: কিউ'র মতো অনেকাংশে নিমগ্ন, অবচেতন বা বিবরাশ্রিত নয়। রিকসাওয়ালা প্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন এবং একক সাধস্বপ্নের অভিলাষী হলেও মাঝপথ থেকেই একটা সমষ্টিগত সত্তার অংশীদার হয়ে ওঠে চেতনা ও অবচেতনায় হয়তো এই কারণ যে, আ: কিউ'র মতো কোন গ্রামীণ জনপদে নয়, মহানগরী পিকিং-এই রিকশাওয়ালার কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে। 'রিকশাওয়ালা' উপন্যাস মহাকাব্যিক বিস্তারে সাজিয়েছে আধুনিক মনোবীক্ষণে আলোকিত উনিশ-শতকীয় বাস্তববাদের জীবনবোধে উজ্জীবিত এক গতর-খাটানো রিক্সাওয়ালার সমপর্যায়ের গতর–খাটানো বহুজনের মন-খনির মালা। প্রাচীন পিকিং নগরীর অভ্যন্তরে গতর-খাটানো বহুজনের মন-খনির মালা। প্রাচীন পিকিং নগরীর অভ্যন্তরে বিংশ শতাব্দীর যে ছোঁয়াচ লেগেছে, এ উপন্যাস যেন তার সুতিকাগারের ছবি। এই আঁতুড় ঘরের হাতুড়ে ধাত্রী হচ্ছে অবচেতন স্বদেশ অন্বেষা। এর দোলনা মহানগরীর স্বর্গমর্ত্য পাতাল মহল।

দুই দশকের সময়ের ব্যবধানে 'রিকশাওয়ালাকে' 'আর কিউ' থেকে পৃথক সত্তা দিয়েছে এদিক দিয়েও যে, প্রায় একই ধরনের দুটি দৃশ্য রয়েছে দুটি উপন্যাসের শেষের দিকেই, কিন্তু গুণগত পরিবর্তন হয়েছে এই দুটি দৃশ্যে। রিকশাওয়ালা উপন্যাসের শেষের দিকে গাড়িতে চড়িয়ে শহর ঘুরিয়ে বধ্যভূমিতে যাত্রায় আ: কিউ'র মতোই মর্মবিদারী ছবি রয়েছে। তবে রিকশাওয়ালাও এর আখ্যায়িত কৌতূহলী দর্শকমণ্ডলীর একজন। বধ্যভূমির দিকে যাত্রীরা ভিন্ন ব্যক্তি। এর গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের দাবীদার হিসেবে স্বৈরাচারী শাসক চক্রের দৃষ্টিতে ষড়যন্ত্রকারী এবং সেই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। এরা তিনজন। এই তিনজনের মধ্যে একটি ছাত্রীও রয়েছে। এদের গুলি করে মারা হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে এদের শহরে ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে। ভিন্ন ব্যক্তি হলেও এরা শুধু রিকশাওয়ালার চেতন অবচেতন মনের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত নয়, এদের মধ্যে যে ছাত্রীটি আছে তাকে রিকশাওয়ালা একদিন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে পেয়েছিল। এই বুদ্ধিমতী ছাত্রীটি রাজনৈতিক অধিকারের জন্যে সংগ্রাম সম্বন্ধে তাকে একটা ধারণা দিয়েছিল। অর্থাৎ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও বধ্যভূমির যাত্রী এই মেয়েটির সঙ্গে

একাত্মতা অনুভব করার কারণ ছিল রিকশাওয়ালার। মহানগরী পিকিং'এর পথের পাশে এক চা-ওয়ালা বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করতে করতে যখন সে বলেছে যে সে মেয়েটিকে চেনে, তখন বৃদ্ধ তাকে সাবধান করে দিয়েছে: 'একথা আর কাউকে বলোনা; তোমাকেও এ গাড়িতে চাপিয়ে নেবে ওরা একথা শুনতে পেলে।' রিকশাওয়ালা তার রাজনৈতিক সহানুভূতির সূত্রে অবচেতনার জগতে এই গাড়িতে আরোহণ করেছিল।

ভাবলৌকিকতার এক ঝলক রঙ্গীন ছোঁয়া হয়তো ছাত্রীটির প্রতি রিকশাওয়ালার এই রাজনৈতিক মমতা প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন ক্রমেই ভাবলৌকিকের প্রশ্রয়দাতা লাও চাঅ'র কলম নয়। 'রিকশাওয়ালা' এমন একটি বাস্তববাদী উপন্যাস বা ফরাসি লেখক মোপাসাঁ কিংবা এমিল জোলার উপন্যাসের নরনারীর দৈহিক জীবন-চিত্রের কিংবা জেমস জয়েসের মনোজীবন চিত্রের রূঢ় বাস্তবতার সংমিশ্রণ তো বটেই, বরং তাকে ছাড়িয়েও গিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এই রূঢ় বাস্তবকে উপন্যাসের মানবীয় উপাদানের বাস্তব হিসেবে উপস্থাপিত করার জন্যে ঔপন্যাসিক বহুসংখ্যক নরনারী-চরিত্রাবলিকে রিকশাওয়ালার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জীবনের গতিপরিণতির সঙ্গে জড়িত করেছেন। এই চরিত্রাবলির অধিকাংশই উনিশশতকীয় ইউরোপীয় উপন্যাসের উদাহরণ স্বরূপ ডিকেন্সের নরনারীর মুখচ্ছবি ও শারীরিক গঠনে উৎকীর্ণ চরিত্র-চিত্রণের ধারাতেই রূপায়িত। অনেকটা যেন সেই পুরানো কথাটাই এখানে প্রযোজ্য; 'মানুষের মুখচ্ছবি আরশিতেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়।' অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির চিত্রণ ধর্মী। কুৎসিত, সৌম্য, সুশ্রী, বিকট, মিষ্টি, কপট, সাহসী মুখের চেহারা আঁকবার ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে রিকশাওয়ালা উপন্যাসে। তেমনি দেহের গঠন দ্বারাও লোকচরিত্রের নিশানা দাখিল করা আছে। রিকশাওয়ালার মুখ এবং দেহ বর্ণনাতেও লেখক তাঁর সাধারণ নায়ককে এমনভাবে পেশ করেছেন যে, সে একান্ত রিকশাওয়ালা না হয়ে যায় না। রিকশা এবং রিকশা-চালানোর সমস্ত খুঁটিনাটি লেখককে আয়ত্ত করতে হয়েছে। লেখক যদি কখনও নিজে রিকশা টেনে না থাকেন, তাহলে এমিল জোলা যেমন 'জার্মিনাল' উপন্যাস লেখার জন্যে ছ'মাস কয়লার খনির মধ্যে সবকিছু খুঁটেখুঁটে দেখেছিলেন তেমনিভাবে তিনিও রিকশা সম্বন্ধে কোথাও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। গা বাঁচিয়ে আলগা থেকে জীবনকে দেখে রিকশাওয়ালার মতো বাস্তববাদী উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। ভাষাও বেরিয়ে এসেছে উপরোক্ত কারণে গণভাষা, গণ গদ্য হয়ে।

লুসুনের প্রদর্শিত পথেই লাও চাঅ লিখেছেন উপন্যাস। কিন্তু যে জীবন-কথাকে ব্যক্ত করার জন্যে তিনি বেছে নিয়েছেন পিকিং মহানগরীকে, তা তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছে আরো অনেক বড় চিত্রপট। কামলা আ: কিউর বৃত্তান্তকে লুসুন মহাকাব্যিকতার ছোঁয়া দিয়েছেন মাত্র। লাও চাঅ রিকশাওয়ালার বৃত্তান্তকে মহাকাব্যিকতার বিস্তার দিয়েছেন। দ্বিচক্রযানের আমদানী করেছেন বলেই হয়তো এই বিস্তারের মধ্যে এসেছে দ্রুতগতি। এই দ্রুতগতির দরুন রিকশাওয়ালা উপন্যাসের জয়েসীয় ধরনে-পরিবেশিত যৌন সম্পর্কিত চিত্রগুলিকে অথবা জীবনের স্থূল ক্রিয়াকর্মগুলির ছবিগুলোকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার অবকাশ পায়না স্থূলাচারী

পাঠক পাঠিকাও। চার্লস চ্যাপলিনের কোন কোন ছায়াছবিতে ভাঁড়ামি কিংবা জীবনের সত্য স্থূল চিত্র যেমন এক পলকের বেশি দাঁড়াতে পারেনি, এখানেও দ্রুতগতিতে তেমনি শ্লীল কিংবা অশ্লীলের কথা ভাববার বিশেষ অবকাশ থাকেনি। মোপাসাঁর মতো মহৎ শিল্পীর লেখাতেও সমগ্র সত্য জীবন চিত্রের অংশ হিসেবে যেখানে কোন কোন সময় পরিহাসে রসিত হয়ে যৌন সম্পর্ক ঘটিত চিত্র বা ইশারা পরিবেশিত হয়েছে, সেখানে দ্রুত গতির আবশ্যকতা না থাকার দরুন যে সব চিত্র পলক ফেলতে না ফেলতে সরে যেতে পারেনি। এই কারণে, নরনারী-জীবনের পর্দা ঢাকা দিকটাকে খোলাখুলিভাবে দেখবার জন্যে বিশেষ বিশেষ পাঠক মহলের প্রবণতা উৎসাহিত হয়েছে বলে মনে হয়। লাও চাও এদিক দিয়ে আকর্ষণীয় হতে পারতেন তাঁর বাস্তববাদিতার নিরাসক্তি ও নির্মমতার জন্যে। কিন্তু দু'চাকার রিকশাই শুধু নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাভাতী শতাব্দীর মানবীয় মুক্তির নব দিগন্তের আশ্বাস তাঁকে দিয়েছে নতুন জগৎকে অবধারিত করে দেখাবার সৃজনাত্মক ক্ষমতা। চীনের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বা জাতীয় অভ্যুদয়ের যে ছবি রিকশাওয়ালাতে আছে, তাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, মেহনতী মানুষ দানা বেঁধে তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের সর্বতোমুখী মুক্তিসংগ্রামের জন্যে। শ্রেণীগতভাবে এই সংগ্রাম শুরু হয়নি। কিন্তু যে জ্বালা সমস্ত পিছুটানগুলিকে একটি বিপ্লবী শ্রেণীর মানুষের মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে, সে জ্বালা রিক্সাওয়ালা এবং তার সাথীদের মনে জ্বলছে।

'রিকশাওয়ালা' উপন্যাসের এই পবিত্র মনাগ্নিশিখা ইউরোপীয় উপন্যাসের পূর্বকথিত শিল্পরূপের দুর্গতি অথবা অচলতার কিনারা করতে পেরেছে নিশ্চয়।

চীনের জাতীয় অভ্যুদয়ের যে তৃতীয় যোগাত্মক উপন্যাসটির উল্লেখ এখানে করা দরকার, সেটির নাম 'আগস্ট মাসে গ্রাম।'

এই উপন্যাসের লেখক একজন সৈনিক-শিল্পী-ভাষাবিদ। উপন্যাস খানির ইংরেজি অনুবাদক এডগার স্নো বইটির সঙ্গে গোর্কির 'মা' উপন্যাসের তুলনা করেছেন।। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী দখল থেকে মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত চীনের গণ-মানবের কাছে এই উপন্যাসটি সেইভাবেই আদর পেয়েছে যেভাবে গোর্কির 'মা' উপন্যাসটি রুশ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতির মুখে আদৃত হয়েছিল রুশ সংগ্রামী শ্রমজীবী জনগণের মাঝে। এডগার স্নোর এই বক্তব্যটিকে নিয়ে যদি বইটির পরিচিতি দাখিল শুরু করতে হয়, তাহলে প্রথমেই বলে নেয়া দরকার, গোর্কির 'মা' উপন্যাসের শিল্পরূপ যেমন একটি সরল যোগ অঙ্ক নয় তেমনি 'আগস্ট মাসে গ্রাম'ও সরল যোগ অঙ্ক নয়। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই দুটি বই। এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা থেকে যদি আমরা এ সিদ্ধান্তে যাই যে, এই দুটি বই'এর গঠন, চরিত্রাবলি ও বক্তব্য জটিলতা-বর্জিত, তাহলে আমরা এদের মূল্য বিচারে ভুল করবো। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যে নতুন দুনিয়া গড়ছে, তাতে হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত গুণগত ও মানগত বৈচিত্র্য ছাঁটাই হবে না, আরও ফলন্ত ফুলন্ত হবে। এই কারণে, শিল্পী উপন্যাসের শিল্পরূপকে গণমুখী করবার জন্যে দুটো চারটে জমজমাট গল্প বলে ক্ষান্ত থাকতে পারেন না। উপন্যাস যদি বিপ্লবী যুগের এবং যুগের মানুষের মর্ম কথাটি ধরতে পারে এবং তার ভিত্তিতে বাঙ্ময় হতে উঠতে পারে, তাহলে তার বক্তব্য জনপ্রিয়

হবেই। 'মা' এবং 'আগস্ট মাসে গ্রাম' উপন্যাস দুটির জনপ্রিয়তা আরও প্রমাণ করেছে, ব্যাপক জনগণ জীবন ও জগতের জটিল প্রশ্নগুলিকে বুঝতে চায়, জানতে চায় চেতন না হলেও অবচেতন মনে পেতে চায় সামগ্রিক সত্যকে। বিশেষ করে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে দোলা খাওয়া জনগণের মন, বাস্তবের গভীরে যে সম্ভাবনা আলোড়িত হচ্ছে তাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।

চীনের উত্তরাঞ্চলে মাঞ্চুরিয়ার অপরূপ পর্বত ও অরণ্যানী-সংকুল নিসর্গ-বিন্যাস প্রবাহিত হয়েছে 'আগস্ট মাসে গ্রাম' উপন্যাসের মানবীয় সুখদুঃখ যাতনা উদ্দীপনার প্রবাহিনী। জাপানি দখলকারীদের বিতাড়িত করার জন্যে গণবাহিনীর একটি দলের অভিযাত্রার কাহিনী এনে দিয়েছে এই বইটিতে মহাকাব্যিক বিস্তার। এই গণবাহিনীর লোকেরা একই সঙ্গে সাধারণ ও বিভিন্ন, ভালয় মন্দয় দোষে গুণে জড়ানো নিতান্তই পার্থিব বাস্তব চরিত্র, যদিও জাপানি দানবীয় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত খণ্ডযুদ্ধকারী মুক্তিসেনাদল অসম্ভবকে সম্ভব করতেই প্রবৃত্ত। এই মুক্তি সেনাদলের অন্যতম ইস্পাত কঠিন চরিত্র সম্পন্ন সেনানায়ক স্বল্পবাক এবং ঘোড়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে প্রতীয়মান। ফল্‌গুধারার মতো মানবিকতা উৎসারিত রয়েছে তার মনের গহনে। একটি মেয়ে আছে যে স্বেচ্ছাসৈনিক এক তরুণ যুবা রয়েছে এই মেয়েটিকে প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু মৃত্যুপণ মুক্তিযুদ্ধে সংসার পাতানোর পরিকল্পনা অন্তর্দাহের অগ্নিশিখা মাত্র। এই তিনটি চরিত্র যেন মুক্তিসেনাদলটির লোকদের ত্রিমুখী অভিব্যক্তি। মুক্তিসেনাদলটি মাঞ্চুরিয়ার জাপানি বাহিনীকে আঘাত করার জন্যে চলেছে পর্বত কান্তার পার হয়ে, গ্রামীণ জনগণের চেতন ও অবচেতন মনে মুক্তি সংগ্রামের ধ্যান ধারণাকে উস্‌কে দিয়ে। যে জাপানী দখলকারী বাহিনী মাঞ্চুরিয়াতে গণপ্রতিরোধের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছে, তার একজন সাধারণ সৈন্যের সাধস্বপ্নও বেরিয়ে এসেছে বইটিতে। এদিক দিয়ে 'আগস্ট মাসে গ্রাম' উপন্যাসের শিল্পরূপ 'আ: কিউ' এবং 'রিকশাওয়ালা' থেকে রাজনৈতিক বক্তব্যের উপস্থাপনের দিক দিয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর। বাস্তববাদ, ভাবলোককতা এবং মনোমুখিতার সংমিশ্রণের যে কাজ রয়েছে এই উপন্যাসে, তাতে চীনাশিল্পীর পুরুষানুক্রমিক সংযম ফিন্‌কি দিয়ে ভেঙ্গে গেলেও একটা নতুন ধরনের গাম্ভীর্যে এর সমগ্র শিল্পরূপ দানা বেঁধেছে।

'আগস্ট মাসে গ্রাম' উপন্যাসকে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে চিন্তায় এবং কর্মে এর সংগ্রামী সচলতার দিক দিয়ে। কিন্তু টলস্টয়ের সঙ্গে তফাৎ এই যে, 'আগস্ট মাসে গ্রাম' বিশশতকের মধ্যাহ্নের, 'যুদ্ধ ও শান্তি' উনিশ শতকের বিদায়ের বই।

আলোচিত চীনা উপন্যাসত্রয়ের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হতে পারে বিশ শতকেরই তিনজন অচৈনিক ঔপন্যাসিকের লেখার সঙ্গে তুলনা করলেও। এই ত্রয়ী হচ্ছেন; সমারসেট মম, পার্লব্যাক এবং আঁদ্রে মালরো। ইংরেজ লেখক সমারসেট মমের 'চিত্রিত আবরণ' (পেন্টেড ভেইল), মার্কিন লেখিকা পার্ল বাকের 'ভাল মাটি' (গুড আর্থ) এবং ফরাসি লেখক আঁদ্রে মালরোর 'সাংহাইয়ে ঝড়' (স্টর্ম ইন সাংহাই) গ্রন্থে চীনের নরনারীর অন্তরের পরিচয় দেবার ব্যাপারে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে এবং

চীনের বাস্তব পটভূমিতে বুঝবার জন্যে যে চেষ্টা রয়েছে, তা হয়তো একমাত্র উপন্যাসশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। বাস্তবকে না পাওয়া পর্যন্ত উপন্যাসশিল্পী আশ্বস্তবোধ করতে পারেন না।

উপন্যাস এবং বিশেষ করে চিরায়তিক ধারায় লেখা উপন্যাস তার শিল্পী-নির্মাতার কাছ থেকে যে উপাদান-সম্পর্কিত প্রস্তুতি দাবী করে, তাকে ফাঁক না থাকলে শিল্পী বিদেশি হলেও জীবনের ছবি পুরোপুরি দিতে পারেন বৈকি। তবে সে উপন্যাস যে ভাষায় লেখা তারই জাতীয় উপন্যাস যেমন, 'পেন্টেড ভেইল' ইংরেজি উপন্যাস। 'স্টর্ম ইন সাংহাই' ফরাসি উপন্যাস। সাধারণভাবেই উপন্যাসের শিল্পরূপে চরিত্রাবলি যে বহির্বাস্তবে আশ্রিত, তার কোন ভৌগলিক সীমা থাকার কথা নয়। কারণ জাতীয় উপন্যাসের যখন সৃষ্টি, তখনও একদিকে যেমন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ঠিকই এবং জাতীয় রাষ্ট্রও গঠিত হয়েছে, তেমনি সারা পৃথিবী জুড়ে স্থাপিত হয়েছে মানুষের যোগাযোগ। ভলটেয়ারের ক্যাণ্ডিড (Candide) কিংবা সুইফ্‌টের 'গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী' ফরাসি এবং ইংরেজি জাতীয় উপন্যাসের বিকাশের পথকে উন্মোচিত করে দিয়েছিল, অথচ এই দুটি গ্রন্থেই নায়কেরা দেশদেশান্তরের যাত্রী। বিশ শতকে এসে আমরা আর্নেস্ট হেমিওয়ে কিংবা ইলিয়া এরেনবুর্গের কয়েকটি উপন্যাসকে যদি দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে আনি, তাহলে সেখানেও দেখবো শিল্পীরা ভৌগলিক সীমারেখা অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। তবু সংশ্লিষ্ট উপন্যাস যে মাতৃভাষা বা লোকগদ্যে লেখা হয়, সেই পরিধিতেই তার প্রাথমিক ও মৌলিক মূল্যায়ন হয়। যেমন, হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোলস' উপন্যাস স্পেনের নরনারীকে ভিত্তি করে লেখা হলেও তা ইংরেজি বা মার্কিন উপন্যাস। এরেনবুর্গের 'প্যারীর পতন' এমনিভাবে রুশ উপন্যাস। যেহেতু উপন্যাস মানবচরিত্র এবং তার বহিরাশ্রয়কে গভীরভাবে বুঝতে পারাকে তার সাফল্যের একটা শর্ত হিসেবে সামনে রাখে, সেজন্যে উপরোক্ত ধরনের এমন অনেক বই অনেক সময় পাওয়া যায় যার তর্জমা পড়ে আমরা বলি, এ আমার বা আমাদের জীবন। মুলকরাজ আনন্দের 'কুলী' কিংবা 'দুটি পাতা একটি কুড়ি' ইংরেজিতে লেখা হলেও এর তর্জমা পড়ে অনেক সময় মনে হয়েছে, আমাদের মাতৃভাষায় লেখা উপন্যাসের অনেক ছবিই নিষ্প্রভ, ফিকে। 'পেন্টেড ভেইল', 'গুড আর্থ' এবং 'স্টর্ম ইন সাংহাই' চীনের অধিবাসীদের কাছে কতখানি আকর্ষণীয় হতে পেরেছে সেটা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা।

সমারসেট মম তাঁর 'পেন্টেড ভেইল' উপন্যাস যদিও শুরু করেছেন শ্বেতাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গিনীর আধুনিক দেহাশ্রয়ী প্রেম দিয়ে, তবু শেষ করেছেন সেই চীনের সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মহাবাক্যিক বাস্তববাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করে, যা চীনের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনের উপরকার 'চিত্রিত আবরণ'টিকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। এখানে কলেরা-মহামারীর যে ছবিটি আছে, তা' চীনের বিপ্লব-পূর্ব-জীবনের একটি নির্মম সত্য চিত্র হিসেবে উপন্যাসের শিল্পরূপে জাগরূক থাকার কথা। পার্লবাক তাঁর 'গুড আর্থ' উপন্যাসে চীনা চাষী জীবনের সেই ভাগ্যের খেলার নাটকীয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন চিত্রাবলি দাখিল করেছেন, যা' বিপ্লব পূর্বাকালে চীনা নরনারীর জীবনে দৈনন্দিন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতো অথবা কুমোরের চাকের মতো আবর্তিত

হতো। পার্লবাক চীনের ওপরেই 'সম্রাজ্ঞী' নামে 'অভিজাত জীবন' নিয়ে যে উপন্যাসটি লিখেছেন সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্রকে আলোকচিত্র মালার মতো সাজিয়ে, 'গুড আর্থ' তার উল্টোপিঠ। আঁদ্রে মালরো 'স্টর্ম হ'ন সাংহাই উপন্যাসে সেই চীনের ছবি তুলেছেন যেখানে জাতীয়তাবাদের খোলস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী মানস সবেমাত্র বেরিয়ে আসছে মুক্তিসংগ্রামী নরনারীর দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক ঘাতপ্রতিঘাতময় চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে। বিশ শতকের চীনের তৃতীয় দশকের বিপ্লবাত্মক গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে মালরো একদিকে যেমন চীনের নব-জন্মযন্ত্রণাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি একই সঙ্গে বিশ্ব শতকের তৃতীয় দশকের আধুনিক মনোবাস্তববাদী উপন্যাসকে আত্মকণ্ডুয়ন থেকে বার করে একটা মহাকাব্যিক বিস্তারে স্থাপিত করতে চেয়েছেন চীনের মুক্তিসংগ্রামের ছবিতে রয়েছে এই উপন্যাসের যোগাত্মকতা। মাল্‌রো তাঁর 'সাংহাইয়ে ঝড়' এর মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অবক্ষয় সংকটকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন মনঃস্রোত পদ্ধতিরই মারফত।

উপরোক্ত তিনটি উপন্যাসই সেই বিশ শতকের চীনকে সামনে আনতে চেষ্টা করেছে, যা আপাতদৃষ্টিতে চীনা উপন্যাসের শিল্পরূপের পটভূমিতেও কোন দিক দিয়েই নির্জীব বলে মনে হবে না। কিন্তু একটা পার্থক্যকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারা যায়। 'আঃ কিউ', 'রিক্সাওয়ালা' আর 'আগস্ট মাসে গ্রাম' চীনের সেই জনগণের চাপা পড়া মনের কথা বার করে এনেছে, যা বিভিন্ন কারণে সমারসেট মম, পার্ল বাক বা আঁদ্রে মালরোর আয়ত্তের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। উপন্যাসের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান যে জাতীয় কিংবা লোকভাষা বা মাতৃভাষা, যার মধ্য দিয়ে অবচেতনার তলায় চাপা পড়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও অভিজ্ঞান বাঙ্ময় হতে পারে এবং চরিত্রাবলির সঠিক রূপকে প্রকাশিত করতে পারে, সেটিকে চীনের বাইরের শিল্পীরা কলমের মুখে পাননি। দ্বিতীয়ত, বাইরের উপরোক্ত শিল্পীরা চীনা শিল্পীদের মতো স্বচ্ছন্দ বা দ্বিধাহীন হতে পারেন না। বাস্তব তাঁদের বিব্রত করেছে, নয়তো সহানুভূতিশীল করেছে। লুসুনের মতো শল্য চিকিৎসকের ছুরী হাতে নিতে পারেন নি তাঁরা। তৃতীয়ত, বিশ শতকের চীনের নরনারীর জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান মালরো যদিবা অনেকখানি ধরতে চেষ্টা করেছেন, সমারসেট মম কিংবা পার্ল বাকের তরফ থেকে সে ধরনের কোন চেষ্টাই সম্ভব হয়নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সমারসেট মম সব সময়েই রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন, আর পার্লবাক তাঁর পশ্চিমী বুর্জোয়া মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গীকে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন এবং 'তাঁরই একটি উপন্যাসের' চিত্রানুযায়ী নকল দাঁতের মতো জাহির করে বসেছেন তাঁর পরবর্তী কোন কোন উপন্যাসে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে।

সুতরাং চীনের জাতীয় অভ্যুদয়কে যদি পুরোপুরি বুঝবার জন্যে উপন্যাসের শিল্পরূপ হাতে তুলে নিতে হয়, তবে 'আঃ কিউ' 'রিক্সাওয়ালা' 'আগস্ট মাসে গ্রাম' প্রভৃতি বিশ শতকীয় চীনা উপন্যাসের প্রতিনিধিস্থানীয়দের মধ্যেই খুঁজতে হবে ঐ বুঝতে পারার নিশানা। এখানে শুধু জাতীয় কিংবা লোক ভাষা সক্রিয় নয়। যে পন্থাকে বিংশ শতাব্দীর মানব অভ্যুদয় বিন্যাসে প্রয়োগ করে চীনা ঔপন্যাসিকরা

স্বল্পতম সময়ে মহাকাব্যিক গদ্যরূপাধার গড়ে তুলেছেন, তা' নিশ্চয় বিশ শতকের চীনের চরম সামাজিক রাজনৈতিক আলোড়নের নিজস্ব সৃষ্টি। তবে স্তাঁদালের উপন্যাস কিংবা তাঁর প্রস্তাবসমূহে যে বাস্তবাশ্রয়িতা ও মনোময়তার ঐক্যের তাগিদ দেওয়া রয়েছে, চীনা উপন্যাসিকরা ভবিষ্যতে কোথাও ঠেকে গেলে তা থেকেও অনায়াসে নতুন নতুন ছাঁচ তুলে নিতে পারবেন। কারণ চীনা ঔপন্যাসিকরা বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ দশকে এ দিক দিয়ে একটা সামীপ্য গড়ে তুলেছেন।

ভবিষ্যতের যিনি শিল্পী, তাঁকে স্বীকৃতি দেয় ভবিষ্যতই, যদিও শিল্পীর ব্যক্তি-কাঠামো গৌণ হয়ে পড়ে, শিল্পীর সমাধির উপর প্রাণের প্রকাশরূপে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে থাকে। ফুল কুড়িয়ে নিতে হয় সমঝদারকে। এতে শিল্পীর দেহের আদরটুকুও পাওয়া যায় না। মহাশূন্যে বিলিন মন-কুসুরের সঙ্গেও এ ফুলের মিল হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না। স্তাঁদালের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের চীনা ঔপন্যাসিকদেরও নিতে হতে পারে নতুন পাঠ। এ হবে স্বচ্ছন্দ নেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া।

এই দেওয়া নেওয়ার প্রশ্নটা এই কারণে এসেছে যে, চীনা উপন্যাস জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে। চীনের ঔপনিবেশিক পরনির্ভরতা ঘুচে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও অবলুপ্ত হয়েছে। প্রাচীন চীনের যে সূক্ষ্ম শিল্পরূপরেখা লুসুনের লেখাতেও প্রাণ পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার ব্যবহার সমাজতান্ত্রিক চীনে স্বভাবতই হ্রাস পাওয়ার কথা, কারণ সব সমাজের প্রাণোপকরণের প্রাচুর্য প্রাচীন সৌন্দর্যকেও সীমিত করতে বাধ্য। অন্তত যতদিন পর্যন্ত একটা মীমাংসা এই সৌন্দর্যের সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে না হচ্ছে, ততদিন লুসুন প্রাচীন রীতির যতটুকু ব্যবহার করেছেন, ততটুকুও চাপাচাপির মধ্যে থাকবে। এইভাবেই অষ্টাদশ উনিশ শতকে যখন সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী প্রথার মধ্যযুগীয় নিগড় ভেঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক অভ্যুদয়ের মর্মবাণী বুকে নিয়ে উপন্যাস বিকশিত হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, তখনও প্রাচীন সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার নিয়ে 'কি করা এবং না করার' প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য হয়নি। তবে সমাজতন্ত্র যেহেতু ইতিহাসের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাকে সামনে রেখেছে সেজন্যে একটা সমীকরণে পৌঁছতে সমাজতান্ত্রিক চীনা উপন্যাসকে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হবে না। উপরন্তু উনিশ শতকের উপন্যাস তো এ বিষয়ে তাকে সহায়তা করে আসছেই। সোভিয়েট উপন্যাসও যেহেতু কয়েক পা এগিয়ে রয়েছে, সুতরাং তার কাছ থেকেও সহায়তার উপকরণ সংগৃহীত হয়ে রয়েছে।

মূল তাগিদটা আসছে এবং আসবে চীনের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবাত্মক গতিপরিণতির শক্তিপুঞ্জের তাগিদ থেকে। জাতীয় অভ্যুদয়ের যে বিপ্লবাত্মক শক্তিপুঞ্জ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাকে মাঝখানে সেরকম কোন সংকট অতিক্রম করতে হবে না যেরকম সংকট ইউরোপীয় উপন্যাসকে অতিক্রম করতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিকতার বিকাশ ও অবক্ষয় এই দুইয়ের আয়ুষ্কাল চীনের অভ্যন্তরীণ জীবনে ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। এই উত্তরণের যুগসন্ধিকে যদি চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকের আধাআধি পর্যন্ত ধরা যায়, তাহলে আমরা দেখবো, চীনে বিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশক পর্যন্ত

লুসুন প্রমুখ ঔপন্যাসিকের লেখায় যারা পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, 'তারা মর্তের নব দিগন্তের যাত্রী।' এখানে 'টিং লিং এর একটি উপন্যাসের শুধু আভাস দিয়েই সমাজতন্ত্রের সন্ধিক্ষণে চীনা উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশেষ ধারার ইঙ্গিত দিয়ে রাখা যায়। 'টি. লিং' এর এই বইটির নাম 'সাংখান নদীতে সূর্যোদয়।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরে উত্তর চীন এলাকায় গণচীনের মুক্তিবাহিনী প্রবেশ করার পরে একটা অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে পলাতক জমিদার আর ধনী কৃষকদের জমি গরীব আর ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হচ্ছে। এই পটভূমিতে গ্রামীণ এলাকার কয়েকটি গতিশীল আর স্থবির চরিত্রে নতুন জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি এঁকেছেন টিং লিং। টিং লিং বর্তমান শতাব্দীর চীনের একজন যশস্বিনী লেখিকা। চীনে যখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়, প্রায় সেই সময়েই টিং লিং চীনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন এবং তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট হয়ে ইয়েমেনে মুক্ত এলাকায় গণজীবনের লেখিকা হিসেবে দায়িত্ব বেছে নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন উত্তর চীনের একটি মুক্ত এলাকায় কৃষকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সূচনা হিসেবে ভূমি বণ্টন চলতে থাকে, তখন এটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য টিং লিং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভূমিবণ্টনের কাজে ব্যাপৃত হন। 'সাংখ্যান নদীতে সূর্যোদয়' উপন্যাস এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখা।

এই কারণে যে, কোন দেশের মহাকাব্যিক উপন্যাসের মতোই এতে সাংসারিক জীবনের উপকরণের আবেগ বর্জিত আখ্যান রয়েছে। অর্থাৎ জমির গুণাগুণ হেরফের নিয়ে আলাপ রয়েছে। টিং লিং তাঁর বস্তুগত অভিজ্ঞতাকেই চিত্রিত করেছেন। এখানে তিনি শুধু কমিউনিস্ট হিসেবেই যে ভূমি-বিপ্লবের বস্তুগত কথা লিখতে বসেছেন তা নয়, একটা চিরায়তিক মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পী হিসেবেও বস্তুগত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু টিং লিং কখনও ভোলেননি যে তিনি সমাজতন্ত্রের দিগন্তে উপনীত চীনের মানব মানবীর কথা লিখতে বসেছেন। তিনি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত দেশ আর পৃথিবীর কথা লিখতে বসেছেন।

এইজন্যে একটা নদী পার হবার যে কাব্যিক বর্ণনা দিয়ে তিনি বই শুরু করেছেন, তাতে শুধু সমস্ত অঞ্চলটাই যে কথা বলে উঠেছে তাই নয়, যেখানে ভূমিবণ্টনের গদ্যময় ব্যাপারটা শুরু হবে সেখানেও আলতো ভাবে আমাদের নিয়ে গিয়েছেন। এর পরে একটা এক রাস্তাওয়ালা গ্রামের সাদাসিদে পটভূমিতে তিনি প্রাচীন চীন ও নবীন চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি সাজিয়ে দিয়েছেন। এখানে কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবকাশ নেই। জমিদাররা পালিয়ে গিয়েছে। লুসুনের 'আঃ কিউ' উপন্যাসে বর্ণিত বিপ্লব তো নয় এই বিপ্লব। শত্রু এখানে পলাতক। কিন্তু তবু গাঁটে গাঁটে রয়েছে পুরানো চিন্তা। সুতরাং একে সরিয়ে নতুন চিন্তার জন্যে কথাবার্তা। তবে এখানে কোন নাটকীয় তরঙ্গোৎক্ষেপ নেই। সম্ভবত এই কারণে যে, টিং লিং সুনের মতোই মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতগুলিকে চিত্রিত করার দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু এই কারু কার্য মহাকাব্যিকতাকে ক্ষুণ্ন করেনি। টেনে নিয়ে যায়নি বাস্তবকে কোন মনের গুহায়।

উপন্যাসের শিল্পরূপের একটি সার্থক উত্তরণের নমুনা হিসেবেই 'সংখ্যান নদীতে সূর্যোদয়' উপন্যাসকে দেখা যেতে পারে। যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কথাকে

সোভিয়েট উপন্যাসের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বেরিয়ে আসতে দেখবো, তারই একটি চৈনিক পরীক্ষা টিং লিং-এর এই বইটি। টিং লিং-এর লেখার পদ্ধতি অপ্রগল্‌ভ। যদি প্রগল্‌ভ হতো তাহলে টলস্টয়-শলোকভের ধারাতেই বৃহদাকার তিন খণ্ডের উপন্যাস হয়ে যেত এটি।

ভূমিবণ্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি গ্রামীণ যুবক আর তার প্রণয়িনী গ্রামীণ তরুণীর মিলনাত্মক পরিণতিকে ঠেকিয়ে রাখার মতো কোন প্রতিবন্ধকই আর ছিল না; বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ তাদের দুজনকেই সামন্ততন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তবু টিং লিং তাদের পরস্পরের কাছ থেকে তফাতেই রেখে দিলেন। কবে এই দুটি জীবনের ধারা মিলিত হয়ে পুষ্পিত হয়ে উঠবে ব্যক্তিগতভাবেও, সে কথাও অনুচ্চারিত রেখে দিলেন। কারণ বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধ তখনও সমাপ্ত হয়নি। তাদের দুজনের কাছেই বিয়ের বাঁশী বাজাবার সময় আসেনি। টিং লিং একজন কমিউনিস্ট হিসেবে এই সন্ধিক্ষণে নায়ক নায়িকার বিপ্লবী জীবনের দায়িত্বের কথাই চিন্তা করেছেন। তাছাড়া উপন্যাসের শিল্পরূপের বাস্তবতার সম্ভাব্যতার তাগিদও ছিল এইভাবে অনির্দিষ্টভাবে বই শেষ করার মূলে।

আঠারো
বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা

মোপাসাঁ যখন মহাকাব্যিক ধারার উনিশ শতকীয় বাস্তবাশ্রিত চিরায়তিক কাঠামোকে না ভেঙ্গেও তার ভিতরেই মনস্তাত্ত্বিক বিস্ফোরক ভরে তাকে নতুন অভিজ্ঞতায় রসায়িত করে নতুন ধাঁচের উপন্যাস লিখেছেন, এবং যখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত চিরায়তিক কাঠামোকে যারা ভেঙ্গেছেন তাদের পক্ষেও যুক্তি দেখাতে শুরু করেছেন, তখন বাংলা উপন্যাস লেখার কাজটা সবেমাত্র খানিকটা এগিয়ে এসেছে মাত্র। বাস্তবাশ্রিত চিরায়ত ধারার আঠারো উনিশ শতকীয় ইংরেজি ছাঁচেই প্রথমে বাংলা উপন্যাস ঢালা।

তবু উপন্যাসের শিল্পরূপের মূল উপাদান যেহেতু বাস্তব পরিবেশ, মাতৃভাষা ও সজীব-মাববমানবী, সেজন্য বাংলা উপন্যাস প্রথম থেকেই দেশজ উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছিল। যে কৌতুক আর উপহাস উপন্যাসের প্রাথমিক চতুর্থ উপাদান, তাও বাঙ্গালি মানবমানবীর অভিজ্ঞতার আওতার মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিল। তবে বাংলা উপন্যাসের দ্রুত প্রসারের পিছনে কাজ করেছে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী অভ্যুদয়ের পর অভ্যুদয়। রালফ ফক্‌স উপন্যাস শিল্পের নবজন্মের তাগিদ হিসাবে যে উপকরণকে সামনে এনেছেন, এটিও সেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তাগিদ, যদিও প্রথম দিকের উপন্যাসে তার প্রতিফলন ছিল নানাভাবে খণ্ডিত।

চীনা উপন্যাসের মতোই বাংলা উপন্যাসের গতিধারার পিছনে স্বাধীনতার অভ্যুদয় প্রথমদিকে প্রতীক অথবা ভাবপ্রাধান্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পরে চেতনা হয়েছে বিপ্লব বিজ্ঞানীর বাস্তব চেতনা।

অবশ্য বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছিল চীনা উপন্যাসের আগেই। যে কয়েকটি সূত্র অনুযায়ী উপন্যাসের সংজ্ঞা বইয়ের শুরুতেই দাখিল করেছি, সেই সূত্রেই বাংলা উপন্যাসের এই প্রাগ্রসরতা। রোমাঞ্চকর কাহিনীকে উপন্যাস বললে এই প্রাগ্রসরতা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে।

বাংলা উপন্যাসের বৈপ্লবিক বিকাশের বাংলাভাষী পাঠকপাঠিকার কাছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধারার যোগবিয়োগ সম্পর্ক স্বভাবতই সুস্পষ্ট। তবু এই পারম্পর্য বিশ্লেষণের দাবীদার। বাংলা উপন্যাসে পাঁচজন শিল্পীর লেখা পাঁচটি বই নিয়ে নিরীক্ষায় বসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের বৈপ্লবিক ধারা পরিষ্কার হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', গোরা থেকে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', 'পথের দাবী' থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা', এবং গণদেবতা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ' – একেকটা ভিন্ন ভিন্ন যুগের গদ্য মহাকাব্যিক চরিত কথার বিশিষ্টতার বাহক। প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার পদ্ধতিতেও ঘটেছে সুস্পষ্ট তারতম্য। 'আনন্দমঠ' ধর্মীয় দর্শনের প্রতীক মালায় আবৃত। 'গোরা' এই ধর্মীয় প্রতীকমালাকে খুলে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু অনেক সময় নিয়েছে। 'পথের দাবী' শুরুই করেছে ধর্মীয় প্রতীকমালাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। তারাশঙ্করের 'গণ-দেবতা' ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে একটি লোকায়ত ধর্মকে বা সংগ্রামী-ভাবজীবনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এরপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে এই লোকায়ত ধর্মীয় প্রতীকের প্রয়োজনকেও ঘুচিয়ে দিয়ে বৈপ্লবিক ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপস্থাপিত করেছেন। এই পর্যায় পরম্পরার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ইংরেজের শাসনের অবসানের জন্য অভ্যুদয়ের পর অভ্যুদয় অবনত শ্রেণীসমূহকে টেনে এনেছে ঘটনাবলির চরিত্র-কেন্দ্র হিসেবে ক্রমে ক্রমে বেশি বেশি করে। বাস্তব গভীর থেকে গভীরতর এবং বিস্তৃততর হয়েছে।

উপরোক্ত পাঁচটি উপন্যাসকে একটি একটি করে বিশ্লেষণ করলে বাংলা উপন্যাসের বৈপ্লবিক ধারা মহাকাব্যিক গদ্যকথার কাঠামোকে প্রসারিত করতে করতেই কি করে চরম ভাবলৌকিকতা থেকে মনোবাস্তববাদে পৌঁছেছে, এবং বৈদেশিক ঔপন্যাসিক শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুদয়কে বেশি বেশি প্রতিফলিত করার দরুন কিভাবে বাংলা উপন্যাসের বৈপ্লবিক ধারা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আলেখ্যকে প্রথম যুগের ধর্মরাজ্যে স্থাপনের জল্পনাকল্পনা থেকে সর্বশেষ যুগে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে পৌঁছে দিয়েছে সেকথা বুঝতে পারা যাবে।

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস নিয়েই আমাদের বিশ্লেষণ শুরু করতে পারি।

অষ্টাদশ শতকের বাংলার মুনাফালোভী ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর লুণ্ঠনমূলক এবং অথর্ব নবাবের সামন্ততান্ত্রিক দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে তদনীন্তন বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস 'আনন্দমঠ' বিতর্কমূলক।

বইটি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত হয়েছে। বইটির মূল কাহিনীর সঙ্গে এর পরিণতি খাপ খায়নি, এরকম অভিমতও ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বইটির মূলমর্ম হচ্ছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অথচ শেষ দৃশ্যে যে ইংরেজের গুণকীর্তন করা হয়েছে, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারি চাকরির ছাপ পড়েছে।

এসব অভিযোগেরই যুক্তি বইটি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

তবু বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভ্যুদয়মূলক ধারা চিত্রণে 'আনন্দমঠ'ই প্রথম কল্লোল মুখর বই।

'আনন্দমঠ' হচ্ছে একটি স্ববিরোধিতাপূর্ণ উপন্যাস। এতে একদিকে রাজনৈতিক মুক্তির তত্ত্ব আকাশচারী, খণ্ডিত এবং ভাবাত্মক। অপরদিকে মানবমানবীর চরিত কথা এবং বাস্তবজীবনের পরিবেশের সঞ্জীব ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন জীবনের সমগ্র সত্যটি স্পন্দিত হয়ে উঠতে চেয়েছে।

সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবহুল কাহিনী একটি বিশেষ ধর্মীয় দর্শনের প্রতীকমালার মধ্যে মাঝে মাঝে চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছে। আবার রক্তে মাংসে গড়া সাধারণ মানব-মানবী তাদের দেহমনের সমস্ত চাপাপড়া ইচ্ছাকে অত্যন্ত সহজ সরল কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করেছে নিরাবরণ ও নিরাভরণভাবে।

জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটিতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের নেতা সত্যানন্দ দুর্ভিক্ষপীড়িত পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্রকে দলে ভর্তি করার সময় দেশদর্শন করিয়েছেন দেবী দর্শনের মাধ্যমে। জগদ্ধাত্রী মূর্তি – মা যা ছিলেন। কালিমূর্তি – মা যা হয়েছেন। দেবীদুর্গা – মা যা হবেন। আবার স্বাধীনতার জন্যে যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন দেখা গেল, দেবী মাহাত্ম্যকে কোন কাজেই লাগানো হয়নি। সেখানে আগমন হলো এক অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষের, যিনি আবার পরাজিত সত্যানন্দকে নতুনতর যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা থেকে নিবৃত্ত করলেন।

আনন্দমঠের বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণের এখানেই শেষ নয়। আনন্দমঠের অন্যতম নায়িকা শান্তি বৈষ্ণবী সেজে ইংরেজ শিবিরে ঢুকে সেখানে এক সেনানীকে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি পদচিহ্ন গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার নাম করে সেই সাহেবের সঙ্গে একই ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে লাথি মেরে সাহেবকে ফেলে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেল। এই শান্তির কথাবার্তা একেবারে খাঁটি বাংলাভাষা যা সাধারণ গ্রামীণ মেয়েরাই বলতে পারে এবং যা বাংলা উপন্যাসের জন্মঘোষণার প্রাথমিক কলকাকলি। দ্বিতীয়ত, মানব মানবীর চরিত কথাকেই যদি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে, উপন্যাসের শিল্পরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে এমন সব চরিত্রের চিত্রণ যারা বৈষ্ণব পুরাণের ধর্মতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পাশে মাটির পৃথিবীর সতেজ তরু সকলেই।

যেমন ধরা যাক, ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষের মধ্যে অন্যতম নায়িকা কল্যাণীর স্বামী মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যাকে পথের মধ্যে রেখে ইংরেজ এবং নবাবের দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সন্তানদলে যোগ দিল। আর ঐ সন্তানদলের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ ভবানন্দ সন্ন্যাসী কল্যাণীকে বাঁচাতে গিয়ে কল্যাণীর প্রতি আসক্ত হয়ে সন্তানদল ছাড়তে মানসিকভাবে তৈরি হলো।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শিল্পী হিসেবে এইসব ছবি এমনভাবে এঁকেছেন যে, মহেন্দ্রকে আমাদের কাছে আদর্শের যন্ত্র বলে মনে হয়, ভবানন্দকে সত্যিকার মানুষ মনে হয়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভবানন্দ শেষ পর্যন্ত মারা গেল। মহেন্দ্র তার গ্রাম পদচিহ্নে সপরিবারে চলে গেল।

তাত্ত্বিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্রকে উঠিয়েছেন, ভবানন্দকে নামিয়েছেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে ভবানন্দকে দরদ দিয়ে এঁকেছেন। এই কারণে উপন্যাসের পাঠকপাঠিকার সহানুভূতি উদভ্রান্ত বীর ভবানন্দের দিকেই ঝোঁকে। এই চরিত্রটি পরিপূর্ণভাবে সজীব।

বইটির মাঝখানে এবং পরিশেষে ধর্মদর্শন নিয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই এই ধরনের তাত্তিক আলোচনা পাওয়া যাবে। 'দেবী চৌধুরাণী' কিংবা 'রজনী' উপন্যাসেও পাওয়া যাবে এই ধরনের তাত্ত্বিক বিচারের ছড়াছড়ি। এটা উপন্যাসের শিল্পরূপের চিরায়তিক ধারার বাইরের ব্যাপার নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এই সুযোগ নিয়েছিলেন। যাঁরা রুশ সোভিয়েট উপন্যাসে এবং এরই ছাঁচে ঢাকা যে কোন ইউরোপীয় উপন্যাসেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী তত্ত্বের ছড়াছড়ি দেখে এইসব উপন্যাসকে ললিতকলার ক্ষেত্রে বিধর্মী ও প্রচারধর্মী বলে চিহ্নিত করে এসেছেন, তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরূপকে বড় করে দেখাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের বক্তৃতা প্রবণতাকে ঠাহর করতে চাননি। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনাগুলি তো গজগজ করেই চলেছে বইয়ের মধ্যে এবং এই আলোচনা ভারিক্কি ভাষাতেই করা। উপরন্তু আনন্দমঠের মতো তত্ত্ব-প্রধান বইতেও শুধু যে নায়ক-নায়িকারা গ্রামীণ বাংলা ভাষায় কথা বলে তাই নয়, উপন্যাসটির ঘটনা বর্ণনাতেও এই গ্রামীণ ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ, একটি গ্রামের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

একটি গ্রাম ও একটি গৃহের বর্ণনার বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়েই বিষয়টিকে যাঁচাই করে নেওয়া যাক। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

'নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে নাকি? ভাবিয়া চিন্তিয়া জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিত শিশু কন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে জীবানন্দ একবার দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা। কেননা, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে

দেখিলাম। যাহা হউক মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করা চাই, না হইলে বাঘভালুকে খাইবে।

ভবানন্দ ঠাকুর এখানেই কোথায়ও আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর।

লোকে বলে ভরুইপুর।

ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস।

নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমল তৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁঠাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজল পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছুদূর ময়ূর উচ্চরবে কেকারব করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই— কাহারও চালে একটি ময়নার পিঞ্জির, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা; কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত, কৃষ, জীর্ণ, সন্তপ্তিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে। জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননের মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে ঘর। গৃহস্থের গরু আছে। ছাগল আছে, একটি ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটি টিয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবু গাছ আছে, গোটাকতক 'মল্লিকা যুঁই-এর গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে: কিন্তু বাড়িতে বড় লোক নাই।

জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

উপন্যাসের বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবেই গ্রাম-বাংলাকে দেখেছিলেন গ্রামীণ মানুষের দরদ দিয়ে। ভাষা তথাকথিত বঙ্কিমী সাধুগদ্য হলেও এত আশ্চর্য সাবলিল যে মনে হয় কথ্যভাষা।

এই আনন্দমঠেই রয়েছে বাংলাকে মা বলে সম্বোধন করে পৌরাণিক দেবীদুর্গার অর্চনার কাঠামোর মধ্যে স্বদেশ সঙ্গীত বন্দেমাতারম। কবি জয়দেবের সুললিত ছাঁচে ঢালা সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই সঙ্গীত। এই সঙ্গীত দীর্ঘকাল জাতীয় মুক্তির গান হিসাবে উপন্যাসের কাহিনী থেকে ছিন্ন হয়ে গীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র বন্দেমাতরম গানের রচয়িতা হিসেবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একটি পর্যায়ে এই গান নিয়ে তীব্র ও তিক্ত বিতর্ক হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাববাদী এবং একটি বিশেষ

ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এই ধরনের ডামাডোলের মধ্যে বাংলার উপরোক্ত গ্রাম-বর্ণনার দেশ-দর্শন বস্তুতপক্ষে চাপা পড়ে গিয়েছে। আনন্দমঠের নব মূল্যায়নে এই দেশ-দর্শন চাপা পড়ে থাকা উচিত কি?

আনন্দমঠের ধর্মীয় প্রতীকমালার মধ্যে থেকেও দেশকে যে এইভাবে তার বাস্তবরূপে বিচিত্র করে দেখা এটাই পরে গোরা, পথের দাবী, গণদেবতা, আর দর্পণ উপন্যাসে ক্রমেই বেশি বেশি করে খোলা খুলি সামনে এসেছে।

আনন্দমঠের পরে উপরোক্ত চারখানা বই এক এক করে নিয়ে বসলেই একথাটা পরিষ্কার হবে।

আনন্দমঠের মধ্যে দিয়ে আরেকটি উপাদানও বিশেষ করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে পটভূমি করে লেখা বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে সূচিত হয়েছিল। এটি হচ্ছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নারী চরিত্রের সংগ্রামী ভূমিকা।

আনন্দমঠের শান্তি নাম্নী মেয়েটি ইংরেজকে শুধু লাথি মেরে লাঞ্ছিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ইংরেজ শাসকদের প্রতি শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ হেনে চরম অবজ্ঞা দেখিয়েছে। একথা বললেই হবে না যে রহস্যচ্ছলে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসকদের উপর ঝাল ঝেড়ে নিয়েছেন। আসলে ইংরেজদের প্রতি শান্তির অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তা শান্তির বিশেষ চরিত্র থেকেই বেরিয়ে এসেছে।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস যত রাজনৈতিক শুষ্কতত্ত্বই আলোচনা করুক না কেন তার মধ্যে সাধারণ মানব-মানবীর যে প্রথম থেকেই সহানুভূতি বা সমানুভূতি জাগিয়েছে, তার প্রমাণ আনন্দমঠের শান্তি। জীবানন্দ যখন তার স্ত্রী শান্তিকে ছেড়ে সন্নাসী হয়ে যায়, তখন শান্তি পুরুষ বেশ নিয়ে সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভিড়তে গিয়ে নাজেহাল হয়ে ঘরে ফিরে এলে সেখানে তার দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনের যে ছবি, তা বাংলা উপন্যাসে ক'জন শিল্পী আঁকতে পেরেছেন?

উপরোক্ত কয়েকটি কারণেই আনন্দমঠকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রবর্তক বলে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র এর পরে পৌরাণিক প্রতীকমালা থেকে মুক্ত যে সব সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে শান্তির মতো একটি সাহসিনী নায়িকা আর দেখতে পাওয়া যায়না। দেবীচৌধুরাণীতে প্রতাপময়ী রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেও যত গুণসম্পন্ন হিসেবে বিচিত্র হোক না কেন, শান্তির কাছে ঘেঁষতে পারে না।

এর কারণ এই যে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বঙ্কিমচন্দ্র খণ্ডিত চিত্রেও বাংলা উপন্যাসে যে মাটির কাছাকাছি দেশ-ধারণার জন্ম হয়েছিল, তার মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিল শান্তি।

এখান থেকে তাহলে একটা সিদ্ধান্তেও যাওয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের প্রভাব উপন্যাসের শিল্পরূপকে খর্ব করে নি, বরং তাকে করে তুলেছে সত্যিকার জীবনের দর্পণ।

একমাত্র এই অর্থে আনন্দমঠ বৈপ্লবিক যদিও বিপ্লব তার প্রথম পর্যায়েই স্থগিত।

উনিশ
বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা (২)

আনন্দমঠের পরে রবীন্দ্রনাথের গোরা।

আনন্দমঠের সঙ্গে 'গোরা'র পার্থক্য যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের শুরুতে তাঁর সমসাময়িক জীবন নিয়ে এই উপন্যাস লিখেছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসটি লিখেছিলেন ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, যদিও কাহিনীটি নিয়েছিলেন তিনি আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে। 'গোরা' উপন্যাসটি আনন্দমঠের তুলনায় এ দিক দিয়ে অগ্রসর।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোরা' লিখেছেন, তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন একটা বিপ্লবাত্মক রূপ নিলেও তার ঘটনাবলি উপন্যাসের মধ্যে রূপায়িত হয়নি। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকেই সমসাময়িক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফসল বলে চিহ্নিত করার কথা উঠতে পারে। কিন্তু যদি মনে করা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে তদানীন্তন বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন, তাহলে ভুল করা হবে। আসল কথা এই যে তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউগুলি যে আপাত দৃষ্টিতে নিস্তরঙ্গ সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারই গভীরে যেতে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'গোরা' উপন্যাসে।

সিপাহী বিপ্লবের ঘটনাবলি থেকে একটি মাত্র সূত্র টেনে নিয়েছেন তিনি ভারতের জাতীয় ধ্যান ধারণার মানবিক সূত্র বার করার জন্য। তার মধ্যকার ঘাতপ্রতিঘাত বার করে আনার জন্যে। সিপাহী বিপ্লবের সময় এক পলাতক আইরিশ মহিলা গোরাকে জন্ম দিয়েই গোরার পালয়িত্রী জননী আনন্দময়ী আশ্রয়ে মারা যান। গোরাকে বাঙ্গালি সরকারি কর্মচারী কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন কাউকে কাউকে কিছু না জানিয়ে। কৃষ্ণদয়াল কিছু বলেননি কোনদিন। শাসক জাতির সাহেবের ছেলে গোরা হয়ে উঠলো সাহেবদ্রোহী ভারতীয় দেশপ্রেমিক। আনন্দমঠের সত্যানন্দের ধরনেরই গোঁড়া ধর্মধ্বজীও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইভাবে গোরাকে নাটকীয় উপাদান দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সম্ভবত ঘটনাধারার মধ্যদিয়ে গোঁড়া হিন্দু-জাতীয়তাবাদকে আঘাত করে ধরাশয়ী করে ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমকে বড় করে দেখবার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসটির আখ্যানকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন সেটি তাই প্রণিধানযোগ্য। উপন্যাসের দুই নায়ক গোরা আর বিনয়—দুই শিক্ষিত যুবাবন্ধু কলকাতার নাগরিক। তারা হিন্দু ঘরের ছেলে। গোরা গোঁড়া আর বিনয় উদার। দুই নায়িকা সুচরিতা আর ললিতা দুই শিক্ষিত সম্পর্কিত বোন—কলকাতার নাগরিক। ওরা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। বিনয় এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচিত হলো দুর্ঘটনার মারফত, একটা

ছেকরা ঘোড়ার গাড়ির আরোহী হিসাবে যখন পরেশ বাবুরা পড়লেন বিনয়ের বাসার সামনে। অতঃপর পরেশ বাবুদের বাড়িতে প্রথম সুচরিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারপর ললিতার প্রেমে পড়লো বিনয়। গোরার সঙ্গে এই পরিবারের পরিচয়টিতে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন। গোরা যদিও প্রথম যৌবনে রীতিদ্রোহী ব্রাহ্মসমাজর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেছিল, কিন্তু পরে এক খৃষ্টান মিশনারীর ভারত-বিরোধী মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে তার সঙ্গে তর্কে ব্যাপৃত হয়ে গোঁড়া হিন্দু হয়ে উঠেছিল। হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মবিরোধী । তাঁর মতিগতি দেখে কৃষ্ণদয়াল উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে তিনি গোরাকে পথে আনার জন্যে একটি উপায় বের করেছিলেন। পরেশবাবু ছিলেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু। গোরাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি পরেশ বাবুদের বাড়িতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে :

"কৃষ্ণদয়াল আনন্দময়ীকে বলিলেন, গোরার বিবাহ সম্বন্ধে আমি একটা পরামর্শ মনে মনে করেছি। পরেশ ভটচাজ আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত। সে স্কুল ইন্সপেক্টরির কাজে পেনশন নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে। সে ঘোর ব্রাহ্ম। শুনেছি তার ঘরে অনেকগুলি মেয়েও আছে। গোরাকে তার বাড়িতে যদি ভিড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে যাতায়াত করতে করতে পরেশের কোন মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। তার পরে প্রজাপতির নির্বন্ধ।"

এরপরে কলাকাতা শহরের ছাদ আর বসবার ঘর নিয়ে যে বসত বাড়ি, সেখানেই নায়ক-নায়িকাদের আলাপ পরিচয় এবং প্রেমেপড়া।

কলকাতার বাইরে যে বিশাল 'ভারতবর্ষ', গোরার কাছে তাই ছিল উপাস্য। এই ভারতবর্ষ তার কাছে ছিল তর্কে জিতবার বিষয়। এই বিষয়টির সামনে কলকাতার আকর্ষণ সে অনুভব করতো না, কোন নারীর প্রেমে পড়া তার কাছে ছিল অভাবনীয়। মা আনন্দময়ী ছাড়া দ্বিতীয় কোন নারীর ছায়াই সে মাড়ায়নি। সে যখন সুচরিতার প্রেমে পড়লো, তখন এই দুর্বলতা ও আদর্শ ভ্রষ্টতা মনে করে কলকাতা ছেড়ে দেশ দর্শনে বার হলো। এখানে ধর্মীয় ভাববাদে ঘেরা দেশের উপর থেকে একটা আবরণ সরে গেল তার চোখের সামনে। এখানে গোরা দেখলো পরাধীন ভারতবর্ষের অধঃপতিত লোকরূপ। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে লোক খেপানোর দায়ে তাকে জেলে যেতে হয়। এরপরে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের ধর্মীয় ভাববাদী আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সে তার প্রণয়িনীকে আশ্রয় করলো এবং দেশকেও গ্রহণ করলো তার বাস্তবরূপে।

এই সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটলো একটা দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায়। আনন্দমঠ পড়ার পরে 'গোরা' পড়তে পড়তে মনে হয়, বঙ্কিমী ধর্মীয় প্রতীকমালা থেকে দেশ চেতনাকে মুক্ত করার জন্যই কি রবীন্দ্রনাথকে দ্বন্দ্বাত্মক ঘাত প্রতিঘাতময় বিশাল উপন্যাস লিখতে হয়েছে?

আনন্দমঠ উপন্যাসের দ্বন্দ্বাত্মক গতি পরিণতি এই যে, এতে কয়েকটি মানব মানবীর স্বাভাবিক সজীব বিকাশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সনাতন ধর্মের ভবিতব্যতাকে। আর গোরা উপন্যাস দ্বন্দ্বাত্মক গতি পরিণতির মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে লোকায়ত দেশধর্মী

হয়েছে। এটা করতে রবীন্দ্রনাথকে যে বিশালকায় উপন্যাস লিখতে হলো, তার কারণ নিশ্চয় এই যে, সে সময়ে মধ্যবিত্ত মানসে গোরার সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ব্যাপারটা যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ এবং তর্কসাপেক্ষ ছিল।

গোরা উপন্যাসের দুই নায়িকা সুচরিতা এবং ললিতা আনন্দমঠের দেহ মনোরমা শান্তির পাশে নিছক ভাবময়ী হিসেবে চিহ্নিত। ললিতা চঞ্চলা, আর সুচরিতা সুধীরা, এই যা তফাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে সুচরিতাকে শান্তির মতো শেষ পর্যন্ত কোন আধ্যাত্ম-সন্ন্যাসের জগতে না নিয়ে বাস্তব দেশের মুক্তির কাজে গোরার পাশে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এটা করতেই রবীন্দ্রনাথকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই এইজন্যে কলকাতার কাঠামোতে আধুনিক ও প্রাচীনের বিরোধের সুর।

কলকাতা শহরে এক সন্ধ্যায় গোরাদের বাড়িতে গোরর ঘরে বসে গোরা আর বিনয় যে আলাপ করছিল, তা এখানে উল্লেখ করা দরকার। কিভাবে উপন্যাসের শিল্পরূপের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানকে দ্বন্দ্বাত্মক সংলাপের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নায়ক নায়িকাদের ধর্মীয় প্রতীকের প্রভাব কাটিয়ে তুলে যুক্তির সত্যে এনে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন?

এখানে গোরা উপন্যাস থেকে বিস্তারিত একটি অংশের উল্লেখ করছি :

'গোরা সেই সময় আলোটি জ্বালাইয়া লিখিতে বসিয়াছে। গোরা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, 'কিগো বিনয়, হাওয়া কোন দিক থেকে বইছে?'

বিনয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, 'গোরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি—ভারতবর্ষ তোমার কাছে খুব সত্য? খুব স্পষ্ট? তুমিতো দিনরাত্রি তাকে মনে রাখ; কিন্তু কিরকম করে মনে রাখ।'

গোরা লেখা ছাড়িয়া কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল—তার পরে কলম রাখিয়া চৌকির পিঠের দিকে ঠেশ দিয়া কহিল, 'জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয়, আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেছি।'

বিনয়। কোথায় তোমার সেই ভারতবর্ষ?—গোরা বুকে হাত দিয়া কহিল, আমার এইখানের কম্পাসটা দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানেই, তোমার মার্শম্যান সাহেবের হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে নয়।

বিনয়। তোমার কাঁটা যেদিকে, সেদিকে কিছু একটা আছে কি! গোরা উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'আছে নাতো কী! আমি পথ ভুলতে পারি, কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ—ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্মে পূর্ণ—সে ভারতবর্ষ কোথায়ও নেই? আছে কেবল চারিদিকের এই মিথ্যেটা! এই তোমার কলকাতা শহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক ইট কাঠের বুদবুদ! ছোঃ।'

বলিয়া গোরা বিনয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। বিনয় কোন উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল। গোরা কহিল, 'এই যেখানে আমরা পড়ছি শুনছি, চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি, দশটা পাঁচটার ভূতের খাটুনি খেটে কি যে করছি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য বলে ঠাউরেছি বলেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান বলে, মিথ্যে কর্মকে কর্ম বলে, দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছি–এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনরকম চেষ্টায় প্রাণ পাব। আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরছি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না পেলে আমরা কী বুদ্ধি কী হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলছি, আর সমস্ত ভুলে কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকে জাহাজ ভাসাতে হবে–ডুবি তো ডুববো মরিতো মরব। সাধে আমি ভারতবর্ষের সত্যমূর্তি, পূর্ণমূর্তি–কোনদিন ভুলতে পারি নে।'

বিনয়। এসব কেবল উত্তেজনার কথা নয়? এ তুমি সত্য বলছ? গোরা মেঘের মত গর্জিয়া কহিল, সত্যিই বলছি।

বিনয়। 'যারা তোমার মতো দেখতে পাচ্ছে না?'

গোরা মুঠা বাঁধিয়া বলিল, তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। এইতো আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট দেখতে না পেলে লোকে আত্মসমর্পণ করবে কোন উপছায়ার কাছে। ভারতবর্ষের সর্বজনীন মূর্তিটা সবার কাছে তুলে ধরো–লোকে তাহলে পাগল হয়ে যাবে। তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে! প্রাণ দেবার জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।'

বিনয়। 'হয় আমাকে সংসারের দশজনের মতো ভেসে চলে যেতে দাও, নইলে আমাকে সেই মূর্তি দেখাও।'

গোরা। সাধনা কর। যদি বিশ্বাস মনে থাকে তাহলে কঠোর সাধনাতেই সুখ পাবে। আমাদের সৌখিন পেট্রিয়টদের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই, তাই তাঁরা নিজের এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। স্বয়ং কুবের যদি তাঁদের সেধে বর দিতে আসেন তাহলেও তাঁরা বোধ হয় লাট সাহেবের চাপরাশির মত গিল্‌টিকরা তক্‌মাটার চেয়ে বেশি আর কিছু সাহস করে চাইতেই পারবেন না। তাঁদের বিশ্বাস নেই, তাই ভরসা নেই।

বিনয়। ... গোরা, তুমি আমাকে যা হয় একটা কাজে লাগিয়ে দাও।

গোরা। কাজের কথা বলছ? এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলছি; আমাদের প্রত্যেকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার করলে আমরা কাজ করবার ক্ষেত্রটি পাব। এখন যে কোন কাজ করতে যাই, সে কেবল ইতিহাসের ইস্কুল বইটি ধরে পরের কাজের নকল হয়ে উঠে। সেই

ঝুঁটো কাজে কি আমরা কখনো সত্যভাবে আমাদের সমস্ত প্রাণধন দিতে পারব। তাতে কেবল নিজেদের হীন করে তুলব।'

কিন্তু এও তো এক ধরনের প্রতীক। হৃদয় প্রতীক। এই ভাবলৌকিক যুক্তিকে বাস্তব সত্যের উপলব্ধিতে নিয়ে যাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিয়েছেন প্রেমে পড়ার ব্যাপার নিয়ে গোরার কলকাতা ত্যাগের।

আনন্দমঠের মতো লড়াইএ নামবার জন্য গোরা কলকাতা ছাড়েনি। ছেড়েছে সুচরিতার আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে নেবার জন্য। তবু এরপর গোরা যে দেশ দেখল, তাও আনন্দমঠের গ্রাম দর্শনের থেকে অনেক বেশি বাস্তব। সুচরিতার প্রেমে পড়ার পরে গোরার কাছে 'ইটকাঠের কলকাতা' যে কিরকম মোহনীয় হয়ে উঠেছিল, সেই ভাবলৌকিক ছবিটি গ্রামদেশের বাস্তবকে প্রখর করে দেখাতে পারে। এই জন্যই এই ছবিটি প্রথমে দেখে নেয়া যাক। এছবি মোহনীয়, কিন্তু অবাস্তব নয়। এটাই হচ্ছে উপন্যাসের ভাবলৌকিকতার বৈশিষ্ট্য। ছবিটি নিম্নরূপ :

'গোরা তার স্বাভাবিক দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া চলিল। বাড়ি যাইবার সহজ পথ ছাড়িয়া সে অনেকটা গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিল।'

প্রকৃতি কোনোদিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অতিরিক্ত অন্ধকার গোরার হৃদয়কে বারবার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল।

আজ বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল।

চারিদিক হইতে মাধুর্যের আবর্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে একটা অতলস্পর্শ অনাদিশক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্বে কোনদিন সে তাহার পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে বেদনায় এবং আনন্দে তাহার সমস্ত মনকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অভিহিত করিতে লাগিল। আজ এই হেমন্তের-রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিণী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল; এই মায়াবিনীকে সে এতদিন নতমস্তকে স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ আকস্মাৎ তাহার সামনের ইন্দ্রজাল আপন সহস্রবর্ণের সূত্রে গোরাকে জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে চারিদিক হাতে বাঁধিয়া ফেলিল। গোরা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বিস্মিত হইয়া নদীর জনশূন্য ঘাটের একটা পঁইঠায় বসিয়া পড়িল। বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং ইহার কি প্রয়োজন। যে সংকল্পের দ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়। ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা দুটি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল, অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দৃষ্টি স্নিগ্ধচক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাতছানির আঙ্গুলিগুলি স্পর্শ সৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল—গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের

বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে–সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল। সে তাহার এই নতুন অনুভূতিকে সমস্ত দেহমন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল; ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।'

গোরা এই আবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বভাবতই অধীর হয়ে উঠলো। এবং তিনজন বশংবদ সঙ্গীকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড ধরে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো। ঠিক হলো পথের মধ্যে গৃহস্থবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবে, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই নেবে না। কিন্তু গোরা কী দেখলো?

'ভদ্রসমাজ, শিক্ষিত সমাজ ও কলকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল, সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অসচেতন এবং মঙ্গল সম্মন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত, পৃথিবীর বৃহৎ চলিবার পথে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত, তুচ্ছতাকে সে যে কতোই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চল ভাবে কঠিন, তাহার মন যে সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন বাস না করিলে কোন মতেই কল্পনা করিতে পারিত না। এই অজ্ঞতা, জড়তা, ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না, একথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।'

কিন্তু গোরা আরও কিছু আবিষ্কার করলো। আবিষ্কার করল চরঘোষপুর নামক মুসলমান পাড়াকে, ও থানা পুলিশের অত্যাচারের কথা :

'যে জমিদারিতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে; কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সকলেই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষ্যে দুইবার পুলিশকে ঠেঙাইয়া জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এপারে নদীর কাচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো পাইয়াছিল–আজ মাস খানেক হইল, নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দার সাহেবের ডানহাতের উপর এমন এক লাঠি বসাইয়া দিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এতবড় দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই; ইহার পর হইতে পুলিশের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মত লাগিয়াছে–প্রজাদের কাহারো কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না, ফরুসর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন; এমন

কি তাহার পরনের একখানিমাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারে না; তাহার একমাত্র বালক পুত্র তমিজ নাপিতের স্ত্রীকে গ্রাম সম্পর্কে মাসি বলিয়া ডাকিত, সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী নিজেদের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশ দেড়েক তফাতে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে, তদন্ত উপলক্ষ্যে গ্রামে যে কখন আসে এবং কী করে তাহার ঠিকানা নাই।'

গোরা ঠিক করল সে চরঘোষপুরে থেকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া গেল না। সেই নাপিতই তাকে রাখতে সাহসী হলো না। তখন গোরা একাই দারোগার সঙ্গে দেখা করে তাকে শাসালো। তারপর সদরে গেল সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে সে বললো,

'আপনি যখন অত্যাচারের প্রতিবিধান করবেন না বলে স্থির করেছেন এবং গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে আপনার ধারণাটা যখন বদ্ধমূল, তখন আমার আর কোন উপায় নেই, আমি গ্রামের লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য উৎসাহিত করবো।'

গোরা প্রথমে জামিন করিয়ে চাষীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করলো। পারলো না। এমন সময় পুলিশ আর ছাত্রদের মধ্যে একটা মারামারির মধ্যে গিয়ে পুলিশকে প্রহার করার দায়ে গোরা গ্রেফতার হলো এবং তার জেল হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে গোরা আরও নিবিড় করে দেশকে দেখলো।

"কারাগার হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে গোরার কাছে সমস্তদিন এত লোক সমাগত হইতে লাগিল যে, তাহাদের স্তবস্তুতি ও আলাপ আলোচনার নিশ্বাসরোধকর অজস্র বাক্যরাশির মধ্যে বাড়িতে বাস করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

গোরা তাই পূর্বের মতো পুনর্বার পল্লিভ্রমণ আরম্ভ করিল। সকাল বেলায় কিছু খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইত, একেবারে রাত্রে ফিরিয়া আসিত। ট্রেনে করিয়া কলিকাতার কাছাকাছি কোনো একটা ষ্টেশনে নামিয়া পল্লিগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত। সেখানে কলু-কুমার কৈবর্ত প্রভৃতিদের পাড়ায় সে আতিথ্য লইত। এই গৌরবর্ণময় প্রকাণ্ডকায় ব্রাহ্মণটি কেন যে তাহাদের বাড়িতে এমন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইতেছে তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না, তাহাদের নানা প্রকার সন্দেহ জন্মিত। কিন্তু গোরা তাহাদের সমস্ত সংকোচ-সন্দেহ ঠেলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে অপ্রিয় কথাও শুনিয়াছে, তাহাতেও নিরস্ত হয় নাই।"

গোরা এখন দেখল হিন্দুসমাজের লৌকিক স্তরগুলিও লোকাচারের বন্ধনে আবদ্ধ। গোরার মুখে বিধবা-বিয়ের পক্ষে যুক্তি শুনে লোকে চটে গেল। গোরার কাছে মুসলমান সমাজকে লোকাচারমুক্ত মনে হল। একজন কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী হিসেবে "একথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে।" দেশাত্মবোধটাকেও সে নতুনভাবে দেখলো :

"শিক্ষিত সমাজে গোরা যখন লিখিয়াছে, তর্ক করিয়াছে, বক্তৃতা দিয়াছে, তখন সে অন্যকে নিজের পথে আনিবার জন্য, স্বভাবতই নিজের কথাগুলিকে কল্পনার দ্বারা মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, যাহা স্থূল তাহাকে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আবৃত করিয়াছে, যাহা অনাবশ্যক ভগ্নাবশেষমাত্র তাহাকেও চন্দ্রালোকে মোহময় ছবির মতো করিয়া দেখাইয়াছে। দেশের একদল লোক দেশের প্রতি বিমুখ বলিয়াই দেশের সমস্তই তাহারা মন্দ দেখে বলিয়াই, স্বদেশের প্রতি অনুরাগবশত গোরা এই মমত্ববিহীন দৃষ্টিপাতের অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বদেশের সমস্তকেই অত্যুজ্জ্বলভাবের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে অহোরাত্র চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতেই গোরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সবই ভালো; যাহাকে দোষ বলিতেছ তাহা কোন একভাবে গুণ, ইহাকে গোরা যে কেবল উকিলের মতো প্রমাণ করিত তাহা নহে, ইহাই সে সমস্ত মন দিয়া বিশ্বাস করিত। নিতান্ত অসম্ভব স্থানেও এই বিশ্বাসকে স্পর্ধার সহিত জয়পতাকার মতো দৃঢ় মুষ্টিতে সমস্ত পরিহাসপরায়ণ শত্রুপক্ষের সম্মুখে সে খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কেবল একটিমাত্র কথা ছিল, স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা সে ফিরাইয়া আনিবে, তাহার পরে অন্য কাজ। কিন্তু যখন সে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করে তখন তো তাহার প্রমাণ করিবার কিছুই নাই, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষকে নত করিয়া দিবার জন্য তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন থাকে না—এইজন্য সেখানে সত্যকে সে কোন প্রকার আবরণের ভিতর দিয়া দেখে না। দেশের প্রতি তাহার অনুরাগের প্রবলতাই তাহাকে সত্য দৃষ্টিকে অনসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়।"

কিন্তু সুচরিতার প্রতি আকর্ষণ এড়াবার জন্য যে গোরা দেশ দেখলো, জেলে গেল এবং আবার দেশ দেখলো, সেই যখন হিন্দু আর ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতের উপরে প্রেমকে বড় করে দেখে সুচরিতার প্রতি প্রেমের আকর্ষণকে স্বীকৃতি দিয়ে সুচরিতার বাড়িতে গিয়ে দেখলো, সুচরিতর দরজা বন্ধ, সুচরিতা অনুপস্থিত, তখন আবার সে তার পুরানো ভাবজগতে প্রবেশ করলো।

'সে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষের হইয়া দেবতার আরাধনা তাহাকে করিতে হইবে, ভারতবর্ষের হইয়া তপস্যা তাহারই কাজ। আসক্তি অনুরক্তি তাহার নহে। গোরা মনে মনে কহিল; বিধাতা আসক্তির রূপটা আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন। দেখাইলেন তাহা শুভ্র নহে, তাহা মদের মতো রক্তবর্ণ ও মদের মত তীব্র, তাহা বুদ্ধিকে স্থির থাকিতে দেয় না, তাহা এককে আর করিয়া দেখায়—আমি সন্ন্যাসী, আমার সাধনার মধ্যে তাহার স্থান নাই।'

গোরা শুধু ভাবলোকেই ফিরলো না, লোকাচারেও প্রত্যাবর্তন করলো।

"সুচরিতার দ্বারা গোরার মন যে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার কারণ সে ভাবিয়া দেখিল—সে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে, কখন নিজের অগোচরে সে ইহাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে নিষেধের সীমা টানা ছিল, এই সীমা গোরা দম্ভভরে লঙ্ঘন করিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পদ্ধতি নহে। প্রত্যেকে নিজের সীমা রক্ষা করিতে না পারিলে সে যে কেবল জানিয়া এবং না জানিয়া নিজেরই অনিষ্ট করিয়া ফেলে তাহা নহে, অন্যের হিত করিবার বিশুদ্ধ শক্তি তাহার চলিয়া যায়।

সংসর্গের দ্বারা নানা প্রকার হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়া জ্ঞানকে নির্বাক শক্তিকে আবিল করিয়া তুলিতে থাকে।

কেবল ব্রাহ্মঘরের মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে গিয়াই যে সে এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নহে। গোরা জনসাধারণের সঙ্গে যে মিশিতে গিয়াছিল সেখানেও একটা যেন আবর্তের মধ্যে পড়িয়া নিজেকে নিজে হারাইবার উপক্রম করিয়াছিল।"

গোরা ঠিক করলো যে সে প্রায়শ্চিত্ত করবে। তার একজন গুরুমারা চেলা কাগজে প্রবন্ধ লিখে ফেললো :

"আমাদের দেশ যেমন নিজের দুষ্কৃতির ফলে বিদেশীর বন্দীশালায় আজ দুঃখ পাইতেছে, গোরাও তেমনি নিজের জীবনে সেই বন্দীশালার বাসদুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইরূপে দেশের দুঃখ সে যেমন নিজে বহন করিয়াছে, এমনি করিয়া দেশের অনাচারের প্রায়শ্চিত্তও সে নিজে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে; অতএব ভাই বাঙালি, ভাই ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি দুঃখী সন্তান, তোমরা ইত্যাদি ইত্যাদি।"

কিন্তু গোরাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো না। গোরার পালক পিতা এককালের প্রচণ্ড দিশিসাহেব এবং শেষ বয়সে সনাতনধর্মী কৃষ্ণদয়াল যখন ভেবে দেখলেন-তিনি মারা গেলে গোরা তাকে পিণ্ড দেবে, তখন গোরাকে প্রায়শ্চিত্ত থেকে প্রতিনিবৃত্তি করার জন্য গোরার জন্ম বৃত্তান্ত বললেন তাঁকে ডেকে তার পালয়িত্রী মা আনন্দময়ীর সামনে।

গোরা মায়ের অনুমতি নিয়ে সুচরিতাদের পালক পিতাকে বললো, 'পরেশবাবু আমার কোন বন্ধন নেই।'

"আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু। আমি যে পতিত হব, ভ্রষ্ট হব, সে ভয় আর আমার নেই–আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।"

"আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলাম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতে আতিথ্য নিয়েছি–কিন্তু কোনমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারিনি, এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারিনি।"

"আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি–মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

"আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই–যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না–যিনি কেবল হিন্দুরই দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরও দেবতা।"

এরপরে প্রেমের জয়।

"এতক্ষণে গোরা সুচরিতার দিকে ফিরিল। সুচরিতা তাহার চৌকির উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। গোরা হাসিয়া কহিল, 'সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ওই গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।' এই বলিয়া গোরা তাহার দিকে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সুচরিতা উঠিয়া গিয়া নিজের হস্ত তাহার হাতে স্থাপন করিল। তখন গোরা সুচরিতাকে লইয়া পরেশকে প্রণাম করিল।"

গোরা উপন্যাস শেষ হলো একটা বৃহত্তর দৃষ্টির তথা মানবধর্মের পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে এনে। দেশপ্রেম আর মানবধর্মকে একাকার করে দেখানো হলো। এদিক দিয়ে বুঝতে পারা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তুলনায় স্বাধীনতার ধ্যান ধারণা তার পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

আনন্দমঠে দেখেছি উপন্যাসের শিল্পরূপের তাগিদে একধরনের দ্বন্দ্ব। পরিবেশ যেখানে বাস্তব, মানব মানবী যেখানে লৌকিক, চিন্তা সেখানে পৌরাণিক। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে লেখা, তবু বিদ্রোহের দর্শন সুদূরতম অতীত কোন দানবদলন কল্পলোকমুখী, কারণ, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে তখন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে; ইংরেজ বেনিয়ার কোম্পানিরাজ বৃটিশ সাম্রাজ্যিক রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করেছে। স্তব্ধ হয়ে রয়েছে রাজনৈতিক অসন্তোষ।

গোরা যখন লিখিত হয়েছে, তখন রাজনৈতিক অসন্তোষ বুদ্ধিগত আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এরদ্বারা সংক্রামিত হয়ে কিছু কিছু বিস্ফোরণ ঘটেছে নিপীড়িত ভারতবর্ষের চাপাপড়া স্তরগুলিতে, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। শুরু হয়েছে বিপ্লবের শক্তির সন্ধান কয়লার খনির সন্ধানের মতো। কিন্তু গভীরে যায়নি, কারণ, জনগণ তখনও তরল পর্বতের মধ্যে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠেনি আমূল। তজ্জন্য ভাবের ঐক্যের মধ্যেই বৈপ্লবিক ঐক্য পাবার প্রয়াস।

এজন্যই 'গোরা' উপন্যাসেও একই সঙ্গে ব্যাপক বাস্তবতার পাশাপাশি উচ্ছ্বাসিত ভাবলৌকিকতার এক দ্বান্দ্বিক বিকাশ।

গোরা আর সুচরিতা, এবং বিনয় আর ললিতার প্রেম মূলত ভাবলৌকিক।

গোরা আর সুচরিতার প্রেমভাবে বুদ্ধির প্রাধান্য, বিনয় আর ললিতার প্রেমভাবে অনুভবের প্রাধান্য। দুটির মধ্যেই রয়েছে দেশপ্রেম। গোরা-সুচরিতার প্রেমে কর্মময় দেশপ্রেমের তাগিদ। বিনয় আর ললিতার প্রেমে প্রীতিময় দেশ প্রেমের তাগিদ। দুটি প্রেমেরই প্রেরণাদাত্রী গোরার মা আনন্দময়ী, যিনি মুক্তবুদ্ধি আশ্চর্য স্নেহময়ী দৃঢ় চরিত্রা রমণী।

এই কারণেই মানব মানবীর চরিত্র অঙ্কনে ভাবলৌকিকতাকে প্রাধান্য দিলেও রবীন্দ্রনাথ শুধু নায়ক-নায়িকাদের নয়, অন্যান্য চরিত্রকেও সুস্পষ্ট মুখচ্ছবি চরিতরেখা দিয়েছেন।

এদিক দিয়ে গোরা মহাকাব্যিক চিরায়তিক উপন্যাস।

গোরা আর সুচরিতা যখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো, তখনকার দুটি ছবি তাই প্রনিধানযোগ্য :

(১) গোরা আর সুচরিতার পাণিপ্রার্থী হারানবাবু বাঙালির দোষগুণ নিয়ে তর্ক করছিল। গোরা বাঙালির পক্ষে, হারানবাবু ইংরেজের পক্ষে।

"দুইপক্ষে এইরূপে যখন তর্ক চলিতেছে সুচরিতা টেবিলের প্রান্তে বসিয়া পাখার আড়াল হইতে গোরাকে একদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল... গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুইবাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ্র ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে; তাহার মুখে কখনো অবজ্ঞার হাস্য–কখনো বা ঘৃণার ভ্রুকুটি তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। ... সুচরিতা বিস্মিত হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। সুচরিতা তাহার জীবনে এতদিন পরে এই প্রথম একজনকে একটি বিশেষ মানুষ, একটি বিশেষ পুরুষ বলিয়া যেন দেখিতে পাইল। এই গোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হারানবাবু অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িলেন। ...সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। ... মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই প্রথম তাহা দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।

(২) "হারানবাবু চলিয়া গেলে সুচরিতা একটা কোন সুগভীর লজ্জায় মুখ যখন রক্তিম ও নত করিয়া বসিয়াছিল, কী বলিবে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, সেই সময় গোরা তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে। মুখের ডৌলটা কী সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপর ললাটটি–যেন শরতের আকাশ খণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট দুটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে। নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্বে কোনদিন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে সমস্তের প্রতি তাহার একটা ধিক্কারভাব ছিল–আজ সুচরিতার দেহে তাহার নতুন ধরনের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভালো লাগিল। সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল, তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরা চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইল। দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহসজ্জা, তাহার পরিপাটি লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল। তাহা যে গৃহ, তাহা যে সেবাকুশলী নারীর যত্নে স্নেহে সৌন্দর্যে মণ্ডিত, তাহা যে দেয়াল ও কড়িয়ালা ছাদের চেয়ে অনেক বেশি–ইহা আজ গোরার কাছে মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। গোরা আপনার চতুর্দিকের আকাশের মধ্যে একটা সজীব সত্তা অনুভব করিল–তাহার হৃদয়কে চারিদিক হইতেই একটা হৃদয়ের হিল্লোল আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। একটা কিসের নিবিড়তা আসিয়া তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া

ধরিল। এরূপ অপূর্ব উপলব্ধি তাহার জীবনে কোনদিন ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একইকালে সমগ্রভাবে সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে, গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

'গোরা' উপন্যাসের ভারততত্ত্বের দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপে শিল্পরূপ ঝুলে গিয়েছে বলে যারা মনে করেন, তাঁরা সম্ভবত উপরোক্ত ছবিগুলোকে খেয়াল করে দেখেন নি। একটি যুবক এবং আকেটি যুবতী একটি সাধারণ আদর্শের ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাছাকাছি হয়ে পরস্পরকে অদ্বিতীয় বলে গ্রহণ করলো। কিন্তু এই গোরাকেই যখন রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনাসামনি করেছেন, তখন কাঠগোড়ায় দণ্ডায়মান আসামী হিসাবে গোরাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সে সময়কার স্বাভাবিক মনোভাব নিয়েই একটি সাধারণ অপরিচ্ছন্ন লোকখ্যাপানো লোক বলে মনে করেছে। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে খুব প্রকট করতে গিয়েও দেশকে ঢেকে ফেলেননি তাকে দিয়ে। সুচরিতা সমগ্র উপন্যাসে দৃঢ়চিত্তে একটি বিদ্রোহের পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু অত্যন্ত সহজ সাবলিলভাবে। ললিতার মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা এসেছে ঘটনার ধারায়, কিন্তু সুচরিতা কথাও কম বলেছে। তার সমস্তটাই প্রায় অনুভব। বিনয় আর ললিতার প্রেম গোরা আর সুচরিতার প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল। এখানে ফুল দেয়া নেওয়ার মধুরছবি আঁকা আছে। কিন্তু এরা দুজনেই সহজ সাবলিল। বিনয় এম এ পাশ করলেও মনে হয় এখনও ছাত্র। ললিতা একটি সাধারণ 'বাঙালি মেয়ে'। মেজো মেয়ের নাম ললিতা। "সে বড়ো মেয়ের বিপরীতে বললেই হয়। তাহার দিদির চেয়ে সে মাথায় লম্বা, রোগা, রঙ আর একটু কালো। কথাবার্তা বেশি কয় না; সে আপনার নিয়মে চলে, ইচ্ছা করিলে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারে।"

ললিতা আর সুচরিতা দুজনেই স্বদেশের প্রতি অনুরাগিণী। ইংরেজ আমলাদের বিরুদ্ধে বিশ শতকের শুরুতে যে ঘৃণার তরঙ্গ উছলে উঠেছে, তাতে তারা তাদের প্রণয়ীদের মারফত শরিক।

আনন্দমঠের শান্তির মতো তার ঘোড়ায় চড়তেও জানেনা, বন্দুক চালাতেও জানে না। কিন্তু তারা নারী হিসেবে পল্লবিনী লতা নয়। তারা চরিত্রবতী অর্থাৎ বুদ্ধির দিক দিয়ে এবং আচরণের দিক দিয়ে মেরুদণ্ডময়ী।

এটা ছিল জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেরই একটা প্রকাশ।

কুড়ি

বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা (৩)

গোরা উপন্যাসের পরেই আলোচ্য শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি লেখা এমন সময়ে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে সারা উপমহাদেশে স্বাধীনতার জন্যে বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান চলছে। গোরা উপন্যাসে যে লোকজনকে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো পাই, যে চিত্রার্পিত প্রায় গ্রামীণ জনগণকে বিক্ষুব্ধ

করে তুলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল গোরা, 'পথের দাবী' উপন্যাস লেখার সময় সেই গণসমুদ্রে ঝড় উঠছে। একটা আগ্নেয়গিরি যেন জেগে উঠছে সারা উপমহাদেশ জুড়ে। অবশ্য তলে তলে এর আয়োজন চলছিল আগে থেকেই একটা বিশেষ ধারায়। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্বদেশীয় সিপাহীদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের প্রচেষ্টা করেছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা। গণবিপ্লব তখনও জল্পনাকল্পনার মধ্যে। একদিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সভা সমিতি চলেছে, এবং আরেকদিকে খুদিরাম কানাইলালরা বাংলার অগ্নিযুগের সৃষ্টি করেছে বোমা পিস্তল দিয়ে সাহেব মারার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এরই পাশাপাশি বৃহত্তর কোন কাণ্ড করে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটাবার জন্য তদানীন্তন উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে সহিংস উপায়ে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা চেষ্টা করেছিল একটা সিপাহী বিপ্লবের। এই প্রচেষ্টা অংকুরেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে অনেক বিপ্লবীকেই আত্মগোপন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাইরে চলে যেতে চেয়েছিল। এরা বাইরে থেকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে ব্যাপক সশস্ত্র গণবিপ্লবের আয়োজন ও পরিকল্পনা করেছিলেন। 'পথের দাবী' উপন্যাসটি এই আয়োজনের দুরূহ ওঠানামার পটভূমিতে রচিত। তবে শরৎচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলিতে আলোড়িত মন নিয়েই এই উপন্যাসটি লেখেন। এই কারণে উপন্যাসটিতে দেশদর্শন ও স্বাধীনতার মূল্যায়ণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণশক্তির হিসাব নিকাশই বেশি প্রতিফলিত।

উপন্যাসের স্থান বার্মা, রেঙ্গুন শহর ও রেঙ্গুনের ভারতীয় শ্রমিক অধ্যুষিত কারখানা এলাকা। এই শ্রমিক এলাকাতে বেশ কিছু বাঙালির বাস। এই 'বাঙালি' শ্রমিকদের নিয়ে 'পথের দাবী' তার বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক এলাকায় একটা ইস্কুল বাড়ী। 'পথের দাবী'র নায়ক গোঁড়া ব্রাহ্মণ অপূর্ব এবং মাতাল এক খৃষ্টানের কন্যা ভারতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল রেঙ্গুনেই প্রতিবেশী হিসেবে। তারপর কলহ, প্রেম, বিচ্ছেদ। তারপর দেখা এই শ্রমিক এলাকার এই ইস্কুল বাড়িতে। অপূর্ব এখানে ভারতীকে নতুনরূপে দেখলো এই ইস্কুল বাড়িতেই। পলাতক বিপ্লবীদের গণসংগঠন 'পথের দাবী।' যেভাবে উপন্যাসে আছে সেইভাবেই তুলে দেওয়া যেতে পারে এখানে :

"কাঁচা ঝাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষর।

অপূর্ব–ওটা কি লেখা ওখানে

ভারতী–পড়ুন না।

অপূর্ব–পথের দাবী। তার মানে?

ভারতী : ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা। আপনি আমাদের সভ্য হবেন?

অপূর্ব–কি আমাদের করতে হবে?

ভারতী–আমরা সবাই পথের পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা

আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্তগতিকে কেউ যেন রোধ করতে না পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

এরপরে নায়িকা ভারতী অপূর্বকে সেই শ্রমিকদের বস্তিতে নিয়ে গেল, যাদের সচেতন ও সংগঠিত করে তুলবার জন্য ইস্কুল বাড়ির প্রতিষ্ঠা।

আনন্দমঠের দেশদর্শন নয়, এটা পথের দাবীর বিশেষ দেশদর্শন। প্রথমে নোংরা শ্রমিক বস্তি দেখে এর মধ্যকার বিপ্লবের আয়োজনকে অপূর্ব বুঝতে পারে নি। বাইরের নোংরা অশ্লীল পরিবেশটায় তার গা রি রি করেছে। ভারতীকে সে এদের সংস্রব ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিয়েছে। পরে সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্বাত্মক উপলব্ধির আরশিতে এবং দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য ব্যাখ্যায় শরৎচন্দ্র তার দেশচিন্তাকে প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু তিনিও আনন্দমঠ এবং গোরার মত রহস্যের আবরণ নিয়ে তাঁর বিপ্লবী কথার সুতো খুলেছেন একজন ব্যাখ্যাকারের মাধ্যমে। তার নাম মহাবিপ্লবী সব্যসাচী।

সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পরে যখন বিপ্লবীরা আবার গুছিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে, তখন ইংরেজশাসিত বার্মার ইরাবতী তীরের রেঙ্গুন শহরের পুলিশ খবর পেয়েছে যে সব্যসাচী নামক দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নায়ক ভারত থেকে জাহাজ যোগে রেঙ্গুনে নামছেন। সব্যসাচী নামলেন ঠিক, তবে গিরীশ মহাপাত্র নামক এক তেলকল শ্রমিকের ছদ্মবেশে। এত সাধারণ চেহারা যে পুলিশ তাকে জেরা করেও ছেড়ে দিল। এদিকে সদ্য রেঙ্গুনে আগাত অপূর্বও সেই জেটিতে ছিল। সেও এই গিরীশ মহাপাত্রকে দেখেছিল। সে ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরে ভারতীর খোঁজে উপরে উল্লেখিত ইস্কুল বাড়িতে গিয়ে দেখলো সমিতির প্রাণ হিসেবে যে ব্যক্তি সমাসীন তিনি গিরীশ মহাপাত্র তথা সব্যসাচী। যিনি ডাক্তারী বিদ্যাতেও আন্তর্জাতিক ডিগ্রীধারী এবং এই জন্যই ডাক্তার হিসেবেও বিপ্লবীদের মধ্যে পরিচিতি।

অপূর্ব ভারতীর টানে পড়ে এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো। এমনকি একটা শ্রমিক সভায় বক্তৃতাও দিয়ে ফেলল। একটা শ্রমিক সভাকে যখন পুলিশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভেঙ্গে দিল এবং অপূর্বেরই অফিসের একজনকে গ্রেফতার করলো, তখন অপূর্ব শুধু পিছিয়েই গেল না। কর্তৃপক্ষের কাছেও সমস্ত কিছু কবুল করলো। বিপ্লবীরা অপূর্বকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ধরে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিল। কিন্তু সব্যসাচীর হস্তক্ষেপে সে ছাড়া পেয়ে গেল। ছাড়াছাড়ি হলো ভারতীর সঙ্গেও। দেখাও হলো অপূর্ব আর ভারতীর, কারণ দুজনের একজনকে ছেড়ে আরেকজন যাবে কোথায়?

ডাক্তারের স্নেহের পাত্রী ভারতী। অপূর্বকে সেই স্নেহের গণ্ডিতে টেনে নিয়েছিলেন তিনি।

এই কারণেই পথের দাবী উপন্যাসে দুটি বিরুদ্ধ ধারার স্রোত এসে মিশেছে। অপূর্ব-ভারতীর মমতা ভালবাসার কোমল ইতিবৃত্ত মিশেছে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আয়োজনের এক নির্মম সাধানার ইতিবৃত্তে। এই নির্মম সাধনার ইতিবৃত্তের নায়ক সব্যসাচী। তবে এর মধ্যেও প্রেমের একটি অন্তর্লীনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে

সব্যসাচী এবং বিপ্লবী নায়িকা সুমিত্রাকে নিয়ে। এখানে এই নায়ক নায়িকা ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখাটাকেও অপরাধ মনে করে। বিচ্ছেদ এখানে অনিবার্য।

আরও বেশ কয়েকটি চরিত্র আমদানী করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীকে ঘটনা দেবার জন্যে। রয়েছে তাই অনেকগুলো মুখচ্ছবি। অনেকগুলি মনের ছবি। পথের দাবী এই একটি কাহিনীর মধ্যে অনেকগুলি কাহিনীর দ্বন্দ্বাত্মক উপন্যাস। শরৎবাবু ডাক্তারের কথার মারফত অস্ত্রধারী বিপ্লবীদের ব্যাখ্যান দেন নি, তিনি রেঙ্গুন শহরে বিপ্লবী দলের যে অন্তর্ঘাত দেখিয়েছেন, তাতেও আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি এঁকেছেন। এটা 'গোরা'র জেলে যাওয়ার পরের কয়েক ধাপ এগিয়ে আসা। পথের দাবীর বিপ্লবীরা যে সত্যি সত্যি হাসতে হাসতে ফাঁসীকাষ্ঠে চড়তে পারে তারই অভিব্যক্তি। 'যে ইংরেজ অস্ত্রের দ্বারা দাবিয়ে রেখেছিল ভারত এবং বার্মাকে', তাকে অস্ত্রের জোরেই বিতাড়িত করার প্রতীক সব্যসাচীর হাতের পিস্তল।

অগ্নিযুগের বাংলায় এ ব্যাপার ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র সেই ছবি সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাখ্যা গণবিপ্লবী ব্যাখ্যা–সেটা আগেই উল্লেখ করেছি।

পথের দাবী উপন্যাসে আরও এসেছে বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। বাংলা উপন্যাসে এসেছে বিপ্লবের আয়োজনে শ্রমিকশ্রেণীরও প্রথম নিয়োজন। এতগুলি ভাবস্রোতের মধ্যে পড়ে এই সত্যটা অবশ্য, যে সময়ে বই লেখা হয়েছিল তখন বিশেষভাবে আলোচিত হয়নি।

এদিক দিয়ে 'পথের দাবী' বিশের দশকের ভবিষ্যৎবাদী ইঙ্গিতের উপন্যাস।

'পথের দাবী' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পরেই এর উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। দুটি দশক বইটি চাপা পড়ে থাকে। যখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে, তখন কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলনকে ভিত্তি করে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামমূলক উপন্যাস কোন রহস্যের আবরণ না রেখে খোলাখুলি লেখা শুরু হয়েছে। সূচনা হয়েছে তারাশঙ্কর আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের। সুতরাং 'পথের দাবী'র ভিতরে গিয়ে মেহনতী মানুষের বিপ্লবের দর্শনের খোঁজ করার কাজটা পাঠকপাঠিকাদের তরফ থেকে কমই হয়েছে। অপূর্ব ও ভারতী কিংবা সব্যসাচী ও সুমিত্রার ভাবলৌকিক প্রেমের কাহিনী হিসেবে অথবা সব্যসাচী ডাক্তারের বৈপ্লবিক অভিযাত্রী জীবনের রোমাঞ্চকরতা নিয়েই পথের দাবী–এই ধারণাই প্রবল থেকেছে। এই কারণে ভবিষ্যৎবাদী উপন্যাস হিসেবেও পথের দাবীর মূল্যায়ন হয়নি বললেই চলে।

'পথের দাবী' ধর্মবিষয়েও আনন্দমঠের গণ্ডীকে তো ছড়িয়ে এসেছেই, গোরার উদারতাকেও ছাড়িয়ে এসেছে। এখানেই পথের দাবীর আরেকটি ভবিষ্যৎবাদী বৈশিষ্ট্য।

অর্পূব ছোঁয়াচ-মানা গোঁড়া হিন্দু আর ভারতী খৃষ্টান। এই অন্তরায়কে ভেঙ্গে প্রেমকে জয়ী করার মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এর জয়গাথা লিখেছেন। সব্যসাচী এই প্রেমকে উৎসাহিত করেছেন। বিপ্লবীরা যখন একে দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তখনও তিনি এই প্রেমের পক্ষ নিয়েছেন

এবং ভারতীয় প্রেমের মর্যাদা দেবার জন্যে দুর্বল কাপুরুষ অপূর্বকে বিপ্লবীদের রোষবহ্নি থেকে বাঁচিয়েছেন। এখানে কে হিন্দু কে খৃষ্টান একথাটা তাঁর কাছে নিতান্ত তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়েছে এবং ডাক্তারের এই মনোভাব দ্বারা পাঠক-পাঠিকাদেরও প্রভাবিত করতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উপর থেকে ধর্মীয় প্রতীকমালা ছিঁড়ে ফেলে দেবার ব্যাপারে এখানেই থামেন নি। সব্যসাচী মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিশের দশকের শুরুতে এমন একটা কথা বলেছেন, যা কার্ল মার্কস গত শতাব্দীতে বললেও বর্তমান শতকের তিরিশ কিংবা চল্লিশের দশকেও বাংলা উপন্যাসে কেউ জোর গলায় বলতে পারেননি।

সব্যসাচী এইসব কথা দীর্ঘ বক্তৃতা—গোরার বক্তব্যর মতোই দীর্ঘ। কিন্তু দীর্ঘ হলেও বাইরের কথা কিংবা চাপিয়ে দেওয়া কথা বলে মনে হয়ে না এসব ভাষণকে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে, অন্তরঙ্গতায় উষ্ণ হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এই ভাষণগুলো। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের মুখে এইসব কথা শুনে শুধু রক্ষণশীলরাই নয়, উদার দেশপ্রেমিকরাও লাঠি নিয়ে তেড়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র অনুরাগী, এমনকি 'পথের দাবী' উপন্যাসের অনেক অনুরাগীও একাজ করেছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, 'পথের দাবী' দীর্ঘ দুই দশক নিষিদ্ধ ছিল এবং এই উপন্যাসটি আধোপঠিত আধোকল্পিত নিষিদ্ধ বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কাহিনী হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল, দেশ দর্শন ও যুগদর্শন হিসেবে নয়। 'পথের দাবী' বুঝবার জন্যে তাই এই উপন্যাসের দেশ ও যুগদর্শনকে চুম্বকাকারে উপস্থিত করার সময় কয়েকটি দীর্ঘ কথোপকথনও দাখিল করা দরকার। 'আনন্দমঠ' আর 'গোরা'র সঙ্গে 'পথের দাবী'র পার্থক্য এতে সুস্পষ্ট হবে। কয়েকটি মূল ছবি আর বক্তব্য এখানে চুম্বকাকারে রাখছি :

(১) উপন্যাসের প্রায় শেষের দিকে অর্পূব বিপ্লবীদের কাছে ধিকৃত হয়ে ভারতীকেও ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরের দিকে যাত্রা করলে অর্থাৎ রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতা রওনা হলো। এই বিপ্লবীদের এবং বিশেষ করে সব্যসাচীর একজন ঘনিষ্ট অনুগামী শশী (যে ছিল সুরাসক্ত সুরশিল্পী, নারী এবং প্রেমিক দুইই এবং যাযাবর) যখন তার প্রণয়িনী মানবতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, তখন ডাক্তারের মনে হয়তো একটা পরিকল্পনা এসছিল, শশী আর ভারতীকে নিয়ে আদর্শ মানব-মানবীয় জুটি তৈরি করার নিরাপদ বিপ্লবীদের আশ্রয় তৈরির লক্ষ্যে।

পথের দাবীর আগা গোড়া যেমন ভারতীর সঙ্গে, তেমন শেষের দিকে শশীর সঙ্গে ডক্তারের কর্থাবার্তা অদ্ভুতভাবে অন্তরঙ্গ।

শশীর সঙ্গে এমনি একটি অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র বাংলাভাষা আর বাংলাদেশের যে জয়গান করছেন, তা একটি শক্তিময় ও সুষমাময় জাতীয় সঙ্গীতের মতো স্পন্দিত হয়েছে। কথোপকথনটি নিম্নরূপ :

ডাক্তার [শশীকে]—কবি দুটি কাজ তুমি কখনো করোনা। মদ খেয়োনা, আর রাজনীতির বিপ্লবের মধ্যে যেয়ো না। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় একথা ভুলো না।

শশী—আপনি যাতে আছেন আমি তাতে থাকলে দোষ হবে, আমি কি আপনার চেয়েও বড়।

ডাক্তার—বড় বৈকি। তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা ছাড়া এর ওজন হবে কি করে? একদিন এই স্বাধীনতা পরাধীনতা সমস্যার সমাধান হবেই—এর দুঃখ দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবে না। কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই তো দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ধারাকে মালার মত গেঁথে।

ডাক্তার—(ভারতীকে) শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানদের নয়, খৃষ্টানের নয়—শুধু আমার বাংলাদেশের কবি। সহস্র নদনদী প্রবাহিত আমার বাংলাদেশ, আমার সুজলা শশ্য শ্যামলা মাঠের পরে মাঠে ভরা বাংলাদেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশি শাসনের অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্বহীনতার লাঞ্ছনা নেই—তুমি হবে শশী তারই জাতীয় কবি। পারবে না ভাই?

শশী ভ্রাতৃ সম্বোধনে বিচলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার চেষ্টা করলে আমি ইংরেজিতে কবিতা লিখতে পারি। এমনকি—'

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, ইংরেজি নয়, ইংরাজি নয়,—শুধু বাংলা, শুধু এই সাতকোটি লোকের মাতৃভাষা। শশী পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্র দলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই। আমি অনেক সময় ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এদেশে কবে কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল, কোথাও যেন এর সীমা নেই।'

(২) কিন্তু সব্যসাচী এখানে থামেননি। আনন্দমঠকে বহু পিছনে ফেলে এসেছেন, এবং গোরাকেও অনেকখানি। নিছক ভাবাবেগকে আঘাত করেছেন, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বলেছেন মানবতার শত্রু।

হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। সেইজন্যেই কথোপকথনটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

শশী—বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালোবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাংলাদেশের লোকে যেন আবার তেমনি করে ভালবাসতে পারে—এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার—তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত করছ শশী, সে ভালবাসা বাঙালি কস্মিনকালেও বাংলাদেশকে বাসেনি। জননী জন্মভূমি ছিল কথার কথা। সে বাঙালি আমার কেউ নয়, অস্বীকার করে চলবো তাদের ধর্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীরুতা, তাদের দেশদ্রোহিতা, তাদের সামাজিক রীতিনীতি তাদের যা কিছু সমস্ত। সেইতো হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই তো হবে তোমার দেশপ্রেম।

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্থ, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ! যে ধর্ম তারা আপনারা মানতো না, যে দেবতাদের পরে আদৌ আস্থা ছিল না তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপদমস্তক যুক্তিহীন বিধিনিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে। এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূল।

ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবল মাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠে না কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। তাছাড়া, বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্য নয়। দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সম্মুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই তো আমাদের পথ করতে হয়। এর মধ্যে মায়া মমতার অবকাশ কই? জীর্ণ মৃত পথ জুড়ে। আমরা পথের দাবীর পথ পাবো কোথায়? যা কিছু পুরাতন, যা জীর্ণ–সমস্ত নির্বিচারে নির্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নতুন মানুষ নতুন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা নিজে তুমি পার?

– কি পারি বোন?

– যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু পবিত্র, নির্মম চিত্তে ধ্বংস করে ফেলতে?

ডাক্তার বলিলেন পারি। সেইত আমাদের ব্রত। পুরতান মানেই পবিত্র নয় ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েছে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি পবিত্র হয়ে ওঠে না। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মতে সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কেউতো আর সে আশ্রয় অবলম্বন করে নাই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তবু তাকেই পবিত্র মনে করে কে জানো ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা তো শক্ত নয় বোন। যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি? আর শুধু কি অপূর্বর বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীশ্চান ধর্মত তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে আজ ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি তাকেই তুমি ত্যাগ করতে বল দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা–আদিম দিনের কুসংস্কার। মানবতার এত বড় শত্রু আর নেই।'

(৩) 'পথের দাবী'র যুগ এগিয়ে এসেছে বলেই–'আনন্দমঠ' এবং 'গোরা'কে দার্শনিক সত্য ব্যাখ্যাতে এ ছাড়িয়ে এসেছে। যথা,

ডাক্তার ভারতীকে বলেছেন, ভারতী, সুমিত্রা বললেন, আমার লজ্জা নেই। তুমি দোষ দিলে আমি সুবিধামত সত্য ও মিথ্যা দুইই। আজও তেমনি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের দাবীর সম্বন্ধ থাকতো। এর

ভাল মন্দ নিয়েই আমার সত্য মিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি। ..... তোমরা যে বল চরম সত্য, পরম সত্য,–এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এত বড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয় সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়, এর জন্ম আছে মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

* * *

ভারতী পথের দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়–এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর। কে কবে কোন অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল, পথের দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের বাক্য হবে মিথ্যা? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু মিথ্যা যদি কোথাও থাকে তবে সে এই।

* * *

ভারতী কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নুতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতে হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

একদিন সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক ও শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই, ভারতী। সেই দিন একথার অর্থ সে বুঝিতে পারে নাই, আজে সে অর্থ তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

(৪) শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট সংগ্রামকে ভিত্তি করে গণবিপ্লবের সুস্পষ্ট অনিবার্যতাকে শরৎচন্দ্র যেন ছবির মতো এঁকে এঁকে দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। 'পথের দাবী' যে সময়ে লেখা তখনও উপমহাদেশে ধর্মঘট রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে স্বাদেশিক চেতনায় সামান্যই গ্রথিত হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, শরৎচন্দ্র কিভাবে এত গভীরে গেলেন। বহুদূরে থেকে ভারতের ঘটনাবলি অবলোকন করে লেনিন যে সব কথা বলেছিলেন বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে,–সে কথাই সব্যসাচীকে দিয়ে বলিয়েছেন শরৎচন্দ্র। অপূর্ব আর ভারতীকে নিয়ে অনুরাগের কত নটখটিই তো খেলিয়েছেন তিনি। কিন্তু এর মধ্যেও সব্যসাচীকে দিয়ে বলিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস। আসলে প্রকৃত ঔপন্যাসিকের চোখ দিয়ে তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনকে দেখিয়েছিলেন।

ধর্মঘটের ব্যাপারটিকেই বুঝতে চেষ্টা করা যাক ভারতী-সব্যসাচীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে :

ডাক্তার–ভারতী, ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপত্রর ধর্মঘট কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না তার পিছনে বাহুবল থাকে। শেষে পরীক্ষা তাকে দিতেই হয়।

ভারতী–কাকে দিতে হয়? শ্রমিককে?

ডাক্তার–হ্যাঁ। তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক কথা নয়। তার উপায়হীন কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে–তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে–তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থবল সৈন্যবল, অস্ত্রবল সবই তার হাতে–সেইত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না–তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বয়ে যায়।

ভারতী–তার পরে?

ডাক্তার–তারপরে আবার একদিন পীড়িত, পরাভূত ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীদের হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী–তারপর?

ডাক্তার–তারও পরে? তারপরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে। তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।

ভারতী–তবে ধর্মঘট করে লাভ কি দাদা?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন, লাভ? এই তো পরম লাভ ভারতী। এই তো আমার বিপ্লবের রাজপথ। বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উথলে ওঠে, জগতে সে শক্তি নয়? সেই তো আবার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরির কমবেশি নিয়ে ঘর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদের সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।

(৫) কিন্তু দেশের কৃষকের শক্তি? পল্লীর শক্তি?

যে শরৎচন্দ্র প্রধানত তাঁর লেখায় বাংলার পল্লীর সুখদুঃখের ছবি এঁকেছেন, তিনি পথের দাবী উপন্যাসে সব্যসাচীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন, তাতে বুঝতে পারা যায়, সে সময়ে বিপ্লবীরা পল্লীর মধ্যে বিপ্লব করার কোন খোরাক পায় নি, সেদিকে তাদের দৃষ্টিও ছিল না।

উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে অপূর্ব আর ভারতীর আবার মিলন হয়েছে। তারা দু'জনে ঠিক করেছে, বাংলার পল্লীতে গিয়ে বসবাস করবে এবং কৃষকদের উন্নতির জন্য কাজ করবে। 'পথের দাবী' সমিতি তুলে দেওয়া হয়েছে, সব্যসাচী আবার আন্তর্জাতিক সংযোগসূত্র জোড়া দেবার জন্য দুর্গম পথে যাত্রায় উদ্যত। অপূর্ব

বলছিল, শিক্ষিত ভদ্র জাতি নয়, দেশের আসল প্রাণ পল্লী, কৃষক। এই প্রসঙ্গে আলাপটি এখানে উল্লেখ করার মতো :

ডাক্তার (ভারতীকে)–দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য কোরছ মনে করবার প্রয়োজন নেই। চাষারা রাজা হোক, তাদের ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করি না। অপূর্বর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কারও ভাল করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে, তার মানে নেই অপূর্ব বাবু। এদের দুঃখদৈন্যের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়। সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

অপূর্ব–কিন্তু এই কি সকলে আজ বলে না?

ডাক্তার–বলুক। যা ভুল তা তেত্রিশ কোটি লোক বললেও ভুল। বরঞ্চ শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত দুর্দশাগ্রস্থ সমাজ বাংলাদেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে ভেবেছ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসছে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্যে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল, স্নেহের বাঁধন, শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে গেল কিসের জন্যে জানো? তোমাদের দুদশ জনের দোষে, শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিমানে। ... শশী, একদিন তোমাকে আমি একাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে? নিজের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, এক প্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভাল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তুমি তাদের করছে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়–বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়। সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো একদিন এসে পৌঁছবে, কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

ভারতী–কিছু মনে কোরোনা দাদা, কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেছি, পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু শহরের উপরে। কৃষকদের উপরে তুমি সদয় নও, তোমার দুচক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি মজুর কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের দাবী খুলেছিল এদের মাঝখানে। আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই থেকে থাকে তোমার, সে শুধু পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ভদ্রজাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা ভরসা, এরাই তোমার আপনজন। বল একি মিথ্যা কথা?

ডাক্তার বললেন, মিথ্যা নয় বোন, অত্যন্ত সত্য। কতবার তো বলেছি তোমাকে, পথের দাবী চাষাহিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি মজুর কারিগরদের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে, কিন্তু পাবেনা খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটিরে।

শশী–আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে বলব।

–যথা?

–যথা, মদ খাবো না, পলিটিক্‌সে মিশবো না, ভারতীর কাছ থাকবো এবং কবিতা লিখবো।

ডাক্তার ভারতীয় মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না, তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন চাষাড়ে কবিতা লিখবে না তুমি?

শশী কহিল না, তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখছিনে। আপনার সে কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এবং এ উপদেশও কখনো ভুলব না যে, আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, অশিক্ষিত কৃষক পারে না। আমি হব তাদের কবি।

ডাক্তার বলিলেন, তাই হোয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।

শশী কহিল, আসুক সেদিন, তখন স্বচ্ছন্দ, শান্ত চিত্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েই আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ আত্ম বিলিদানের গুরুভার তারা বইতে পারবে না।

(৬) শশীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সব্যসাচীর নিজের উৎসর্গিত অনন্য জীবন সম্পর্কে বক্তব্য থেকে একথা মনে হতে পারে যে, সব্যসাচীর বিপ্লবী রণনীতিতে কি শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং শেষ পর্যন্ত চাষীরাও শুধু একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আত্মবলিদান করেই যাবে? না, তা নয়। দুটি কথোপকথন দ্বারা মূল কথাটি বুঝতে পারা যাবে :

(ক) ভারতী–নেবে দাদা সঙ্গে? তুমি ছাড়া এ আঁধারে যে এক ফোঁটা আলোও দেখতে পাইনে।

ডাক্তার ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে কহিল, অসম্ভব–

ভারতী, তোমার কথায় আমার জোয়াকে মনে পড়ে; তোমারই মত তার অমূল জীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় কোন লক্ষ্য নেই; কিন্তু মানব জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য নেই এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ–এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই তো স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা?

(খ) অপূর্ব–একদিন যে আমি প্রাণ পেয়েছিলাম একথা চিরদিন মনে রাখবো ডাক্তার।

অন্ধকার হইতে জবাব আসিল, তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই বড় করে দেখলে, অপূর্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না? অপূর্ব চীৎকার করিয়া কহিল, মানে? এ জীবনে ভুলব না। এ ঋণ মরণ পর্যন্ত আমি–

দূরের আঁধারের মধ্যে হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, তাই যেন হয়। প্রার্থনা করি, সত্যকার দাতাকে যেন একদিন চিনতে পারো অপূর্ববাবু। সেদিন সব্যসাচীর ঋণ–

এ ইঙ্গিত ভারতীর প্রেমের প্রতি।

এভাবেই যে স্বাধীনতার জন্যে জীবনকে নতুন করে বাজী ধরতে যাচ্ছেন সব্যসাচী, তার উপরেও প্রেমের জয়গান করিয়া নিয়েছেন শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর শেষ কথা দিয়ে। বিপ্লবীদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড থেকে অপূর্বকে সব্যসাচী বাঁচিয়েছিলেন ভারতীর প্রেমের কথা চিন্তা করে।

অর্থাৎ ভারতীয় প্রেমের জন্যেই সব্যসাচীর ভাষায় 'তুচ্ছ অপূর্ব' বেঁচে গিয়েছিল। বইটির মধ্যে এই ধরনের প্রেমের জয়জয়কারের দরুন 'পথের দাবী'কে অনেকে গম্ভীর এই বলে গ্রহণই করতে চাননি। এই না গ্রহণের ব্যাপারটা হয়েছে বইটির মৌলিক অবিচার।

আবার সব্যসাচীর দীর্ঘ ভাষণগুলির জন্য অনেকে মানবিক মূল্যবোধের অভাবও অনুভব করেছেন। অনেকের মনে হয়েছে, সব্যসাচী একটা বিপ্লবী যন্ত্রছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু পথের দাবী উপন্যাসে আরও দেখা যাবে, বৈপ্লবিক মানবিক মূল্যবোধ শুধু অপূর্ব ভারতী শশীতেই থেকে যায়নি, সব্যসাচীর বিপ্লবী জীবনও এই মূল্যবোধের আওতায় রয়েছে। অবশ্য মূল্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছে ভারতী।

সব্যসাচীর হাতে গড়া বিপ্লবী নায়িকা সুমিত্রা যখন 'পথের দাবী' সমিতির সম্পর্ক ছেড়ে সুমাত্রা যবদ্বীপে তার সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্যে চলে যাচ্ছে, তখন ডাক্তার ভারতীকে বলেছেন,

"মানুষতো যাবেই। যত বড় হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্বনাশ বলে ভাবি। একজনের স্থান জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে, এই শিক্ষাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা ভারতী।'

ভারতী বলল, 'তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কিনা? তুমি বলচ পারে, আমি বলচি, পারে না। আমি জানি, মানুষ শুধু জলস্রোত নয়, তুমি তো নওই।'

একুশ

বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা (৪)

'পথের দাবী' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কৃষক সমাজকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় উপাদানরূপে সাব্যস্ত করে শ্রমিক-শ্রেণী আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের রূপটিকে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসে সেই কৃষক সমাজকেই স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের মূল মর্মে স্থাপন করলেন। এদিক দিয়ে 'গণদেবতা' বাংলা উপন্যাসে একটি নতুন পটোত্তোলন। আমরা 'আনন্দমঠ' এবং ' গোরা'তে যে গ্রামীণ সমাজকে দেখি এবং এদের মধ্য দিয়ে দেখি যে দেশকে, 'গণদেবতা'র গ্রামীণ সমাজ তার থেকে

আলাদা। গণদেবতার কৃষক বা গ্রামীণ সমাজ থেকে বিপ্লবের প্রবণতা বেরিয়ে এসেছে ভিতরকার গতি পরিণতি থেকে। 'পথের দাবী' উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবীরূপ যেমন বেরিয়ে এসেছে তাদের কারখানার কাজের সম্পর্ক থেকে, তেমনি গণদেবতা; উপন্যাসের কৃষক সমাজের বিপ্লবীরূপ প্রকাশ পেয়েছে তাদের জমির কাজ এবং এই কাজের সঙ্গে জড়িত সামাজিক সম্পর্কবোধের মধ্য থেকে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভূমি সমস্যা আর ভূমি জীবন ও ভূমি সম্পর্ককে, যেখানে ঔপন্যাসিক সাম্রাজ্যবাদী শাসক শোষক এবং তাদের আমলা, অংশীদার ও উচ্ছিষ্টভোগীদের বিরুদ্ধে উৎপাদক কৃসক সমাজ এবং সাধারণভাবে গ্রামীণ মেহনতী মানুষেরা সম্মিলিত হয়ে নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

অবশ্য সামগ্রিকভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামই এখানেও চুম্বকক্ষেত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই উপমহাদেশে যে গণ–অভ্যুদয় ঘটেছিল, তাতে গ্রামীণ সমাজের মূল ভিত্তি কৃষক সমাজ ব্যাপকভাবে শরিক হয়েছিল। গণ বিক্ষোভ ও অসহযোগের মধ্য দিয়ে সারা উপমহাদেশ যেন আগ্নেয়গিরির অভ্যুত্থানে ব্যাপৃত হয়েছিল। এই অভ্যুত্থানের বিপুল তরঙ্গরাশি কয়েক বছরের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে গেলেও এতে শরিক কৃষক সমাজের মধ্যে এর পরেই যখন আবার অস্থিরতা শুরু হলো তখন ব্যাপারটা ঘটলো আরও গভীর তাৎপর্য নিয়ে। উৎপাদক কৃষক সমাজ ও সাধারণভাবে গ্রামীণ মেহনতী মানুষ বিপ্লবে শরিক হয়েছিল নিজেদের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সংগ্রামের মারফত। বিশের দশকের দ্বিতীয়ভাগে এই ঘটনা ঘটেছিল। তদানীন্তন যুক্তবঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণমুক্তি সংগ্রামের সংগঠন হিসেবে 'শ্রমিক কৃষক সংস্থা' গড়ে উঠেছিল। গ্রামীণ জীবনেও এই নতুন পরিস্থিতিকেই তারাশংকর তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসের শিল্পরূপে বিন্যস্ত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র তিরিশের দশকের শুরুতে সমসাময়িক জীবনের কথা লিখবার সময় গ্রামজীবনে কৃষক সমাজের এই ভূমিভিত্তিক অস্থিরতাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে কৃষক সমাজের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে নবীনেরাই– অর্থাৎ কৃষক সমাজের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার মুখপাত্ররাই যে যুগেরও মুখপাত্র সে সম্বন্ধে কিছুটা ইশারা আছে।

তারাশংকরকে এ ধরনের বিতর্কে বা ইশারায় যেতে হয়নি, কারণ তিনি তাঁর উপন্যাসকে প্রথমেই ভূমিবিপ্লবের প্রাথমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন।

গণদেবতা উপন্যাসটিতে দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ময়ূরাক্ষী তীরের শিবকালীপুরের ভূমিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনের নানা রকম ছোটখাট সমস্যা ও সংকট থেকে উঠে এল একটি পরিণতি। ১৯২৬ সালে সেট্‌ল্‌ম্যান্টের নতুন জরিপে আমলাদের কাজে বাধা দেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষক দেবু পণ্ডিতের এক বছরের জেল হয়ে গেল, দেবু পণ্ডিতের জেলে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে গ্রামের লোকের মানসিক এবং সাংগঠনিক বিন্যাস ঘটেছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে দেবু পণ্ডিতের জেল থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফেরত আসার পরে শুধু সেই গ্রামটিতেই নয়, ময়ূরাক্ষী তীরের আরও কয়েকটি গ্রামে গণঅভ্যর্থনা পাওয়া গেল। একে ভিত্তি করে একটা নতুন কর্মচঞ্চল্য দেখা দিল। এখানেই যোগ

হল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চুম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে। দেবু পণ্ডিত ফিরে এসে দেখলো, যতীন নামে এক রাজবন্দী বিপ্লবী তরুণ যুবা গ্রামে অন্তরীণ হয়েছে এবং তাকে ঘিরে প্রজাসমিতি নাম দিয়ে একটা নতুন বৃত্ত তৈরি হয়েছে। দেবু পণ্ডিত এই বৃত্তে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো। এবার খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুধু শিবকালীপুরের নয়, আশেপাশের পঞ্চগ্রামে মানুষ ধর্মধটের জন্য তৈরি হলো। অন্তরীণ বন্দী যতীনকে কর্তৃপক্ষীয়েরা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু একটা ব্যাপক ধর্মঘটের আয়োজন দেখে সে গ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'গণদেবতা' উপন্যাসের এই দুই খণ্ডের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ছক চিরায়তিক খাতে অত্যন্ত সুস্পষ্টও রূঢ় হয়েই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু উপন্যাসের শিল্পরূপের মূল উপাদান যে প্রাণবন্ত মানব মানবী চরিত্র তারা এই ছকে বিন্দুমাত্র ফিকে হয়ে যায় নি। নায়ক নায়িকারা সংখ্যা খুব বেশি নয়, তবে সকলেই তারা সাধারণ নরনারীর প্রতিভূ। এমনকি বিপ্লবী তরুণ যুবা যতীন অসামান্য কোন নায়ক নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক এদের এত দরদ দিয়ে চিত্রিত করেছেন যে, এবং এরা এত সত্য যে, সমস্ত কাহিনীটিকে এরা সজীব করে রেখেছে। শুধু শিবকালীপুরের বাসিন্দারা নয় আশেপাশের সমস্ত গ্রামের মানুষ যেন এতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কেবল তাই নয়। সমগ্র গ্রাম বাংলার চাপাপড়া স্তরগুলিই যে চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে বিশের দশকে সচেতন হতে শুরু করেছিল, সেটাও এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

উপন্যাসে মূল নায়িকা এই সূত্রেই মুচিদের মেয়ে দুর্গা। সে স্বৈরিণী। আমলা গোমস্তারা মুচি পরিবারের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে এপথে নামিয়েছিল। সে সুন্দরী। মুচিদের ঘরের সমস্ত তুচ্ছতা ও গ্লানির মধ্যে থেকেই এবং স্বৈরিণীর জীবনে অভ্যস্ত থেকেই দুর্গা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আলোর দিকে হাত বাড়িয়েছে। যতটুকু তার দেহমনের পক্ষে বাস্তব ততটুকুই। দেবু পণ্ডিত আর নজরবন্দী বিপ্লবী তরুণ যতীনের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের মধ্য দিয়েই তার অবচেতন মনে একটি বিন্যাস ঘটেছে যেটা ভাবগতভাবে না হয়ে কার্যগতভাবে বিপ্লবীমুখী। দেবু পণ্ডিতের জেল হয়ে গেলে দুর্গা পেশকারের সঙ্গে নিশিযাপন করে সাজা নাকচ করার চেষ্টা করেছে। যতীনের ঘরে যখন প্রজাসমিতির বৈঠক বসেছে এবং পুলিশের লোক আর দলবল নিয়ে যখন জমিদারের লোকেরা সেই বৈঠককে ঘেরাও করতে এসেছে রাত্রিতে, তখন দুর্গা যতীনদের খবর দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, সে কাটারি দিয়ে নিজের পায়ে রক্তাক্ত ক্ষত তৈরি করে সাপে কামড়েছে বলে রোল তুলে পুলিশ বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে তাদের দেরি করিয়ে দিয়েছে।

সেই সেবাময়ী ও সান্ত্বনাময়ী মেয়েটি সারা উপন্যাসটিতে বিপন্ন গৃহিণীদের ফাইফরমাস খাটা কিংবা গায়ে পড়ে ঘরের কাজ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাপৃতা থেকেছে। অস্পৃশ্যা এই মেয়েটি পরিহার করেছে যে কোন রকম নাটকীয়তাকে। তার মুখে কখনো রাজনৈতিক তত্ত্বের সামান্য দুচার কথাও শোনা যায় নি। গ্রামের বিক্ষোভের সঙ্গে সে জড়িত রয়েছে বলে যে মুহূর্তে পুলিশের লোক তাকে আটকাবার চেষ্টা করেছে, সেই মুহূর্তেই তার হাবভাব আর স্বৈরিণীসুলভ কথাবার্তাই তাকে রেহাই দিয়েছে।

এই দুর্গা মেয়েটি নিপীড়িত গ্রামাঞ্চলের মাটির দুলালী। গ্রামাঞ্চল যখন অভ্যুত্থানের জন্য বাস্তব হয়েছে তখন সেও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অভ্যুত্থানের জন্যে তৈরি হয়েছে।

'গণদেবতা' উপন্যাসে দুই রাজনৈতিক নায়ক দেবু পণ্ডিত আর যতীন এই দুর্গা মেয়েটিকে গ্রামীণ জীবনের কাজকর্মে আর নিসর্গের মধ্যে যেভাবে দেখেছে, তার দুটি ছবি এখানে চলচ্ছবির মতো দাখিল করছি এই রহস্যময়ীর চরিত্রের গভীরতাকে বুঝানোর জন্য।

দুটি ছবিই উপন্যাস থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি। এতে উপন্যাসের শিল্পরূপটিকেও পাওয়া যাবে।

প্রথম ছবিটি দেবু পণ্ডিত জেল থেকে বেরিয়ে যেভাবে নতুন করে তার গ্রামকে দেখেছে এবং এর মধ্যে যেভাবে দুর্গার রূপটিকে দেখেছে তারই আলেখ্য। এই আলেখ্যটি নিম্নরূপ :

'এক বৎসর অতীত হইয়াছে। এক পৌষ-সংক্রান্তি হইতে আর এক পৌষ সংক্রান্তিতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, মাঘ ফাল্গুন আরও দুইটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন চৈত্রের পাঁচ তারিখ। দেবু ঘোষ জংসন ষ্টেশনে নামিল। চৈত্রমাসের শীর্ণ ময়ূরাক্ষী পার হইয়া শিবকালীপুরের ঘাটে উঠিয়া সে একবার দাঁড়াইল। দীর্ঘ এক বৎসর তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ শেষ করিয়া সে আজ বাড়ী ফিরিতেছে। পনেরো মাসের মধ্যে কয়েকদিন সে মকুব পাইয়াছে। এতক্ষণে আপন গ্রামখানির সীমানায় পদার্পণ করিয়া যেন পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ অনুভব করিল।

ওই তার গ্রাম শিবকালীপুর, তাহার পশ্চিমে সেখ-পাড়া কুসুমপুর, তাহার পশ্চিমে ওই দালান-কোঠায় ভরা কঙ্কনা। দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংসন। সেখ পাড়া কুসুমপুরের মস্‌জিদের উঁচু সাদা থামগুলি সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে। শিবকালীপুরের পূর্বে ওই মহাগ্রাম—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ী। মহাগ্রামের পূর্বে ওই দেখুড়িয়া, দেখুড়িয়ার খানিকটা পুবে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ফিরিয়াছে। বাঁকের উপর ঘন সবুজ গাছপালার মধ্যে বন্যায় নিশ্চিহ্ন ঘোষপাড়া মহিষডহর।

ঘাট হইতে সে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর উঠিল। চৈত্রমাসের বেলা দশটা পার হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে বেশ খরা উঠিয়াছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এখন প্রায় রিক্ত। গম, কলাই, যব, সরিষা, রবিফসল প্রায় ঘরে উঠিয়াছে। মাছে এখন কেবল আছে কিছু তিল, কিছু আলু এবং কিছু কিছু রবি ফসলও রহিয়াছে। তিলই এ সময়ের মোটা ফসল, গাঢ় সবুজ সতেজ গাছগুলি পরিপূর্ণরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইবার ফল ধরিবে। চৈত্র লক্ষ্মীর কথা দেবুর মনে পড়িল—এই তিলফুল তুলিয়া কর্ণাভরণ করিয়া পরিয়াছিলেন মা-লক্ষ্মী, তাই চাষীর ঘরে তাকে আসিতে হইয়াছিল—তিল ফুলের ঋণ শোধ দিতে। বেগুণী রঙের তিলফুলগুলি অপূর্ব গঠন। মনে পড়িল, তিলফুল জিনি নাসা।

আজ এক বৎসরেরও অধিক কাল সে জেলখানায় ছিল—সেখানে ভাগ্যক্রমে জনকয়েক রাজবন্দীর সহচার্য সে কিছুদিনের জন্য লাভ করিয়াছে। প্রচুর আনন্দের

মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দেহ তাহার ক্ষীণ হইয়াছে। ওজনে সে প্রায় সাতসের কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু মন ভাঙ্গে নাই। মুক্তি পাইয়া আপনার গ্রামের সম্মুখে আসিয়াও সাধারণ মানুষের মত অধীর আনন্দে ছুটিয়া বা দ্রুত পদে চলিতেছিল না। সে একবার দাঁড়াইল। চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। শিবকালীপুর মাঠ দেখা যাইতেছে। আম কাঁঠাল, জাম, তেঁতুল গাছগুলির উঁচু মাথা নীল আকাশপটে আঁকা ছবির মত মনে হইতেছে। দুলিতেছে কেবল বাঁশের ডগাগুলি। এই মৃদু দোল খাওয়া বাঁশগুলির পিছনে তাহাদের ঘর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি ঘর দেখা যাইতেছে।

এদিকে বাউড়ি-পাড়া, বায়েন-পাড়া, ওই বড় গাছটি ধর্মরাজতলার বকুলগাছ। ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলির মধ্যে ওই বড় ঘরখানা দুর্গার কোটা ঘর। দুর্গা, আহা দুর্গা বড় ভাল মেয়ে। পূর্বে সে মেয়েটাকে ঘৃণা করিত, মেয়েটির গায়ে-পড়া ভাব দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিত। অনেক বার রূঢ় কথাও বলিয়াছে সে দুর্গাকে। কিন্তু তাহার অসময়ে, বিপদের দিনে দুর্গা দেখা দিল এক নতুন রূপে। জেলে আসিবার দিনে সে তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিল। তারপর বিলুর পত্রে সে জানিয়াছে অনেক কথা। অহরহ-উদয়াস্ত দুর্গা বিলুর কাছে থাকে, দাসীর মত সেবা করে। সাধ্যমত সে বিলুকে কাজ করিতে দেয় না। ছেলেটিকে বুকে করিয়া রাখে। স্বৈরিণী বিলাসিনীর মধ্যে এ রূপ কোথায় ছিল-কেমন করিয়া লুকাইয়া ছিল?

বন্ধু কে নয়? বিলুর পত্রে সে যে পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে গ্রামের মানুষগুলির প্রতিটি জনই যেন দেবতা। তাহার মনে পড়িল গ্রামের একটি গ্রাম্য প্রবাদ–গাঁয়ে মায়ে সমান কথা। হ্যাঁ–মা। এই পল্লীই তাহার মা! সে নত হইয়া পথের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

দ্বিতীয় ছবিটা কিছুটা ভাবলৌকিক-ধর্মী। কলকাতার ছেলে যতীন গ্রামের নিসর্গকে যে ভাবে দেখেছে এবং তার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবেই দুর্গাকে যেভাবে দেখেছে তারই আলেখ্য। আলেখ্যটি নিম্নরূপ :

চৈত্রের দ্বিপ্রহর। অলস বিশ্রামে যতীন দাওয়ার তক্তপোষখানির উপর শুইয়াছিল। চারিদিক বেশ রৌদ্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তপ্ত বাতাস–এলোমেলো গতিতে বেশ জোরেই বহিতেছে। বড় বড় বট, অশ্বত্থ, শিরীষ গাছগুলি কচি পাতায় ভরা, উত্তাপে কচিপাতাগুলি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সেদিনের বৃষ্টির পর মাঠে এখন হাল চলিতেছে, চাষীরা এতক্ষণে হাল-গরু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ঘর্মসিক্ত কালো চামড়া রৌদ্রের আভায় চক্‌চক্ করিতেছে তৈলাক্ত লোহার পাতের মত। বাউড়ি-বায়েনদের মেয়েরা গোবর, কাঠ কুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। সম্মুখেই রাস্তার ওপাশে একটা শিরীষ গাছে সর্বাঙ্গ ভরিয়া কি একটা লতা–লতাটির সর্বাঙ্গ ভরিয়া ফুল। চারিপাশে মৌমাছি ও ভ্রমরের গুনগুনানি যেন এক মৃদুতম ঐকতান সঙ্গীতের একটা সূক্ষ্ম জাল বিছাইয়া দিয়াছে। গোটাকয়েক মধুচুট্‌কি পাখী নাচিয়া এ-ডাল ও-ডাল করিয়া ফিরিতেছে। দূরে কোথায় ডাকিতেছে কোকিল। 'চোখ গেল' পাখীটার আজ সাড়া নাই। কোথায় গিয়া পড়িয়াছে–কে জানে! আকাশে উড়িতেছে কয়েকটা ছোট ঝাঁকে একদল বন-টিয়া: মাঠের তিল ফসলে তাহাদের

প্রত্যাশা। অসংখ্য বিচিত্র রঙীন প্রজাপতি ফড়িং ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিতেছে—দেবলোকের বায়ু তাড়িত পুষ্পের মত।

গন্ধে-গানে বর্ণচ্ছটায় পল্লীর এই এক অনিন্দ্য রূপ। কবির কাব্যের মতই এই গন্ধে গানে বর্ণচ্ছটায় যেন একটা মাদকতা আছে। কেমন একটা হাতছানির ইসারা আছে। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সেই ইসারার ডাকেই যেন মোহগ্রস্তের মত যতীন বাহির হইয়া পড়িল। কাছেই কোন গাছের মধ্যে সঙ্গীতের একটা সমগ্রতা আছে। পাখীটা যেন কোন গানের গোটা একটি কলি গাহিতেছে। পাখীটার খোঁজেই যতীন সন্তর্পণে ওই জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। খানিকটা ভিতরে গিয়া পাইল সে অপূর্ব মধুর গন্ধ ধ্বনি এবং গন্ধের উৎসমূল আবিষ্কার করিবার জন্য সে অগ্রসর হইয়া চলিল। আশ্চর্য পাখীটা এবং ফুলগুলি তাহার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলিতেছে? শব্দ এবং গন্ধ অনুসরণ করিয়া যত সে আগাইয়া আসিতেছে—তাহারাও যেন তত সরিয়া চলিতেছে। মনে হয় ঠিক ওই গাছটা। কিন্তু সেখানে আসিলেই পাখী চুপ করে, ফুল লুকাইয়া পড়ে। আবার আরও দূরে পাখী ডাকিয়া উঠে। গন্ধ মনে হয় ক্ষীণ; উৎসস্থান আরও দূরে। মোহগ্রস্তের মত যতীন আবার চলে।

– বাবু? – কে ডাকিল? নারী-কণ্ঠে যেন।

যতীন পাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—একটা গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া দুর্গা।

– দুর্গা ?

– আজ্ঞে হ্যা। ... আঁট সাট করিয়া গাছ কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া দুর্গা বসিয়া কি যেন কুড়াইতেছে।

ওগুলো কি? কি কুড়োচ্ছ?

এক অঞ্জলি ভরিয়া দুর্গা তাহার হাতে ঢালিয়া দিল। টোপ-টোপা স্ফটিকের মত সাদা—এগুলি কি? এই তো সেই মদের গন্ধ। ইহাই এক ছড়া মালা গাঁথিয়া দুর্গা গলায় পরিয়াছে। বিলাসিনী মেয়েটির দিকে যতীন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গঠন-ভঙ্গিতে, চোখ-মুখের লাবণ্যে রুক্ষ চুলে মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভরিয়া একটা অদ্ভুত রূপ আছে।

দুর্গা মৃদু হাসিয়া বলিল—মউ-ফুল।

– মউ ফুল?

– মহুয়া ফুল, বাবু, আমরা বলি মউ-ফুল।

যতীন ফুলগুলি তুলিয়া নাকের কাছে ধরিল; সে এক উগ্র মদির গন্ধ—মাথার ভিতরটা যেন কেমন হইয়া যায়, সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

– কুড়িয়ে রাখছি বাবু, গরুতে খাবে—দুধ বাড়বে। আবার—দুর্গা হাসিল।

– আবার কি ক'রবে?

– আর সে—আপনাকে শুনতে হবে না।

– কেন, আপত্তি কি?

– আর আমরা মদ তৈরি করি।

– মদ?

– হ্যাঁ !... পিছন ফিরিয়া দুর্গা হাসিতে লাগিল, তারপর বলিল–কাঁচাও খাই, ভারী মিষ্টি।

যতীন টপ করিয়া একটা মুখে ফেলিয়া দিল। সত্যই চমৎকার মিষ্টি। কিন্তু মিষ্টতার মধ্যেও ওই উগ্র মাদকতা। আবার একটা সে খাইল। আবার একটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার কানের ভিতরটা যেন গরম হইয়া উঠিল, নাকের ভিতর নিঃশ্বাস উগ্র তপ্ত। কিন্তু অপূর্ব এই মধু রস।

দুর্গা সহসা চকিত হইয়া বলিল, পাড়ার ভেতর গোল উঠেছে লাগছে, হ্যাঁ তাইত। সে তাড়াতাড়ি ঝুড়িটা কাঁখে তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি চললাম; বাবু! পাড়াতে কি হ'ল দেখি গিয়ে।

যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, মউ আর খাবেন না, বাবু মাদকে হবে।

– কি হবে?

– মাদ্‌কে! নেশা–নেশা ... দুর্গা চলিয়া গেল।

নেশা। তাইতো তাহার মাথার ভিতরটা যে ঝিম ঝিম করিতেছে সর্বশরীরে একটা জ্বালা, দেহের উত্তাপও যেন বাড়িয়ে গিয়াছে।"

এইভাবে দুই আদর্শবাদী নায়কের মনোপটে বায়েন মুচিদের ভ্রষ্টা মেয়ে দুর্গাকে উপন্যাসের সঞ্চালিকা উপাদান হিসেবে স্থাপন করে তারাশংকর বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারাকে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যত 'পথের দাবী' উপন্যাস থেকে একপা এগিয়ে দিয়েছেন। কথাটা অবশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। গ্রামীণ লোকজীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে তারাশংকর স্বভাবতই ধর্মীয় লোকাচার বা বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং চণ্ডীমণ্ডপকে কাহিনীর বৃত্তের মধ্যে এনেছেন, এবং বাস্ত ব পরিবেশকে উপন্যাসের শিল্পরূপ অনুযায়ী যথাযথভাবে পরিবেশন করার জন্য এদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এই বিবরণ ধর্মকে গ্রাম্যজীবনে বড় করে দেখাবার জন্য আসেনি। লোকজীবনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অঙ্গ হিসেবে এই বিবরণ অনেকটা নিজ গতিতেই চলে এসেছে। তা যদি না হতো তাহলে বায়েনদের ভ্রষ্টা মেয়ে দুর্গা এ উপন্যাসের সহজ নায়িকা হতে পারতো না। গ্রামীণ সমাজকে একেবারে নীচতলা থেকে দেখানো সম্ভব হতো না। হিন্দু ধর্মীয় পৌরাণিক কথা উপন্যাসের মধ্যে চলে এলেও, প্রজাসমিতি যে ধর্মঘটের আয়োজন করেছে, হিন্দু মুসলমান চাষীরা সমবেতভাবে তাতে উদ্যোগী হয়েছে। এ ব্যাপারটাও এসেছে ভূমিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের বৈপ্লবিক প্রয়োজন থেকে, যে প্রয়োজনটি আবার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৃহত্তর প্রয়োজনবোধের সঙ্গে জড়িত। এই বৃহত্তর প্রয়োজনবোধটি পটভূমিতে রয়েছে বলেই–দেবু পণ্ডিতকে সমগ্র উপন্যাসটিতে ঘটনাবলির মধ্যে দুর্গার পাশাপাশি প্রাধান্য দিলেও মূল রাজনৈতিক তাত্ত্বিক বক্তব্যটি আনা হয়েছে বিপ্লববাদী যতীনের চিন্তা মারফত। আবার, 'গণদেবতা' উপন্যাসের ঘটনা ঘটেছে গ্রামীণ জীবন এবং তার মানবমানবীদের নিয়ে। যতীন এখানে একটি যোগসূত্র! এর বেশি নয়। এই কারণেই যতীন একটি সাধারণ চেহারার এবং ব্যবহারের বাঙালি ছেলে। সে বিপ্লববাদী। সে

রাজবন্দী। কিন্তু সে তার অসামান্যতা নিয়ে উপন্যাসের ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি করেনি।

উপন্যাসের শিল্পী কয়েকটিমাত্র লাইনে যতীনের যে মুখচ্ছবিটি এঁকেছেন, সেটি এই প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য :

"উনিশ শো চব্বিশ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রণয়ন করা আইন–আটক আইন। নানা গণ্ডিবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বিশেষ বিশেষ থানার নিকটবর্তী পল্লীতে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সন্দেহে বাঙালি তরুণদের আটক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙলা সরকারের সেই আটক আইনে বন্দী যতীন। যতীনের বয়স বেশি নয়। সতের আঠারো বৎসরের কিশোর, যৌবনে সবে পদার্পণ করিয়াছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, চোখ দুইটি ঝক ঝকে, চশমার আবরণের মধ্যে সে দুইটিকে আরও আশ্চার্য দেখায়।"

যতীন অত্যন্ত স্বল্পভাষী। সে বিপ্লববাদী হলেও 'কলকাতার' ছেলে; সে দেশদর্শন করেছে নতুনভাবে। এজন্য সে বেশি শোনে, কম বলে। তার একটা চৌম্বক আকর্ষণ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে রয়েছে যেমন ভাবে সে অন্তরীণ রয়েছে সেই ভাবেই। যতীনের তুলনায় এই কারণেই গোঁয়ার অনিরুদ্ধ কামার একশ গুণ বেশি দুরন্ত দুর্বার চরিত্র। এই অনিরূদ্ধ কর্মকারের বাইরের ঘরেই যতীন বাসা নিয়েছে। অনিরুদ্ধ কর্মকারের স্ত্রী সন্তানহীনা পদ্মাকে সে মা-মনি ডেকেছে। যতীনের এই মামনি যতীনকে ছেলে বলে ডেকেছে। মাতাল উচ্ছৃঙ্খল স্বামী পদ্মর জীবনকে পণ্ড করে দিয়েছে। এই স্বামী স্ত্রীর ঘাতসংঘাত আর ভালবাসার জীবনকে যতীনের উপস্থিতি আবৃত করে দেয়নি।

'গণদেবতা' উপন্যাসের একটি গণদেবী হচ্ছে পদ্ম। সমগ্র উপন্যাসে অনন্যা যদি কেউ থেকে থাকে তবে সে এই পদ্ম। চিরদুঃখিনী পদ্ম। ধনী চাষী শ্রীহরি বা ছিরুও অনন্য চরিত্র, অবশ্য অনন্য বদমায়েশ চরিত্র। সে হচ্ছে দেবু পণ্ডিতের বিপরীত। সে ভোগী, পদ্মর উপর তার চোখ ছিল। কিন্তু পদ্মর পাশে রাখা পানিতে কাটারীর ভয়ে সে অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতেও পদ্মের ঘরে ঢুকতে সাহস করেনি। কিন্তু অত্যাচারী হিসাবে তার জুড়ি নেই। খল সে, এবং একই সঙ্গে ত্রাস সে। আবার আমলাদের জোগানদার সে।

বিপ্লববাদী যতীনকে এর পাশে স্নিগ্ধ আলোক শিখার উপস্থিতি ছাড়া আর বেশি কিছু করে চিত্রিত করা হয়নি।

যতীনের তারুণ্য সত্ত্বেও তার দেশদর্শনে পল্লীর নিসর্গ আর পল্লীবাসীরা ঠিক যেমনটি ঠিক তেমনটি। এদের ধর্মীয় আবরণটুকুও অবাস্তব নয়, আবার পল্লীর ধর্মপরায়ণ ন্যায়রত্নের নাস্তিক নাতি যে বলেছে, 'চন্ডীমণ্ডপের যায়গায় কো-অপারেটিভ করতে হবে,' সে কথাটাও বাস্তব ভিত্তিকই। একথাটা আসারও অবস্থা তৈরি হয়েছে, তা নাহলে এ কথাটা আসতে পারে না। চাষীর ছেলে দেবু পণ্ডিত এই বাস্তবের মধ্যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে করতে যতীনের বিপ্লববাদের জগতের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"পণ্ডিত দেবুঘোষ অর্ধ শিক্ষিত চাষীর ছেলে, হৃদয়ের প্রসারতায় তাহার মূল্যাঙ্ককে ছাড়াইয়া গিয়াছে–কতখানি, কতদূর–যতীন তাহা নির্ধারিত করিতে পারে নাই, কেমন করিয়া গেল–সেত অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত এক রহস্য।"

যতীনের কাছে বিশের দশকে দেশের যে অঙ্কের হিসাব ছিল, তাতে গ্রাম বাংলার মানুষের ছবি পাওয়া যায় নি, যতীনও চেষ্টা করেনি তার হিসেবের ছকের মধ্যে তার সদ্য আবিস্কৃত গ্রাম বাংলাকে শক্ত করে আটকাতে।

সেদিন সে হিসাবও ছিল প্রাথমিক। তাছাড়া সে হিসাবের মধ্যে শক্ত করে গ্রামবাংলার বিপ্লবীরূপকে আটকে তাকেই পূর্ণ সত্য বলে প্রসারিত করতে যাওয়াটা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এই কারণে যে, শুধু দেবু পণ্ডিতকে নয়, যাকে সে মা বলে ডেকেছিল তাকেও সে পুরোপুরি বুঝবার আগেই এই গ্রামটিকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। গণদেবতা উপন্যাসের শুরু যাদের নিয়ে, তারাই যে আসন্ন ভূমি বিপ্লবের ভিত্ তৈরি করছে এবং করবে, এটাই যতীনের আসা এবং যাওয়ার পরেও মূল সত্য এখানে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ হিসাবের অঙ্কের তাগিদে 'গণদেবতা' উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড 'পঞ্চগ্রাম' লিখেছিলেন। কারণ তিরিশের দশকে বিপ্লবের হিসাবের অঙ্ক আগের চেয়ে আরও বেশি দেশের মানুষের মনের জগতের সম্ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু গণদেবতা লিখবার সময়ের অভ্যুত্থানের দশকের বাস্তবকে সামনে রেখে তারাশংকর চাষীর দেশে চাষী বিপ্লবের ছবি দিতে গিয়ে যে যেমনটি বাস্তবের ঠিক তেমনটি ছবি এঁকেছেন। তাতে সাংসারিক রংচং প্রাধান্য পেয়েছে।

তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ কিংবা চল্লিশের দশকের বিপ্লবের অঙ্কের হিসাব যখন ভূমি-বিপ্লবের ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি সত্যতা জাহির করলো, তখন তারাশংকর এই ধারাটিকে নিয়ে 'গণদেবতা'র মতো বস্তুভিত্তির উপর কাজ না করলেও, বাংলা উপন্যাসের এই ধরনের কাজ বন্ধ থাকলো না। আরেকজন ঔপন্যাসিক এই সময়ে ভূমি বিপ্লবের আয়োজনের এমন সব নায়িকা নিয়ে এলেন উপন্যাসের শিল্পরূপে যারা যতীনের থেকে একযুগ সামনে এগিয়ে এসেছে। এই ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ধারা দর্পণকে মর্মে রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মালা।

এখানে তারাশংকরের 'গণদেবতা' উপন্যাস একটি উপাদানকে মহাকাব্যিক শিল্পরূপে এনেছে, যা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাজ করেছেন। এটি হচ্ছে সংলাপে লোকভাষার ব্যবহার।

এদিক দিয়ে 'গণদেবতা' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের তুলনায় খুব বেশি সংযত। দুর্গা লোকভাষাতেই বাঙ্ময়ী। কিন্তু সে প্রগল্‌ভা নয়। শিল্পী এখানে দুর্গাকে সহজভাবে উপস্থিত করার উপরেই জোর দিয়েছেন। এদিক দিয়ে 'গণদেবতা' উপন্যাসে সংলাপে লোকভাষার ব্যবহার নির্ধারিত কাজটুকু করেছে। তবে বলা যায়, গণদেবতা এদিক দিয়েও একটি অন্তর্বর্তীকালীন উপন্যাস।

বাইশ
বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা (৫)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ' জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শিল্পরূপ দর্পণ হিসেবে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে আলাদা এদিক দিয়ে যে, "গণদেবতার" মতো "দর্পণও" মুক্তিসংগ্রামের উৎসর্গিত বিপ্লববাদীদের চরিত্রে যত আলো ফেলে তাদের বীরত্বকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছে। তার চেয়ে বেশি আলো ফেলেছে নিতান্ত সাধারণ ও তথাকথিত সামান্য মানব-মানবী চরিত্রে, যারা গ্রাম বাংলা আর সহরতলীর মেহনতী মানুষদের চাপা পড়া স্তর থেকে বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আবার 'দর্পণ' উপন্যাসটি "পথের দাবী" ও "গণদেবতা" থেকে আলাদা এদিক দিয়ে যে, "দর্পণ" জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চল্লিশের দশকের বিপ্লবাত্মক শ্রমিককৃষক মৈত্রীর যোগসূত্র স্থাপনের উপন্যাস। "পথের দাবী'র বিপ্লবের মূলশক্তি শহরের কল কারখানার শ্রমিক আর 'গণদেবতা'র মূল বিপ্লবীশক্তি গ্রামীণ গণ-অভ্যুত্থানে একত্রিত হয়েছে। এ যেন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সর্বশেষ গণবৈপ্লবিক মহাঅভ্যুত্থানের একটা প্রাথমিক প্রস্তুতি ও পরীক্ষামূলক ঘটনা। এই ঘটনা যাদের নিয়ে ঘটেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনই সামান্য মানুষদের প্রতিভূ। এই কয়েকটি চরিত্রের নিজস্ব সমস্যা ও দ্বন্দ্ব নিতান্তই মানবিক দ্বন্দ্ব। অনুরাগ বিরাগ যেমন আত্মার, তেমনি দেহজ। এখানেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সেই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে পটভূমিতে, যা অবশ্য আনন্দমঠকে তো কথাই নেই, গোরা এবং পথের দাবীকেও এবং এমনকি খুব কাছাকাছি সময়ের গণদেবতাকেও রাজনৈতিক সামাজিক বৈপ্লবিক লক্ষ্যে বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে এসেছে। যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার পুরোপুরি চেহারাটা এখানে যেমন বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি যে সব শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করার জন্য সর্বশেষ সংগ্রামের প্রস্তুতির দিক দিয়ে তৈরি হয়েছে, তাদের চেহারাটাও পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে। এখানেও বিপ্লববাদী তাত্ত্বিকদের অধিকাংশই এসেছে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক কর্মী এবং কর্মিনীদের মধ্য থেকে। বিভিন্ন তর্কের মধ্যদিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণে চল্লিশের দশকের পরিস্থিতিটাকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই জনগণ থেকে এদের বিচ্ছিন্নতা অনেকটা কাটবার মুখে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে আপোষমুখী বুর্জোয়া বা উচ্চবিত্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচীর বিভিন্ন ভাষণ মুখর হলেও যাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকলাপ বা সংঘাতের অস্তিত্বমূলক কোন ঘটনা পথের দাবীতে নেই, সেই বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বিধান্বিত রূপটা এখানে কয়েকটা দ্বন্দ্বাত্মক চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'দর্পণ' উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে যে গ্রামীণ জীবন সমস্তটা জুড়ে আছে সেখান থেকেও এই কারণে বৈপ্লবিক শ্রেণীবিন্যাসের তাত্ত্বিক তাগিদ বেরিয়ে এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। কলকাতা মহানগরীর বস্তি আর গ্রাম বাংলার কুঁড়ে ঘরের সংগ্রামী ঐক্যের যে সংকেত

দেখানো হয়েছে দর্পণে, সেখানে যে দেশ দর্শন করানো হয়েছে, তা চল্লিশের দশকের বাস্তব।

'দর্পণ' উপন্যাস আরেকদিক দিয়েও তার পূর্বসূরীদের থেকে আলাদা। এই পার্থক্যটাকে অনন্যতা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'দর্পণ' জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভ্যুত্থানমূলক বাংলা উপন্যাসের ধারায় সাধারণ মানব-মানবীর ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের মনের চলচ্ছবিও এঁকেছে। দর্পণের গ্রামীণ মেয়ে রম্ভা গণদেবতার দুর্গার চেয়ে বৈপ্লবিক দিক দিয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনাময়ী। এর কারণ এই যে, দর্পণ উপন্যাসের এই সামান্য নায়িকাটির মন গণদেবতার দুর্গার চেয়ে গভীরতরভাবে অভিব্যক্ত।

গণদেবতার এক জায়গায় দেবুপণ্ডিত তার নিজের শক্তির প্রবলতাকে বুঝতে গিয়ে বলেছে—'এ যেন দেবুর মধ্যে দিয়ে আরেকটা দেবু কাজ করে চলেছে।'

দুর্গাকে দিয়ে তারাশঙ্কর এতটা ভাবাতে পারেন নি। দুর্গা আচরণময়ী, লীলাময়ী। দুর্গা চিন্তাময়ী নয়। তবে তারাশংকর দেখিয়েছেন, স্বৈরিণী দুর্গার মধ্যে একটা বিপ্লবী দুর্গা আছে। এর বেশি তারাশংকর অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়েছেন। দর্পণের রম্ভা যেমন লীলাময়ী, তেমনি চিন্তাময়ীও। তবে দুটোয় মেশানো সাধারণ মেয়ে। তার যে যৌবনময় দেহটি সাংসারিক দিক দিয়ে পুরুষকে টানে সেটি যেন বিপ্লবী অভ্যুদয় ঘটাবার জন্যই তৈরি। এই দেহে যে মনটি রয়েছে, তা তার্কিক এবং তাত্ত্বিকও বটে। এই যে সাধারণ মেহনতী মানব-মানবীর মনের গভীরতায় গিয়ে বিপ্লবের গভীরতায় যাওয়ার চেষ্টা এখানে দুটি দর্শন নিয়ে উপন্যাস-শিল্পী কাজ করেছেন। একটি ফ্রয়েডবাদী, আরেকটি মার্কস্‌বাদী দর্শন। বাংলা উপন্যাসে শিল্পীর এই মার্কস্‌বাদী দর্শন সাধারণ মেহনতী মানব-মানবীর বৈপ্লবিক ভূমিকাকে সামনে এনেছে। বাংলা উপন্যাসে তাঁর ফ্রয়েডির ভাবধারা হচ্ছে অবচেতন মনকে জানানোর মধ্য দিয়ে পুরো মানুষটাকে জানানো। মার্কস্‌বাদী দর্শন প্রাধান্য বিস্তার করেছে গণবৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। তবু ফ্রডেয়ীয় ভাবধারা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে এই দর্শন প্রধান; দ্বিতীয় খণ্ডে অপ্রধান হলেও প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

''দর্পণ' উপন্যাসের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝাবার জন্য শিল্পী হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকাশ এবং বিশেষ করে বিশের দশকের যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারা থেকে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উদ্ভব, সেটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বাংলা উপন্যাসে বহির্বাস্তবলৌকিক ও ভাবলৌকিকতার ধারার সঙ্গে আরেকটা ধারা যোগ হয়, যাকে মনোবাস্তববাদী ধারা বলে ইতিপূর্বে অন্যান্য প্রসঙ্গে চিহ্নিত করেছি। এবং যাকে দেখেছি একই সঙ্গে শিল্পরূপের পক্ষে বিপদ ও সম্পদের পদ্ধতিরূপে। এই ধারা একই সঙ্গে এনেছে সংকট এবং সমৃদ্ধি এবং এই প্রসঙ্গে গত শতাব্দীর ফরাসি ঔপন্যাসিক স্তাঁদালের কথা এসেছে উপন্যাসের শিল্পরূপের রক্ষাকর্তারূপে।

বস্তুতপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলা উপন্যাসে এই ধারাটিকে নিয়ে আসেন প্রথমে একটি ঋজু পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে। এই ঋজু স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে মনোমুখিতা, যার সংস্পর্শে ইউরোপীয় উপন্যাসে চিরায়তিক ছাঁচ নিরবয়ব হয়ে গড়িয়ে নেমেছে ঔপন্যাসিকের তিমিরাচ্ছন্ন মনোবিবর থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ভুতুড়ে লেখায়। এই স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে ফ্রয়েডির-অবচেতনাবাদী মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপায়ণের বিশেষ চিত্রমালা।

এই ফ্রয়েডির ধারাকে নিয়ে কাজ করতে করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরিশের দশকের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নব অভ্যুদয়গুলিতে প্রভাবিত হয়ে গণমুখিতার এবং মার্কসীয় গণবৈপ্লবিকতার ধারার শিল্পরূপকার হিসেবে কাজ নিলেন। এই গতিধারার মধ্য দিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সাধারণভাবে বিশ্ব-উপন্যাস শিল্পের সেই নব উজ্জীবনের ছাঁচ গড়ে উঠলো, যার উপর নির্ভর করে ফরাসি স্তাঁদালের উপন্যাস অপেক্ষাও উন্নততর মানের বাস্তবলৌকিক, ভাবলৌকিক ও মনলৌকিক ঐক্যের কথারূপচ্ছবি হয়েছে নিশ্চয়, কারণ দেশে দেশে হয়েছেও।

উপন্যাসের শিল্পরূপের যে নিকটতম পরিস্থিতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবির্ভাব, সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ছোটগল্প দিয়ে শুরু করেন, তার কিছুকাল আগে অর্থাৎ ১৯১৯-২০ সালের ঠিক পরেই শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' প্রমুখ উপসন্যাসে নরনারীর দেহাশ্রিত অনুরাগকে মনোবীক্ষণের নতুন আলোয় রঞ্জিত করে সাহিত্যের তথাকথিত স্বাস্থ্যরক্ষকদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তরুণ ঔপন্যাসিক নরনারীর দেহের ক্ষুধাকে পাপ বলে চিহ্নিত না করে তারই মধ্যে মহৎকে, সুন্দরকে, সুষমাকে, মানবতাকে, আত্মিকতাকে আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত না হয়ে তাদের মহৎ শিল্পের উপাদানরূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন বিন্দুমাত্র আবৃত না করে বিকৃত না করে। বাংলা উপন্যাসের বাস্তববাদী ধারাতেও এ এক নতুন দিকদর্শন।

নরনারীর যে যৌন ক্ষুধা বাংলা উপন্যাসের শুরুতেই তার পরিপূর্ণ দাহ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, সে ছিল পাপ-সমস্যা। এই ক্ষুধাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস এবং বিশেষ করে কলকাতার 'কল্লোল' ও ঢাকার 'প্রগতি' গোষ্ঠীর তরুণ ঔপন্যাসিকদের লেখায় দেখা দিয়েছিল একটা 'পাপের ভাবমুক্ত' মানবিক তাগিদ হয়ে। এই নব বাস্তববাদী ধারা এই কারণেই বিদ্রোহ নামে চিহ্নিত হয়েছিল। উদরের ক্ষুধার মতোই নরনারীর দেহের ক্ষুধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নব জাগৃতির দাবীদার মানুষের অন্যতম উৎকৃষ্ট স্বভাব-দাবী। এই ক্ষুধাও উদরের ক্ষুধার মতো দাবী করেছিল সমস্ত মানবীয় মূল্য নিরূপণে শরিকানা।

নরওয়ের ক্নুট হামসুনের 'ক্ষুধা' উপন্যাসে উদরের ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত স্বাভাবিক ও সরল সহজভাবে নরনারীর দেহের ক্ষুধাকে শিল্পরূপে স্বীকৃতি দেওয়ায়, এই বইটি সেদিন আধুনিক বাংলা উপন্যাসের শিল্পীদের একটি আদর্শ উপন্যাসে পরিণত হয়েছিল। তবে ক্নুট হামসুনের এ প্রভাবের অর্থ এই নয় যে, আলোচ্য নব-বাস্তববাদী ধারা মূলত বৈদেশিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সমগ্র উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী অধিবাসীদের চাপাপড়া স্তরগুলি সমস্ত

সমাজ সেদিন অগ্নিগিরির ধারায় প্রকাশের পথ অনুসন্ধান করছিল। আলোচ্য বাস্তববাদী উপন্যাস রচনারও তাগিদ তাই ছিল মৌলিক দেশজ, বহুকেন্দ্রিক, স্থানীয় ভাষাভাষী। একদিকে যেমন রাণীগঞ্জ, বীরভূম আত্মপ্রকাশ করেছিল সাঁওতাল এবং বাউরি বাগদীর বাংলা নিয়ে, তেমনি আরেকদিকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার লোকভাষার প্রয়োগ ঘটেছিল নব বাস্তববাদী বাংলা উপন্যাসে।

এদের শিল্পীরা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার ছিলেন না কেউ। এরা ছিলেন জাগ্রত সর্বহারার আত্মপ্রকাশের রূপকার। স্বতন্ত্র ধারার কোন দাবীদার যে ছিলেন না একসময়ে তা নয়। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ পিছিয়ে পড়া মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণকে বাংলাভাষায় বাঙ্ময় করতে চেয়েছিলেন এবং এই সূত্রের একটি মুসলিম ধারাও সাধারণ বাংলা সাহিত্যের ধারায় এসে পড়েছিল।

সর্বহারার লোকভাষার প্রয়োগের দিকে তাকালেও সাধারণভাবে সমস্ত সর্বহারার অভ্যুত্থানের দিকে নির্ধারণী ধারা দেখা যাবে। একদিক থেকে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' আর অচিন্ত্যকুমারের 'আকস্মিক' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাসের বাস্তববাদী ধারায় ছিল এক অভূতপূর্ব আশাবাদ, সৃজন চাঞ্চল্য। ছিল সমস্ত তিক্ততা ও অপমানজনক দিক দিগন্ত মুখর করা অভিযাত্রার আনন্দ ধ্বনি। উপরোক্ত সৃষ্টিশীলতাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ম্যাক্সিম গোর্কির বহির্বাস্তবলৌকিক ভাবলৌকিকতার ছাঁচে ঢালা সাধারণ মানব মানবীর সূর্যোজ্জ্বল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা এ জন্যই সেদিনকার বাংলা উপন্যাসের তরুণ রূপকারদের মনে দিয়েছিল অবিশ্রান্ত দোলা।

শুরুতে বাংলা উপন্যাসের এই নব মানববাদ ছিল প্রধানত সূর্যমুখ। এই মানববাদের মূলগুলি অতি সাধারণ নরনারীর তিমিরাবৃত মনের গভীরে প্রোথিত থাকলেও এর পত্রপুষ্পরাজি ছিল আকাশের আলোর সন্ধানী। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তা ব্যতিক্রম। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের প্রগতিবাদীদের বাস্তবচিত্রণকেই গভীরতর করে দেখতে গিয়ে তরুণ ছোটগল্প-লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষুব্ধ দৈহিক কামনার এমন একটি অন্তঃশীল রূপ দেখতে পেলেন, যা আর কারো চোখে এত তীব্রভাবে ধরা পড়েনি। সর্বকনিষ্ঠ হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন, নানাভাবে বঞ্চিত মানব মানবীর আশাহত, ক্ষত-বিক্ষত, অন্তর্মুখী ক্ষুধার কুন্ডলিনীকে। দেখতে পেলেন, জ্বালামুখী দৈহিক তৃপ্তির স্পৃহা কাম্যকে ঈপ্সিতকে না পেয়ে অতৃপ্ত আন্তরাত্মায় মাথা খুঁড়ে মরছে। দেখলেন মানবাত্মার অজস্র চাপা বিস্ফোরণ, নানাবরণ দাহ। তথাকথিত সভ্য সমাজসম্পর্কের পাষাণ চাপাকে ঠেলে সরিয়ে সোজাসুজি বেরিয়ে আসতে না পেরে নরনারীর বিচিত্র গোপন কামনা বাসনারা সর্পিল সুড়ঙ্গ খুঁজে খুঁজে পাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। তরুণ শিল্পী দেখলেন, জীবন-তরুর মাথা মুড়িয়ে কাটা, সঞ্জিবনী ধারার জন্য শিকড়গুলো তৃষ্ণার্ত। কল্লোল মুখর অরুণরঞ্জিত দেহমনোমর্মর কোথায়? এযে কালিদহের অতলতলে ঘূর্ণীস্রোতের ক্রন্দন। ভিতরের দিকে মুখ গোঁজা

স্নায়ু-আশ্রিত অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষিত রূপরস মধু থেকে বিছিন্ন। অন্ধকারই তা আশ্রয়। এখানেই তার আলোর পিপাসা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানব মনবীর মনের এই নিমজ্জিত বাস্তবলোককে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। এবং সক্ষম হলেন তাঁর এই কাজে। সেদিন এই রূপকারুতায় সফল হয়েছিলেন বলে বাংলা উপন্যাসে তিনি যে মনোবাস্তববাদী ধারা নিয়ে এলেন, তাকেই সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের ধারার অনুসরণ করতে মহাকাব্যিক উপন্যাসেও যুক্ত করে দিতে পারলেন। 'দর্পণ' এই গতিপরিণতির চল্লিশের দশকের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মহাকাব্যিক ফলশ্রুতি।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখা শুরু করেন, তখন এই বয়োকনিষ্ঠ শিল্পীর কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা? তার সামনে মানব মানবীর মনের চাপা আগুনকে খুঁচিয়ে বার করার একমাত্র পদ্ধতি ছিল ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন তত্ত্ব। এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার মতো পণ্ডিতও তখন প্রাচ্য দেশে আঙুলে গোনা যেত। 'দিবারাত্রির কাব্য' নামক উপন্যাস লিখবার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন পুরো মানুষগুলি টুকরো টুকরো হয়ে রয়েছে। বস্তুত তার নায়ক নায়িকার মনের এই খণ্ডগুলিকেই আঁকড়ে ধরে তাঁকে তাদের মনের গুহায় নামতে হয়েছিল। একেকটি চরিত্রকে বুঝবার জন্য চরিত্রের উপকরণগুলিকে টেনে বার করে আনতে হয়েছিল ভিতর থেকে। যেহেতু ভিতরের দিকে মুখ গোঁজা তমিস্রা লাঞ্ছিত বিবর মুখী মানবাত্মা সোজাসুজি বাস্তব পরিবেশের মুখোমুখি হয় না, সেই কারণে বিদ্রোহ বিক্ষোভও বিস্তৃত হতে পারেনা। অব্যক্ত, নিমজ্জিতভাবে গুমরে মরাই এর প্রবণতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র মহাকাব্যিক পটভূমিতেও সর্বহারাদের তাই তো আধো আলো আধো ছায়ারূপ। পদ্মা নদীর মাঝি থেকে এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি অর্থপূর্ণ :

"বিবাহ দিলে মেয়ে পরের ঘরে যায়, কাছে অথবা দূরে। গোপী না হয় যাইবে দূরে—অনেক দূরে ময়না দ্বীপে। হয়তো কখনো একটু মন কেমন করিবে কুবেরের, কিন্তু প্রতীকার কি? মনতো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষের। গ্রামে রাসুর মতো পাত্র থাকিতে দূরদেশে মেয়েকে কুবের পাঠাইবে কেন?

কেন?

এ কেনর জবাব দিবার ক্ষমতা নাই কুবেরের।

ময়না দ্বীপে গিয়ে গোপীকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মত মাঝে মাঝে তারও কি ছটফট করে না? তবু তাকে এসব বলা মিছে?"

কিন্তু সর্বহারাদের আধো আলো আধো ছায়ারূপ নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে থাকতে হয় নি। সর্বহারাদেরই উপজীব্য রাখলেন তার শিল্পরূপে, এবং এই কারণেই ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব থেকে এসে উপনীত তিনি হলেন মার্কসীয় তত্ত্বে। এই তাগিদ এল সর্বহারাদের বাস্তব জীবনের সংস্পর্শ থেকেই। তিরিশের দশকের শেষের দিকে শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম যে ভাবাদর্শ নিয়ে দেখা দিয়েছিল তা সমাজতন্ত্র। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলগুলিতে একটা নতুন তরঙ্গ এল জাতীয় স্বাধীনতার নতুনতর সংজ্ঞা নিরূপণের এবং তাগিদ এল স্বাধীনতা সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর বদলে শ্রমিক

শ্রেণীর নেতৃত্বের। এই সূত্রেই মার্কসীয় তত্ত্ব বাস্তব সত্য তত্ত্ব হয়ে উঠলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিল্পরূপের উপজীব্য সর্বহারা মানব মনবীর জীবনের ছবি আগের চেয়ে আরও নিবিড়ভাবে আঁকতে প্রবৃত্ত হয়ে মার্কসীয় তত্ত্বে সংক্রামিত হলেন।

এ তত্ত্বটি ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ তত্ত্বের মতে ফ্রয়েডিয় প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি সর্বস্ব এবং এ কারণেই মানব মনের মুক্তিকামী প্রবৃত্তিকে সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারে না। মার্কসীয় তত্ত্বের প্রতিপাদ্য এই যে পরিবর্তন মুখী শক্তিবিশেষ ছাড়া ব্যক্তির বিদ্রোহ জীর্ণ ও নিপীড়নমূলক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সর্ম্পককে অপসারিত করতে এবং নতুন মুক্ত সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। নরনারীর দেহাশ্রিত অনুরাগের সর্ম্পকের ব্যাপারেও যুক্তি প্রযোজ্য। তিরিশের দশকের শেষের দিকে কলকাতার আশে পাশে শিল্পাঞ্চলে বস্তিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে যে সংগঠিত শক্তি-চেতনার সঞ্চার হচ্ছিল, তাতে একটা পরির্বতন মুখী সামাজিক শক্তির অভিব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছিল। শিল্পীর ফ্রয়েডিয় চিন্তধারা পরিস্থিতিতে একটা পার্থক্য দেখছিল। এই পার্থক্যের রেশ ধরেই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র নায়ক নায়িকারা মনের ভিতর শুধুই গুমরে না মরে প্রসারিত পৃথিবীতে বাধা বন্ধের বাইরে আলোস্বাস্থ্য পরমায়ু এবং ভালবাসার জন্য হাত বাড়িয়েছিল। শিল্পরূপে এর সাক্ষী 'সহরতলী' উপন্যাসটি।

সহরতলী উপন্যাসটি ফ্রয়েডিয় ধ্যানধারণা এবং মার্কসীয় বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রয়োজনের বস্তুগত তাগিদের একটি মিশ্রণ। এ সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনগতভাবে মার্কসীয় তত্ত্বকে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের উপর স্থান দেন নি।

দর্শনগতভাবে মার্কসীয় তত্ত্বকে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের উপর স্থান দেওয়া বলতে কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে বিশ শতকের তিরিশ দশকের লেখা ক্রিস্টফার কডওয়েলের নিম্নোক্ত মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

'মানব মনের গুহানিহিত স্তর এবং উপরের স্তরগুলির মধ্যে যে বিরোধ, তাকে ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উপস্থিত করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমরা অনেকখানি ঋণী। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মার পরির্বতন সাধনের জন্য যে এই দুনিয়াটাকেই পরিবর্তিত করতে হবে, এই প্রাথমিক সত্যকথাটা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তিনিচয়ের বিদ্রোহ–এইটেই ফ্রয়েডের কাছে সবকিছু। এইটেই তার দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে দেয়, যার ফলে মনস্তত্ত্ব, শিল্পকলা, ধর্ম , সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যা কিছু লেখেন তা সবই উপরোক্ত বিদ্রোহের ছাঁচে ঢালা। জীর্ণ কাঠামোর অন্তরালে যে বিস্তৃত চেতনা জন্মের অপেক্ষায় রয়েছে, এই সর্ম্পকে যে বহুসংখ্যক ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে উপরোক্ত ফ্রয়েডিয় বিদ্রোহ অন্যতম মাত্র, সমগ্র নয়–ফ্রয়েডিয় বিদ্রোহকে একজন মার্কসবাদী এই দৃষ্টিতেই বিচার করবেন। মার্কসবাদীর বক্তব্য এই যে অন্ধ ও অনুভূতিহীন প্রবৃত্তি-সমূহের উপর যুগ যুগান্তরের সংস্কৃতির ক্রিয়ার নানা জীবন্ত বর্ণ সমন্বিত আবেগের জন্ম; সকল শিল্পকলা, সকল শিক্ষা, সকল দৈনন্দিন সামাজিকতা এই আবেগকে মানুষের জৈব সত্তার অভ্যন্তর থেকে বার করে আনে, এর লক্ষকোটি অভিব্যক্তিকে পরিচালিত করে, আকৃতি দেয়; ব্যক্তির ভিতরকার এই শক্তিকে একমাত্র

সামগ্রিক সমাজই পরিচালিত করতে পারে; কোন একজন ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ, রসায়নশাস্ত্রবিদ অথবা কোন দৈবনির্ভর পদক্ষেপ একাজ করতে পারে না।'

ক্রিস্টফার কডওয়েলের এই বক্তব্যটিকে সামনে রেখে চল্লিশের দশকের লেখা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পরূপ বিকাশের বিচারে বসলে আমাদের মনে হবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় বিপ্লবী কর্মসূচি সবসময় করেই চলেছেন। ১৯৪৪ সালে সাহিত্যিক জীবনের মধ্যাহ্নদিনে তিনি খোলাখুলি নিজেকে মার্কসবাদী বা কমিনিউস্ট বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার আন্তরিকতা ছিল আপোষহীন। কিন্তু সৃষ্টিই শিল্পীর আসল পরিচয় এবং একারণে পরবর্তীকালেও বারবার প্রশ্ন উঠেছে, মানিক বন্দ্যোপধ্যায় কি মানব মানবীর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ফ্রয়েডিয় ভাবধারাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না? 'দর্পণ' উপন্যাসটি সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠেছে। তবে এতে যদি ফ্রয়েডিয় প্রভাব কিছু বেশি থেকে থাকে, সেটা অস্বাভাবিক নয়। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা যে সময়ে সুনিশ্চিতভাবে ফ্রয়েডিয় থেকে মার্কসীয় ধারায় মোড় নিয়েছে, সে সময়কার লেখা 'দর্পণ'। এই উপন্যাসটিকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন একসঙ্গে গাঁথা দুটি উপন্যাস। প্রথমটি কলকাতা মহানগরীর উচ্চবিত্তের পাশাপাশি বস্তিবাসী নরনারীর অবরুদ্ধ অন্তরাত্মার সম্পর্কের সর্পিল গতিধারা। যেন কলকাতার আণ্ডার ড্রেন।

দ্বিতীয়টি শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রামবাংলার চাষী এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষের আপাত ব্যর্থ অভ্যুত্থান, যেন পর্বতনন্দিনী সুবর্ণরেখায় হঠাৎ ডাকা বান। শিল্পীর জীবনের দুটি পর্যায় যেন এখানে পাশাপাশি সাজানো—ফ্রয়েডবাদী আর মার্কসবাদী। 'দর্পণ' দেখিয়ে দেয় যে, মার্কসীয় দর্শনকেই অদম্য মুক্তিসংগ্রামের ভবিষ্যৎবাদী আশাবাদী পরিপ্রেক্ষিত রূপে শিল্পী জীবনে এবং নিম্নরূপে গ্রহণ করেছেন। ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব পিছনে পড়ে গিয়েছে। তবু ফ্রয়েডিয় ভাবধারা পরিত্যক্ত হয়নি দ্বিতীয়াংশেও। অপরদিকে প্রথমাংশে বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর যে কয়েকটি সামান্য ভাববিদ্রোহের ছবি আছে, তাতে মার্কসীয় দর্শন একটা সন্ধানী আলো হিসাবে বস্তবিশ্লেষণের মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে। এটা যদি না থাকতো, তাহলে 'দর্পণ' একটা সামগ্রিক মহাকাব্যিক উপন্যাস হতে পারতো না। প্রথম অংশের মার্কসীয় দ্যোতনার আভাস পরের অংশে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

'দর্পণ' উপন্যাসে ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞানের যে উপাদান রয়েছে, সেটাকে যদি চরিত্রের গভীরতর সত্যে পৌঁছবার পদ্ধতিরূপে দেখার দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য উপন্যাসের দ্বন্দ্বাত্মক দিকটাকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধক না মনে করে সহায়ক উপাদান বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'দর্পণ' উপন্যাসটি 'সহরতলী' কিংবা 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাস থেকে এদিক থেকে অনেক বেশি অগ্রসর যে, এখানে নিপীড়িত মানব মানবীরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিতে নিজেদের সাময়িকভাবে হলেও স্থাপন করতে পেরেছে। 'সহরতলী' উপন্যাসটির সংগ্রাম নিছক অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে আংশিক। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কোন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আসার অবকাশ নেই বলেই এর সংগ্রাম প্রকৃতিনিবন্ধ। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভ্যন্তরে যে

শ্রেণীসংগ্রামের উপাদান কাজ করে এসেছে মিশ্রিতভাবে উনিশ শতক থেকে, দর্পণে তা কিছুটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রশ্নটি গণদেবতাতেও চাপা পড়েছিল।

এদিক থেকে দেখতে গেলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমির ধারাবদলের লক্ষণ রয়েছে দর্পণে। সম্ভবত এই কারণেই ধর্মের প্রশ্নটিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্যা হিসেবে তত্ত্বের মধ্যে আনার প্রয়োজনবোধ করেননি। দর্পণের ঘটনাধারাকে উপস্থিত করেছেন তিনি ধর্মনিরপেক্ষভাবে। এখানে অন্যতম বুদ্ধিজীবী নায়ক হীরেনের স্ত্রী মমতা যে আরিফ নামক এক মুসলমান কমরেডের পাণিগ্রহণ করলো, সেটা ব্যর্থ প্রণয়ের দিক থেকে হীরেনের কাছ সমস্যা, ধর্মের দিক থেকে নয়। এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, হীরেন হচ্ছে 'দর্পণ' উপন্যাসে একটা পরিদর্শক ধরনের চরিত্র। ঘটনাবলির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হলেও নির্ধারকের ভূমিকা নয় তার। সে যাই হোক, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যেকার শ্রেণীসংগ্রামকে মর্মে রেখেছেন বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হীরেন-আরিফ-মমতা সমস্যাকে বড় করে দেখিয়ে হিন্দু মুসলমান নিয়ে এখানে তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। পরবর্তীকালের বিভিন্ন উপন্যাসে শ্রেণীসংগ্রামের উপাদানটি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, এবং এক্ষেত্রে শিল্পী হিন্দুমুসলমান প্রশ্নটিকে আরও পিছনে ফেলে দিতে চেয়েছেন সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের একাকার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে সামনে এনে। এক্ষেত্রেও যেটুকু একাকার হয়ে যাওয়া অনায়াসে এসেছে সেটুকুকেই অবশ্য তিনি চিত্রিত করেছেন।

তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ধর্মের প্রশ্নটা যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সামনে রেখে শিল্পীর মনে তাঁর জীবনের প্রথম থেকে জাগরূক ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। অবশ্য এ ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই ব্যবহারিক। এখানে কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি কথাটাকে পরিষ্কার করতে পারে :

'হোসেন বলে, তবে কাইল তোমাগো নিকা সারি।

আলিমুদ্দি বিস্মিত হইয়া বলে, কাইল ক্যান? ময়নাদ্বীপি দিবা–দুইমাস বাদ।

হোসেন বলে, ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই?

রাজবাড়ির আজিজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি, শওজনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতে পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি হিঁদু দিব ঠাহুর ঘর–না মিয়া আমার দ্বীপির মধ্যি ও কাম চলবো না।'

ধর্মের ব্যাপারে চল্লিশের দশকের শেষের দিকে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহারিক পটভূমিতেও একটা অনড় বাধা হিসেবে সামনে আনেন নি। দেশ বিভাগের পর কলকাতা এবং তার আশেপাশে ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে ধর্ম অথবা ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি মূল প্রশ্নরূপে উপন্যাসের মর্মে স্থাপন করেন নি। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাময়িক ব্যর্থতাকে কাটিয়ে ওঠার যে ধারাটা চল্লিশের দশকের

শেষে অথবা পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুতে ক্ষীণ হলেও ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল তাঁর কাছে, সেই নিপীড়িত সহরতলী ও গ্রামীণ মানুষের শ্রেণীগত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের খণ্ড খণ্ড ধারাগুলির প্রতি তিনি আঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন চলার পথ হিসেবে। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নামক ছোটগল্পের বইতে এই বিষয়টিকে তিনি এনেছিলেন বিস্ফোরিত ঘটনা হিসেবে। 'ইতিকথার পরের কথা' নামক উপন্যাসে বিষয়টিকে তিনি রেখেছিলেন বিস্ফোরণের ভিত্তি রচনা হিসেবে। "ইতিকথার পরের কথা"র দেশদর্শন 'দর্পণে'র তুলনায় একটি চূড়ান্তে পৌঁছবার উপযোগী করে ঘটনাবলিকে না সাজালেও, সেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নটি নিয়ে বিচার তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধতর হয়েছে। এখানেও অবশ্য মানব মানবীর গুহায়িত অন্তরাত্মার তাগিদগুলি শুধু যে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়, উপন্যাসের শিল্পরূপকে গভীরতর সত্যে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হয়েছে।

'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে 'শুভ' নামক চরিত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শুভও এক ধরনের পরিদর্শক চরিত্র। তার মনের আয়নায় প্রতিফলিত চিন্তাগুলি উপন্যাসের ঘটনাবলি সম্বন্ধে একটা সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রয়াস যেন। শুভ বিলেত ফেরত ডি এস সি ডিগ্রীধারী। সে দেশের মৌল কাঠামো বদলাতে চায়। অর্থাৎ চায় দেশের শিল্পায়ন, যার ভিত্তি স্থাপনই করতে দেয়নি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ। স্বাধীনতা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি বলে মনে করছে সে একে। সে কলকাতার মোহ কাটিয়ে কাছেই গ্রামাঞ্চলে কারখানা স্থাপন করেছে এবং এখানেই একইসঙ্গে চাষী এবং শ্রমিকদের একটি সংযোগস্থলের আয়োজক স্বরূপে এসেছে দেশের চাপাপড়া মানুষগুলির মুক্তিসংগ্রামের সংস্পর্শে।

'ইতিকথার পরের কথা'র 'শুভ' দর্পণের হীরেনের তুলনায় উদ্যোগী। দর্পণের সময়কে যে এই উপন্যাসটির সময় ছাড়িয়ে এসেছে বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তনে, এটা তারই ফলশ্রুতি নিশ্চয়।

তবে দুটি দিকে মিল আছে হীরেন আর শুভ'র। প্রথমত, হীরেন যেমন চাষী মেয়ে রম্ভার প্রতি আকৃষ্ট ঐ মেয়েটির সহজ বৈপ্লবিকতর কারণে, শুভও তেমনি আকৃষ্ট লক্ষ্মী নামে একটি চাষী মেয়ের সহজ বৈপ্লবিকতায়। উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরা বিপ্লবের পটভূমিতে দুজনের কাজেই সঙ্গিনী হিসেবে চাষী মেয়েদের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, উভয়ের কাছেই শহর আর গ্রামের একটা বৈপ্লবিক সংযোগ প্রতিভাত হয়েছে। শুভ অবশ্য অনেক পরিষ্কারভাবে দেখেছে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের বৈপ্লবিকতাকে।

এখানে শুভ'র চিন্তাস্রোত থেকে নিম্নোক্ত দুটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য :

(১) 'বারতলার গোঁয়ার মানুষগুলির জন্য শুভর মন কেমন করে। বিশেষভাবে লক্ষ্মীর জন্য। ছেলেবেলা থেকে তার জীবন কেটেছে শহর আর ওই গ্রামে। কিন্তু গেঁয়ো মানুষগুলির কাছাকাছি থেকেও সে তো কোনদিন এক হয়ে যেতে পারেনি ওদের সঙ্গে, কোনদিনও তলিয়ে জানতে পারেনি ওদের জীবন। আধখানা জানাচেনা মানুষগুলি তাকে টানে ওদের আরও আপন করার জন্য তারই কামনা দিয়ে। ওদের চালচলন ধ্যানধারণা আর জীবনযাপনের রকমটা জানাই শুধু নয়, ওদের চেতনার

অলিগলির সন্ধান জানার আগ্রহ তার চিরদিনই ছিল, এবার সেটা আরও জোরদার হয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীর কথা আসায় শুভ ভাবছে,

'তার সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়ে ওই চিররহস্যময়ী ফুলটির দুটি একটি পাপড়ি খুলে যেতে শুরু করেছে, লক্ষ্মীর টানটা তাই সে অনুভব করে সবচেয়ে বেশি।'

(২) 'আত্মীয় বন্ধু কেন, চারিদিকের জীবন ও পরিবেশও যেন তাকে এক বাক্যে নিষেধ করছে এখানে নয়, এখানে কিছু হবে না। মনুষ্যত্ব ছাড়া কিছু নেই এখানকার মানুষের। মানুষ যে প্রকৃতিকে জয় করেছে, মানুষ যে পশু নেই, তার আদিম কিছু প্রমাণ মেলে লাঙল দিয়ে জমি চষায়, তাঁত বোনায়, মাটির হাঁড়ি কলসী গড়ায়, কুঁড়েঘরে উনানের আঁচে লোহা তাতিয়ে কামারের হাতুড়ি ঠোকায়। দুঃখদৈন্য রোগশোক ক্ষুধা আর উগ্র অসন্তোষ নিয়ে মানুষ বাস করে, মনের আদিম অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। বর্ষার পর ভরসা, খরায় মাঠের ফসল জ্বলে যায়, ডোবা পড়ে, মশার ঝাঁক ওড়ে, প্রতিটি দিনের সঙ্গে শেষ হয় পথের অভাবে মাঠ ভেঙ্গে চলাফেরা; আর সকল শিথিল কাজকর্ম; তেলের অভাবে সন্ধ্যাবেলাতেই সন্ধ্যাদ্বীপ নিভে গিয়ে শুরু হল নিষ্ক্রিয় ঝিমধরা দীর্ঘরাত্রি।

কি দিয়ে রচিত হবে নবশিল্প?

তবু শুভ থাকে নি। পল্লীমায়ের শান্ত মধুর স্নেহসিক্ত বিষাদের হতাশা থেকে জিদ এসেছিল কি না। শহর থেকে দুরেই নবশিল্প গড়া দরকার।

উপরোক্ত দুটি উদ্বৃতির প্রথমটিতে ফ্রয়েডিয় প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়টিতে যে বাস্তব পরিবেশে মার্কসীয় চিন্তা তথা সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্যান ধারণা উৎসারিত হতে পারে তারই অবতারণা।

'ইতিকথার পরে কথা'র উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে প্রমাণিত হবে যে, দর্পণ-এর রচনার পথকে তৈরি করে দিয়েছে। যে উপন্যাসে বহির্বাস্তব গুরুত্ব লাভ করেছে এবং সমান গুরুত্ব নিয়ে যেখানে ঘটনা ঘটিয়েছে সামান্য নরনারী, সেখানে সমান গুরুত্ব দিয়ে মনস্তত্ত্বের গভীরতা দ্বারা উপন্যাসকে নবগুণান্বিত করা—এটা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে।

'দর্পণ' উপন্যাসটি হচ্ছে এই প্রচেষ্টার মহাকাব্যিক নিরীক্ষা, যার জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আগেকার উপন্যাসগুলিতে তৈরি হয়েছিলেন এবং দর্পণ হচ্ছে সেই উপন্যাস যা তাঁকে 'ইতিকথার পরের কথা' লিখবার জন্য তৈরি করেছিল। 'দর্পণ' উপন্যাসকে এ পটে রাখলেই এর ঐতিহাসিক অবস্থানটি নির্ণয় করা যেতে পারে। বাস্তবপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত উপন্যাস একসূত্রে গাঁথা এবং 'দর্পণ' এদের মধ্যমণি।

'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে 'সহরতলী'—'সহরতলী' থেকে 'দর্পণ'—'দর্পণ' থেকে 'ইতিকথার পরের কথা'—এই মূল ধারাকে সঞ্জীবিত করেছে চাষীর মেয়েকে নিয়ে 'আনাড়ি হাতে অনেকগুলি চিঠির আকারে লেখা উপন্যাস 'চিন্তামনি', মোটর ড্রাইভারকে নিয়ে লেখা উপন্যাস 'আরোগ্য' এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বিপ্লবী

যুবাযুবতীদের নিয়ে লেখা 'প্রতিবিম্ব'। মানব মানবীর চরিত্র বিচারে এবং গভীরতম করে চরিত্র চিত্রণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কাজ 'দর্পণ' উপন্যাসের আয়তনের মধ্যে আঁটকানো সম্ভব হয়নি, অথচ যার ইশারা আছে, তাকে এই তিনটি উপন্যাসের সীমিত বিষয়ের পরিধিতে সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

এই সব কাজই বাংলা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপ্লবাত্মক ভূমিকাকে বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয়।

খণ্ড খণ্ড জীবনের ঘটনার উপর লেখা উপন্যাসগুলি পড়ার সময় বহির্লৌকিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান প্রয়োগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশলতা ও সাধনা এবং সংগ্রামের কথা মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, চল্লিশের দশকের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখার ভার কেন তাঁর উপরেই পড়েছিল। বুঝতে পারা যাবে, গণদেবতার সঙ্গে 'দর্পণের' তফাৎটা কোথায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার গণঅভ্যুত্থানকে নিয়ে প্রায় একই সঙ্গে তারাশঙ্কর লেখেন, 'ঝড় ও ঝরাপাতা' আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'চিহ্ন'। দুটিই ক্ষুদ্রায়তন হলেও এদের মধ্যে রয়েছে মহাকাব্যিকতা। দুটি উপন্যাসই নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে পরিদর্শকের চরিত্রকে। এরা দুটি সাধারণ লোক। 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র নায়ক ছাপোষা কেরানি। চিহ্নের নায়ক এক মাতাল। এর কোন ধরনেরই চিহ্নিত দেশকর্মী নয়, যারা তৈরি সংজ্ঞা দিতে পারে। এদিক দিয়ে দুটি উপন্যাসের মিল আছে।

কিন্তু এদের পদ্ধতি আলাদা। 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র নায়কের মন ঘটনার উন্মুক্ত তরঙ্গভঙ্গে উৎক্ষিপ্ত। 'চিহ্ন' উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরা অন্তরাশ্রয়ী চেতনায় প্রতিফলিত। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন ঝড়ের ব্যাপ্তিকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট গণ-অভ্যুত্থানকেও ধরতে চেষ্টা করেছিলেন সেই অন্তরাত্মার দর্পণে, যাকে তিনি পরিচ্ছন্ন করে এসেছেন এবং করেছেন তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনে। মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখার সময় এই কারণেই প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি গণদেবতার পরে বাংলা উপন্যাসে দর্পণের নতুন ধারা নিয়ে আসতে।

বাংলা উপন্যাসে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বকে প্রথমদিকে অবিমিশ্রভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তিনি। আবার মধ্যজীবনে এবং শেষজীবনে মিশ্রিত করেছিলেন একে মার্কসীয় ধ্যান ধারণায়।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ফ্রয়েডিয় ধারার প্রভাবে পড়ে 'মালঞ্চ' উপন্যাস লিখেছিলেন তরুণ লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন। তিনি অবশ্য এ ধরনের লেখায় এনেছিলেন কিছুটা উপর তলার মানুষের ছবি। সমাজের নিম্নস্তরের নরনারী মনের গহনে অতৃপ্ত প্রবৃত্তি যে চাপা আগুনে জ্বালিয়ে রেখেছে এবং এই চাপা আগুনে নরনারীর পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ককে যে জটিল ইতিবৃত্ত প্রসারিত করে দিচ্ছে, তারই রেখাচিত্রায়ণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই লেখার উপক্রমণিকাতে নরনারীর চরিত্র চিত্রণের প্রতি তাঁর নাড়ীর টান তাঁকে তাঁর ঔপন্যাসিক

জীবনের প্রথম অধ্যায়েই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লেখক হিসেবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

খেটে খাওয়া মানুষদের চরিত্র-চিত্রণ-প্রবণতাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিউনিস্ট লেখকে পরিণত করেছিল। এই বিচার সামনে রাখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এই শিল্পীর জীবনে পর্যায়ে পরিবর্তন একটি দেরাজ থেকে আরেকটি দেরাজে যাওয়া নয়। চল্লিশের দশকের মধ্যভাগের বই 'দর্পণ'ও দেরাজবন্দী হবার বই নয়।

'দর্পণ' বইটিও পথের দাবীর মতো বিশেষভাবে ভবিষ্যতবাদী বা ভবিষ্যতের জন্য উপাদানবাহী উপন্যাস। দর্পণের মধ্যে যে ভবিষ্যতের উপাদান রয়েছে সেটা বিশেষ করে সামান্য মানব মানবীদের মধ্যেকার অসামান্যতা বা অসীম সম্ভাবনার মূল্যবোধ। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উদ্যোগ যখন থেকে স্বাধীনতাকে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রপ্রবণ হয়ে উঠেছে তখন সাম্যবাদেই মুক্তি সংগ্রামী নরনারী তাদের সমস্ত গভীরতা ও আকাশ-স্পর্শিতা নিয়ে বিকশিত হবে—এটাই বিশ শতকের মধ্যভাগের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চিন্তাধারা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এই বৈপ্লবিক দর্শনের এবং ঘটনা ধারার শিল্পী বাংলা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জীবনশিল্পী সাম্যবাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে ফলিত দেখেছেন সাধারণ মেহনতী নরনারীদের চিন্তায় এবং কাজে—এমনকি তাদের যাবতীয় প্রবৃত্তির বিপ্লবমুখী বিন্যাসে। সমস্তটা মন নিয়েই যে কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রত্যেকের অবাধ বিকাশই এখানে অর্জনীয়। সাধারণ সংগ্রামী খেটে খাওয়া মানব মানবীরাই বিপ্লবতত্ত্বের পাশাপাশি শিল্পীর জীবনে এজন্য অনেকবেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এদের ছাড়া যে কোন বিপ্লবী পরিকল্পনাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই জন্যেই। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের যে ঘাটতি, সেটা পূরণ হয়েছে মার্কসবাদী উপন্যাসের শিল্পরূপের কারুকর্মী হিসেবে। তিনি বাংলা উপন্যাসের ধারাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, যেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানব-মানবীরাই মূল লক্ষ্য। তারা আর কোন ক্রমেই উপলক্ষ্য নয়।

দেশ ও পৃথিবী যে অগণিত মেহনতী মানব-মানবীদের দেশ ও পৃথিবী হতে যাচ্ছে এবং যে বাস্তব জীবন মেহনতী মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুস্থিত হতে যাচ্ছে, তাদের কথক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তেইশ

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গদ্য মহাকাব্য কথা

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে গেল। বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপের গতি পরিণতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণস্বাধীনতার তাগিদ ক্রমেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, সেটা ফলবান হতে পারলো না। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি উপমহাদেশের বিরাট বিরাট গণঅভ্যুত্থানগুলির সাম্যবাদী বৈপ্লবিক ধারাকে সাময়িকভাবে শুদ্ধ করে দিতে সক্ষম হলো। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ক্রমেই

উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির অভ্যুদয় ও অবাধ বিকাশের তাগিদের আওতায় মেহনতী জনগণের সর্বাত্মক মুক্তির যে ছকটিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলেছিল, সেটি সাময়িকভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, বিধৌত বাংলাদেশ আবদ্ধ হলো পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের কাঠামোতে। পাকিস্তানের মুৎসুদ্দী পুঁজিপতি আমলা সামরিকচক্র এবং বৃহৎ ভূস্বামীরা তাদের নবতম মুরুব্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় বাংলাদেশকে শোষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকারূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলো।

কিন্তু যে ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক প্রয়োজনের তাগিদে উপমহাদেশে গত শতাব্দী থেকেই এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও স্তর এবং ভাষাভাষী জাতি শরিক হয়েছিল সমস্ত পাষাণচাপা ঠেলে সরিয়ে, সেই প্রয়োজন আবার স্বাভাবিকভাবে মাথা তুললো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো '৫২ সালের বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম একটি সমাজতান্ত্রিক গণবৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামের রূপও নিতে শুরু করলো। ধর্ম নিরপেক্ষতার তাগিদও এতে সন্নিবেশিত হলো। বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানকে উপন্যাসের শিল্পরূপে পাবার জন্য একটা প্রত্যাশারও সৃষ্টি হলো অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। পঞ্চাশের দশকটি এদিক দিয়ে যেন 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ'। ষাটের দশকটিতে কয়েকটি পাঁপড়ি উন্মোচিত হলো মহাকাব্যিক উপন্যাসের।

শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' এবং জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' এই মহাকাব্যিক উপন্যাসের কয়েকটি স্তবক।

'৪৮ সালেই বাংলা ভাষার দাবীতে ছাত্র জনতার খণ্ডবিদ্রোহ বাংলাদেশে আনলো অবাধ্যতার ঢেউ। '৫২ সালে এল নবজাগরণ। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষার মর্যাদার দাবীতে বিপ্লবী গণ-অভ্যুদয় একদিকে যেমন পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার সংগ্রামে গণমাতৃভাষার ভিত্তিতে সমাজের সমস্ত চাপাপড়া স্তরগুলিকে উঠিয়ে এনে এবং মুখর করে তুলে তাদের একত্রিত হবার পথ উন্মুক্ত করে দিল, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক গণ-আবেদনমূলক সৃষ্টির চাহিদা তৈরি করলো। তৈরি হলো গভীরতর এবং ব্যাপকতর অনুসন্ধিৎসু ও তার চাহিদা।

পাকিস্তানী শাসকচক্র তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে ধর্মীয় ভেদনীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাভাষার হিন্দু মুসলমানের ব্যবধান তৈরির জন্য ফরমায়েসী বাংলা সাহিত্যের যে ঘোঁট তৈরি করেছিল, '৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি দু-হাজার বছরের বাংলাভাষার পক্ষে গণ অভ্যুদয় সেই ফরমায়েসী ঘোঁটকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলো।

হাজার হাজার বছরে গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে সদাপ্রস্তুত মাতৃভাষায় '৫২ সালের পরে বাংলাদেশে যে নবপর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ এল, তাকে স্বভাবতই আঙ্গিকের জন্য শুরু থেকে কোন একটি ছাঁচ নিতে হলো না। বাংলা সাহিত্যে গণবৈপ্লবিক গতিধারার প্রতিফলন চল্লিশের দশকের গণমুখী প্রবণতা মারফত যে জঙ্গম ছাঁচটি গড়ে তুলেছিল, সেটি বাংলাদেশের '৫২ সালের পরবর্তী লেখক

লেখিকাদের হাতের তৈরি ছিল। সারসত্তা বা বিষয়বস্তুগুলো নতুন, কারণ '৪৮ সাল বা '৫২ সালের পরে বাংলাদেশের যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলো, তার অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পরিস্থিতি হলো একটা নবপর্যায়ের ব্যাপার। নব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আহৃত সারসত্তা ও বিষয়বস্তুর বিন্যাস রূপরীতির ব্যাপারে যে চল্লিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের রূপরীতির অনুকারক না হয়ে তাকে নতুন করে সাজিয়ে নেবে, এটাও এস্থলে হলো অপরিহার্য। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গণঅভ্যুদয়কে চিত্রিত করার জন্য যে মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখা হয়েছে তার ধারা উপরোক্ত দুটি বিষয় দ্বারা নির্দিষ্টকৃত হয়েছে।

'৫২ সালের গণঅভ্যুদয়ের প্রস্তুতি হিসেবে শুধু '৪৭ থেকে '৫৯ নয় এর আগেও যে একটা অন্তঃশীল যুগ গড়ে উঠেছিল তারই ঘটানা পরিক্রমার ভিত্তিতে রচিত 'সংশপ্তক'। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদদের বুকের রক্তে রাঙানো দিনগুলিকেই শুধু নয়, এর পরে নির্বাচনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক দলগুলির সম্মিলিত জয়লাভের দিনগুলিকেও যখন পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকচক্র ঠেলে দিয়েছিল অন্ধকারে, তখন ১৯৫৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে নববিদ্রোহের সূচনাকে নিয়ে লেখা জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন'। আর '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করলো যে '৬৮-৬৯ সালে সামরিক স্বৈরাচারি বিরোধী গণবিপ্লবাত্মক অভ্যুদয়, তাকে নিয়ে লেখা জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' তিনটি উপন্যাসই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। এই তিনটি উপন্যাসের শিল্পীরা নিজ নিজ বর্ণিত গণঅভ্যুত্থানে নিজেরা শরিক ছিলেন।

পঞ্চাশের দশকে মুক্তি সংগ্রামকে ভিত্তি করে গীতি কবিতা ও ছোটগল্প লেখা হলেও উপন্যাসের জন্যে অপেক্ষার দশক এটা। বাংলাদেশে '৫২ সালের পরে যে একদল নবীন বয়সী লেখক লেখিকা গুরুত্বপূর্ণ কবিতা এবং ছোটগল্প লিখলেন এবং এই সঙ্গে ভাবলৌকিক ধারায় কিছু উপন্যাসও রচনা করলেন, তাদের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত হচ্ছিল বিশেষ করে রক্তাক্ত ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে গদ্য মহাকাব্য। ষাটের দশকে সেই মহাকাব্যিক লেখা এলো। কিন্তু এ লেখা প্রথম যিনি লিখলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। তিনি শহীদুল্লা কায়সার। '৫৮ সালে সামরিক আইন জারী হবার পরে যে সব রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা গ্রেফতার হলেন, তাঁদের একজন ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার। তিনি ছিলেন অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ করে মার্কসীয় অর্থনীতিতে। তিনি ছিলেন তৎকালে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তিনি নিবন্ধকার এবং সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি ৬২ সাল পর্যন্ত চার বছর কারাগারে আটক থাকার সময় দুটি উপন্যাস লিখে বসলেন। একটি 'সারেং বৌ' দ্বিতীয়টি 'সংশপ্তক'। প্রথমটি বাংলাদেশের একটি বিশেষ এলাকার সাগরমুখী মানুষের জীবনালেখ্য, যাকে গদ্য লোককাব্য বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়তটি চিরায়তিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত গদ্য মহাকাব্য। এর বিষযবস্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মুক্তির মূলধর্ম। বইটির বর্ণিত ঘটনাবলি '৫২ সালের আগে এসে থেমে গেলেও '৫২-র অভ্যুদয় যে কিসের ভিত্তিতে এসেছে সেটা পরিষ্কার করে দিল। তিরিশের দশকের

শেষ কয়েকটি বছরে বিন্যস্ত গ্রামবাংলার কয়েকটি পরিবারের জীবন-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশভাগের পটভূমিতে ফলেছে বিস্তারিতভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অনিবার্যতার ছবিটি সংক্ষিপ্ত হলেও তীব্র। শহীদুল্লা কায়সারের এই বই যখন ১৯৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হল তখন সবাই বিস্মিত হয়ে গেল শুধু বস্তুগত বিন্যাসেই নয়, এর মানবিক বিন্যাসেও। সংশপ্তকের একটি পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে এভাবে–'একটি মেয়ে। সে যে এত যন্ত্রণা জানত না মালু।' শুধু এই মেয়ে রিহানা কিংবা তার প্রণয়ী মালুরই নয়, যে কয়েকটি নরনারীর চরিত্রের অবতারণা করেছেন সংশপ্তকের শিল্পী, সবকটিই এত আশ্চর্য সজীব যে তারা যেন ষাটের দশকে বেরিয়ে আসতে চাইল বই-এর আবরণ ছিন্ন করে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় যে উপন্যাসটির কথা এখানে আলোচ্য, সেটি জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন'। এই বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। জহির রায়হান অবশ্য পঞ্চাশের দশকেই প্রধানত সাহিত্যের শিল্পী হিসেবে তার পরিচয় সামনে রাখতে পেরেছিলেন এবং তার ছোটগল্প আর নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ঘরোয়া কথা নিয়ে লেখা উপন্যাস তাঁর বড় লেখক হবার প্রতিশ্রুতি দাখিল করেছিল। কিন্তু জহির রায়হান মাঝখানে প্রধানত চলচ্চিত্রের নির্মাতারা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মাঝখানে তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল–'হাজার বছর ধরে'। এটি চাষী জীবনের গদ্য লোককাব্য। যে ২১শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস ক্রমাগত বিলম্বিতই হয়ে আসছিল, তাকে বিষয়বস্তু করে জহির রায়হানকেই বই লিখতে হল। মাত্র একশ' পৃষ্ঠার কিছু বেশি। যেন একটা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ধরনের আঙ্গিক এবং ভাষা বিন্যাস তীক্ষ্ণ ঋজু। প্রত্যেকটি চরিত্রকে দেওয়া হয়েছে সুনির্দিষ্ট অবয়ব এবং আবরণ। একটি নাটকীয় চরম মুহূর্ত হচ্ছে ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের কালো পতাকা উত্তোলন আর কারাবরণ। প্রধানত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ ছিল, সুতরাং এই বিক্ষোভটা ছিল কিছুটা সীমিত ঘটনাতেই নিয়োজিত। কয়েকটি যুবাযুবতীর সংগ্রামী ছবি এঁকেছেন জহির রায়হান। তখন দেশে মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধেও বেশ কিছু লোক ছিল। তাদেরও যথাযথ ছবি এঁকেছেন শিল্পী। যা বাস্তব ছিল তাকে সামনে আনতে দ্বিধা করেননি। সংগ্রামী চরিত্রগুলিও শক্ত করে ফ্রেমে বাঁধানো নয়। বিপ্লবী নায়ক মুনিমের রুমাল দিয়ে মুখ মুছবার অভ্যাসটাকে চলচ্ছবির মতো এঁকেছেন তিনি।

সংশপ্তকের তুলনায় 'আরেক ফাল্গুন' রেখাচিত্র। কথা ছিল, শহীদুল্লা কায়সার সংশপ্তকের যে দ্বিতীয় খণ্ড লিখবেন, তাতে '৫২ সালের ঘটনাবলি থাকবে। কিন্তু এই খণ্ডটি পরিকল্পনাই থেকে যাচ্ছিল লেখকের কর্মীজীবনের কাজের চাপে। সেদিক থেকে জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' ঐতিহাসিক প্রয়োজন পরিপূরণ হিসেবেও চিহ্নিত হতে পারে। তিনি অনুজের কাজ করেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের তৃতীয় যে মহাকাব্যিক উপন্যাস এখানে আলোচ্য, সেটি জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী।' এটি লিখিত এবং প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে। এ বই বৃহৎ আকারের হতে পারে না। বৃহৎ হয়নি।

মাত্র ১৩৯ পৃষ্ঠার বই। জহিরুল ইসলাম ইতিপূর্বে 'অন্য নায়ক' নাম দিয়ে একটি চরিত্রভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন। লিখেছেন আরো কয়েকটি মাঝারি আকারের বাস্তব জীবনের ঘরোয়া ধরনের উপন্যাস। সেদিক থেকে 'অগ্নিসাক্ষী' অনন্য নয়। অগ্নিসাক্ষীর অনন্যতা মুক্তি সংগ্রামের মহাকাব্যিকতায়। 'মধুরিনা' নামে নায়িকাকে নিয়ে নিতান্ত ঘরোয়াভাবে কাহিনী শুরু করেছেন লেখক; তাতে প্রথমে বুঝতেই পারা যায় না যে, '৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী অভ্যুত্থান কোন্‌খানে কীভাবে বিন্যস্ত হতে যাচ্ছে। কিন্তু শিল্পী এই বিন্যাসকে এনেছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে। অবশ্য কিছুটা ভবিষ্যৎবাদী বা সম্ভাবনাময়তার প্রতি ইশারার কায়দায়।

'সংশপ্তক' উপন্যাসে একটি যুগান্তরে ইতিকথা বিন্যস্ত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ সাল। এর মধ্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে উপমহাদেশের যে মুক্তি-সংগ্রাম চলছিল, তার দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার জটিল প্রশ্নের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষাবস্থা, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ এবং দেশ বিভাগের পরে মুক্তি সংগ্রামের পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা—এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দুটি গ্রামের কয়েকটি চরিতকথা সংশপ্তকে উল্লেখিত। উপন্যাসের এক জায়গায় মূল নায়িকা রাবু বা সৈয়দা রাবেয়া খাতুন তার ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহাস্পদ মালুকে বলছে; 'আসল কথা কি জানিস? আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত আর ছোট ছোট দুঃখ কষ্টগুলোকে অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখি আমরা। আর সত্যিকার দুঃখ যা তোর আমার ব্যক্তিগত কষ্ট বা দুঃখ নয়, যা বিশাল মানবগোষ্ঠীরই দুঃখ সেসব হয় আমাদের স্পর্শ করে না, অথবা কিছুক্ষণের জন্য ব্যথিত হয়েও ভুলে যাই সহজে ......। আমার নিজের কথাটাই ধরা যাক। অল্প বয়সে, যখন আমার কোন বুদ্ধি গজায় নি, বাবার পছন্দমত বরের সাথে তিনি বিয়ে পড়িয়েছেন আমার। খুবই অন্যায়, কিন্তু এরকম অন্যায় ঘটনাতো রোজই ঘটছে আমাদের দেশে। এর চেয়েও সহস্রগুণ কঠিন এবং নৃশংস পীড়নে ভুগছে আমাদের দেশের মেয়েরা। তাই না?'

নায়িকার মুখে এই ধরনের কথায় মনে হতে পারে, যুগান্তরের যে ঘটনাবলিকে শহীদুল্লা কায়সার তাঁর উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। তাদের প্রাধান্য দেবার জন্য তিনি একটা কৈফিয়ত তৈরি করেছেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। রাবুর কথাটা চেতনার কথা। আর সংশপ্তক যেমন ঘটনাপ্রধান, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রচিত্র প্রধান। এবং এই কারণেই উপন্যাসের শিল্পরূপের চিরায়তিক মহাকাব্যিক গতিধারার প্রায় সবটুকু মূল উপাদানই সংশপ্তকে এসেছে বীর এবং বীরনারী নায়ক নায়িকা সহ দ্বন্দ্বাত্মক চরিত্র-পরিমণ্ডল নিয়ে।

১৯৩৮ সালে উপমহাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁ মুসলমান প্রধান বাকুলিয়া তারই গায়ে লাগা হিন্দুপ্রধান তালতলিকে সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলো। ঘটনাধারা দেশভাগের দিকে এগিয়ে চললো। এই জন্যই মুসলমান আর হিন্দুরা সংকীর্ণ পক্ষাপক্ষের অবতারণা।

উপমহাদেশে তখন মুসলিম লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য থেকে শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বার্থের প্রশ্নকে পৃথক করে নিয়ে তার উপর ভিত্তি করে মুসলিম ঐক্য

আর মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের উপর জোর দিয়ে ব্যাপক প্রচারে অবতীর্ন হয়েছে। বাকুলিয়ার সৈয়দ বাড়ির ছেলে জাহেদ কলকাতায় থেকে পড়ছে। সে মুসলিম লীগের সংগঠন তৈরি আর প্রচারের কাজ করতে এসেছে ছুটিতে। এর আগেই ঔপন্যাসিক তার কাজের পরিমণ্ডলটা সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়ে রেখেছেন। পরিমণ্ডলটা সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় ছোটবড়োর পরিবেশ। মুসলিম প্রধান বাকুলিয়ার পরিচয় দিতে এসে ঔপন্যাসিক বড় ছোটকে বলেছেন, আশরাফ আতরাফের ভেদ। প্রকৃতিনিবদ্ধ অর্থনীতিক গ্রামীণ জীবন। কৃষির উৎপাদন প্রায় প্রাগৈতিহাসিক স্তরে। বাকুলিয়ার জমিদাররা পড়ে যাওয়া সৈয়দ বাড়ি আর মিঞা বাড়ি। তবে প্রতিষ্ঠা রয়ে গিয়েছে। সৈয়দ বাড়ির এক ভাই দরবেশ হয়ে গেছেন। আরেক ভাই কলকাতায় ইংরেজ সরকারের আমলা। মেয়েরা বাড়িতেই আছে–এইভাবেই কাহিনীর সূত্রপাত। মিঞাবাড়ির ফেলু মিয়া পঞ্চায়েতের মোড়ল। জমি-গ্রাসের ক্ষুধা আর নারী-দেহের ক্ষুধা দুটোই প্রচণ্ড। বাইরে ধর্মপরায়ণতার খোলস। সাকরেদ রমজান। এই রূঢ় অচলায়তনকে ঘিরে রয়েছে একটি নয়নাভিরাম আবেষ্টনী। সেটি বাংলার নিসর্গ। ক্ষেত মাঠ, খাল, ফলের বাগান, শ্যামলিমা, শন্‌শন্‌ হাওয়া। অচলায়তনের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে কয়েকটি কোমল ও বিদ্রোহী মন, ভালবাসা, মমতা, সুখ শান্তি, গান আর জ্ঞানের উন্মুখতা। প্রাণবত্তার প্রতীক কিশোরী রাবু, বালক গায়ক মালু, গ্রামীণ স্কুল শিক্ষক সেকান্দর মাষ্টার, গ্রামীণ স্বৈরিণী হুরমতি, সঙ্গীত পিয়াসিনী কিশোরী রানুদি, দিন মজুর লেকু আর তার স্ত্রী আম্বরি। জাহেদ কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে কতকগুলি ছককাটা কথা। 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক প্রথম দিকে যেমনটা ছিল, জাহেদ যেন অনেকটা সেরকম মনোভাব নিয়ে এল বাকুলিয়ায়। গোরা প্রথমে হিন্দুর চোখে দেখেছে স্বাধীনতাকে। তবে গোরার মতোই এর মধ্যেও রয়েছে একটা ভাববাদী আদর্শবাদ, যেজন্য একদিকে যেমন সে সাড়া পেয়েছে, তেমনি অন্তর্বিরোধের সম্মুখীন হয়েছে স্থানীয় ক্ষমতার প্রশ্নে।

জাহেদ আদর্শের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে তার আবাল্য সুহৃদ ও বয়সে কয়েক বছরের বড় স্কুল শিক্ষক সেকান্দার মাষ্টারের কাছ থেকে, যে গ্রামেই পড়ে আছে গ্রামীণ মানুষের সুখদুঃখের সমভাগী হয়ে এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে যাকে টেনেছে।

সেকান্দর মাষ্টারের সঙ্গে জাহেদ তর্ক করেছে। এদের কথাবার্তায় যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা বর্ণিত যুগান্তরের ঘটনাবলির অভ্যন্তরের একটা প্ররোচক ও দ্বন্দ্বাত্মক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। সুতরাং উপন্যাসের পরবর্তী পর্বগুলিকে বুঝবার জন্য এবং প্রথম পর্বের পরিস্থিতিকে বুঝবার জন্য এই বিতর্কটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

বিতর্কটিকে বুঝাবার জন্য উপন্যাসের কয়েকটি পৃষ্ঠাই এখানে দাখিল করছি, বিতর্কের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশদর্শনটিকেও একঝলকে সামনে আনার উদ্দেশ্যে :

জাহেদ বলছে : মুসকিল হল লীগের নামটা এখনো পৌঁছায়নি অনেকের কাছেই। কিন্তু আমি তো যতই ঘুরছি ততই উৎসাহিত হচ্ছি। আমাদের শত্রু যে এক নয়,

আমাদের শত্রু দুই, এক ইংরেজ, দোসরা হিন্দু বানিয়া মহাজন, তুমি কি মনে কর একথাটা বুঝতে মুসলিম সমাজের খুব বেশি সময় লাগবে?

তা তোমার মত লোকেরা যখন উঠে পড়ে লেগেছে তখন বেশি দেরি হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

সেকান্দরের উত্তরটা একটুও ভাল লাগে না জাহেদের। এখনো কোথায় যেন ওর দ্বিধা সংকোচ।

এই সকাল বেলায় মাটির রাস্তাটা কেমন নরম আর ঠাণ্ডা। রাতের বিশ্রাম পাওয়া পথের উপর যেন লেগে রয়েছে কি এক কোমল শ্রী। সেই কোমলতাটা পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে চলতে সুন্দর একটি ভাল লাগায় রোমাঞ্চিত হতে চায় শরীরটা, মনটা। মাটির সাথে গভীর একটা অন্তরঙ্গতাবোধ সুর তুলতে চায় নাড়িতে, গান হয়ে বাজতে চায় কণ্ঠে। কিন্তু মাষ্টারের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিমেষের মাঝেই উধাও হয়ে যায় জাহেদের সেই ভাল লাগার অনুভূতিটা। খাঁ খাঁ করছে মাঠ। এখানে সেখানে পোড়া সবুজের মর্মন্তুদ কান্না।

এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল সেই ফাল্গুনের শেষাশেষি। যাদের তাড়াহুড়ো তারা তখুনি জলদি দুটো চাষ দিয়ে ধান ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু অন্যরা জানে–প্রথম বৃষ্টিতে একটা চাষ দিয়ে মাটির বাঁধুনী দাও খুলে, পরে বৃষ্টিতে পানি খেয়ে মাটি যখন ভুর ভুর করবে তখন ছিটোবে ধান, ফসল পাবে–দ্বিগুণ। তাই অপেক্ষা করে আছে ওরা।
কিন্তু বৃষ্টি আর কৃপা করেনি।

সেকান্দরের চোখেও দগ্ধ সবুজের আতংক। ও বলল, দেখছো? এখনো বৃষ্টি হল না। লোকগুলো এ বছরও উপোষ মরবে।

কী যে হয়েছে জাহেদের। রোদেপোড়া দীর্ণবুক ক্ষেতের যে আশংকা ওর মনে জেগেছে তাইতো প্রকাশ পেয়েছে সেকান্দরের কণ্ঠে, অথচ খিঁচিয়ে উঠলো জাহেদ : গত বছর মরেছে, তার আগের বছর, তারও আগের বছর, সব সময়ই ওরা মরছে। এ বছরও মরবে, সামনের বছরও মরবে। দ্যাট ইজ হোয়াট দে ডিজার্ভ, ইউ ডিজার্ভ। নির্বিবাদে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোন কাজটা করতে পার তোমরা?

সেকান্দর বুঝলো একটু আগে যে খোঁচাটা দিয়েছে সে এ তারই পাল্টা বিস্ফোরক। ক্ষুণ্ন হল সেকান্দার। কিন্তু ভিতরটা ওর কী এক অপমান বোধে জ্বলে উঠল। বলল, এ মৃত্যুকে আমি রুখব। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হব। আমি মরণজয়ের ডঙ্কা বাজাব, সকলকে শোনাব মৃত্যুহীনের ডাক।

যেন ঠোক্কর খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জাহেদ। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সেকান্দরের দিকে। এমন সংকল্পের দৃঢ়তা, এমন প্রত্যয়ের ডাক কখনো শোনা যাবে তালতলি স্কুলের জুনিয়র মাষ্টার সেকান্দরের কণ্ঠে, জাহেদের কাছে এ ছিল অভাবনীয়।

কিন্তু যতটা খুশি হল তার চেয়ে বেশি শংকিত হল জাহেদ। কেননা ও জানে অনুভূতির এই তীব্রতা মাষ্টারকে নিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও 'স্বদেশীদের' খপ্পরে, নতুবা শ্রেণী সংগ্রামের পথে। আর এ দুটোকেই পরিহার করে চলে জাহেদ। মরণজয়ের ডঙ্কা বাজাও, সে তো আমারও কথা। কিন্তু কিসের জন্য?

মুক্তির জন্য!

কার মুক্তি? শুধাল জাহেদ।

রোদে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিদেয় যাদের পেট জ্বলে, অকাল মৃত্যু যাদের কপালের লিখন, তাদের মুক্তি।

হিন্দুস্থানের সকল মুসলমানই কি তোমার এই সংজ্ঞায় পড়ে না? না, বলেই কি এক কৌতুকে হেসে দিল সেকান্দর। হাসতে হাসতেই বলল আবার, অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার। তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, সৈয়দপুত্র তুমি, মাতুল ফেলু মিঞা আর লেকু, ফজরআলী তোমরা সবাই এক সারিতে, এক শ্রেণীতে, বঞ্চিতের দলে হা হা হা।

চুপ কর। চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ।

ওর চীৎকারে চমকে দুপা পিছিয়ে গেল সেকান্দর। ভয় পেল। জাহেদের এমন ক্রুদ্ধ মূর্তি আগে কখনো দেখেনি ও। ওরা নিঃশব্দে হাঁটছে। রাস্তার দুপাশ ধরে, পরস্পর থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে। ওরা এখন বন্ধু নয়, ওরা যেন দুই শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ, মুখোমুখি মোকাবিলার পূর্বে নীরব প্রস্তুতি চলছে ওদের।

তুমি জান কি করে এ জমি গড়ে উঠেছিল? আবার ঝলসানো ক্ষেতের দিকে চোখ ফেরালো জাহেদ। জান? যাদের হাতের মায়া আর শ্রমের ছোঁয়া পেয়ে এ জমি শস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, তারা আর এ জমির কেউ নয়?

জানি।

জান ইংরেজ আসবার আগে এ অবস্থা ছিল না?

উত্তর দিক থেকে এবারও ভেসে আসে সেই ক্ষুদ্র কিন্তু আক্রমণাত্মক জবাব, জানি।

দিনে দিনে ক্ষয় হচ্ছে জমির উর্বরা শক্তি। অনাবৃষ্টি আর অতি বৃষ্টির খামখেয়ালী তাণ্ডবে হাহাকার জাগছে ঘরে ঘরে। জনসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য নেই দেশে। সর্বত্র এই অভিযোগ। কিন্তু আমি বলি এটাই তো স্বাভাবিক, এই তো বিদেশী শাসনের আর শোষণের পরিণতি। ইংরেজ কি তবে বেহেশ্‌ত বানাবার জন্য এসেছে এদেশে? ঠুকঠুক করে পেরেক ঠোকার মতো করেই যেন কথাগুলো সেকান্দরের মাথায় ঢোকাতে চাইল জাহেদ।

সে তো বুঝলাম ...

বুঝেছ কচু। বুঝলেই যদি, তবে কেন গোটা জাতির কথা ভাবছ না? কেন বুঝতে পারছ না, পরপদানত কোন মানুষের পক্ষে একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা, আজাদী?

কারণ তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ, শুধু মাত্র ইংরেজ বিতাড়ন। আমার কাছে তার অর্থ আরও ব্যাপক, ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে জমি রুটি রুজি জীবনের নিরাপত্তা, চাপা দৃঢ়তায় উত্তর দিল সেকান্দর।

রাবিশ। চিল্লিয়ে উঠল জাহেদ আর ছিনিয়ে নিল সেকান্দরের বগলের বইগুলো, ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়, চেঁচিয়ে বলল, এই বইগুলোই যত নষ্টের মূল। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি সেকান্দর, তালতলির ওই হিন্দু মাষ্টারগুলো থেকে দূরে থেকো,

রাজনীতিটা বুঝবার আগেই তোমার মাথায় একগাদা পোকা ঢুকিয়েছেঃ এবার আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খাবে।

সেকান্দর নীরবে বইগুলো কুড়িয়ে নেয়। নীরবেই পথ চলে।

সহসা দুহাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে জামার গলাটা। তারপর তীরের মত ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল, তুমি মুসলমান কি না?

না।

তবে তুমি কী?

মানুষ।

অপমানবোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই?

না। তুমি মুসলমান।

আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।

সেজন্যই কি অমন বর্বরের মত আচরণ করছ? গলাটা ছাড় তো এবার। যেন বিরক্ত হয়ে বলল সেকান্দর।

আমি মুসলমান। এ পরিচয় আমার গৌরব। অগৌরব তো নয়ই। বলতে বলতে মাথাশুদ্ধ সেকান্দরের গলাটা দোলনার মত একবার পেছনে ঠেলল, আবার সামনে টানল, তারপর ছেড়ে দিল মুঠিটা।

দুজনেই ওরা পরিশ্রান্ত। রাস্তার মাঝেই ওরা বসে পড়ল। আর ফোঁস ফোঁস করে হাঁপিয়ে চলল।

ভুল করছ জাহেদ, প্রথমে মানুষ। তরপর ধর্ম। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়।

শ্রান্ত কিন্তু কি এক হিংস্র চোখে ওকে নিরীক্ষণ করল জাহেদ, মুখ খুলল না। মুখ খুলল অনেকক্ষণ পরে। তাহলে মুসলিম লীগ করছ না?

করছি। সংক্ষেপে বলে উঠে দাঁড়াল সেকান্দর।

এক্ষুণি তোমাকে স্কুলে ছুটতে হবে। চল আমাদের বাড়ি। গোসল করে কিছু খেয়ে নাও।

চল।

সেকান্দরের সঙ্গে জাহেদের একটা জায়গায় মতের মিল হলো, কিন্তু মুসলিম লীগের কাজে না জমে ঘটনার ধারা অন্যত্র মিলবার দিকে বিন্যস্ত হলো।

জাহেদ একটা পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লো।

দরবেশ চাচা ফিরে এসে জাহেদের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ চৌদ্দ বছর বয়স্ক কন্যা রাবুর বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁর বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে। জাহেদ ফিরে এসে তার দলবলের সহায়তায় জামাইকে তাড়ালো। জাহেদের মাথা ফেটে গেল এই হাঙ্গামার সময়। এর

মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সত্য, রাবু আর জাহেদ পরস্পরকে ভালবেসে বসে আছে। কিন্তু মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে দুর্লংঘ্য বাধা, যেটাকে রাবুও অলঙ্ঘনীয় মনে করছে। ঘরে বাইরে জামাই তাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা এবং রাবুকে জড়িয়ে বদনামের সম্মুখীন হলো জাহেদ। রাজনৈতিক প্রচার অভিযানে সে আবার বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু মনে আর জোর পেল-না। সৈয়দ বাড়ী নিয়ে গ্রামীণ মাতব্বররা মুখরোচক কানাঘুষোয় মেতেছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সৈয়দগিন্নি তাঁর মেয়ে আরিফা আর রাবুকে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিলেন। জাহেদও তাদের সঙ্গে চললো।

সেকান্দর আর জাহেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল–দীর্ঘকালের ছাড়াছাড়ি। বাকুলিয়ার পাট উঠলো জাহেদের জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার ধারণার ব্যাপারে একটা জায়গায় সেকান্দরের বক্তব্যে জাহেদ সম্মতি দিতে পারলো।

সংশপ্তক থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

"স্বাধীনতা একটা ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবন বোধ। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে এর একটা অর্থ, একটা তাৎপর্য। সেটা হলো জাগরণ এবং পুনর্গঠন, নৈতিক আধ্যাত্মিক, সামাজিক অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী। প্রস্তুতি চলবে ঘরে ঘরে। এই তোমাকে বোঝাতে চাই। তাই এত তর্ক করি। হাসি থামিয়ে বলল সেকান্দর।

আমি বুঝি এবং আরও বুঝতে চেষ্টা করব। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তর্কের ইতি টানতে চাইল জাহেদ।

কিন্তু সেকান্দর জিদ ধরেছে। সে বলে চলল, আমাদের মানসিকতাটা এখনো মধ্যযুগীয় ফিউডাল, এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং একে দূর করতেই হবে।

তা স্বীকার করি মাষ্টার। কিন্তু এখন তো অন্য চিন্তায় আসতে হয়। ব্যাটারা যে মিটিংয়ে গোলমাল শুরু করল তার কি করবে।

তোমার মামুজান ফেলু মিঞা তো নোস্‌খা দিয়েই দিয়েছেন, ল্যাঠ্যোঔষধি, অর্থাৎ ওদের লাঠির জবাবে আমাদের লাঠি। আর গাদ্দারগুলোকে উত্তম ঠাঙানী।

ঠিক দাওয়াই। সায় দিল জাহেদ।

তবু চিন্তামুক্ত হতে পারে না জাহেদ, হৃদয়ের স্বচ্ছ আবেগ দিয়ে যা অতি সহজ এবং স্বাভাবিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত ও, সে সমস্তই আজ কেমন গিঁট পাকিয়ে উঠেছে। ঘরে এবং বাইরে। জীবনে সহজের কোন অস্তিত্ব নেই, রূঢ় এক সত্য হিসেবেই যেন কথাটা উপলব্ধি করল তরুণ জাহেদ।

ওই একরত্তি মেয়ে রাবু, সেই তো কত কঠিন। জাহেদের চোখে যা অস্বাভাবিক, ও মেয়েটার কাছে তাই যেন স্বাভাবিক। একা রাবু কেন, বাড়ীতে, বাড়ীর বাইরে সকলের কাছেই জাহেদের সহজ স্বাভাবিক চিন্তা আর কাজগুলো যেন অস্বাভাবিক, অসরল অর্থভরা।"

সংশপ্তকের নায়ক জাহেদের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার ধারার মূলকেন্দ্র বাকুলিয়া-তালতলি থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পরে ঢাকা হয়ে আবার মূলকেন্দ্র

বাকুলিয়াতেই ফিরে এল। ফিরে এল গ্রামবাংলায় গণজাগরণের নব প্রয়োজনে। একত্রিত হয়েছে রাবু, মালু, সেকান্দর মাষ্টার। রাবু এখন গ্রামের মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। নব আয়োজনের চুম্বকমনি জাহেদ–তার নব ভূমিকা। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রাথমিক খণ্ড খণ্ড সংগ্রামের একজন নেতা জাহেদ। এই কারণেই পাকিস্তানী শাসকচক্র তার নামে হুলিয়া বার করেছিল। পলাতক অবস্থায় বাকুলিয়া গ্রামেই সে গ্রেফতার হয়ে গেল। উঠতে হল তাকে পুলিশের সাম্পানে। তাকে পুলিশের লোকেরা জেলখানায় নিয়ে যাবে। রেখে যাচ্ছে সে বাকুলিয়া–তালতলিতে সেকান্দর মাষ্টার, রাবু, এবং অন্যান্য সহকর্মীদের। সাম্পানে উঠেছে জাহেদ। সাম্পানে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলছে, মাষ্টার আবার আসব আমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ এস। আজ থেকে রাবুর স্কুলে আমি জয়েন করলাম। বুঝলে? চেঁচিয়ে বলল সেকান্দর।

হ্যাঁ, তাই কর।

রাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলল জাহেদ। বলল, আসি। অশ্রু টলমল রাবুর চোখ। টপটপ করে ঝরে পড়ল দুটো ফোঁটা। রাবু হাসল। বলল, এস। সাম্পান পৌঁছে গেছে মাঝ গাঙে। পকেট থেকে রুমাল বের করল জাহেদ। উড়িয়ে দিল নিশানের মত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, চিন্তা করিসনে রাবু, আমি ফিরে আসব। আমি আসব।

বড় খালে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কলকল জোয়ার খালে। সাঁই সাঁই বাতাসের দাপাদাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সবকিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে একটি কথা–আমি আসব। আমি আসব।"

এটা মূলত প্রতীতির কথা। কিন্তু কী তার চিন্তার বিন্যাসটি যেখানে সেকান্দর মাষ্টার আর তার মিল হয়েছে?

সংশপ্তকের সর্বশেষ পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারা যেতে পারে ইঙ্গিতকে :

(১) "একটা বই পড়ছিল জাহেদ। বইটা বন্ধ করে ওদের (মালু আর রাবুর) পাশে এসে বসল। কেউ যদি বই বন্ধ করে জীবনের কথা শোনায় আমাদের, আমরা কি আপত্তি করব? কৌতুক নেচে গেল রাবুর চোখে। মোটেই না। মোটেই না। উচ্চস্বরে সায় দিল মালু।

ওরা তিনজন গলা মিলিয়ে হাসল। সে হাসি মৃত্যুকে অস্বীকার করবে। তারপর ওরা শুরু করল জীবনের গল্প মানুষের গল্প ... হ্যাঁ, তখন শ্রেণী বিভাগ আসেনি। দলবদ্ধভাবে শিকার করত, যা পেত একসাথে ভাগ করে খেত আদিম মানুষ... দলপতি ছিল একান্তভাবেই আজকের নির্বাচিত প্রথার মত .... । এল গোষ্ঠীপ্রথা ....' গভীর মনোযোগে ওরা সবাই শুনছে জাহেদের কথা।"

(২) "সব ক্ষতই শুকিয়ে যায়। রিহানার ক্ষতটাও শুকিয়ে যাবে, এখনও শুকায়নি, মনে মনে ভাবল মালু।

আরও আশ্চর্য। জাহেদ জেনেছে সবই। কেমন করে, কার কাছ থেকে সে প্রশ্ন অবান্তর।

সরাসরি কিছু বলল না জাহেদ। বলল ইঙ্গিতে। জানিস মালু, এক ধারায় নয়, বহু ধারায় প্রবাহিত মানুষের জীবন। যদি শুকিয়ে যায়, যদি রুদ্ধ হয় একটি ধারা, আর এক ধারায় জীবন বয়ে চলে সার্থকতার পানে। এটাই জীবনের ধর্ম। সহস্র ধারায় জীবনের বিকাশ, অজস্র তার পূর্ণতা।

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে সমাজে সেই বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামের আবির্ভাবের পূর্বক্ষণ, যা জনগণের স্বাধীনতা আর সর্বাত্মক মুক্তির পথ তৈরি করে এসেছে এবং করবে : দ্বিতীয়টিতে জীবনের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুগতি ধারার প্রকাশ।

দুটিতেই রয়েছে মার্কসীয় দর্শনের অভিব্যক্তি।

করণীয়টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এজন্য জনগণ সংগঠন। এই দায়িত্ব নিয়েই ঢাকার স্কুল শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে রাবু বাকুলিয়াতে ফিরে এসেছে। জাহেদ তথা মেজোভাই তখন পলাতক। ঢাকা ছেড়ে বাকুলিয়া আসার পূর্বমুহূর্তের ছবিটা নিম্নরূপ :

"দেখা হলে বলিস মেজো ভাইকে, ওর চোখের আলো আমার পথের সম্বল। ভরা সুটকেসের ডালাটা চাপতে চাপতে বলল রাবু।

রাবু আপা, তোমার কথাই ঠিক। মেজো ভাইয়ের মতো কিছু লোককে সারা জীবন দুঃখই পেয়ে যেতে হয়।

শুধু দুঃখটাই দেখছিস? এর পেছনে যে লুকিয়ে আছে আনন্দ আর গৌরবের ফল্গুধারা সেটা দেখছিস না?

আচ্ছা রাবু আপা! তুমি কি শুধু দরবেশ চাচার সেবার উদ্দেশ্যেই দেশে চললে? হঠাৎ শুধাল মালু।

তা কেন, মানুষের মাঝে মেজ ভাইয়ের কাজ। সে কাজটা যদি আমারও হয়, আপত্তি আছে তোর?"

সংশপ্তকের উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই এটা নিশ্চয় বুঝতে পারা যাবে যে, এই উপন্যাসে একদিকে যেমন রাজনৈতিক মুক্তির সাধনা আর স্বপ্নের রূপরেখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি সমভাবেই যে সব চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে এতে তাদের অনুভূতিগুলিকেও জোরালোভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মূল নায়ক নায়িকা জাহেদ আর রাবুর প্রেমে এই কারণেই কিছুটা ভাবাবেগের অতিশয্য রয়েছে। তবে এরা দুজনেই চরিত্র হিসেবে বাস্তবের কাছে নিয়েছে শিক্ষা এবং এই কারণেই এদের চরিত্র জ্বলে পুড়ে বিকাশ লাভ করেছে। এরা তাই যুগান্তরের উত্তাল ও রক্তাক্ত ঘটনাবলিতে উৎক্ষিপ্ত না হয়ে সংগত ও আত্মস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য বিপ্লবের পথিকৃত হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করতে পেরেছে।

রাবুর কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাবে, সে স্বল্পভাষিণী হয়েও সেই বীর নারীদের একজনে পরিণত হয়েছে যারা বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর বিপ্লবাত্মক ভাঙ্গাগড়ায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে। বাস্তবতা দিয়ে

গড়া এমন একটি নারী চরিত্র সমগ্র বাংলা উপন্যাসের গতিধারায় খুব কমই আঁকা হয়েছে। রাবুর জীবনের শুরুতেই যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল পিতৃ-আদেশে বিয়ের দরুন, সে বিপর্যয়কে সে শান্তভাবেই অতিক্রম করেছে। শেষপর্বে পিতার আদেশ অমান্য করলো, বললে সে স্বামীর ঘরে যাবে না, এখানেও কোন নাটকীয়তা প্রকাশ পেল না। প্রধান যে সব চরিত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্ণের বাকুলিয়া থেকে দেশ বিভাগোত্তর বাকুলিয়াতে এসে পৌঁছেছে মহাকাব্যিকতার বৈপ্লবিক গতিপরিণতির সূত্রধর রূপে, তাদের সবাইকেই সংশপ্তকের শিল্পী সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন এবং করেছেনও। কোন একটি চরিত্র নিয়ে কাজ করার সুযোগ তিনি বেশি পান নি। এই কারণেই রাবুর চরিত্রটিকে যে তিনি সুদৃঢ় রেখায় তুলে ধরতে পেরেছেন, এটা একটা বিশেষ কৃতিত্ব। এ কৃতিত্ব একজন সার্থক শিল্পরূপকারের। ঔপন্যাসিক অতঃপর মালু চরিত্রটিকে খুব বেশি পরিসর দিয়েছেন।

যে উপন্যাস প্রধানত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকে তৈরি করতে ব্যস্ত, তার মধ্যে মালুর মতো একটি গীতিপ্রবণ চরিত্রের জন্য এতখানি পরিসর উপন্যাসটির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে কিছুটা অবিন্যস্ত করে দিতে পারে–এরকম একটা সম্ভাবনা ছিল। সৈয়দবাড়ীর আশ্রিত বালক মালু গ্রামীণ গায়েন থেকে প্রখ্যাত বেতারশিল্পী এবং দেশ ভাগের পর ঢাকা বেতারের সর্বজনপ্রিয় কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে। দেশভাগের পরে সে তার গানে মুগ্ধ রিহানা নামের একটি ভাবাতুরা মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে স্বপ্নরাজ্যে বাস করছে। তার মোহভঙ্গ হয়েছে রিহানার মোহভঙ্গের পরে। এই মোহ এবং মোহভঙ্গ সংশপ্তকের বেশ কয়েকটি মূল্যবান পাতা জুড়ে আছে। এই মালু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের কলকাতার গণবিদ্রোহকে যেমন অবাক হয়ে দেখেছে, তেমনি ছেচল্লিশের দাঙ্গাকেও অবাক হয়েই দেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সূচনার ঘটনাবলির ধারা থেকেও সে নিজেকে এত আলগা রেখেছে যে, রিহানার সঙ্গে তার সম্পর্কের সংকটের সময় সে যখন জাহেদের খোঁজ করতে গিয়ে জেনেছে তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এই নিখোঁজ প্রিয়জনটির খোঁজ করতে সে পুলিশের বড় কর্তার কাছে পর্যন্ত গিয়েছে। জাহেদ যে রাজনৈতিক পলাতক, সেটা সে আন্দাজই করতে পারে নি। মালু এদিক দিয়ে একটি ষোলআনা ভাববাদী চরিত্র। সে একটি পরিদর্শক আর্শিমাত্র। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে সম্ভবত এই চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল এবং এ ধরনের চরিত্র বাস্তবে থাকেও। মালু হচ্ছে এমন একটি চরিত্র যা কখনও কুলষিত হয় নি এবং এই কারণেই তার বালক বয়সের বাকুলিয়া-তালতলি আর যৌবনের বাকুলিয়া-তালতলির একটি নির্ভরযোগ্য যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে সে। রিহানার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে সে যখন গ্রামে চলে আসে, তখন দেখা যায় তার অসাম্প্রদায়িকতাতে কোন দাগ লাগে নি। রেয়াজ করে তার গান শেখার মূলে ছিল তালতলির রানুদি আর অশোক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিতে দেশ বিভাগ তাকে একথা ভোলাতে পারে নি। সে রাবুর অনুচর হিসেবেই জাহেদের কাজের দায়িত্বের শরিক হয়েছে শেষপর্যন্ত। তবে এখানেও তার নিষ্ঠা আর আন্তরিকতাতে কোন অভাব হয়নি।

মালু প্রধানত স্বভাবশিল্পী এবং এদিক দিয়ে সে গ্রামীণ লোক সাধারণের একজন। তার অবিনষ্ট চরিত্র বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের অমিয় ধারার প্রতিভূরূপে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাংস্কৃতিক লোকজাগরণকেও সম্ভাব্য উপকরণরূপে উপন্যাসে সুস্থিত করেছে।

সেকান্দর মাষ্টার বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেরই সাধক কর্মী চরিত্রের প্রতিভূ। সেকান্দর হচ্ছে সেই কর্মীদের একজন যারা মুক্তিসংগ্রামকে তার মহাবৈপ্লবিক বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও পল্লী গ্রামের সাধারণ মানবমানবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাবদ্ধ সংগ্রাম বলে প্রমাণিত করেছে।

এদেরই পাশে হুরমতি আর লেকু। হুরমতি সুন্দরী বিলাসিনী গ্রামীণ স্বৈরিণী। লেকু চটা মেজাজের সদা বিদ্রোহী গরীব চাষী, যাকে ভূমিহীন বললেই চলে। উভয়েই প্রধানত দেহনির্ভর হলেও জাহেদ রাবু-সেকান্দর মাষ্টারের আদর্শে নিজেদের ভাবনাচিন্তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হুরমতি গোরা সৈন্যদের রক্ষিতায় পরিণত হলেও এবং খারাপ রোগে আক্রান্ত হলেও শেষপর্যন্ত দেখা যায়, সে বিকৃতি থেকে উঠে আসতে পেরেছে স্বাভাবিক গ্রামীণ দাম্পত্য ও চাষী জীবনে। লেকু তাকে আশ্রয় দিয়েছে। প্রথমদিকে যেটা ছিল লেকু আর হুরমতির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের নিষিদ্ধ অন্তঃস্রোত, সেটা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি নিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। এরা স্বীকৃতি পেল রাবু-সেকান্দর-মালুর কাছেও।

সম্প্রদায় নির্বিশেষে কয়েকটা অসৎচরিত্রের ছবিও সংশপ্তকে আছে। যারা পরের দিকে গৌণ হয়েছে। সম্ভবত এই কারণে যে, জাহেদ রাবু সেকান্দর যে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েদী স্বার্থের শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে শেষ পর্যন্ত, সেটা দেশের ঔপনিবেশিক শাসকচক্র এবং তার আমলা মুৎসুদ্দী অনুচরবর্গ, যারা জাহেদকে ধ্বংসাত্মক ও অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করেছে। জাহিদ রাবু সেকান্দার লেকু বাংলাদেশের জনগণের প্রতিভূ। তারা যাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সেই নয়া ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুচরদের নিপীড়ক চেহারাটাকে সামনে এনেই উপন্যাসটিকে শেষ করেছেন সংশপ্তকের শিল্পরূপকার।

সংশপ্তকের শিল্পরূপকার দেশভাগের আগেকার কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবিও দিয়েছেন বেশ খানিকটা। দাঙ্গা এবং দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধের ঘটনাচিত্রও দিয়েছেন। এসব ঘটনাচিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি জাহিদ-রাবু আর মালুর চরিত্রকে যেন এসিড দিয়ে যাঁচাই করে নিয়েছেন। সংশপ্তকের রূপকার এখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচুর ছবি আনতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি আনেন নি সমগ্র উপন্যাসটির বিন্যাসের সমীকরণের দিকে তাকিয়েই সম্ভবত। তিনি পরবর্তীকালে ঢাকায় নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং সংশপ্তকের নগর-পর্ব যদি খুব বড় হয়ে যেত, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু থাকত না, কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ঘটেনি। বরং সংশপ্তকের একটা বিস্ময়, এতে যে গ্রামীণ জীবনের বাস্তব ছবি প্রাধান্য পেয়েছে, তা লেখকের শৈশব ও বাল্যকালের মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা হলেও এত সত্য হল কি করে!

বাকুলিয়া গ্রামের দরিদ্র ও রিক্ত চাষীজীবনের বেশ কয়েকটি ছবিতে গ্রামীণ দরিদ্র জীবনকে দেখার ব্যাপারে লেখকের তীক্ষ্ণ চোখের পরিচয় পাওয়া যায়। এ শুধু তীক্ষ্ণ চোখ নয়। মানবতাবাদী বিপ্লবীর চোখ। এখানে নিম্নোক্ত ছবি দৃষ্টান্তস্বরূপ :

(১) খেজুর পাতার দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে যায় লেকু। লাঠিটা চাঙের উপর ছুঁড়ে রেখে সটান শুয়ে পড়ে চৌকিতে। এই চৌকিটার গায়ে বিচিত্র এক গন্ধ, মৃত পিতার সেই বার্ধক্যের আর ওর নিজের কৈশোরের গন্ধ যেন। সে গন্ধের সাথে লেপা মাটি, তেলচিটে বালিশ, আম্বরির সেলাই করা কাঁথা, আম্বরির গায়ের গন্ধ, সব মিলে এমন এক বাস যাকে কিছুতেই সুবাস বলা চলে না। তবু উপুড় হয়ে শুয়ে জামকাঠের গায়ে এক আস্তর চিটচিটে ময়লা জমান আর ভুনির (কন্যার) কত পেচ্ছাব গড়িয়ে যাওয়া সেই প্রাচীন চৌকিটার সাথে মধুর এক আত্মীয়তা অনুভব করে লেকু। আর সব মিলিয়ে সেই যে এক বিচিত্র গন্ধ, নাক ভরে সে গন্ধ টানে লেকু। শরীরে বল আসে, মনেও যেন জোর পাচ্ছে লেকু। আজ তো গোটা সকাল আর এই দুপুর অবধি একবারও শোবার কথা ভাবেনি ও। হ্যাঁ, ওর মনে পড়েছে, জাহেদ সাহেবের কথা–সুদিন আসছে, সুদিন আসবেই। সে কথাগুলো শোনার পর থেকেই একটু একটু করে যেন শক্তি পাচ্ছে ও।'

(২) 'হুরমতির খবরে আর মালুর বয়ানে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। কসিররা চলে যাচ্ছে।

ওদের দোতালা ঘরটির সামনে সাদা উঠোনটুকু ফিকে জোছনাও কেমন ধবধবে। দু বউ এক ছেলের সংসরে যা কিছু সম্পত্তি, উঠোনে নামিয়ে গাঁটরি বাঁধছে কসির। কীই বা সম্পত্তি, খান তিনেক কাঁথা, মাটির হাঁড়ি, মাটির বাসন খোরা, একটা এলুমিনিয়মের বাটি, দুটো এনামেলের চটাওঠা গামলা, পিঁড়ি। কাঁথাগুলোর আলাদা একটা গাঁটরি করে তার ভেতর দা কাস্তে আর কুঠারটা সেঁদিয়ে দেয় কসির। একটা কোরায় হাঁড়ি পাতিলগুলো ভরে মাছধরার কোঁচটা হাতে নেয়, তারপর বউদের ডাকে–চল।

ভিটির প্রতি মেয়েদেরই বুঝি টান। নীড় রচনায় হৃদয়ের আবেদনটা পুরুষদের চেয়ে ওদেরই বেশি। তাই নীড়ের প্রতি এত মমতা ওদের। কসির ঘর গড়েছে, আবার গড়বে। তাই ভাঙতেও বুঝি দ্বিধা নেই ওর। কিন্তু বউরা? তৈরি করা ঘর ফেলে যেতে কলজেটা ওদের ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

সংশপ্তক উপন্যাসের যুগান্তর বিন্যাসে শহীদুল্লা কায়সার যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে যেমন রয়েছে গরীব আর ভূমিহীন চাষীর জীবনের বঞ্চনার অবসানের তাগিদ, তেমনি তাতে আরও একটা তাগিদ সুস্পষ্ট। মধ্যযুগীয় ফিউডাল বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর যে অসহায়তা আর দুঃখ, তাকে বুঝবার জন্য দুটি নারী চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। একজন আম্বরি–সে লেকুর তরুণী স্ত্রী। আরেকজন মিঞা বৌ–তিনি ফেলুমিঞার প্রবীণা স্ত্রী। আম্বরিকে অনেকক্ষণ দেখা যায়। মিঞা বৌকে দেখা যায় এক ঝলক। কিন্তু এই দুটি নির্যাতিতা নারীর দুঃখ ফেনিয়ে ওঠে সমগ্র গ্রন্থে।

সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজকে ভাঙ্গা দরকার শুধু চাষীর মুক্তির জন্য নয়, নারীর মুক্তির জন্যও।

সংশপ্তক উপন্যাসের এই তাগিদটি উপন্যাসের শিল্পরূপের যে দুটি আধুনিকতম উপাদানকে ব্যবহার করে নি, তাদের একটি হচ্ছে, অবচেতন মনের চাপাপড়া জগৎ, আরেকটি হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। কিন্তু এতে সংশপ্তককে সময়ের দিক দিয়ে 'পিছিয়ে পড়া' বলে মনে হয়নি। এর কারণ, সংশপ্তক অন্যান্য সমস্ত উপাদান নিয়ে এত বেশি সময় সচেতন যে, ১৯৩৮-৫১'র সমস্ত যুগান্তরটাই এতে বাঙ্ময়।

'৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির যে রক্তাক্ত গণঅভ্যুদয় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গণ ঐক্যের উৎসকে অবারিত করে দিয়েছিল, তাকে এবং তার জন্য '৪৮ থেকে '৫২ পর্যন্ত অন্ধকারে আবৃত কয়েকটি বছরে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল তাকেও স্মরণে রেখে ১৯৫৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালনের একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে 'আরেক ফাল্গুনে।' ঘটনার নায়ক নায়িকারা সবাই ছাত্র ছাত্রী। স্থান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পরিপার্শ্ব ঢাকা শহর। তখন বস্তুতপক্ষে সামরিক শাসন জারী ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা এই নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে কালো পতাকা উড়িয়ে সভা আর সমাবেশ করলো। তারা দলে দলে জেলে গেল। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের স্মৃতিকে পাকিস্তানী শাসকচক্র মুছে ফেলবার জন্য যে ভীতির রাজত্ব কায়েম করেছিল, তাকে ছাত্রছাত্রীরা একটা কাগজের টুকরোর মতো ছিঁড়ে ফেলল। এই আরেক ফাল্গুনের বিক্ষোভ সেদিনই প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের রূপ নিল না, একথা ঠিক। এবার শুধু ছাত্রছাত্রীরাই জেলে গেল আইন অমান্যের সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ধারায়। কিন্তু এই সত্যাগ্রহী ধরনের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কেটে গেল জড়তা। কেটে গেল সাময়িক বিভ্রান্তি আর হতাশা। স্থাপিত হলো সামরিক শাসনকে অগ্রাহ্য করার সমস্ত পরিণতির ঝুঁকি নেবার দৃষ্টান্ত। মুক্তি সংগ্রামের পতাকাবাহী ছাত্র সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়লো 'জীবন অথবা মৃত্যু' পণ করে। এদিক দিয়ে এর আয়োজনের ধারাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই আয়োজনটিকে একটি অগ্রসর বৈপ্লবিক শিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। এই আয়োজনের মধ্যে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীত কয়েকটি যুবার মুখচ্ছবি। এই উৎসর্গীকৃত যৌবনের প্রসারমান গণ্ডীটা এককেটা সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে কিভাবে বড় হতে যাচ্ছে 'আরেক ফাল্গুন' তারও আভাস দিয়েছে। এই উৎসর্গিত যৌবনের প্রসারমান গণ্ডীতে যে মেয়েরাও শরীক হতে শুরু করেছে, তারও আভাস দিয়েছে আরেক ফাল্গুনের ঘটনা। '৫৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবস পালন করতে গিয়ে যারা সামরিক শাসনের নিষেধাজ্ঞা ভাঙ্গলো তাদের মধ্যে দেখা গেল বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রীকে। এটা ছিল সে সময়ে একটা অভাবিত ব্যাপার। কিন্তু এই অভাবিত ব্যাপারই ঘটলো সেদিন এবং জানিয়ে দিল যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সম্ভাব্য বিভিন্ন স্তরগুলির একটির কথা। বাংলাদেশের নারী সমাজ এই আরেক ফাল্গুনে ঘটনার নেতৃত্বের অংশীদার হয়ে অর্জন করে নিল সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং বৈপ্লবিক মর্যাদার ছাড়পত্র। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটানোর জন্যে হলেও যেখানে তরুণ তরুণীরা একত্রিত হয়েছে এবং ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের অবস্থায় পৌঁছেছে সেখানে প্রেম একটা মূল উপাদান হবে, এটা স্বাভাবিক।

প্রেম এবং 'ভাবলৌকিক' প্রেম আরেক ফাল্গুনের মানবিক সম্পর্কে ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি করেছে। অন্তরের বাধা আর বাইরের প্রতিবন্ধকতা—দুটোই ঘটেছে। জীবন ও স্বপ্নগুলি সবই এক সুরে মিলে যায়নি। যেগুলি মিলেছে সেগুলিও প্রথম থেকেই বেহালার সুরবাঁধা তারের মতো বাঁধা হয়ে থাকেনি। স্বপ্নকামনা আর বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে জীবনে। এবং যে ব্যবধানকে জয় করার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রামের প্রয়োজন হয়, উপন্যাসের শিল্পরূপকার জহির রায়হান তাকে খুব তীক্ষ্ণভাবেই মনে রেখেছিলেন। তার এই সজাগ সতর্কতা উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে কিছুটা রূঢ়ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এই ব্যবধান যে কত বাস্তব, তার লক্ষণ তিনি দেখিয়েছেন আরেক ফাল্গুনের ঘটনার নায়ক মুনিমের প্রণয়িনী ডলির সাময়িক বিভ্রান্তি দ্বারা। 'আরেক ফাল্গুন' অত্যন্ত সীমিত পরিধির মধ্যে স্মৃতির মধ্যে এনেছে '৫২ সালের রক্তাক্ত একুশের ঘটনা। এখানে এসেছে '৫০ সালের রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর গুলিচালনার ঘটনাও। এর মধ্যে জহির রায়হান পরিসর তৈরি করে নিয়েছেন মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণী ডলির ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বপ্নের ধারাটিকে বিন্যস্ত করার জন্য।

'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির কৃতিত্ব এই যে, এর শিল্পরূপ বিন্যাস চলচ্চিত্র নাট্যের মতো সংক্ষিপ্ত হলেও যে কয়েকটি প্রধান চরিত্রকে এতে আনা হয়েছে, তারা পরিষ্কার চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে ঘটনাগুলি এবং এদের আয়োজক আয়োজিকারা অবস্থিত ছিল বলেই আরেক ফাল্গুনের সত্যতাকে এত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন তিনি। স্মৃতি আর প্রত্যক্ষকে একটি একহারা মালার মধ্যে গাঁথতে পেরেছেন, যাকে মহাকালের গলায় আমরা পরিয়ে দিতে পারি অনায়াসে।

'আরেক ফাল্গুন' লেখার আগে জহির রায়হান আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে রয়েছে 'হাজার বছর ধরে'।

'হাজার বছর ধরে' শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' উপন্যাসের মতোই গদ্য লোককাব্য। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের আবহমান চাষী জীবনের যে সব ছবি দেয়া আছে, তার মধ্যে কোন যুগান্তর নেই। প্রকৃতি হচ্ছে একই সঙ্গে 'শত্রু এবং বন্ধু' সুখদুঃখ, ভালমন্দ, আলো অন্ধকার, ঘৃণা ভালবাসার 'এপার ভাঙ্গার ওপার গড়ার' পালা, যে যাকে পায় তাকে চায় না, যে যাকে চায় তাকে পায়না। গভীর দুঃখের ধারা বয়ে চলেছে সারা বইটিতে।

এরকম গ্রামীণ অঞ্চল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও দেখা যায় না তা নয়। সুতরাং 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের ঘটনাধারা অবাস্তব নয়। কিন্তু ভাঙ্গা গড়ার মুক্তি সংগ্রামের স্রোতের টানের মধ্যে এর না আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। এ ধরনের ব্যতিক্রম রাখালিয়া গানের মতো উপভোগ্য হয় এবং এর আবেদনও থাকে, কিন্তু সামগ্রিক সত্যের শিল্পরূপ এ দিতে পারে না। এ কারণেই বর্তমানের মহাকাব্যিক শিল্পরূপে একে ফেলা যায় না। এ কারণেই বাংলাদেশের গণজীবনের প্রাকৃতিক ধরনের রূপবিন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে মহাকাব্যিকতা থাকলেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মহাকাব্যিকতার সঙ্গে এর কোন যোগ

সাধিত হয় নি। 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে যদিও বস্তুতপক্ষে চাষী মজুরেরা অনুপস্থিত এবং যদিও আরেক ফাল্গুনে যে বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে তাতে জনগণের কোন অংশগ্রহণ নেই, তবু এ উপন্যাসেই সামগ্রিক সত্যের যে অভিব্যক্তি আছে, 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে তা নেই। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে যেন বাংলাদেশের একটি উদাসিনী নদী যে বিপ্লবের আলোড়নে উন্মথিত লোকালয় গুলিকে পাশে রেখে নিজের মনে বয়ে গেছে। বাংলাদেশের যে মুক্তি-সংগ্রাম বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার দাবীতে গণ অভ্যুদয়ের রূপ নিয়ে বাস্তবে এবং সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে সামগ্রিক চরিত্র লাভ করেছে, 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে তার সচলতা যত সীমিত পরিসরেই আসুক না কেন, তা মহাকাব্যিক লক্ষণযুক্ত হতে বাধ্য। যে অর্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণঅভ্যুদয়ের পটভূমিতে তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরা পাতা' এবং মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসে একটি মহাকাব্যিকতার লক্ষণ রয়েছে, সেই অর্থেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি সিদ্ধান্তকারী গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে 'আরেক ফাল্গুন' মহাকাব্যিক আলেখ্য।

যে শিল্পী 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের মতো গণজীবনভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন, তাঁর কাছ থেকেই '৫২ সালের রক্তাক্ত গণ-অভ্যুদয় ও তার পটভূমি এবং সম্ভাব্যতা ভিত্তিক সামগ্রিক উপন্যাস প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু জহির রায়হান একটিমাত্র পর্ব বা সর্গকে নিয়ে 'আরেক ফাল্গুন' লিখে বস্তুত ভবিষ্যতে একটি সামগ্রিক মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখার উপক্রমনিকা তৈরি করে রেখেছিলেন। কিংবা সম্ভবত, তিনি তাঁর বড় ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে সংশপ্তকের রূপকাররূপে পাওয়ার পরে তাঁর কাছ থেকেই সংশপ্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে '৫২ সালের গণ-অভ্যুদয়ের মহাকাব্যিক আলেখ্য আশা করেছিলেন এবং এই কারণেই নিজে লিখতে চান-নি।

কিন্তু যখন '৫২ সালের রক্তাক্ত গণ-অভ্যুদয়ের আলেখ্যরূপী উপন্যাসটি বিলম্বিত হতে থাকে শহীদুল্লা কায়সারের বিপ্লবী কর্ম জীবনের ব্যস্ততার দরুন, এবং যখন মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক ছাড়া বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের '৫২ সালের অধ্যায়টি সাধারণভাবে গদ্য কথাসাহিত্যে আসেনা বললেই চলে, তখন জহির রায়হান আরেক ফাল্গুনকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেন।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি বিশিষ্ট রীতিকে সামনে এনেছেন জহির রায়হান। এই রীতিটি শহীদের প্রতি সম্মানে নগ্নপদের মিছিল। ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রামী ও গণ ঐক্যের শপথের প্রকাশ এই রীতিটি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক গণসমাবেশের একটা অবিভাজ্য পদ্ধতিরূপে কাজ করেছে। জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে এই রীতির যে কোমল এবং দৃপ্ত ছবিগুলো এঁকেছেন, সেগুলি গভীর দ্যোতনাময় সত্যচিত্র।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গণ অভ্যুদয়ের শিল্পরূপ হিসেবে তৃতীয় যে উপন্যাসটি এখানে আলোচ্য, সেটি জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী।'

জহিরুল ইসলাম তার উপন্যাসটি শুরু করেছেন অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে একটি পরিবারকে নিয়ে, যার আর্থিক সঙ্গতি খুবই সীমিত কিন্তু যা লালন করেছে সৎ ও আদর্শদবাদী ছেলেমেয়েকে। বড় মেয়ে মধুরিনা, বাংলা অনার্সের ছাত্রী, যে সক্রিয়

রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। আরেক মেয়ে ফারিয়া স্কুলের ছাত্রী যে ইতিমধ্যেই সক্রিয় ছাত্র রাজনীতিতে নেমে পড়েছে। ভাই বুলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, সে শুধু সক্রিয় ছাত্র রাজনীতি করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বৈপ্লবিক শ্রমিক কৃষকের রাজনীতিতেও নেমে পড়েছে। বুলনের সমবয়সী ও রাজনীতির বন্ধু ও গুরু মুনির সুলতান এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। মধুরিনা আর মুনির সুলতান পরস্পরকে ভালবেসেছে। তাদের মধ্যে বাক্‌দান আছে। এই কয়েকজনকে ঘিরে একটি ছাত্রছাত্রীমণ্ডল, যাদের অধিকাংশই মুনির সুলতানের রাজনীতি করে। বুলনের প্রতি আকৃষ্টা একটি মেয়ে-নার্গিস-মধুরিনার বন্ধু। নিম্নবিত্ত। আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ। ফারিয়া আর দীপক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এই দীপক একটি হিন্দু ছেলে। সে মুনির ভাই-এর প্রধান শিষ্যদের একজন, যেমন ফারিয়া মুনির ভাইয়ের শিষ্যা। এই ধরনের একটি পরিচিতদের মণ্ডলী '৬৮-৬৯ সালের ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহে শরিক হয়। বুলন শহীদ হয়। মুনির সুলতান আহত হয়। মুনির সুলতান আহত হয়ে হাসপাতালে। মধুরিনা সক্রিয় রাজনীতির বিপ্লবী পতাকা হাতে নেয়। এই বিপ্লবী পতাকা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় গণমুক্তিসংগ্রামের সমাজতন্ত্রের দিকে চলার পতাকা।

শহীদুল্লা কায়সার তাঁর 'সংশপ্তকে' বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূচনার ছবি এঁকেছেন। জহির রায়হার তাঁর 'আরেক ফাল্গুনে' মুক্তি সংগ্রামের মাঝামাঝি অবস্থার একটা অচলাবস্থা ভাঙ্গার জয়গান গেয়েছেন। জহিরুল ইসলাম যখন এই অগ্নিসাক্ষী লিখতে বসেছেন, তখন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম একটা সর্বোচ্চ সন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেছে। মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক শক্তি যেমন তাদের একটা সাধারণ ঐক্যে বিন্যস্ত হতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ শ্রেণীগত অবস্থান সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অর্থাৎ একদিকে যেমন বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক ঐক্যের প্রবণতা আর আয়োজন বেড়েছে, তেমনি স্বাধীনতার ফলভোগ যাতে শোষিত নির্যাতিত এবং চিরবঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণীগুলিই করতে পারে সেই করণীয়কে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রমিক কৃষককের মধ্য থেকেও উদ্যোগ নিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই দুটো আয়োজন আর উদ্যোগ যেমন পরস্পরকে সহায়তা করেছে, তেমনি এদের মধ্যে ভাবগত ফাঁকও কতকগুলি রয়ে গিয়েছে যার দরুন সমগ্র সংগ্রাম একটা নিশ্চিত লক্ষ্যে ভাবগতভাবে বিন্যস্ত হয়নি। পাকিস্তানী কাঠামোটা যে থাকবে না সে সম্বন্ধে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত 'আনুষ্ঠানিকভাবে' তখনও বিতর্কের আওতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি এবং বাংলাদেশের একটা শোষণমুক্ত সমাজের তাগিদ বস্তুগতভাবে এমন একটা জায়গায় একত্রিত হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক কাঠামোর মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সামরিক শাসনের শিকড়গুলি আলগা হয়ে গিয়েছে। এই সময়ের ঘটনাবলি থেকে বুঝতে পারা গিয়েছে যে, বস্তুগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপ্লবী শক্তি বিন্যাস তৈরি হচ্ছে সেই সিদ্ধান্তের জন্য যা '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভাবগতভাবেও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুত্থান

ঘটাল। জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' উপন্যাসে ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের যে ছবি দেওয়া হয়েছে তাতেই মুক্তিসংগ্রামের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই উপন্যাসটিকে বাংলাসাহিত্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠার মুক্তিসংগ্রামের সার্বিকতার যে ধারণা মাত্র দুটি পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে সেটাই অগ্নিসাক্ষীতে বর্ণিত অন্যান্য সমস্ত ঘটনাকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গদ্য-মহাকাব্যিক শিল্পরূপের একটি নিদর্শনের মধ্যে গ্রথিত করে রাখতে পেরেছে।

সার্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে উপন্যাসে নায়িকা মধুরিনার উপলব্ধির কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ :

'মধুরিনার চিরচেনা পৃথিবীটার রঙ যেন সহসা বদলে যাচ্ছে। চতুর্দিকে কি এক অচেনা উন্মাদনা। চাঞ্চল্য আর চাঞ্চল্য-সর্বত্র চাঞ্চল্য।

জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ চেতনার ভাষা খুঁজে পেয়েছে এদেশের ছাত্র শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষ।

এই যে সার্বিক বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থান, এর মধ্য থেকে জহিরুল ইসলাম কোন একটা বিপ্লবাত্মক উপাদানকেও বাদ দিতে চাননি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতের পছন্দ অপছন্দের খাতিরে।

অগ্নিসাক্ষীর লেখক তাঁর বই এর শেষের দিকে, বিশেষ করে কৃষক শ্রমিকের বিপ্লবী ভূমিকাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন এবং এমন কি মেহনতী মানুষদের লাল সালাম জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে বিরাট বিস্তৃত জাতীয় রূপ, তাকেও যথাযথভাবেই চিত্রিত করেছেন। একে ইচ্ছামত সাজান নি। এর ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ন করেন নি কোথাও। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এই সর্বাত্মক বৃহৎ পটভূমিতে অগ্নিসাক্ষীর রূপকার তাঁর নায়কনায়িকাদের মুখচ্ছবিগুলিকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন ও তাদের চরিতকথার রূপ দিয়েছেন এমনভাবে যে, এই সজীব চরিত্রগুলি ঘরোয়া কিংবা মিছিলের সামনের সর্বাত্মক পটভূমিকেও কথা বলিয়েছে।

উপন্যাসটির মূল নায়িকা-নায়ক মধুরিনা আর মুনির সুলতান। এরা দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক ধারায় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। এরা মুখর মুখরা। শুধু এরাই নয়, অগ্নিসাক্ষী উপন্যাসের সামান্য পরিসরের মধ্যে যারা এসেছে তারা অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে হলেও নিজেদের মতগুলিকে প্রকাশ করেছে খুব খাড়াখাড়ি ভাবে। এদের ভালবাসা, কলহ, ব্যস্ততা সবই সুস্পষ্ট। একারণেই '৬৮-৬৯ এই বিপ্লবাত্মক গণঅভ্যুত্থান যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি এই গণ অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক সামগ্রিকতা চুম্বকের মতো টেনেছে সংগ্রামী মাত্রকেই তাদের নানাধরনের মত পার্থক্য সত্ত্বেও।

"মধুরিনার চিন্তাস্রোত থেকে প্রথমে তফাৎটা বার করা যাক তার এবং মুনির সুলতানের মধ্যেকার :

'মধুরিনা তার চিরচেনা পৃথিবী থেকে আড়াল হতে চায় না, এই সমাজে, এই উঁচুনীচু আর্থিক অবস্থানের চোরাবালিতে কঠোর সংগ্রাম করে বাঁচতে চায়। ত্যাগ তিতিক্ষা আত্মসংযম এতে কি কম নাকি?

কিন্তু মুনির ভাই বলবে, সেই সংগ্রাম শ্রেণীর সংগ্রাম, ব্যক্তির সংগ্রাম নয়।

পলিটিক্স করে সমাজটা এমন হয়েছে যে, ব্যক্তি আর শ্রেণীর মধ্যে এর শ্রেণীর যেন বিরাট তফাৎ রয়েছে। যেন শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তি বলে কিছু নেই।

মাথা গোল হয়ে গেল নাকি মুনি ভাইয়ের। যে কোন শ্রেণীই হোক না কেন, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক বা ধনীশ্রেণী-কিছু ব্যক্তির সমন্বয়েই তো তার হিসেব।"

মধুরিনা তার ব্যক্তিকতার চিন্তা নিয়ে গিয়ে পড়লো মুক্তি সংগ্রাম বিরোধী চক্রের নায়ক সাদিকের ভোগী জীবন দর্শনের পাল্লায়। কিন্তু বুঝতে দেরি হলো না যে, সাদিক তাকে নিয়ে খেলতে চায়, যেমন সে অনেক মেয়েকে নিয়ে খেলেছে :

"বহুক্ষণ ঝিম মেরে কালো অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গিয়ে সে আসল সত্য উদ্ধার করে এনেছিল যে, নার্গিসের মত নিজের জীবনের ভাবনাগুলোকে গড়ে তুলতে না পারার জন্যেই তার জীবনের সূচনাতেই এমন একটা সর্বনাশের সংকেত দোলা খেয়ে পুঞ্জিভূত হয়ে গেলো যেখানে আন্দোলনমুখী নগরীর হাজারো কোলাহলের ঢেউয়ে মধুরিনা এক একক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানস-সত্তা, যার পেছনে সামনে ডাইনে, বাঁয়ে একটি মানুষ সহানুভূতির অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।"

এর আগে ফারিয়ার বন্ধু দীপককে ফারিয়ার সঙ্গে মেলামেশার জন্য তিরস্কার করতে গিয়ে দীপকের কাছ থেকেই গভীর সহানুভূতির কথা সে শুনেছিল। দীপক তাকে বলেছিল, "পৃথিবী নিষ্ঠুর নয়, নিয়তি নিষ্ঠুর নয়। আমরা ওসব বিশ্বাস করিনে। আমরা মনে করি সাম্রাজ্যবাদের মত নিষ্ঠুর আর কিছু হতে পারে না—হতে পারে না। যতো নির্মমতা যতো অত্যাচার অনাচার পাশবিকতা কেবলমাত্র ঐ একটা জিনিস থেকেই উৎপন্ন হয়ে চলেছে। সুতরাং সেই নিষ্ঠুরতার আগে ধবংস চাই। তারপর যত ইভিল্‌স, যতো ত্রুটি বিচ্যুতি আমরাই দূর করবো।" সুতরাং সাদিককে উপলক্ষ করে নিজের ব্যক্তিকতার মোহভঙ্গের পর মধুরিনা বিচ্ছিন্ন রইল না। সে মুনির সুলতানকে গ্রহণ করতে রাজী হল তার সামগ্রিক বৈপ্লবিকতা নিয়ে, অর্থাৎ সে-ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একাত্ম হলো।

সে জগতটা থেকে সে দূরে সরেছিলো, নিজের গা বাঁচিয়ে এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছিল—সেই জগতটাই আচম্বিতে তাকে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে টেনে নিলো।

বাস্তব জগত, সুস্থ চেতনায় ফিরে যেতে পেরে মধুরিনার একটা চমৎকার উপলব্ধি ঘটেছে। "মধুরিনা যেন ভোরের পাখি। এই পৃথিবীতেই অনেক অনেক আলো। ওরা তো সব আলোর মোহনায় চলছে।"

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে গণ বৈপ্লবিক চরিত্র মধুরিনাকে এবং মধুরিনার সমবয়সী আরো অনেক তরুণী আর তরুণকে চুম্বকের মতো টেনেছে, তার মধ্যেকার কোন মেহনতী নরনারীর চরিত্রছবি অগ্নিসাক্ষীর মধ্যে আসেনি। এটা নিশ্চয় অগ্নিসাক্ষীর পরবর্তী খণ্ডে আসতো। কিন্তু জহিরুল ইসলামকে তাঁর বিপ্লবী মতামতের জন্যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সামরিক বাহিনীর লোকেরা

তাঁকে হত্যা করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে শহীদুল্লা কায়সার এবং জহির রায়হান শহীদ হয়েছেন সেই ভাবেই জহিরুল ইসলাম শহীদ হয়েছেন।

অগ্নিসাক্ষীর পরবর্তী খণ্ডে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কৃষক শ্রমিক চরিত্র আসতো, একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি, তার কারণ, জহিরুল ইসলামের প্রবণতা ছিল কৃষক শ্রমিকদের চরিতকথার চিত্রণের দিকে। শুধু কৃষক চরিত্র নিয়ে উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। এবং প্রমাণ করেছিলেন এ ব্যাপারে তিনি দক্ষ। তাঁর 'অজগাঁয়ের বেগম' উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গ গভীর মূল্যায়নের দাবীদার।

মেদিনীপুরের চাষীজীবনের এই ছবি গণ-উপন্যাসের একটি নিরুপম দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন–'আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জহিরুল ইসলাম নিয়েছিলেন মেহনতী নরনারীদের জীবনকে দেখবার বুঝবার অন্তর্দৃষ্টি 'অজগাঁয়ের বেগম' অবশ্য 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতোই তথাকথিত অরাজনৈতিক–একটি বিশেষ অঞ্চল বা আবহাওয়া ভিত্তিক। সুতরাং 'অজগাঁয়ের বেগম' শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' কিংবা জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে'র সঙ্গেও তুলনীয়। এই জন্যই মহাকাব্যিক বলে চিহ্নিত হতে পারে না।

কিন্তু 'অজগাঁয়ের বেগম'–উপন্যাসের শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মহাকাব্যিক উপন্যাসে নিম্নবিত্তদের পাশাপাশি শ্রমিক কৃষকদের ছবি অবশ্যই আঁকতে পারতেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে, তাতে স্বাধীনতাকে গণজীবনে ফলপ্রসূ করে তোলার কাজে উপরোক্ত তিনটি উপন্যাসই ভবিষ্যৎবাদী এবং সঞ্জীবক উপকরণ হিসেবে বেশি বেশি করে আদৃত হবে। এই তিনটি উপন্যাসেরই ইতিবৃত্ত যেমন সমসাময়িক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত, তেমনি এরা বিপ্লবাত্মক সম্ভাব্য ঘটনাকেও রেখেছে গুচ্ছ গুচ্ছ আফোটা ফুলের কুঁড়ির মতো বিন্যস্ত করে, যে ধরনের কুঁড়িরা অনাগত দিনের সচেতন মানব মানবীর মনের ছোঁয়ায় কবিতায় উপন্যাসে নাটক সাহিত্যে পাপড়ি মেলে।

এই চেতনার পাপড়ি মেলার ব্যাপারটা ভাবলৌকিকতা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে গুণগত ধরনের তাগিদ উপন্যাসত্রয়ে রয়েছে, তাদের একটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা। মার্কসীয় দৃষ্টিতে এর অর্থ সকল ধর্মের সম-অধিকার এবং সমস্ত ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার। রাষ্ট্র থাকবে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এর যে ভাবগত বিন্যাস প্রয়োজনীয় তার জন্য উপন্যাসত্রয়ে রয়েছে সঞ্জীবক নির্দেশনা।

চব্বিশ
ফরাসি লোক অভ্যুদয়মূলক উপন্যাস

রালফ্ ফক্স তাঁর 'উপন্যাস ও জনগণ' গ্রন্থে বিশ শতকের উপন্যাসের শিল্পরূপের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার যে সম্ভাব্য উপন্যাসের দ্বিতীয় সঞ্জীবক ধারার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেটি হল এই শতকেরই ফরাসি লোক অভ্যুদয়মূলক উপন্যাস। এই ইঙ্গিতের সূত্র ধরে চল্লিশের দশকের এবং তার পটভূমি হিসাবে বিশশতকের প্রথম তিন দশকের উপন্যাসর মহাকাব্যিক ধারাটিকে পরীক্ষা করে দেখবো এখানে।

বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে ফ্রান্সে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী লোক অভ্যুদয় ঘটে, তার মধ্যেই রালফ্ ফক্স উপন্যাসের শিল্পরূপেরও নতুন প্রাণোচ্ছলতার সম্ভাবনা দেখতে পান। ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির তাগিদ জনগণের তরফ থেকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তেমনি শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব কায়েম করে জনগণকে নতুন করে দাসত্ববন্ধনে আটকাবার চেষ্টা করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশের এবং তিরিশের দশকে। জনগণকেও তাই প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হয়েছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তির বিন্যাসে, শিল্পরূপে, দর্শনে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা গণমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস করেছিল মনগড়া জাতীয় ঐক্যের নাম করে। এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের প্রয়াসী মেহনতী জনগণের জাতীয় ঐক্যের বিপ্লবী সমাবেশ গড়ার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল উপন্যাসের শিল্পীদেরও। উপন্যাসেও এই নববৈপ্লবিক রূপকারের একই সঙ্গে একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরে বাইরে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শাসনের কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্য আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের যে মহাতরঙ্গরাশি উত্থিত হয় তাকে ব্যাহত করার জন্য এবং খাস মালিক দেশগুলির মধ্যেই মেহনতী মানুষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়াসে রুশ বিপ্লবের লেনিনের পথে যে প্রসার ঘটে তাকে ঠেকাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা মালিক দেশগুলির অভ্যন্তরে ধনিকশ্রেণীর নির্দেশাধীন জাতীয় সংহতির এক দর্শন খাড়া করে। তারা এই দর্শন দ্বারা মালিক দেশগুলির জনগণকে প্রভুজাতির মানুষ বলে নিজেদের ভাবাতে প্রয়াসী হয়। এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অতি জাতীয়তাবাদই ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদ নামে পরিচিত হয়েছে। ইটালিতে মুসোলিনী আর হিটলার এর নামদাতা। ১৯৩৭ সালে স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো এই অতি জাতীয়তাবাদী একনায়কত্বের ধারক বা বাহকরূপে প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়েছিলো।

তিরিশের দশকের শুরুতে মুসোলিনী-হিটলার ফ্রাঙ্কোর কায়দায় ফ্রান্সেও ফ্যাসিবাদী বা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অতি-জাতীয়তাবাদীদের একচ্ছত্র শাসন কায়েমের প্রয়াস ঘটলে তার বিরুদ্ধে ফরাসি জনগণের বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম ও সমাবেশ সেখানে উপন্যাসের শিল্পীদের মনে প্রাণের জোয়ার এনে দিয়েছিল। এর মধ্যদিয়ে ফরাসি উপন্যাস একদিকে ধনতান্ত্রিক জনগণের প্রাণে যে আগুন ছিল তাকে যন্ত্রণা বেদনার সঙ্গে যুক্ত করে শিল্পরূপের নতুন অধ্যায়ের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।

রালফ্ ফক্স এই ঘটনাটির মধ্যে সেদিন উপন্যাসের পুনরুজ্জীবনের ধারাটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। 'উপন্যাস ও জনগণ' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছিলেন নিম্নোক্তরূপ সম্ভাব্যতা :

"আমাদের ভগ্নীস্বরূপা ফরাসি গণতান্ত্রিকতার জীবনধারার সঙ্গে যাদের নিবিড় পরিচয় আছে, তাঁরা ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র-আদর্শের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তার জগতের গতিপরিবর্তনকেও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ায় ফ্রান্সের জনসাধারণ তাঁদের স্বাধীনতা সমূহকে লক্ষ্য করার জন্যে এবং তাঁদের স্বদেশকে স্বাধীন শক্তিশালী ও সুখী করার উদ্দেশ্যে একটা সাধারণ সমাবেশ একত্রিত হয়েছেন। মেহনতী জনগণের ঐক্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। তারপর যাঁরা শ্রেণী নির্বিশেষে আপন পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করেন তাঁদের মধ্যে এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে। ফরাসি সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে এবং বিশেষ করে ঔপন্যাসিকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন মতাবলম্বী শিল্পী এই আন্দোলনে শরিক হচ্ছেন। সাম্যবাদী আঁদ্রে মালরো, নৈরাজ্যবাদী সেলিন (Celine), উদারপন্থী জুল্স রোমেইন্স্, সম্রাজ্যবাদী জাঁ রিচার্ড ব্লক (Bloch) এবং চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী আঁদ্রে জিদ একটা সাধারণ ভিত্তির ওপর এসে দাঁড়াতে পেরেছেন। তাঁরা নতুন করে জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং এতদ্বারা নিজেদের শিল্পকর্মের সজীবতাকে ফিরে পেয়েছেন। জনসাধারণের সঙ্গে এই সংযোগ ফরাসি সাহিত্যের মহান উত্তরাধিকারের উদ্ধার সাধনে ঔপন্যাসিককের সাহায্য করেছে।"

বিশশতকের তিরিশের দশকের শেষের দিকেই দেখা যাবে, শুধু ফ্রান্সে নয়, সারা ইউরোপে তথা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার প্রাক্কালে রালফ্ ফক্স্ স্পেনের দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে যোগদিয়ে রণক্ষেত্রে নিহত হলেন। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে গণপ্রতিরোধের সফলতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে রালফ্ ফক্স ফ্রান্সের প্রবীণ ও নবীন ঔপন্যাসিকদের গণসংযোগকে সামনে রেখে উপন্যাসের শিল্পরূপের যে অন্যতম সঞ্জীবক ছক এঁকে যান, সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় প্রারম্ভেই জার্মেনির হিটলার বাহিনীর আক্রমণের মুখে ফ্রান্সের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অগ্নিপরীক্ষায় পড়ে।

আঁদ্রে মালরো উপন্যাস লেখা বন্ধ রেখে মুক্তিযুদ্ধের আয়োজনে শরিক হয়েছিলেন। উদারপন্থী শিল্পীরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিরিশের দশকে ফ্রান্সের সে ফ্যাসিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অতি জাতীয়তাবাদী চক্র একচ্ছত্র শাসন কায়েমের চেষ্টা

করেছিল, তারা হিটলার বাহিনীর তল্পিবাহক হিসাবে ফ্রান্সের একাংশে ক্ষমতাসীন ছিল। বিপ্লবী নগরী প্যারি থেকে সরাসরি জার্মেন অতি জাতীয়তাবাদী হিটলারী নির্দেশ নামায় পিঞ্জরাবদ্ধ। সুতরাং তিরিশের দশকের ফরাসি উপন্যাসকে সঞ্জীবক ধারা যেভাবে ফরাসি ফ্যাসিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অতি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লোক অভ্যুদয়ের সত্যার্থী শিল্পরূপ হিসাবে উঠে এসেছিল, তা নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হয় এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের লোক অভ্যুদয়ের আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে আমরা দেখি, তিরিশের দশকের সঞ্জীবক ধারার কিছু কিছু উপাদান নিয়ে কয়েকজন শিল্পী গণজাতীয় মুক্তিসংগ্রমী উপন্যাস লিখেছেন মক্তিযুদ্ধের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে মহাকাব্যিক ধারায় পুঞ্জিভূত করে। এদের তিনজনের মধ্যে একজন একেবারেই নবাগত—আলবেয়ার কামু। আরেকজন জাঁপল সার্ত্রে, তিরিশের দশকের শেষের দিকে একটি মাত্র চটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আরেকজন লুই আরাগঁ, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ফ্রান্সের আধুনিক মনোবাস্তববাদী কবিতার অন্যতম পথিকৃত হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

চল্লিশের দশকে ফ্রান্সে যে লোকঅভ্যুদয় ঘটে, তা জার্মেন অতি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবেই পরিণতি লাভ করে। জার্মেন অতি জাতীয়তাবাদীদের ছাঁচে গড়া ফরাসি ফ্যাসিবাদীদের মুখপাত্রদের উৎসারণ ঘটে ঐ মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যর সঙ্গে সঙ্গে। এদিক দিয়ে অবশ্য চল্লিশের দশকের লোকযুদ্ধ তিরিশের দশকের লোক অভ্যুদয়ের পরবর্তীতরঙ্গ। সুতরাং আলবেয়ার কামু, সার্ত্রে কিংবা লুই আরাগাঁর উপন্যাস তিরিশের দশকের গণ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেরই ধারাবাহী শিল্পরূপ।

তিরিশের দশকের উপন্যাস শিল্পীদের নতুন প্রেরণা এবং চল্লিশের দশকের উপন্যাস শিল্পীদের রূপ সমৃদ্ধির মধ্যে যে বৈপ্লবিক যোগসূত্রটি রয়েছে, তাকে রালফ ফকস্রের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আঁদ্রে জিদ প্রমুখ শিল্পী সরে দাঁড়ালেও তিরিশের দশকের গণমুখী শিল্পী সমাবেশের সংগ্রামী পতাকা চল্লিশের দশকের শিল্পীদের হাতে আসে। একটা চলার পথের ছক সামনে তৈরি পাওয়া যায়।

অবশ্য এই পতাকা কিংবা নিশানকে তিরিশের দশকের বিপ্লবী গণসমাবেশেও নিবদ্ধ করে দেখাটা ঠিক হবে না। কারণ, বস্তুতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ চলার সময়েই ফ্রান্সে ধনতান্ত্রিক অতি জাতীয়তাবাদী যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের পতাকা তুলে ধরেছিলেন বিশেষ করে দুজন শিল্পী—রোমাঁ রোলাঁ এবং আঁরি বারবুসে, তাদের উপন্যাসের মাধ্যমে।

রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'জা ক্রিস্তফ' উপন্যাস লিখেছিলেন এই শতকের শুরুতে। তখনই প্রস্তুতি চলছিল দুনিয়ার বাজার ভাগাভাগি করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের। জার্মেনী আর ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক অতি জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বের মেহনতী মানুষের মধ্যে জাতিগত বৈরীতার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। সঙ্গীতের আন্তর্জাতিকতার জয়গান গেয়ে রোমাঁ রোলাঁ এই বৈরীতাকে প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী

পুঁজিবাদীদের অতি জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ-প্ররোচনার বিরুদ্ধে তাঁর এ উপন্যাস ছিল সর্বদেশের মানবতাবাদী শিল্পীর প্রতিবাদ। উপন্যাসের নায়ক সঙ্গীতশিল্পী জাঁ ক্রিস্তফ আদর্শবাদের ফাঁপা বেলুন নয়, সে আদর্শবাদী মানুষ, তবে রক্তমাংসের মানুষ। সে বাস্তব ও সজীব চরিত্র এবং যে সমাজে সে চলাফেরা করেছে সেখান থেকেই পেয়েছে সে চরিত্রের অসঙ্গতি। মে দিবসে প্যারিসের রাজপথে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হলে সে শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, আবার সেই সংঘাতে প্রিয় কবি বন্ধু অলিভিয়েরকে হারিয়ে সাময়িকভাবে দেশত্যাগ করেছে। 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাস এক প্রগল্‌ভ গদ্য মহাকাব্য, যার শেষকথা প্রশান্তি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়গুলো শুরু হবার পরে আনেত নাম্নী একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে রোঁমা রোলাঁ যে দ্বিতীয় মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখলেন 'বিমুগ্ধ-আত্মা' নাম দিয়ে, তার শেষ খণ্ডে তাঁর নায়িকা যুদ্ধবিরোধী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন জানালো। আনেত চরিত্রের বিকাশের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পোড়-খাওয়া চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মানুষ একটা শক্তস্থান পেয়েছিল দানা বাঁধবার।

অবশ্য রোঁমা রোলাঁ তার নিজস্ব অধ্যাত্ম গতিরেখা ধরেই তাঁর নায়িকাকে সামনে নিয়ে এলেন। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লেনিনকে এবং যুদ্ধের বাড়বানল ভেদ করে মানুষের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির পতাকা নিয়ে বেরিয়ে আসা সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে খাপের মধ্যে তাঁর বিবেকের তরবারিকে মজুদ রাখলেন ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লে তা দিয়ে কোন রকম বিচ্যুতিকে আঘাত করার জন্য। কোন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে একটা না বললেও তার এ ধরনের অভিনন্দন ও সমালোচনার বক্তব্য নিয়ে বই ছাপা হলো এবং সে বই-এর নাম 'আমি ক্ষান্ত হবনা'। তিরিশের দশকে উপন্যাস শিল্পীদের বিপ্লবাত্মকভাবে গণমুখী হতে এ বই সাহায্য করেছে।

আঁরি বারবুসে তাঁর দুটি উপন্যাস 'অগ্নিবরিষণে' এবং 'আলোক' লিখে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েকটি বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফরাসি ঔপন্যাসিকদের একজন হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব তিরিশের দশকেও ছিল গভীর। রালফ্ ফক্সের 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' থেকে তিরিশের দশকের ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে বারবুসের নাম নেই। কিন্তু ১৯৩৫ সালে আঁরি বারবুসের মৃত্যু হলে রালফ্ ফক্‌স্ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন, আঁরি বারবুসেই তিরিশের দশকের গণসমাবেশের প্রাথমিক জয়লাভকে সম্ভব করেছিলেন। রালফ্ ফকস্ তাঁর এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধেই বারবুসের উপরোক্ত দুটি উপন্যাসের ঐতিহাসিক যুদ্ধবিরোধী তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং জানান যে, 'মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বারবুসে একটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছিলেন; মানুষের ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত রকম মানবীয় সম্পর্কের পটভূমিতে বর্তমানে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে উদঘাটিত করতে চেয়েছিল এ বই।' এ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি, বারবুসে তিরিশের দশকেও উপন্যাসের শিল্পরূপে একটা নতুনতর পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ফ্রান্স আর তার বিপ্লবী নগরী হিটলার-বাহিনীর করায়ত্ত হয়। বারবুসের উপন্যাসের

পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয়েছে কিনা, তাই বা কে জানে। যদি পাওয়া যায় এবং যদি এ বই বিশ্ববাসী পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছে তাহলে ভবিষ্যতেও উপন্যাসের শিল্পরূপে বারবুসের পরীক্ষা একটা সঞ্জীবক উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

আঁরি বারবুসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে মৃত্যু ধ্বংস ক্ষুধা ও যন্ত্রণাবাহী কামানের গোলা আর রাইফেলের গুলির ঝাঁকের অগ্নিবরিষণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্ত রকমের অন্ধ হত্যাকাণ্ড আর অপচয় ও নির্বুদ্ধিতা পশুত্বকে সচক্ষে দেখে লিখেছিলেন তাঁর দুটি উপন্যাস 'আলোক' এবং অগ্নিবরিষণে'।

'আলাক' উপন্যাসে বারবুসে কিছুটা ভাববাদী আর গীতিকবিজনোচিত ভাবে সুমিত।

'অগ্নিবরিষণে' উপন্যাসে তিনি মহাকাব্যিক অজস্র বাস্তবের কথাশিল্পী। সাম্রাজ্যবাদী প্রথম মহাযুদ্ধের চোখ–খেকো ধ্বংস ও হত্যালীলার যে রূঢ় নিরাবরণ বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, এরিক মারিয়া রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' অথবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস' অথবা ডস প্যাসেজের '১৯১৯' উপন্যাসের কিংবা শলোকভের ধীরে বহে ডন' উপন্যাসের প্রথমাংশ। শিল্পরূপের প্রযোজনায় এই সবকটি উপন্যাসই মহাকাব্যিক বাস্তববাদের বিভিন্ন কোণ থেকে কিংবা কোণের দিকে উপস্থাপিত। সমগ্র সত্যের বিস্তৃত আধার উপন্যাস ছাড়া এত বিভিন্ন কোণ থেকে দেখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক গতিপরিণতিকে ধারণ করা অন্য কোন শিল্পরূপের পক্ষেই সম্ভব ছিল না, এই বই গুলি সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। সত্য রূপের এই সূর্যমালার মধ্যেও বারবুসের 'অগ্নিবরিষণে' তার অদ্বিতীয়তা নিয়ে জেগে রয়েছে।

আঁরি বারবুসে তাঁর এই উপন্যাসের শেষের দিকে রণক্ষেত্রে খোলা আকাশের তলায় বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেওয়া তলিয়ে যাওয়া যুধ্যমান মুখোমুখি জার্মেন এবং ফরাসি ট্রেঞ্চের সৈনিকদের মেলামেশা এবং আলাপ আলোচনার যে মহাকাব্যিক ছবি এঁকেছেন তা বেরিয়ে এসেছে উপন্যাসের অভিজ্ঞতার বাস্তব গতিপ্রবাহ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেনিনের আহ্বান যে একান্ত বাস্তব ভিত্তিক ছিল, তার প্রমাণ এই উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলি এবং রুশবিপ্লব। কারণ রুশবিপ্লব যখন সংঘটিত হয় তখন তার ভাবপ্লাবনে প্লাবিত হয়ে যুধ্যমান মখোমুখি রুশ ও জার্মেন ট্রেঞ্চের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল একই রকম। বারবুসের উপরোক্ত উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলি বিশ শতকের উপন্যাসের শিল্পরূপের বিপ্লবাত্মক প্রাণোপকরণ হিসাবে কেন যে খুব বেশি আলোচনার মধ্যে আসেনি, সেটা আশ্চর্যজনক। রালফ্ ফকস্ যে সুস্পষ্ট ইশারা দিয়েছেন বারবুসের উপন্যাস সম্বন্ধে, সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

বারবুসে চিরায়তিক উপন্যাসের শিল্পরূপের অন্যতম মূল উপাদান নরনারী-চরিত্রাবলিকে নিমজ্জিত করেন নি তাঁর গণপ্লাবনে। জনগণ একটা ঢালাও গলন্ত বস্তুপ্রতীক বা আত্মপ্রতীক নয়। তার জীয়ন্ত মুখচ্ছবি আছে এবং সেও লক্ষ লক্ষ মুখ। লক্ষ লক্ষ সাধারণ সৈনিকের প্রতীক হিসাবেই বুঝি বা তিনি ফরাসি সৈনিকদের একটি

দল বা গ্রুপকে বেছে নিয়ে তাদের বিভিন্ন চরিত্রের উপর সন্ধানী আলো ফেলেছেন। শিল্পীর এই দেখার এবং দেখাবার পদ্ধতি অনুবীক্ষণের। মানবতাবাদী অনুবীক্ষণের। এই পদ্ধতি চল্লিশের দশকে জাঁ পল সার্ত্রেকে যুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে 'পীড়িত হৃদয়ের (Iron in the soul) দ্বিতীয় অধ্যায় লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছে বলে মনে হয়। বারবুসের উপন্যাসের চরিত্রাবলি পুরোপুরি রক্তমাংসের প্রবৃত্তিবাহী মানুষ, আবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিপ্লবের চেতনায় সঞ্চারিত সংঘশক্তি।

আঁরি বারবুসে এদিক দিয়ে সম্ভবত মানবচরিত্র চিত্রণে সেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী পদ্ধতির অন্যতম পথিকৃত, যা সংঘ ও ব্যক্তির জীবনকে একই সঙ্গে পূর্ণ করে তোলার পক্ষপাতী, যা সোভিয়েট উপন্যাসে প্রধান বিপ্লবাত্মক প্রযোজক উপাদান হিসেবে শিল্পরূপের ক্ষেত্রে বিশ শতকের সদ্যোদ্ভিন্ন পদ্মকলি।

বারবুসে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের সেই ফরাসি শিল্পীদের একজন যিনি নবজাত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রুশ প্রজাতন্ত্রকে জানিয়েছিলেন নিঃশর্ত অভিনন্দন। তিনি রোমাঁ রোলাঁর থেকেও আরেক পা বেশি এগিয়েছিলেন এদিক দিয়ে। তিরিশের দশকে ফরাসি লোক অভ্যুদয়ে তাঁরা একই সঙ্গে শরিক হয়েছিলেন। তাঁরা যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক লীগ' স্থাপন করেছিলেন। ফ্রান্সের অতি জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্যারী নগরীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী গণশোভাযাত্রার পুরোভাগে তাঁরা দুজনে পাশাপাশি থাকতেন।

ফরাসি উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রমুক্ত বিকাশে এই দুই ঔপন্যাসিকের এ ধরনের কর্মোদ্যমের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

কারণ, চল্লিশের দশকের ফ্রান্সের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবাত্মক গণঅভ্যুদয়ের প্রাণোপকরণ নিয়ে যে তিনজন শিল্পী উপন্যাস রচনা করেছেন বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেই আলবেয়ার কামু, সার্ত্রে ও লুই আরাগঁকে পেয়েছি আমরা গণঅভ্যুদয়ের আয়োজকরূপেও। উপন্যাস তাঁদের প্রত্যক্ষ লব্ধ অভিজ্ঞতার রসায়নে রসায়িত এবং ঢালাই করা।

জাঁ পল সার্ত্রেকে উপন্যাস শিল্পের পুনরুজ্জীবকের ভূমিকা দিতে যাওয়া অবশ্য একটি সমস্যা বিশেষ। কারণ, অতীতের শিল্পরূপসম্ভার যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, তা সার্ত্রের মতে 'বাসি ফুলের মালা'। তাছাড়া এই সেদিন রেখে আসা উনিশ শতকের দুই দিকপাল ঔপন্যাসিক মোপাসাঁ এবং 'মাদাম বোভারী' প্রণেতা ফ্লবেয়ারকে তিনি যেভাবে কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর 'সাহিত্য কি' গ্রন্থে তাতে সায় দিতে গেলে, উপন্যাসের শিল্পরূপের বিকাশের সোপানগুলিকে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে ফেলে দিতে হয়।

তবে তিরিশের দশকের শেষের দিকে উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন বলেই অন্তত পক্ষে আঁরি বারবুসের বৈপ্লবিক সংস্পর্শের আঁচ তাঁর গায়ে রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সার্ত্রে অবশ্য তাঁর বিশেষ দার্শনিক মতবাদ 'অস্তিত্ববাদ' (এক্সিস্টেনসিয়ালিজম) দ্বারা তাঁর উপন্যাসকে মূলত সঞ্জীবিত করেছেন, এটাই সাধারণ ধারা। মৃত্যু যেখানে

মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সংগ্রাম প্রচেষ্টাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করতে চায় সেখানে এই অর্থহীনতাকে অর্থময় করে তুলতে পারে একমাত্র মানুষের স্বাধীনতার বিদ্রোহ, এই দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রে সার্ত্রের উপন্যাসের চরিত্রাবলিও গাঁথা। তবু সার্ত্রে উপন্যাস লিখতে বসে উপন্যাসই লিখেছেন, দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক বই লেখেন নি। অষ্টাদশ উনিশ শতকীয় উপন্যাসের শিল্পরূপ যে তিনটি উপকরণ নিয়ে জন্মেছে এবং গড়ে উঠেছে, তাদের প্রত্যেকটিই তাঁর উপন্যাসে বর্তমান। তাঁর মানব মানবী চরিত্রাবলি পূর্ণাবয়ব রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর চরিত্রাবলি বহির্বাস্তব ঘটনাবলিতে আশ্রিত। তিনি গদ্যমহাকাব্য লিখেছেন, তবে কৌতুক (irony) তাঁর চতুর্থ উপকরণ নয়। তাঁর চতুর্থ উপকরণ ক্রোধ। অবক্ষয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে কোথাও মুচ্‌কি হাসি অথবা অট্টহাসি হাসা তাঁর পক্ষে যেন অসম্ভব। এদিক দিয়ে তিনি উনিশ শতকের উপন্যাস শিল্পী বালজাক কিংবা মোপাসাঁ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন।

একজন দক্ষ রূপকার এবং সুমিত ও অমিতের মাত্রারক্ষাকারী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ হিসেবে সার্ত্রে সামাজিক বাস্তবতা (social realism) এবং শিল্পীর স্বাধীন চিত্তের স্বচ্ছন্দ সমন্বয় ও পুনবিন্যাসের যে পথ দেখিয়েছেন, তা' বিশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপীয় উপন্যাসের মনঃসমীক্ষা-সঞ্জাত আনবিকীকরণ ও খণ্ডীকরণ কিংবা ধনতান্ত্রিক অবক্ষয়জাত বিভ্রমের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসার পথ। কতখানি চলা যাবে এ পথে সে সম্বন্ধে তর্ক হতে পারে। সার্ত্রে নিজে এ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা অথবা সুভাবনা করা দরকার মনে করেন নি হয়তো। কারণ তিনি বিভিন্নভাবে বলতে চেয়েছেন যে, শিল্পকলা যতক্ষণ তাজা থাকে অর্থাৎ শিল্পকলা একান্ত বর্তমানের রাগ দুঃখ যন্ত্রণা আনন্দকে যতক্ষণ বয়ে নিয়ে যায়, ততক্ষণই তার আসল দাম। তবু যারা উপন্যাসকে নিছক মনোময়তার পাতাল গহ্বর থেকে তুলে এনে আবার তাকে মহানদীর মতো প্রবাহিত করে দিয়েছেন জনগণের সংগ্রামী জীবনান্ত দিয়ে, তাদের একজন হচ্ছেন সার্ত্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাণ্ডারীদের তরফ থেকে শিল্পীর উর্ণনাভ প্রবৃত্তি এবং আত্মকণ্ডুয়নের অহমিকাকে যে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তাকে দমিয়ে দিতে পারে সার্ত্রের উপন্যাসের উদ্দীপনা। 'সাহিত্য কি' গ্রন্থে 'কেন লেখা' অধ্যায়ে সার্ত্রে লিখেছেন : 'বাস্তব জগতের যে স্বরূপ তা একমাত্র সংগ্রামে বা কাজের মধ্যদিয়েই উদ্‌ঘাটিত হয়, কারণ পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে জগতকে অতিক্রম করে গিয়েই তার মধ্যে নিজেকে অনুভব করা চলে। এই জন্য ঔপন্যাসিকের জগৎ যদি অতিক্রমণের চলমানতার মধ্যে আবিস্কৃত না হয়, তাহলে তার গভীরতার অভাব ঘটবে।'

সার্ত্রে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রাবলি এবং তাদের কর্মভূমি বা বাস্তব আশ্রয় বা জগৎকে স্বীকৃতি দেবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাস্রোতকেও যেভাবে উৎসারিত করেছেন, তাতে মনোবাস্তবতা, বহির্বাস্তবতা ও ভাবলৌকিকতাকে শিল্পরূপের মধ্যে সমন্বিত করার সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সার্ত্রে তাঁর শিল্পরূপে গদ্যকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন এবং বলেছেন যে, তিনি সেই গদ্যের পক্ষপাতী যা কাচের মতো স্বচ্ছ, যা' বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, যা' প্রতিনিয়ত সজীব, যা' ঘোলাটে প্রবাহ নয়।

সে জন্য তাঁর নায়কদের চিন্তাস্রোতও রহস্যময় কতকগুলি ভাবপ্রতীকের সারি কিংবা নিছক প্রবৃত্তিবাহী হয় নি। সার্ত্রে'র 'স্বাধীনতার পথ'–বর্তমান শতকের চল্লিশের দশকে ফ্রান্স যে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হলো এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলো, তার মহাকাব্যিক ঘটনাবলির পটভূমিতে লেখা। প্রথমত, সার্ত্রের এই তিনখণ্ডে লেখা মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রথম দুটি খণ্ড–'প্রাজ্ঞ হবার বয়স' এবং বাঁচোয়াকে' 'পীড়িত হৃদয়' নামক তৃতীয় খণ্ডের ঘটনাবলির ব্যাপকতা ও গভীরতাকে বুঝতে পারার দুটি ধাপ বলে মনে হতে পারে। প্রথম দুটি খণ্ড সংকটের পূর্বাহ্ণ। তৃতীয় খণ্ডটি সংকট ও প্রতিরোধের সূত্রপাত। 'স্বাধীনতার পথ' উপন্যাসের সামগ্রিক নায়ক ম্যাথু দর্শনের শিক্ষক। কিন্তু 'পাড়িত হৃদয়' উপন্যাসে পৌঁছে দেখা যায় ম্যাথু তারই বন্ধু কমিউনিস্ট সাংবাদিক নেতা ব্রুনেটকে ঘটনাবলির মূলকেন্দ্র ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ 'স্বাধীনতার পথ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র স্বাধীন চিন্তার দার্শনিক ম্যাথু শেষের দিকে কমিউনিস্ট সাংবাদিক নেতা ব্রুনেটকে প্রাধান্য দেবার পথ তৈরি করেছে তার শেষ সিদ্ধান্তে ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে ফ্রান্সের পরাজয়ের পরে। দুজনেই ফরাসি সেনাদলে যোগ দিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার পরে। দুজনেরই মৃত্যুসংগ্রাম চালিয়ে যাবার পথে স্বাধীনতাকে অর্থময় করে তোলার চূড়ান্ত প্রয়াসে। 'স্বাধীনতার পথ' উপন্যাস শেষ খণ্ডে পেয়েছে দুই বীরকে। একজন ম্যাথু, যে নিষ্ক্রিয় দার্শনিকতার স্বাধীনতাসত্তার তাগিদে নতুন চরিত্র পেল এবং হিটলারি বাহিনীদ্বারা পর্যুদস্ত ফরাসি বাহিনীর একটি সেনাদলের একজন হিসেবে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। দ্বিতীয় বীর হচ্ছে ব্রুনেট, যে যুদ্ধবন্দীদের একজন হিসেবে হিটলারের বন্দী শিবিরের দিকে ধাবমান মৃত্যুট্রেনের যাত্রী হয়েও সমস্ত বিপ্লবী সত্তাকে জাগরুক রাখলো। সে বুঝিয়ে গেল যে সে অপরাজেয় এবং জনগণের ফ্রান্সও অপরাজেয়।

'স্বাধীনতার পথ' উপন্যাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিবেচ্য এই যে, ম্যাথু চরিত্রের মধ্যেই সার্ত্রে নিজের দর্শনকে প্রতিফলিত করেছেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে ফ্রান্সের সামরিক পরাজয় আর আত্মসমর্পণের মূল কারণগুলিকে উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন, বিশেষ করে প্রথম দুইখণ্ডের ক্লান্তিকর চিন্তা, উৎকণ্ঠা, আর গতানুগতিক জীবনধারা প্লাবিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে, যার কেন্দ্রবিন্দু ম্যাথু। ব্যক্তিগত স্বাধীনসত্তার অস্তিত্ববাদী বিদ্রোহাত্মক দর্শনকে বুঝবার জন্য তৃতীয় খণ্ডে ম্যাথুকে বহুসংখ্যক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন করে দিয়েছেন লেখক এবং একারণেই 'প্রাজ্ঞ হবার বয়স' কিংবা 'বাঁচোয়া' নামক প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড কিছুতেই তৃতীয় খণ্ডে যাবার নিমিত্তের ভাগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। ম্যাথুর অবিশ্রান্ত চিন্তাস্রোতের বিবরণ মারফত এবং অত্যন্ত গতানুগতিক পরিবেশেও ব্যক্তিক সম্পর্ক ঘটিত ঘটনাকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুলে ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেই সার্ত্রে তার অস্তিত্ববাদী দর্শনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়ে নিয়েছেন। 'প্রাজ্ঞ হবার বয়স' নামক প্রথম খণ্ডে দায়িত্বহীন ও সুবিধাবাদী প্রেমের ব্যর্থতার কাহিনী রচনা করেছেন, 'বাঁচোয়া' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে দায়িত্বহীন ও সুবিধাবাদী রাষ্ট্রনীতির লজ্জাকরতার কাহিনী রচনা করেছেন এবং তৃতীয় খণ্ডে দায়িত্বশীল ও বৈপ্লবিক রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনবোধ বা মূল্যবোধ তৈরি করেছেন। প্রথম

খণ্ড 'প্রাজ্ঞ হবার বয়স' দর্শনের শিক্ষক ম্যাথুর ৩৬ বছর বয়সে পড়ার আত্মআবিষ্কার। এ বয়সটা সেই বয়স যখন মানুষ অবজ্ঞা থেকে প্রাজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হয় নানা রকমের পোড় খেয়ে। সম্ভাব্য একটি অবৈধ শিশুর জনক হওয়ার বিপত্তির সূত্র ধরে এসেছে এই প্রাজ্ঞতা।

দ্বিতীয় খণ্ড 'বাঁচোয়া' ফ্রান্সের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের দেউলিয়া দেশনীতির সুবিধাবাদী 'বাঁচোয়া', যা শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের উপর বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় নেমে আসাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। 'বাঁচোয়া' উপন্যাসের রয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী সৃষ্ট চরম বিভ্রান্তি ও অশন ব্যসন এবং আত্মসন্তুষ্টি। 'পীড়িত হৃদয়' হচ্ছে সময়মতো এবং সঠিকভাবে ব্যবস্থা না নেবার ফলে আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য প্রত্যেকটি বিবেকবান দেশপ্রেমিককে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার কাহিনী। এ যন্ত্রণা দেশপ্রেমিক এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্টের বিবেক যন্ত্রণা।

এখানে তৃতীয় খণ্ডের উপরেই কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। 'পীড়িত হৃদয়' উপন্যাসে শিল্পীর উপরোক্ত প্রযোজনা কিভাবে সাধিত হয়েছে সে সম্বন্ধেও এখানে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

'স্বাধীনতার পথ' উপন্যাসের স্থান ফ্রান্স ১৯৩৮-১৯৪০। বিষয় যুদ্ধ, আত্মসমর্পণ, প্রতিরোধ, লোক অভ্যুদয়ের মানসিক প্রস্তুতি। পাত্র-পাত্রী ফরাসি লোক সাধারণের বিভিন্ন স্তরের নরনারী। 'পীড়িত হৃদয়' উপন্যাসের সময় ১৯৪০। স্থান ফ্রান্সের রণক্ষেত্র, কিন্তু সেখানে ফরাসি বাহিনীর কর্তারা আত্মসমর্পণ করায় সেনাদলগুলি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। প্যারি নগরী হিটলারের সেনাবাহনীর দখলে চলে গিয়েছে। ফরাসি সেনাদলগুলি কেন্দ্রচ্যুত, লক্ষহারা, উৎক্ষিপ্ত। এই অবস্থায় উপন্যাসের দুটি ভাগ। প্রথমটিতে একটি ফরাসি সেনাদলের একটি গ্রুপ বা অংশ আত্মসমর্পণ করতে রাজী না হয়ে ম্যাথু নামক এক শিক্ষাব্রতীর নায়কতায় জার্মেন সেনাবাহিনীকে আঘাত করে এবং মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয়ভাগে হাজার হাজার ফরাসি সেনার যুদ্ধবন্দী হয়ে বন্দীশিবিরের দিকে চলার কথা। এর মধ্যেকার একটি গ্রুপ বা অংশের প্রতিরোধে সন্ধানী আলো ফেলেছেন সার্ত্রে। এই জিনিসটি ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে ব্রুনেট নামক কমিউনিস্টকেই ঘিরে। এই গ্রুপটি যে হাজার হাজার লক্ষ্যহারা তাড়িত নিপীড়িত যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা বিপ্লবাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চলেছে, তার ইশারা দিয়েই এখণ্ডের উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। প্রথম ভাগে আত্মসমর্পণের দৃশ্যের ওপর আলো ফেলার জন্যে রণাঙ্গনের বাইরের চিন্তাভাবনা করার মানুষের মনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে নেহাতই টুকরো টুকরো। দুটো ভাগই প্রধানত অসহায়তাকে কাটিয়ে ওঠার ছবি। প্রথমটির মাথার ওপরে খোলা আকাশ থাকতে থাকতে শত্রুকে হাতে যা আছে তাই দিয়ে আঘাত হানা। দ্বিতীয়টি বৃহত্তর আঘাত হানার জন্যে পিঞ্জরের মধ্যেও আয়োজন। দুই ভাগের দুই নায়ক। একভাগে ম্যাথু। আরেকভাগে ব্রুনেট (Brunet), ম্যাথুর চিন্তাস্রোত এবং ব্রুনেটের চিন্তাস্রোত–উভয়ই বিপ্লবাত্মক, বীরোচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবোচিত। জীবনের শত সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ কামনা বাসনা ইচ্ছার রং লেগে আছে এই চিন্তাস্রোতে। একান্ত মানবিক, কিন্তু বিবরমুখী বা গুহাশ্রয়ী নয়। এই দুটি গ্রুপ ফরাসি লোকসাধারণের

বিভিন্ন স্তর থেকে যে বিভিন্ন চিত্রাবলি নিয়ে গড়া, তাদের প্রত্যেকের সুস্পষ্ট গতিশীল ছবি রয়েছে উপন্যাসটিতে। মেহনতী মানুষও রয়েছে, বুদ্ধিজীবীও রয়েছে। যে বাস্তবকে বা বাস্তব ঘটনাবলিকে আশ্রয় করে চরিত্রাবলি সামনে এনেছে, তার বর্ণনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে সামাজিক বাস্তববাদী পুরোধা এমিল জোলার বেপর্দা বর্ণনাকেও কোন কোন জায়গায় হার মানিয়েছে। উপন্যাসের শিল্পরূপ যে সত্যকে উদঘাটিত করে, তা যে শ্লীলতা অশ্লীলতার ধার ধারে না, সেকথা সার্ত্রে তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। 'পীড়িত হৃদয়' উপন্যাসে আবার চরিত্রাবলি অধিকাংশই পুরুষ এবং এই কারণে এতে বাজারের অশ্লীল উপন্যাসের নারীদের নিয়ে লুকোচুরি খেলার কোন উপায় নেই। যৌন জীবনের যে ছবি আছে, সেগুলিও স্থির চিত্রের পাঁক নয়। কারণ জীয়ন্ত মানুষ তার যৌনভাবনায় নিবদ্ধ থাকতে পারে না। অথবা বলা চলে যে, পাঠক পাঠিকার মনকে উপন্যাসের ঘটনাবলি এবং নায়কদের চিন্তাস্রোত ঠেলে নিয়ে চলে যায় বিপ্লবাত্মক আয়োজনের দিকে। মানুষের স্বভাব ও ব্যবহারিক জীবনে লালিত্যময় অথবা পাশবিকভাবে তার যৌন তাড়না ও যৌন ভাবনা যতখানি জায়গা দখল করে আছে তাকে তার প্রাপ্য মাত্র দিয়েছেন শিল্পী। কিন্তু তার বেশি নয়। যেখানে বেশি হয়ে যায় অথবা বেশি করা হয়, সেখানেই যে কোন কাহিনী অশ্লীল হয়ে যায়, বিকৃত হয়ে যায়, জীবন বহির্ভূত হয়ে যায়, অবক্ষয়ের বাহক হয়ে দাঁড়ায়। সার্ত্রে অবক্ষয় মুক্ত সংগ্রামী শিল্পী।

উপন্যাসের শিল্পরূপের ব্যাপারে একটি মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করে রাখা যেতে পারে। যেহেতু মানব চরিত্র বা মানব জীবন বা মানব মনই হচ্ছে উপন্যাসের মূল উপাদান, এবং যেহেতু উপন্যাস যত বিস্তৃতি ও গভীরতায় প্রবেশ করেছে, ততই নরনারীর কর্মকাণ্ড ও চিন্তাস্রোতের বিস্তার ও গভীরতায় প্রবেশ করেছে সেহেতুই নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে আবরু রয়েছে, সেটাকে ঔপন্যাসিক ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়ে যে শিল্পীরা নরনারীর সম্পর্ক ঘটিত ব্যাপারে যা না করার কিংবা না ভাবার ব্যাপারে ফেরেস্তা, তাই তাদের কলমের মুখে উপন্যাস অনর্গল বেরিয়ে আসে। এমিল জোলার 'নানা', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' কিংবা শ্যামুয়েল বাটলারের 'ওয়ে অব অল ফ্লেশ' পড়ে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়। যে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' নিবন্ধ লিখে নারীকে দেহসর্বস্ব বলে মনে করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তার কলম থেকে 'চরিত্রহীন' বেরিয়েছে, কারণ নরনারীর তথাকথিত ভাল আধখানা কিংবা তিন চতুর্থাংশ নিয়ে আর যাই হোক উপন্যাস সৃষ্টি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নরনারীর চরিত্র চিত্রণে 'সু' এবং 'কু'র দ্বন্দ্বের নাম করে বাংলার পাঠক পাঠিকাদের সইয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন জীবনের সমগ্র রূপের বর্ণনাতে। অপরদিকে যে সব লিখিয়ে 'বই কাটতি'র জন্য ব্যবসাদারির উদ্দেশ্যে নরনারীর সম্পর্কের দেহগত দিকটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যধিক মাত্রায় পরিবেশন করেছেন, তারা মুছে গিয়েছেন উপন্যাসের শিল্পরূপের জগৎ থেকে। দ্বিতীয়ত যাঁরা নরনারী সম্পর্কের দেহগত সম্পর্ককে বাদ দিয়ে শুধু আত্মার কথা লিখেছেন, তারা যদি বা স্কুল কিংবা কলেজের পাঠপুস্তকে ধারণা পেয়েছেন, নির্বাসিত হয়েছেন তাঁরা জনসাধারণ থেকে।

জাঁ পল সার্ত্রে যেসব দার্শনিক নিবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি সেই মুষ্টিমেয় পাঠক পাঠিকার জন্য, যারা মানসিক ডন বৈঠক না করে নিবন্ধের অর্থোদ্ধারে সাহসী হয় না। অথচ তা যতখানি জগৎ দর্শন, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবদর্শন। সার্ত্রে বিন্দুমাত্র তাগিদ অনুভব করেননি এই লেখাগুলিকে রসায়িত করে পরিবেশন করার। দর্শন শাস্ত্রের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পারম্পর্য রক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গ দোলায় মানুষের মুক্ত পদক্ষেপ বা স্বাধীনতার কী অর্থ কী কার্যকরিতা থাকতে পারে সে সম্পর্কে সত্য সন্ধান করতে গিয়ে সার্ত্রে যখন উপন্যাসের শিল্পরূপ বেছে নিয়েছেন তাঁর 'পরশ পাথর' হিসেবে তখন সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে তাঁকে। উপন্যাসের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে এমন বই লিখতে হয়েছে, যা সহজ, যা ঘটনাবহুল, যা দৈনন্দিন কথোপকথন ভিত্তিক, যা মুষ্টিমেয়ের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে নিবদ্ধ নয়, যা অনেক জায়গায় বিদগ্ধজনের রুচিবিগর্হিত, যা ছাপাখানার শ্রমিক যেভাবে কথা বলে সেভাবেই বলা। যদিও 'পীড়িত হৃদয়' (Iron in the Soul) উপন্যাসের প্রথম ভাগের সাজানোর মধ্যে সামান্য ইচ্ছাকৃত জটিলতা রয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগের একশ কুড়ি পৃষ্ঠায় প্রায় কোন অনুচ্ছেদ না থাকায় জেমস জয়েসের ইউলিসিস উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে যায়, তবু সমস্তটাই অনায়াস পাঠ্য। সার্ত্রে হয়তো সব সময়ই খেয়াল রেখেছেন যে, তিনি গদ্য মহাকাব্য এবং বিশেষভাবে গণবীর চরিতকথা লিখেছেন। যা একান্ত বাস্তবভিত্তিক, যা লোকমানস থেকে উদ্ভূত এবং লোকায়ত। ক্ষুধার্ত যুদ্ধবন্দীদের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা মহাকাব্যিক সত্য। কমিউনিস্ট ব্রুনেটের যে বীরচরিতচিত্র তিনি এঁকেছেন এই পটভূমিতে তা দাভিঞ্চির মোনালিসার হাসির মতোই অমর হবার দাবীদার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বচ্ছ বর্ণনার মতোই পরিষ্কার।

'সার্ত্রের স্বাধীনতার পথ (Roads to freedom)' উপন্যাসমালার নামে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার প্রতিপাদ্যও প্রায় এক ধরনের যদিও তা নিবন্ধমালা এবং প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে লেখা। প্রায় একই ধরনের প্রতিপাদ্য নিয়ে এমিল জোলা লিখেছিলেন কয়লার খনির শ্রমিকদের সংগ্রাম ভিত্তিক 'জার্মিনাল' উপন্যাস। উপন্যাসের শিল্পরূপ শিল্পীর কাছ থেকে কি চায় এই তিনটি বইয়ের মিল অমিল মিলিয়ে দেখতে গেলেই বুঝতে পারা যায়। উপন্যাসের জন্য প্রয়োজন পূর্ণাবয়ব মানব-মানবী, তাদের দৈনন্দিন তুচ্ছতা, বীরত্ব, সুখদুঃখ, ক্লৈব্য, মিলনসংঘাত, যন্ত্রণা, সংগ্রাম, আনন্দ। এসব কিছুকে নিবন্ধের মধ্যে আনতে গেলে তা আর নিবন্ধ থাকবে না, উপন্যাস হয়ে যাবে।

উপরের কথাগুলিকে সামনে রেখেই আমরা সার্ত্রের সমসাময়িক ফরাসি ঔপন্যাসিক আলবেয়ার কামুর একটি বই নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। বইটির নাম 'প্লেগ'। মড়কের মুখে লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎপাদন এই উপন্যাসের উপজীব্য।

আলবেয়ার কামু সার্ত্রের মতই অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম ফরাসি প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন এবং বিশেষ করে বেপরোয়া মোটর চালনকালে তাঁর যে মৃত্যু হয়েছে সেটাও তাঁর জীবনদর্শনের একটা অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই আখ্যায়িত

হয়েছে অস্তিত্ববাদী মহলগুলিতে। ভাবটা অনেকটা যেন এই যে, ব্লাকবোর্ডের ওপর চকের সাদা দাগের মতো মানুষের জীবনের স্বাক্ষর আঁকা হয় মৃত্যুর বুকের ওপর।

আলবেয়ার কামুও জীবন মৃত্যুকে বিষয়বস্তু করে যে মানব দর্শন সম্বন্ধে নিবন্ধমালা লিখেছেন, তা সহজপাচ্য নয়। কামুর নিবন্ধমালার রচনাশৈলীতে সার্ত্রের অধ্যাপকোচিত দার্শনিক পরিভাষার অজস্র প্রয়োগ নেই। কামুর অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন লোকায়ত দর্শনের ভাষায় লেখা। তবু দার্শনিক সত্য নির্ণয়ের জন্য ঈপ্সিত নিস্পৃহতা মৃত্যুর রসবৈরীতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কামুর বক্তব্যকে নিদারুণভাবে ঋজু করেছে। কিন্তু কামুই আবার সার্ত্রের মতো যখন উপন্যাস লিখেছেন, তখন ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছেন। কারণ এখানে তাঁকে মানব-শিল্পী হতে হয়েছে। এখানে মৃত্যুর করালগ্রাসে দাঁড়িয়েও রসবৈরীতাকে পরিহার করেছেন তিনি।

'প্লেগ' উপন্যাসের পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো সাজানো পাঁচ অধ্যায়ের মাঝামাঝি জায়গা ছাড়িয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে সবটাই মহামারীর মৃত্যুলীলার একটানা বর্ণনা, সেখানে ঔপন্যাসিক বলেছেন, সমস্ত বর্ণনাটাই একান্তভাবে বিষয়ানুগ; এখানে শিল্পশৈলীগত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য কোন রদবদল করা হয়নি। কিন্তু একথাটা শিল্পীর বিনয়েরই অভিব্যক্তি। 'প্লেগ' উপন্যাস শিল্পরূপের দিক দিয়ে অনন্যতা দাবী করতে পারে।

তবে সার্ত্রের উপন্যাসের সঙ্গে কামুর উপন্যাসের প্রভেদ আছে : কামুও বিশেষ দুটি চরিত্রের মাধ্যমে, অর্থাৎ দুই নায়কের চিন্তাস্রোতের মাধ্যমে সমস্ত কাহিনীটিকে উন্মোচিত করেছেন। কিন্তু এতে কোন দল বা গ্রুপের অবতারণা করেননি তিনি। যদিও দুই লক্ষাধিক নাগরিক অধ্যুষিত ওরান বন্দরে প্লেগ মহামারীর মৃত্যুলীলাকে পটভূমি করে একটা গোটা নগরীর হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে, তবু এই দুই নায়কের সঙ্গে আরও পুরুষ-চরিত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধি সৃষ্টি করেছে মাত্র। দুই নায়কের একজন ডাক্তার, দ্বিতীয়জন হচ্ছে একজন স্বেচ্ছাসেবী–সে এক প্রাক্তন সমাজ বিপ্লবী। এদের পরিধির অন্তর্ভুক্ত চরিত্রাবলির মধ্যে একজন মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি, একজন সাংবাদিক, একজন ধর্মযাজক, একজন পলাতক খুনী আসামী। কোন প্রত্যক্ষ নারীচরিত্র নেই। ডাক্তার, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী এবং সাংবাদিকের স্ত্রীরা মহামারী পীড়িত নগরীর বাইরে, যদিও প্রত্যেকের চিন্তাস্রোতে এরা ফিরে ফিরে আসে। ডাক্তারের মায়ের উপস্থিতির কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। এ অবস্থায় এমন কোন নরনারী সম্পর্কিত 'রসঘন' ঘটনা ঘটতে পারেনি, যা উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত এবং যা সার্ত্রের উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে প্রকাশকদের তরফ থেকেই প্রচারিত হয়েছে যে, এটি একটি রূপক। ফরাসি অধ্যুষিত আলজিরিয়ার ওরান বন্দর-নগরীর প্লেগ-আক্রান্ত অবস্থা আসলে হিটলারের জার্মেন বাহিনী কর্তৃক পদানত ও অবরুদ্ধ বন্দীদশা। বিচ্ছিন্ন ওরান নগরীর মতোই নির্বাসিত অবরুদ্ধ ফ্রান্সের নাগরিকবৃন্দ। এত মৃত্যু কখনো দেখেনি কেউ। ঘরে ঘরে মৃত্যু। এই সংকট আর দুর্বিপাক আর বন্দীদশার মধ্যে সাধারণ অস্বস্তির মধ্যে থেকে ক্রমে ক্রমে জেগে উঠেছে

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংগ্রামী স্বেচ্ছাসৈনিকেরা। তারপর একদিন অবরোধ মুক্তি। অবসান হয় বিচ্ছিন্নতার, স্বস্তি ফিরে আসে।

কিন্তু প্রশ্ন আসে। ওরান নগরীর প্লেগ মহামারীর যে বর্ণনার ভিত্তিতে উপন্যাসটি লেখা, তা একটি সমসাময়িক ঘটনা। প্রথমে কয়েকটা রক্তবমি করা ইঁদুর মরা থেকে কি করেই বা স্তূপে স্তূপে ইঁদুর মরার মধ্য দিয়ে প্লেগ এল আর নিয়ে এল মানুষের জন্য মড়ক আর লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিভাবে ঘটলো–এ সমস্ত কিছুর বর্ণনাতে কোন ফাঁক নেই। সমস্ত উপন্যাসটি যেন একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক দলিল। প্রধানত একজন ডাক্তারের জবানবন্দীতে বেরিয়ে এসেছে এই বর্ণনা, যদিও যাতে বর্ণনা একঘেয়ে না হয়ে যায়, সেজন্যে প্রাক্তন সমাজ বিপ্লবীর জবানবন্দী বুনে দেওয়া হয়েছে মাঝে মাঝে। অণুবীক্ষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা বাস্তব মড়কের বর্ণনা এটি। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন এই যে, পরপদানত অভিশপ্ত জীবনকে দেখাতে গিয়ে শিল্পীর হাত থেকে কেন এই আলেখ্য বেরিয়ে এল মড়কের সত্য চিত্র? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হিটলারের জার্মেন বাহিনীর অবরোধে রক্তাক্ত শ্বাসরুদ্ধ ও নিষ্পেষিত থাকার সময় হয়তো রূপকের প্রয়োজন হতে পারতো ফ্রান্সের অভিশপ্ত জীবনকে অভিব্যক্ত করার ব্যাপারে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে, রাহুমুক্ত ফ্রান্সে কী প্রয়োজন পড়লো রূপকের? ছন্দভাষায় ছদ্মাবরণে কথাবলার কি প্রয়োজন ছিল?

এই প্রশ্নের প্রথমটির উত্তর এই যে, পরপদানত ফ্রান্সের বন্দীদশার যন্ত্রণাকাতর দিনগুলির ছবি আঁকার জন্যে আলবেয়ার কামু যে ওরান নগরীর প্লেগ মহানগরীর বিকল্প ঘটনাকে রূপক হিসাবে নির্বাচিত করেন তার সমগ্র সত্যরূপে উপন্যাস-শিল্পী হিসাবে তিনি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, উপন্যাসটি তার রূপককে করে তোলে একান্ত জীবন্ত বাস্তব। দ্বিতীয় প্রশ্নটির সম্ভাব্য জবাব এই যে, প্লেগ মহামারিতে আক্রান্ত ওরান মহানগরীর বাসিন্দাদের মনোভাবের সঙ্গে পরপদানত ফ্রান্সের বাসিন্দাদের মনোভাবের এমন মিল খুঁজে পান তিনি, যা দার্শনিক হিসেবে নয় শুধু, মানবশিল্পী হিসেবেও আকৃষ্ট করে। বন্দীদশা সম্বন্ধে অস্বস্তি সত্ত্বেও ফ্রান্সের জনজীবনের গড্ডালিকা প্রবাহ এবং আমলাতান্ত্রিক ও ব্যবসাদারিক গতানুগতিকতা আলবেয়ার কামুকে ওরান নগরীর প্লেগ মহামারীর এই ধরনের ব্যাপার সম্বন্ধে সজাগ করেছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য সৈনিকদের মৃত্যুতুচ্ছকারী সংগ্রাম আলবেয়ার কামুকে প্লেগ মহারীর বিরুদ্ধে ডাক্তার ও তার সঙ্গীদের সংগ্রামের কথা লিখিয়েছে। তারপর মুক্তির পরে ফ্রান্সের জনগণকে আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে দেখে আলবেয়ার কামু অনুভব করেছেন যে, বন্দীদশা ও আত্মসমর্পণের মূল কারণগুলি মহামারীমুক্ত নগরীর বিবরে বিবরে প্লেগের সম্ভাব্য বীজবাহী ইঁদুরের মতো রয়ে গেল। একথাটা তিনি উপন্যাসের শেষের দিকে ডাক্তারের জবানবন্দী মারফত বলেও দিলেন, তবে প্রচ্ছন্নভাবে, কারণ মুক্তির পরে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত ফরসী গণমনকে তিনি সোজা কথাটা বলে হয়ত পীড়া দিতে চান নি।

এই দুটি জবাবের পরও যে আরেকটি বক্তব্য থেকে যায় সেটি এই যে, আলবেয়ার কামু তাঁর জীবনদর্শন বা মৃত্যুর প্রাচীরতলে মানবতার জীবনদর্শনকে ব্যক্ত

করতে চেয়েছেন। এই জীবন দর্শনকে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খতিয়ে দেখেছেন ফ্রান্সের বন্দীদশার সময় এবং একটা বাস্তব রূপকের আশ্রয়ে তাকে সুনিপুণভাবে সাজিয়েছেন, ফ্রান্সের সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিতর্ক থেকে তাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের শিল্পরূপেই আলবেয়ার কামু আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন, কোন বিশেষ বিপ্লবী মতবাদী হিসাবে তাঁর অন্যতম নায়কের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কেন সাধারণ মানবতাবাদী ধারাটাকেই কাম্য মনে করে নিয়েছিলেন। সে সময় আলবেয়ার কামুর পক্ষে বিপ্লবের পথ থেকে সরে আসার দার্শনিক কৈফিয়ত দেওয়া হয়তো সম্ভবপর ছিল না রূপকের মারফত ছাড়া।

কিন্তু এসব প্রশ্ন এবং জবাবের ওপর যে কথাটা সব চেয়ে বড় হয়ে জেগে ওঠে 'প্লেগ' উপন্যাসে, সেটা এই যে আলবেয়ার কামু শিল্পরূপের দিক থেকে মহাকাব্যিক গদ্যরীতির চিরায়তিক ধারাকে পুনরুদ্ধার করেছেন একটি সজীব ভিত্তিতে, রালফ্ ফকস কর্তৃক উল্লেখিত বিশ এবং তিরিশের দশকের লোক অভ্যুদয়মূলক ফরাসি উপন্যাসের ধারাতেই।

সার্ত্রে এবং কামুর উপন্যাসদ্বয়কে সমালোচকরা বলেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস, কারণ, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তারিখের ঘটনাবলির ভিত্তিতে এদের চরিত্রাবলির জীবন বিন্যস্ত। তবু আমরা বিশ শতকের পাঠক পাঠিকারা মনে করিনা যে এরা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, কারণ, এদের ঘটনাবলি এখনও একান্তভাবেই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমসাময়িক এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে চলমান এবং এখনও অনির্দিষ্ট বা সম্ভাবনায় এদের গতি পরিণতি। লুই আরাগঁ কিন্তু তাঁর 'পবিত্র সপ্তাহ' নামক উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের এমন সময়ে (১৮১৫ সালে) নিয়ে গিয়েছেন, যাকে আমরা অনেক আগে অতিক্রম করে এসেছি বলে মনে করি। সে দিক দিয়ে 'পবিত্র সপ্তাহ'কে পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

১৮১৫ সালের ফ্রান্সের এবং বিশেষ করে প্যারি নগরীর ঘটনাবলিকে নিয়ে লেখা এই 'পবিত্র সপ্তাহ' উপন্যাস। নেপোলিয়ন যখন ভূমধ্যসাগরস্থ এল্‌বা দ্বীপ থেকে তাঁর প্রথম পর্যায়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ১৮১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফরাসি উপকূলে অবতরণ করে প্যারী নগরীর দিকে আসতে থাকেন, সেই সময়ের একটি সপ্তাহে প্যারীতে এবং প্যারীর বাইরে অভিজাত সমাজ, রাজকীয় বাহিনী এবং জনসাধারণের চাঞ্চল্যের পরিস্থিতির পটভূমিতে সৈনিকও ব্যালে নর্তকী থেকে শুরু করে গ্রাম্য কামারের চরিত্রচিত্রণটির বিভিন্ন অভিব্যক্তি স্থান পেয়েছে লুই আরাগাঁ এই উপন্যাসে। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু নরনারীর ব্যবহারিক জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনা সেই ঐতিহাসিক দিনগুলিতে যেভাবে বিন্যস্ত উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার ছবির পর ছবি রয়েছে এতে। সঙ্গে সঙ্গে ১৭৮৯-৯৫ সালের ফরাসি বিপ্লবের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি নেপোলিয়নের সময়ে কিংবা রাজতন্ত্রের সাময়িক পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিনগুলিতে চাপা পড়েছিল, তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সামনে এনে দিয়েছে এই উপন্যাস। শিল্পী পর্দা তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন ফরাসি বিপ্লবের গণমুক্তির চিন্তা ও সংগ্রাম কোন সময়েই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন এবং রাজতন্ত্রের প্রতিরোধ প্রয়াসের ঐতিহাসিক সংঘাতে বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এসেছে

বিপ্লবী জনগণের তরঙ্গ মথিত ফ্রান্স। ঘটানার চেয়ে সম্ভাবনা অর্থময়। উপন্যাসের সূত্ররক্ষাকারী এক চিত্রশিল্পী ঘোড়-সওয়ারের মন গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার নব দিগন্তে কীভাবে পৌঁছালো তার কাহিনী প্রথমদিকে কিছুটা চিত্রার্পিত হলেও পরের দিকে মহাকাব্যিক গতিপ্রবাহ পেয়েছে।

১৭৮৯-৯৫ সালের ফরাসি বিপ্লবের একপ্রান্তে ছিল সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার দাঁড়াবার জায়গা ধ্বংস করার চেষ্টা, আরেক প্রান্তে উদ্ভব হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ধ্যানধারণার। বিপ্লবী সাম্যবাদী ব্যাবুফপন্থীদের অনেকেরই ১৭৯৫-৯৬ সালে প্রাণদণ্ড হলেও তাদের চিন্তাধারা ফরাসি জনসাধারণের স্তরে স্তরে রয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই যখন নেপোলিয়ন এবং রাজতন্ত্রের সংঘর্ষের দরুন গণমনে গভীরতর উপলব্ধির প্রয়োজন পড়লো, তখন সেই সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা যেন ঝর্ণাধারার মতো উপ্‌চে উপ্‌চে পড়তে লাগলো। প্যারি নগরীর বাইরে গ্রামাঞ্চলে খোলামাঠে আধো গোপন ও আধো প্রকাশ্যভাবে গণবিতর্ক অনুষ্ঠানের যে বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে, তা' মহাকাব্যিক। এই গণ বিতর্কের ধারা যেন প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, শুধু ১৭৮৯-৯৫ সালের প্যারি নগরীর গণমনের আবেগের দাউ দাউ করে জ্বলে জ্বলে খাক হওয়া নয় আর, এবার গণমনের বিপ্লবী শিক্ষাগুলিকে নতুন জীবন-দর্শনে ঘনীভূত করার পালা। ফরাসি বিপ্লবের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে জনতা যা হারিয়েছিল এবং যা রাখতে পেরেছিল, তার পুনর্মূল্যায়ন এই 'পবিত্র সপ্তাহ' উপন্যাস। ১৮১৫ সালের প্রতিবিপ্লবী প্রাধান্যের এক ফাঁকে এইভাবে ফরাসি বিপ্লবের মূল্যায়ন খুবই অভিনব নিশ্চয়। ভিক্টর হিউগো এবং আনাতোল ফ্রাঁস১৭৮৯-৯৫ সালের ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘনাবলিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখেছেন। লুই আরাগঁর উপন্যাস এই ঘটনাবলিকেই অন্যভাবে প্রযোজিত করেছে।

শুধু তাই নয়। লুই আরাগঁ ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্পরূপে একটা নতুন উপাদানের সূত্রপাত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ঠিক পরেই ফরাসি বাহিনী যখন পরাজিত জার্মেনির ভূখণ্ডে অবস্থান করছে, তখন সেখানে এক মনোবাস্তববাদী কবি হিসেবে লুই আরাগঁ যা ভেবেছিলেন, তাকে সেতারের নতুন তারের মতো বেঁধে দিয়েছেন উপন্যাসের কাহিনীর অন্যান্য পুরানো তারের সঙ্গে। এইভাবে তিনি 'পবিত্র সপ্তাহ' উপন্যাসের সাতদিনের পরিধিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন দেড়শত বছরের চেতনার তরঙ্গরাশিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত ফ্রান্সের লোক অভ্যুদয়ের মহাকাব্যিক গীতিকবিতার রচয়িতা লুই আরাগঁ তাঁর উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক তথ্য সাজিয়েছেন, অনেকক্ষেত্রে সেগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হলেও অকাট্য। তাঁর এই উপন্যাসেও কোথাও কোন অসতর্ক মুহূর্তেও 'কাগুজে' হয়ে যায়নি। তাঁর কবি-জীবনের ভাবলৌকিকতা এবং কবিবিপ্লবী জীবনের মানবিক গতিময়ী বাস্তবতা উপন্যাসটিকে প্রতি মুহূর্তে সজীব করে রেখেছে।

তিরিশের দশকের লোক অভ্যুদয়ে লুই আরাগঁ রোমাঁ রোলাঁ এবং আঁরি বারবুসের পাশে জনতার মিছিলে সামনের কাতারে থেকেছেন। চল্লিশের দশকে হিটলারের জার্মেন বাহিনী যখন প্যারি নগরী দখল করে, তখন ফরাসি কমিউনিস্টরা যে সশস্ত্র

মুক্তিসংগ্রাম চালায় তাতে তিনি শরিক হন। চল্লিশের দশকে তিনি তাঁর একটি প্রখ্যাত কবিতায় লেখেন যে, ফ্রান্সের সংগ্রামীরূপ তাঁকে মহাকাব্যের মর্ম উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে, এই উপলব্ধি তাঁর কবিতা লেখার রীতি নববাস্তবতার নব উপাদান যুগিয়েছে। কিন্তু গীতিকবিতা যে বিস্তৃত বাস্তব, দেশ ও জগৎ ও কালের এবং লক্ষকোটি মানব মানবীর মুখচ্ছবি ও মনের চলমান ছবিকে স্থান দেবার ব্যাপারে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তাকে নিয়ে কি করবেন, এইটেই হয়তো তিরিশের দশক থেকেই শিল্পী হিসেবে লুই আরাগঁ চিন্তা করে এসেছেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্টদের নিয়ে তিনি এক মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখেছেন। উপ্যাসের শিল্পরূপে মহাকাব্যিকতার প্রয়োজনার ক্ষেত্রেও তিনি যে জীবনের সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে অভিনবত্বের পথিকৃত, তার প্রমাণ অবশ্য আমরা "পবিত্র সপ্তাহ" উপন্যাসেই পেয়েছি।

এই উপন্যাসের মধ্য দিয়েই আভাস পাওয়া যায়, শিল্পী-জীবনের প্রথম দিকে ব্যক্তি উপাদানের নিরঙ্কুশ মুক্তপ্রয়োগপন্থী লুই আরাগঁ গণমুক্তি সংগ্রামের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে স্বচ্ছন্দভাবে শিল্পরূপে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই উত্তরণে সহায়তা করেছে মার্ক্সীয় সাম্যবাদী দর্শন। মার্কস্‌বাদ যে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিবাদী বিপ্লবীদের গণজীবনের জয়গানে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছে, তাঁদের প্রতিভাকে নবনব সৃজনশীলতায় মঞ্জরিত করতে পেরেছে, লুই আরাগঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস তার প্রমাণ।

পঁচিশ

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা

উপন্যাসের শিল্পরূপকে রুশ সমাজতান্ত্রিক বা সোভিয়েট উপন্যাস নতুন কী দিয়েছে? চিরায়তিক উপন্যাসের ধারাকে এই উপন্যাসে কিভাবে প্রযোজিত করা হয়েছে? মনস্তাত্ত্বিকতাকে এই উপন্যাস কিভাবে নিয়েছে? সোভিয়েট উপন্যাস দিয়েছে একটি নতুন সংজ্ঞাও, যার নাম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা—এর তাৎপর্যটিই বা কি? এসব প্রশ্নের উত্তরগুলিকে একটি বক্তব্যে বিন্যস্ত করার আগে রাল্‌ফ ফক্‌সের সূত্রটা একবার ঝালিয়ে নেয়া দরকার। উপন্যাসের শিল্পরূপে অন্যতম সঞ্জীবক ধারা হিসেবে সোভিয়েট উপন্যাসের যোগাত্মক দিকটিকে সামনে আনতে গিয়ে রাল্‌ফ ফক্‌স তিরিশের দশকের ইংরেজি সাহিত্যের তুলনা দিয়ে লিখেছিলেন :

"ফরাসি বিপ্লব থেকে যে প্রবল প্রাণবেগ ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমসাময়িক কালের শিল্পীকল্পনাকে শক্তি যুগিয়েছিল এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থকেও প্রভাবিত করেছিল, সেই স্বাধীন সত্তাই সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎসারিত।" গণমুক্তির প্রাণবেগ বা স্বাধীনতা সত্তাকেই রালফ্‌ ফক্‌স্‌ সোভিয়েট উপন্যাসে বড় করে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। সোভিয়েট গদ্য মহাকাব্যকার শলোকভের লেখা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "শলোকভের বিপ্লবী নায়কেরা প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ আর ইচ্ছাশক্তিতে পরিপূর্ণ।"

রালফ্ ফক্স্ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সোভিয়েট উপন্যাসের এই একটি বৈশিষ্ট্যের উপর তীক্ষ্ণভাবে আলো ফেলেছিলেন সম্ভবত এ কারণে যে, সে সময়েও পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা সোভিয়েট উপন্যাসকে প্রধানত নস্যাৎ করে আসছিল এর মধ্যে স্বাধীনতা-সত্তা বা প্রাণবেগ নেই রব তুলে।

দেশে দেশান্তরে পুঁজিবাদী অবক্ষয় এবং বিকৃতি থেকে উপন্যাসের শিল্পরূপধারার মুক্তির একটা সুস্পষ্ট সম্ভাবনাকে তিনি সোভিয়েট উপন্যাসের এই স্বাধীনতা সত্তা বা প্রাণবেগের মধ্যে অভিব্যক্ত দেখেছিলেন। ১৯১৭ সালের সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের পরে তখন মাত্র দেড় দশক গত হয়েছে; সুতরাং সোভিয়েট উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশেষত্বটি তখনও প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে ছিল। এই বাস্তবকে সামনে রেখেই তিনি মুক্তির মূলমর্মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপরীতির বিন্যাসের ক্ষেত্রে তখনও ঘষামাজা চলছে বলে সোভিয়েট-রুশ উপন্যাসকে "যদিও এখনও মাত্র নতুন এবং অপরিণত" বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি 'আত্মসমালোচনা'ও করেন। 'উপন্যাস ও জনসাধারণ' গ্রন্থের 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বক্তব্য ও প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"সোভিয়েট উপন্যাসের কিংবা পশ্চিমী দেশগুলির বিপ্লবী লেখকদের লেখা উপন্যাসের কোনটিই যে সার্বিক বিকাশব্রতী জীবন স্রষ্টা ও আত্মস্রষ্টা মানুষের পূর্ণ চরিত্র চিত্রণে সফলকাম হয়নি, এটা স্বীকার করাই হবে শোভন আত্ম-সমালোচনা। ব্যতিক্রম ঘটেছে, তবে তা দুর্লভ। পক্ষে বলার মতো সর্বোত্তম যুক্তিও রয়েছে অবশ্য। রুশ গৃহযুদ্ধ, সমাজতন্ত্রী শিল্প নির্মাণ, কৃষকের জীবনে বিপ্লব, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অতি জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের কথাই ধরা যাক। এই ঘটনাবলি নিজে থেকেই এত বীরত্বপূর্ণ ও গভীর।

তাৎপর্য-পূর্ণ বলে প্রতীয়মান যে, লেখক মনে করে বসেন, এই সব ঘটনাকে শুধু মাত্র লিপিবদ্ধ করলেই এরা পাঠক পাঠিকাকে অভিভূত করে দিতে পারে। হতে পারে, মহত্তম হৃদয়াবেগের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এতে। কিন্তু এই হৃদয়াবেগ বস্তুত প্রথম শ্রেণীর ইতিবৃত্ত রচনা করেছে মাত্র। লেখকরা এ লেখা দিয়ে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করেন না, আমাদের চেতনা ও অনুভূতিশীলতাকে মূলত সম্প্রসারিত করেন না।"

রালফ্ ফক্সের লেখার উপরোক্ত দ্বন্দ্বাত্মক উদ্ধৃতি থেকে সোভিয়েট উপন্যাসের দুটি সত্য আমাদের সামনে আসে। একটি স্বাধীনতার নবঅরুণোদয়। আরেকটা নতুন বাস্তবতা নিয়ে শক্ত বোঝাপড়া। রালফ্ ফক্সের এই বক্তব্যকে, অবলম্বন করে এতে আরও আলো ফেলে আলোচনাটাকে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের প্রথম দিনগুলির দিকে তাকিয়েই স্তারিকোভা নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন :

"সাহিত্যে এ পর্যন্ত প্রয়োগ করাই হয় নি এমন বিভিন্ন শিল্পরূপাদর্শ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারা এবং সাধারণভাবে উপস্থাপনের ব্যাপারে এদের সঙ্গে খাপ খেতে পারে এমন সব রচনাশৈলীর তাগিদ সেদিন সামনে এসে দাঁড়ালো নতুন নতুন বিষয় এবং উপকরণ সঙ্গে নিয়ে। ফিদর গ্লাদ্‌কভ্, লিওনভ, মারিয়েটা শাগিনিয়ান, নিকোলাই

পোগোদিন, ভ্যালেন্তিন কাতায়েভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, পিওতর পাভলেঙ্কো এবং কনস্তান্তিন পস্তভস্কির লেখায় নির্মীয়মান সমাজতান্ত্রিক সমাজের নতুন সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল উপাদানগুলি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেল। এখানে অবশ্য মাত্র কয়েক জনেরই নাম করা যাচ্ছে। এরা সকলেই নতুনত্বের উদ্ভাবক, কারণ এরা সাহিত্যে এমন সব রূপকল্প এবং সমস্যা এনে হাজির করেছেন যেগুলি এযাবৎ পাঠকপাঠিকার চিত্তে শিল্পকলার বিষয়বস্তু হিসেবে অপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুতপক্ষে, চলতি সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ধারণা ও রুচিকে এরা কমবেশী পরিমাণে অতিক্রম করে এসেছেন, নতুন ধারণা ও রুচিকে সামনে এনেছেন। প্রামাণিক উপকরণ, দ্রব্যোৎপাদন সংক্রান্ত পরিভাষা এবং অর্থনৈতিক সংখ্যাচিত্রের ব্যবহারে স্বাভাবিকবাদের কিছুটা মাত্রাধিক্য কয়েকটি নতুন গ্রন্থে প্রকট হয়ে জেগে উঠেছে। কিন্তু এ দোষটা আসলে একটা খুবই নবাগত সাহিত্যের অগ্রজনোচিত সরলবিশ্বাসী দোষামাত্র, এর বেশি কিছু নয়। এই স্বাভাবিকবাদ তার ওতপ্রোত স্বচ্ছতা থেকে এবং বাস্তববাদ-নিহিত গভীর বিশ্বপ্রজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন।"

স্তারিকোভার এই মূল্যায়নেও দেখতে পাওয়া যাবে, সোভিয়েট উপন্যাসের সঞ্জীবক আবির্ভাবকে অযথা বাড়িয়ে দেখা হয় নি। তবে সোভিয়েট উপন্যাসের নতুন উপাদান সম্বন্ধে এখানে সুস্পষ্ট দাবী পাওয়া গিয়েছে। নতুন উপাদানের নিয়োজনে রূঢ়তার কথা স্বীকার করা হয়েছে, তবে সেজন্য একটা কৈফিয়তও দেয়া হয়েছে। এই নতুন উপাদান পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে স্পষ্টতর অবয়ব নিয়ে। সামগ্রিকভাবে সোভিয়েট উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ দিকটা পরিষ্কার হবে।

রাল্‌ফ ফক্‌স্‌ কিংবা স্তারিকোভা বিশ্লেষণাত্মকভাবে সোভিয়েট উপন্যাসের বিশেষত্বকে সামনে এনেছেন। সোভিয়েট উপন্যাস সম্বন্ধে প্রধানত উচ্ছ্বাসময় আবেগ প্রবণ বক্তব্যও আমরা পেতে পারি। এরকম একটা বক্তব্য এখানে পেশ করে রাখা যেতে পারে। বক্তব্যটা বলেছেন সোভিয়েট উপন্যাসের অন্যতম পথিকৃত ভ্যালেন্টিন কাতায়েভ। তিনি রুশ নিসর্গের বিস্তার ও গতিময়তার অন্যতম প্রতীক রাজহংসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন, এর একটি ডানা হচ্ছে রোঁমা রোলাঁ, আরেকটি ডানা ম্যাক্সিম গোর্কি। রোঁমা রোলাঁর প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ হচ্ছে বিশ শতকের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। ম্যাক্সিম গোর্কির কোন উপন্যাসের নাম না করলেও কাতায়েভের বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। গোর্কি বিশ শতকের গণউপন্যাসের পথিকৃত একথা সর্বজনবিদিত।

বিশ শতকের প্রথম পর্বের দুজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কাজের যোজনায় সোভিয়েট উপন্যাসকে এইভাবে উঁচু পর্যায়ে তুলে দেখানোর মধ্যে সোভিয়েট উপন্যাস শিল্পীর দেশপ্রেমিক বৈপ্লবিক গরিমার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই ভাবটি প্রণিধানযোগ্য। তবে এ বক্তব্যের মধ্যেই বিশ্লেষণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট উপন্যাসের একটা প্রধান বিশেষত্বে উপনীত হওয়া যায়। রোঁমা রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ হচ্ছে এক চির অশান্ত সঙ্গীত শিল্পীর জীবনের নব নব দিগন্তে একলা চলার অভিযান সম্পর্কিত বিস্তারিত কাহিনী। অপর দিকে ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাসের চরম রূঢ়

বাস্তবে নর-নারী নায়ক-নায়িকারা সর্বত্র মুক্ত আকাশের দিকে কোমল কিশলয়ের মতো সমবেতভাবে হাত বাড়িয়েছে। কাতায়েভের বক্তব্য এই যে, ব্যক্তি এবং সমষ্টি সোভিয়েট উপন্যাসে উড়ন্ত রাজহংসের দুটি ডানার মতোই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সহায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে বিপ্লবী বিশ শতকের বহু প্রয়োজনীয় এবং কিছুটা বিতর্কিত কাঠখোট্টা সত্যটাই কাতায়েব বলেছেন কাব্যিক উপমায় সুন্দর করে সাজিয়ে।

কিন্তু সোভিয়েট উপন্যাসের কথা এভাবে নরম এবং সুন্দর করে জানতে জানতেই আমরা আন্দাজ পাবো সেই রূঢ় ব্যতিক্রমের যেখানে সোভিয়েট উপন্যাসের অনন্যতা প্রথম থেকেই সূচীত হয়েছিল। সোভিয়েট বিপ্লবের ঝঞ্ঝায় জীবনের এবং সেই সঙ্গে শিল্পরূপের অনেক সূক্ষ্ম তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। এই ছেঁড়া তারগুলিকে জীবন এবং শিল্পরূপের বীণায় নতুন করে বাঁধতে কিছুটা সময় লেগেছে। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আসতে হয়েছে শিল্পীদের। তিরিশের দশকে পৌঁছে শিল্পরূপ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ নাম নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করার আগে বিপ্লবের আগুনে গলানো শিল্পরূপ থেকে বিভিন্নমুখী ছাঁচ নিয়ে কাজ করেন উপন্যাস শিল্পীরা। 'প্রোলেত কাল্‌ট' বা শ্রমিক শ্রেণীর রীতি পদ্ধতির শিল্পীরা গণজীবনের ধারাকে উপন্যাসের ছাঁচে লাভা প্রবাহের মতো বইয়ে দেন। লোহা আর সিমেন্ট হয় তাদের দুটি প্রতীক। শ্রমিকশ্রেণীর নরনারী প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। সব কিছুকে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে দেখা হয়। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল করণীয় ও মতাদর্শের বিচারেই সবকিছুর মূল্যায়ন করা হয়। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নর-নারীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল গৃহযুদ্ধ এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ আয়োজনের কর্মকাণ্ডে। সুতরাং একদিকে যেমন ভারী ভারী রাজনৈতিক সামাজিক সংলাপের মধ্যে সোভিয়েট নর নারীর দৈনন্দিন সুখদুঃখের ও মনমেজাজের অভিব্যক্তিগুলি আনুষঙ্গিকের মতো জড়িয়ে যায়, তেমনি উপন্যাসের শিল্পরূপ বহির্মুখী যৌথ ক্রিয়াকর্মে গম্ গম্ করতে থাকে। স্তারিকোভো সোভিয়েটের প্রথম দিকের যেসব ঔপন্যাসিকের নাম করেছেন, তাদের প্রায় সবাইকার লেখাই এই ধরনের কিছুটা অতিরিক্ত বহির্মুখী লেখা।

পুঁজিবাদী শিল্পবিপ্লবের প্রারম্ভিক যুগে সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া ধনবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আঠারো উনিশ শতকের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে প্রগল্‌ভ করে তুলেছিল। এটাও ছিল বিশুদ্ধ প্রচারেরই সমতুল্য। এমনিভাবেই সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হতেই ধনবাদ-বিরোধী সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশ শতকের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে প্রগল্‌ভ করে তুলেছে এবং এটাও বিশুদ্ধ প্রচারেরই সমতুল্য। উনিশ শতকের শেষে দিকের অথবা বিশ শতকের বুর্জোয়া ধনবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত ক্ষয়িষ্ণু উপন্যাসের অমানবিক ভাবকণ্ডুয়নের অনির্বচনীয়তার পাশে সোভিয়েট উপন্যাসকে তাই অত্যন্ত কর্কশ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এটা কোন দোষ হিসেবে গণ্য হতে পারে কি? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পরে কোটি কোটি মেহনতী মানব মানবীর কথা শিল্প হিসেবে সোভিয়েট উপন্যাস যদি

অন্য কোন রূপ নিত, তবে সেটাই কি অস্বাভাবিক হতো না? উপন্যাসের শিল্পরূপের মৌল উপাদান–তার আদি সত্তায়–মুক্তিমুখ মানবমানবীর জীবনের নবদিগন্তে বাঙ্ময় হয়ে ওঠা।

তবু প্রশ্ন এসেছে যে, সোভিয়েট উপন্যাস আঠারো-উনিশ শতকের উপন্যাসের তুলনায় অনেক বেশি প্রচারধর্মী হওয়ায় শিল্পরূপ ক্ষুণ্ন হয়নি কি? সরু মোটা তারের সমাহারে মোটা তারের প্রাধান্য ঘটায় সূক্ষ্মসুর চাপা পড়ে নি কি?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করলে এ প্রশ্ন থেকেই সংশয় না হয়ে সোভিয়েট দেশের বাইরেও নবজীবনের সত্যসন্ধানের নিরিখ হয়ে উঠতে পারতো। ইউরো-মার্কিন উপন্যাসের অবক্ষয়ের ধারার পক্ষপাতীরা সোভিয়েট শিল্পরূপে নবজীবনের উদ্দামতা ও প্রগল্‌ভতাকে শিল্পরূপ সম্মত বলে মেনে নিতে পারে নি। নিছক যৌন মনোবাস্তববাদী সর্পিল নরনারীর কাহিনী এদের কাছে উপন্যাসের শিল্পরূপের শেষ কথা। এই শেষ কথার পরে ভিন্নতর উপাদান ও নতুনতর প্রাণসম্পদকে এরা গ্রহণ করতে পারেনি। শিল্পরূপের দিক দিয়েও সোভিয়েট উপন্যাসের মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে সোভিয়েট এবং ইউরো-মার্কিন উপন্যাসের শিল্পরূপের তুলনামূলক আলোচনাও একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে নি। এ কারণে এ সূত্রে সোভিয়েট উপন্যাসের শিল্পরূপ ঢাকা পড়েছে অনেক সময়।

মোটা তারের প্রধান্যের এ প্রসঙ্গেই যে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে সেটা এই যে, প্রথমাবধি সোভিয়েট উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে যান্ত্রিকতার অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা সঠিক নয়। সোভিয়েট লেখকদের উর্দীপরা লেখক নামে অভিহিত করে এবং সোভিয়েট উপন্যাসকে হুকুম প্রিয় আমলাতন্ত্রের ফরমায়েসী লেখা বলে যে ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা বিভিন্ন পশ্চিমী মহল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও হয়েছে সেটা সত্যের অপলাপ। সোভিয়েট উপন্যাসকে ফরমায়েসী বলা সত্যের অপলাপ এই কারণে যে, সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে একথা অনস্বীকার্য হলেও সোভিয়েট উপন্যাস এদিক দিয়ে বরং আশ্চর্যভাবে মুক্ত। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণবাদী বিকৃতি ও অবক্ষয়ের প্রভাব কাটিয়ে গত তিনশত বছরে সমগ্র সত্যের আধার হিসেবে যে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিকশিত হয়ে এসেছে তাকে সোভিয়েট উপন্যাসের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, শিল্পীরা রূপকার হিসেবে যেটুকু নিয়ন্ত্রণ মেনেছেন, তাছাড়া অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ এই সব গ্রন্থে নেই। শলোকভের 'ডন নদীর গতি পথে' কিংবা এলেক্সি টলস্টয়ের 'ক্যালভারির পথে' বা 'অগ্নি পরীক্ষা' চিরায়তিক গদ্য মহাকাব্যিক ধারায় লেখা উপন্যাস। এই দুটি উপন্যাসের মূল নায়ক নায়িকারা শ্রমিক শ্রেণীর নরনারী না হলেও এখানে জীবনের চলচ্ছবি শ্লথ হয় নি। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে এই দুটি উপন্যাসের নায়কনায়িকারা প্রথমেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি এবং এই দ্বন্দ্বই উপন্যাসে ঘটনা ধারায় এদের জীবনযাত্রার সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। তবু সোভিয়েট উপন্যাসে শিল্পীরা তাঁদের নায়ক নায়িকাদের পূর্ণাঙ্গতাকামী মানুষরূপে উপন্যাসের সত্যের বলয়ে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করেন নি। শলোকভ যে গ্রেগর এবং আকসিনিয়ার দেহাত্মিক প্রণয়ের আলেখ্য এঁকেছেন তাঁর 'ডন নদীর গতি পথে' উপন্যাসে, তার তুলনা বিশ্ব

উপন্যাসে মানবমানবীর চরিতকথা চিত্রণে কদাচিৎ পাওয়া যায়। এমনিভাবেই আবার আলেক্সি টলস্টয় তাঁর 'ক্যালভেরির পথে' উপন্যাসে কাতিয়া রশচিন এবং দাশা টেলেগিনের যে মহাকাব্যিক প্রণয় এঁকেছেন তাঁও ভাবলৌকিক মহৎ উপন্যাসের ধারায় নতুন মৃত্যুঞ্জয়ী চরিতকথা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে।

সোভিয়েট উপন্যাসে মানব মানবী আর শিল্পীর স্বাধীন সত্তা যে খর্ব হওয়া দূরে থাকুক অবাধ বিস্তাতের মহামুক্ত দিগন্ত পেয়েছে, এই দুটি উপন্যাস তার প্রমাণ। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে লেখা পাস্তেরনাকের ডাক্তার জিভাগো উপন্যাস সোভিয়েট উপন্যাসের উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ চরিতকথা-চিত্রণ ধারারই একটি পরিণতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রাচ্য পাশ্চাত্যের স্নায়ুযুদ্ধের খোরাক হয়ে পড়ায়, পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই উপন্যাসকে ব্যবহার করার চেষ্টা করাতেই এই বইটির মূল্যায়নে ঘটেছে বিপত্তি। পাস্তেরনাক এবং সোভিয়েট শিল্পীরা যদি নিজেদের মধ্যে সোভিয়েট উপন্যাসের বিপ্লবাত্মক রূপরীতির সমগ্র সত্যের ধারাটিকে পুরোপুরি খতিয়ে দেখতে পারতেন, তাহলে 'ডাক্তার জিভাগো' বিড়ম্বিত হতো না। 'ডাক্তার জিভাগো' মহাকাব্যিক চিরায়তিক ধারায় লেখা উপন্যাস। এখানে শিল্পীর অজান্তেই মূল চরিতকথার আশে পাশে এমন সব নরনারী চরিতকথা উপচে পড়েছে, যাদের নতুনভাবে জানতে এবং বুঝতে চাইলে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যোগাত্মক দিকগুলিকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত দেখাবে। 'ডাক্তার জিভাগো' উপন্যাসের নায়কের মনঃস্রোতের পাশাপাশি মাঝে মাঝে অজস্র সংলাপের মধ্য দিয়ে বহু বক্তব্য এসেছে সাধারণ মানব মানবীর মর্মবাণী বহন করে, সেগুলি প্রযোজিত হয়েছে জীবনের দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতির পথে। সত্য রয়েছে এদের বক্তব্যের মধ্যে। সত্য শুধু ডাক্তার জিভাগোর সিদ্ধান্তগুলিই নয়। বিপ্লবের প্রতি ডাক্তার জিভাগোর বিকর্ষণের পাশাপাশি বিপ্লবের প্রতি কয়েকটি চরিত্রের আকর্ষণ শুধু পাস্তেরনাকের উপন্যাসটিকে নয়, সোভিয়েট উপন্যাসের বিপ্লবী চিরায়তিক ধারাকে বুঝবার পক্ষেও সহায়ক হতে পারে। যারা এদিকটাকে উপেক্ষা করে শুধু ডাক্তার জিভাগোর চারিত্রিক জীবনের উন্মোচনকে জানতে চেয়েছেন, তারা উপন্যাসের শিল্পরূপের সেই চিরায়তিক উপাদানটিকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন যেখানে মানব মানবী নায়ক-নায়িকারা বিস্তৃত জীবনের বহুজনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সোভিয়েট চিরায়তিক গদ্য মহাকাব্যিক ধারার উপন্যাসে সমগ্র সত্যের অনিয়ন্ত্রিত রূপায়ণে হচ্ছে সেই মূলধারা, যাকে রালফ্ ফক্স্ স্বাধীনতা সত্তার নব উত্তরণ বলে চিহ্নিত করেছেন, যদিও এই মুক্ত ধারাকে সমস্ত শিল্পী একইভাবে একই পরিমাপে ব্যবহার করেন নি।

এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক আমলের কাজগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের আমলে যে সব নিবন্ধ লিখেন, তাতে দেখা যাবে, তিনি 'শিল্পী ও গণ পাঠক পাঠিকার পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করলেও এই সংজ্ঞাকে ফরমায়েসী ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত রেখেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কি এমন ভাবলৌকিকতাকেও জীবনের সংগ্রামী দিকে নিয়োজিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে,

তিনি লেখা শিখেছেন ফরাসি স্তাঁদাল এবং বালজাকের কাছ থেকে। মহাবিপ্লবী তাত্ত্বিক লেনিনের অনুরোধে নরনারী চরিত্রের মুখর বিতর্কে সত্যকে নিকষিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

ম্যাক্সিম গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরের শিল্পরূপকে কোন বাঁধাধরা গৎ দিয়ে নির্দিষ্ট করতে প্রয়াস করেন নি। ১৯২৭ সালে তিনি গদ্য মহাকাব্যিক ধারায় তিনখণ্ডে 'ক্লিম স্যামঘিনের জীবন' নাম দিয়ে উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই বইটির বিপুলতা ও সূক্ষ্মতার সমাবেশের তুলনা বিশ্ব উপন্যাসে বিরল। সমসাময়িক সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক জীবন নিয়ে লেখা না হলেও এবং বিশেষ করে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের গতি পরিণতিই এর বিষয়বস্তু হলেও, 'ক্লিম স্যামঘিনের জীবন' মেহনতী জনগণকে যুগস্রষ্টা বলে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সোভিয়েট উপন্যাসের দিগন্ত ব্যস্ত সমস্ত শিল্পীদের হাতে তুলে দিয়েছে কম্পাসের কাঁটা।

ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর কয়েকটি গণবাস্তববাদী উপন্যাস মারফত বিপ্লবের আগেই জীবনের পরিপূর্ণ রূপ বা সমগ্র সত্যকে উদঘাটিত করেছিলেন। বিপ্লবের পরে 'ক্লিম স্যামঘিনের জীবন' লিখে তিনি সোভিয়েট শিল্পীদের সামনে এই দৃষ্টান্ত রাখলেন যে, উপন্যাসের শিল্পরূপ চায় জীবনের সামগ্রিক সত্যকে, যাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর স্বাধীনতার সত্তা আর আয়ত্ত করা এবং পরিবেশন করা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়াতে যে ইতিহাসের ধারা থেকে দ্বন্দ্বাত্মক গতিপথে উঠে আসে, তার মধ্যে অনেক সংশয় ছিল, অনেক তাড়না ছিল, অনেক ব্যভিচার ছিল অনেক তিক্ততা ছিল। গোর্কী এই সব কিছুকেই সোভিয়েট সমাজের শিল্পী ও পাঠক পাঠিকাদের সামনে উপস্থিত করতে দ্বিধা করেন নি। এটা হয়তো ইশারা হিসেবেই কাজ করেছে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক জীবনে নিয়োজিত কোটি কোটি নরনারীর মনে অতীতের যে ক্লেদ থেকে গিয়েছিল তাকে উপন্যাসে উদঘাটিত করে দেখানোর জন্যে।

অতীতের ক্লেদ ও মোহ ছড়ানো যে সহজ কথা নয়, সে কথা ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর উপন্যাসের রূঢ় বাস্তবতার অবতারণাতে রেখেছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও। শিল্পরূপের একটি প্রধান বিশেষত্ব সমগ্র সত্য। এ কথাটা সাম্যবাদী সমাজের কল্পনাকারীরা ভুলতে পারেন না।

ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েট শিল্পীদের শুধু উপন্যাস রচনার সংজ্ঞা দিয়ে প্রশিক্ষিত করেন নি, তিনি নিজে উপন্যাস লিখে দেখিয়েছেন, সোভিয়েট উপন্যাসও কোন পথে চলবে যেহেতু তা উপন্যাস।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে গোর্কি নিয়ে এসেছেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রূপসৃষ্টি জন্ম দিয়েছে তত্ত্বের, তত্ত্ব থেকে রূপসৃষ্টি প্রসূত হয় নি। বিপ্লবের পরে দশ বছরের মধ্যে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা, বহু একক প্রয়াস ও বহু গোষ্ঠীর প্রয়াসের ফলশ্রুতি এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা সমস্তরকম বাস্তবতারও একটা পূর্ণ সচেতন পরিণতি–সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মেহনতী জনগণের মুক্তির বাস্তবতা।

গত দুই তিন শতাব্দীতে উপন্যাসের শিল্পরূপে বাস্তবতাকে পাওয়া গিয়েছে একটি মূল উপাদান হিসেবে। এই বাস্তবতাকে অভিহিত করা হয়েছে 'সত্য চিত্রণ',

'সামাজিক বাস্তবতা', এবং 'মনোবাস্তবতা'র নামে। এই বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবতার কোথাও কোথাও যদিবা স্থবিরতা অথবা বিকার ঘটে থাকে, সাধারণভাবে এরা সৃজনশীলতারই পরিচয় দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাতে ইতিপূর্বেকার সমস্ত বাস্তবতা উত্তীর্ণ হয়েছে এক বিপ্লবাত্মক সৃজনশীলতায়। একথা প্রমাণিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পরূপে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে সোভিয়েট ঐতিহাসিক উপন্যাস। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, এলেক্সি টলস্টয়ের 'প্রথম পিটার' উপন্যাসটির পরিপ্রেক্ষিত চিত্র আমাদের সামনে এক বিশাল নদীপ্রবাহের খাতের ছবিকে হাজির করে। এই ধরনের উপন্যাসকে সামনে নিয়েই জনৈক সোভিয়েট তাত্ত্বিক সোভিয়েট ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অনন্যতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পঞ্চাশের দশকে যে দাবী করেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য :

'সোভিয়েট উপন্যাস এমন একটা যুগে বিকশিত হচ্ছে যখন সম-সাময়িক ধনতান্ত্রিক সাহিত্যে ঐতিহাসিক লেখা চূড়ান্ত অবনতির পথে নেমে এসেছে, প্রকট হয়ে উঠেছে তার শিল্পকলাগত দারিদ্র্য। স্বাভাবিকতাবাদ ও বহিরঙ্গবাদ ও আঙ্গিকতা আধিপত্য করেছে এতে। ধনতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকরা জানিয়ে শুনিয়েই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের মনস্তত্ত্ব ও মনোভাবকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে নিচ্ছেন, ইতিহাসের যা কিছু উন্মার্গগামী মনের পরিচায়ক তাতেই বিমর্ষ মনের কৌতূহল ঢালছেন। অপর পক্ষে সোভিয়েট ঐতিহাসিক উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার মূল নীতিগুলি অভিব্যক্ত হয়েছে। সোভিয়েট লেখক যখন ইতিহাসের মুখোমুখি হন, তখন তিনি ঘটনাবলির নিরপেক্ষ ইতিবৃত্তকার সাজেন না। সোভিয়েট লেখক ইতিহাসের গতিধারার বিধানগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করতে সচেষ্ট হন এবং তীব্রতর করে তোলেন সেই প্রগতিশীল চলকশক্তিসমূহকে যাদের বিকাশ ও সাফল্যের পথে মেহনতী জনসাধারণের মুক্তির দিন এগিয়ে এসেছে।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যাবে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজের ছবির কারবারী নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা একটা শিল্পদৃষ্টি এবং শিল্পরীতি বা অতীতের যে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কিংবা বর্তমানে সমাজাতান্ত্রিক সমাজের বাইরে লোক সমাজের মুক্তির সংগ্রামের গতিপরিণতিকে চিত্রিত করেছে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আরেকটা ফলশ্রুতি হচ্ছে লেখকশিল্পী এবং ব্যাপক সংখ্যক পাঠক–পাঠিকার মিলনমঞ্চ হিসেবে উপন্যাসের সৃষ্টি। এখানে উপন্যাসের বাস্তবতাকে গড়ে তোলে গণপাঠক পাঠিকার তরফ থেকে জীবন নিয়ে লেখার তাগিদ। এখানে গণপাঠক–পাঠিকার উপন্যাসের চাহিদা গড়ে উঠে লেখক শিল্পীর সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব কর্মে, জীবন এবং সংগ্রামে। এখানে মধ্যবর্তী কোন মুনাফাবাজের টোপ নেই। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তৃতীয় ফলশ্রুতি হচ্ছে বহুজনোচিত ব্যক্তিচরিত্র এবং অসাধারণ ব্যক্তি চরিত্রের সমাহার। বিশেষ করে পশ্চিমা ইউরোপের উপন্যাসের জগৎ থেকে বেরিয়ে সোভিয়েট উপন্যাসের মৌলিকতা যাচাই করতে যাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বোধ হয় এই যে, সাধারণত সোভিয়েট উপন্যাসের একজন নায়ক বা

নায়িকা বহুজনের চারিত্রিক ছাঁচে ঢালাই করা। সোভিয়েট উপন্যাসে বহুজনোচিত ব্যক্তিচরিত্র বা প্রতিনিধিস্থানীয় টাইপ চরিত্রের ব্যবহার বেশি। তবে এই টাইপ বা প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের আশেপাশেই অনন্য চরিত্রের স্থান রয়েছে। এখানে পর্যায়ে পর্যায়ে বিপ্লবের অভিঘাতে বাস্তব জীবনটাই এমন গতিশীল হয়ে ওঠে যে, টাইপ বা বহুজনোচিত চরিত্র এক সময়ে অনন্য চরিত্রে তৈরি হয়ে যাবে। এই কারণে অনন্য চরিত্রেরও উৎস হিসেবে কাজ করে বহুজনোচিত চরিত্র। জাহাজ নির্মাতা শ্রমিকদের নিয়ে লেখা 'জু বিন বংশ' উপন্যাস এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এর মূল চরিত্র ইলিয়া মাতভিয়েইভিচ, যার চিন্তাধারাগুলি সীমিত হলেও সুচিত্রিত। একজায়গায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানবমানবীর অনন্যতার কথা বলা আছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে :

"যে ধাতুর চাংকে চুল্লীর মধ্যে ঢোকানো হয়, তার কথা মনে পড়ে যায় মাতভিয়েইভিচের। ধীরে, ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তা। উত্তাপ ধাতুর সবগুলি খণ্ডকে একলাফে আঁকড়ে ধরে না, সঞ্চারিত হয় একটা থেকে আরেকটায়। তারপর সমস্ত খণ্ড একটা অখণ্ড বস্তু হিসেবে ফুটতে থাকে, উপচে পড়ে যায়। এ চিন্তা মাতভিয়েইভিচকে আরও সামনে নিয়ে এল। ১৯১৭ সালের পর থেকে কয়েক বছরে যে মানব-ধাতু উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততম হচ্ছিল তা আজ ফুটতে এবং উপচে পড়তে শুরু করেছে। এ এমন এক ধাতুর গলন, যা পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব।" এও হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে গুণগত পরিবর্তনের বাস্তবতা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় এইভাবে একই সঙ্গে কোন একটি চরিত্রের বহুজন নেতা ও অনন্যতা সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রসারমান বৃত্তের মধ্যেই সম্ভাব্য বাস্তব। সোভিয়েট জীবনের বৃত্তগুলি সদাপ্রসারমান হওয়ার দরুন সোভিয়েট উপন্যাসের নরনারী-চরিত্রাবলি অনির্দেশ্যতায় ঠিকরে বেরিয়ে যায় না, কিংবা পিছনে পড়ে যায় না। সোভিয়েট উপন্যাসে মানব-ধূমকেতুরও কক্ষপথ আছে সত্যকার ধূমকেতুর মতো। বীর নায়ক ও বীর নায়িকাদের ভিত্তি করে বহুসংখ্যক সোভিয়েট উপন্যাস লেখা হয়েছে। এইসব বীর নায়ক ও বীর নায়িকাদের দৃঢ়সংবদ্ধ চরিত্র আছে, এরা একে আরেকের গায়ে ঢলে পড়েনি, মিশে যায় নি আনবিকীকৃত হয়ে অথবা ভাবের ঘোরে পরস্পরের সঙ্গে। নূরানভের 'চাপায়েভ', অস্ত্রোভ্‌কির 'ইস্পাত' কিংবা বরিস পলিভয়ের 'সত্যিকারের মানুষের গল্প' লিওনিদ লিওনভের 'সট' ও 'স্কুটারেভ্‌স্কী'—এরা সবাই দৃঢ়সংবদ্ধ চরিত কথা। এইসব চরিতকথা সবই গদ্য মহাকাব্য নয়, তবে এদের মধ্যে মহাকাব্যিকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু এরা উনিশ শতকের বিপ্লবী উপন্যাসের অনন্যতা থেকে স্বতন্ত্র।

সোভিয়েট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, অথবা ১৯৩৪-৩৫ সালে এবং এর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিংবা পরে, দুটি দমকে সোভিয়েট সাহিত্যে এসেছে রূপাবরণের ভাঙ্গাগড়ার বহুধার অস্থিরতা। সোভিয়েট কবিতার মতো সোভিয়েট উপন্যাসের রূপাবরণে হয়তো এই ভাঙ্গাগড়ার অস্থিরতা তেমন উত্তাল ও চঞ্চল হয় নি, কারণ উপন্যাসের চিরায়তিকতা তাল সামলেছে কবিতার তুলনায় অনেক বেশি। ঐতিহাসিক ও শ্রমিক উপন্যাসের শিল্পরূপসৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষাও ইতিপূর্বেকার কোন কোন রূপবৃত্তকে ভেঙ্গেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিপ্লবী গণজীবনের

বিশাল বৃত্তায়িত অগ্রগতির বহুজনের একীভূত প্রচেষ্টার দরুন রূপবৃত্তগুলি ছড়িয়ে পড়ে যায় নি।

দ্বিতীয়ত, একত্রিত নির্মাণ প্রয়াসের প্রাধান্যের দরুন প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও, উপন্যাসের চরিত্রাবলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ চেনা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ভিজে ন্যাকড়ার মতো প্যানপ্যানে হয়ে যায় নি।

'ইস্পাত' উপন্যাসের রচয়িতা অস্ত্রোভ্স্কি বার বার বলেছেন যে, তাঁর নায়ক বহুজনোচিত প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র; অসাধারণ সে নয়। তবু যোগাত্মক চরিত্র-সমস্যার প্রতি এই ধরনের মনোভাবের মধ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি দিককে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সে দিকটি হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনেই বীরোচিত এবং নভোচারীকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা।

সোভিয়েট তাত্ত্বিকরা আরেকদিক দিয়েও কোটি কোটি নরনারীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের দিবারাত্রির চক্রের পরিক্রমার মধ্যে নিয়ে এসেছেন চূড়ান্ত গুরুত্ব। বলেছেন, 'শিল্পসম্মত চিত্র আঁকতে গিয়ে আমাদের শিল্পী, লেখক এবং শিল্পপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ সব সময়ে স্মরণ রাখবেন বহুজনোচিত ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হবে সামাজিক শক্তির সারবস্তু ও সারমর্মকে।

এ বক্তব্যের ফরমায়েসটা হচ্ছে গৌণ। এর মূল তাগিদটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তাগিদ। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবতা দ্বন্দ্বমূলক গতিধারায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের উপাদান জুগিয়ে চলছে অনবরত। মেহনতী মানবী-মানবী অসাধারণ মানব-মানবী হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট উপন্যাসের সর্বত্র মানব-মানবীর কেজো কথা এবং কেজো চরিত্র। সামাজিক শক্তির চালক হিসেবে তাদের এই যে বিপ্লবীরূপ, সেটিকে না দেখতে না বুঝতে না ধরতে পারলে এই সাধারণ মানব-মানবীরা পাঠক পাঠিকার মনে দাগ কাটতে পারে না। মূল উৎসটিকে স্পর্শ করতে পারলেই এই সাধারণ মানব-মানবীদের কাহিনীর শেষ লাইনটি পর্যন্ত না পড়লে বই বন্ধ করা যায় না।

কোন কোন উপন্যাস পড়তে পড়তে অবশ্য মনে হতে পারে, শিল্পী বিপ্লবাত্মক সামাজিক শক্তিকে চরিত্রাবলির মধ্যে অন্তর্নিহিত না রেখে তাকে উপন্যাসের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছেন খোলাখুলি সামনে এনে। এর ফলে চরিত্রাবলির মনোজগতে জ্বলন্ত বিশ্বাস জাগানোর প্রয়াস প্রাধান্য পেয়েছে : উপন্যাসের ক্ষিপ্রগামিতার সহায়ক হওয়ায় এতে মানব মানবীর চরিত্রের গভীরে যাবার অবকাশ পাওয়া যায় নি।

এই ধরনের কোন কোন উপন্যাস পড়েই সম্ভবত জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'সত্য' বিশ্বাস ও কবিতা নিবন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন:

"বিশ্বাসের আশ্চর্য কৃতবিদ্যতায় রাশিয়া আজ যেরকম দীপ্ত, তাতে উচ্ছ্বাস কমিয়ে ফেলে ধীরভাবে চেতনার গভীর অন্তর্যামী আলোয় জীবনকে চিনে নেওয়ার সাহিত্য পদ্ধতিকে বুর্জোয়ার ভূতের বেগার বলে মনে হচ্ছে তার। কিন্তু এ রকম বেগার দান্তে খেটে গেছেন, টলস্টয়ও। আধুনিক সোভিয়েটও যেখানে যা কিছু ভালো সাহিত্য হচ্ছে সেটার স্থিরতা, ইতিহাসে যা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, যা হয়নি সেসব

দুঃসাধ্য স্বর্গ রচিত হতে পারে স্বীকার করেও বিশ্বাসের মাত্রা রক্ষা ও অভিনিবেশের ফলেই হচ্ছে।"

কিন্তু নিছক বিশ্বাসকে ভিত্তি করে লেখা সোভিয়েট উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম। জলন্ত বিশ্বাস মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সোভিয়েট উপন্যাসকে সাধারণভাবে সত্যের সন্ধানী রাখায় বিশুদ্ধ ভাবলৌককতার কাজ এতে খুব সামান্যই হয়েছে। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, ভাবলৌকিকতার সাথে বাস্তবতার মিশ্রণই রীতি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বিশ-তিরিশের সন্ধিক্ষণে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকালে শলোকভের সমসাময়িক আভদেয়েঙ্কো 'আমি ভালবাসি' নাম দিয়ে যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তাতে প্রেমে পড়া এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যের মধ্যে মিলন ঘটানো হয়েছিল একটানা খুশির আবেগোজ্জ্বল অনুভব। প্রেম ও সমাজতন্ত্রের ঊষালগ্নে মনে হয়েছে, 'ভালবাসি ভালবাসি জলেস্থলে বাজে বাঁশি।' এ ধরনের বই সোভিয়েট উপন্যাসে অবশ্য খুবই বিরল। লিওনিদ লিওনভ বিদ্যুৎ বিজ্ঞানীকে নায়ক করে 'স্কুটারেভ স্কি' উপন্যাসেও লিখেছিলেন ভাবলৌকিকতার সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ বাস্তববাদ মিশিয়ে। এতে লিওনভ ভাষার খেলা দেখাতে চেয়েছিলেন বরঞ্চ। মনঃস্রোতের পদ্ধতিরও একটা পরীক্ষা এতে পাওয়া যায়। ঝর্ণার মতো বর্ণনার গতি উপরোক্ত দুটি বইয়েরই।

ভাবলৌকিক বই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম যে ধারাটা থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাও বাস্তবতা প্রসূত। এই বাস্তবতা গতানুগতিক নয়। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক গণ বিপ্লবের দায়িত্ব যে দেশকে প্রথম নিতে হয়েছে, তার জনগণের জীবনপথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। সোভিয়েট উপন্যাসকেও প্রধানত মোটা কাজই করতে হয়েছে। মনঃস্রোতের কাজের অবকাশ পাওয়া গিয়েছে দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত খাটুনির পরে ছুটি নেওয়ার মতোই। শিল্পী আর মেহনতী জনতা বিপ্লবোত্তর কর্মকাণ্ডে একই সঙ্গে নিয়োজিত হওয়াতে এবং কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিকল্পনা পরিপূরণের তগিদ শিল্পীর মনে সঞ্চারিত হওয়াতে বিশেষ করে বিশ-তিরিশের দশকের সোভিয়েট উপন্যাসের বিকাশ পরিকল্পনা কালক্রমিকতা অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। এটা হয়েছেও তাই, সচেতনভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। সোভিযেট উপন্যাসের শিল্পীরা লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করেছেন এবং এই লক্ষ্যমাত্রায় গণ-অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা দেহের মধ্যেকার কঙ্কালের মতো কাজ করেছে অনেক সময়। এই কারণে সোভিয়েট উপন্যাসে তেল নুন লাকড়ির আধিক্য ঘটেছে। কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, সেকথা এখানেও বলা দরকার। উপন্যাসের চিরায়তিক ধারায় তেল নুন লাকড়ির উপাদান অপাঙক্তেয় হয় নি, অবাঞ্ছিত হয় নি কোন দিন। আমেরিকার আর্নেষ্টহোমিংয়ের "বৃদ্ধ ও সমুদ্র", আপটন সিনক্লেয়ারের 'জঙ্গল', ফ্রান্সের এমিল জোলার 'জার্নিয়াল', ইংরেজ হার্ডির 'টেস' নরউইজিয় নুট হামসুনের "খামার" প্রভৃতিতে অমানবিক উপকরণের প্রাবল্য কি এদের মানবসত্তাকে কিংবা শিল্পগুণকে ক্ষুণ্ন করেছে? এমন কি পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত দুদিনসেভের "শুধু আহার্যে নয়" নামক যে উপন্যাসটিকে আমলাতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পশ্চিমী সমালোচকেরা যে বইটিকে মহৎ রুশ উপন্যাসের যোগ্য অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন, তাতেও একজন ইঞ্জিনিয়ারের

গবেষণার সাজসরঞ্জাম নিয়ে যে মূলকাহিনীর জের টানা হয়েছে, তাতে একফোঁটা কবিতা নেই। বস্তু জিনিসটা এদিক দিয়ে লোহালক্কড় আর ড্রেন পাইপের ব্যাপার। দুদিনসেভ যদি তাঁর বইটিকে লঘুপক্ষ করার জন্য এই ড্রেন-পাইপের ভূত ভবিষ্যতকে বাদ দিতেন, তাহলে তাতে তাঁর বিজ্ঞানী নায়কের সত্যের সাধনা যেমন অবাস্তব হয়ে পড়তো, তেমনি তাঁর স্বাধীনতাসত্তার তাগিদও অনির্দিষ্ট ও নিরালম্ব হয়ে যেত।

সোভিয়েট উপন্যাস যেহেতু রাখ ঢাক না করে খোলাখুলি গণ উপন্যাস, সে কারণে 'যারা কাজ করে' তাদের দৈনন্দিন জীবনের লক্ষ্যমাত্রা এবং সাজসরঞ্জাম নিয়েই তার কারবার। যৌথ খামার নিয়ে শলোকভ "ধরিত্রীর নবজন্ম" নাম দিয়ে যে উপন্যাস লিখেছেন তাতে বিষয়বস্তু যৌথ খামারই, এতে শলোকভ গ্রামীণ জীবনকে উপস্থিত করেছেন তাঁর সমস্ত রূঢ়তা ও মাধুর্য দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উপন্যাসের শিল্পরূপে গণ-মানবমানবীকে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ায় এটা অনেক বাস্তববাদীর কাছেও ছন্দপতন বলে মনে হতে পারে। কোন কোন দিক দিয়ে ছন্দপতন হয়েছে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ ব্যাপার ঘটেছে বাস্তবতারই ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসের নবপর্যায়ে অনিবার্যভাবে। উপন্যাসের শিল্পরূপে এ রকম ছন্দপতন শিল্পীর রূপসৃষ্টির তাগিদে বারংবার ঘটেছে গতানুগতিকতাকে ভাঙবার প্রক্রিয়ায়। এটা কোনদিনই দোষণীয় বলে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়নি। কারণ ছন্দপতনকে ভরে তুলেছে নতুন ছন্দ।

ক্রিস্‌ট্‌ফার কডওয়েল তাঁর 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে এক জায়গায় কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, সমস্ত শিল্পকলাই প্রচার বা একটা বিশেষ ভাবনার চেষ্টা; তবে অন্যান্য প্রচার থেকে এর ধারা আলাদা। একটা চমৎকার উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন, গাছের পাতাই যেমন ফুলের পাপড়ি হয়ে ওঠে, তেমনি প্রচারও শিল্পকলার সৌন্দর্যের রূপ নেয়।

সোভিয়েট উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। রাল্‌ফ ফক্‌স্‌ যে অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন, সে সম্মন্ধে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে শিল্পীরা যে সচেতন থেকেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে খোলাখুলি বলে কয়ে প্রচারমূলক লেখার পাশাপাশি সৌন্দর্যবাদী বই লেখাতে।

কনস্তান্তিন ফেদিনের ১৯৪০ সালে প্রকাশিত "সানাটোরিয়াম আর্কতুর" বা 'আর্কতুর আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শলোকভের 'ডন নদীর গতিপথের' মহাকাব্যিক বিস্তারের পাশে এই বইটিকে একটি গীতি কবিতার মতো মনে হয়। কিন্তু এ ধরনের লেখা রুশ উপন্যাসের একটি ধারাকে বহন করেছে, যা উনিশ শতকে টুর্গেনিভের লেখার শিল্পরূপের উৎকর্ষ-চূড়ায় উপনীত হয়েছিল। উপন্যাসের শিল্পরূপে এ ধরনের লেখা অন্যান্য দেশেও জায়গা করে নিয়েছে।

মহাকাব্যিক পদ্ধতিতে লেখা টমাস মানের 'যাদুর পাহাড়' (ম্যাজিক মাউন্টেন) উপন্যাসের যে পটভূমি ও বিষয়বস্তু, 'সানাটোরিয়াম আর্কতুর' উপন্যাসেও তাই। সুইজারল্যান্ডের পর্বত, কন্দরে বিভিন্ন দেশের যক্ষারোগীদের আরোগ্য নিকেতনে

জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামের কাহিনী এই উপন্যাস। টমাস মানের 'যাদুর পাহাড়' হিমাবৃত পর্বতচূড়ার মতোই মহিমান্বিত ও আকাশভেদী। তার পাশে 'সানাটোরিয়াম আর্কতুর' একটা পাহাড়ী ঝর্ণার মতো। কিন্তু আরো একটু তফাৎ রয়েছে। জীবন ও মৃত্যুকে টমাস মান দেখেছেন উদার মানবতাবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিতে। কনস্তান্তিন ফেদিন একই বিষয়কে দেখেছেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে। কিন্তু 'সানাটোরিয়াম আর্কতুর' সচেতনভাবেই পরিহার করেছে যে কোন রকম ভারী বিপ্লবাত্মক বিতর্ককে, কারণ আরোগ্য নিকেতনে হালকা কথাই বাস্তব এবং চিকিৎসকের নির্দেশানুগ। এই উপন্যাসের নায়ক একজন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য-দেশীয় নায়ক নায়িকার সঙ্গে আলাপের মধ্যে চেষ্টাকৃত ভাবে তাঁর সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমিকে নিজের কথার মধ্য দিয়ে সামনে আনেন নি। তাঁর প্রেমে পড়েছে যে দুটি জার্মান মেয়ে, তাদের দিয়েও সমাজতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করানো হয় নি। এদের একজন ডাক্তারের সহকারিনী ডাক্তার, আরেকজন রোগিনী। এরা নিজেদের চিন্তার বাইরে আসেনি নায়কের কাছে প্রেম নিবেদন করতে। রোগিনীর মৃত্যু হয়েছে, আর ডাক্তারের সহকারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার দেশে ফিরেছে। দুটি পরিণতিই মর্মান্তিক। কিন্তু অবিমিশ্র ভাবলৌকিকতার কোন অবকাশ নেই। সমগ্র কাহিনীর গতিপরিণতি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছে যে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এমন একটি সমাজ দরকার, যেখানে অর্থের সংস্থানের জন্য মাথা ঘামাতে হয় না।

উপন্যাসটি খুব ছোট হলেও চরিত্র প্রধান এবং চারিত্রিক বৈশিষ্টে প্রতিটি মানবী-মানবী তীক্ষ্ণ তীব্র। বিভিন্ন দেশের নরনারী এরা। বিভিন্ন মনের ধরন এবং কথা বলার অভ্যাস। সমস্ত বর্ণনাই আশ্চর্য সংযত। এক জায়গায় একটি নবনির্মিত গৃহের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ইটালীয় রাজশ্রমিকদের যে সমবেত সঙ্গীতের বর্ণনা আছে, তাকে লেখক একজন সোভিয়েট সমবেতবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভাল লাগা এবং ভালবাসা জানাতে গিয়ে কয়েকটি মাত্র পঙক্তির মধ্যে আটকা রেখেছেন। কনস্তান্তিন ফেদিনের গীতিকাব্যিক উপন্যাসটিতে বিভিন্ন চরিত্রকে যে স্ফিতি দেওয়া হয়েছে, তাতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সত্তাটি অর্থময় হয়ে উঠেছে। অগণিত বিভিন্ন চরিত্রের স্বকীয় স্ফূর্তি সোভিয়েট উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক মানবিকতারই ফলশ্রুতি। সোভিয়েট সমাজতন্ত্র নরনারীকে একটা ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করেনি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমসাময়িক উপন্যাসে রয়েছে বিচিত্র মানব মানবী।

সানাটোরিয়াম আর্কতুর আরেক দিক দিয়েও বিশিষ্ট। এতে কথাচ্ছলে উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরোগ্য নিকেতনের পরিচালক-চিকিৎসকের পকেটে থাকে এডগার ওয়ালেসের লেখা ডিকেটটিভ উপন্যাস। সমস্ত রোগীকেই এই উপন্যাস পড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি তিরিশের দশকের আধুনিক ফরাসি যৌন মনোবাস্তববাদী উপন্যাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে টমাস মানের 'যাদুর পাহাড়' উপন্যাসের কথাও এসেছে। এই বইটিতে মৃত্যুর কালোছায়ার বর্ণনার আধিক্য রয়েছে বলেই বোধ হয় আরোগ্য নিকেতন এর প্রবেশ নিষিদ্ধ। চিকিৎসকের মতে, এই বইটি 'নৈরাজ্যবাদের সমুদ্র' কিন্তু 'সানাটোরিয়াম আর্কতুর'-এর লেখক একথা গোপন

করেননি যে, রোগী এবং রোগিনীদের মনে কৌতূহল রয়েছে শুধু 'যাদুর পাহাড়' বইটির জন্য নয়, কৌতূহল রয়েছে যৌনবাস্তববাদী উপন্যাসের জন্যেও। হয়তো তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যৌন বিকারের কাহিনী সংবলিত উপন্যাসের জন্যে অসুস্থ এবং বৈষম্য পীড়িত সমাজের পাঠক পাঠিকাদের তরফ থেকে যে চাহিদা গাঁজিয়ে উঠেছে তা স্বাভাবিক। বস্তুতপক্ষে কনস্তান্তিন ফেদিন তাঁর উপন্যাসে মনোবাস্তববাদকে প্রাশয়ই দিয়েছেন বলা চলে। বিশেষ করে তরুণী রোগিনী ইঙ্গার মনে মৃত্যুর আগে বিছানায় শোয়া অবস্থায় আধো চেতন আধো অবচেতন অনুভবগুলি যেভাবে খেলা করেছে, সে ভাবটা মনোবাস্তববাদী পদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের শিল্পরূপে এই মনোবাস্তববাদ জীবনের সমস্ত কামনারই আলেখ্য এঁকেছে। যৌন ছোঁয়ার যেটুকু স্বাভাবিক তার বেশি আসে নি, যদিও অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি যক্ষ্মারোগগ্রস্থা একটি তরুণীকে সহজেই বিকারগ্রস্থ করে উপস্থিত করলে চল্লিশের দশকে কোন কোন পশ্চিমী মহলে বাহবা পেতে পারতেন লেখক।

তিরিশের দশকের ইউরোপীয় মনোবাস্তববাদের উপকরণ নিয়ে কাজ করেও কনস্তান্তিন ফেদিন অবক্ষয়ের ছায়াকে পর্যন্ত তাঁর কাছে ঘেঁষতে দেননি। এটা যে তিনি পেরেছেন, তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, রুশ উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত ঘটে গিয়েছিল। সোভিয়েট শিল্পীদের দিক নির্দেশ করতে গিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি রুশ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এহে অবক্ষয়ের অধ্যায়টার কথা বলেছিলেন। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে সজাগ করে দিয়েছিলেন তিনি অবক্ষয়ের নেতিবাচতকা সম্বন্ধে। কনস্তান্তিন ফেদিন ম্যাক্সিম গোর্কির হাতে গড়া অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে এই সাবধানতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ মনোবাস্তববাদের যোগাত্মক দিকটাকে কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে, এটা তার দৃষ্টান্ত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ফরাসি শিল্পসাহিত্যের নেতিবাচক উপকরণগুলিকে বাদ দিয়ে ইতিবাচক উপকরণগুলিকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, তার আরেকটি দৃষ্টান্ত ইলিয়া এরেনবুর্গের উপন্যাস।

চিত্রশিল্পী পিকাসোর অনুরাগী সুহৃদ ইলিয়া এরেনবুর্গের জীবনে দুটি কেন্দ্র : মস্কো আর প্যারী। প্যারী শহরে আরও অনেকের মধ্যে কক্‌তোর কাছাকাছি হতে পেরেছিলেন ইলিয়া এরেনবুর্গ। শিল্পসাহিত্যের নব নব ফরাসি পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলিকে গভীর সহানুভূতি নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন এরেনবুর্গ। এই সহানুভূতিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসে এরেনবুর্গ পাত্রপাত্রীদের মুখ দিয়ে যে সব কথা বলিয়েছেন সেগুলি সমগ্র সত্যকে অভিব্যক্ত করার পন্থী। এরেনবুর্গ ফরাসি পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিবাচক উপকরণগুলিকে আশ্চার্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আয়ত্ত করেন। তিনি মহাকাব্যিক ধারায় 'ঝড়' 'নরম তরঙ্গ' এবং 'বরফ গলেছে' নাম দিয়ে যে ত্রিখণ্ডের উপন্যাস লিখেছেন, সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত থেকে শুরু করে সমাপ্তির পরবর্তীকালের ঘটনাবলিকে পটভূমি করে লেখা। বইটিকে একদিক দিয়ে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা

চলে। তুলনাটা এই যে, যুদ্ধ যে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করতে পারে না এবং মানবিকতার যে ধ্বংস নেই, তারই মূল্যবোধ জাগ্রত করা হয়েছে এই ত্রিখণ্ডের উপন্যাসে। এই ত্রিখণ্ডের উপন্যাসে একই সঙ্গে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য ভ্রাতৃবোধের আবেগোচ্ছল চিত্রাবলি সাজানো হয়েছে।

কথা উঠতে পারে, মহাকাব্যিক পদ্ধতির উপন্যাসে ফরাসি আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষার নেতিবাচক দিকগুলি নিজের থেকেই চাপা পড়েছে এবং এই প্রসঙ্গে সার্ত্রে এবং কামুর নাম করা যেতে পারে। তাদের ছোট ছোট লেখাতেই আধুনিক রীতি প্রবল। এর অর্থ এই যে, এরেন বুর্গেরও অন্য ধরনের লেখায় নেতিবাচক উপকরণ রয়েছে? কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব হবে এই যে, গীতিকাব্যিক গদ্য লেখাতেও এরেনবুর্গ যোগাত্মক উপকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। তিরিশের দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে ভিত্তি করে এরেনবুর্গ "মেয়েটির হাতে রাইফেল ছিল" নাম দিয়ে যে গীতিকাব্যিক গদ্যকাহিনী লেখেন, তা একটি অনন্য সৃষ্টি। আর্নেস্ট হোমিংওয়ে থেকে শুরু করে আরও অনেকেই তিরিশের দশকের স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর উপন্যাস লিখেছেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে লেখা হেমিংওয়ের "ফর হুম দি বেল টোল্স্ " (শোকের ঘণ্টা কার জন্য বাজে) টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে বিশ্ব উপন্যাসে। এরেনবুর্গের লেখাটি এ তুলনায় খুবই ছোট। কিন্তু স্পেনের নিসর্গ থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামী জনতার যে ছবি এঁকেছেন লেখক 'মেয়েটির হাতে রাইফেল ছিল' কাহিনীতে তা একদিকে যেমন কাব্যিক তেমনি আরেকদিকে বাস্তববাদিতার প্রমাণ। গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ-বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা-মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে গুলি করে মেরে ফেলল, এই পরিণতিটিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানা স্পেনের পটভূমিতে মনপ্রাণ ঢেলে বর্ণনা করেছেন এরেনবুর্গ। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ ফ্যাসিবাদী ফ্রাঙ্কোর হামলায় বিধ্বস্ত গণজনপদ 'গোর্নিকা'কে নিয়ে পিকাসো যে ছবি আঁকেন, তাতে মনোবাস্তববাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারার ছোঁয়াচ থাকলেও মূলত তাতে গণবাস্তববাদিতার অভিব্যক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। তেমনি এরেনবুর্গ যে উপন্যাস লিখেছেন, তাতে গল্প সাজাবার কৌশলে অবিনবত্ব রয়েছে, কিন্তু মনোবাস্তববাদকে চাপা দিয়েছে মহাকাব্যিকতা।

ইলিয়া এরেনবুর্গের উপন্যাস এমনভাবে প্রাণপ্রাচুর্য পূর্ণ এবং তার গতিধারা এত দ্রুত যে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রশ্নাবলি নিয়ে বিতর্কের তোড় কোথাও শিথিল হবার অবকাশ পায়নি। উপন্যাসের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে সংলাপ এরেনবুর্গের লেখায় এত জীবন্ত যে কাহিনীর গতিধারা অনেক সময় গৌণ হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষ পরিবেশ থেকে সত্যকে সরাসরি গ্রহণ এবং যাঁচাই করার পদ্ধতিকে উপন্যাসের শিল্পরূপে প্রয়োগ করার ব্যাপারে ইলিয়া এরেনবুর্গ ফরাসি উপন্যাসের বৈপ্লবিক স্তাঁদালীয় মনস্তাত্ত্বিক উপাদানকে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহভরে এবং অত্যন্ত সাবলিলভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন।

এরেনবুর্গের আত্মজীবনী থেকে তিনটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। প্রথম উদ্ধৃতিতে স্তাঁদালের বই পড়ার ঘটনাটা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের। এতে দেখা যায় আঁদ্রে জিদের তুলনায় স্তাঁদাল অনেক বেশি অগ্রসর। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্ত

ববাদের মুক্ত কল্পনার তাগিদ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে ব্যক্তি আর সমষ্টির ঐতিহাসিক সম্পর্কটির ইশারা :

(১) (স্তাঁদালের) 'লাল এবং কালো' বইটি আবার পড়লাম এবং আবার পড়লাম; বইটি যে আশিবছর আগে লেখা একথা চিন্তা করাই কঠিন। বইটি যখন পড়ছিলাম তখন লোকজন বলছিল, আঁদ্রে জিদ হচ্ছে এমন একজন লেখক যিনি আধুনিক যুগকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আমি তাঁর 'লা পরস ও ভ্রোয়াত' উপন্যাসটি পড়লাম। আমার মনে হল বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসে লেখা। একথা ভেবে হাসিই পেল যে, এর রচয়িতা বেঁচে আছেন। আমি তাঁকে একটি থিয়েটার হলে দেখেছি।

(২) আমি জানি গোগল একজন বাস্তববাদী লেখক। প্রত্যেকটি স্কুলপাঠ্য বইতে একথা লেখে। স্কুলে পড়ার সময় মুখস্ত করেছিলাম, 'আবহাওয়া যখন শান্ত থাকে তখন নীপার নদীকে চমৎকার দেখায়।' এই অনুচ্ছেদেই আছে, 'এমন পাখি খুব কমই পাওয়া যাবে যারা নীপারের মাঝখান পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।' পাখীরা উড়তে উড়তে মহাসমুদ্র পর্যন্ত পেরিয়ে যায়। তবুও গোগেলের কথাটা শুদ্ধ। নীপার নদী চওড়া ঠিকই, কিন্তু শিল্পকলাও চওড়া।

(৩) একজন লেখক কদাচিৎ এমন একজনের কথা লেখে যার অস্তিত্ব 'রয়েছে', সে জনৈক ইভানভ ডেভিড কিংবা স্মিথ যেই হোক না কেন। লেখক যে বহু মানুষকে দেখেছে কিংবা তার নিজের যেসব অভিজ্ঞতা রয়েছে অথবা জগৎ সম্বন্ধে তার যে ধারণা, এদের সবকিছুকে একত্রিত করে তৈরি হয় লেখকের নায়ক-নায়িকা। ইতিহাসও বোধকরি ঔপন্যাসিক? সম্ভবত জীবন্ত মানুষেরা এই ঔপন্যাসিকের ছাঁচ। এদের সবাইকে একসঙ্গে গালিয়ে সে উপন্যাস লিখছে–সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

উপন্যাস লিখবার সময়ে এয়েনবুর্গ যে ব্যক্তি, সমষ্টি, বাস্তব আর কল্পনাকে সমন্বিত করতে সচেষ্ট থেকেছেন, উপরোক্ত ধ্যানধারণা থেকে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

পঞ্চাশ ষাটের দশকে লেখা ইলিয়া এরেনবুর্গের আত্মজীবনীতে উৎকীর্ণ উপরোক্ত তাগিদগুলো পঞ্চাশ ষাটের দশকের সোভিয়েট উপন্যাসের উপদানের প্রয়োজনেরই প্রতিফলন।

পঞ্চাশের দশকে লেখা লিওনিদ লিওনভের 'রুশ অরণ্য' উপন্যাসটি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অরণ্য-সন্ধানী ইভান ভিখ্‌রভের জীবন-সাধনা বিশ শতকের রুশ গণজীবনের বিপ্লবী পরিবর্তনের বিন্যস্ত। এই পরিবর্তনময় বিশ শতককে মহাকাব্যিক ছবির পর ছবিতে সাজিয়েছেন লিওনিদ লিওনভ এই উপন্যাসটিতে। এই সব ছবির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিকশিত হয়েছে নায়ক ইভান ভিখরভের বিপ্লবী জীবন সাধনা। এই জীবন সাধনার সঙ্গে জড়িত হয়েছে ইয়েলেনা নাম্নী এক মেয়ে। দুজনেই উঠে এসেছে গণজীবনের গভীরে তলদেশ থেকে। এদের পরিণয়, বিচ্ছেদ, এবং পুনর্মিলনের গতিধারা তরল রেশমের সুতোর মত গেঁথেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিপদ ও

প্রতিরোধের পটে সমাজতন্ত্রের বিন্যাসের অর্থনৈতিক উপাদানগত এবং মানবিক সমস্যাবলিকে। যে অর্থনৈতিক উৎপাদন এখানে বস্তুগত উপকরণ, তা হচ্ছে রাশিয়ার সমস্ত সম্পদ, যা একই সঙ্গে নৈসর্গিক, মানবিক এবং অর্থনৈতিক। অরণ্য বিজ্ঞানী ভিখরভ একই সঙ্গে অরণ্য প্রেমিক। এই প্রেমের সূত্রে দুটি বিষয়কে একসঙ্গে গ্রথিত করেছেন লিওনিভ। অরণ্য যেমন অসংখ্য বৃক্ষ-জীবনকে নিয়ে সমন্বিত, তেমনি সমাজ অসংখ্য ব্যক্তিজীবন নিয়ে সমন্বিত। যে কোন একটি বৃক্ষের গায়ে কুঠারাঘাত জাগিয়েছে বেদনা। তেমনি প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং বিশেষ করে সাধারণ ব্যক্তির যন্ত্রণা জাগিয়েছে বেদনা। ব্যক্তি, সমষ্টি, বাস্তব আর কল্পনাতে যে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন লেখক, তা অনাস্বাদিতপূর্ণ। সোভিয়েট উপন্যাসকে পঞ্চাশের দশকে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার নতুন সৃষ্টির মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। সোভিয়েট বিপ্লবের চতুর্থ দশকে লেখা 'রুশ অরণ্য' প্রমাণ করে যে, প্রাণবেগ ও স্বাধীনতাসত্তায় উদ্বেলিত সোভিয়েট উপন্যাস হচ্ছে বিকাশমান মুক্তিধারা। প্রাণবেগ আর স্বাধীন সত্তার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট উপন্যাস বিশ্ববাসীকে দিয়েছে শিল্পশৈলীর দিক দিয়ে গভীর এবং উচ্চ মূল্যমানের মহৎ সৃষ্টি। উপন্যাসের মহাকাব্যিক ধারাতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী প্রয়োগ যে কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় বিশেষ চরিত্রের খুব বড় রকমের যোগের অঙ্ক নয়, বরং এই প্রয়োগ যে বিশেষ ও অবিশেষ চরিত্রের গুণে গুণান্বিত মানবতার অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বমিলনাত্মক উত্তরণের দিক-নির্ণয়, সে কথাটা লিওনিদ লিওনভ তাঁর 'রুশ অরণ্য' প্রকাশ করেছেন।

অরণ্যবিজ্ঞানী ইভান ভিখরভ, তার স্ত্রী ইয়েলনা এবং তাদের কন্য পলিয়া এই মহাকাব্যিক উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই কাহিনীকে রুশ অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত মানব-মানবীর জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করে কত যে নিবিড়ভাবে ব্যক্ত করেছেন লেখক এবং কত যে স্বার্থকভাবে করতে পেরেছেন তিনি, তার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে এখানে। হিটলারের বাহিনী যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে, যখন মস্কোর উপর বিমান হামলা হচ্ছে, তখনও আয়োজন করা হয়েছে 'সোভিয়েট ইউনিয়নের অরণ্য সম্পদ' সম্মন্ধে অধ্যাপক ভিখরভের বক্তৃতা। এ বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন অরণ্য সম্পদের নানা দিককে মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে উপস্থিত করে। অধ্যাপক ভিখরভ এক নাগাড়ে তিনঘণ্টা বলেছেন। লিওনিদ লিওনভও এই সমগ্র বক্তব্যটি তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত করেছেন সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে এক নাগাড়ে। তত্ত্ব আর তথ্যে ভারাক্রান্ত এই বক্তৃতা। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে ঘটনাবলির বৈপ্লবিক ঘাতপ্রতিঘাতের ধারায় এবং মানবীয় অনুভুতির সূক্ষ্ম টানাপোড়েনের মধ্যে এ বক্তৃতা এমনভাবে স্থাপিত যে, মনে হয় এ যেন একটা অসাধারণ সুন্দর কোন সঙ্গীত।

সাম্যবাদী সমাজ যারা তৈরি করেছেন এবং করবে, বিপ্লবকে যারা রক্ষা করেছে এবং করবে, তারা যে অসংখ্য সাধারণ মেহনতী মানব-মানবী, গ্রামাঞ্চল এবং মহানগরীর শ্রমজীবী মানুষেরা এবং তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা সংগ্রামী তরুণ তরুণীরা, এই ঐতিহাসিক বাস্তব সত্যকে লিওনিদ লিওনভ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করে লিখেছেন 'রুশ অরণ্য'। বিশ শতকের মহাবিপ্লবাত্মক ঘটনাবলি

নিয়ে লেখা এই গদ্য মহাকাব্যে তাই নায়ক নায়িকারা এবং অপরিমেয় অধিকাংশ পাত্র পাত্রীরা 'খুদে মানুষ' এই-'খুদে মানুষরাই' যেমন বিপ্লবের, মুক্তিযুদ্ধের এবং সাম্যবাদী সমাজের অপরিহার্য মহৎ সংঘটক এবং মহাশক্তির উৎস, তেমনি এরা সাম্যবাদী ভাবনাতেও সদা ভাবিত এবং তত্ত্ববিজ্ঞানের সদা উদ্ভাবক। এরা উপলক্ষ নয়, এরা লক্ষ্য। সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ এবং তার রক্ষাকার্যে এবং প্রসারণে নিয়োজিত শ্রমজীবী সাধারণ মানব মানবীরা বৈপ্লবিক জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় নব-মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতেও নিয়োজিত। এই মূল্যবোধকে রসায়িত করেছে জৈবিক আত্মিক বিকাশের ছোট বড় সুখদুঃখ, ভালোবাসা, ঘৃণা, আকর্ষণ, বিকর্ষণ। এরা সুনির্দিষ্ট চরিত্র লাভ করছে। এরা সমাজতান্ত্রিক বাবস্তবতার অভূতপূর্ব সৃষ্টি। উপন্যাসে এদের প্রাধান্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞাকে নির্দিষ্ট করায় সহায়তা করেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবাদ হচ্ছে অগণিত মেহনতী মানব-মানবীর অবাধ আত্মপ্রকাশের শিল্পরূপ।

'রুশ অরণ্য' নামটি তাৎপর্যময় এজন্য যে, এতে রাশিয়ায় প্রকৃতিদত্ত এবং কর্ষণলব্ধ অরণ্য সম্পদের সমস্যা এবং কাজের সামগ্রিক ক্রিয়াবলি রয়েছে। এই নামটি আরও একদিক দিয়ে তাৎপর্যময় এজন্য যে সমগ্র অরণ্য যেমন একটা বিশাল জীবন, তেমনি প্রত্যেকটা গাছও এককেটা প্রাণমূর্তি। এরা যেন সাধারণ মেহনতী মানব-মানবী, যারা আলো চায়, বাতাস চায়, বিশ্বজগতের প্রাণতরঙ্গে নিজেদের বিকশিত করে তুলতে চায়। উপন্যাসটির মধ্যে বহু অধ্যায় আছে, যেগুলিতে বিপ্লবের আগে মানুফাবাজদের কুঠারাঘাতে কিংবা বিপ্লবের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার-বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে ভেঙ্গে পড়া গাছ নিয়ে এমন সব ছবি আছে যাদের মনে হয় তারা রক্তাক্ত মানুষ।

সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের কর্মকাণ্ডের গণযৌথসত্তার মধ্যেই যে এই কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত মানবমানবীদের স্বাধীনতা সত্তার অবাধ বিকাশের নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে এবং এই দুটো ব্যাপারেই যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়ে এসেছে এবং আসছে, সে সত্যকে একটা মালার মতো গেঁথেছেন লিওনিদ লিওনভ তাঁর গ্রন্থে।

একদিক দিয়ে তিনি যেমন সাম্যবাদী সমাজনির্মাণের কর্মগত এবং বস্তুগত অগ্নিপরীক্ষার সত্য ঘটনাবলির নির্মম বাস্তবচিত্র দাখিল করেছেন, তেমনি এই বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত মানব-মানবীর ব্যক্তি জীবনেও বাস্তব ছবি দাখিল করেছেন নির্মমভাবে। এরা যে একসঙ্গে জীবনের অপরাজেয় অভিজ্ঞতার শরিক, সেটা এই বাস্তবতার মধ্যে থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য :

'রুশ অরণ্য' উপন্যাসের মূলকাহিনীর জটিলতার উন্মোচনের একটি রসায়কের কাজ করেছে ভিখরভ দম্পত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক। অধ্যাপক ভিখরভকে ইয়েলেনা বিয়ে করেছে উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে। যে সখ্যতার পরিণতিতে ঘটেছে তাদের আকস্মিক বিবাহ, তার মধ্যে ভিখরভের তরফ থেকে গভীর ভাবলৌকিক প্রেম থাকলেও ইয়েলেনার প্রেম ছিল না। এই কারণেই কন্যা পলিমার জন্মের পরেও ইয়েলেনা এই দাম্পত্য জীবনে হাঁফিয়ে উঠেছিল। খাঁচার পাখীর মতো ছটফট করছিল। কিন্তু মায়াডোর কাটতেও পারছিলনা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলনা সে। এমন সময়ে একটা ব্যাপার ঘটলো। তখন ১৯২৯ সাল। ইভান ভিখরভের এক বন্ধু ভ্যালেরি

ক্রাইনভের সঙ্গে দম্পতিটির হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার সাক্ষাৎ ঘটলো। তার একটা কথার ভেঙ্গে গেল দ্বিধার খাঁচা।

ভ্যালেরি অক্টোবর বিপ্লবের আগেকার গোপন কমিউনিস্ট। বিপ্লবীদের একজন হিসেবে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল। বিপ্লবের পরে সে নেতৃস্থানীয়দের একজন। সে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলল, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তার কাছে স্বীকার করেছেন যে, একমাত্র কমিউনিজমই বিজ্ঞানকে সীমাহীন গবেষণার ক্ষেত্র দিতে পারে এবং সেটা আসবেই। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, সাম্যবাদী সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বর্তমান স্বাধীনতাগুলি মার খাবে এবং এই কারণেই তিনি চান তাঁর মৃত্যুর পরেই যেন সাম্যবাদী সমাজ আসে। ভ্যালেরি বলল, সেই বিজ্ঞানীকে সে একটা কথাই বলেছে–'যে ভয় আপনি পাচ্ছেন, তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন: এছাড়া জয় হয় না; যে মুরগীর ছানা ডিমের খোসা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার সাহস করে না, সে দুর্ভাগা।'

ভ্যালেরি কথাটা বলেছিল সাম্যবাদী বিপ্লবী সমাজ গড়ার ঝুঁকির পক্ষে যুক্তি দেবার জন্য। ইয়েলেনা এই কথাটাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করল। সে মেয়ে পলিয়াকে নিয়ে ভিখরভের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে চলে গেল গ্রামাঞ্চলে নার্সের কাজ নিয়ে। যাবার সময় সে চিঠি রেখে গেল। তাতে ভ্যালেরির সেই কথারই পুনরুক্তি করে গেল–'যে ভয় আপনি পাচ্ছেন, তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন।'

ভিখরভ দম্পত্তি পুনর্মিলিত হয়েছে এরপরে, কিন্তু ভালবাসার প্রশ্নে এই যে প্রত্যেকটি মানবমানবীর ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্যায়ন, এতে পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্ব্যর্থহীনতা। একটি সাধারণ মেয়ের জীবন নির্ধারিণে স্বাধীনতার তাগিদটি এখানে তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কমিউনিজম যে সারা বিশ্বেই একটা নতুন জগতের নির্মাতা, শ্রমজীবী মানবমানবীরা যে প্রত্যেকে স্বাধীনতাসত্তার প্রাণবেগের ধারক-ধারিকা, রুশ অরণ্যের সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সে অনিবার্য সত্যের প্রস্তাবক।

রালফ ফকস্ সোভিয়েট উপন্যাসের কাছে পূর্ণাঙ্গতার প্রত্যাশা করেছিলেন। 'রুশ অরণ্য' তাকে পূর্ণ করেছে শিল্পরূপের অনন্য বিন্যাস।

'রুশ অরণ্য' অবশ্যই একটি বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্ত বতার ধারায় রচিত উপন্যাসাবলিরই একটি নিদর্শন 'রুশ অরণ্য' যা হয়েছে এবং যা হতে যাচ্ছে, তার স্মারক।

সোভিয়েট উপন্যাসে যা হয়েছে এবং যা হতে যাচ্ছে–সেটি একটি মুক্তধারা। এই মুক্তধারা বিশ শতকে যে দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা হতে যাচ্ছে, সেখানে একটি অগ্নিপরীক্ষিত শিল্পরূপ হিসেবে এবং বিশেষ করে কমিউনিজমের সমষ্টি এবং ব্যক্তি জীবনের সমন্বিত স্বাধীন বিকাশের শিল্পরূপ হিসেবে নব নব উপন্যাসের সঞ্জীবক দৃষ্টান্তরূপে পরীক্ষণীয়।

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বিশ্বের অন্যান্য যেখানেই সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজের দিকে মানবমানবীর মুক্তিসংগ্রাম এগিয়ে চলেছে, সেখানে সেই

সংগ্রামের-শিল্পরূপ সৃষ্টিতে সঞ্জীবকরূপে কাজ করেছে এবং করতে থাকবে। এটি একই ছাঁচে ঢালা হবে না, বলা বাহুল্য।

আগামী দিনের সকল দেশের জন্য সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা যেমন অন্যান্য শিল্পরূপে তেমনি উপন্যাসের শিল্পরূপে একটি চলমান মানকে মর্মকেন্দ্ররূপে স্থাপন করেছে। শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপন করার এবং তাকে রক্ষা করে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলার ঘাত-প্রতিঘাতময় অগ্নিপরীক্ষার বাস্তব ও সম্ভাব্যতা থেকে বেরিয়ে এসেছে এই মান। সুতরাং এই মানের মধ্যেও রয়েছে সম্ভাব্যতা। এই মান হলো সবার উপরে মেহনতী মানুষ সত্য। মেহনতী মানবমানবীর স্বাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা। মেহনতী মানবমানবীর সহযোগিতাই সত্য সহযোগিতা। শোষণমুক্ত নতুন পৃথিবীর নির্মাতা মেহনতী জনগণ। এই নির্মাণেরই কর্মে ঘর্মে রূপবিন্যাসে ব্রতী মানবমানবী দেহাত্মিকভাবে রূপবান ও রূপবতী–রূপান্তরিত মানবতার রূপে রূপান্বিত। এটি বিশ শতকে প্রযোজিত বিশ্বসত্য। এ সত্য স্বাধীন বাংলাদেশে সমস্ত শিল্পরূপে এবং (সুতরাং) উপন্যাসের শিল্পরূপেও প্রকাশিতব্য শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের ইতিহাসের বৈপ্লবিক অগ্রগতির অশ্রান্ত ধারায়।

ছাব্বিশ
বিজ্ঞানোপন্যাস

বিজ্ঞানের নির্বাচন ও বিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপের মৌলিক উপকরণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি মিল পাওয়া গিয়েছে অন্যান্য শিল্পকলার তুলনায়। "উপন্যাসের এবং বিবর্তনবাদ জ্ঞাসমূহের পূর্ণ প্রসারের জন্য চাই প্রতিভার কাছ থেকেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপক্বতা।" কডওয়েলের এই বক্তব্যটির এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই একটা কথা চলে আসে এখানে। উপন্যাস এবং বিজ্ঞান শিল্পকলার মারফত হাত মেলাতে পারে। উপন্যাস পারে বিজ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তারিত করতে এবং বিজ্ঞান পারে উপন্যাসের দিগন্তকে ছড়িয়ে দিতে। উপন্যাস পারে তার শিল্পকলাগত আসক্তিকে কাটিয়ে উঠতে এবং বিজ্ঞান পারে তার নিরাসক্তিকে কাটিয়ে উঠতে।

মানবমানবীর মৌলিক জীবসত্তার গঠন ও বিকাশে দেহাত্মার প্রকৃতিতেও একটা রূপান্তরের আভাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মাটির পৃথিবীর আঁচলের বন্ধন কেটে দিয়ে মানবমানবীকে অনন্ত জ্যোতির্ময় বিশ্বের নাগরিক করে দিয়েছে। জীবনলীলার শৈশবের জান্তব পুনরাবর্তন কাটিয়ে উঠবার পরে সাড়ে তিনহাত লম্বা দ্বিপদ প্রাণীর চার পাঁচ লাখ বছর লেগেছে হাতপায়ের গিঁট ছাড়িয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠের দুর্গমতম স্থানগুলিতে প্রিয়পদচিহ্ন অনুসরণের জন্য না হলেও গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় যন্ত্র করতে। সে আজ ভাবতে পারছে আগামী শতাব্দীর গোড়ার দিকেই দল বেঁধে অনন্ত মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিহার করবে। মানব-শরীরের গিঁটগুলিও একচোটে আরও ছাড়বে আশা করা যায় এই

অভিযাত্রার চাপে। শুধু জৈবিক ব্যাপারেই এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা সীমিত থাকবেনা। মানুষের বাস্তব পরিবেশকে বিজ্ঞান আজ এমন এক বিরাট ব্যাপ্তি দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এমন সব মহাশক্তিকে এনে হাজির করেছে যে, মানবমানবীর পারস্পরিক ও বহুজীবন-সম্পর্কের একটা গুণাত্মক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। উপন্যাসের মানবীয় সম্পর্ক এর ফলে নতুন দিগন্তে উপনীত হবে এটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যখন বিশ্বের দেশে দেশান্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন মানব-মানবীর যেমন নিজেদের দেহাত্মিক রূপের ধারণার জগতে একটা নতুন দিগন্ত আনবে, তেমনি শিল্পরূপেও নতুন দিগন্তকে ডেকে আনবে।

বিজ্ঞানোপন্যাস একাজ কিছুটা আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে কল্পনার মিশাল বাস্তব সম্ভাবনার তুলনায় বেশি হয়েছে। তবু এতে পৃথিবীর টান বিশ্বজগতের টানের থেকে বেশি জোরদার। উনিশ শতকের ফরাসি ঔপন্যাসিক জুলস ভার্নে লিখেছিলেন, 'চাঁদের চারদিকে মানুষ' উপন্যাস। ষোড়শ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সব হিসেব করেছিলেন, তার ভিত্তিতে এবং উনিশ শতকের যন্ত্রশিল্পের সম্ভাব্য শক্তি সম্বন্ধে একটা ধ্যান ধারণা করে জুলস ভার্নে কল্পনায় মানুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছিলেন চাঁদের চারদিকে এবং এ কল্পনাকে তিনি রসালো উপন্যাসে সত্যের ভান দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের উঠ্‌তি ধনবাদী মার্কিন মুলুকের আর্থিক সঙ্গতি আর গোয়ার্তুমি আর ফ্রান্সের বুদ্ধি এবং মানবিকতার মধ্যে একটা সংযোগ ঘটিয়েছিলেন জুলস ভার্নে। কিন্তু পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারাটাই যেন জুলস ভার্নের এই উপন্যাসের সফল পরিণতি।

বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ, জি ওয়েলস পদার্থবিদ্যার পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করে কল্পনায় এমন একটি পদার্থের কল্পনা করলেন যা মনুষ্যবাহী একটি মহাশূন্যযানকে বাষ্পীয় শকটের মতো ঠেলে উপরে নিয়ে যেতে পারে। এইচ. জি ওয়েলস এই মহাশূন্যযানে চড়িয়ে দুটি মানবসন্তানকে চাঁদে নামালেন। সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা হলো চাঁদের পাতালবাসী এক ধরনের মানুষের সাথে, যারা জৈবিক দিক দিয়ে মানুষের কাছে নানাভাবে খাপছাড়া। চাঁদের দেশে পাওয়া গেল বিজ্ঞান কল্পনার পাতালপুরীকে, যেখানে যন্ত্রের প্রয়োগ বিশেষভাবে উন্নত এবং এই পটভূমিতেই দেখা গেল চাঁদের বাসিন্দাদের মস্তিষ্ক, মানুষের তুলনায় অনেক বড় এবং জটিল। ওয়েলসের 'চাঁদের প্রথম মানুষ'-উপন্যাসেও ফিরে এল মানুষ তার পরিচিত পৃথিবীতে কিছুটা উৎপ্রেক্ষা নিয়ে।

এইচ.জি ওয়েলসের উপন্যাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট ঔপন্যাসিক এলেক্সি টলস্টয় লিখলেন 'আলিয়েতা'। এখানে দুজনকে পাঠালেন তিনি মঙ্গল গ্রহে। মঙ্গলগ্রহের ভূপৃষ্ঠের উপরেই পাওয়া গেল মঙ্গলগ্রহবাসীদের নগরী। তারা কিন্তু আসলে মানবী মানবী। এদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর এক মহাবিপর্যয়ের সময় ছিটকে গিয়ে পড়েছিল মঙ্গলগ্রহে এবং সেখানে স্থাপন করেছিল গোষ্ঠীসমাজ। মহশূন্যযানের অন্যতম যাত্রী এখানে মঙ্গলবাসিনী আলিরেদার প্রেমে পড়লো এবং এই প্রেম হলো উভয়ত। মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা এই প্রেমকে সহ্য করলো না, তারা

নবাগতদের আপদ মনে করলো। মহাশূন্যযানের যাত্রীদের পালিয়ে আসতে হলো পৃথিবীতে। আলিয়েতার জন্যে মানব-প্রণয়ীর হৃদয় হাহাকার করে শূন্য শূন্যে খুঁজতে লাগলো আলিয়েতার ডাক।

উপরোক্ত তিনজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে জুল্‌স্ ভার্নে শুধু বিজ্ঞানোপন্যাসই লিখেছেন। তাঁর 'চাঁদের চারদিকে মানুষ' উপন্যাস ছাড়াও অন্যান্য লেখায় রোমাঞ্চক সাহসিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ধারা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক রোমাঞ্চক কাহিনী রয়েছে। চাঁদের চারদিকে মানুষ প্রথম রংধনুসিঁড়ি রচনা করেছে মহাশূন্যযাত্রার। এদিকে দিয়ে জুল্‌স ভার্নে সেই উপন্যাস রচনা করেছেন যা বিজ্ঞানীদের কর্মসূচীতে তখনও ওঠেনি। এখানে উপন্যাস বিজ্ঞানে আসক্তি আরোপ করেছে খুব, সন্তর্পণে, হাস্য কৌতুকের মধ্য দিয়ে। গ্রহ গ্রহান্তরের বাসিন্দাদের সম্পর্কে কোন জৈবিক বা সামাজিক প্রশ্ন এখানে ওঠেনি।

এইচ. জি ওয়েলস লিখেছেন "চাঁদে প্রথম মানুষ।" ব্যাপারটাকে কৌতুকচ্ছলে শুরু করলেও ওয়েলস শেষ পর্যন্ত কয়েকটা প্রশ্নের উদ্রেক করেছেন। এ প্রশ্নগুলি হচ্ছে গ্রহ গ্রহান্তরের সম্ভাব্য বাসিন্দাদের সঙ্গে পৃথিবীর বাসিন্দাদের সম্পর্ক কি হবে? এবং চাঁদের বাসিন্দাদের জৈব গঠনও কি প্রয়োজনীয় হবে মহাশূন্যযাত্রী মানুষের জন্যে? চাঁদের বাসিন্দাদের সামাজিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা কি প্রযোজ্য হবে পৃথিবীর সেই নব মানবমানবীর ওপর, যারা বসতি স্থাপন করবে গ্রহ গ্রহান্তরে? এসব প্রশ্ন অবশ্য উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত প্রশ্ন। একাধারে ঔপন্যাসিক এবং বিজ্ঞানী ওয়েলস অতি নিপুণভাবেই এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঠক পাঠিকার মনের মধ্যে। উপন্যাস হিসেবে ওয়েলসের এই লেখা অবশ্য খুব অভাবনীয় বলে মনে হয়নি তিরিশের দশকেও। কারণ একই সঙ্গে কয়েকটা সামাজিক উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি কয়েকটা বিজ্ঞানোপন্যাসও লিখেছিলেন।

এলেক্সি টলস্টয়ের "আলিয়েতা" উপন্যাসটি কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সোভিয়েট উপন্যাস মহাকাব্যিক এবং ঐতিহাসিক ধারার অন্যতম পুরোধা হিসেবেই এলেক্সি টলস্টয়ের পরিচয়। পেশাগতভাবে একজন প্রকৌশলী হলেও তিনি তাঁর উপন্যাসে প্রকৌশলী বিদ্যাকে অভিব্যক্ত করেননি। তাঁর "অগ্নিপরীক্ষা" উপন্যাসের অন্যতম নায়ক তেলেগিন একজন প্রকৌশলী হয়েও উপন্যাসটিকে তিনি বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধের ঘাতপ্রতিঘাতের ঘটনা এবং মূল্যায়নে নিয়োজিত রেখেছেন। 'আলিয়েতা' উপন্যাসে তাঁর প্রকৌশলী বিদ্যাকে প্রধান্য দেওয়ার পক্ষে যুক্তি ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। ম্যাক্সিম গোর্কি 'আলিয়েতা' উপন্যাসের প্রশংসা করতে গিয়ে এই সংযমের ওপর জোর দিয়েছেন। একজন সোভিয়েট শিল্পী হিসেবে তিনি বিজ্ঞানোপন্যাসেও প্রেমকে প্রধান্য দেওয়ায় সোভিয়েট উপন্যাসে রোমাঞ্চকর ভাবলৌকিকতার প্রভাবের প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ভাবলৌকিকতা 'আলিয়েতা' উপন্যাসে অবৈজ্ঞানিক কল্পনার ওপর ভর করেনি। আপেক্ষিক গতিতত্ত্বের কথা অনায়াসে সংলাপের মধ্যে এনে এলেক্সি টলস্টয় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যত সহজভাবে তিনি গল্প বলেছেন, তত সহজ গল্প "আলিয়েতা" নয়। তাছাড়া 'আলিয়েতা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক আগামী দিনে গ্রহে গ্রহান্তরে ছড়িয়ে যাওয়া এবং ছড়িয়ে

থাকা মানব সমাজের যোগাযোগের সমস্যাকে জরুরী তাগিদ হিসেবে সামনে রেখে দিয়েছেন।

এলেক্সি টলস্টয় বিজ্ঞানোপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হওয়ায় স্বভাবতই উপন্যাসের শিল্পরূপের গতি পরিণতিতে বিজ্ঞানোপন্যাসের প্রবণতা একটা মূলধারা হতে পারে এ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহের ভূমিপৃষ্ঠ উপন্যাসে শুধু ক্ষুধিত পাষাণ হয়েই থাকবে না। তারা নগরজীবনযাত্রার পাদপীঠ হবে। এরপরে গ্রহ গ্রহান্তরের জগতে আমাদের ছোট্ট পৃথিবীর মেঘরৌদ্র, সুখদুঃখ, মিলনবিরহ, যুদ্ধ শান্তিকে হয়তো মনে হবে মহাশূন্যে উড়ন্ত পালকের মতোই ক্ষণিকের জন্য ঝিকমিক করছে। প্রশ্ন উঠবে, মহাজাগতিক রশ্মি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুখোশপরা মানব-মানবীর কোন মুখাবয়ব থাকবে কি? অধর স্পর্শ করতে চাইবে অধরকে? মানবমানবী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরস্পরকে কি করে বলবে, "আমি ভালবাসি; তুমি সুন্দর?" বহির্বাস্তবের এযাবৎকালের ভূমিপৃষ্ঠে যে পারস্পরিক ও বহুজনীন সম্পর্কের পর্যায়ে পর্যায়ে প্রসারিত ও গভীরতর করে প্রকাশ করে এসেছে, তারা যদি এক লাফে অনেক খানি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন উপন্যাস-শিল্পের চিরায়তিকতার উপকরণগুলি কি বিজ্ঞানোপন্যাসে কিছু মাত্র বজায় থাকবে? শিল্পী কি আবার নতুন ধরনের রবিনসন ক্রুসো লিখবেন? বিশ্ব প্রকৃতির সীমাহীন পটভূমিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে ও মানুষের পারস্পরিক যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক দ্বন্দ্ব-মিলনাত্মক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানবাত্মর বিকাশ কাহিনী এক অভিনবতর কথাশিল্পকলার জন্ম দেবে কি? উপন্যাসের শিল্পরূপের নিগূঢ় মানবিকতার আনন্দ আর্তি ও পরিহাস এতেও ঝঙ্কৃত হবে কি? ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের রহস্য লহরীর-ধরনের কোন কোন যান্ত্রিক ও অস্বাভাবিক যোগাত্মক বিজ্ঞানোপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে এ সংশয় জাগে।

কিন্তু বিজ্ঞানই আবার মানুষকে তার আপন মনের গহনতম কন্দরে নিয়ে যাচ্ছে। আর বিজ্ঞানের বিশাল কর্মকাণ্ড মানুষের মুঠোর মধ্যে তুলে দিচ্ছে জ্যোতির্জগতে উল্লম্ফণের শক্তি, তার পাটাতন হচ্ছে বহু জনসমাবেশ। এখানেও স্বাধীনতা সাম্য আর সমাজতন্ত্রের তাগিদ হবে সাফল্যের চাবিকাঠি। সুতরাং যে বিজ্ঞান মানুষের জৈব আত্মিকতায় সংকট এনে উপন্যাসের নিগূঢ় মানবীয় সম্পর্ক ঘটিত রূপটিকে ফিকে করে দিতে চাইছিল, তাই মানব মানবীর মনকে এমনভাবে সাজিয়ে দিচ্ছে যে, মহাজগতের বাসিন্দাদের মুখোশের তলাতেও আরও লক্ষ লক্ষ বছর ছল ছল করবে জৈবিক আত্মিক অবিকৃত সহজ কামনা। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে লোকভাষাও, কারণ মানুষকে সূর্যের কালো গুহায় গেলেও মহানগরী আর বাসা তৈরি করে নিতে হবে।

আলো দিয়ে আলো জ্বালা

সোনার হরিণ

সৌন্দর্য সৃষ্টির একই আধারে যে বৈপরীত্যের সমাবেশ, তাও তথাকথিত কোন একটা কাঠামোতে সংলগ্ন হয়ে থাকার ব্যাপারে, একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হবার ব্যাপারে শিল্পী চিত্তের সহায়ক আর প্রতিকূলতার উৎস হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের অন্যতম আদি কবি বাল্মীকির সোনার হরিণরূপী রাক্ষস চিত্র এই বৈপরীত্যের একটি দৃষ্টান্ত। কিংবা বলা যায়, সোনার হরিণ যে উপাদানে গড়া যায় সেই দৃষ্টান্ত। শিল্পীর স্বপ্ন এর দুই বিপরীত দিকে প্রক্ষেপিত রূপে দ্বিধা বিভক্ত। এর একটা রূপ পরিতাপের আরেকটা রূপ স্নিগ্ধতার। একে বলা যায় সুন্দরের অভিশপ্ত সাধনা! এরই একদিকে দেখা যায়, এই অভিশাপের সুতোয় বুঝিবা গাঁথা রয়েছে প্রাচীন কালের কাব্য থেকে শুরু করে আধুনিক গীতিনাট্য! মানুষের ভাগ্য বিপর্যয়ের, অশ্রু ও রক্তের হাল্কা ভারী পরিচয়ের যে ধারা বয়ে চলছে বিশ্ব কাব্য সাহিত্যে তাতে একটা অভিশাপ বার বার উচ্চারিত হয়েছে যার লক্ষ রয়ে গেছে একটা বিশেষ বস্তুর বিশেষ অবয়ব। এই সর্বনাশা আর কেউ নয়, এ হলো সোনার হরিণ। এই সর্বনাশা আর কেউ নয়, এ হলো ওর গায়ের স্বর্ণপিণ্ডা বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়িকা ধরিত্রী কন্যার মনে যে স্বর্ণমৃগ মোহ ছড়িয়েছিল, সেই নানারূপে যুগে যুগে শিল্পীর পর শিল্পীর চোখের ফাঁদে পড়ে এ কালের প্রান্ত পর্যন্ত চুম্বক পাহাড়ের মত আকৃষ্ট করেছে সমগ্র জীবনকে তার চারধারে, দিয়েছে চূর্ণ করে সাত সাগরের যাত্রীবাহী জাহাজকে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকবরী' নাটকের মাটির তলা থেকে তোলা মরা সোনাই 'বল্মীকির সোনার হরিণ।' তাইতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রতীক নাটকটির ভূমিকায় পরিহাসের ছলে জানিয়েছেন, 'আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেইতো আজকের দিনে সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াটা শীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?' তফাৎ আছে নিশ্চয়। রামায়ণের সোনার হরিণরূপী রাক্ষসের তীরবিদ্ধ দেহটাই একালের গীতিনাট্যে ঠেকেছে, তবে পচে গলে সোনার দলায় পরিণত হয়ে গিয়েছে সে অনেক আগেই, ধাতব ধুলো হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই; গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে ইংল্যাণ্ডের শেক্‌সপীয়র আর জার্মানির ভাগনারের লেখা পেরিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও এই সোনার দলা তাই মুদ্রিত করেছে অভিশাপের ছাপ। সোনার হরিণ কবে মরে গিয়েছে, কিন্তু এর মৃতদেহটাই জাগিয়ে রেখেছে কী রূপতৃষ্ণা, কী লোভ, কী মোহ আবহমান কাল। এই লোভে, এই মোহ লক্ষণ হয়েছে, কারণ হয়েছে অভ্রভেদী-শির মানব-মানবীর পতনের।

অধ্যাপক জর্জ টমসন তাঁর 'মার্কসবাদ ও কবিতা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, চিত্তাকর্ষক বৈভব সোনা যুগে যুগে মানুষের জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি ট্রাজেডির কারণ হয়েছে। শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক জর্জ টমসন লিখেছেন : "শেক্‌সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকগুলির ভয়াবহতা ও ভাবাবেগের আতিশয্যের তলায় যে অভিশাপ সুগভীর স্বর ঝঙ্কারের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, তা হলো সোনার অভিশাপ।" গ্রীক নাটকের এই একই অভিশাপ কাজ করেছে, এই তাঁর

সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গক্রমে এরিস্টটল কথিত একটি গল্পের উল্লেখ করেছেন তিনি। মিডিয়াস ছিলেন ফ্রিজিয়ার রাজা; দেশটি ছিল সোনায় ভর্তি; রাজা এর উপরেও চাইলেন সেই শক্তির অধিকারী হতে যার দৌলতে তিনি যা ছোঁবেন তা-ই সোনা হয়ে যাবে ; শেষ কালে তিনি আহার্যের অভাবে না খেতে পেয়ে মরলেন, কারণ সব কিছুই সোনা হয়ে গেল তাঁর স্পর্শে। অধ্যাপক জর্জ টমসন দেখিয়েছেন যে গ্রীক নাট্যকার সফক্লিস এবং ইউরিপাইডিসের লেখায় লোভ ও পাপ, পতন ও মৃত্যু, যন্ত্রণা ও ক্ষোভের মূলে এই কারণটি ক্রিয়া করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকবরী' নাটকের সোনার খনির কাজ সম্পর্কে কয়েকটা পঙ্‌ক্তি তুলে নিয়ে অধ্যাপক জর্জ টমসনের অভিমতকে সমর্থন করা যেতে পারে।

পংক্তিগুলি এই :

নন্দিনী - আচ্ছা, রাজা, বলতো পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয়না?

রাজা - কেন, ভয় কিসের?

নন্দিনী - পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসো। দেখছ না এখানে সবাই যেন রেগে আছে কিম্বা সন্দেহ করছে কিম্বা ভয় পাচ্ছে ?

নেপথ্যে - অভিসম্পাত ?

নন্দিনী - হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

জার্মানির গত শতকের সুরকার ভাগনারের গীতিনাট্য 'নিবলুং-এর আংটি-তেও এই অভিশাপ সূত্রস্বরূপ। রাইন নদীর তলায় যে সোনার পিণ্ড জ্বলছিল, তাকে হরণ করল নিবলুং আলবেরিখ, কারণ সে শুনলো যে ঐ সোনা দিয়ে যে আংটি তৈরি করতে পারবে, সারা পৃথিবী আসবে তার দখলে। আংটি সে তৈরি করল। কিন্তু দেবতারা ছলে বলে সে আংটি কেড়ে নিয়ে গেল। পিছনে পিছনে গেল নিবলুং-এর অভিশাপ। যার কাছে যাবে সে আংটি, তার ধ্বংস অনিবার্য। হলোও তাই। দানব, মানব, শেষ পর্যন্ত দেবকন্যা সমেত দেবতাদের প্রাসাদও ধ্বংস হল। ফিরে এলো সেই সোনা রাইনের তলায়। এ সোনাও অভিশপ্ত। 'রক্তকবরী' নাটকের পৃথিবীর মরা হাড় নয়, ভগনারের সোনা সজীব, বিভাময়। এ সোনা বহু দূর কালের চঞ্চল হরিণের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে সে তার ছদ্মবেশ। আসলে ভগনারের চোখে এই সোনা অশ্রু, রক্তপাত ও তিক্ততার প্রতিভূ।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী ' নাটকের বিশেষত্ব এই যে, সোনার অভিশপ্ত রূপ নিয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, তাদের হার মানিয়েছে এর প্রতি শিল্পীর ঘৃণার মৌলিক অভিব্যক্তি। এ সোনার যেন এক ফোঁটা প্রাণ নেই, এক কণা রং নেই, এ মৃত্যুর প্রতীক। এর বিপরীত যা তা অপর এক বস্তু। জীবনের প্রতীক হলো রক্তকবরী। বুনো রক্তকরবীতেই হলো যত সুষমা, যত রং, যত প্রাণ। অভিশপ্ত সোনা মানব মানবীর পারস্পরিক সম্পর্ককে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, বিষাক্ত করে দেয়। বুনো রক্তকরবী গ্রন্থিত

করে দেয় নরনারীর হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায়, সেই ভালোবাসায় যা বিচ্ছেদকে, অপঘাতকে, বিপর্যয়কে, ধ্বংসকে তুচ্ছ করে দেয় তার প্রাণবক্তা দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে।

কিন্তু 'রক্তকরবী' ও শেষ কথা নয় সোনার স্বপ্নের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীচিত্তের অভিব্যক্তিতে। সোনার অভিশাপের বিপরীত রূপটি উদগ্রভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখায়। এ দিকটাতে সোনা অভিশাপ নয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ও সে। মানুষের দূরতম মহত্তম অভিযাত্রার পাথেয় সে। গীতাঞ্জলিতে সোনার ছড়াছড়ি কি আমাদের একটা মহৎ উপলব্ধি যোগায় না ? এমন কি যে 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সোনার নাম দিয়েছেন 'নিরেট মদ', সেখানেও সোনার এই রূপটি অনুপ্রবেশ করে বসেছে। অধ্যাপক যেখানে নন্দিনীকে বলেছেন: "এই যক্ষপুরে আমার যা কিছু ধন সবই ধুলোয় নাড়ীর ধন-সোনা। কিন্তু তুমি যে সোনা সেতো ধুলোর নয়, সে যে আলোর।"

সোনার দুই বিপরীত রূপকে সমান্তরাল ভাবে চিত্রিত করেছে এমন লেখাও রবীন্দ্রনাথের রয়েছে। "শ্যামলী" কাব্যগ্রন্থের 'অমৃত' কবিতার পর পর দুটি ছবি বিবেচনাযোগ্য।

প্রথমে,

> দিন যায় রাত যায়
> মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
> সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
> ততই আমাকে ঠেলে চলে
> থামতে পারিনে, থামতে পারিনে তার তাড়না।

পরে,

> কর্মের নেশায় ঝাঁজ এল মরে।
> এত কালের খাটুনি মনে হোলো যেন ফাঁকি,
> প্রাণ উঠল দু'হাত বাড়িয়ে
> জীবনের সাচ্চা সোনার জন্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন। তিনি একই উপাদানের দুই বিপরীত রূপকে নিজের লেখায় সাধারণত কখনো একেকে কখনো অপরকে রাত্রির অন্ধকার আর দিনের অরুণালোকের মতো নিবিড়তম ভাবে অভিব্যক্ত করে কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে দুই বিপরীত রূপকে পাশা পাশি সাজিয়ে এ ব্যাপারে অনন্যসাধারণত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই বৈপরীত্যের সমাহারের ব্যাপারে শিল্পীচিত্ত পূর্বেও সাড়া দিয়েছে।
হয়তো 'উত্তর রামচরিত' এর স্বর্ণসীতাই স্বর্ণ সঞ্চয়ের মানবিক দিকের প্রথমিক রূপরেখা। তবে এই মানবিক দিক নিংড়ে বের করেছে বহু শতাব্দীর ব্যবধানেও শিল্পীর কাছে থেকেও একই ধরনের স্বীকৃতি।

শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকে বৈপরীত্যের সমাবেশ লক্ষণীয়।

প্রায় চার শতাব্দী আগে শেক্‌সপীয়র ইটালির ভেরোনা নগরীর রোমিও জুলিয়েটের প্রেম নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। তখন মানুষের মনে সোনা সম্বন্ধে যে তীব্র আকর্ষণ বিকর্ষণ ছিল, সে বিষয়টি এখানে প্রণিধান যোগ্য।

নির্বাসনে বসে রোমিও শুনল যে তার প্রণয়িনী জুলিয়েটের মৃত্যু হয়েছে, তখন সে ঠিক করলো সেও আর প্রাণ রাখবে না; জুলিয়েট যেখানে সমাধিস্থা, সেখানে বসে সে আত্মহত্যা করবে বিষ পান করে। এ জন্য জুলিয়েটের কাছে ফেরার জন্য যাত্রা করে সে গেল পাঁচন বিক্রেতার কাছে। তার কাছ থেকে দুরন্ত বিষ নিয়ে, পরিবর্তে মোহরের থলি নিয়ে বলল :

'এই নাও তোমার সোনা,
মানুষের মনের জন্য
এ হচ্ছে আরো দুরন্ত বিষ।
এই ঘেন্না ধরে যাওয়া দুনিয়ায় যেখানে
তুমি তোমার বিষ বিক্রি করতে চাও না
সেখানে এই বিষ তোমার বিষের চেয়েও
বেশি নরহন্তা।
আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম বিষ,
তুমি করোনি।'

সোনার এই মূল্যায়ন কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যে একেবারে বদলে গেল। রোমিও জুলিয়েটের মৃত্যুর পরে নাটকের যবনিকা পতনের আগে ভেরোনার রাজা রোমিওর বাবা মন্টেগু এবং জুলিয়েটের বাবা ক্যাপুলেটকে তিরস্কার করলেন যে এই দুই পরিবারের শত্রুতা ও রেষারেষির জন্যই রোমিও জুলিয়েটের প্রেম সার্থক না হয়ে উভয়ের মৃত্যুকে ডেকে আনল। তখন ক্যাপুলেট মন্টেগুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন :

> 'ভাই মন্টেগু ! আমার হাতে তোমার হাত খানি দাও। কারণ এর থেকে বড় কোন যৌতুক আমার মেয়ের পক্ষ থেকে আমি দাবি করতে পারিনা।

মন্টেগু তার উত্তরে বলল :

'কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু দিতে পারি ;
কারণ আমি খাঁটি সোনায় তার মূর্তি গড়িয়ে দেব,
যতদিন ভেরোনার নাম থাকবে দুনিয়ায়
ততদিন এখানে আর
সতীসাধ্বী জুলিয়েটের মূর্তির চেয়ে দামী
মূর্তি কেউ বানাতে পারবেনা।'

ক্যাপুলেট বলল :

'একই দামী রোমিওর মূর্তি তার
প্রণয়িনীর পাশে শয়ান থাকবে।
আমাদের শত্রুতার এরা হবে
অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ।'

এই ধরনের ঘটনা তখন ঘটেছিল, কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তখন সবেমাত্র সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। এই পরস্পর বিরোধিতা পরবর্তীকালে ধনতন্ত্রের প্রসারের মধ্য দিয়ে আরো তীব্র হয়েই দেখা দিয়েছে।

পুঁজিবাদ এর সমাধা করতে পারেনি, পারবেনা। এর সমাধানের তাগিদ নিয়ে এসেছে, আসছে সাম্যবাদী সমাজ।

শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা

(আহমেদুর রহমানের স্মরণে)

স্বাধীনতা এবং সততাকে আজ যে ব্যাপকতা ও গভীরতা সহকারে শিল্পী চরিত্রের অপরিহার্য উপকরণ রূপে দেখা হচ্ছে দেশে দেশান্তরে, এ ভাবে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা হয়নি। এর কারণ এই যে, সাধারণ ভাবেই স্বাধীনতা এবং সততা এবং সভ্যতা বিকাশের সাঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতর ভিত্তিতে উত্তরিত হতে হতে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী সমাজ বিপ্লবের আবহাওয়া এবং কালান্তরের নতুনতর সম্ভাবনায় উপনীত হয়েছে। এরা সমৃদ্ধতর হয়েছে, এদের ভিতরকার সারসত্তাতেও পরিবর্তন এসেছে। শেখ সাদীর স্বাধীনতা প্রিয়তা এবং সততাবোধ আমাদের আজো অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু সেই অপেক্ষাকৃত সারল্যের দিনগুলিকে আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। যেহেতু এটা শ্রেণী আধিপত্যের হাজার বছরের চলে আসা সমাজ থেকে সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজে যাবার কালান্তরের শতাব্দী, সেজন্য স্বাধীনতা এবং সততাকে পৃথকভাবে কিংবা একসঙ্গে সম্মুখীন হতে হচ্ছে বৈপ্লবিক রূপান্তরের অগ্নি পরীক্ষার। স্বাধীনতার এবং সত্যনিষ্ঠার জন্য শিল্পীর নিজস্ব তাগিত কিংবা জনগণের তরফ থেকে শিল্পীর কাছে এই দুই উপকরণের দাবী বিশ্বব্যাপী আলোড়নে ও ঘাত প্রতিঘাতে স্পন্দিত। যে সব দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে কিংবা গড়ে উঠবার মুখে, সেখানেও শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা বিকাশের প্রশ্নে যবনিকা পতন হয়নি ; সেখানে মাত্র প্রথম দৃশ্য, কিংবা বড় জোর দ্বিতীয় দৃশ্যের পর্দা উঠেছে। পরিবর্তমান কিন্তু অনেকাংশে আজও পর্যন্ত পিছিয়ে থাকা দুনিয়া থেকে এইসব দেশ বিচ্ছিন্ন নয়, এদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অন্যের উপরও পড়েছে। দ্বিতীয়ত, হাজার হাজার বছরের মানব সমাজের অর্থনৈতিক-জৈবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জের চলছে এসব দেশে, নিকট ভবিষ্যতেও কি চলবেনা? আর যে সব দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা এবং সততার তাগিদ মাথা খুঁড়ছে সামাজিক অচলায়তনে, সেখানে হলিউড চলচ্চিত্রজগতের বামপন্থী তাত্ত্বিক জন হাওয়ার্ড লসনের ভাষায় : 'স্বাধীনতার ধারণাকেই স্বাধীন করার কাজ রয়েছে সামনে।' এখানে স্বাধীনতার ও সততার ডানা আছে, কিন্তু পায়ে শিকল।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততার প্রশ্ন ফ্রান্সের অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের মতো আরও অনেকের মনে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখেছে। শিল্পীর বুকের মধ্যে প্রশ্নের কাঁটা বিবেকের যন্ত্রণা। 'দি আয়রন ইন দি হার্ট' সার্ত্রের একটি উপন্যাসের নাম শুধু নয়,তাঁর নিজস্ব মনের আয়নাতে একালের উৎকণ্ঠিত

শিল্পীদের চেহারা। সমস্ত দেশেরই শিল্পীর মনে কম বেশি এই প্রশ্নের কাঁটা। বিপ্লব-পূর্ব চীনের উপন্যাস 'আগস্ট মাসে গ্রাম' একালের শিল্পীর মনের কথা। নায়ক বলেছিল, বিপ্লবীর জীবন সে তো বিষের পেয়ালা। পান করতেই হবে, গত্যন্তর নেই।' একালের জটিল জীবন যাত্রার দরুন অনেক সময় আদিম জীবনে ফিরে যেতে চায় শিল্পী, ম'মের উপন্যাসের চিত্রশিল্পী নায়কের মতো দক্ষিণ সাগরের দ্বীপমালায়। কখনও ভবিষ্যৎবাদী হয়ে এক লাফে পার হয়ে যেতে চায় শিল্পী স্বাধীনতা আর সততার কল্পলোকে ঝড়ের পিঠে পা দিয়ে। কিন্তু সেটা সাধারণভাবে সম্ভব নয়, সার্ত্রে এদিক দিয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী। তিনি রূঢ় বাস্তবের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছেন। শিল্পীর পরিচয় শুধু এই নয় যে সে শিল্পী। শিল্পীর পরিচয় সে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত এবং এই মানুষকে স্বাধীন হতে হয় এবং সক্রিয় হতে হয়। শিল্পী ও জনতাকে একই সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় বিশেষ করে এই শতাব্দীতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জীবন সংগ্রামের মধ্যে রাগ, ঘৃণা এবং ভালবাসার জীয়ন্ত সূত্রে গ্রথিত হয়ে। স্বাধীনতা ও সততার অস্ত্রের আলোতে নতুন পথ তৈরি করে স্বাধীনতা ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরবর্তী স্তরের চিন্তায়। স্বাধীনতা অপরিহার্য কিন্তু সততা ছাড়া সে অসার্থক। এবং সততা হচ্ছে সংগ্রাম। ইতিহাসের অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমরা কী দেখতে পাব? এই প্রক্রিয়া কীভাবে গড়ে উঠেছে?

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীক জীবনের আলেখ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা আর সততার উপর একই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। (প্লেটোর প্রজাতন্ত্র এবং সংলাপ গ্রন্থে সক্রেটিস প্রসঙ্গে এর প্রামাণ্যচিত্র রয়েছে। বিষ খেয়ে মরতে হয়েছিল সক্রেটিসকে।) তখন তো শিল্পীর স্বাধীনতা আর সততার প্রশ্নের সমাধানের তাগিদ সদ্যোদ্ভিন্ন অঙ্কুর মাত্র। শিল্পী তথা কবির ভূমিকার কথা উত্থাপিত হয়েছিল সক্রেটিসের বক্তব্যের সামান্য অংশে। মধ্য যুগের অবসানের প্রাক্কালে ইউরোপে রেনেসাঁ বা মুক্তচিন্তার নব অভ্যুদয়কালে ইটালিতে কবি দান্তের জীবনে সততার তাগিদ এনেছিল অশান্তি আর অতৃপ্তি, অস্থিরতা আর বিদ্রোহ। রাজনৈতিক সততা আর স্বাধীনতার তাড়না প্রতিফলিত হয়েছিল জীবন যাপনের এবং মানবিক মূল্যাবোধের নতুনতর বিন্যাস প্রয়াসে। কবি দান্তের মনন শুধু তাঁর প্রণয়িনী বিয়াত্রিচে সম্পর্কিত প্রশান্ত প্রেমে নিবদ্ধ ছিলনা, তাঁকে প্ররোচিত করেছিল কর্তৃপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে বাঙময় হতে। ইটালির সীমিত দিগন্তের সেই সব দিনগুলি ইউরোপে যে দোলা এনেছিল, সেগুলি ফারসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্যাপকতর দিগন্তের ঝড়ের বেগে দেখা দিল। আপেক্ষিক ভাবে রক্ষণশীল বৃটিনেও বার্নস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের যুগে এর তাড়না উল্লেখযোগ্য। শেলী আর কীটস্ যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—স্বাধীনতা আর সততার। সৌন্দর্য আর সত্যের ঐক্য জীবনের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যদিও কীটসের মৃত্যুতে শেলীর খেদোক্তি আচ্ছাদিত করে রেখেছে শেলীর 'বন্দী প্রমিথিউসের মুক্তি' কবিতার উৎফুল্লতাকে। পরবর্তী পর্যায়েও উঠেছিল তিক্ততার হলাহল। ফারসি বিপ্লবের ভাবধারাকে পরিত্যাগ করায় জনৈক প্রবীণ কবি দাঁড়িয়েছিলেন পরবর্তীদের অভিযোগের কাঠগড়ায়। ব্রাউনিং-এর 'পথভ্রষ্ট নায়ক' কবিতাতে দেওয়া হয়েছিল

রায়। এক হাঁড়ি সোনার জন্য দলত্যাগ করায় প্রবীণ তথাকথিত সদাচারী কবিকে নবাগত কবি বিদ্রূপ করেছিলেন। জার্মানির কবি-নাট্যকার গ্যেটের ফাউস্ট নাটকের প্রথম খণ্ডের মর্মন্তুদ পরিণতিতে শিল্পী চিত্তের স্বাধীনতা ও সততার অন্তর্ঘাত প্রতিফলিত। কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিল মার্গারেট। ফাউস্ট তাকে ফেলে চলে এল তার নিজের স্বাধীনতা নিয়ে। স্বাধীনতা ও সততা দুইই হয়ে গেলো অর্থহীন। স্বাধীনচেতা শিল্পীচিত্তের বিবেকের রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রতীক এ দৃশ্য।

আমাদের শতাব্দীতে পৌঁছে দেখব, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরো-আমেরিকার লেখকশিল্পীরা বিশেষ করে প্যারী শহরে স্বাধীনতা আর সততায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে সচেষ্ট। হেমিংওয়ে এবং তাঁর নবীন বন্ধুরা মার্কিনী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মেকি আবরণগুলিকে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে দেখেছিলেন, স্বাধীনতার তাগিদের সঙ্গে সততার প্রশ্নও জড়িত হয়ে পড়েছে। হেমিংওয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বসন্ত নির্ঝর' (টরেন্টস্ অব স্প্রিং) গ্রন্থে যে অন্তর্দ্রোহের ছবি এঁকেছেন, তাঁর মধ্যে রয়েছে নিছক বিদ্রোহের সঙ্গে সততার রসায়ন। এই উপন্যাসে হেমিংওয়ে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের নিরাভরণ বেদিয়া জীবনকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তদানীন্তন শিল্পীদলের একটি মনোভাবকে প্রকাশ করেন। তাঁর সামান্য সমস্যা ছিল কপটতার সমস্যা সাহিত্যের প্রচলিত বাকসজ্জাকে তাঁরা কপটতার প্রতিভূ বলে মনে করতেন। তাঁরা দেখতেন, প্রচলিত কথাগুলি ব্যবহারিক জীবনে নানা রকম ছদ্মবেশ পরে বসে আছে। বাকসজ্জার এই কপট আবরণকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য হেমিংওয়ে সততার ভাষায় উপন্যাস লেখা শুরু করেন। প্রায় একই সময়ে ডি. এইচ. লরেন্স বলশেভিকবাদকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, শুধু একটা বিরাট ঝাড়ু হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পশ্চিমী সভ্যতার জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য। এই দুই শিল্পীর স্বাধীনতা আর সততার তাগিদে ফাঁকি ছিল না। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ছিলেন একলা চলার শিল্পী। এই কারণে কোন সমীকরণে পৌঁছাতে পারেননি তাঁরা, রেখে গিয়েছিলেন শুধু আক্ষেপ।

আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিবেশে আসা যাক। নিকট অতীতের দৃষ্টান্ত কাজী নজরুল ইসলাম। স্বাধীনতা ও সততার অগ্নি পরীক্ষায় নিয়োজিত শিল্পীর প্রতীক। কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' 'ঝড়' (পশ্চিম ও পূর্বতরঙ্গ) এবং 'কৈফিয়ত' কবিতায় আমাদের প্রিয় কবির স্বাধীনতাপ্রিয়তা আর সততাবোধের স্বাক্ষর আঁকা আছে যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রক্ত দিয়ে লেখা।' 'বিদ্রোহী' কবিতা স্বাধীনতা বিক্ষুব্ধ প্রতীক। 'ঝড়' কবিতাতে ব্যবহারিক জীবনের আকর্ষণ বিকর্ষণ এসে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কপটতার আবরণে মুখ ঢাকেননি কবি, জিহ্বাকে দিয়ে বাস্তবকে অবাস্তব প্রতিপন্ন করেননি। বিদ্রোহী কবিতাতে কবি বলেছিলেন, অত্যাচারীর খড়ুগ কৃপাণ বহাল থাকতে শান্ত হবেন না; কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র; জীবন সরল রেখায় চলে না; হঠাৎ বিপ্লবের লালঘোড়া ছেড়ে গৃহবাসী হতে হল কবিকে। তাঁরই স্বীকারোক্তি 'ঝড়' কবিতা। 'কৈফিয়ৎ' কবিতা স্বাধীনতা ও সততার রাসায়নিক মিশ্রণ। বাংলা কবিতাতে স্বাধীনতার উদগাতা বিদ্রোহী হৃদয়ের এই সুস্পষ্ট ব্যাকুলতা এবং আর্তি আমাদের সামনে শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততার প্রশ্নকে তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে জাগরূক করে রেখেছে। সংগ্রামী কবি হৃদয়ের আকর্ষিত ও বিকর্ষিত চেহারা এই কারণেই আমাদের

কাছে অজানা থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐকতান' কবিতার মধ্য দিয়েও সততার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন আমাদের সামনে। তিনি বলেছেন, তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয়নি।

সততা একটি সংগ্রাম। অনেক সময় কপটতার আবরণ ছিঁড়বার জন্য নিজের অহমিকার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। 'পুরস্কার' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিছক গৃহীর সততার সারল্যের প্রতিচ্ছবি করে তুলে ধরেছিলেন। অপরদিকে তিনি 'অমৃত' কবিতাতে ঘর ছাড়া বিপ্লবীর সততাকে সামনে এনেছিলেন। এর আগে মেশিনগানের সম্মুখে গেয়েছিলেন জুঁই ফুলের গান। তাঁর গানগুলিকে নিয়ে খেলা করার প্রবণতাকেও ঢাকবার চেষ্টা তিনি করেন নি। আমরা শিল্পীর স্বাধীনতা আর সততার এই দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় বিকশিত হয়ে ওঠার যন্ত্রণাকে তাঁর কবিতার আয়নায় অগ্নিশিখার মতো দেখতে পেয়েছি। শেষের দিকে কবিতার যন্ত্রণা জ্বালামুখী হয়ে উঠেছে কি এই কারণেই?

সমসাময়িক লেখক ও কবি শিল্পীদের সামনে এই প্রশ্নকে শুধু আত্মজিজ্ঞাসা হিসেবেই রাখব। সার্ত্রে দূরদেশের লেখক শিল্পী। কাজী নজরুল ইসলাম আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তকে আমরা কতখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছি? আমাদের স্বাধীনতা আর সততার তাগিদ আগুন ছড়াচ্ছে কি? আথবা আমরা এ ব্যাপারে নিছক প্রতিবিম্ব?

আহমেদুর রহমান এ প্রশ্ন করেছিলেন। এর জবাব তিনি পেয়ে যান নি। আমাদের চারিদিকে একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব বিরাজমান। এর অর্থ কি এই যে, স্বাধীনতা আর সততার একটা সমীকরণ আমরা করেছি, সেই জন্যই আমাদের অস্থিরতা নেই? সারা বিশ্বের যে যুগের আমরা সন্ততি, সেখানে কি এটা সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের বুকে কাঁটা নেই? আমাদের হৃদয় রক্তাক্ত নয়? আহমেদুর রহমান কিন্তু সন্তুষ্ট চিত্তে মরেন নি। তিনি কিছুটা নিজের শিল্পী মনের স্বাধীনতা ও সততা-প্রিয়তাকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে প্রকাশ ছিল গণ্ডি ঘেরা। তাই জ্বালা ছিল তাঁর মনে। সততার সাহস ছিল তাঁর মনে। তিনি জানতেন যে সাম্যবাদী সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদগাতা কবি মায়াকোভস্কি স্বাধীনতা এবং সততার প্রশ্নে দ্বিধাহীন ছিলেন। মায়াকোভস্কি লিখেছিলেন, "আমার একটাই মুখ আছে; আমি হাওয়াই মোরগ নই যে যেদিকে হাওয়া সেদিকে মুখ পাবে আমার।" আমরা যারা আহমেদুর রহমানের শিল্পীচিত্তের স্বাধীনতা ও সততার উত্তরাধিকারী, আমরা কি একথা বলছি? আমরা কি আমাদেন হৃদয়কে বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে জনগণের সামনে রাখছি, ঠিক যেমনভাবে ম্যাক্সিম গোর্কি রেখেছিলেন অসংকোচে।

আমরা যে কালের পৃথিবীতে আছি, তার কথা হয়তো আবার এ প্রসঙ্গে মনে করা দরকার। শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা এই শতাব্দীতে যে কি-রকম জ্বলন্ত প্রশ্ন, সে কথাটা আবার মনে করিয়ে দেবার জন্য একটা কবিতা দাখিল করছি। এ কবিতার লেখক জার্মানির বার্টোল্ড ব্রেখট। এই শতাব্দীর স্বাধীনতা ও সততার সমীকরণের তীব্র তাগিদের অন্যতম প্রতিভূ এই বার্টোল্ড ব্রেখ্ট। উনিশশ ষাটে আমরা তাঁকে হারিয়েছি। তাঁর নাটক আর কবিতার বইগুলি জীবনের বেদনার প্রাচীরে আশার অগ্নি পতাকা তুলে ধরেছে। সাম্যবাদী এই কবির কাছে আমাদের পাঠ নেওয়া বাকী আছে

এখনও। তাঁর যে কবিতার কথা উল্লেখ করেছি, সেটি হিটলারী ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের আমলে লেখা, নির্বাসনে বসে। পুরানো কবিতা, কিন্তু খুব পুরানো নয়। কবিতাটির সরল গদ্যভাষ্য এই :

যখন সরকার হুকুম দিলেন,
বিপজ্জনক চিন্তাধারার বইগুলি
প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং সর্বত্র
তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রজ্বলিত চিতাবহ্নিতে
গাড়ি গাড়ি স্তূপীকৃত বই নিয়ে ফেলা হল,
সর্বত্র এ সব গাড়ি টানানো হল
বলদদের দিয়ে জোর করে,
তখন নির্বাসনে বসে এক কবি,
সবার সেরা কবিদের একজন,
ঐ জ্বালিয়ে দেয়া বই-এর তালিকা পড়তে পড়তে
ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি দেখলেন,
তাঁর বইগুলির কথা ওরা ভুলে গিয়েছে।
কবি রাগের পাখাতে ভর দিয়ে
যেন উড়ে গিয়ে বসলেন তাঁর লেখার টেবিলে,
তারপর উপরোক্ত সরকারের কাছে
ক্ষমতাসীনদেন কাছে লিখলেন,
আমাকে পোড়াও, আমাকে পোড়াও তোমরা।
ঝড়ের বেগে চললো তাঁর কলম,
আমার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ তোমরা করো না।
আমি কি আমার বই-এর মধ্যে
সব সময় সত্য কথা বলিনি?
আর এখন তোমরা আমার সঙ্গে
এমন ভাব করছ যেন আমি একটা মিথ্যাবাদী?
হুকুম করছি আমি
আমাকে জ্বালিয়ে দাও।

মানবিক মূল্যবোধে অমরতার নিরিখ

আমাদের এই সসাগরা রত্নসম্ভবা পৃথিবী যেমন একদিকে স্নেহময়ী, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে উদাসীনা। সন্তান-সন্ততির স্মারক চিহ্নকে সে কখনো আঁকড়ে ধরে রাখে, কখনো টান মেরে ফেলে দেয়। তাই দেখা যায় উপরদিক থেকে যাকে একান্ত ভঙ্গুর মনে হয়, সে রকম অনৈতিহাসিক কোন একটা স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর আঁচলে যেন গিট দিয়ে বাঁধা আছে। অপর দিকে পর্বত শিখরের মতো স্থায়ী বলে মনে হয়েছে যাকে তা নিক্ষিপ্ত হয়েছে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালে। সবার উপরে যে মানুষ সত্য তাকেই তাই যুগ যুগান্তর

ধরে সেই অমরতার সূত্র ধরে রাখতে হয়েছে, রক্ষা করতে হয়েছে, যাতে দৃশ্য অথবা অদৃশ্যভাবে গ্রথিত রয়েছে সামান্য আর অসামান্য নির্বিশেষে সেই মানুষের কীর্তি বা কাজগুলো, যাদের মালা করে গেঁথে বিকশিত হয়ে চলেছে মানুষের যত সৌন্দর্যের মূল্যবোধ। কত হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের হানাহানি রক্তসাগর-সেঁচা এই মানবিক বোধে লালিত মুক্তাগুলি! কত হুকুমের উঠ-বস করার মধ্য থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা চির তারুণ্যের উল্লম্ফনগুলি! কত অসিহিষ্ণু বাজীমাতের চালবাজী-কাটিয়ে-ওঠা প্রজ্ঞার সুশান্ত প্রত্যয়গুলি! মানব সমাজের স্মৃতির পরতে পরতে এরা উৎকীর্ণ উত্তরিত হয়ে চলেছে নতুন নতুন তরঙ্গিত মিনারে! কিংবা বলা যেতে পারে চয়ন সঞ্চয়নের বহতা ঝর্ণাধারায় ঐ মূল্যবোধ উৎসারিত হয়ে আসছে সেই রংধনু রং-এর মধ্যে চল্‌কে চল্‌কে পড়ে, যার মধ্যেই সাদা আর কালো, আলো আর অন্ধকার সুশ্রী-কুশ্রীর ভেদ ঘুচিয়ে পরিমিতকে করে চলেছে অপরিমিত আর অপরিমিতকে করে চলেছে পরিমিত।

ইংরেজ কবি জন কীটস্‌ আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীস দেশের মৃৎপাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ রাখালিয়া আমলের ছবি দেখে সেই চিত্রিত পাত্রটিকে উদ্দেশ্য করে যে নিটোল কবিতা লিখে রেখে গিয়েছেন, সেটিও যেন চিত্রিত মৃৎপাত্র, কথার মৃৎপাত্র। কীট্‌স এই ভঙ্গুর মৃৎপাত্রকে অনাগত জরাজয়ী বন্ধু হিসাবে অভিহিত করে বলেছেন, এর বাণী হল সৌন্দর্যই সত্য আর সত্যই সৌন্দর্য এবং পৃথিবীতে এর উপরে জানবার মত আর কিছু নেই। সহজ সরল জীবনের অভিব্যক্তির সুমিতির প্রতীক এই প্রাচীন গ্রীক মৃৎপাত্রকে কীট্‌স এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছেন যে, মনে হয় কীটসের জানালায় কেউ যেন একগুচ্ছ তাজা ফুল রেখে গিয়েছে বাগান থেকে তুলে এবং কবি তা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছেন। আড়াই হাজার বছরের মৃত্যু আর ধ্বংসের ইতিহাস এর সজীবতাকে ঝলসে দিতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের মালায় নতুন ফুল গাঁথা হয়ে গেছে। কীটসের কবিতা। কবির ব্যাখ্যা আর আখ্যান। সৌন্দর্য আর সত্যের দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন। চিরকালের জন্য উচ্চারিত বাণী, কিন্তু অমরতার সূত্র নিঃশেষিত হল না। সে তো নিঃশেষিত হবার নয়। বিংশ শতাব্দীতে ক্রিস্টফার কডওয়েল তুলে নিয়েছেন এই কবিতাকে মার্কসীয় জীবন-বোধের গতিবান সামগ্রিকতাকে বুঝে নেবার জন্য। ভবিষ্যৎমুখী সৃজনাত্মক অনুভবের প্রকাশনা যে সৌন্দর্যে এবং প্রয়োগাত্মক কল্যাণকর আবিষ্ক্রিয়ার অবিশ্রান্ত ধারাবাহিকতা যে জ্ঞানে, তারা একবৃন্তে বিকশিত হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের নতুন জগৎ গড়ার প্রেরণা রূপে। দেশে দেশান্তরে যুগে যুগান্তরে মানবিক মূল্যাবোধ রূপ থেকে রূপে, প্রাণ থেকে প্রাণে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। এই মুল্যবোধের সঞ্চয়নকে কোন বিশেষ দেশ নিজস্ব দেশের নিজস্ব সম্পত্তি করে রাখত পারেনি, সুতরাং ভবিষ্যতেও রাখতে পারবে কি? রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই কারণেই ভিক্ষু আনন্দকে দিয়ে বলিয়েছে 'সুন্দরের কোন জাত নাই মুক্ত সে সদাই।' তাছাড়া গ্রীকরা যেভাবে সুন্দরকে লীলায়িত করেছে, ঠিক সেইভাবেই হাজার হাজার বছর আগে দেশ দেশান্তরের মানুষ সুন্দরের সংজ্ঞা দেয়নি কিংবা সুন্দরকে গড়ে নি মূল্যবোধে অথবা তার কায়ায়। বরং মনে হবে তফাৎটাই যেন বড়। আলাদা হয়েছে বলেই তারা সুকৃতি; এক রকম হলে অনুকৃতি বলে বিবেচিত হত। যেমন নিগ্রো মুখোশের শিল্পকলা অথবা জাপানের কাবুকী নাট্যাভিনয় কিংবা

বাংলার নক্‌সী কাঁথা অজন্তা কিংবা মুঘল চিত্রকলার আদলের সঙ্গে মিললে আমাদের কাছে এরা পানসে হয়ে যেত।

কিন্তু এই যে রূপের কিংবা ভাবের লাল কালো গোলাপেরা, এরাতো নিজে থেকে উৎসারিত হয়নি প্রাণ থেকে প্রাণে। সবার উপরে যে মেহনতী মানুষ সত্য, তাকেই ভাবতে হয়েছে, চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে বারংবার বিদ্রোহ করতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে হয়েছে, সাধনা করতে হয়েছে, খুঁজতে হয়েছে, খুঁড়ে খুঁড়ে দুর্গমে প্রবেশ করতে হয়েছে, বুকের রক্ত ঢালতে হয়েছে, প্রাণোৎসর্গ করতে হয়েছে এদের বাঁচাবার জন্য, অনাগত পুরুষদের কাছে রেখে যাবার জন্য, বিগত পুরুষদের উত্তরাধিকারকে সজীব রাখাবার জন্য। এই সংগ্রাম ও সাধনা কখনও হয়েছে যৌথ, কখনও আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ একক। কখনও একান্তভাবেই জনতার প্রকাশ্য সৃষ্টি সাধনা, কখনও একান্তভাবেই নিভৃতের ব্যক্তির সৃষ্টি-সাধনা। অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে পৌঁছে বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর সে সময়ের গ্রন্থ রচনার অন্যতমা সহায়িকার চোখ দিয়ে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখেছিলেন তাতে গ্রীক আমল থেকে চলে আসা লোক-নাট্যের ধারাবাহিকতাই দেখা গিয়েছিল; খুঁজেছিলেন তিনি সেখানে ব্যক্তিকতাকে, পাননি; আশা প্রকাশ করেছিলেন একদিন লৌকিক, গণব্যঞ্জনাকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসেব সতন্ত্র সৌন্দর্যে উৎসারিত ব্যক্তিব্যঞ্জনা। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সেদিন রাশিয়ার লোক মিছিলনাট্যে দেখেছিলেন, গ্রীক নাটকের শুধু নয়, শেকস্‌পীয়রের নাটকের বিষয়বস্তুকেও নতুন আধারে লালিত। তাঁর আক্ষেপের মধ্যেও একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পার হয়ে মানবিক মূল্যবোধ কিভাবে নতুন আধারে এসে পড়ে এবং লালিত হয়, তারই একটি দৃষ্টান্ত এসেছে বেরিয়ে। একক কিংবা আপাত-একক অথবা গোষ্ঠীগত দৃষ্টান্ত রয়েছে হাজার হাজার বছরের ইতিবৃত্তে যুগে যুগান্তরে ছড়িয়ে। কালো আফ্রিকার লোকশিল্পীদের তৈরি মুখোশের ভাবরূপকে শ্বেতাঙ্গ ফ্রান্সে-ইউরোপে শিল্পীর রংএ-রূপে সঞ্চারিত করে পিকাসো বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন গ্রীক সুমিতির যান্ত্রিক অনুকৃতির ধারাকে। পিকাসো এনেছিলেন এক মানসিক নব জাগরণকে, এক নতুন রেনেসাঁকে। পিকাসোর সতীর্থেরা তাঁর সহায় হয়েছিলেন। এরপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে আফ্রিকা মহাদেশ বিশ্ব মানবের চিত্তজগতে প্রবেশ করেছে মূল্যবোধের নতুন উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে এই ঘটনার মূলে রয়েছে আফ্রিকার কালো মানুষের মহাবিদ্রোহের প্রথম নব পর্যায়। এই তরঙ্গ গণ-তরঙ্গ। এই মূল্যবোধ যে স্বীকৃতি দাবী করছে, তার পিছনে রয়েছে মূলত কোটি কোটি মানুষের প্লাবনাত্মক সুন্দরের আকাঙ্খা। এ আকাঙ্খা আজ নিজের জোরে পথ করে নিচ্ছে। কিন্তু একে একদিন বুঝতে হবে যে এই অভ্যাগতের জন্য চিত্তভূমি তৈরি করেছিলেন পিকাসো এবং তাঁর সতীর্থরাও।

সবার উপরে মেহনতী মানুষই যে সত্য এবং মানুষের মূল্যবোধ যে ভৌগোলিক ও মানসিক সীমানাকে ভেদ করে বিকশিত হয়ে আসছে, তার প্রমাণ একক সাধনার মধ্য দিয়ে দাখিল করেছেন পিকাসো। তিনি যখন শুরু করেছিলেন তাঁর কালো মানুষের মর্মছবির কাজ, তখন আফ্রিকা ছিল ছায়াবৃত, ইউরোপে তখনও রুশ বিপ্লব সফল

হয়নি। পিকাসোর সেদিনকার একক প্রচেষ্টাও তাই সংগ্রাম ও সাধনা হিসেবে আমাদের মূল্যবোধ জগতে স্বীকৃতি পাবে।

সোভিয়েট চলচ্চিত্রকার আইজেনষ্টাইন জাপানি কাবুকী নাটককে জাপানের সামন্ত তান্ত্রিক চিন্তাবরণের খোলস-মুক্ত করে গণ-চলচ্চিত্রের তথা গণ-মুখী সৌন্দর্যবোধের একটি মূল উপাদান হিসাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁকে অবশ্য একক বলব না, কারণ তিনি রুশ সর্বহারা শ্রমিকের মহাবিপ্লবের এবং নব প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী সমাজের কাছ থেকে পেয়েছেন অফুরন্ত প্রেরণা এবং পেয়েছেন সেই শিল্পীর স্বাধীনতার সনদ, যাতে সারা বিশ্বের এবং সমগ্র অতীতের সবকিছু সুন্দর এবং সবকিছু মহৎ পেয়েছে পুনর্বিন্যাসের ও নবজীবনের কর্মকাণ্ড। তবুও তিনি ছিলেন এদিক দিয়েও পথিকৃত এবং তাঁকে ডান ও বাম উভয় ধরনের বিচ্যুতিকে দুহাতে ঠেকিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রের গ্রহণ ক্ষমতা যে মানবিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে কত গভীর, তার প্রাথমিক পরিচয়ের ক্ষণটিতে আইজেনষ্টাইন এবং অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। আইজেনষ্টাইনের প্রতিভা ও সোভিয়েট বিপ্লব পরস্পরের সৃষ্টিধর্মিতায় একাত্মতায় সার্থক হয়েছে। এদিক দিয়ে আইজেনষ্টাইন বিশ্বের সমস্ত একক প্রতিভার কাছেও সার্থকতার সংগ্রাম সাধনার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। পিকাসোও সারা জীবন ধরেই নিয়েছেন এই একক-গণ-যুগ্ম সৃষ্টিধর্মিতার পথ, অবশ্য তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। তাঁর তুলিতে জনতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নাইবা প্রকট হল। যুগযুগান্তের জনগণ আর কবিশিল্পীদের দেশ দেশান্তরের মানবিক মূল্যাবোধের সংগ্রামী সাধকদের সঙ্গে আমরা বাঙ্গালিরাও জড়িত রয়েছি অঙ্গাঙ্গীভাবে। আমরাও এই অবিশ্রান্ত প্রাণের উৎসধারায় সঞ্জীবিত। আমরা পেয়েছি অনেক, পাব অনেক। আমরা আদায় করেও নেব। আমাদের তরফ থেকে দিতেও হবে তেমনি। বিশ্বমানবের যে বিকাশমান সদামুক্ত মূল্যবোধ কোন হুকুমের প্রাচীরকে মানে না, কোন কায়েমী স্বার্থকে মানে না, কোন সঙ্কীর্ণতাকে মানে না, কোন একচেটিয়া কাজকে মানে না, কোন মোড়লকে মানে না। কোন ভ্রুকুটির ধার ধারে না, তারই আমরা বিপ্লবী সৃজনশীল উত্তরাধিকারী। এই সৃজনশীলতার জন্য চাই দুটো খোলা চোখই। গতিবান এক এবং বহুকে একত্রিত করে দেখবার খোলা চোখ। বিদ্যা আর মেহনতকে একত্র করে দেখবার চোখ। সত্য আর সুন্দরকে মিশ্রিত করে দেখবার চোখ। একই দৃষ্টিতে দেখার সজাগ সচেতন মনের হাজার চোখ।

সবশেষে সবার প্রথম কথাটা। নিজের মনের মাধুরী আর যুগের তাগিদ মিশিয়ে গড়ে নিতে হবে মৃত্যুহীন মনোমতকে। কাজটা সহজসাধ্য নয়। কোন কালে ছিল না। রূপকুমার কীটসকে একথা জেনে যেতে হয়েছিল বুকের রক্ত উগ্‌রে উগ্‌রে।

কিন্তু কাজ কঠিন হলেও সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কীট্‌সের চোখের সামনে ছিল ফারসি বিপ্লবের গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক তরঙ্গে উদ্ভাসিত, আগামী দিনের ইউরোপ যাকে তিনি 'শান্তি' নামক কবিতায় আহ্বান করেন। আমাদের সামনে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তরঙ্গে দোলায়িত নতুন পৃথিবী।

অদৃশ্য জনতা

আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে শুধু রক্ষণশীলদের নয় অনেক প্রগতিকামীরও অভিযোগ এই যে, এরা অভিনব–সন্দেহ নেই, কিন্তু এরা জনতার প্রতি বিমুখ। এই অভিযোগের মর্ম আবার শুধু এ নয় যে, আধুনিক শিল্পকলার-সাহিত্যে জনতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অস্বীকৃত। বক্তব্য এই যে, আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্য জনতার পরোক্ষ উপস্থিতিকেও ছেঁটে ফেলে দিয়ে প্রথমত আত্ম-কুণ্ডয়ণকে প্রশ্রয় দেয় এবং দ্বিতীয়ত মানবিক সত্তাকে নিংড়ে বার করে ফেলে রং, রেখা, ধ্বনি আর পাথরের সত্তাকেই ষোল আনা প্রতিষ্ঠিত করে। এই বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে অতি সাম্প্রতিক শিল্পকলা-সাহিত্যের নিষ্ঠাবান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীদের ধৈর্য্যহারারা বলেন, বেশ তাই হোক। এই ধৈর্য্যহীন শিল্পীরা স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে বিশ্বাসও করতে শুরু করেন যে, আত্মকুণ্ডয়ণই সারাৎসার। এদের শিল্পরূপের মানদণ্ডও হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিক উপাদান (Personal element) অথবা নিছক পঞ্চভূত। বৃটিশ কবি হার্বার্ট রীড ও ইটালিয় ভবিষ্যদ্বাদী চিত্রশিল্পী সেভেরিনের মত বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পসূত্রকারদের লেখাকে এঁরা দাখিল করেন প্রামাণ্য হিসাবে, বিশেষ করে ব্যক্তিক উপাদানের প্রাধান্যের দাবীতে। এদের এই ঝোঁক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই ঝোঁকের পক্ষপাতীরা সোভিয়েট সাহিত্যে ব্যক্তিক উপাদানে উৎসাহী আনা আখমাতোভা ও পাস্তেরনাককে ছাড়া আর কাউকে কবি বলতে রাজী নন।

কিন্তু মূল প্রশ্ন এই যে, আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যের মূল ধারাকে কি জনতা-বঞ্চিত কিংবা জনতা-বিমুখ বলে মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভব? যে জনতা গত এক শতাব্দী ধরে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী অভ্যুদয়ের মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার পথযাত্রী, তাকে জীবনের আয়না শিল্পকলা-সাহিত্যের কোন না কোন প্রান্ত প্রতিফলিত না করে থাকতে পেরেছে কিংবা থাকতে পারে?

এ জিজ্ঞাসাও যে আধুনিক শিল্পকলা সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিচারের ক্ষেত্রে সমর্থন পায়নি তা নয়। তবে এর সামগ্রিকতা ততখানি সামনে আসেনি, যতখানি সামনে এসেছে খণ্ডিত তীক্ষ্ণতা। খণ্ডিত বলছি এ জন্য, আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যে জনতার উপস্থিতিকে যে দুইভাবে দেখবার কিংবা দেখাবার সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে তারা সমগ্র আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যকে একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করে না। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে, আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যে জনতা বিমুখ ধারার পাশাপাশি আরেকটা সমান্তরাল ধারায় জনতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিকে চিনিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, জনতা বিমুখতাকে পরিত্যাগ করে যে সব আধুনিক শিল্পী তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্বতন্ত্রভাবে জনতামুখী হয়েছেন, তাঁদের সামনে এগিয়ে আনা। প্রথম পদ্ধতির মুখপাত্র হিসাবে উপস্থাপিত হন মায়াকভ্স্কি, পাবলো নেরুদা, কাজী নজরুল ইসলাম, সুভাষ

মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বিতীয় পদ্ধতির মুখপাত্র হিসাবে উপস্থাপিত হন লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এই দুইভাবেই আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যে জনতার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা কিছুটা অন্তত খণ্ডিত থেকে যায় এবং কিছুটা খণ্ডিত থাকার দরুন বিকল্প স্বতন্ত্র ধারাকে জনতা-বঞ্চিত ও জনতা বিমুখ বলে জাহির করার যুক্তি জোরালো থেকে যায়।

অথচ উল্লেখযোগ্য এই যে, আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যের সকল ধারায়, এমন কি ব্যক্তিক প্রাধান্য সমন্বিত ধারাতেও জনতার উপস্থিতি ইতিমধ্যে প্রতিপন্নও করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উপন্যাস-শিল্পে স্বগতচিন্তা ও স্বগতোক্তির চূড়ান্ত প্রাধান্যদাতা আইরিশ লেখক জেম্‌স জয়েসকেও (১৮৮২-১৯৪১) জনতামুখী শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য এ জনতা অদৃশ্য জনতা; কিন্তু অদৃশ্য হলেও এ জনতা মহা প্রাণবান। এ জনতার কাছে রয়েছে আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপার কাঠি সোনার কাঠি। আসল মুস্কিল এই যে, জনতার পক্ষপাতীরা এই পরিচয়কে সপ্রমাণিত করলেও এখনও প্রমাণ রেওয়াজে পরিণত হয়নি। তবে মুস্কিলের আসানও দুরূহ নয়। জেমস জয়েসের কিংবা এই ধরনের অন্যান্য নির্বাসনকামী স্বগত শিল্পীদের সৃষ্টি-সাধনার প্রাণের উৎস যে অদৃশ্য জনতা, তার সার সত্তাকেই প্রখর ও তীক্ষ্ণভাবে সামনে এগিয়ে আনতে পারলে জনতার পক্ষপাতীদের পক্ষে এই শতাব্দীর এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা সহজ হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অদৃশ্য জনতাকে পরোক্ষভাবে উপস্থিত জনতা বলে ধরে নিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু গৌণ বলে নয়।

২

আপাতত, জেমস জয়েস সম্বন্ধেই শুধু আলোচনা করা যাক।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃত সার্জি আইজেনষ্টাইন তাঁর 'চলচ্চিত্রের আঙ্গিক' গ্রন্থে জেমস জয়েসের লেখা ও মনোভাবের উপর যে আলো ফেলেছেন, তাতে 'অদৃশ্য জনতা' হয়েছে দৃশ্যমান। চলচ্চিত্রের সংলাপকে 'স্বগতোক্তি প্রধান' বলে অভিহিত করে আইজেনষ্টাইন জেমস জয়েসের উপন্যাসের সংলাপের স্বগতাধর্মিতার কাছ থেকে চেয়েছেন এর শিল্পরূপগত সম্মতি। জেমস জয়েসের উপন্যাস-বিন্যাসের পদ্ধতির সঙ্গে আইজেনষ্টাইন তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতির মিল খুঁজে পেয়েছেন এবং সে মিল পাওয়ার কথা অনায়াসে স্বীকার করেছেন। এই মিল পাওয়া আবার নিছক মানসিক আকস্মিকতা ছিল না। এই দুই শিল্পীর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল বন্ধুত্বের পরিবেশে জেমস জয়েস চূড়ান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন আইজেনষ্টাইনের তোলা যুগান্তকারী চলচ্চিত্রগুলিকে চোখে দেখবার জন্য। সেটা অবশ্য সম্ভব হয়নি তাঁর অন্ধত্ব বা চোখের অসুখের জন্য। জেমস জয়েস শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। জেমস জয়েসের লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, কারও নামডাক শুনে আকৃষ্ট হবার মানুষ ছিলেন না তিনি। তাঁর মন ছিল নির্মম বিশ্লেষণধর্মী। আইজেনষ্টাইনের চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক সম্বন্ধে নিশ্চয় পুরো খবরই তিনি রাখতেন। খবর রাখতেন, যে তাঁর শিল্পীবন্ধুর কাছে জনতাই হলো প্রত্যক্ষ নায়ক। এদিক দিয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় আইজেনষ্টাইনের সোভিয়েট চলচ্চিত্রের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে ভুল

করার কিছুই ছিলনা। আইজেনষ্টাইন 'চলচ্চিত্রের আঙ্গিক' গ্রন্থে লিখেছেন যে জনতা দিয়ে ছবি করাই তাঁর 'অপূর্বতা' (originality)। তিনি তাঁর এ বক্তব্য জেমস জয়েসকেও নিশ্চয় শুনিয়েছিলেন। তবু আইজেনাষ্টাইনের কাজের প্রতি জেমস জয়েস আকর্ষিত হয়েছিলেন, বিকর্ষিত হননি। এই আকৃষ্ট হওয়াটা জনতার প্রতি বিমুখতা প্রমাণ নয়, বরং জনতামুখী তারই প্রমাণ।

৩

কথা উঠতে পারে, শিল্পীর পরিচয় তার রূপসৃষ্টিতে। কোন প্রবণতা শিল্পীর মনোভাবই নিহিত থেকে গেলে, তাকে নিছক শুভেচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। এদিক থেকে অবশ্য জেমস জয়েসের লেখার পূর্ণ বিশ্লেষণ হয়নি। তবে শিল্পকলা-সাহিত্যের দুজন ভিন্ন মতাবলম্বী তাত্ত্বিক জেমস জয়েসের লেখার মধ্যে একট সাধারণ গুণনীয়ক লক্ষ্য করেছেন। এই গুণনীয়কটি অদৃশ্য কিন্তু প্রাণের উৎসরূপী জনতার সঙ্গে নিবিড় যোগেরই প্রতীক। তাত্ত্বিকদের একজন হচ্ছেন মার্কসপন্থী সিডনী ফিনকেলষ্টাইন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন অতি আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ টি, এস, এলিয়ট।

সিডনী ফিনকেলষ্টাইন তার 'শিল্পকলা এবং সমাজ' গ্রন্থে গত তিনশত বছরের ইউরো ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রখ্যাত শিল্পরূপকারদের কাজে লোকশিল্পকলার সঞ্জীবক প্রভাবের তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। এই সূত্রেই তিনি দেখিয়েছেন যে, শেকস্‌পিয়র থেকে শুরু করে জেমস জয়েস পর্যন্ত শীর্ষ স্থানীয় বাণীরূপকারদের লেখায় লোকভাষা উপাদান ব্যবহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকে দিয়েছে সম্প্রসারিত শিল্পাধার তৈরি করার তাগিদ। এইভাবে সিডনী ফিনকেলষ্টাইন নি:শর্তভাবে প্রমাণিত করেছেন জেমস জয়েসের লেখায় জনতার উপস্থিতিকে।

টি. এস. এলিয়ট মিলটন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যদিও প্রাসঙ্গিকভাবে জেমস জয়েসকে সামনে এনেছেন মিলটনের ভাষা সম্পর্কিত নেতিবাচক দিকেরই আধুনিক প্রতিভূরূপে। তবু তাঁর লেখাতে পেয়েছেন অস্তিবাচক দিকও। একথা নিদারুণ সত্য যে, মিলটনের মহাকাব্য এবং জয়েসের মহাকায় উপন্যাসের সমধর্মিতার কথা বলতে গিয়ে টি, এস, এলিয়ট বলেছেন যে, দুই অন্ধ সুরশিল্পী দৃশ্যের উপরে জোর না দিয়ে ধ্বনির উপরে, ভাবের উপরে জোর না দিয়ে কথার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ধরনের মন্তব্য শিল্প হিসাবে জনতা থেকে জেমস জয়েসের বিচ্ছিন্নতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এ মন্তব্যকে টি, এস, এলিয়ট ইচ্ছা করেই সংশোধনযোগ্য বলেও দাখিল করেছেন। তিনি প্রথমত বলেছেন যে, জয়েস সম্বন্ধে তাঁর উপরোক্ত বিচার পরীক্ষামূলক (tentative)। দ্বিতীয়ত, তিনি জয়েসের লেখার পদ্ধতির ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেও বলেছেন, জয়েস সর্বদাই কথ্য সুরের সঙ্গে কিছুটা সংযোগ রক্ষা করেন।' টি. এস. এলিয়টের নিজের লেখাতে ব্যবহৃত এই 'কথ্য সুর' বা সাধারণের কথ্য ভাষাতে একদিন জনতা যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল সেকথা স্মরণ করে এবং সেই মিল ধরে জেমস জয়েসের লেখার ভাষায় জনতার সঞ্জীবক উপস্থিতিকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বলে মনে করা যেতে পারে।

শিল্পসাহিত্যে জনগণের ভূমিকা

সাহিত্য ও শিল্পকলার যে অবিশ্রান্ত সৃষ্টি প্রবাহে আমরা সঞ্জীবিত, সে যেন একটি দ্বৈতসঙ্গীত, অথবা সে যেন একটা দোতরা বাদ্যযন্ত্রের আলাপ। দুটি কণ্ঠস্বর। দুটি তার। দুটি তরল তার অবশ্য। এ যেন ধলেশ্বরী আর মেঘনার মিলিত প্রবাহ, দুটি সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েও স্বতন্ত্র বর্ণে চিহ্নিত। একটি বিদগ্ধ, আরেকটি লোকায়ত। দুটি জঙ্গম। একটির ধারাবাহিকতাকে প্রসারিত করে চলেছেন ব্যতিক্রমের নব নব দিগন্তের আবিষ্কর্তা লোকোত্তর প্রতিভারা, অনন্য সাধারণ শিল্পীরা, যাঁদের অনেকেই নিজেদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছেন সৌন্দর্য সাধনায়। আরেকটি ধারাবাহিকতাকে প্রসারিত করে চলেছেন লোককবি-শিল্পী পুরুষানুক্রমিকভাবে আলো থেকে আলো জ্বালিয়ে নিয়ে। সংজ্ঞাটাকে খুব স্থূলভাবে উপস্থিত করলে বলা যায়, একটি ধারায় হোমার, কালিদাস, ওমর খৈয়ম, দা ভিঞ্চি, শেক্সপীয়র, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, পিকাসো প্রমুখেরা। আরেকটি ধারায় পাহাড়ের গুহায় হরিণের ছবি, আফ্রিকার নিগ্রো ভাস্কর্য কিংবা পূর্ববঙ্গ গীতিকার অনামী অথবা অচিহ্নিত শিল্পীদের শিল্পকর্ম। এই দুটি সত্তাকে আমরা কিন্তু অনেক সময় একেবারেই আলাদা করে ফেলি। দ্বৈতসঙ্গীতের একটি কণ্ঠ হারিয়ে যায়, একটির তার ছিঁড়ে যায় আমাদের জীবনে, আমাদের বিচারে। দুটি বিপরীত মেরুতে স্থাপিত হয় দুটি সত্তা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এককতা আর লোক সঙ্গীতের দলবদ্ধতাকে মনে হয় বিপরীত ধর্মী। যেমন বিমূর্ত চিত্রশিল্প আর পটের ছবিকে মনে হয় বিপরীত-ধর্মী। যেমন, আধুনিক গদ্য কবিতা আর কবিয়ালের কবিতাকে মনে বিপরীত ধর্মী।

সাহিত্য ও শিল্পকলার সৃষ্টিপ্রবাহে এই এক সঙ্গেই জড়িত এবং পৃথক দুটি ধারা একেক সময় একে অপরকে নাকচ করে দিতেও প্রয়াসী হয়। এদের অন্তর্দ্বন্দ্বও আবর্তের সৃষ্টি করে। ব্যতিক্রম ও অভিনবের তাড়না লোকরীতিকে বেমালুম অস্বীকার করে। লোকরীতির গড্ডলিকা প্রবাহ ব্যতিক্রম ও অভিনবকে গ্রহণ করে না। সুতরাং শিল্পরূপের দুটি সত্তার মিলন ও বিচ্ছেদকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, দুইই সত্য। চিরায়ত শিল্প সাহিত্যের রূপকার আর লোকায়ত শিল্প সাহিত্যের রূপকারেরা এই দুই সত্যের শরীক।

কিন্তু এই এই দুই সত্যের আরও এক শরীক আছে। সে হচ্ছে জনতা বা জনগণ বা লোকসমাজ। এই জনতার ভূমিকা হচ্ছে ঘটকালি। রাসয়নিক পরিণয়ের ঘটকালি, পুনর্মিলনের ঘটকালি। জনতা নিয়ে আসে হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠকে, ছিঁড়ে যাওয়া তারকে জোড়া দিয়ে দেয়। অবশ্য শুধু প্রেক্ষাগারের টিকিট কিনে জনতা শিল্পরূপের জগতে তার এই ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাকে বুকের রক্ত ঢালতে হয় রাজপথে। তাকে সংগ্রাম করতে হয় মুক্তধারার পথের প্রতিবন্ধক সরাতে। তাকে সংগ্রাম করতে হয় স্বাধীনতার জন্য, শান্তির জন্য, শোষণহীন সমাজের জন্য। জনগণের এই এ মুক্তি সংগ্রামই শিল্পরূপের দুটি বিশিষ্ট সত্তাকে উত্তরিত করে দেয় পরস্পরের নতুনতর বৃহত্তর স্বীকৃতিতে। জনতার মুক্তির সংগ্রাম পিকাসোর মতো একক নিরীক্ষাকারকে

টেনে নিয়ে আসে সর্বজনের রূপকার করে, জনতার মুক্তি সংগ্রাম জারী গানে ভরে দেয় ভূমি-বিপ্লবের তাগিদে উদ্দামতা। রূপলোকের জনতা হচ্ছে সংগ্রামী জনতা।

সিডনী ফিনকেলষ্টাইন তাঁর 'শিল্পকলা ও সমাজ' গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে জনতার এই ভূমিকাকে সামনে এনেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের শুরুতে স্পেনের জনগণ যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, তখন সেই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মহাশিল্পী গয়া পেয়েছিলেন রূপসৃষ্টির নব নব দিগন্ত, তেমনি স্পেনের লোকশিল্পকলা পেয়েছিল নতুনতর রূপরেখাধ্বনি। মিলন ঘটেছিল অনন্য শিল্পী এবং লোকশিল্পী সত্তার। বাঁধ ভেঙ্গেছিল উভয়েরই।

আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে এমনি একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে জাগরূক আছে। ফ্রান্সের মৃত্যুহীন বিদগ্ধ শিল্পী রোঁমা রোঁলা এই দৃষ্টান্ত। রোঁমা রোঁলার জাঁ ক্রিস্‌তফ রচিত হয়েছিল সোভিয়েত বিপ্লবের আগে, আফ্রো-এশীয়, জনগণের মহাঅভ্যুত্থানের আগে। সেখানে তাই বিদগ্ধ শিল্পীকে দেখি নভচারী। জনতার সংগ্রাম জাঁ ক্রিস্‌তফের শিল্পচিত্তে সামান্যই অনুরণনের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। রোঁমা রোঁলা নিজেও সেদিন পর্যন্ত 'পর্বতশিঙ্গমালার' অভিযাত্রী। বিটোফেন, মিকেল এঞ্জেলো এবং টলষ্টয়ের মতো মহাশিল্পীদের জীবন সাধানারই তিনি ছিলেন কাহিনীকার । সোভিয়েট বিপ্লব আর আফ্রো-এশীয় অভ্যুত্থানে এসে রোঁমা রোঁলার দৃষ্টিকে দিল প্রসারিত করে। সাধনাকে দিল মুক্ত করে। একদিকে তিনি যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে নিয়োজিত করলেন নিজের শিল্পীসত্তাকে, সঙ্গে সঙ্গে আফ্রোএশিয়ার লোকশিল্পকলার মুক্ত প্রতিষ্ঠার প্রতি হলেন আগ্রহী। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে আবিষ্কার করলেন তিনি এক মহৎ শিল্পরূপ সৃষ্টি এই কারণেই।

আমাদের আরও নিকটে এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অভ্যুদয় এবং 'রক্তকরবী'র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মূলে আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুদয়, বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান আমাদের লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পকলাতেও স্থবিরতাকে দিয়েছিল খান খান করে ভেঙ্গে। কবি জসীমউদ্‌দীন ও কবিয়াল রমেশ শীল এই অভ্যুত্থানেরই দুই প্রতীক স্বরূপ।

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সামনে রেখেছে উপরোক্ত জনতার তাগিদকে। জনতার অধিকার সচেতন সংগ্রাম আমাদের শিল্পীদের বিচ্ছিন্ন মেরুবাসী হতে দিতে পারে না, দেবে না। তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্ন থাকবে। শিল্পরূপের অবিশ্রান্ত প্রাবাহে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সংগ্রামী জনতা কি নিতান্ত তৃতীয়পক্ষ? শিল্পরূপের সৃষ্টির ব্যাপারে তার কি কোন প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নেই? জনতাও কি শিল্পী হতে পারে না?

খুব সংক্ষিপ্তভাবে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়, সেটা দাঁড়ায় একই রকম। ইটালিয়ান অতি ভবিষ্যৎবাদী শিল্পী সেভেরেনি কিংবা ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্সের বক্তব্য এদিক দিয়ে নেতিবাচক। অপরদিকে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা বিপরীত বক্তব্য পেশ করছে। আজ এই বক্তব্য শিল্পরূপের জগতে প্রসার লাভ করেছে।

সেভেরেনি আর ডি. এইচ. লরেন্সের বক্তব্য আজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। জনতার শিল্পসত্তা সম্বন্ধেও সত্য বেরিয়ে আসছে বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে। এ সত্যটি হচ্ছে এই যে, জনতা হচ্ছে জাত শিল্পী, জন্মশিল্পী।

কডওয়েল তাঁর 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন কবিতার আদী উৎস হচ্ছে আদীম গোষ্ঠীর দলবদ্ধ উৎসব। গ্রীক নাটকের নিরপেক্ষ পণ্ডিতরাও বলেছেন যে, কোরাস হচ্ছে নাটকের কাণ্ডস্বরূপ। গোর্কি বলেছেন, রূপকথা হচ্ছে মেহনতী জনতার কল্পকথা।

আজ সংগ্রামী জাতশিল্পীদের ডাক দিতে হবে আমাদের সংস্কৃতির অচলাবস্থা যেখানে যেখানে ঘটেছে সেখানে অভ্যুদয় ঘটানোর জন্য। একতরফা কিছু করার জন্য নয়, সর্বাত্মক মুক্তির জন্য এই আহ্বান। জনতাকে হতে হবে সচেতন শিল্পদৃষ্টি সম্পন্ন জনতা। রূপের জগৎকে দিতে হবে পূর্ণ মূল্য।

সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে

প্রচলিতের বৃত্তকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্য শিল্পীরা যুগে যুগে সাধনা ও সংগ্রাম করে এসেছে। শিল্পকলার সরঞ্জাম, চিরায়ত সাহিত্যের বহমান ধারা, চিত্রভাণ্ডারের ছবি, সঙ্গীতের অগণিত শাখা প্রশাখা, স্থাপত্য কিংবা গুহাচিত্রের ধারাবাহিক নিদর্শনগুলি প্রমাণিত করে, শিল্পীর সৃষ্টি রীতি-ভেদী। শিল্পীর অঙ্গীকার চিরনূতনের অঙ্গীকার। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অর্ধ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যের বিকাশের মধ্যেও এই ভাঙ্গাগড়ার লক্ষণগুলির আমাদের চোখের ওপরে রয়েছে। নবীন প্রবীণকে অস্বীকার করে প্রচলিতের বৃত্তকে বাব বার রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে লিখেছে নতুন নতুন কবিতা। প্রবীণও নিজেকে লঙ্ঘন করে সেই একই সংগ্রাম সাধানার শরিক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই তাগিদকে বলেছেন, 'আবার আহ্বান'। একে বলা যেতে পারে 'বারংবার আহ্বান।' শিল্পীর সৃজনশীলতার অব্যাহত ধারার মধ্যে এই আহবান চির অস্থির জ্বালানির মতো কাজ করে আসছে। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের অশ্রান্ত ধারাকে আমরা এইভাবেই দেখব।

যুগ যুগান্তরে শিল্পীদের এই সৃজনলীলার ইতিহাসের একটা প্রশ্ন এই যে ভাঙ্গাগড়ার যে প্রয়াসের কথা বলা হল, সে কি এককভাবে মহৎ শিল্পীদের না জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বহুশিল্পীর সংগ্রাম-সাধনা? প্রচলিত ধারণা এই যে, শিল্পীরা এককভাবে প্রচলিতের বৃত্তকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। কোন কোন সময় একে পর্বত শৃঙ্গে আরোহণের অভিযাত্রীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অনেক সময় দুর্যোগের দিনে একলা চলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই ধরণা থেকেই সম্ভবত কথাটা এইভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে, সৃজনশীল শিল্পী হচ্ছে নিভৃতের সাধক কিংবা একক বিদ্রোহী: অপরদিকে জনগণই হচ্ছে গড্ডলিকা প্রবাহ। স্বভাবত এই দৃষ্টিভঙ্গী শিল্পীগণকে আত্মনিবদ্ধ করে তোলে। সৃজনশীল শিল্পী আর জনগণের মধ্যে দূরত্ব গড়ে ওঠার মধ্যে এই ধারণাটা কাজ করে আসছে। সৃজনশীল শিল্পী আর জনগণের মধ্যেকার দূরত্ব দূর করার প্রয়োজন যদি আজ একান্তভাবেই দেখা দিয়ে থাকে, তবে সমাধানের

পথ হচ্ছে প্রথমে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যে, শিল্পসৃষ্টির বৃত্ত ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে বিশেষ কোন শিল্পীর একক-সত্তা কাজ করে আসছে না শিল্পীদের সমষ্টিগত সত্তা।

আধুনিক শিল্প সমালোচনা তথা মার্কসবাদী শিল্প-সমালোচনা এর উত্তর দেবার চেষ্টা করে আসছে এইভাবে যে, সমাজ বিপ্লব কিংবা রাজনৈতিক নবদিগন্ত রচনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি চিন্তা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারে জনগণের উদ্যোগী ভূমিকা রয়েছে, যেমন রয়েছে মনীষীর কিংবা মহৎ শিল্পীর। এই তত্ত্বের মূল কথা ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, 'মেহনতই শিল্পকলার উৎস।' এই মেহনত মানুষের সামাজিকতার অভিজ্ঞান। শিল্পকলা এই সৃষ্টির সৃষ্টি। একথা বিস্মৃত হলেই সৃজনশীল শিল্পী নিজেকে জনগণ থেকে অসংলগ্ন মনে করে। কিন্তু কথাটার এখানেই শেষ নয়। জনগণ যুগে যুগে বিপ্লব ও বিদ্রোহ করে এসেছে এবং প্রচলিত সামাজিক রাষ্ট্রিক বৃত্তকে ভেঙ্গে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রচলিত বৃত্তকেও ভেঙ্গে দেবার পরিবেশ তৈরি করে নিয়ে এসেছে। কিংবা বলা যেতে পারে, এই প্রস্তুতির ব্যাপারে সৃজনশীল শিল্পীরা এবং জনগণ পরস্পরের সহায়ক। সোভিয়েট কবি আলেকজাণ্ডার ব্লক একজন একক বিদ্রোহী সৃজনশীল শিল্পী বলেই কোন কোন মহলে প্রচারিত। তিনি কিন্তু নিজের জনগণমুখী সঠিক ভূমিকাটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং এই কারণেই তিনি বলেছিলেন কবিরা হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের সিস্মোগ্রাফ বা ভূকম্পন পরিমাপ যন্ত্র। এই চেতনার দরুনই একান্ত করুণা প্রবণ এই কবি সোভিয়েট বিপ্লবের ব্যাপক গণঅভ্যুদয়কে তাঁর কবিতার কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। আধুনিক শিল্প জিজ্ঞাসা আরও একটা কথাকে সামনে এনেছে এবং সেটা এই যে, জনগণ হচ্ছে চির নূতনের মূলাধার। লোক-সাহিত্য কিংবা লোক শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে। পুরানো ধারণা এই যে, লোক সাহিত্য কিংবা লোক শিল্পকলা পুনরাবৃত্তির চক্রে আবদ্ধ। এই ধারণা থেকেই সৃজনশীল শিল্পীর একটা অহমিকা গড়ে উঠতে পারে এবং গড়ে উঠেছেও কোন কোন ক্ষেত্রে। লোকনৃত্যকে ব্যাকরণের অব্যয় বলে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু আধুনিক তত্ত্ব এ কথাটাই জোর দিয়ে বলতে চায় যে লোক সাহিত্য এবং লোক শিল্পকলা যুগ যুগান্তরের বিপ্লবের স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে চলেছে। ড. ফিনকেলষ্টাইন সেক্সপীয়রের রচনাকেও লোক কবিতারই গুণাত্মক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে দাখিল করেছেন। আমাদের ঘরের কাছে কবিয়াল রমেশ শীল এর প্রমাণ। আমাদের একুশের গান 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', সেও একটি প্রমাণ।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে নিশ্চয় একথা বলা যেতে পারে যে, সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের দূরত্ব মোচনের উপায় করতে গিয়ে প্রচলিত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আধুনিক চিন্তাকে গ্রহণ করতে হবে।

যে রকম সহজে রোঁমা রোঁলা ১৯৩১ সালে গোর্কীর কাছে তাঁর মনের কথা জানিয়েছিলেন, সেই ভাবেই এই চিন্তাকে ব্যক্ত করা যায় : 'আমার চারদিকে পশ্চিম ইউরোপের মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার শিকড় আমি বাইরে রাখিনি। ইউরোপের কঠিন আবরণ ভেদ করে সোভিয়েটের নবজাগ্রত বিশাল

জনজীবনের উর্বর মৃত্তিকা স্তরের মধ্য দিয়ে আমি দুই স্তরের সংযোগ সাধন করেছি। এই ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা স্তরের প্রান্তদেশে আমার শিকড় গোর্কীকে স্পর্শ করেছে।

বাংলা ভাষা আন্দোলন কিংবা উনিশ শ' উনসত্তর সালের গণ-অভ্যুদয় এই আধুনিক চিন্তার পথকে আমাদের শিল্পীদের কাছে সহজ করে দিয়েছে শহীদের বুকের রক্তের ঢলে।

মেহনতের শক্তি ও প্রত্যয়

'মেহনতই হচ্ছে সংস্কৃতির মূল উৎস', ম্যাক্সিম গোর্কীর এই উক্তির ন্যায্যতার পক্ষে এমন সব যুক্তি দাখিল করা যেতে পারে, যা মূলত সমাজবিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই যুক্তিগুলি চিরায়ত শিল্পকলার মধ্যেও রয়েছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে। ম্যাক্সিম গোর্কীর উপরোক্ত উক্তিকে গ্রহণ করার জন্য ভিত্তিমূলও তৈরি হয়ে রয়েছে বহু সহস্র বছরের শিল্প চেতনার প্রবাহে বিধৌত হয়ে। কিন্তু ম্যাক্সিম গোর্কীর এর পরের কথাটার জন্য আমরা হয়ত প্রস্তুত থাকিনা। তিনি বলেছেন, গ্রীকদের মানব-দেব কাহিনীর হারকিউলিস মেহনতের অসম্ভবকে সম্ভব করার শক্তির প্রতীক'।

শক্তি জিনিষটা আমাদের মনে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন, অপরিমেয়, অনিয়ন্ত্রিত এবং যান্ত্রিক রূপ নিয়ে হাজির থাকে যে আমরা অন্তত পক্ষে শিল্পসংস্কৃতির সৃষ্টির উপকরণ হিসাবে একে যেন পরিপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করতে পারি না কিছুতেই।

আমাদের একহাতে বিজ্ঞান–শক্তি, আমাদের আরেক হাতে শিল্প-সংস্কৃতি-অনুভব। আমরা মেলাতে পারিনা এদের। এইটেই কি আমাদের সমসাময়িক কালের অন্তর্দাহের মূল কারণ?

আমাদের এই অন্তর্দাহ দুটো বিশ্বযুদ্ধের কটাহ থেকে সংগ্রহ করেছে জ্বালা। আর একটা সম্ভাব্য যুদ্ধ–পারমাণবিক অস্ত্রের তোড়জোড় মানবসভ্যতারকে ধ্বংস করে বসতে পারে। রূপকথার খড়্গের মত সে ঝুলেছে এই দুঃখ সুখের ঢেউ খেলান মধুময় পৃথিবীটার ওপর। আমরা প্রত্যয়ের সন্ধানী আজ, বিশ্বাসের সন্ধানী। আমরা সেই প্রত্যয়ের সন্ধানী যা আমাদের বলে দেবে যে, পৃথিবীটা আরও অনেক দিন বাঁচবে। আর আমরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য বাঁচব না, অবিরত নতুনত্বে কুসুমিত হয়ে বাঁচব। কিন্তু শুধু কথায় বলে দেবেনা, কাজেও দেখাবে যে সে বাঁচিয়েছে মানুষকে চিরকাল, আগামীতেও বাঁচাবে।

কিন্তু কে আমাদের দেবে এ প্রত্যয়? সে কি মেহনত নয়? কিন্তু হারকিউলিসের কায়া নিয়ে শক্তি রূপে যখন সে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন কি বিব্রত হইনা আমরা? বিব্রত হইনা, যখন শুনি মেহনতী মানুষের একনায়কত্বের শক্তি প্রয়োগের কথা?

২

এই দ্বিধার নিরসনের জন্য মনে হয় যাওয়া উচিত অতীতের খনি-গহ্বরেই, কারণ হারকিউলিসের আসল সত্তা নিহিত রয়েছে ইতিহাসের মণি খনিতে। এজন্য যেতে হবে না ভূতত্ত্বের অস্থি উপকরণে এবং শুষ্ক তথ্যেই। এ একটা প্রাথমিক সান্ত্বনা আমাদের কাছে। কাব্য-নাট্যের রসভোগ হবে আমাদের উপরি পাওনা এই পথে গেলে।

৩

আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীসের কাব্যনাট্যকার ইউরিপাইডিসকে একালের জনৈক সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রথম সাফ্রেজিষ্ট বা নারী জাতির ভোটের অধিকারের ডঙ্কাবাদক বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছেন আলসেসটিস কাব্য নাট্যকে। আলসেসটিস নাটকে উদ্ঘাটিত ইউরিপাইডিসের শিল্পী চিত্তকে এমনিভাবে একালের আয়নায় মিলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আরও ব্যাপক সত্তার অধিকারী হিসেবে উপস্থিত করা যায়। বস্তুত, জীবন ও মৃত্যুর আলোছায়ায় জীবনের এত বড় জয়গান এমন নিবিড়ভাবে অন্য কোন গ্রীক নাটকে সম্ভবত ঝংকৃত হয় নি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, নাট্যকার নারীজাতির অধিকারের দাবীকে মানুষের প্রাথমিক বাঁচবার দাবীর সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। আর এই নাটকের মানস ঘাত-সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতিতে উদ্ধারকারীর ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন তিনি হারকিউলিসকে।

নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে হল এই যে, দেবরাজ জিউসের বজ্রাস্ত্র তৈরি করে দিয়েছিল যে সাইক্লপ্‌রা, দেবতা এপোলো তাদের হত্যা করেছিলেন। জিউসের অভিশাপে এপোলো ক্রীতদাস কিছুকাল রাজা এডমিটাসের রাজসভায় কাটিয়েছিলেন। রাজার ব্যবহারে প্রীত হয়ে এপোলো বর দিয়েছিলেন যে, এডমিটাসের মৃত্যুক্ষণে যদি কেউ তার হয়ে যমপুরীতে প্রবেশ করে, তাহলে এডমিটাস বেঁচে থাকবেন। এডমিটাসের রাণী আলসেসটিস ছাড়া স্বামীর জায়গায় যমপুরীতে আর যাবে কে? কিন্তু মৃত্যুক্ষণ যখন এগিয়ে এল, তখন বুঝতে পারা গেল, এই পৃথিবীতে বাঁচার মূল্য কী অপরিসীম। আলসেসটিসের মনে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল বাঁচার সাধ। কিন্তু মৃত্যুর কড়া-ক্রান্তির হিসাব একটুও ভুল হল না। আর অন্য কেউ–জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বা নবযুবা আত্মীয় পরিজন–আলসেসটিসের জীবন রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল না। যমরাজ তার করাল বাহু দিয়ে ঘিরে পাতাল পুরীতে টেনে নিয়ে চললেন আলসেসটিসকে। আলসেসটিস তখন যমরাজকে বলছেন, ছাড়, ছাড় আমাকে। কী ভয়ঙ্কর এই মৃত্যুর পথ। হতভাগিনী, হতভাগিনী আমি। আমাকে নেমে যেতে হবে নীচে আরও নীচে? ছাড় ছাড় আমাকে।

যমরাজ এই প্রার্থনা শুনলেন না। এ আর্তনাদ কিন্তু কানে গেল হারকিউলিসের। সে তার বজ্র বাহু বাড়িয়ে আলসেসটিকে মৃত্যুর গহ্বর থেকে বার করে নিয়ে এসে ফিরিয়ে দিল তাঁকে তাঁর প্রিয়জনদের কাছে এবং নিশ্চয় আলসেসটিসের আত্মজীবনেও।

হারকিউলিসের এই মুক্তিদাতার ভূমিকায় অবশ্য একটা নিরাসক্ত কর্তব্য পরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক যেমন এই ধরনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে উনিশ শতকের প্রভাতের শেলীর 'প্রমিথিউসের মুক্তি' কাব্যনাট্যে হারকিউলিসের ভূমিকাতেও।

দেবতাদের আগুন গোপনে নিয়ে এসে প্রমিথিউস মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, এজন্য দেবরাজের হুকুমে প্রমিথিউস পর্বতগাত্রে শৃঙ্খলিত হয়েছিলেন। প্রমিথিউসকে মুক্ত করেছিলেন হারকিউলিস, এও হারকিউলিসের এক কীর্তি। এই মুক্তি-সাধনের ব্যাপারে যে নিরাসক্ত কর্তব্য পরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে মেহনতী মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির যুগে প্রাচীন নাটকের রাসায়নিক ঐক্য আলসেসটিস উদ্ধারকারী শক্তিমান হারকিউলিসকে নবতর জীবনাভিলাষী নরনারী মাত্রের একান্ত আপন জন করে দিয়েছে। শেলীর নাটকে মানবতার জয়গান হারকিউলিসকে স্নিগ্ধ আলোর মত বেষ্টন করে রয়েছে। বিপ্লবী মানবতাবাদের যুগে এই হারকিউলিসের কাছ থেকে প্রত্যয় পাবনা আমরা?

সময় হয়েছে নিকট এবার

'বিজ্ঞানী ও শিল্পীর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, তার পরিসমাপ্তির সময় সমাগত।'

–সৌন্দর্য : ক্রিস্টফার কডওয়েল

১

আর সকলের মত ক্রিস্টফার কডওয়েলও মনে করতেন যে, বিজ্ঞানের লক্ষ সত্য আর শিল্পকলার লক্ষ হচ্ছে সৌন্দর্য। কিন্তু তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আমরা যদি এদের দুটিকে আলাদা করতে চেষ্টা করি তাহলে দুই–এরই দাম শোচনীয়ভাবে কমে যাবে। আমরা যদি এদের নিখাঁদ করতে চাই, তাহলে আমাদের পাওনার কোঠা হবে শূন্য। বিজ্ঞান ও শিল্পকলা দুই বাস্তব জগতে জ্বলজীয়ন্ত মানবকীর্তি। এই মৌলিক বোধের অধিকারী হয়েই কডওয়েল ঘোষণা করতে পেরেছেন যে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর বিরোধের পরিসমাপ্তির দিন আগত। এর আরও কারণ এই যে, কডওয়েল দ্বন্দ্বাত্মক সমন্বয়ের বিকাশ ও অগ্রগতির রহস্য বুঝতে পেরেছিলেন।

সত্য আর সৌন্দর্যকে অবশ্য যুগ যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন করে কমিয়ে দেখার রেওয়াজ চলে এসেছে। কিংবা বলা যায় দুই-এর প্রত্যেকের দামকেই পুরোপুরি বুঝবার ব্যাপারে চলে আসছে প্রতিবন্ধকতা, অস্বীকৃতি। বিজ্ঞানী ও শিল্পীর প্রবণতা রয়ে গিয়েছে দুই বিপরীত ও স্বতন্ত্র মেরুতে অবস্থান করার। বাস্তব জগতে জীয়ন্ত মানব শরীরের তথা নর-নারী-শিশুর হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে যন্ত্রণার নিলয় হয়েছে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর প্রতি পরস্পর বিপরীত আকর্ষণে। তবু এটাও চূড়ান্ত সত্য যে, আদিম গুহাবাসী মানুষের এক হাতে ছিল মশাল আরেক হাতে তুলি। কিংবা বলা উচিত, আদিম গোষ্ঠীগুলির কারুর হাতে ছিল তুলি। কারুর হাতে ছিল আদি বিজ্ঞানের অভিযাত্রার নিশানা, কারুর হাতে ছিল আদি শিল্পকলার রংরেখার ফলক।

আলো আর রং। তা না হলে আজ হাজার বছর পরেও অন্ধকার গুহাগাত্রে যে সব মৃত্যুহীন চিত্রকে আমরা অঙ্কিত দেখতে পাচ্ছি, তাদের পেতাম না। বিজ্ঞান আর শিল্পকলা সেই আদিকালেই একত্রিত হয়েছিল বলেই লক্ষ লক্ষ বছরেও এসব গুহাছবি বিকৃত হয়নি। বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য দুইই যে বাস্তব জগতে জ্বলজীয়ন্ত মানব কীর্তি, এ ধারণা ক্রিস্টফার কডওয়েল পেয়েছিলেন ইতিহাসের আদিম জীবন যাপনের সামগ্রিক অভিব্যক্তি থেকে। মানুষ তার শৈশবে যা করেছে, যৌবনে কেন তা করতে পারবে না? সুতরাং মাঝখানে যা হয়েছে তা হয়েছে, আবার কেন বিজ্ঞানী ও শিল্পী সহযোগী হবেন না? কেন বলতে পারা যাবে যে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিত? কেন আজ কোন কবি বলবেন, বিজ্ঞানী যন্ত্রের কেরামতিতে ব্যস্ত, কবি মানুষের কেরামতিতে?

২

এখানে হয়তো একটা প্রশ্ন আছে। মানব সমাজের শৈশবে যে সহজ সরল জীবন যাত্রার প্রচলন ছিল, সামান্য উপকরণে যে অপরিমেয় প্রশ্নাতীত আনন্দবোধ ছিল, উৎসবে কর্মকাণ্ডে যে অসংশয় সমষ্টিমুখিতা ছিল, সেগুলিকে চেষ্টা করলেও আর যেমন ছিল তেমনভাবে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আজকের মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে এসেছে হাজারটা টানাপোড়েন। এ যুগ বেতার-চিত্রের যুগ। বেতার চিত্রের যান্ত্রিকতায় লালিত হওয়ার দরুন যান্ত্রিকতা বিরোধী বিশ্বশিল্পী পিকাসোর ছবি আজ আমরা আনন্দ জগতে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণ করি না। বিজ্ঞানী শিল্পীর, কিংবা বিজ্ঞান আর শিল্পকলার ঘনিষ্ঠতার সহযোগিতায় এ-কালের অধ্যায় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে না। আমাদের অনেক বিতর্কবিচারে যেতে হবে জীবনের প্রসারিত প্রয়োজনের তাগিদে। দারা পুত্র কন্যা পরিবার নিয়ে এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবীতে কয়েক মুহূর্তের জন্য অনাবিল জীবন যাপন করার তাগিদেও আমাদের এই নব বিচারে যেতে হবে। বিজ্ঞান, যুদ্ধ আর ধ্বংস সাকরেদ হয়ে রয়েছে মুনাফাবাজদের অন্ধগলিতে ভ্রষ্ট হয়ে। শিল্পকলা মানুষের আনন্দের যোগান দেওয়া বন্ধ করেছে দাম্ভিকতার পাঁকে আটকা পড়ে। বিজ্ঞানের অজস্র সম্ভার আর শিল্পকলার অজস্র উপহারেও আজ তৃপ্তি নেই যন্ত্রসুরী আমেরিকা কিংবা ফ্রান্সে অথবা ইটালিতে। রবীন্দ্রনাথের 'পক্ষমানব' কবিতায় ধ্বংসের যে কালো ছায়া তা হল আমাদের মত দেশগুলির মানুষের মনের উদ্বেগের পুঞ্জীভূত রূপ। বিজ্ঞান আর শিল্পকলার সহযোগিতা একালের ভিত্তিকে আমরা পৃথিবীময় তৈরি করে নিতে পারছি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কডওয়েল এই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস

১

ধনবাদী আমলের পরস্পর বিরোধিতা উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। শিল্পীরা যে অগ্নিশিখা জ্বেলেছে ধনিকশ্রেণী তাতে পানি ঢেলেছে। উপন্যাস বলতে

সাধারণভাবে বুঝিয়ে এসেছে হাল্কা ও অব্যাহতি-প্রদ সাহিত্য বিশেষকেই। উপন্যাস এদিক দিয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করেই ক্ষান্ত রয়েছে। পুরুষ, স্ত্রী, পুরুষ–অথবা স্ত্রী, পুরুষ, স্ত্রী–এই ত্রয়ীর সমস্যা ছাড়া অন্য কোন সমস্যাই যেন ছিলনা উপন্যাসে। উপন্যাস অধিকাংশ পাঠকের কাছে আকাশ-কুসুম প্রেম ও যৌন দ্বন্দ্বের রসসমৃদ্ধ উপাখ্যান মাত্র হিসাবে দাখিল হয়েছে। পাঠরীতির এই গতানুগতিকতাতে ঢালাই হয়ে যাওয়াতে উপন্যাসের ভঙ্গীতে বৈচিত্র এবং চরিত্রসমূহের পার্থক্যই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আনকোরা নতুন বই, উদীয়মান তরুণ লেখক বা লেখিকা এবং অভূতপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি নতুনত্বের যা কিছু ছাপ দিতে পেরেছে এরাই। নতুন সমাজ সৃষ্টির রসবিচার এবং নতুন ধরনের উপন্যাস লেখার পর্যায়ের ধনবাদী যুগের পাঠরীতির এই বহিরাড়ম্বর-সর্বস্বতা ধরা পড়ে গিয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় 'শেষের কবিতা' এবং 'শেষ প্রশ্নের' কথাটাই ধরা যাক। এই দুখানা উপন্যাস প্রকাশ হয়ে একট হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্র শরৎ সাহিত্যের বিকাশে এই দু খানা গ্রন্থ আধুনিকতার চরম উৎকর্ষ হিসাবে অভিহিত হয়েছিল; কিন্তু বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত সম্মুখী গতিধারার ইতিহাসে এদের সে রকম কোন বিশেষ স্থান পরবর্তীকালে ফিকে হয়ে গিয়েছে। আজ যখন আধুনিক বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের বিচার একটু গভীরভাবে করতে যাই, তখন এই গ্রন্থ যুগলের সমসাময়িক প্রকৃত অগ্রগামী প্রবাহের নিবিড় ও সঞ্চারমান ছায়াকে দেখতে পাই অন্যত্র। এখানে রূঢ় ও বীভৎস, বিষণ্ন ও পঙ্গু, হাজার হাজার খণ্ডে ভেঙ্গে যাওয়া এবং সহস্র বক্র ধারায় অন্ধকার হাতড়ে গড়ে ওঠা জীবনের কথা–বিকৃত ও ক্ষুধাতুর মানুষের কথা–অর্থাৎ নিতান্ত সাধারণ লোকের কথা লিখবার বিষয়টাই উত্থাপন করছি। উপন্যাসের এই বাস্তবতার ধারা বৈষম্যময় সমাজের উপন্যাস সাহিত্যে অবিসংবাদিত অগ্রগতি। আজ রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের লেখা সার্থক মূল্য বিচারও করতে হচ্ছে নতুন ভাবে।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্বকেই আজ সবচেয়ে বেশি সার্থকতা দেওয়া যায় সবগুলি পর্বের ভিতর, কারণ অন্য সব খণ্ডে ছোট ছোট টুকরো ছবিমাত্র আছে, তৃতীয় পর্বে বাস্তবতা জমাট ও ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বাস্তবতার ধারাকেই শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে খুঁজবার চেষ্টা চলছে আজ। এজন্য শরৎচন্দ্রের প্রথমদিকের লেখার মধ্যে যেতে হচ্ছে সত্যের সন্ধানে। 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চ'তে শেষের কবিতার ধারাতেই আধুনিকতার আরেক উৎস দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। গণমুখিতার সন্ধানে ফিরে যেতে হচ্ছে তাই রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটিতে। যে সময়ের কথা বলছি এখানে, বাস্তবতার ধারা সে সময়ে বয়ে চলেছিল ফল্গুধারার মত পাঁচমিশেলী পত্রিকার পৃষ্ঠায়–বিকৃতি ক্ষীণদৃষ্টি ভয় জড়তার সহস্র বন্ধন ভেদ করে কোন রকমে আত্মপ্রকাশ করছিল। কিন্তু সেটাই ছিল এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃত ধারা। আজ এই ধারা যখন স্ফীত হয়ে, নির্মল ও সবল হয়ে দৃষ্টি গোচর হচ্ছে, তখন এর অভিনন্দন যতই কেননা স্থূল ও দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত হোক, এর পাশে দাঁড়িয়ে নিছক চমকপ্রদের পক্ষে বাহবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিকতার যে প্রান্তসীমা অঙ্কিত হয়েছিল, তাকে সেই পথেই অতিক্রম করার চেষ্টার

মধ্যেই যে সৃজনশীল অগ্রগতি নিহিত থাকেনি এই বোধ পাঠক মনকে প্রভাবিত করে তুলছে। এই প্রভাব অবশ্য অত্যন্ত স্থির, যেন ছড়িয়ে রয়েছে কোন রকমে স্থান পূর্ণ করে। পাঠক সাধারণের কোন স্পষ্ট ও প্রবাহময় চিন্তা এই প্রভাবের মূলে রয়েছে কিনা সেটা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।

জগৎ, সমাজ ও দেশের গতি পরিণতি ও পরিবর্তনময় পরিস্থিতির ভাবাদর্শ যেন আজও শুধু প্রক্ষিপ্তই হয়ে রয়েছে। তবে এটা ঠিক যে 'শেষ প্রশ্ন' অথবা 'শেষের কবিতা'র লাইনের ঝলমলে আধুনিক বাক্য ঝনৎকার আজ যদি রীতিমত শোভাযাত্রা শুরু করে, তবু পাঠক সাধারণ আগেকার মত আগ্রহ দেখাবেনা, হয়ত তারা তিক্ত ও বিরক্ত হবে এবং ঐ ধরনের অগভীর উপন্যাসের তথাকথিত তার্কিক ও সমালোচক পাঠক প্রায় থাকবেই না।

সমাজ বিপ্লবের ভাবাদর্শ আমাদের উপন্যাস-নামা রূপকথার রহস্যপুরীর দুয়ারে করাঘাত করে চলেছে।

নতুন ধারণার কথা উত্থাপন করা হচ্ছে। এই ধারণা ইউরোপে, রাশিয়ায়, চীনে, জাপানে ও আমেরিকায় সাহিত্য জগতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। উপন্যাস লেখা ও পড়ার ভিতর যে স্পষ্ট ও বিপ্লবী পরিবর্তন এসেছে, তাতে শুধু আধুনিকতম উপন্যাসকেই যাচাই করা হয়নি। সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যের বিচিত্র প্রসার ও বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও মূলগত প্রবাহের বিস্তৃতিতে সাহিত্যের নবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তার অন্য রকম মূল্য নিরূপন শুরু করে অন্যভাবে উপন্যাসকে সংস্কৃতি জীবনের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস চলেছে। সমাজ-বিপ্লবের সুস্পষ্ট ভাবাদর্শ এই ধারণার মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অসঙ্কোচ প্রকাশ ধারার উৎস রূপে। এই ধারণাকে সহজ ও খোলাখুলি ভাষায় মার্কসীয়, প্রোলিটারিয়ান অথবা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী মতবাদ বলে অভিহিত করা যায়।

২

একটা বিশেষ মতবাদের নাম পরিষ্কারভাবে দিয়ে দেওয়ার কোন প্রচারগত উদ্দেশ্য নেই। বিংশ শতাব্দীর গণমুক্তি বিপ্লবের উদ্ঘাটনে মার্কসীয় ভাবাদর্শই সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান সম্মত ভাবধারা হিসাবে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মার্কসবাদ বহুদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটাকে বড় করে দেখান বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। মার্কসবাদ কি, সে কথা নয়। উপন্যাস সাহিত্যই এখানে মূল প্রশ্ন।

কার্ল মার্কস নিজে গভীরভাবে উপন্যাসের পাঠ নিয়েছিলেন। ফিল্ডিং, স্কট ও বালজাক তাঁর বিশেষ প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর একটা পরিকল্পনা পর্যন্ত ছিল যে, সময় পেলে ফারসি ঔপন্যাসিক বালজাকের উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি একটা গবেষণাপূর্ণ আলোচনা লিখবেন। কিন্তু সে সময় তিনি পাননি। তবু তাঁর প্রিয় লেখক ও উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিতে উপন্যাস সম্বন্ধে একটা খসড়া নিশ্চয়ই গড়ে তোলা যেতে পারে এবং সেটা করা হয়েছেও।

কিন্তু সেই ভাবে এখানে মার্কসবাদেরও অবতারণা করা হচ্ছেনা। গভীর ও ব্যাপকভাবে দেখতে, বুঝতে ও লিখতে চেষ্টা করার সাহায্য করবে বলে এই নতুন দৃষ্টির সারকথাটুকু মাত্র এখানে দাখিল করা হয়েছে। সর্বহারা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব আজ যে দেশে দেশে জনসাধারণ কারখানা, ক্ষেতখামার থেকে শুরু করে শিল্প সৃষ্টিরও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, তারই আয়োজন এই নব বিচারের চলন্ত পটভূমি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক থিওডোর ড্রাইজার উপরোক্ত চিন্তাজগতে প্রবেশ করার পরেই তাঁর লেখার যে খোলসটা ক্রমে জীর্ণ হয়ে উঠে ছিল, তা খসে গিয়েছে। এই ধারা ঠেকাতে গিয়ে আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিক প্রিষ্টলে গত শতাব্দীর মানবতাবাদের জের টেনেছেন। প্রাচীন ও প্রচলিত সাহিত্য-রীতিকে পরিহার করে এই নতুন চিন্তা গ্রহন করেছেন বলেই, বিপ্লবের পর রাশিয়াত্যাগী এলেক্সি টলষ্টয় সাহিত্য-শিল্পে বিপ্লবী অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন এবং যে নিষ্ঠা নিয়ে বিপ্লবের আগে লিখতেন, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠা সহকারে রাশিয়ায় ফিরে গড়ে তুলতে পেরেছেন সোভিয়েট সাহিত্যের কয়েকখানি প্রামাণ্য উপন্যাস। এইচ. জি. ওয়েলস্ এই চিন্তা ধারাকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছেন বলেই, তাঁর উপন্যাসে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত বিকাশ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাই মানুষের ছদ্ম পদক্ষেপ—একেবারে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যান্ত্রিক; হয় নেহায়েৎ 'থার্ডক্লাশ' লোক, নয়তো অতিমানবীয় শক্তির অধিকারীর মিছিল চলছে ওয়েলসীয় উপন্যাসে।

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান আমেরিকার এক লেখক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন যে, রাজনীতির সংসর্গ এড়িয়ে চলেছিলেন বলেই তাঁর মতো লেখকদের এত বেশি নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আয়োজনের যুগে। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা সাহিত্য ক্ষেত্রে সমস্ত প্রগতিমুখী সৃষ্টি-শক্তিকে একটা সম্মিলিত মহড়ায় দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে; এই সম্মিলিত প্রথা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সর্বদেশের প্রগতিপন্থী লেখককে একত্র করার চেষ্টা হয়েছে। টমাস মান এঁদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ছিলেন। মার্কসবাদের ব্যাপক প্রয়োগ ও দৃষ্টি আরেকজন ঔপন্যাসিককে পৌঁছে দিয়েছে নবদিগন্তে। ইনি রোঁমা রোঁলা। সোভিয়েট অর্থাৎ মার্ক্সীয় সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে আশার কথা শুনিয়েছেন এবং তাঁর নিজের পূর্বজীবনের সাহিত্য-সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে যে আত্মবিলাপ জানিয়েছেন, সেই সব উক্তি এই ক্ষেত্রেই প্রণিধানযোগ্য।

অর্থাৎ এই নতুন ধারণা প্রচলিত প্রথায় লালিত-পালিত লেখকদের মানস-জীবনে একটা প্রচণ্ড সংঘাত এনেছে। প্রচলিত প্রথায় উপন্যাস লিখে যারা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যাঁদের উপন্যাস এখনও লক্ষ পাঠকের প্রিয় হয়ে রয়েছে, তারা অপ্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করে নতুন করে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করেছেন। ব্যাপকভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে এবং বিশেষার্থে উপন্যাস বিষয়ে এই যে নব-মূল্যবোধের প্রভাব বিস্তার, এর মূলে যে সূত্রগুলি রয়েছে, তারা নিছক সাময়িক ধ্বনিমাত্র নয় বলেই এইভাবে পুরাতন লেখক-লেখিকাদের সংস্কার জগতে এমন একটা আলোড়ন এনেছে।

একে একটা নিছক ভবিষ্য-বাদ অথবা অতিবাস্তবতা আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে রাজনীতির নামে আতঙ্ক জারী করে একে বহিষ্কৃত করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রাণ স্রোতই চলেছে এই দিকে।

উপন্যাস সম্বন্ধে উত্থাপিত আমাদের এই ধারণা অনেক কিছুকে জড়িয়ে রয়েছে। তবে প্রধানত দুটো ধারায় এই ধারণাটাকে ফেলা যায়।

প্রথমত, উপন্যাসের মাঝখানে জনসাধারণের স্থান। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমাজ বিপ্লবের সদা অগ্রসর ক্ষেত্রে উপন্যাসের স্থান নির্ণয়।

প্রথমত, কোন উপন্যাসের বিষয় বিশ্লেষণ ও মূল্য বিচার করতে গিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই উপন্যাসে জনসাধারণকে পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া যায়, তবে কোন অবস্থায়। উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক দৃষ্টি গোচর হয়েছে তো?

এরপর বিচার বিশ্লেষণ করে জনসমাজের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তার একটা বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণও দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এই সমাজতান্ত্রিক বিচার শুষ্ক ইতিহাস নয়। নবসামাজের ছায়ায় সামাজিক, ব্যক্তিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বিকাশ-সম্ভবনাকে সমস্ত বিচিত্র রূপে রঙে প্রকাশ করাই এর কাজ।

মূল্য সম্বন্ধে রায় দেওয়া যেতে পারে এর পর।

জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত উপন্যাসকে দ্বিতীয় দিক দিয়ে সামাজিক উদ্ভব হিসাবে দেখা দরকার। সমাজ জীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি যেভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়েছে, তাকে বুঝে ওঠাই এই দ্বিতীয় ধারার কাজ। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে উপন্যাস সাহিত্যের স্থান নির্ণয়ের অর্থ হচ্ছে; সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে উপন্যাস বিচিত্র বিকাশের দিকে এগিয়ে এসেছে, কোন্ বিশেষ কালে কাদের হাতে পড়েছে, কাদের হাত দিয়ে বার হয়েছে, কেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে পাঠকের মন থেকে, কোন্ শক্তিতে এবং কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সাধারণের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, এই সব প্রশ্নের জবাব বার করা। উপন্যাস-পাঠকের জানা প্রয়োজন–কোন সামাজিক পরিবেষ্টনে, কোন শ্রেণী সন্নিবেশে, কোন মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে ঔপন্যাসিক কলম ধরেছিলেন অথবা ধরেছেন।

প্রথম দিকটিতে আমরা দেখি, উপন্যাসে গণজীবন তরঙ্গিত কিনা, অথবা জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে কিনা। দ্বিতীয় দিকটিতে দেখি, সামাজিক জীবন-প্রবাহের ভিতর থেকে উপন্যাস কত রকম কতভাবে বেরিয়ে এসেছে।

প্রথমত, উপন্যাসের ভিতর জন জীবনের অনুসন্ধান চলেছে। মানুষ শ্রেণীগতভাবে বিন্যস্ত জীব–সমাজের মাঝখানে তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক যত প্রক্রিয়াই থাক না কেন সামাজিক শ্রেণীগত সম্বন্ধবোধের একটা ছায়া তার লেখাতে পড়বেই। সে যতই কেননা পলাতক হোক, নরনারীর দ্বয়ী অথবা ত্রয়ী সমস্যাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাক, নির্জন প্রকৃতির প্রান্তে ঘুরে বেড়াক, তবু ঘৃণায় হোক, প্রণয়ে হোক, শ্রেণীগত

সমাজ চেতনা একটা তার থাকবেই এজন্য বিশেষ করে উপন্যাসে সমাজের ছবি না পাওয়া যাবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু চলতি রীতি অনুসারে এখনও সাধারণভাবে বুঝতে চেষ্টা করা হয় আলাদা আলাদা চরিত্রগুলিকে। সমাজের কাজ যেন তাদের সামনে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে অথবা আঘাত করে কিংবা তাদের বক্ষে ধারণ করে তাদের পরিস্ফূট হওয়াতে সাহায্য করা। এইভাবে দেখলে সমাজের ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে শুধু চরিত্রগুলির জীবন সংগ্রাম অথবা জীবন উপভোগের ব্যাপক ক্ষেত্ররূপে। আজ কিন্তু খুঁজতে হবে সমাজচিত্রের মাঝখানে গণজীবনকে। চরিত্রগুলিকে চরিত্র হিসাবে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ জীবনের বিভিন্নমুখী গতি পরিণতির প্রতীক বা প্রতিনিধি হিসাবে দেখতে হবে। সমাজকে এজন্য জন সমাজের নামে অভিহিত করে নেয়া যেতে পারে। সমাজকে এখানে পটভূমিকা থেকে সরিয়ে সামনা-সামনি হাজির করে উপন্যাসের সঠিক সামাজিক বিচার করা সম্ভব।

উপন্যাস অবশ্য ইতিহাস নয়, সমাজতান্ত্রিক সন্দর্ভও নয়। উপন্যাস হিসাবে তার সার্থকতা সমাজ জীবনকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলায়। যে কোন সময়েই হোক না কেন, বিশিষ্ট জীবনের একটা গতি প্রকৃতি আছে এবং সেটা অনেক রং মিলিয়ে একটা বিশেষ ছবির মত, ভীড় থেকে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শক্তি ও চরিত্রের সমন্বয়ে। সমাজের কর্মধারা ও মানসিকতাকে একটা কাহিনীর মধ্যে শিল্পরূপ দেওয়া সম্ভব বিভিন্ন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে। তবে তাদের মেশানো দরকার। প্রত্যেকটি উপন্যাসে এইভাবেই একটা সমগ্র ছবি সংগ্রাহ করা যায়। যাদের সমন্বয়ে সমগ্রকে গড়ে তোলা হয়, তাদেরও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সমগ্রতা কোথায়, সে সমগ্রতা ঐতিহাসিক কোন্ পর্যায়ে রয়েছে সেটি নির্ণয় করে সেই ঐতিহাসিক পর্যায়ের সাহায্যে বিভিন্ন চরিত্রের সার্থকতা বিচার করতে হবে। প্রচলিত পাঠরীতি এবং বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের সমালোচনা সাহিত্যে এসবের স্থান প্রায় ছিলনা, এজন্য সমাজ বা ব্যক্তি–কোনটাই স্পষ্ট হয়নি।

জনজীবনের কথা শেষ পর্যন্ত একটি বিচার ধারা হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে দুটি উদ্দেশ্যে। প্রথমত, জনজীবনের উপর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়; দ্বিতীয়ত, জনজীবনের ঐতিহাসিক পর্যায়ের কোন্ ধারায় তাকে ব্যক্তির সঙ্গে ঐ সম্পর্কে সংযুক্ত হতে হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

জনজীবনের কথা না থাকাও একটা পর্যায়। এখানে একথাটাও প্রণিধানযোগ্য।

উপন্যাসে জনজীবনের গতি-পরিণতি বিস্তারের কোন রকম অবস্থাই আমাদের বিস্মিত করবে না। জনসমাজের বিপ্লবী তথা আজকালকার বিপ্লবী রূপ না থাকার জন্যই আমরা কোন একটি উপন্যাসকে দোষী করে কাজ সারব না। আমরা দেখতে চেষ্টা করব প্রথমত, উপন্যাসটি কোন্ কালের, কোন্ স্থানের, কোন্ লেখকের, কোন শ্রেণীগত চিন্তাধারার।

উপন্যাস এসেছে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদীদের শিল্পবিপ্লবের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদের জীবন-দ্বন্দ্বের মুকুর হিসাবে উঠে এসেছিল উপন্যাস। সামন্ত তন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার সময়, সেই সংঘর্ষকালে আজকের এই ধনিক শ্রেণীই একটা আপাত বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য ব্যক্তির সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রশ্নটিই সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার দাবীর মূলে ছিল, ব্যক্তিজীবনই নতুন বুর্জোয়া আদর্শ সমূহের পুষ্টি যুগিয়েছিল। এজন্য ব্যক্তি জীবনের কাহিনী-স্বরূপ উপন্যাস আকাশ থেকে ভূমিষ্ট হয়নি। সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আলোড়নের ভিতর দিয়ে ধ্বংস ও সৃষ্টির ঝঞ্ঝাময় পথ তাকেও ভাঙ্গতে হয়েছিল। এজন্য সে সময়ে ধনিকশ্রেণীর প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে ছিল বিক্ষোভ; তার পারিপার্শ্বিকের দৌলতে দেহ মনের অণুপরমাণু ভরা ছিল নব সম্ভাবনায়; সে ছিল সেই শ্রেণীর একজন, যে শ্রেণী নতুন উৎপাদন-প্রথার উদ্ভবের মালিক হয়ে উঠে এসেছিল; সে ছিল সেই শ্রেণীর, যে শ্রেণী সেদিন সমগ্র জনসাধারণকে জীর্ণ ভূমি প্রথা ও বিনিময় এবং করভারী প্রথার বিরুদ্ধে একত্রিত করে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। বাধাহীন ব্যক্তি সম্পত্তির তাগিদ এই নতুন ব্যক্তিকে (ধনিক শ্রেণীর) দিয়েছিল অফুরন্ত বিকাশের ক্ষেত্র ও মাল মসলা। ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল সে দিন ইতিহাসের চালক। বুর্জোয়া দ্রব্যোৎপাদন প্রথা যুগিয়েছিল অগ্রগতি; ইতিহাসে নায়ক ছিল বুর্জোয়া কর্মবীরদের দল, সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক হয়েছিল উপন্যাসের নায়ক নায়িকা; আর তার ক্রিয়াকলাপ ও পারিপার্শ্বিক হয়েছিল উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, যে শ্রেণী প্রভু হয় সেই শ্রেণী তার শ্রেণীগত ভাবাদর্শকে সমগ্র সমাজের বলে জাহির করে। প্রভু-শ্রেণীর লোক সমাজের সকল লোকের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াতে চায়। এজন্য ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শ্রেণীর থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভাবময় করে তুলবার চেষ্টা হয়। নতুন প্রভু-শ্রেণীর উদ্ভবকালে প্রথম প্রভাতে খড়মটি দিয়ে ঢেকে রাখবার এই চেষ্টা সফলও হয়। ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে সেদিন শহরের দরিদ্রেরা ও গ্রামের চাষীরা এসে দাঁড়িয়েছিল। নতুন ব্যক্তিভাব সেদিন তাদের হয়ে কথা বলবার স্পর্ধাও করেছিল এই কারণে।

এই নতুন ব্যক্তির কথা নিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রথম প্রভাতে উপন্যাস রচিত হয়েছিল। প্রথম দিকের একটি প্রামাণ্য উপন্যাস হিসাবে ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসোর' নাম করা যায়। ইংরেজি ভাষায় এই প্রথম উপন্যাসে ধনসম্পদের সন্ধানী ব্যক্তির জীবন-কাব্য বিধৃত হয়েছিল। ফারসি সাহিত্যে রুশো-ভলটেয়ারের উপন্যাসেও এই নতুন ব্যক্তিভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রভাত বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ব্যক্তিভাবের পরস্পর বিরোধিতা ধার পড়ে গেল ঊনবিংশ শতাব্দী অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রান্সে ১৮৩২ সালে শুরু হওয়া বিপ্লবের পর বিপ্লবে। সতেরো কিংবা আঠারো শতকের জনসাধারণের ভিতর ধনিকশ্রেণী যে প্রতিষ্ঠার শিকড় রোপণ করেছিল, উনিশ শতকের জনসাধারণের অভিজ্ঞতার বিক্ষোভময়তায় সে শিকড় নষ্ট হতে শুরু করল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূচনা হয় হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে। এজন্য এইসব দেশে প্রথম জনসাধারণ পুঁজিবাদী ভাবাদর্শের চরিত্রকে ধরতে পারে। ইংলণ্ডে সুরু হয় চার্টিস্ট আন্দোলন, ফ্রান্সে শুরু হয় লিওন বিদ্রোহ, জুন উত্থান। ভাবাদর্শ জগতে তখন এক

বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। তারই একটা পরিণতি আমরা দেখতে পাই চার্লস ডিকেন্স এবং ফ্রান্সের এমিল জোলার লেখায়। এই ঔপন্যাসিকদের বইতে আমরা দেখতে পাই জনসাধারণকে– আমরা দেখতে পাই জনতাকে শুধু সমসাময়িক নয়, অতীতকালের পটে। নিছক গভীর বাস্তবতাবোধ এই লেখকদের চালিত করেছিল। কিন্তু এও ঠিক যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান করে নতুন সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টির প্রয়াসে এই ক্রমে-খুলে-যাওয়া জনসাধারণ যে ভাবে জড়ো হচ্ছিল, তার একটা অবধারিত পরিণতির কথাও এই উপন্যাসে বলা হয়। তবে সন্দেহ, ঘৃণা ও চরমপত্র–জনসাধারণের তরফ থেকে এই ছিল সেদিন ঔপন্যাসিকের বিদ্রোহ। উপরন্তু অনেক সময় নিছক ব্যক্তিভাবে বিচার করতে যাওয়ায় জনসমাজের যে রূপ উদঘাটিত করা হয়েছে উপন্যাসে তাতে ঔপন্যাসিক তার ভিতরে নব সমাজের স্রষ্টাকে পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারেননি। তাঁরা শুধু কয়েকটা নীতিগত আদর্শবাণী ঐ বীভৎস বাস্তবের দাওয়াই হিসাবে শেষ পর্যন্ত খাড়া করতে পেরেছেন।

উপন্যাসে এইভাবে জনতার আগমন হয়েছিল। পুঁজিবাদী সমাজের শোষকশ্রেণী বুর্জোয়ার পাশাপাশি, ডিকেন্স ও জোলার ধরনের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের লেখার বাস্তবতার নামে বীভৎস দারিদ্র্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ লোক, কিন্তু সাধারণ লোক উপন্যাস সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ হয়নি। ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া যুগের লেখক লেখিকারা ফ্রান্সে মোপাসাঁ ও ফ্লবেয়ারের অনুগামীরা এবং জার্মানিতে হফমান ও জুডারমানের মত লেখক বাস্তবতাকে চরম ভাবে প্রয়োগ করেছেন ব্যক্তিজীবনে–অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের ব্যক্তিজীবনে। তবে এই ধরনের অধিকাংশ উপন্যাসে বিভাগীকরণ এবং খণ্ড খণ্ড করে নিপুণভাবে বিশ্লেষণের কাজও পরিলক্ষিত হয়। কয়েকজন ঔপন্যাসিক একটি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেছিলেন এই ধরনের উপন্যাসে। স্কাণ্ডিনেভিয়ান ঔপন্যাসিক আগস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ এবং রাশিয়ার কাউন্ট লিও টলস্টয় ও ডস্টয়েভ্স্কিকে এঁদের পর্যায়ে ফেলা যায়। আপন জীবনের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, দেহমনের জটিল দ্বন্দ্বময়তা, নিরাশা, আশা, বিদ্রোহ, অসন্তোষ, পাপবোধ এবং আত্মসমর্পণ-প্রভৃতির সাহায্যে ক্ষতবিক্ষত পুরুষ-হৃদয় দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে এইসব উপন্যাসে। উপন্যাসের ভিতরে তাঁরা জীবনের রহস্য নিবেদন করেছেন, দিতে চেয়েছেন দার্শনিক বাণী। অনেক জীর্ণ চিন্তা-মূর্তিকে তাঁরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। অনেক চিন্তা স্ফুলিঙ্গকে তাঁরা আকাশে উড়িয়েছেন। এইসব লেখকের লেখায় ব্যক্তিভাব তার মানস-শক্তির চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছিল। আবার এদেরই লেখায় পথের রূঢ় ও অপরিচ্ছন্ন জনতা ও বৈঠকখানার ফিটফাট ও সংস্কৃতি সম্পন্ন লোক মিশ্রিতভাবেও একটি শৈল্পিক রূপ লাভ করেছিল। সমগ্র উনিশ শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসে এই মিশ্রণটি ছড়িয়ে রয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ও বিষয়বস্তুতে কাল ও সমাজের পরিবর্তন রূঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। বুর্জোয়া ব্যক্তি অথবা হৃতসর্বস্ব জনসাধারণ ইতিহাসের এই কালে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ তখনও আরও সম্প্রসারিত হওয়ার শক্তি রাখে; আর দরিদ্র জনসাধারণ অনেকগুলি উত্থানে যোগ দিলেও তখনও বিক্ষিপ্ত ও অসংহত অবস্থায় অবস্থান করছে। কাজেই উভয়েরই

প্রবেশলাভ হয়েছিল উপন্যাস জগতে পাশাপাশি। অবশ্য জনসাধারণই 'উপভোগ' করেছে অন্ধকার! তবুও, ফাটলের তলায় অগ্নিপ্রবাহ চোখে পড়ে গিয়েছে। বিক্ষুব্ধ-হৃদয় আত্মকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিও এদিকে স্বভাবতই নিবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য তিনি অনেক সময় নিজের শ্রেণীর প্রতিই সাবধান-বাণী শুনিয়েছেন।

জীবন-বাস্তবতার বিশৃঙ্খল, অবিমিশ্র ও বহুধাবিভক্ত রূপ বর্তমান শতাব্দীতে স্পষ্টভাবে দুইখাতে বিধৃত হয়েছে, একদিকে দরিদ্র জনসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নায়ক; আরেক দিকে বুর্জোয়া ব্যক্তি তার সমাজ-বিপ্লবী রূপ পরিত্যাগ করে, নিজের চারিদিকে ঊর্ণনাভের জাল বুনেছে। এক ধরনের উপন্যাসে ধ্বনিত হচ্ছে জন-কল্লোল; ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর উপন্যাসে শিল্পের বাঁধ খুলে দিয়ে যে জনস্রোতকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন, তা আজ জীবনের নতুন কথা শোনাচ্ছে, ব্যক্তিকে চুম্বকের মতো নিজের ভিতর টেনে নিচ্ছে। এখনও অবশ্য সাবেক ধরনের উপন্যাসে জীর্ণ পুঁজিবাদী-সমাজের প্রতিনিধিরা ফ্রয়েডিয় মতবাদের নাম করে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিভাবের ভিতর গ্লানি ফেনিয়ে তুলে তার নাম দিচ্ছে সৃজনী-ক্ষমতার অতলস্পর্শতা। দরিদ্র জনসাধারণের নায়কতা নিয়ে শিল্পসৃষ্টি এদের কাছে স্থূল প্রচারকার্য মাত্র। তবে এই সাবেকীরা আজ অপ্রধান। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পরেই এই তারতম্য ঘটেছে বিশেষভাবে।

সাবেকী উপন্যাসে বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকের নিগূঢ় পরিচয় সাহিত্য হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল, বুর্জোয়া ব্যক্তিভাবের ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিক্রিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা তার ভিতরে প্রকাশ পেয়েছিল, যদিও জীবনের উপাখ্যান হিসাবে উপন্যাস ব্যক্তির গণ্ডির বাইরের জনসাধারণের জীবনকেও একেবারে না নিয়ে পারেনি।

এখন উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করেছে জনসাধারণ। বর্তমানে ইতিহাসে বুর্জোয়ার নায়কতার অবসান হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। এখন ইতিহাসের মূল নায়ক হয়েছে মেহনতী জনসাধারণ। মেহনতী জনসাধারণের লোকই হবে এখন উপন্যাসের নায়ক নায়িকা।

বৃটেন প্রবাসী রুশ সমালোচক মিয়স্কির লেখায় উপন্যাস বিচারের মাপকাঠি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে তীব্রভাবে উপস্থাপিত হয়। সাহিত্য মাত্রেরই বিচারকে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে দাঁড় করান। মার্কসবাদের একটি ব্যাপক প্রয়োগে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। সমাজ, গণজীবন, মানবতা, বাস্তবতা–এ সব কথাই তাঁর কাছে ধোঁয়াটে মনে হয়েছে। শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে তিনি বিচার করেন সাম্যবাদী বিপ্লবে নিয়োজিত শ্রমিক-শ্রেণীর দৃষ্টিতে, সামাজিক সম্পর্কের সদা-পরিবর্তন ও দ্বন্দ্বময় ভাঙা-গড়ায়। বিচিত্র সমাজ-জীবনের বিভিন্ন প্রতীক-ব্যক্তির জটিল সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসকে দেখে তিনি ক্ষান্ত থাকতে পারেননি। শ্রেণী সম্পর্কের দ্বন্দ্বময় অগ্রগতিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবনলিপি পড়তে চেষ্টা করেছেন তিনি।

৩

অতঃপর উপন্যাস সাহিত্যের আঙ্গিকের বিচারে বসলে আমরা কী দেখতে পাব? উপন্যাস সাহিত্যের যেরূপ বিস্তার হয়েছে, যেসব বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, তাদের পৃথক সত্তার সার্থকতা এবং সমস্ত উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েই এই বিচার করতে হবে। ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক-প্রধানত এই দুই ভাগে উপন্যাসের বিশিষ্ট রূপ নিরীক্ষা ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। মার্ক্সীয় সমালোচনার ধারায় এদের কোন একটি নাকচ করে দিয়েই আরেকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিকেই সামাজিক উদ্ভব হিসাবে দেখা হয়েছে, 'উপন্যাস নয়' বলে প্রচলিত সমালোচনার ধারায় কোন এক ধরনের উপন্যাসকে ছাপ মেরে দেওয়া হয়নি। এমনকি ডিটেকটিভ নভেলও উপন্যাস, আবার বটতলার সচিত্র প্রেম-নীতি উপন্যাসও উপন্যাস। এই সব নানা ধরনের উপন্যাস সমাজের বিভিন্ন পর্যায় ও শ্রেণীর চাহিদা অনুসারে লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এজন্য তাদের কোনটা উপন্যাস নয় অথবা কোনটা উপন্যাসের বিকৃত কিংবা অবাস্তব পরিণতি মাত্র—এই ধরনের রায় দিয়েই আমদের নতুন ধারণা ক্ষান্ত থাকতে পারে না। প্রত্যেকটি সামাজিক উদ্ভবের পিছনে যে ঐতিহাসিক শক্তি-দ্বন্দ্ব আছে, তাকে খুঁজে বার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এ নিশ্চয় উপন্যাস, কিন্তু এই ধরনের, এই কালের, এই শ্রেণীর।

এদের মধ্যে বহুজন পরিচিত কোন একটিকে নিয়ে আলোচনা করলেই উপরের উক্তি পরিষ্কার হতে পারে। যেমন ডিটেকটিভ উপন্যাসে দেখা যায়, ব্যক্তি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত পাহারা ও তার দুর্ভেদ্যতার ব্যবস্থা, যে 'অর্থ' বুর্জোয়া সমাজের কেন্দ্ররূপ, ডিটেকটিভ উপন্যাসে সেই 'অর্থই হয়েছে বিষয়বস্তু। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে এই বইয়ের কাটতি দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিকের 'আর্থিক মর্যাদা' অন্য ধরনের ঔপন্যাসিককে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। আমাদের দেশে সাধারণত এই বই পড়ে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রথমত, ডিটেকটিভ উপন্যাসকে সাহিত্যের সীমানা থেকে বাইরে ঠেলে দিয়ে অস্পৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে, সাহিত্যের আদর্শ ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট প্রমাণিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে যেসব সম্প্রদায় বেশি ছোঁয়াচ মেনে চলেন, তারাই আবার দ্বিতীয় ধারণা পোষণ করেছেন। এঁরা খুব ভাল এবং আসল ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখবার জন্য নিজেদের দলের লোককে উৎসাহ দিয়েছেন। বাংলাদেশের জলবায়ুতে নিজস্ব ডিটেক্টিভ শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াসে এঁদের প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছে। সাহিত্যের এদিক দিয়ে যে একটা নতুন আঙ্গিক নড়ে চড়ে উঠছে, একথা জানাতেও এঁরা ভোলেননি। এঁদের ধারণা যে, পশ্চিমদেশে যে ভাবে ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা হয়, তা একটি উন্নত সাহিত্য পর্যায় বলেই তার এত প্রভাব এবং আমাদের দেশীয় ভাষায় লেখা ঐ ধরনের বই আমাদের হাতে লেখা অনুকরণ মাত্র বলেই তা' নিকৃষ্ট সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে রয়েছে।

বুর্জোয়া অর্থ-প্রথার অভিযানের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত দরিদ্র জনসাধারণের জীবনকে আমাদের দেশের যে সব সমালোচক ও ঔপন্যাসিক এগিয়ে চলে আসা ইতিহাসের হাত থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহন করেন, ডিটেকটিভ উপন্যাস

তাঁদের কাছে ঘৃণার বস্তু। তবে এঁরা যেখানে শুধুমাত্র বুদ্ধির জগতে তাল ঠুকে প্রাচীনকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন, সেখানে যেমন এঁদের বাস্তববাদী উপন্যাস অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হয়ে রয়েছে, তেমনি ডিটেক্টিভ উপন্যাস সম্বন্ধে এঁদের রায়ও নিতান্তই হালকা থেকে গেছে। ডিটেকটিভ উপন্যাসকে এঁরা জঞ্জালের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই খালাস হয়েছেন এবং অনেক সময় পাঠক পাঠিকাদেরই কাঁধে এর সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে দিয়েছেন। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে দেখলে ডিটেক্টিভ বই-এর মূল ব্যাপারটি সামনে আসবে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির সাম্প্রতিক আধ্যাত্মিক আওয়াজ ও ধ্যান ধারণার ভিতরকার শাঁসটি অত্যন্ত স্থুল জিনিস, ডিটেকটিভ সংস্কৃতিই তার প্রমাণ। এই ধরনের বই শত টুকরো করে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করলেই সাহিত্য জগতে এর স্থান-চ্যুতি হবে না। এই ধরনের বই এর সকল রহস্যময়তার উপর যে রহস্যটি রয়েছে অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের প্রাধান্যের যে রহস্যটি রয়েছে, তাকেই ভেদ করতে হবে; ঐ আবরণটিকে শতটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ডিটেকটিভ বই-এর এইভাবের সামালোচনা দুটো কথা পরিষ্কার করতে পারে। প্রথমত, এই উপন্যাসে ধনিক শ্রেণীর রক্ষণশীলতার স্থুল অভিব্যক্তিটা স্থান করে নিয়েছে; দ্বিতীয়ত, ধনিক সংস্কৃতি স্থুলতা সম্বন্ধে এই উপন্যাস আর কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেনি।

উপন্যাসের অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে, কোন বিশেষ ধারার উদ্ভব ও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে এইভাবেই তলিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার। ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও এমনিভাবেই আলোচনার সূত্রপাত্র মার্ক্সীয় সমালোচকরা করেছেন।

মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসকে বিচারেও-মার্ক্সীয় ধারণার প্রয়োগ উপরোক্ত ধরনের হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম মানসিক কারুকার্য দিয়ে যে উপন্যাস গঠিত হয়, কিংবা ইতিহাসের কাঠামোকেই একটু অদলবদল করে যে উপন্যাস রচিত হয়, তার ভাসমানতা অথবা যান্ত্রিকতা কিংবা গভীরতা অথবা সজীবতা কতখানি সার্থক, সে সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

ডিটেকটিভ উপন্যাস যখন একটি বিকৃতিমাত্র বলে মনে হয়, তখনও মার্ক্সীয় সমালোচক তার ইতিহাসগত বিচার করতে রাজী। কাজেই যে উপন্যাসের রূপ প্রগতিক ও উন্নত, যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস, তার যোগ্য স্থান নির্দেশ করতে হবেই। উন্নত উপন্যাসের রূপকে কিন্তু আমাদের ধারণা গলধঃকারণ করবে না। বিশুদ্ধতা, ব্যাপকতা অথবা স্থানীয়ভাব এবং সময়ের সীমা প্রভৃতি দিয়ে কোন একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুসরণে একে দেখা হবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসকেও ইতিহাসের গতিধারায় পরীক্ষা করতে হবে। অতীত অথবা বর্তমানের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিচার হবে উপন্যাসের ইতিহাস রচনা করে। লিও টলস্টয় যখন তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' লিখছিলেন, তখন ইতিহাস ও উপন্যাসের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, ইতিহাসকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করতে হলে বিপরীত ধারাটাকে গ্রহণ করতে হবে; অর্থাৎ ইতিহাসে বিশেষকে যা কিছু বোঝা যায় ব্যাপকের সংযোজনায়, আর উপন্যাসে ব্যাপককে বিশেষের মধ্য দিয়ে দেখতে হবে; অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন হবে উপন্যাসের ঘটনা, ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তাই। সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই যে, তাঁর প্রবল ব্যক্তিভাব তাঁর বিরাট বাস্তবতাবোধকে অতিক্রম

করেছে। তিনি ব্যক্তির ভেতর তলিয়ে গিয়েছেন; ইতিহাসের কাল ও স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নয়, নিজের মধ্যে। লিও টলস্টয় নিজেই 'যুদ্ধ ও শান্তির' নায়কের মধ্যে সজীব হতে চেয়েছেন, সার্থক হতে চেয়েছেন। সুতরাং মার্ক্সীয় বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে বলতেই হবে যে, ইতিহাস ও উপন্যাস সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা সত্ত্বেও সে চিন্তা টলস্টয়ের উপন্যাসে যত না স্থান পেয়েছে তার চেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে টলস্টয়ের ব্যক্তিগত মতবাদ। এদিক দিয়ে দেখলে টলস্টয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবে গোঁজামিল দিয়েছেন। এই পটভূমিতে বর্তমানে সোভিয়েট উপন্যাসের ঐতিহাসিক রূপ অপেক্ষাকৃতভাবে সার্থক হয়েছে বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সার্থক করে তোলায়। সেখানে জগৎ, সমাজ ও মানুষের মন সম্বন্ধে মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যেসব উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার ভিতর যে বিশিষ্ট স্থান কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার মূলগুলি অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করবার পর ঐতিহাসিক শক্তিদ্বন্দ্বের বাস্তবরূপের উদঘাটন করে তারই ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে নতুন ঐতিহাসিকতা। 'তাদের কথা তাদেরই বলতে দাও–' এই হচ্ছে মার্ক্সীয় বিচারের পদ্ধতি; কিন্তু এই পদ্ধতি আরেকটা কথা বলে, 'যারা কথা বলছে, তাদের এমন বাস্তব পরিচয় চাই যে, তখনকার কথা ও তখনকার কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক গতির চাকার কাজ করবে।' আধুনিক মার্কসপন্থী ঔপন্যাসিক কোন দূরকালের ইতিহাসের লোক নায়কের বাক্যে ও ব্যবহারে উঁকিঝুঁকি মারবেন না; কারণ সেদিনকার একজন ব্যক্তির পক্ষে মার্ক্সীয় সর্বহারা বিপ্লবের ভাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু সেই উপন্যাস রচনা হবে এ দিক দিয়ে যে, তাতে জীবন ঘটনার মূলগুলি উদঘাটিত হবে ইতিহাসের সম্মুখগামী ধারায়।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও এই ধরনেরই বিষয়ীভূত বিষয়ের প্রাধান্য থাকা দরকার। আজকের মূল কথাটা এই যে, জনসাধারণ এবং জনসমাজের গতিপথ ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে উপন্যাস লিখতে ও পড়তে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে, মূল্য নিরূপণ করতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জনসমাজের মশালে অনেক অনেক বেশি আলো, জনসমাজের নিশানে অনেক বেশি নিশানা।

(এই লেখাটির মূল কাঠামোর রচনাকাল-১৩৪৭ সন)

উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র

মেহনতী মানুষ যখন থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসাবে উপন্যাসকে উচ্চমূল্য দিতে শুরু করেছে বাইরের ব্যবসায়িক চটুলতার খোলস থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে–প্রায় তখন থেকেই পরজীবী পুঁজিবাদী মহলগুলিতেও উপন্যাসকে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকতার একটা বিশেষ ছদ্ম রন্ধ্রপথের পথিক করে তাকে দিয়ে মাকড়সার জাল বুনিয়ে নিয়ে শিল্পকলাকে ধরাছোঁয়ার অতীত প্রতিপন্ন করে মেহনতী মানুষের উপন্যাস সংক্রান্ত জাগ্রত আগ্রহকে নস্যাৎ করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। এদের মুখে এই কারণেই শোনা গিয়েছে যে, গত তিন শতাব্দীর বাস্তববাদী ধারায় লেখা ইদানীংকার বইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পকর্ম।

এ অবস্থায় উপন্যাসের শিল্পরূপের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের মূল সূত্রটিকে সামনে আনার জন্য মেহনতী মানুষকে সচেষ্ট হতে হয়েছে। তিরিশের দশকে বিশ্ববিশ্রুত সাম্যবাদী বিপ্লবী ইংরেজ লেখক ক্রিস্টফার কডওয়েল উপন্যাস সম্বন্ধে যে তাত্ত্বিক সূত্র দাখিল করেন তাঁর 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে, সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বিশেষভাবে অর্থময় হয়ে উঠেছে। সুতরাং কডওয়েলের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি হুবহু হাজির করে আমাদের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে :

'কবিতা ও উপন্যাস উভয়েই ধ্বনিভিত্তিক। এ-সব ধ্বনি থেকে জাগে বহির্বাস্তবের এবং অনুভব-তরঙ্গের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি। তবে কবিতার ক্ষেত্রে অনুভব-তরঙ্গ সংগঠিত হয় ভাষার আকৃতিতে, উপন্যাস ক্ষেত্রে তা সংগঠিত হয় বহির্বাস্তবের চিত্রণে।

'সঙ্গীত, কবিতা এবং উপন্যাসে ধ্বনি-প্রতীকের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। উপন্যাসের ধ্বনি-প্রতীক হচ্ছে বহির্বাস্তবে অবস্থিত বিষয়বস্তুর প্রতীক; কবিতার ধ্বনি প্রতীক অনুভব-তরঙ্গ ও স্মৃতি-চিত্রের শব্দপদজাত জটিল মানসের প্রতীক; সঙ্গীতের ধ্বনি-প্রতীক অংশত আপাত-বহির্বাস্তবের প্রতীক।

উপন্যাস এবং ঐকতানের জগতে মানুষের ধ্যান ধারণায় জেগে ওঠে এক পরিবর্তমান ও প্রসারমান বিশ্বের বহু মানুষের বিভিন্ন আবেগের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র গতিধারা।

'উপন্যাসের এবং বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানসমূহের পূর্ণপ্রসারের জন্য চাই প্রতিভার কাছ থেকেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপক্বতা।'

২

ক্রিস্টফার কডওয়েল উপন্যাসের শিল্পকলাগত পার্থক্য ও মৌলিকতাকে যথেষ্ট তীক্ষ্ণভাবে নিরূপিত করে গিয়েছেন। উপন্যাসের এই পার্থক্য এবং মৌলিকতার ঋজুতা যে ঔপন্যাসিককে শিল্পসৃষ্টির পিচ্ছিল পথে পা রেখে চলতে প্রভূত সাহায্য করেছে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। কিন্তু প্রথমত, ক্রিস্টফার কডওয়েল 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে প্রধানত কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়েই আলোচনা করেছেন; উপন্যাস সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তা প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত, ক্রিস্টফার কডওয়েল দেখেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর উপন্যাসের লক্ষণসমূহ; কিন্তু দ্বিতীয় মহযুদ্ধোত্তর উপন্যাসে একদিকে একটা যুগান্তরের অবশ্যম্ভাবী চিহ্নগুলি অঙ্কিত হয়েছে, আরেকদিক দিয়ে এর মধ্যে কডওয়েলের সমকালীন সেই অস্ফুট লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যাদের সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করা তখন সম্ভব ছিল না। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, কডওয়েল প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে ছোটখাট বিস্ফোরণও কি ঘটেনি?

কডওয়েল বেঁচে থাকলে সম্ভবত তিনি নিজেই এ-প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে কবিতার ভবিষ্যৎ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। যথা ভবিষ্যদ্বাণী খুব বেশি অবিকল এবং চুল-চেরা হওয়া উচিত নয়। কোন একটি গুণ তার বিপরীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে ছোট একটুখানি পরিবর্তনেই।' সুতরাং খোলা মন নিয়ে বিচার করার জন্য কডওয়েলের নিজের দেওয়া প্রবেশপত্রই উপন্যাস সম্পর্কে

তৎকর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে, যা নিয়ে সমসাময়িক সংজ্ঞার প্রসারমান অভিনবত্বের গভীরে যেতে দ্বিধা নেই। এখানে উল্লেখ বাহুল্য যে, তরণী এবং স্রোত নিরবধি। কডওয়েল-প্রদত্ত মৌলিকতার সংজ্ঞা আমাদের আলোচনার অগ্রগতিতে এই ভাবেই সাহায্য করবে। সৃষ্টি ও সংজ্ঞায় যদি অন্তর্দ্বন্দ্বের সুবৃহৎ বিস্ফোরণও এতে প্রতিভাত হয়, তাতে পথভ্রষ্ট হবার ভয় থাকবে না। এ-সংজ্ঞার পিছনে রয়েছে গত তিন শত বছরের উপন্যাসের বিকাশের ইতিবৃত্ত।

৩

সংলাপ ও ঘটনা-বিন্যাসের এক অভূতপূর্ব গুণাত্মক ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন সমাবেশে গড়া সাহিত্যের অভিনব শিল্পরূপ 'উপন্যাসের' উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে বিজ্ঞান ও শিল্প-বিপ্লব-পুষ্ট যন্ত্রপুরীর ছাঁচে ঢালা পণ্যোৎপাদন-চুল্লী থেকেই। মুদ্রণ-যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ব্যতীত উপন্যাস-শিল্প সম্ভব হত না; অবাধ ব্যবসায়ের অন্যতম পণ্য হিসাবে পরিগণিত না হলে উপন্যাস তার ব্যাপক পাঠক-পাঠিকা-গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারত না। তবু সেই নিতান্ত যন্ত্রজাত তথাকথিত সুলভ সংস্করণের ছাঁচের মধ্যে কথাশিল্পীরা মানব-মানবীর প্রমুক্ত বা মুক্তিমুখী হৃদয়ের ইতিবৃত্তকে যেমন করে সংস্থাপিত করেছিলেন, ইতিপূর্বে সাহিত্যের কোন বিভাগেই তা সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে শিল্পকলার কোন ছাঁচের মধ্যেই মানবত্বের সর্বময় প্রকাশে এত প্রশস্ত পরিসর আর পাওয়া যায়নি। কবিতা ও নাটকের ঋজু আধারের মধ্যে শিল্পীরা হাজার হাজার বছর ধরে পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টা করে আসছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসের উদ্ভবের সঙ্গে শিল্পীর মুক্তি-প্রয়াস যেন রাতারাতি অর্গলমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন নব নব মুক্ত দিগন্তচারী সাধ-স্বপ্নেরা শুধু প্রকৃতি-জয়াভিলাষী দু:সাহসী অভিযাত্রিকদের শ্যেনবক্ষই বাসা বাঁধেনি, নব নব গৃহের কন্যা ও ঘরণীদের কপোতবক্ষকেও বেপরোয়া করে তুলেছিল। উপন্যাস এই নবযুগের নরনারীর সাধ-স্বপ্ন বিস্তারের বাধামুক্ত শিল্পরূপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যন্ত্র উপন্যাসের মৌলিক বিস্তৃতির সহায় হিসাবে কাজ করেছিল, মানবত্মার মুক্তধারা কাজ করেছিল প্রাণশক্তি রূপে।

উপন্যাসের উদ্ভবের শতাধিক বছর আগে শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে প্রচলিত নাট্যরূপ ভেঙ্গে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামাজিক অভ্যুদয়ের নায়ক নায়িকাদের উদ্দাম হৃদয়ের জন্য পরিসর বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকের বেপরোয়া ঔপন্যাসিক সুরভ অগোছালো ভাব লক্ষণীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কিংবা আরও কিছুকাল আগে ইউরোপের কোন কোন দেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের প্রত্যুষ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এই প্রত্যুষের সুচনায় ইটালির কবি দান্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। ফ্রান্সের জনৈক ভাববাদী সাহিত্য-তত্ত্ববিদ পর্যন্ত দান্তের কাব্যে একটি অখণ্ড আধারে নাটক ও গীতি-কবিতার সঙ্গে উপন্যাসকেও আবিষ্কার করেছেন। এই প্রত্যুষের পরবর্তী পর্যায়ে উপন্যাসের উপাদান নিয়ে উদ্ভব হয়েছিল এক নতুন ধরনের গদ্যরচনার, যাকে বলা যেতে পারে দৈনন্দিন জীবনের ইতিবৃত্ত

(জার্নাল)। বিভিন্ন সাময়িকীতে নব-নাগরিক জীবনের আটপৌরে ইতিবৃত্ত উপন্যাসের পাদপীঠ গড়েছে।

উপন্যাসের উপাদান নাটক, কবিতা কিংবা জার্নালে শিল্পকলাগতভাবে অন্যান্য শিল্পরূপের অঙ্গ হয়ে বেশি দিন থাকেনি। এর কারণ, সাধারণ মানব-মানবীর জীবনচিত্রের তাগিদ খুঁজেছে বিস্তারিত দৈনন্দিন রূপরেখা। রাশিয়ার পুশকিন তাঁর 'ইউজিন ওনেগিন' কাব্যের পরিচয় দিয়েছিলেন 'কাব্যে উপন্যাস' বলে। কিন্তু রুশ উপন্যাসের স্রষ্টা হিসাবে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' লিখে। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসের ধারায় যখন তিনি সাহিত্যের শিল্পরূপে হাত দিলেন, তখনই তা তাঁর গীতিকবিতা বা কাব্যনাট্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিল এবং সেই উপন্যাসের রূপ-প্রবর্তন করল যা বিশ্ব উপন্যাস-সাহিত্যের বুনিয়াদের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। গোগোল, তুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, গোর্কি উপন্যাসের এই মৌলিকতাকেই সমৃদ্ধতর করেছেন। টলস্টয়ের কথাই ধরা যাক। মানুষের জীবন-সত্যকে সূত্রাকারে ব্যক্ত করার প্রবণতা টলস্টয়ের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে; কিন্তু উপন্যাস লিখতে বসে তিনি কাগজের স্তূপের ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, পাঠক পাঠিকার সময়ের হিসাব করলেন না, নিজের সাধনার দামী দামী মুহূর্তের কথা ভাবলেন না। বালজাক, হিউগো, চার্লস ডিকেন্স এবং মোপাসাঁর গ্রন্থ স্তূপে যোজনা করলেন হাজার হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাসমালা। এর অন্যথা করার উপায় ছিল না তাঁর। যখন তিনি নরনারীর অন্তরাত্মার বিহারকাহিনী বলার জন্য উপন্যাসের মাধ্যমে নির্বাচন করলেন, তখন তিনি জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যময় পথে বহু মানুষের শরিক হয়ে গেলেন, তাঁর ব্যক্তিত্বকে অসংখ্য নরনারীর আত্মিক বিকাশে বিশ্লিষ্ট করে দিলেন।

একথা সত্য যে আনাতোল ফ্রান্সের মতো ঔপন্যাসিকরা চেষ্টা করেছেন গ্রীক সুমিতিকে উপন্যাসেও প্রয়োগ করতে। আনাতোল ফ্রাঁসে তাঁর 'বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য' তত্ত্বকে সার্থকভাবেই প্রয়োগ করেছেন তাঁর রচনাবলিতে। তাঁর লেখা উপন্যাস 'থেইস' কিংবা 'পেঙ্গুইন দ্বীপ' বিষয়বস্তুতে ও আঙ্গিকে পৃথক হলেও শিল্পকলাগতভাবে গ্রীক নাটকের শিল্পকলার সূত্রে গ্রথিত। আনাতোল ফ্রাঁসে যে ধারার প্রবর্তন করেন, তা ফারসি উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে আজও। কিন্তু সমগ্রভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আনাতোল ফ্রাঁসে তাঁর মতাদর্শকে প্রতিফলিত করতে পারেননি। অপরিমেয় উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর শ্লেষাত্মক মন্তব্যকে উপেক্ষা করে রোঁমা রোঁলা 'জাঁ ক্রিস্তফ' এবং 'বিমুগ্ধ আত্মা' উপন্যাসদ্বয়ের প্রথমটিতে একটি পুরুষ চরিত্রের এবং দ্বিতীয়টিতে একটি নারী চরিত্রের মুক্তি অভিযাত্রাকে বহু মানুষের জীবনযাত্রায় প্রসারিত করে দিয়েছেন। উপন্যাসের বহু নরনারীর জীবন শুধু নয়, উপন্যাসের বাক্যবিন্যাসও সদা-প্রসারমাণ বিশাল নদীপ্রবাহের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, উপন্যাস মানব-মানবীর যে অন্তর্জীবনকে উদ্ঘাটিত করেছে, তা মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি।

তিনশত বছরেও তাই উপন্যাসের মৌলিকতার প্রসারমান ধারা মন্থর হয়নি। শুধু যে মন্থর হয়নি তা নয়, অপরিমেয় প্রাণশক্তিতে ভরপুর রয়েছে। জার্মান ঔপন্যাসিক

টমাস মান উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত যে একই ধারার উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে গেছেন, তাতে তাঁর মান কিংবা আবেদন তিলমাত্র কমেনি।

৪

আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম দিকপাল আলডুস হাক্সলি তাঁর 'মিউজিক অ্যাট নাইট' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে উপন্যাসের উপরোক্ত মৌলিক বিশেষত্বকে নির্ধারিত করেছেন এইভাবে যে, গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে শেকস্‌পীয়রের নাটক যেখানে সত্যের রাসায়নিক বিশুদ্ধ রূপায়ণমাত্র, উপন্যাস সেখানে সমগ্র সত্যের আধার! এদিক থেকে শেক্‌সপীয়রের নাটক অপেক্ষাও অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং অনেক বেশি বাস্তবধর্মী, বেশি সত্যগ্রাহী। আলডুস হাক্সলির মতে শিল্পকলাগত দিক দিয়ে সমগ্র সত্যকে রূপায়িত করেছে হোমারের মহাকাব্য; তারপরই তিনি নাম করেছেন অষ্টাদশ শতকের ফিল্ডিংএর উপন্যাসের। আলডুস হাক্সলি শুধু অষ্টাদশ শতকেই উপন্যাসের মৌলিকতাকে সীমায়িত রাখেননি। উক্ত গ্রন্থে তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন: প্রুস্ত, ডি. এইচ. লরেন্স, আঁদ্রে জিদ, কাফ্‌কা, হেমিংওয়ে-এরা পাঁচজন নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক লেখক। এই পাঁচজন গ্রন্থকারই পরস্পর থেকে যথাসম্ভব উল্লেখযোগ্য ভাবে পৃথক। এঁরা শুধু একটা বিষয়ে এক, সেটা হল এই যে, এঁরা কেউ বিশুদ্ধ ট্রাজেডি লেখেননি, এঁদের সম্পর্ক হচ্ছে সমগ্র সত্যের সঙ্গে।' আলডুস হাক্সলির এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনশ' বছরের উপন্যাসের বাস্তববাদী ধারাবাহিকতাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েট লেখক ভ্লাদিমির নেপ্রভ তাঁর 'বাস্তববাদের নন্দন তত্ত্বের পক্ষ সমর্থনে' নামক লেখায় দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েট উপন্যাস 'চাপায়েভ' উনিশ শতকের বাস্তববাদী ধারারই একটি পরিণত রূপ।

ভ্লাদিমির নেপ্রভ তাঁর উপরোক্ত লেখায় উপন্যাসের অবাস্তব মনস্তাত্ত্বিকতার সমস্যা তথা দ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কথাগুলি বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে একথা বেরিয়ে এসেছে যে, উপন্যাসে তথাকথিত মনস্তত্ত্ববাদীরা সংকট সৃষ্টি করেছ। এই সঙ্কট কিসের সঙ্কট? নেপ্রভ বলেছেন :

বাস্তববাদী শিল্পকলাকে যে ধারাগুলি ভ্রষ্ট করেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নন্দনতাত্ত্বিক আত্মকেন্দ্রিকতার প্রসার। লেখক তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে অতি-রুচিবান মনের সূক্ষ্ম ধারাগুলিতে কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর নিজের মনের বিভিন্ন আশ্লেষ, স্মৃতি এবং মানসিক আবেদন তাঁর কাজকে অভূতপূর্ব বিঘ্নের সম্মুখীন করে দেয়। এই বিশাল ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণাগার একদিন শিল্পকলাগত রূপান্তর করণের এবং ব্যাপক মানব-জনতা ও জনগণের অর্জিত চেতনার প্রতিনিধিরূপে বিশিষ্ট চরিত্র-সৃষ্টির উপায় হিসাবে কাজ করছে; আজ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে গবেষণাগারেরই চিত্রায়ণে।

নেপ্রভ-প্রদত্ত এই সঙ্কটের চিত্রও বিচ্ছিন মার্কসবাদী চিত্র নয়, এই একই ধরনের তীক্ষ্ণ বক্তব্য ফারসি ঔপন্যাসিক সার্ত্রের লেখাতেও দেখতে পাওয়া যাবে। উপন্যাসের

স্বচ্ছ প্রাণবন্ত ধারার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি চরম জটিল তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন 'সাহিত্য কি' গ্রন্থে তাতে নেপ্রভ কর্তৃক আলোচিত ভ্রষ্টতা সংকট সম্পর্কে তাঁকে প্রায় একমতই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সার্ত্রে নিজে যে সব উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলিতে অজস্র নরনারীর বহির্মুখী অন্তর্জীবন বিধৃত হয়েছে।

এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, যে প্রসারমান বহির্বিশ্ব এবং বহু মানুষের সঙ্গে পাত্রপাত্রী নরনারীর নিগূঢ় সংযোগে ঔপন্যাসিক রাসায়নিক উপাদান মিশ্রণের কাজ চালিয়ে কাজ করে আসছেন শিল্পীর অপরিমেয় ভালবাসার সঙ্গে খানিকটা বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার খাদ মিশিয়ে, তারা এক ধরনের ঔপন্যাসিকের লেখায় শিল্পীর চিন্তাপ্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে তরলিত হয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে শিল্পীর মনের তিমিরাচ্ছন্ন গুহায়, কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই ধরনের তিমিরাচ্ছন্নতাই কি শেষ কথা? এমন কি সংশ্লিষ্ট ঔপন্যাসিকেরও?

জেমস জয়েস কিংবা উইলিয়াম ফকনার যে দুটি ধারার প্রবর্তন করেছেন উপন্যাসকে শিল্পকলাগত-ভাবে কাব্যিক জটিলতায় জড়িয়ে, এ-প্রসঙ্গে তাদের কথা উঠতে পারে। তবে এই দুই শিল্পীর রচনাতেও উপন্যাসের মৌলিক ধারা এত আপোষহীন যে, ঔপন্যাসিক হিসাবে এদের দুজনকেই সে ধারায় এগিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁরা যা করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে তাঁরা উপন্যাসের বিশিষ্ট শিল্পকলাকে বিপর্যয়ের মরু-কিনার দিয়ে নিয়ে চলেছেন। পড়ে ধ্বসে ধ্বসে পড়েছে, স্রোতধারার শ্বাসরোধ হয়েছে মাঝে মাঝে। তবে মাঝে মাঝে উপন্যাসের সাধারণ মানব মানবীরা আশ্চর্য নিটোল হয়ে চলাফেরা করেছে তাঁদের লেখাতেও। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'ইউলিসিস' উপন্যাসেও জেমস জয়েস উপন্যাসের মৌলিকতাকে মাঝে মাঝে আশ্চর্য উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। একজন কথা-শিল্পী এবং একজন ফলিত-বিজ্ঞানী ব্যবসায়ীর স্বতন্ত্র জীবন প্রবাহের যে সমান্তরাল ছবি এই বইটিতে পাওয়া যায়, তাতে বুঝতে পারা যায়, জেমস জয়েস বিভিন্ন শিল্পকলার মৌলিকতা সম্পর্কে সচেতন। অবশ্য তিনি পরবর্তী গ্রন্থে এক সম্পূর্ণ নতুন দেশে প্রবেশ করেছেন যা শিল্পকলা হতে পারে, কিন্তু উপন্যাস না কবিতার এক মহাসমুদ্ররূপ তা নির্ণয় করা কঠিন। এখানেও প্রশ্ন এই যে, জয়েসের 'শিল্পী চরিত' উপন্যাসটি আটপৌরে ভাষায় লেখা বলে এটিকে বাতিল করে দিতে পেরেছেন কি কেউ?

তবে একথাও বিচার্য যে, যে সংজ্ঞা ও সৃষ্টিধারা তিনশত বছরের মানবতীর্থ-যাত্রার অভিব্যক্তি বহন করছে, তাতে গুণগত পরিবর্তন আসা প্রয়োজন ও স্বাভাবিক। শিল্পী প্রতিহত মনে করতে পারেন প্রচলিত ধারার পৌনঃপুনিকতায়, তা যত সঞ্জীবকই হোক না কেন প্রাণের তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করেনা, যদি তার ধারা সব সময় মুক্ত না থাকে। গত তিনশত বছরে যে-সব অন্তর্দ্বান্দ্বিক বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাদের কারণ তলিয়ে দেখে উপন্যাসের শিল্পকলায় নতুন গুণ সঞ্চারিত করে তার ধারাকে অপ্রতিহত করে তোলার কথাটাও চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার। বিশ শতকে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে চলেছে, সেটাও বাস্তবের গুণগত পরিবর্তন। শিল্পকলাতে তথা উপন্যাসে এই গুণগত বিপ্লবের বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি ঘটবে। ঘটেছে ইতিমধ্যে। জনগণকে এবং জনগণের শিল্পীদের দেখতে হয়েছে রং যেন কোথাও ফিকে না হয়ে

যায়। পুষ্পস্তবক যেন কোথাও বাসি না হয়ে যায়। সমগ্র সত্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে উপন্যাস যেন শিল্পীর পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়ে দাঁড়ায়।

একথা মানতেই হবে যে, উপন্যাস যা গ্রহণ করে তাকে সব সময় আত্মস্থ করতে পারে না। এতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে উপন্যাসের শিল্পকলাগত স্থূলতা সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা অকারণ নয়।

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্গার করেছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড। ..... কারখানা ঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভাল লাগুক মন্দ লাগুক আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারছে না। এই অপ্রাণ পদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোণঠাসা করে। উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।...পশ্চিম মহাদেশে এই কায়াবহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত হয়ে।'

'গোরা' উপন্যাসের যিনি লেখক, বাস্তবের বিস্তার এবং চিন্তা-চর্চা যাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের উপজীব্য, তিনি উপন্যাস সম্বন্ধে কেন সংশয় পোষণ করলেন তা আমাদের সাবধানে পরীক্ষা করে দেখতে হবে নিশ্চয়।

কবিতা ভাষা মাতৃভাষা

কবি আর দার্শনিকের মধ্যে সত্যসম্পর্কিত পার্থক্য সম্ভবত এখানে যে, কবির সত্য বাক্‌সজ্জার মধ্য থেকেই উৎসারিত হয় এবং তাকে কথা থেকে কোনকালেই ছাড়িয়ে নেবার কথা উঠতে পারে না; অপর দিকে দার্শনিক তত্ত্ব যতই দূরধিগম্য পরিভাষা তৈরি করে জিলিপির প্যাঁচ কিংবা কুলকুণ্ডলিনীর জটে ঘুরপাক খাক না কেন, দার্শনিকের প্রবণতা থাকে কথাকে ছাড়িয়ে নিরালম্ব সত্যে উপনীত হবার দিকে। কবির কথা পল্লবিত বৃক্ষের মতো আকাশ ভেদ করা সত্য হয়ে উঠতে চায়। ভীষণদর্শন কল্লোলিত শব্দসমুদ্রের মধ্যেও দার্শনিক তাঁর সত্যকে একটি কুটোর মতো আলগা করে তুলে ধরতে চান। অপরদিকে কবিতার সত্য বিরহিনীর নয়নকোণে কয়েক ফোঁটা অশ্রুর মত সহজ কথাকেও আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

ফারসি দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে দর্শনের তরফ থেকে এবং ইটালির কবি কাসিমাদো কিংবা বাংলার জীবনানন্দ দাশ কবিতার তরফ থেকে যথাক্রমে ভাষাকে ছাড়িয়ে যাবার এবং ভাষাকে নিয়ে চলার দুই পৃথক প্রবণতাকে খোলাখুলিভাবে সামনে এনেছেন। দর্শনের সত্য আর কবিতার সত্য যদি একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়, তবু কবিতার সত্যটিকে রাখতে হয় তার ভাষার অবয়বে।

এ কথাটাকে দেশ দেশান্তরের কবি এবং কাব্যরসিকরা নানাভাবে সামনে রেখেছেন এবং আনছেন। কবিতার নিরীক্ষার এই প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সহজ। কবিতা আর ভাষা অবিচ্ছেদ্য।

কবির অভিজ্ঞতা কিংবা নিরীক্ষাতে আরও একটি সত্য বেরিয়ে এসেছে। সেটি এই যে, কবিতার ভাষা মূলত মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষারই অপর নাম সংশ্লিষ্ট কবির দেশ বা অঞ্চলের লোকভাযা। এই সত্য শুধু হাজার বছরের চলে আসা লোক গীতিতেই প্রযোজ্য নয়, এ সত্য আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কবিতা, ভাষা এবং মাতৃভাষার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে নিম্নোক্ত বক্তব্য মারফত সুস্পষ্ট করে তোলা যেতে পারে।

২

প্রথমে সাধারণভাবে ভাষার সঙ্গে কবিতার নিগূঢ় সম্পর্কের কথাটাই বলা যাক বিভিন্ন ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে।

(ক) ফারসি কবি থিওফিল গতিয়েরের মৃত্যুর পরে ইংরেজ কবি সুইনবার্ন লিখেছেন, 'তোমার জীবন্ত মুখের সুরধ্বনি বেঁচে রইল।' (The music of thy living mouth lives)। সুইনবার্ন কল্লোলিত-ভাষী কবি নামে খ্যাত। তিনি সতীর্থ ফারসি কবির কবিতাকে মৃত্যুহীন মুখের ভাষা হিসাবেই দেখেছেন।

(খ) ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে লিখেছেন : 'কবিতার কথা হচ্ছে শব্দ ব্রহ্ম; কথা হয়েছে কায়া।' (The poetic word is the Logoes, the word made flesh.) কডওয়েলের এই শব্দ-ব্রহ্ম কিন্তু অপার্থিব কিংবা অমানবিক কিছুই নয়। এই শব্দ-ব্রহ্ম ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত মানুষের জীবন যাপনের বাঙময় রূপ। 'মায়া ও বাস্তব গ্রন্থের আরেকটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: কবিতা ব্যক্তিসত্তা এবং বহির্বাস্তবের উপাদানসমূহের গতিশীল সম্পর্ককে বিস্তারিত ও বস্তুনিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করে। এই সম্পর্ক শব্দপ্রতীকে রূপান্তরিত হয়।' কডওয়েল কখনও কখনও আরও সোজাসুজি ভাবে কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কবিতা হচ্ছে শব্দ-সমাবেশ।'

(গ) রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও কবিতার নিগূঢ় সম্পর্কটিকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন নানাভাবে। প্রথমে তাঁর দুটি কবিতার শরণ নেওয়া যাক। 'জন্মদিনে' কবিতা-গ্রন্থের ২০ নং কবিতায় নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে শব্দই কবিতা:

'মনে মনে দেখিতেছি, সারাদিন ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।'

'শেষসপ্তক' কবিতা-গ্রন্থের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে বক্তব্যটি আরও বিস্তারিতভাবে সামনে এসেছে:

'মানুষের বোধের যখন বাঁধ মানে না
বহন করতে চায় সে কথাকে;
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে
নিয়মকে দেয় তার বাঁকা করে।'

এই কাব্যিক বক্তব্যকে যদি হেঁয়ালি বলে ঠেকে, তবে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের শরণ নেওয়া যেতে পারে। এখানে ক্রিস্টফার কডওয়েলের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আশ্চর্য মিল।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ভাষার প্রাথমিক মৌলিক সত্তাকে নির্ধারিত করেছেন এইভাবে: 'সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে প্রাণগত মনোগত মিলনের আদান প্রদানের উপায় স্বরূপ মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তাঁর ভাষা।' এর পরেই আরও একটা সিদ্ধান্তে এগিয়েছেন তিনি, 'ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়াবেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষের বুদ্ধি-সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে।'

কাব্যের চূড়ান্ত পুষ্পিত হওয়ার মূলাধার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছেন সামাজিক ভাষারূপী কাব্যকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতাকে যুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে আদিম নরনারী থেকে শুরু করে আধুনিক মানুষের আধুনিকতম মানুষের আকাঙ্ক্ষা-ভিত্তিক ভাষা-বিকাশের সঙ্গে। যেমন:

'আদিম কালের মানুষ তার ভাষাকে ছন্দের তাল লাগিয়ে নিরর্থক নাচাতে কুণ্ঠিত হয়নি। নাচের নেশা আছে তার রক্তে। বুদ্ধি যখন তার চেতনায় আধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে, তখনি সে নেশা কাটিয়ে উঠে জেগেছে শব্দের সঙ্গে একান্ত যোগ। আদিম মানুষ যন্ত্র বানিয়েছে, সে যন্ত্রের সঙ্গে অর্থের শাসন নেই অথবা আছে সামান্য। তার মন ছন্দে দোলায়িত ধ্বনির রহস্যে ছিল অভিভূত। তার মনে ধ্বনির এই যে সম্মোহন প্রভাব দেবতার উপরে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও তার ক্রিয়া সে কল্পনা করত।

'এই যে ধ্বনিতে অর্থে মিলে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সেটা সকল যুগের কবিতার মধ্য দিয়েই কম-বেশি প্রকাশমান; তাই অর্থের প্রবলতা বেড়ে উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে।

'সাহিত্যের মধ্যে কারুকাজ, কাব্যে যার প্রাধান্য, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দের সাজাই বাছাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষার শব্দ জমে যায় বিস্তর। তার মধ্য থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক ফরমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।

'শব্দ বাছাই ভাব বাছাইয়ের শিল্পকাজ চলেছে পৃথিবীর সাহিত্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে চলেছে ধ্বনির কাজ। সেটা গদ্যে চলেছে অলক্ষ্যে, পদ্যে চলেছে প্রত্যক্ষে।' (বাঙলা ভাষা পরিচয়)

(ঘ) বিংশ শতাব্দীর দুর্বোধ্যতম এবং মননধর্মী কবিতার ধারার অন্যতম পুরোধা টি. এস. এলিয়ট এবং তাঁর অনুগামীরা ভাষা প্রয়োগের দিক দিয়ে চরমপন্থী বলে আখ্যায়িত হতে পারেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, কবিতার পুরো অর্থটা নাই-বা জাহির হল, তাতে এসে যায় না কিছুই। কাব্যের আস্বাদ নিতে হবে শব্দ ও পংক্তিগুলিকে নিংড়ে নিংড়ে। বারবার পড়ে যেতে হবে; ছন্দোবদ্ধ শব্দ আর পদ মনের মধ্যে কোমলে কঠোরে বাজাতে থাকবে, অনুরণিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে; কবির বক্তব্য যতটুকু ধরা দেয়, তা-ই সই।

(ঙ) জাঁ পল সার্ত্রে অবশ্য সাহিত্যে টি. এস. এলিয়টের বিপরীতপন্থী। তবে কবিতাতে ভাষার স্থান সম্পর্কে যে অভিমত দিয়ে বসেছেন, তাতে প্রকারান্তরে টি. এস. এলিয়টকে সমর্থনই করা হয়েছে। সার্ত্রে বলেছেন, কবিরা হচ্ছেন সেই লোক যাঁরা বিষয়বস্তুকে দেখাবার জন্যে ভাষাকে খাটিয়ে নিতে চান না গদ্য লেখকদের মত। এই প্রসঙ্গেই তিনি ফারসি কবি ভ্যালেরির উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'যখন সূর্যের সামনে চশমার কাচের মত আমাদের চোখে ভাষার প্রকাশ ঘটে, তখন তা হয় গদ্য।' সার্ত্রের মতে কবিতা ঘটায় এর বিপরীত ব্যাপারটাকে; কবিতাতে বিষয়বস্তু হয় গৌণ, ভাষাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য।

(চ) টি. এস. এলিয়টের সঙ্গে কোনরকম মিল নেই এরকম একজন কবির কথা এখানে আনা যেতে পারে। ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপ্লবী সমাজবাদী ভাবধারার প্রথম প্রধান অকপট প্রচারবাদী কবি। তাঁকে ভবিষ্যৎবাদী কবিদেরও অগ্রপথিক বলে মনে করা হয়। মেঘলোকে উধাও তাঁর কবিতার তরুশীর্ষ। কবিতার শব্দ যে কবিতার মর্মভূমিতেই অবস্থান করে, এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সজাগ।। এই কারণেই তাঁর একটি কবিতায় কবি ইয়েসেনিনের কবিতার প্রশস্তি পাঠ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: 'কথা হচ্ছে প্রধান সেনাপতি।' এই বক্তব্য আরও বিস্তারিতভাবে বেরিয়ে এসেছে 'তহশীলদারের সঙ্গে আলাপ' কবিতায়:

'কবিতাকে আরও বলতে পারো
রেডিয়াম ধাতুর নিষ্কাসন।
বহু বছরের মেহনতে
কয়েক রতি-মাত্র নিকষিত,
একটা মাত্র শব্দের প্রয়োজনের খাতিরে
হাজার হাজার টন শব্দের ধাতব চাং ভাঙ্গতে
ছাঁকতে হয় আমাকে,
ছেঁকে বার করে আনতে হয় সেই প্রয়োজনীয় শব্দটিকে।'

(ছ) ফ্রাঁসের আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃত লুই আরাগঁ তাঁর বক্তব্যকে খুব সাধারণভাবে বুঝিয়ে বলেছেন: 'কবিতা হচ্ছে ভাষা, কারণ একজন কবির কাছে প্রথমে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করার চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কিছু নেই। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর

কালে পল এলুয়ার এ বিষয়ে যত গভীরভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, এমন আর কেউ হননি।'

(জ) ফারসি কবি পল এলুয়ারের কবিতা-সঞ্চয়নের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ক্লড রয় লিখেছেন: কবিতা হচ্ছে কথা দিয়ে গড়া একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র; এর উদ্ভাবন হয়েছে মানুষের সত্তাকে কাঁপিয়ে তুলবার জন্যে; কবিতা হচ্ছে কায়া রূপান্তরের ব্যবস্থামাত্র।'

(ঝ) রুশ (সোভিয়েট) কবি বোরিস পাস্তেরনাকের 'ডা. জিভাগো' উপন্যাসের নায়ক শেষের দিকে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়। ডা. জিভাগোর কবিতা সম্পর্কে একটি বিশেষ নিরীক্ষাতে পারেস্তরনাকের কাব্যিক চিন্তাও প্রকাশ পেয়েছে। বক্তব্যটি নিরূপ: 'দুতিনটি অনুচ্ছেদ লিখে ফেলে কয়েকটি রূপকল্পে নিজেই অভিভূত হবার পরে সে দেখতে পেল তার লেখাই তাকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। সে সেই বস্তুকে অনুভব করল যাকে প্রেরণা বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের অনুভবের মুহূর্তে শৈল্পিক সৃষ্টির নির্দেশক শক্তিগুলির পরিপক্ব সম্পর্কটিতেও যেন ওলটপালট ঘটে যায়। এসময়ে শিল্পীর বক্তব্যের প্রধান বিষয়টি আর কবি-মানস থাকে না; প্রধান বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় সেই ভাষা, যার মধ্য দিয়ে সে তার মানসিক অবস্থাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। ভাষা যে সৌন্দর্য আর ইঙ্গিতের আধার, সে নিজেই মানুষের পক্ষ হয়ে ভাবতে এবং কথা বলতে শুরু করে দেয়। তার সমগ্র সত্তাটাই পরিণত হয়ে যায় সুরে। এই সুর ঝঙ্কারের সুর নয়। এই সুর অন্তরের দাহের আবেগের প্রাবল্য এবং শক্তির সুর। এর পরে, বিরাট প্রবাহিনী নদীর স্রোতধারা যেমন পাথরকে ঘষে ঘষে নিটোল করে তোলে কিংবা যন্ত্রের চাকাকে দেয় ঘুরিয়ে, তেমনিভাবে বাক্য-প্রবাহ তার চলার পথে তার নিজস্ব কানুন অনুসারে ছন্দ আর মাত্রা তৈরি করে নিয়ে চলে ... ইত্যাদি।'

৩

কবিতা আর ভাষা যে কীভাবে অবিচ্ছেদ্য, উপরোক্ত মন্তব্য কিংবা সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগুলি থেকে সে কথা পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে। অতঃপর কবিতার ভাষা যে মাতৃভাষা, অথবা লোকভাষা বা গণভাষা সে কথাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। এখানেও কয়েকটি মন্তব্য কিংবা সংক্ষিপ্ত ভাষ্য দাখিল করা যেতে পারে। এদের একটির পর একটি সাজিয়ে পেশ করা যাক। যথা:

(ক) কাব্যে মাতৃভাষার অনিবার্যতার প্রমাণ হিসাবে প্রথমেই সামনে আনা যেতে পারে জার্মেনির কবি এবং নাট্যকার গ্যেটের একটি মন্তব্য। গত শতাব্দীতে গ্যেটে তাঁর ফাউস্ট নাটকের প্রথম খণ্ডে নায়কের মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছিলেন, সেটি তাঁরই বক্তব্য হিসাবে এখানে বিশেষ ভাবে উত্থাপন-যোগ্য। নাটকের নায়ক বিজ্ঞানী ফাউস্টের বিশ্বগ্রাসী জ্ঞান-ক্ষুধার মধ্যে জার্মানভাষী কবিহৃদয়ের সরোদের তার অতি সুক্ষ্মভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কারণেই ফাউস্ট বলেছে: 'আমার প্রিয় হয়ে উঠেছে প্রাণের সেই কুয়োগুলো, যেগুলির বারি-নির্ঝরকে খুঁজে ফিরছে আমার আত্মা। এই মুহূর্তে মন আমার পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে আত্মনিয়োগ-ব্যাকুলতায়। ইচ্ছা বুঝে

নিতে চাইছে পবিত্র রহস্যময় শাস্ত্রলিপিকাকে সহজ সততায়। জন্মভূমির প্রিয় ভাষাতে তর্জমা করতে চাই এই সত্যকে।' বিশ্বগ্রাসী সত্য এখানে কবির মাতৃভাষার শরণার্থী।

(খ) এই ধরনের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার পতনের চিহ্নগুলি যখন বর্তমান শতাব্দীতে তার সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে, তখন 'আমরা সব ফাঁপা মানুষ' কবিতাটি লিখে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেই এই পতনকে যে কবি অবধারিত বলে ইংরেজি কাব্যে ইশারা দিয়েছিলেন, সেই টি. এস. এলিয়ট বাকসজ্জার দিক থেকে আন্তর্জাতিকতার নিরীক্ষাকার বলেই সাধারণভাবে পরিচিত। তাঁর বাকসজ্জায় মাতৃভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগে ইচ্ছাকৃত এবং কৃত্রিম প্রয়াস রয়েছে বলে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আধুনিক কাব্যের কালা পাহাড় এই টি. এস. এলিয়ট কবিতার মাতৃভাষাগত মূল মর্মভূমি সম্বন্ধে যে কত সজাগ, সে কথা তাঁর 'কবিতার সুর' নামক নিবন্ধটি পড়লে বুঝতে পারা যায়। ১৯৪২ সালে লেখা এই নিবন্ধটিতে টি. এস. এলিয়ট এদিকে যেমন দেখিয়েছেন যে, কবিতার ভাষা পরিবর্তন-সাপেক্ষে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে রেখেছেন যে, লৌকিক ভাষার সঙ্গে এই ব্যতিক্রম সংযোগহীন হতে পারে না। ফারসি কবি ষ্টীফেন মালার্মের অতি-ব্যতিক্রম-ভাষী দুর্বোধ্যতার ব্যাখ্যা দিয়ে টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, 'ফারসিরা কখনও কখনও বলে থাকে যে, এ কবিতা বিদেশিরাই বুঝবে।' এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা: সমসাময়িক কবিতা আজ কোন পর্যায়ে এসেছে সেটা বিচার করে দেখার ভার আমি আপনাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে আমার ধারণা, আপনারা এ বিষয়ে একমত হবেন যে, যদি গত কুড়ি বছরের কবিতার কাজের শ্রেণী বিচার নিরর্থক না হয়ে থাকে, তবে আমরা দেখব, এর বিশেষ যুগটি হচ্ছে একটি সঠিক লৌকিক বাকরীতিকে খুঁজে বার করার যুগ।'

এই লৌকিকভাষা কি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু?

(গ) ইংরেজি কবিতার অমর রূপকার জন কীটসের কবিতা পড়লে মনে হয়, প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য সুষমা আর সুমিতির একটা বিশেষ যুগের মধ্যে তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু মূলত গ্রীক। কিন্তু ভাষা? ভাষা একান্তভাবে ইংরেজি। অর্থাৎ কীটসের মাতৃভাষা। কবিতা আর মাতৃভাষার গভীর নিগূঢ় এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে অবহিত ছিলেন। এই কারণেই তিনি 'কবি' নামক কবিতায় এত সহজ সরলভাবে বলতে পেরেছেন, 'বাঘের গর্জ্জন' কবির কানে এসে লাগে মাতৃভাষার মত।

(ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বামপন্থী লেখক সিডনী ফিনকেলষ্টাইন তাঁর 'শিল্পকলা এবং সমাজ' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন, যুগে যুগে ও দেশে দেশে নতুন কবি ও কবিতাকে রসদ যুগিয়েছে জনগণ তাদের লৌকিক ভাষা মারফত। তিনি শেকস্‌পীয়রের নাটকেও এই লৌকিক রসদে তৈরি বলে প্রমাণিত করেছেন। শেকস্‌পীয়রের নাটক একই সঙ্গে কবিতা ও নাটক। ফিনকেলষ্টাইন আরও দেখিয়েছেন ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালির কবি আলিঘোরি দান্তে যুগান্তর এনেছিলেন লৌকিক ভাষা তথা আকাড়া মাতৃভাষাকে কবিতায় ব্যবহার করে। ফিনকেলষ্টাইন মন্তব্য করেছেন, 'দান্তে তাঁর উপাদানের খোঁজে সাধারণ লোকের দিকে

মুখ ফেরানোর ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি'কে ইটালির লোক ভাষায় ঢালাই করে। সেই সময়ে পণ্ডিতেরা ল্যাটিন ভাষাতেই লেখার কাজ চালাচ্ছিলেন।'

ফিনকেলষ্টাইনের এই সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল স্যাণ্ডবার্গ কিংবা ই. ই. কামিংস প্রমুখ কবিদের কাব্যিক প্রচেষ্টাগুলিরও মর্মদেশে পৌঁছাতে পারব। প্রতীক ধরে নয়, লোকভাষা তথা মাতৃভাষাকে সন্ধান সূত্র ধরেই আমরা এই দুই কবির এবং বিশেষ করে কামিংসের অপরিচিতির গণ্ডীকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি।

(ঙ) এবার আমাদের একেবারে ঘরে আসা যাক। কপোতাক্ষতটে যে কবির শৈশব উদ্‌যাপিত হয়েছিল, সেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতার কাননে কাননে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভাবাবেগের কবি, আদর্শের কবি, বীর-বীরাঙ্গনার কবি। তিনি ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন বাঙলা কবিতার প্রচলিত বৃত্তকে। তিনি এনেছিলেন নতুন ছন্দরীতি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কাব্যে তাঁর লক্ষ্য ছিল এক কথায় বিপ্লবাত্মক। এই কারণে, তিনি তাঁর 'কবি' নামক চতুর্দশপদীতে নিছক শব্দযোজনাকে বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কবি কি সে যে 'শব্দে শব্দে বিয়া দেয়?' কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ইংরেজি কবিতা রচনা করে তৃপ্তি পেলেন না এবং যখন নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগলেন, তখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বিপ্লবী ভাবকে কবিতায় রূপ দিতে হলে মাতৃভাষা ছাড়া গতি নেই। তারপর তিনি নামলেন মাতৃভাষার খনিতে। লিখলেন তাঁর অমর চতুর্দশপদী কবিতা 'বঙ্গভাষার প্রতি।'

(চ) মুহম্মদ ইকবালের কথাও এ প্রসঙ্গে আসতে পারে, যদি উর্দু কবিতার পরিবর্তমান বহমান ধারার বিচার করি। ইকবালের কাব্যজগতে দুই ভাগ, এক ভাগ ফারসি, এক ভাগ উর্দু। তবে কবি বার বার ফিরে এসেছেন তাঁর মাতৃভাষায়, এবং সেও আকাড়া উর্দুতে। উর্দু কবিতায় তিনি লোকভাষী। অন্যান্য অনেক কবির তুলনায় ইকবাল তাঁর উর্দু কবিতায় ফারসির ব্যবহার অনেক কম করেছেন। অর্থাৎ কথাটাকে হয়তো আরেকভাবে বলা যায় এবং সেটা এই যে, কবি যখন দর্শনের সত্যের দিকে ঝুঁকেছেন তখন তিনি ফারসি ভাষাকে নিখাদভাবে ব্যবহার করেছেন, আর যখন কবিতার সত্যের দিকে ঝুঁকেছেন তখন প্রায় নিখাদ মাতৃভাষার দিকে ঝুঁকেছেন। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তাঁর 'নক্‌শে ফরিয়াদী' গ্রন্থে ইকবালের প্রশস্তি হিসাবে রচিত কবিতায় বলেছেন, ইকবালের অবস্থান এত উঁচুতে যে জনগণের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু তাঁর গান জনগণের মধ্যে নেমে আসে নির্ঝরের মত। এই নির্ঝর সম্ভব হয়েছে কবি এবং তাঁর দেশের জনগণের মাতৃভাষার সংযোগের দরুন।

(ছ) উপরোক্ত প্রসঙ্গেই হয়তো ইরানের মহাকবি ফিরদৌসীর নাম করা যেতে পারে। তিনি কবিতায় মাতৃভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং মূলত তিনি নিখাদ মাতৃভাষাই ব্যবহার করেছেন। ফারসি ভাষার একটি ব্যাকরণে একটি অর্থব্যঞ্জক ইতিবৃত্ত আছে। এতে দেখা যায়, ফিরদৌসীর সমগ্র মহাকাব্যে একটি মাত্র আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; শব্দটি 'আহসান'। ফিরদৌসীকে যখন এর কারণ

জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি এর উত্তরে বলেন যে, ঐ শব্দটি তাঁর অজ্ঞাতে ভাবের আবেশের সময় তার কাব্যে নিজে থেকেই প্রবেশ করেছে।

(জ) রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে আমাদের সমসাময়িক জীবনে তাঁর সমগ্র সাধনা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি মাতৃভাষা তথা লোকভাষা তথা বাংলা ভাষাকে কাব্যের মূলধন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' কিংবা 'লোক সাহিত্য–গ্রাম সাহিত্য' নিবন্ধ গ্রন্থ পড়লেই বুঝতে পারা যায়, তিনি তাঁর কল্পনার অভ্রভেদী ডানার ঝাপটানি সত্ত্বেও কি করে মাটির মানুষের একান্ত কাছাকাছি থাকতে পেরেছিলেন। 'মুক্তধারা' নাটকের নায়ক অভিজিত ঝরনার তীরে শুয়ে তার কলধ্বনিতে মায়ের ভাষা শুনতে পেত, সেটা চূড়ান্ত সত্য, কবির জীবনের কাব্য সাধনার সারসত্তা।

৪

উপরোক্ত প্রতিপাদ্যকে একটি গণ্ডী বেঁধে দেওয়ার দৃষ্টিকোণ সঞ্জাত বলে মনে করলে অবশ্যই ভুল করা হবে। ব্যাপারটা আসলে বিপরীত। কবিতার অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তি যে লোকভাষা বা মাতৃভাষার সঙ্গে, একে যদি কূপমণ্ডূকতা মনে করি কিংবা কবিতাকে গণ্ডীবদ্ধ মনে করে বসি, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা মানব সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিবেশের যে প্রসার ও গভীরতা সাধিত হচ্ছে, তা থেকে আমরা মাতৃভাষা ও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও বিচ্ছিন্ন করে বসবো। কবি কোন অবস্থাতেই মাতৃভাষা ছাড়া কবিতা লিখতে পারবেন না, এ ধরনের অনড় ধারণা পোষণ করাও সত্যের অপলাপ করা হবে। ভিন্ন ভাষার সার্থক কবিতা সৃষ্টি হয়েছে কখনও কখনও। কিন্তু সেটা একান্তই ব্যতিক্রম। কবিতা ও মাতৃভাষাকে একত্রীভূত ভাবে দেখার যে তাগিদ সেটি হচ্ছে মানব সমাজের মুক্তি সংগ্রামের অদম্য বিকাশের তাগিদ। মাতৃভাষা কবিতার সত্যের ব্যাপ্তি এবং গভীরতারই উপাদান জনগণের সচলতা এবং বিপ্লবী পদক্ষেপের প্রাণশক্তি। মাতৃভাষার অপহ্নবে কবিতার অপহ্নব। মাতৃভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য। মাতৃভাষার মুক্তি জনগণের মুক্তি। সুতরাং কবিতার এবং সত্যের মুক্তি। বিশ শতকের বিশ্বব্যাপি লোকমুক্তি সংগ্রামে এবং সামাজিক বিপ্লবে এই মুক্তধারা বিশেষভাবে কাজ করে আসছে। মাতৃভাষা ও কবিতা অবিচ্ছিন্ন থাকলে তারা সমাজবিপ্লবের অন্যসব উপাদানকে নিজেদের সঙ্গে আনায়াসে শামিল করে এগিয়ে চলতে পারে।

এইভাবেই মাতৃভাষা কবিতার প্রাণ এবং কবিতার সত্য মাতৃভাষাতে সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত একটি সদাউপচীয়মান মুক্তধারা। এই মুক্তধারাকে বাধাহীন রাখা জনগণ এবং কবিদের সংগ্রামী দায়িত্ব।

অব্যাহত কবিতার জন্য

'গলায় গলায় সেই
সুরভাঁজা যার অন্ত নেই–'
–পল এলুয়ার

আমরা একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। ময়মনসিংহ গীতিকা কিংবা অতি সাম্প্রতিক কবিতা আমাদের দুঃখ, দারিদ্র্য, পশ্চাদপদতা, বিড়ম্বনা, ক্ষুদ্রতা ও অপঘাতে আশঙ্কায় আকীর্ণ হলেও নৈরাশ্যবাদ এদের খাঁজে খাঁজে আসর জমিয়ে বসতে পারে নি। এমন কি মাঝে মাঝে চূড়ান্ত নৈরাশ্যের কালো যবনিকাও একটা সংগ্রামী তত্ত্ব হয়ে উঠতে পারেনি। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলাকে আমরা মুছে ফেলতে পারি নি আমাদের মন থেকে শত চেষ্টা করেও, শত ভেঙে পড়লেও। স্বামী লখিন্দরের মৃত্যুকে চূড়ান্ত বাস্তব বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল শক্তিরূপা বেহুলা। সে উপাখ্যান বাঙলা কাব্যের মর্মে মর্মে অনুরণিত। গ্রীক সুর শিল্পী অর্ফিয়াস যে তার দয়িতাকে রেখে এসেছিল যমরাজের বিবরে, সে উপাখ্যান আমাদের মনে ধরে নি কখনো।

সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্যের ভাগ্য ভাল যে, দুটো বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত দণ্ড ও নখররাজি ত্রাসিত ও বিমূঢ় করতে পারে নি আমাদের পুরোধা শিল্পীদের। শান্তির কবি রবীন্দ্রনাথ–সুমিত, প্রশান্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ যেমন মৃত্যুকে গৌণ প্রতিপন্ন করেছেন বারবার, ঠিক তেমনিভাবে সংঘাতের কবি কাজী নজরুল ইসলাম–অমিত, অস্থির, চঞ্চল কাজী নজরুল ইসলামও জীবনের পথ রোধকারী মৃত্যুর প্রস্তর স্তূপে বারবার আঘাত করেছেন জীবনের নির্ঝরকে মুক্ত করে সে মুক্তধারায় জীবনের বর্ণবিভাবে প্রতিফলিত করতে। আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ফ্রান্সের আলবেয়ার কামুর মত মৃত্যুর দিকে মুখ রাখেন নি। নজরুলের মৃত্যুক্ষুধার অন্তর্নিহিত সুরও হচ্ছে জীবনের পক্ষে বিদ্রোহ।

মৃত্যুতে অবরুদ্ধ আলবেয়ার কামুর বহু আলোচিত উপন্যাস ও নাটকের নৈরাশ্যজনক প্রতিপাদ্যের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। যদিও শেষ পর্যন্ত স্মৃতিভ্রষ্টতায় আক্রান্ত চির অশান্ত গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম এবং বেপরোয়া মোটর চালাতে গিয়ে অপঘাতে মৃত উচ্ছল আলবেয়ার কামুর শিল্পী-জীবনের ধারা প্রায় একইভাবে খণ্ডিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে, তবু এরা জীবন ও মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার মুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম ও আলবেয়ার কামু উভয়েই নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের অভয় বাণীর পাশে আলবেয়ার কামুর লেখার মূল বক্তব্যের মৃত্যুলিপ্ততা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। জীবনের সার্থকতা যে ধ্বংস নয়–সৃষ্টিতে প্রসারিত, বাঙলা সাহিত্যের সে প্রতীতি দুটো বিশ্বযুদ্ধের সর্বাত্মক হত্যাযজ্ঞেও চাপা পড়ে নি। সহস্র সহস্র বছরে গড়ে তোলা মানবিক মূল্যসমূহকে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কটাহ থেকে উদ্ধার করার সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েও এবং স্বদেশের মুক্তির ও যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নব নব মানবিক মূল্য-সৃষ্টির সুযোগক্ষেত্র পেয়েও কামু এবং তাঁর বিদ্রোহী অনুরাগীরা তাঁদের 'কবরস্থানী' সাহিত্য-দৃষ্টি দ্বারা, তাঁদের মৃত্যুমুখিতা দ্বারা ফারসি সাহিত্যে বিপর্যয়ের বিস্ফোরক সম্পৃক্ত করে গিয়েছেন; বাঙলা সাহিত্য সেরকম কোন পরিস্থিতিতে পতিত হয় নি। আমাদের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামকে ধন্যবাদ। আমাদের কন্যা বেহুলার জন্য আশিস। আমরা আত্মস্থ। আমরা আশাবাদী। এ সত্য জ্বলন্ত। পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃত্যুতে আমরা বিদ্রোহ করিনি, একথা মর্মান্তিকভাবে সত্য, কিন্তু জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারাই নি, এটাও মনে রাখার মত।

২

কিন্তু এ কি সত্য নয় যে, এমন অতুলন আশাবাদ নিয়েও বাঙলা সাহিত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং পরে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ঠিক সে রকম বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়ে আসতে পারেনি, যে রকম ফারসি সাহিত্য করেছে? নৈরাশ্য ও নেতিবাদের পক্ষীয় শিল্পী সাহিত্যিকরা ফারসি সাহিত্যকে বিপন্ন করলেও বিপরীত দিক থেকে ফারসি সাহিত্যের আশাবাদীরা অবিশ্রান্তভাবে সক্রিয় রয়েছেন এবং জীবনবাদী শিল্পীরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা উন্মোচিত করেছে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎসকে। এগিয়ে চলা ব্যতিরেকে সাহিত্য-শিল্পকলা তার সঞ্জীবক ভূমিকা পালন করতে পারে কি?

আমাদের গত এক যুগের ব্যাহত মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে আমরা কি মাঝে মাঝে আত্মপ্রতারণাও করে বসি না? এই মুহূর্তগুলিকে অনিবার্য বলে মনে করি না?

ফারসি সাহিত্য এদিক দিয়ে ভাগ্যবান। ভাগ্যবান এজন্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাড়বানলে এবং অন্তর্বর্তীকালীন যুদ্ধ-প্রস্তুতির চাপেও পল এলুয়ার এবং লুই আরাগঁর মতে কবিদের লেখার অবিশ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমান্বয়ে উত্তরিত হয়েছে অবিস্মরণীয় সৃষ্টিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসান হবার পরে পল এলুয়ার যে 'অব্যাহত কবিতা' (Uninterrupted poetry) লিখেছেন, তার মূল যেমন প্রোথিত রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফারসি কবিতার নব রূপ, বস্তু ও ভাষার জন্য সন্ধান-সাধনায়, তেমনি এর ডালপালা সন্ধান করেছে নব নব মুক্তিসূর্যের। ফারসি সাহিত্য ও কবিতার প্রাণোচ্ছলতা তাই মৃত্যুবাদের কাছে পরাভব স্বীকার করেনি। 'অব্যাহত কবিতা' মানব হৃদয়ের এমন সব নিভৃত প্রাণকন্দরে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে যে, মৃত্যুবাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ফারসি ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে উৎসাহ পেলেও পল এলুয়ারকে বিশ্লিষ্ট করে দিতে পারেনি বিপ্লবী জনগণের মর্মমূল থেকে। দয়িতাকে সম্বোধন করে পল এলুয়ার তাঁর দীর্ঘ ও জটিলগঠন 'অব্যাহত কবিতা'র শেষ দুটি লাইনে লিখেছেন:
'আমরা দুজন বাঁচি জীবনের প্রতি অনুগত থাকার জন্যেই।'

অর্থাৎ বাংলা কবিতার মৃত্যুবাদ বা নৈরাশ্যবাদ মাথা গুঁজতে না পারলেও, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিভ্রষ্টতার পরে বেশ কিছু কাল ধরে যখন একটা বা একাধিক সুদৃঢ় নতুন পথ অঙ্কিত করার কাজ ব্যাহত হয়েছে,

যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের অজস্র পরীক্ষা নিরীক্ষার অভূতপূর্ব ব্যস্ততা প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে ঠিক তখনই ফারসি সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল আঁদ্রে জিদের শাণিত প্রতিভা আয়েশী নিষ্ক্রিয়তার খাপের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করলেও এবং চির অশান্ত জাঁ ক্রিস্তফ ও চির অপরাজিতা আনেৎ চরিত্রে স্রষ্টা সুরশিল্পী ঔপন্যাসিক রোঁমা রোলাঁর অন্তরীণ জীবন এবং দেহাবসান সত্ত্বেও, কিংবা মুক্তি সংগ্রামী আলবেয়ার কামু এবং তাঁর পন্থীদের মনের মধ্যে অন্ধকার ও মৃত্যুর কীটেরা বাসা বাঁধলেও ফ্রান্সের সাহিত্য শিল্পীদের কাজ ব্যাহত না হয়ে বরং নতুন নতুন পথে এগিয়ে এসেছে। ফ্রান্সের বাইরে একথার হয়তো পনেরো আনাই অপ্রকাশ থেকে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্স দেশি ও বিদেশি ফ্যাসিষ্ট-নাৎসী স্বৈরাচারীদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে আসার পরে হঠাৎ শীতের পর বসন্তের বনভূমির মত ফারসি সাহিত্য মঞ্জুরিত হয়েছে, এবং বিশ্বের সামনে উন্মোচিত করেছে ফারসি কবিতার সেই অব্যাহত গতিধারাকে যা হার মানেনি চূড়ান্ত বিরুদ্ধ আবেষ্টনীতেও। পুরানো তারকা লুই আরাগঁ এবং পল এলুয়ারের নতুন কবিতার দীপ্তি এবং ক্রুদ্ধ জাঁ পল সার্ত্রের নববাস্তবতাবাদী উপন্যাস ও নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো পর্দা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বাইরের মানুষকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। তার কারণ হল এই যে, এঁরা তিনজনই এঁদের সতীর্থ সাহিত্য-শিল্পীদের সঙ্গে মিলে জীবনের জয়গান করেছেন নিজ নিজ শিল্পাধারে। এঁরা গড়ে নিয়েছেন, দরকার হলে যন্ত্রণায় গলিয়ে নিয়েছেন, ভেঙ্গে নিয়েছেন সেই আঁধারগুলিকে– কথা বলার এবং ছবি আঁকার বিষয়বস্তুকে ঠিকমত ফারসি জনসাধারণের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ এবং জাঁ পল সাঁর্ত্রে যখন ফারসি ভাষার প্রাণশক্তিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করছেন, তখন বিশেষ করে পল এলুয়ারের সুহৃদ পিকাসো, যিনি যত না খুঁজে পেয়েছেন তার চেয়ে খুঁজেছেন বেশি (More a seeker than a finder), এবং তাঁর সেই সব মৃত্যুবিদারী ছবির নিরীক্ষাভূমি তৈরি করছেন, যেগুলি আজ জগৎকে চমৎকৃত করে দিচ্ছে তাদের অত্যাশ্চর্য প্রবাহিকা শক্তিতে। শুধু তাই নয়। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী সালভাদর ডালি মন্তব্য করেছেন যে, পিকাসো যে আবার নতুন সৃষ্টির পথ দেখিয়ে এরপরেও আবার জগৎকে চমকে দিতে পারেন, সে সম্ভাবনাও রয়েছে। এখানে আরও একটা কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পিকাসোর চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছে আধুনিক ফারসি কবিতার এবং কবিদের সাহচর্যে, এপলনেয়ার থেকে শুরু করে এলুয়ার কর্তৃক প্রভাবিত পরিবেশে। পিকাসোর ছবির বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক স্বীকৃতি ও জয় জয়াকারের মধ্য দিয়ে ফারসি অব্যাহত ধারাও পেয়েছে স্বীকৃতি।

১৯৪২ সালে পল এলুয়ার লিখেছেন:

আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত আশ্রয়স্থানগুলির উপরে,
আমার ভেঙ্গে পড়া আলোকস্তম্ভগুলির উপরে,
আমার ক্লান্তির প্রাচীরগুলির উপরে
আমি তোমার নাম লিখি স্বাধীনতা।

সত্যিই, অদম্য অব্যাহত ফারসি সাহিত্য। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে যখন লুই আরাগঁ এবং জাঁ পল সার্ত্রের মত প্রবীণদের পাশে এসে দাঁড়ালেন তরুণী

উপন্যাসিকা ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ, তখনও এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে সত্যিই অব্যাহত রয়েছে ফারসি সাহিত্য সৃষ্টি।

বাংলা কাব্যে যদি ফিরে আসি, তবে দেখব, মৃত্যুবাদকে আমরাই পরিহার করে এসেছি। কিন্তু আবার সেই প্রশ্নই মনে আসবে, আমরা কি অব্যাহত রাখতে পেরেছি আমাদের মৃত্যুজয়ী ধারাকে?

আমাদের যদি এ কথা মনে জেগে থাকে যে, পল এলুয়ার এবং তাঁর সতীর্থেরা অব্যাহত সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান পেয়েছিলেন হাতের কাছে তৈরি, তাহলেও ভুল করা হবে। নানা উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থেকে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য-শিল্পীদের জন্য দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন একদিন পল এলুয়ারও। পল এলুয়ার ফ্রাঁসের যে মনোবাস্তবতাবাদী (Surrealist) কবি গোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা বৈষম্যময় জগতের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আয়নার মত ভেঙ্গে চুরমার করেছিলেন কবিতার শিল্পকে। এলুয়ারও তাই করেছিলেন। কিন্তু পরে বৈষম্যময় জগৎটাকে নতুনভাবে গড়ে তুলবার জন্য শিল্পরূপকেও গড়ে তুলেছেন সুডৌল করে। এলুয়ার লিখেছেন অব্যাহত কবিতা এবং একে করে দিয়ে গিয়েছেন অব্যাহত সাহিত্যের শিল্পধারের প্রতিভূ।

এই শিল্পাধারে রয়েছে দুটি উপাদান যা সংগ্রহ করা আমাদেরও এই মুহূর্তের সাধ্যায়ত্ত। প্রথমটি হচ্ছে বিপ্লবী মানবতাবাদ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাতৃভাষা। আমরা কি এই দুটি উপাদানকেই চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে আসছি না?

আলো দিয়ে আলো জ্বালা

'তারা কোন যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল'–

'বাংলা ভাষা পরিচয়', রবীন্দ্রনাথ

১

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'বাহিরে বহুর সঙ্গে জড়িত' বলে আখ্যায়িত করেছেন নানাভাবে, শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্পশৈলীর আশ্রয় নিয়ে। এদের মধ্য থেকে একটা সাধারণ বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে। তাহল এই যে, বহুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গিয়ে কখনও শর্ত সামনে আনেননি। শিল্পীর সৃষ্টির অহঙ্কার ছিল তাঁর সকলের হয়ে। বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের সর্ববিভাগে প্রয়োগ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ-এর যে অভাবনীয় সৌকর্যসাধন করেছেন, সেজন্য কোন রকম কায়েমী স্বত্বের দাবী রেখে যাননি তিনি। ওপরে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া

হয়েছে, তাতেই প্রকাশ পেয়েছে, কেন এ ধরনের কোন দাবী করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয়নি। শিল্পীজীবনের প্রথমদিকে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে, মধ্যাহ্নে 'বলাকা' গ্রন্থে এবং শেষদিকে 'মহুয়া'তে চিরমানবের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক-যোজনার মধ্য দিয়ে মৃত্যুহীনতার যে অভীপ্সা ব্যক্ত রয়েছে, তা আত্মোৎসর্গের এক অভিনব অনুভূতিতে পূর্ণ। নিজের সম্বন্ধে তিনি কোন মোহ পোষণ করেন নি। তবে এ আশ্বাস তাঁর ছিল যে, তাঁর সাধনা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে না। কড়ি ও কোমলের 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' কবিতায় চিরজীবী হবার বাসনা হয়তো বা একটা প্রচণ্ড যুবাসুলভ ইচ্ছামাত্র। কিন্তু পরে এই নিছক ইচ্ছাতে সঞ্চারিত হয়েছে প্রতীতি। বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতায় 'রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে' কবিতায় বেঁচে থাকার প্রতীতি হয় তো কিছুটা প্রতীকী। মহুয়াতে তা নিগূঢ় বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহণ করেছে। মহুয়ার 'নববধূ' কবিতার প্রতীতি অনেক বেশি ঘরোয়া, আবার অনেক বেশি সর্বমানবীয় এবং এই জন্যই অনেক বেশি নিঃশর্ত। এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলেছেন, 'জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী, অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী'; তারপরেই বলেছেন, 'আলো দিয়ে জ্বেলে গেনু আলো।'

'বাহিরে বহুর সঙ্গে জড়িত' রবীন্দ্রনাথের এই যে শিল্পরূপ, রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্য এর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন কিন্তু অপরিহার্য শর্তস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের এই বহুজনমুখিতা, এই অতীতের শিল্পকার্যের ধারাবাহিকতার একটি তরঙ্গ হিসাবে নিজেকে দেখার ও দেখানোর প্রবণতা, এই ভবিষ্যতের অনামীদের শিল্পসৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়ে থেকে যাবার ব্যাপারে পরম নিশ্চিন্ততা-বোধকে অনুধাবন করতে না পারলে রবীন্দ্র-কাব্যের সত্য মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারে না। কেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরেও চিরবাসন্তী ফুল-মালার মতো আমাদের এই পৃথিবীটাকে রূপে-সৌরভে-সুরে ঘিরে রেখেছে, কী করে ঘিরে রাখতে পারলো, সে কথা 'বাংলা ভাষা পরিচয়,' 'কড়ি ও কোমল', 'বলাকা' ও 'মহুয়া'তেই শুধু নয়, আরও অজস্র লেখার কণায় কণায় উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এ পথে রবীন্দ্রকাব্যের মূল্যায়নে এগিয়ে এলে কবির অনেক উপেক্ষিত ও নিভৃত কাব্যকক্ষও কথা বলে উঠবে এবং সেকথায় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে জয় করার দৃঢ়তম প্রতীতির মর্মকে। এ মর্ম হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মৃত্যু নেই, কারণ, বহু মানবের মৃত্যু নেই।

এখানেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সৃষ্টির চিরজীবী হওয়ার রহস্য আরেকটা দিক তুলে ধরে। সে দিকটা বিশেষ করে রবীন্দ্রোত্তর আমাদের কালের। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের শিল্প-সৃষ্টির অমরতাকে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারি। এই অনুভবকে আমরা পাচ্ছি আমাদের জীবনের সাদামাটা অভিজ্ঞতা থেকেও। তবে শিল্পীর বক্তব্য সব সময়েই অনেক বেশি প্রখর নয় কি?

২

'রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে' উত্তরিত হবার, কিংবা আলো দিয়ে আলো জ্বালার মধ্য দিয়ে শিল্পীর অমর হবার তাগিদকে পটভূমি করেই নানাদিক দিয়ে আমাদের আত্ম পরিচয়কে সম্প্রসারিত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বহু মানবের প্রাণ প্রবাহে

সঞ্জীবিত থাকতেন বলেই অবক্ষয় বার বার তাঁর দেহমনকে গ্রাস করতে গিয়েও উগ্‌রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা' বলে আখ্যায়িত করেছেন জীবনের অসংখ্য সম্মুখগামী পর্যায়গুলিকে চিহ্নিত করার জন্য। তবে তাঁর জীবনের আলো-ছায়াকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিলেই বোধ হয় ক্ষয় ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁর মরদেহটার সংগ্রামের সত্য ইতিবৃত্তকে ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে। 'সন্ধ্যা' কাব্য থেকে 'খেয়া' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে জীবন, তা যেন একটা রংধনুকের মত আকাশের এক পার থেকে অন্য পারে নেমে গেছে। মনে হয়, এই বুঝি হয়ে গেল তাঁর কবি-জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু এর গায়ে লেগেই দ্বিতীয় আরেকটা রংধনু জেগে ওঠে। 'বলাকা' থেকে এই দ্বিতীয় রংধনুকের উত্থান শুরু, 'পরিশেষ' কাব্যে এর অবতরণ? এখানেও কি শেষ? তাও নয়। আবার 'নবজাতক' কাব্যে তৃতীয় আরেক রংধনুকের আকাশে ওঠা। আর শেষ? কোথাও কি শেষ?

জীবনের প্রতি শিল্পীর আনুগত্য কত তীব্র হলে বারবার এই উজ্জীবন সম্ভব? এ আনুগত্য নিশ্চয় আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় এক মহা বিস্ফোরক উপাদান। রবীন্দ্রনাথ একে সংহত রাখতে পেরেছিলেন তাঁর চেতনায়। তাই শত বিপর্যয়েও এর সক্রিয়তা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, মূর্ছিত পর্যন্ত হয়নি। শান্তির, মানবতার, স্বাধীনতার, ন্যায়ের পতাকা জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে কখনও খসে পড়েনি।

আমরা কি রবীন্দ্রনাথের লেখার নব মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের শিল্প ও জীবন-গত মূল্যকেও পুরোপুরি অনুধাবন করতে চেষ্টা করব না? আমরাও কি বারবার মৃত্যু ও ধ্বংসের ভ্রূকুটিকে অতিক্রম করে জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে উত্তরিত হব না?

ছবি ও কবিতার শাসন প্রশ্রয়

'কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না
তার কঠিন শাসন;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে
তর্জনী তোলে না'
১৯ নং কবিতা, শেষ সপ্তক,
—রবীন্দ্রনাথ

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন রং তুলির দিকে ঝুঁকেছিলেন, তখনকার স্বচ্ছন্দচিত্ততার প্রকাশ হিসেবেই শুধু উপরোক্ত উদ্ধৃতিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। শিল্পকলার বিভিন্ন বিভাগের মানদণ্ড তৈরি করার জন্য কোন ঋজু সংজ্ঞা হিসাবে উপরোক্ত পংক্তি কয়েকটিকে ব্যবহার করতে গেলে আমরা নিশ্চয় ভুল করে বসব। কারণ, রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা মুক্তি পেয়েছে কথার জগতেই, এর প্রমাণ তাঁর কবিতার অবাধ্য প্রবহমানতায়।

বস্তুত, কথার শাসন মানবার পাত্রই ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চের ভূমিকা দ্রষ্টব্য: যথা গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙ্গাই যথেষ্ট নয়; পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তা দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনতা ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্য রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং এই দিক লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।' শেষ সপ্তকের একটি কবিতাও দ্রষ্টব্য, যেখানে তিনি 'আবাঁধা বেনীর বাণীকে' উন্মোচিত করেছেন: যথা :

'আমার ফুল বাগানের ফুলগুলোকে

বাঁধব না আজ তোড়ায়।'

শেষ সপ্তকের প্রথম উদ্ধৃতিটি থেকে আমরা বড় জোর এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে, পরিণত জীবনের কবি-শিল্পীর এক প্রতিহত অসিহষ্ণু মুহূর্তে রংকেই সম্ভবত মনে হয়েছিল নতুনকে প্রকাশ করার যোগ্যতম উপাদান। তবে শিল্পী জানতেন, কথার আড়ষ্টতাকে এবারও কাটিয়ে তোলা যাবে ঠিক তেমনি করেই, যেমন কাটিয়ে তোলা গেছে বারংবার এর আগে। এজন্য আলোচ্য উদ্ধৃতিটি অর্ধেক সংজ্ঞা, অর্ধেক কৌতুক? অবশ্য একটা কথা বোধ হয় মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, শিল্পকলার উপাদানগুলিরও এমন সব সত্তা রয়েছে, যাদের নিগূঢ় পরিচয় শিল্পীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ কথা হোক, রং হোক—এদের বিন্যাস দাঁড়িয়ে থাকে এদের বস্তুসত্তার ওপর। কথা-ঘন আধুনিক কবিতা এবং রং-এর স্তূপরূপী আধুনিক ছবিতে কথা ও রং-এর এই বস্তুসত্তা উগ্রভাবে স্বীকৃত। আর এই স্বীকৃতিই তুলে দেয়নি কবি আর চিত্রীর আঙ্গুলে মুক্তির সূত্রকে?

এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ শেষ সপ্তকের অন্য আরেকটি কবিতাতে রূপের সত্তাকে দিয়েছেন স্বয়ং সম্প্রসারণতা, যেখানে অমিতার আনন্দ-সম্পদ ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা।

২

অর্থাৎ আমরা প্রাথমিকভাবে একথা বলতে পারি যে, শিল্পকলার মুক্ত ধারায় এর উপাদানগুলির সত্তাসমূহ শাসক না হলেও যথেচ্ছাচার মেনে চলে না। আবার স্বীকৃতি পেলে দেয় প্রশ্রয়। এভাবে দেখলে কবি বা চিত্রী এবং তাদের শিল্পসৃষ্টির অন্যতম উপাদান বাস্তব পরিবেশের সম্পর্কটিও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতে পারে নিশ্চয়। বাস্তব পরিবেশ যেহেতু কথা, রং এবং তুলির চেয়ে অনেক বেশি পরিসর-সম্পন্ন আর ভারী, সে-জন্যই হয়তো মুক্তিমনা শিল্পীর তরফ থেকে একটা বিশেষ সংকোচও স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে। অন্তত, বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দী যখন মানুষের মনের ক্ষেত্রকেও বাস্তব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে, অর্থাৎ যখন বর্তমান চিন্তাধারা মানুষের মন এবং পরিবেশের মাঝখানকার দেয়ালটাকে ভেঙ্গে দিয়ে মনোবাস্তবতা বা সুররিয়ালিজমের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে শিল্পকলার ক্ষেত্রেও, তখন এর প্রাথমিক জড়তায় শিল্পী স্বভাবতই তাড়িত বোধ করতে পারেন। বাস্তবের এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেকার সম্মুখগতিকে না দেখে যাঁরা এর তাড়নাটকেই বড় করে

দেখেন এবং মুক্তিকামী শিল্পীকে পরামর্শ দেন শিল্পীসত্তাকে বাঁচাবার জন্য নিছক কল্পনায় কিংবা আত্মকুণ্ডয়নে আশ্রয় গ্রহণ করতে, কিংবা কথা অথবা রং-এর রূপসত্তাকে বাস্তব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তারই মধ্যে শিল্পীসত্তাকে প্রসারিত করতে, তাঁরাও অযথা প্রভাব খাটিয়ে বসতে পারেন। আধুনিক কবিতা বা ছবিতে এই বিবিধ তাড়না প্রতিফলিত হয়ে আসছে। আধুনিক কবিতার অন্যরকম পথ প্রদর্শক টি. এস. এলিয়ট যখন বাস্তব পরিবেশকে স্বীকৃতি দেন ছোঁয়াচ বাঁচানোর মতো করে (দান্তের বাস্তববাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এখানে উল্লেখযোগ্য), তখনই উপরোক্ত প্রতিফলনের কথা বেশি করে মনে আসে।

তবু শিল্পকলার যে মুক্তধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, তাতে বাস্তবের অমিতার উপলখণ্ডসমূহকে শিল্পকলা-সত্তার সুমিতা বাস্তব জগতের নব-অভ্যুদয়মূলক তাড়নার মধ্যেই সুডৌল করে নিয়ে এসেছে বারবার। কিংবা উপলখণ্ডসমূহের তীক্ষ্ণধারের ওপর স্বাচ্ছন্দ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েই সুমিতা নিয়ে এসেছে অভিনব সুর। বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের উপলাহত ছন্দধারার এই অভিনবত্ব রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। এই ছন্দধারা আজ আরও সাবলিল হয়ে এসেছে। ঠিক এমনিভাবেই কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার কোমল-কঠোরের রূঢ় সমাবেশ পরবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থে কোমল হয়ে এসেছে।

নজরুল কাব্যপ্রবাহের জঙ্গমবিচার

নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার সন্তান আমরা পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনে আসছি, সাগরমুখী নদীরও হাজার বছরের মূল প্রবাহের খাত শেষ পর্যন্ত পঙ্কিল হয়ে যায়, নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে নদীর অমিয় ধারা, শাখা-প্রমাখায় ছড়িয়ে পড়ে সে, তারপর কোন একটি প্রশাখাই হয়ে দাঁড়ায় মূল প্রবাহ। আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার সাফল্যের ওয়ারিস হিসেবে ইদানীং আমরা এ শিক্ষাও পেতে শুরু করেছি যে, স্বভাবকে প্রভাবিত করা সম্ভব। নদীপ্রবাহের চঞ্চলা অমিয়ধারাকে এমন জায়গাতেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যেখানে নিজের থেকে সে যাবে না; পঙ্কিল খাতকেও নির্মলা-সলিলা করে তোলা যায়। আমাদের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা এখনও রয়ে গিয়েছে প্রধানত কেতাবী। সবেমাত্র হাতে খড়ি হচ্ছে এর প্রকল্পের প্রশিক্ষণে।

বাংলা কাব্যকেও কি আমরা সাগরমুখী প্রবাহ বলে বর্ণনা করিনি? বাংলা কাব্যের মধ্যে নজরুল কাব্য-প্রবাহও কি এই বর্ণনার আওতার মধ্যে পড়ে না? কিন্তু আমরা কি এদের একই দৃষ্টিতে দেখি? এদের কি আমরা আমাদের নদী-প্রবাহের স্বভাববিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করি? আমরা কি নতুন নতুন খাত থেকে নজরুল কাব্যের অমিয় ধারাকে আঁজলা করে তুলে নেই? কিংবা মরা গাঙ চেড়ে গহীন গাঙের খোঁজ করি? ছড়িয়ে দিতে চাই মূল প্রবাহকে নহরে নহরে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত লোকে লোকালয়ে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা দেখব, নজরুল কাব্যের প্রকৃতির মুখোমুখী হবার ব্যাপারে আমাদের বেশ কিছু দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার

প্রকৃতিকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতার প্রশ্নে ছাঁচে পটে আঁকা স্থির আলেখ্য হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত। নজরুল কাব্যকেও আমরা বহমান, বেগবান, বিকাশমান এবং এক কথায় আমাদের পরিবর্তমান জীবনের শিরায় শিরায় জীবন্ত প্রবাহরূপে আমদের জীবন যাপনে সময়মত পুরোপুরি গ্রহণ করিনি। সুতরাং মননেও সেই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটবে কি করে?

এ সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, বছর কয়েক ধরে আমরা যেন নতুন করেই আবিষ্কার করেছি, নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক পূর্ব বাংলার নদীপ্রবাহের স্বভাব বিশিষ্ট। আমরা এর জঙ্গম রূপকে আবিষ্কার করেছি। যদি সে ছবি হয়েও থাকে, তবে সে ছবি চলমান, ধাবমান, বহমান, চঞ্চল। ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠীর আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত গ্রন্থে নজরুল কাব্যের ওপর আলোচনাকে কৃপণতা বলে মনে করে নিয়ে অভিমান করে হোক, কিংবা সুফী জুলফিকার হায়দারের 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে নজরুল প্রতিভাকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ফ্রেমে আটকাবার যে চেষ্টা হয়েছে তাতে অসুখী হয়েই হোক, আমরা পূর্ব বাংলায় নজরুল কাব্য প্রবাহকে নতুন করে দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমরা দেখেছি, এ কাব্যে ছবির বিজুরী নয়। এ বিজুরী চারশো চল্লিশ ভোল্টের শক মারা জীয়ন্ত বিজুরী। অথবা এই কাব্যে যেমন মরা গাঙ আছে, তেমনি আছে গহীন গাঙ। এ কাব্য শুধু অতীত নয়, এ কাব্য বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কাব্যিক লাভাপ্রবাহ নয় যে, ছাই কিংবা পাথর হয়ে জমাট বেঁধে গেছে; নজরুল কাব্য এবং জল প্লাবনের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, কিন্তু সে প্লাবনও বাংলা কাব্য প্রবাহের চিরকালের সঞ্জীবনী ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে এবং আজও তার জঙ্গম বিশিষ্টতাকে অনুভব করা যায় শুধু ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতাতে নয়, ১৩৭৬ সালের কবিতার ধারাতেও। আমরা মাঝখানে বুঝতে দেরি করে ফেলেছি বলেই সম্ভবত আমাদের এই গ্রহণের মধ্যে রয়েছে ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা এবং কিছুটা বাড়াবাড়ি। এই ব্যস্ততা কিছুটা আকস্মিক বলেই আমাদের যুক্তিবাদী মন একে হিড়িক বলেও মনে করছে। অপরদিকে, সম্ভবত, এক হাজার বছরের সমগ্র বাংলা কাব্যের প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে নতুন পৃথিবী আর নতুন মানব সমাজের স্বপ্নদেখা জনগণমুখী আধুনিক কবিতার ধারায় মিশে-থাকা এবং মিশে-যাওয়া নজরুল কাব্যপ্রবণতার দুর্বার রেশ লক্ষ্য করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা কবি নজরুল ইসলামকে ফ্রেমের মধ্যে আটকে রাখার জন্য কিছুটা ঢংঢাং-এর আয়োজনও করেছে। যে কবি 'দারিদ্র্য' কবিতা লিখেছেন বুকের রক্ত নিংড়ে, তাঁর ব্যাখ্যাকার হিসেবে যখন তখন স্ফীতোদর কিংবা কঞ্জুষ শেঠেরা হাততালিও কুড়িয়েছে।

নজরুল কাব্য প্রবাহ সম্পর্কে পূর্ব বাংলায় এই যে প্রধানত দুই ভিন্নমুখী ব্যাখ্যার প্রাচুর্য, একে আর যাই বলা যাক আকস্মিক বলা যায় না। নজরুল কাব্যকে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত নদী-চেতনার মতোই যে শিল্পরূপ-চেতনায় উদ্ভাসিত করে দেখছি, তাতে রয়েছে প্রাণের তাগিদ, সাগরমুখীতার তাগিদ, ইতিহাসের অগ্রগতির তাগিদ। আর প্রাণ-সূর্যের সুকৃতি দুর্বার হয়ে দেখা দিয়েছে বলেই তো রাহুর বিকৃতি এসে ছায়া ফেলছে তাতে। নজরুল-কাব্যপ্রবাহকে অবলম্বন

করে যে বিচার বিশ্লেষণের প্রবল্য, যে সম্ভাষণের ঝোঁক, যে বিতর্কের অবতারণা, তারা তাই আমাদের কাছে সব সময়ই আদরণীয়। নজরুল কাব্য প্রসঙ্গ হচ্ছে জঙ্গম প্রসঙ্গ। এই সূত্রেই অনেক সদ্য-নতুন কথা গিঁট খোলা না-হতেই আরও কয়েকটা কথা নজরুল কাব্য প্রবাহ প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে।

২

প্রথমেই যে কথাটার হয়তো পুনরাবৃত্তিই করা দরকার, সেটা এই যে, নজরুল কাব্যের সামগ্রিকতাকে এবং বিশেষ করে ধারাবাহিক সামগ্রিকতাকে আমাদের চোখের সামনে কম্পাসের কাঁটার মত রাখা দরকার। বলতে গেলে মাত্র দশ বছরের মধ্যে নজরুল কাব্য রচনার লেখার কাজটা সম্পন্ন করেছিল এবং এই কারণে নজরুল-কাব্য অতিমাত্রায় ঘনীভূত হওয়ার কথা। কিন্তু এ-পর্যন্ত আমরা যাঁরা নজরুল কাব্যকে বহমান বলে মনে করে এসেছি , তাঁদের মধ্যেও দেখা যাবে, এ সম্পর্কে চেতনার অভাব। আমরা কোরাস থেকে আলাদা করেছি গজলকে; বিষের বাঁশীকে আলাদা করেছি দোলন চাঁপা থেকে, বিদ্রোহীর পাশে পূজারিণীকে মনে হয়েছে আমাদের চোখে বেমানান। যে যুগে নজরুল-কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল, আমরা তার সর্বোতমুখী শতদল-রূপকে বুঝতে পরাঙ্‌মুখ থেকেছি। সুতরাং যে যুগের জন্য নজরুল কবি প্রতিভা সম্ভাবনা, সে যুগের সবর্তোমুখীতাকে আমরা আজ কি করে বুঝবো? নজরুল হয়তো কোন কোন কবির মতো প্রেমকেই বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহকেই প্রেম বলে অভিহিত করেননি, কিন্তু নজরুল প্রেম ও বিদ্রোহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেননি। তাঁর গজল এবং কোরাস এক সূত্রেই গাঁথা। তাঁর উদ্দামতা থেকে শ্রান্তি, তাঁর অধৈর্য থেকে তাঁর প্রশান্তি, তাঁর প্রতিটি গান, প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ একটি গতিশীল অদৃশ্য তরল সূত্রে গ্রথিত। এই গতিশীল সূত্রকে কবি তুলে নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক কাল-তরঙ্গ থেকে এবং সমর্পণ করে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতের গর্ভে সমগ্র জীবনের মূলসূত্র হিসাবে।

আমরা কিন্তু সাধারণভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখেছি অতীতে; আজ আরও বেশি খণ্ড খণ্ড করে দেখছি। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কস্তুরী মৃগের মত একাগ্রতায় খুঁজেছি চম্পক কাননকে, ত্রিশোত্তর যুগে চাঁপা গাছকে অস্বীকার করে চেয়েছি চাঁপা ফুলকে। কোন চঞ্চলা বলিকা যেমন খোঁপায় চাঁপা ফুল গুঁজে মনে করে সে নিজেই চাঁপা গাছ, আমরাও করেছি তা-ই। আজো হয়তো সে-ভাবেই দেখতে চেষ্টা করছি এবং এই কারণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবীদার হয়েও হিসাব মেলাতে পারছি না। কামরা সৃষ্টি করে বসছি আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তৈরি চলন্ত রেলগাড়ীতেও। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ওটা হয়তো একটা 'রাতের রেলগাড়ি'। নিজেরাই বা কোথায় আছি, এবং নজরুল কাব্য প্রবাহকেই বা কতটুকু বুঝছি?

অপরদিকে যাঁরা নজরুল-কাব্যপ্রবাহকে ফ্রেমে বাঁধবার জন্য সচেষ্ট, তাঁরা নজরুলের কবিতা থেকে পুরাণকে বাদ দেওয়ার জন্য তাত্ত্বিক নিয়োগ করেছেন। এ-হচ্ছে ভূতকে দিয়ে কোলের শিশুকে গোসল করানোর গল্পের মত; ভূত যেমন শিশুর পেট চিরে নাড়িভূঁড়ি পর্যন্ত ধুয়ে সাফ করেছিল, এ তাত্ত্বিকরাও তাই করছেন, অর্থাৎ

নজরুল কাব্যকে পরিশুদ্ধ করতে গিয়ে তার প্রাণ হরণ করছেন। এঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান, নজরুল কাব্য থেকে পুরাণকে আলাদা করতে চান। এখানে কি করা উচিত, কি করা অনুচিতের প্রশ্ন বড় নয়; এখানে কি করা সম্ভব, তারই প্রশ্ন। এঁদের যদি বিচার-বিশ্লেষণের শিল-নোড়া হাতে থাকে, তাহলে এরা দস্যু না হলেও শিশুর মত ঘড়ি বেঁটে মসলা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। তত্ত্বগতভাবে এ চেষ্টা চলছেও। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতা থেকে পুরাণকে ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব কি? ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব কি 'নারী' থেকে? নজরুলকে যদি কেউ পৌরাণিক কবি আখ্যা দেয়, কিংবা যদি কেউ বলে যে বিদ্রোহী কবি পুরাণের আদর্শে প্রভাবিত, তবে তা যেমন সত্যের অপলাপ হবে, তেমনি পৌরাণিক উপমা বাদ দিয়ে নজরুল কাব্যে শুচিতা রক্ষা করতে যাওয়াও হবে তাঁর কবিতার স্বভাবের বিরোধিতা করা। পৌরানিক উপমা সমুদ্রে নীলিমার মত নজরুল কাব্যের সত্তায় মিশে আছে, যদিও কবির নতুন দুনিয়ার স্বপ্নে পৌরাণিক আমলের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য হয়েছে। সমুদ্রের নীল রং ছেঁকে বের করা যায় কি? সমুদ্র নীল নয় একথাও বলা যায় কি? যদিও আঁজলায় করে সাগরের পানি নিয়ে কোন নীলবসনা সুন্দরী তার কাপড় রাঙাতে পারবে না, তবু সমুদ্রের নীলিমার অস্তিত্বকে সে অস্বীকার করবে কি করে?

বক্তব্যটাকে আরও সোজাসুজি এনে বলা যায়, যাঁরা নজরুল কাব্য থেকে পৌরাণিক উপমা ছেঁটে ফেলার চেষ্টায় আছেন, এখনও তাঁরা সমুদ্র-সম সামগ্রিক নজরুল কাব্য পরিহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের চোখ নীল-ভীরু, দূর-ভীরু, তরঙ্গ-ভীরু। কিন্তু এই ভীরু চোখ নিয়ে তারা কি করে নজরুল কাব্যের পরিমাপ করবেন? এও যে অসম্ভব।

৩

কাজী নজরুল ইসলামের কবি-মন যেভাবে গড়ে উঠেছিল, সেসম্বন্ধে আজ কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। কৈশোরে নজরুল তাঁর বড়বড় চোখ মেলে যে জগৎটাকে দেখেছিলেন, তার ছবিগুলি হারিয়ে গিয়েছে। তবে প্রবীণরা স্মরণ করতে পারেন কিছুটা অস্পষ্টভাবে। কিশোর নজরুল একদিকে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকার সাঁওতালদের ঝুমুর নাচ দেখতেন, মাদলের আওয়াজ তাঁর রক্তে মিশে ছিল। আরেক দিকে নজরুলের আশেপাশে তখন যাত্রার পালাগান আর নাট্যাভিনয়ের হিড়িক চলেছে; আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিশোর কবি এই যাত্রাগানে, পুরাণের সঙ্গে নিশ্চয় এখানেই তার পরিচয়। পূর্ব বাংলাতে কবি কিশোরের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়েছিল পল্লী সংস্কৃতির দিকে। এইভাবে লালিত কবিমনের সঞ্চার উদঘাটিত হলো যৌবনের জ্বালার মধ্য দিয়ে। একদিকে নবযুগ কথা কইতে চাইল কবির সোচ্চার কণ্ঠের মধ্য দিয়ে; ঝটিকাক্ষুব্ধ সে যুগ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তস্নাত এবং রুশবিপ্লবের পদধ্বনিতে আন্দোলিত সে যুগ; পাক-ভারত উপ-মহাদেশের হাজার হাজার বছরের স্তরীভূত রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় ওলট-পালট আনা আলোড়নের সে যুগ; সেই যুগ নজরুলকে করলো মুখপাত্র। অন্যদিকে গ্রাম-বাংলার গীতি আর সুরের ধারা, বাংলার কাব্য, মাটির মানুষ, জনগণের সহজিয়া সাধনা নজরুলকে করলো তাদের নতুন চণ্ডীদাস। ডক্টর ভূপেন্দ্র

নাথ দত্ত যে তাঁর 'প্রগতি সাহিত্য' গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলামকে চণ্ডীদাস, পরে বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা কাব্যে দ্বিতীয় 'মানুষের কবি' বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন, তার সত্যতা যদি কোথাও যাঁচাই হওয়ার থাকে, তবে তা' এখানেই হওয়া উচিত। বাংলা কাব্যে মানবিকতাবাদী গীতিপ্রবণতার ঐতিহ্যবাহী হিসেবেই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি মাফিক নজরুলকে দ্বিতীয় চণ্ডীদাস বলা যেতে পারে। কিন্তু এটি ছিল তাঁর মানসিক প্রস্তুতি মাত্র, কিংবা মানসিক উপাদান বা উপকরণের সঞ্চয় মাত্র। নবযুগের তাগিদ এই উপাদানকে ব্যবহার করেছে 'যুগবাণীতে'। এ চণ্ডীদাস ভিন্ন চণ্ডীদাস। এ হচ্ছে বিশ্ব সমাজবাদী ঊষাকালের চারণ কবি; এ কবি ধূমকেতু আর ফণীমনসা, অগ্নিবীণা আর বিষের বাঁশীর কবি, এই কারণে যে, যে চিরবঞ্চিত সর্বহারাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী নজরুলের কাব্যে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল, তারা কল্লোল যুগের অন্যতম নিষ্ঠাবান গল্প লেখকের ভাষায় ছিল তথাকথিত 'রূপের বাহিরে'।

নজরুল-কাব্যপ্রবাহ উৎসারিত হয়েছে দুটি জঙ্গম উপাদানের রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্য দিয়ে। একটি ছিল তাঁর কিশোর কবিমনের সঞ্চয়, দ্বিতীয়টি যৌবনের জাগ্রত আত্মার অভিজ্ঞতা, চেতনা আর পারিপার্শ্বিক জগৎ আর মানুষের তাগিদঃ 'কথা কও, কথা কও, আমাদের হয়ে কথা কও।' এজন্য সেদিন নির্বাচিত হয়েছিলেন নির্ভয়চিত্ত নজরুল, অসংকোচ নজরুল, বেপরোয়া নজরুল, হটকারী নজরুল, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাবিমুখ নজরুল। নজরুল চরিত্রের দোষগুণ সবকিছু একত্রিত হয়ে সেদিন ইতিহাসের প্রয়োজনকে মিটিয়েছিল। যে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্য লিখে ভোরের বিহঙ্গ হিসাবে নবযুগের আগমনের কথা জানিয়েছিলেন, তিনিও নজরুলের তথাকথিত অমার্জিত কাব্যরীতি সত্ত্বেও তাঁকেই ডেকে বলেছিলেন, 'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।' আমরা যারা তখন বালক মাত্র, আমাদের কোটের পকেটে যে তখন কাজী নজরুল ইসলামের বই থাকতো, সেটা সম্ভব হয়েছিল নবযুগ তাঁকে নির্বাচিত করেছিল বলে। এই নবযুগের আত্মপ্রকাশটাকেই আমরা সেদিনকার কিশোর-বয়সীরা বড় করে দেখেছিলাম। সে কাব্যপ্রবাহের কি রং, তা নিয়ে চিন্তা করা তখনকার অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাংলা কাব্যের রীতির মধ্যে অভিনিবিষ্ট হওয়া, গজলের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় সেদিন ছিল গৌণ বিতর্কের বিষয়। রূপের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিলো প্রাণ।

কিন্তু যা সত্য, তা ছিল উভয়ত সত্য। অর্থাৎ জাগরণও সত্য, স্বপ্নও সত্য, প্রাণও সত্য, রূপও সত্য। যে কবি কিশোর বয়সে ঝুমুর নাচ আয়ত্ত করেছিলেন পরিবেশ থেকে, তিনিই 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যৌবনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আর রুশ-বিপ্লবের প্রেরণায়। তিনি কিন্তু ভুলতে পারেননি ঝুমুরকে। শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' নিয়ে যখন ছবি তৈরি হলো, তখন তার সুরকার নজরুলকে আমরা পেলাম এমনভাবে যে, যেন তিনি কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল পল্লীর কোন খেয়ালী বলিষ্ঠ সুরপাগল যুবক। কোন আঁচড়ই যেন লাগেনি মহানগরী কলকাতার সংস্পর্শে কণ্টকিত মনের। এখানে আমরা সম্মুখীন হয়েছি তাঁর কৈশোরের কবিমনের নিকষিত সঞ্চয়ের সঙ্গে। নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত কিংবা কীর্তনের উৎসও এখানে। নজরুল কাব্য-

প্রবাহে রাসায়নিকভাবে মিশ্রিত এই সঞ্চয়ের উপাদানগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন অবস্থায়। রাতে সমুদ্রে যেমন দেখা দেয় ফসফরাসের আগুন, তার চেয়েও বেশি তাগিদ এই আত্মপ্রকাশের; সম্ভবত কবির সৃজনাত্মক অস্থিরতার দরুন এরা সৃষ্টি করেছে এককেটা ছোট ছোট সময়বিভাগের। এদের কোনটাই হুজুগে নয়, একটা নতুন কিছুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা নয়। এরা এসেছে নজরুলের স্বভাবকবিত্ব থেকে, বহুকাল থেকে জারিত ও রসায়িত অভিজ্ঞতা থেকে।

৪

এই কারণেই নজরুল কাব্যকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। নজরুল কাব্যপ্রবাহকে ফ্রেমে আটকানো যায় না। তার কোন অধ্যায়কে কেটে আলাদা করে ফেলে দেওয়া যায় না, কোন কবিতাকে পরিশুদ্ধ করা যায় না। সে চেষ্টা যেদিক দিয়েই করা যাক, তা হবে অবাস্তব। যে কবিকে আমরা এই পরিশোধনের মধ্য দিয়ে পাবো, তিনি আর যেই হোন, নজরুল হবেন না।

গিরিফুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের ৮০তম জন্ম দিনে প্রশস্তি লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন:

> 'আনন্দ সুন্দর তব মধুর পরশে,
> অগ্নিগিরি গিরি মল্লিকার ফুলে ফুলে
> ছেয়ে গেছে'।

ধুমকেতুর কবির এই উক্তিতে তাঁর নিজের শিল্পীজীবনের পরিণত পর্যায়ের আত্মদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে নিশ্চয়। তবে একথা বলাই কি তাঁর পক্ষে সঙ্গত হতো না যে, গিরিমল্লিকার অগ্নিমালা গলায় নিয়েই নবোত্থিত আগ্নেয়গিরির মতো তাঁর উদ্ভবও হয়েছিল বাংলা কবিতায় এবং তাতে নব নব প্রাণের ও দৃষ্টির রং লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের লেখার সংস্পর্শে? কারণ, কোন বিশেষ ফুলের নামে যদি কবি তাঁর শুরুর লেখারই নাম রাখতেন, তাহলে সবচেয়ে যোগ্য নাম হতো গিরিমল্লিকা। সে নাম হতে পারতো রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার ভাষায় 'রডোডেনড্রন' কিংবা গিরিফুল।

কিন্তু এ কথার কি অর্থ এই যে, শুরুতে হোক বা শেষের দিকে হোক, বিদ্রোহী কবির কবিতা যতখানি বহির্বিশ্বের, ততখানি গৃহকোণের নয়? যতখানি জনতার, ততখানি ব্যক্তিগত নয়? যতখানি প্রকাশ্য,ততখানি স্বগত নয়?

অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দুর্গম গিরি কান্তার মরুর যাত্রীর সাথী? এই হচ্ছে কাব্যের বিশেষ পরিচয়? একান্তভাবেই নজরুল কাব্য গিরিফুল? সুন্দর কিন্তু রূঢ়? বর্ণিল কিন্তু একক নয়? কোনখানেই।

এধরনের কোন সিদ্ধান্তে যাওয়ার চেষ্টা সর্বজনীন সমর্থন হয়তো পেতে নাও পারে। গিরিমল্লিকা ছাড়াও এমন ফুল খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে নজরুল

কাব্যমালঞ্চে, যা একান্ত গৃহকোণের। আর এর সন্ধানীরা দাবী করতে পারেন যে, গরিষ্ঠ গিরিফুল বাদ দিয়ে যা লঘিষ্ঠ ফুলডোর, তাই বিদ্রোহী কবির সার্থক কবিতা। কারণ, এধরনের রায়তো কাব্য-জিজ্ঞাসায় অজানা নয়, গৃহীতও হয়েছে যুগে যুগে। কবিতার কয়লাখনিতে কবিতার হীরার সন্ধান নতুন কিছু নয়। কবিতার সমগ্র সত্তা, সমগ্র শরীর উপলক্ষ হয়ে গিয়েছে; মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্রূভঙ্গী বা অলকগুচ্ছের মত কয়েকটা ইশারা। তবু একথা বলবো যে, গিরিফুলই নজরুল কাব্যের বিশিষ্ট সৃষ্টি। কারণ এই গিরিফুল বাংলা কবিতার বিকাশে শুধু নব-উপকরণ হিসেবে সংযোজিত হয়নি, এই গিরিফুল বাংলা কবিতার নব-সৌন্দর্য বীক্ষণের, নব বিচারের পথ করে দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের রূঢ়তা ও জনতা এবং বহির্মুখীনতা বাংলা কবিতায় নতুন ধারণা এনে দিয়েছে। এই গিরিফুল না থাকলে বাংলা কবিতা তার নব-দিগন্তকে বুঝতে পারতোনা। বাংলা কবিতায় প্রকাশ্য ও স্বগতের নতুনতর সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে গিরিফুলের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ একথা বুঝেছিলেন বলেই স্বাগত জানিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবির রূঢ় রূপটিকে।

২

সমসাময়িক আধুনিকদের উপর কবি নজরুলের প্রভাবের কথাও বিশেষভাবে বিচার্য। কাজী নজরুল ইসলামের "সাম্যবাদী" লেখা না হলে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা বিলম্বিত হতো। কাজী নজরুল ইসলামের "কুলি মজুর" না লেখা হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রথমা" কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লেখা হত কিনা সন্দেহ। বিদ্রোহী কবি তাঁর 'নারী' কবিতা না লিখলে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' অতো সহজে মঞ্জরিত হতো না। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্রপথিক রে সেনাদল' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'কে সম্ভব করেছে। বিদ্রোহী কবির রাজনৈতিক ব্যঙ্গোক্তির ধারা সমর সেনের কবিতার উপকরণ যুগিয়েছে। কিশোর কবি সুকান্তের স্বচ্ছন্দ আবির্ভাব ঘটেছে কাজী নজরুল ইসলামের লেখার ধারাতেই।

কথা উঠতে পারে যে, আধুনিক বাংলা কবিতা এমন একটা অধ্যায়, যার পরিণত বা সুসংস্কৃত আওতার মধ্যে প্রারম্ভিক কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাকে বে-মানান মনে হয়। আধুনিক বাংলা কবিতাতে টি. এস. এলিয়ট প্রমুখ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আধুনিকতাবাদী কবির দুর্বোধ্য লেখার প্রভাব প্রকট থাকায় কাজী নজরুল ইসলামের সহজবোধ্যতাকে এর মধ্যে হয়তো অপাংক্তেয় বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম যখন কবিতা লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, সেই সময়ে দুর্গম পথের অভিযাত্রা নতুন মোড় নেওয়াতে কাজী নজরুল ইসলামের পথের গানের সঙ্গে আরো অনেক বেশি সুর, অনেক বেশি বৈচিত্র্য যুক্ত হয়েছে এবং এজন্যই দুর্গম পথের সাথী হিসেবেও নজরুলকাব্য এই বৈচিত্র্যে এমনভাবে ঢাকা পড়েছে যে, তারা প্রখর অস্তিত্ব আর ত্রিশ বছর আগের মতো মনে হয় না। এসব কথাই হয়তো নিদারুণ বাস্তব সত্য। কিন্তু যা ভিত, তাতো প্রচ্ছন্নই থাকে। সৌধ তৈরি হয়ে গেলে ভিত ব্যবহারিক বিচারে গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু তার মৌল কার্যকারিতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে কি? কাজী

নজরুল ইসলামের লেখা অবিচ্ছেদ্যভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার গঠনের মধ্যেও সঞ্চারিত রয়েছে।

এখানে একথাই বলতে চাই যে, আধুনিক বাংলা কবিতার যে রূঢ়তা, গদ্যমুখিতা, অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য-প্রবণতা, তিক্ততা এবং অস্থিরতা তাকে উনিশ শতকের বাংলা গীতি-কবিতা বা মহাকাব্যের ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে নজরুল কাব্য। শুধু বক্তব্যে নয়, কাব্য-রীতিতেও একথা প্রযোজ্য। 'বিদ্রোহী' কিংবা 'কামাল পাশাকে' নিয়ে লেখা কবিতাকে এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে আনা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা কবিতার পথ প্রদর্শক হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম। টি. এস. এলিয়ট নন। বাংলা কবিতায় টি. এস. এলিয়টের প্রভাবের কাল শুরু হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের এক দশক পরে।

৩

অবশ্য একথা সত্য যে, উনিশ শতকের কিংবা তারও আগে থেকে চলে আসা বিশ্ব-কাব্য-সাহিত্যের চলিত পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র কাব্য রচনার যে 'সচেতন' প্রয়াস টি. এস. এলিয়ট ও তাঁর সতীর্থেরা দেশ-দেশান্তরে গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে করে এসেছেন, সে সচেতনতা কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। বিদ্রোহী কবি যা করেছেন, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছেন।

'ক্ষণিকার' সহজপন্থী রবীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে কিছুটা সচেতন প্রয়াসী হয়েছিলেন; কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম সব সময় সহজিয়া। 'পূজারিণী' কবিতায় বিদ্রোহী কবি যে সহজিয়াবাদ প্রচার করেছেন, সেটিকে আয়ত্ত করার জন্য তাঁকে 'সাধনা' করতে হয়নি। এর কারণ এই যে, তিনি জোয়ারের জলে তরী ভাসিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় ভাটিতে নৌকো টানতে হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম অনেক বেশি বেপরোয়া। একথাও উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকাতে যে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে, তা আফ্রো-এশীয় কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের সামনে খুলে দেয় অফুরন্ত কল্পনার উৎসকে। সাহিত্য-শিল্পকলার অবারিত সৃষ্টির এক বহুমুখী যুগের শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আবার আহ্বানের' পরে আসে নতুন পালা। কাজী নজরুল ইসলামের কাছে এটা প্রথম আহ্বান। এতে বিদ্রোহী কবি তাই সাড়া দেন অনেক বেশি উচ্ছলতা নিয়ে।

কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় কালান্তরের দাবী সূত্রবদ্ধ হয়নি। জনতার সকল স্তর, সকল শ্রেণী প্রাণের পসরা বয়ে চলতে পারলেই তাঁকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। অসহযোগ, খেলাফত, সন্ত্রাসবাদী ও সাম্যবাদী এরা সবাই একই সঙ্গে ভাষা চেয়েছে এই তরুণ কবির কাছ থেকে, পেয়েছে। যে কোন মত, যে কোন পথ স্বাধীনতার পক্ষে গিয়েছে, তারা এর আগে পরস্পরের বিরোধিতা করে এলেও বিদ্রোহী কবির কাছ থেকে নবযুগের সম্মতি ও স্বীকৃতি আদায় করেছে।

একই সঙ্গে মোসলেম ভারত, কল্লোল এবং লাঙ্গলের লেখক গোষ্ঠীত্রয়ে মিশে যেতে কাজী নজরুল ইসলাম বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। নিজের শিল্পীসত্তাকে উজাড় করে দিয়েছেন যেকোন মানব-মুক্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে । কোন শর্ত রাখেননি, কারণ যা দিয়েছেন, তার ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। আর মাথা ঘামাতে গেলে কি কালান্তরের এত তাগিদ তিনি এক সঙ্গে এত কম সময়ের মধ্যে মেটাতে পারতেন?

৪

এখানে আরও প্রখর করে প্রশ্নটাকে এভাবে আনা যায় যে, যদি নজরুল ইসলাম সহজিয়া না হতেন এবং তাঁর উদ্ভব একটা জোয়ারের মুখ না পেত, তাহলে কি তিনি কালের দাবী মেটাতে পারতেন? গিরিফুলই কি স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ কাব্যিক মন ও পরিবেশের মাধুর্যের সঠিক সৌন্দর্য প্রতীক হিসেবে বাংলা কাব্যের নতুন রূপ-সজ্জার সূত্রপাত করেন নি। ঠিক সেই প্রলয়ংকর সময়ে অন্যকোন ফুলের পক্ষে কি সম্ভব ছিল সৌন্দর্যকে স্পর্ধাভরে নবযুগান্তরে পৌঁছে দেওয়া?

নতুন স্মৃতিতে আরোহণ

আমরা সবাই আরোহণ
করব এক নতুন স্মৃতিতে
আমরা একসঙ্গে বলব এক
অভিমানী ভাষা।

- পল এলুয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাংলা কাব্য-বীণার কয়েকটা জংধরা তার খুলে ফেলে দিয়ে নতুন নতুন ধারালো তার বাঁধছেন রবীন্দ্রনাথের স্মিতদৃষ্টির সামনে, তখন পল এলুয়ার ফারাসি কবিতার নতুন পরীক্ষা শুরু করেছেন মনোবাস্তবতাবাদী কবি এপলনেয়ারের পরিমণ্ডলে। অবশ্য দুজনের কবিতার দিগন্ত ছিল পৃথক। কাজী নজরুল ইসলামের এক একটি কবিতা এক একটি দৃপ্ত ঘোষণা; পল এলুয়ারের এক একটি কবিতা মৃদু গুঞ্জন। নজরুলের পদ্ধতি ছিল ফরমানের, পল এলুয়ারের পদ্ধতি ছিল আলাপনের। একটা মিল ছিল-সেটা ভালোবাসা -নিপীড়িত মানুষের জন্য মমতা। তবে দুটো পৃথক পদ্ধতির খাতে দুজনের লেখা পরস্পর থেকে এমন বিচ্ছিন্ন ধারায় নিজ নিজ ভবিষ্যৎ তৈরি করেছিল যে, দুই কবির কাজ যে কোনদিন কাছাকাছি আসতে পারে, সে কথা হয়তো কেউ ভাবতে পারেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল ও অবসানের পরবর্তী কালের মধ্যে পল এলুয়ার তাঁর সূক্ষ্ম ও মৃদুভাষী কবিতাতে এমন কতকগুলি স্বর ও সুর সংযোজিত করে নিয়েছেন, যা কাজী নজরুল ইসলামের লেখাতেই মানাতে পারত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রকাশিত পল এলুয়ারের কাব্যগ্রন্থ এবং বিশেষ করে তাঁর 'অব্যাহত' কবিতা পড়ে মনে হয়েছে, এ যে ঘোষণা ! পল এলুয়ারের দীর্ঘ অজস্রভাষী 'অব্যাহত কবিতা' পড়ে মনে হয়েছে, এ যেন, নতুন ছাঁচে ঢালা 'বিদ্রোহী' কবিতা। বহু বিপরীত ভাবের অনর্গল সমাবেশ সত্ত্বেও নজরুলের 'বিদ্রোহীর' মতই পল এলুয়ারের 'অব্যাহত কবিতা' সহজবোধ্য। অব্যাহত কবিতার আঙ্গিকগত জটিলতা কবির বক্তব্যের হীরক দ্যুতিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এ বক্তব্য 'বিদ্রোহী' কবিতার মত তেজস্ক্রিয়। এ কবিতা দয়িতাকে নিবেদিত হলেও বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতা ও শান্তিকামী মানব-মানবীর জন্য উচ্চারিত। 'অব্যাহত কবিতা' একা একা পড়ে তৃপ্তি হয়না। যেমন তৃপ্তি হয় না একা একা 'বিদ্রোহী কবিতা' পড়লে।

এর আগে সমসাময়িক দুনিয়ার কোন কবির সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের তুলনা দিতে গিয়ে, সোভিয়েট কবি ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির নামই শুধু মনে আসতো। একই পদ্ধতিতে এই দুই সমসাময়িক কবির লেখা শুরু। শুরু উদাত্ত ঘোষণায়। শুরু তারস্বরে জনসমাবেশে কবিতা পড়ায়। এরপরেও জনতার মধ্যে ছুটে বেড়িয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে অগ্নিবীণার কলরোল তোলার মধ্য দিয়ে দুই কবির যে মিল দেখা দিয়েছে, তা আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছে। শারীরিক গঠনের দিক দিয়েও মনে হয়েছে, দুই চারণ কবি যেন এক ছাঁচে ঢালা। সে একই ধরনের বুক ভরা জ্বালা। চীৎকার করে পৃথিবীকে মনের কথা না শোনানো পর্যন্ত অব্যাহতি নেই। জনতার জন্যে দরদের মধ্যে দয়িতার জন্য ক্রন্দন জড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু জনতার পথ প্রণয় নিকেতনকে বিদীর্ণ করে চলে গিয়েছে দুর্গম ভবিষ্যতের পথে। সুতরাং মায়াকভস্কির সঙ্গে ছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের তুলনা আর কার সঙ্গে চলবে, এ প্রশ্নই মনে জেগেছে এর আগে সদাসর্বদা। পল এলুয়ারের 'অব্যাহত কবিতা' পড়বার পরে মনে হয়েছে যে, কবিতার বহুজনমুখিতা, কবিতার উদাত্ত উচ্চারণ-পদ্ধতি এমন একটা কালজয়ী ধারা, যা খুঁজে নেবেই তার প্রতিভূকে, তার প্রবক্তাকে-যুগে-যুগে-কালে-কালান্তরে, দেশে দেশে। সুতরাং আপনা থেকেই বিদ্রোহী কবির পাশে এসে দাঁড়াবেন এমন আরও কবি, যাদের লেখা পড়ে মনে হবে, এতে যে অগ্নীবীণারই উদাত্ত সুর আছে জড়িয়ে।

এ পদ্ধতির উৎস কোনদিন শুষ্ক হয়না। কারণ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতার সম্ভাবনা কোনদিন নিঃশেষিত হতে পারেনা। বরং সংগ্রামী সহযোগিতার স্রোতধারা চির প্রসারমান। নির্ঝর শান্তি, স্বাধীনতা, স্বস্তি, সমৃদ্ধি অর্জনের সংগ্রামের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বহুর সঙ্গে একের জড়িত হওয়া। পল এলুয়ার যে মুহূর্তে মানুষের পাশে মানুষের এই সর্বাত্মক সমষ্টিগত মুক্তি প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে শরিক হলেন. সেই মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায় সঙ্গোপনে লালিত স্বগত কবিতাতে প্রকাশ্য ঘোষণা অনিবার্য হয়ে উঠল। নতুন স্মৃতিতে সবাই মিলে আরোহণ করার প্রতিজ্ঞা নিলেন তিনি। সবাই মিলে অভিমানী ভাষায় কথা বলবেন বলে ঘোষণা করলেন।

সুকান্ত–নিকষিত হেম

জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যেটে জনানুরঞ্জক কবির জন্য যে দুটি গুণের জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন তাঁর ফাউস্ট নাটকে, তাদের একটি যৌবনের সজীবতা, আরেকটি প্রাজ্ঞের অভিজ্ঞতা। বাংলা কবিতার বিকাশে এই দুটি গুণেরই প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল আমাদের শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ, বিপ্লব আর অভ্যুত্থানের যুগসন্ধিতে। এই দ্বিমুখী তাগিদের জবাবে যেন বেরিয়ে এসেছিল সুকান্ত। আর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নিকষিত ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিল সে। সুকান্ত তার একটি কবিতায় লিখেছিল, 'জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।' যে কথা সেদিন সে বলেনি তা এই যে শতাব্দীর প্রজ্ঞা নিয়েই সে ভূমিষ্ট হয়েছিল।

বিপ্লবী চেতনা আর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিল সুকান্ত কৈশোরেই, পূর্বাভাষ এর কবিতাগুলি লিখবার সময়েই। এই কারণেই সুকান্ত এ যুগের বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। যেভাবে গত শতাব্দীতে বাংলা কাব্যে বিপ্লবী অধ্যায় উন্মোচিত করেছিলেন মাইকেল এবং পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, তারপরে এই শতাব্দীতে এসে প্রথমে নজরুল এবং পরে আবার রবীন্দ্রনাথ, সেভাবেই সুকান্ত খুলেছিল নতুন অধ্যায়। মাইকেলের কবি-জীবন যখন শুরু, তখন ভাবাবেগ আর অন্বেষা ছিল তাঁর সঞ্চালক শক্তি। এরপরে তিনি সংসারকে দেখেছিলেন, জগৎকে চিনেছিলেন অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে। এর মধ্যে যেমন দুঃখের দহন ছিল, তেমনি চিন্তার গভীরতাও ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। তাঁর যে যৌবনবহ্নি শিখায়িত ছিল, প্রজ্ঞা এসে তাতে রং ধরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যৌবন ও প্রজ্ঞা দীর্ঘজীবনে বিসর্পিত সাগরাভিমুখী নদীর দুটি তীরের মত কখনো নিকটে এসেছে, কখনো দূরে সরে গিয়েছে। নজরুলের কবি জীবন বলতে গেলে মাত্র দশ বছরের। তবু এরই মধ্যে শুরু যৌবনের অস্থির চিন্তার পরিণতি সমাজ বিপ্লবের প্রজ্ঞায়। সুকান্তের কবি জীবনে যৌবন ও প্রজ্ঞা বলতে গেলে শুরুতেই একের সঙ্গে অপরে জড়িত। খনি থেকে তোলা ইউরেনিয়ামের চাং-এর মত। অথবা 'ধুপ না পোড়াতেই গন্ধ।' মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবে মাইকেলকে আলাদা রেখে যদি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর সুকান্তের প্রথম তিনটি সার্থক কবিতাকে অর্থাৎ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'বিদ্রোহী' আর 'ছাড়পত্র'কে পাশাপাশি রেখে বিচার করে দেখা যায়, তবেই বুঝতে পারা যাবে সুকান্তের বৈশিষ্ট্যকে। সে নিজের বিপ্লবী সত্তার ফরমান জারী করেছে, কিন্তু সামনে রেখেছে নতুন এক শিশুকে। সে তার প্রথম কবিতাতেই রেখে গিয়েছে প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত স্বাক্ষরকে। যৌবনের প্রচণ্ড আবেগকে খর্ব না করেও সে তার কাব্যিক শব্দসজ্জার পরিসরকে একেবারে শুরুতেই কমিয়ে দিয়েছে এবং দিতে সক্ষম হয়েছে বলা যেতে পারে। সুকান্ত এদিক দিয়ে বাংলা কাব্যের এক অনন্য-সাধারণ প্রতিভা।

অবশ্য মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতাগুলিকে সুকান্ত তৈরি বীণাযন্ত্রের মতোই পেয়েছিল। তাকে শুধু নতুন তার বাঁধতে হয়েছে। আরও বেশি উল্লেখযোগ্য এই যে, রবীন্দ্রোত্তর কিংবা নজরুলোত্তর

অধ্যায়ে আধুনিক স্বতন্ত্র বাংলা কবিতার প্রায় বিশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই সে জন্যেই হাতে পেয়েছিল। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তারা যেন এক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যারা ছিলেন এই আধুনিক ধারার পথিকৃৎ, তাঁরা আবার বিপরীত মুখে প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করেছিলেন পূর্বসূরীদের এবং রবীন্দ্রনাথের বাক্‌রীতিকে। তাঁর কবিতার ভাষাকে টেনে হিঁচড়ে কখনো লালিত্যকে নিংড়ে বার করে ফেলে দিয়ে, কখনও কুৎসিত বাস্তবকে ললিত-ভাষার মধ্যে টেনে এনে একটা অঘটন ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়োগে কবিতাকে তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন এমনভাবে যে আঁস্তাকুড়ের ফণীমনসাই হচ্ছে ফুলের রাজা। কেউবা টি. এস. এলিয়টের দেশ থেকে 'ক্যাকটাস' ধার করে টবে বসিয়ে বৈঠকখানার রসভঙ্গ করেছিলন বৈদগ্ধ্য জাহির করার জন্য। সুকান্ত এদের উত্তর সাধক হিসেবে পরে জন্মেছিল বলেই ফণীমনসাকে অনায়াসে শিল্পীর উত্তরাধিকাররূপে আপন করে নিতে পারলো। সে পেলো বাংলা কাব্যের নতুন স্বপ্ন পরিসর বাকভঙ্গীকে। অনায়াসে পেল সে সেই ঋজু বাকভঙ্গী ও বাকবিন্যাসকে, যাদের কাব্যাশ্রিত করার জন্য বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে অনেক কাঠ-খড় গোড়াতে হয়েছিল। তফাৎ এই যে, সুকান্তের কবিতার ফণীমনসা বা ক্যাকটাস বিষ্ণু দে কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহী হলেও জাদুর ছোঁয়াটা একান্ত সুকান্তেরই। হয়তো সুকান্ত দেরি করতে চায়নি মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি ঘেঁষতে দেখে। জন্যেই সে মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়েছিল। সেখানে প্রবীণদের কিংবা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শেষ ইশারাটুকু তুলে নেবার জন্য অপেক্ষা করারও অবকাশ ছিলনা।

২

সুকান্তের 'ছাড়পত্র' গ্রন্থের সব কবিতা পড়লেই একথা বুঝতে পারা যায়। 'পূর্বাভাষ' কবিতা গ্রন্থেও এই ব্যাপারটি লক্ষণীয়। সুকান্ত সব সময়ই মৃত্যুর ছায়াতে বসে জীবনের জয়গান গেয়েছে। নিজের বিদায়ের বারতা শুনিয়েই বিপ্লবী নতুন মানবকে স্বাগত জানিয়েছে। সে বারবার বলেছে যে, সে থাকবেনা, যদিও জগৎ থাকবে, মানুষের বাসোপযোগী নতুন জগৎ থাকবে। একটি দৃষ্টান্ত 'খবর' কবিতা থেকে এখানে উল্লেখযোগ্য:

আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি।

তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের–

কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে?

ছাপাখানার শ্রমিকের মতো সুকান্ত নিজেকে সব সময়ই যেন মনে করেছে, সে থাকছে না।

অবশ্য বিস্মরণ ছাড়াও মৃত্যুর পরবর্তী অন্য ধারার সমান সুস্পষ্ট স্বাক্ষরও আছে সুকান্তের কবিতায়, যেখানে সে বলেছে, 'তারপর হব ইতিহাস।' কিন্তু সে শুনিয়েছে চলে যাওয়ার কথাই বারংবার:

চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি।
(ছাড়পত্র)

হে পৃথিবী, আজিকে বিদায়
এ দুর্ভাগা চায়,
যদি কভু শুধু ভুল করে
মনে রাখো মোরে,
বিলুপ্তি সার্থক মনে হবে
দুর্ভাগার।
প্রভাত পাখির কলরবে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার তিক্ত অবসান।
তবুতো পথের পাশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে বিস্ময়।
সেই মোর জয়। (পূর্বাভাষ)

সুকান্ত যেন বুঝতে পেরেছিল, তার অকাল মৃত্যু অবধারিত। এই জন্যই সে সমগ্র সমসাময়িক জীবনকে নিজের মধ্যে ধরে নিজেকে বিস্ফোরিত করে দিয়েছিল। এটা সে করতে পেরেছিল আরেকটা কারণে। সুকান্ত ছিল জনতার আত্মনিবেদিত এবং এটাই হচ্ছে সুকান্ত সম্বন্ধে একটা মূল কথা। সে জানতো যে সে মরে যাবে, কিন্তু জনতা থাকবে। একথা যদি তার কবিচিত্তে প্রধান্য না পেতো, তাহলে মৃত্যুর চক্রের কাছে সে আত্মসমর্পণ করতো। সার্ত্রে তার শিল্পী জীবনের প্রথম দিকে যেমন করেছিলেন, সে ভাবেই। সে অতীন্দ্রিয়বাদী হত। কিন্তু তা সে হয়নি। প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি হিসেবে তার যে ক্ষমতা, সেটিকে সে অধ্যাত্মতত্ত্বে লাগিয়ে পুরাতনের নকল নবিস হতে পারতো। তা না হয়ে সে বলেছে, মনে হয় আমিই লেনিন। সে লিখেছে ঘুম তাড়ানির ছড়া।

আরও স্পষ্টভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, সে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল ক্ষুধা থেকে. পরাধীনতা থেকে, যুদ্ধ থেকে, গুণ্ডামি থেকে, দারিদ্র্য থেকে দেশবাসীর মুক্তির সংগ্রামে। সে জানতো যে, এ সংগ্রামে তার মৃত্যু এবং আরো অনেকের মৃত্যু হবে, কিন্তু এই প্রাণোৎসর্গেই অচলায়তন ধ্বংস হবে। 'সিগারেট' কবিতাটি এই বিশ্বাসের স্মারক। তার এই আত্মোসর্গের স্পর্ধিত স্মারক। জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মোৎসর্গের স্মারক। ভবিষ্যতের সুখী মানুষের জগতের জন্য নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল। একথাটা অত্যন্ত কোমল করে, গভীরতম প্রজ্ঞা ঢেলে সে বলে গিয়েছে:

ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই জানি আমি ভাবী বনস্পতি।

ছবি, গণদর্শক, মেহনত

কদাচিৎ দুয়েকজন ছাড়া কোন শিল্পীকেই একথা বলতে শোনা যাবে না যে, ছবির দর্শকের জন্য তাঁর কোন আগ্রহ নেই, দর্শক তিনি নিজেই। তবে কোন কোন শিল্পী একথা বলতে পারেন যে, তাঁর ছবি বুঝবার মতো দ্বিতীয় কোন লোক তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এ কথাও কোন কোন শিল্পীকে বলতে শোনা যেতে পারে যে, সমসাময়িক দর্শকেরা তাঁর ছবির কদর করবে না, ভবিষ্যতের দর্শকের জন্যই তাঁর ছবি আঁকা। সম্ভাব্য দর্শক আছেই সে ছবির সামনে। নিতান্ত অহঙ্কারী শিল্পীকেও দেখা যাবে, একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন যদি কোন সমঝদার মিলে যায় এই প্রত্যাশায়। ছবি, দর্শক আর শিল্পীর ত্রিকোণ হচ্ছে শিল্পীর জীবন সম্পর্কের জঙ্গম কাঠামো। একথা মূর্ত এবং বিমূর্ত নির্বিশেষে সমস্ত চিত্র-পদ্ধতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। একা একা গাওয়া হয়তো সম্ভব; একা একা বাঁশী বাজানো, সেও চলতে পারে; সুর আর কথা মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে গায়ক বা বাঁশীওয়ালার আশেপাশে লোকালয়ে কোন দাগ না রেখে। কিন্তু ছবিকে কোন অদৃশ্য প্রবাহে অলক্ষ্যে ভাসিয়ে দেয়া যায় কি? ছবি নির্জন কক্ষকেও ভরে দেয় সম্ভাব্য দর্শক দিয়ে। রং আর রেখার অনপনেয় দাগ নিয়ে গুহার আঁধারেও সে যেন জেগে বসে থাকে, কবে জোড়া জোড়া চোখ তাকে দেখবে সেই আশায়।

এই কারণেই পাবলো পিকাসো থেকে শুরু করে আমাদের একান্ত নিকটের পূর্ব বাংলার ঢাকা গ্রুপের শিল্পীরা শুধু প্রদর্শনীর আয়োজন করে ক্ষান্ত থাকেননি, ছবির বক্তব্যকে লিখিতভাবে ব্যাপকতর দর্শক সমাজের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য সতীর্থ কবি কিংবা লেখকদের শরণাপন্ন হয়েছেন তাঁরা। মুখপত্র এবং মুখপাত্রের জন্য এই ব্যাকুলতার মূলে রয়েছে দর্শকদের সমঝদার করে তোলার ব্যাকুলতা। গত এক শতাব্দীতে যে আধুনিক চিত্রকলা গড়ে উঠেছে বিশেষ করে প্যারী নগরীকে ভিত্তি করে, তার বিকাশ ও বিস্তারের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে প্রদর্শনীর অভিনব ধারা। দর্শকের সম্মতিকেই ছবির প্রাথমিক নিরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্রোহী শিল্পীরা একে তাদের সংগ্রামের অঙ্গ বলেই মনে করে নিয়েছেন। আধুনিক দুর্বোধ্য কবিতার তুলনায় এদিক দিয়ে আধুনিক ছবি অনেক বেশি জনমুখী। একথা সত্যি যে, পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্রমেই দেখা যাচ্ছে, এই প্রদর্শনীগৃহ শাঁসালো খরিদ্দার ধরার নীলামঘরে পরিণত হয়েছে। সে জন্য দায়ী কিন্তু সমাজব্যবস্থা।

অর্থাৎ দর্শক, শিল্পী আর ছবির ত্রিকৌণিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দর্শকের উপস্থিতি স্বীকৃত সত্য। কিন্তু দর্শককে 'জনগণ' নামে চিহ্নিত করা যায় কি অনায়াসে? এখানে একটা খটকা রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ছবির জগতে শিল্পী, মেহনতী আর মেহনতের সম্পর্কের প্রশ্নে কিনারা করার প্রয়োজন রয়েছে এই কারণেই।

আমাদের শতাব্দীর শুরুতে গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়াতে এমন এক নতুন সমাজব্যবস্থার পত্তন হল, যেখানে শাঁসালো খরিদ্দার বলে কেউ থাকলো না তো বটেই; সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেওয়া হল বাজেয়াপ্ত রাজপ্রাসাদের চিত্রভাণ্ডারগুলির দরওয়াজাও

সর্বসাধারণের জন্যে। মায়াকভস্কির মত চারুকলা বিদ্যালয়ের পাশ করা শিল্পীরা দেয়াল ছবির মাধ্যমে গণবিপ্লবকে দর্শনীয় করে তুললেন। লেনিনের 'জনগণের কাছে যাও' আবেদন শিল্পীদের কাছে ব্যাপক দর্শক সমাজকে উদঘাটিত করে দিল। ঘটনাটা এক-তরফা রইলনা। গণদর্শক ভিড় করে সারি দিয়ে দাঁড়ালো ছবির গ্যালারিতে, যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্রভাণ্ডারে।' নবীন গণরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধায়কেরা চিত্র ভাণ্ডারের গণদর্শককে দুর্বোধ্য ছবির মর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্যে 'পরিচায়ক' রাখলেন (রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ায় চিঠি' দ্রষ্টব্য)। তবু বিভিন্ন দেশে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এ-দিকটি পরিষ্কার হয়েছে বলে মনে হয় না। 'রাশিয়ার চিঠি' বইটির চিত্রকলা সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি আমাদের দেশেই আড়ালে পড়ে গিয়েছে। ইউরো-মার্কিন ছবির গ্যালারিগুলির মুষ্টিমেয় সমঝদারের চটকদার টিপ্পনির খবরই আমরা বেশি রাখি। দেশত্যাগী রুশশিল্পী শাগালের গণবিমুখিতায় বিরক্তি প্রকাশ করিনা আমরা। বরং মনে করি, না জানি এই আত্মনিমগ্ন ছবিতে কি আছে!

সমাজতন্ত্রের উদয়-শতাব্দীতেও এই যে, 'গণদর্শক' সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, এটা স্বভাবতই যেসব দেশে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়নি, সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে। ইটালির ভবিষ্যৎবাদী শিল্পী জিনো সেভেরেনি তো বলেই দিয়েছেন যে, জনগণ শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের হাতে শিল্পকলা তুলে দেওয়া যাবেনা। আমাদের দেশেও কোন কোন শিল্পী এই গণবিমুখতায় সংক্রামিত। হয়তো গণদর্শককে খোলাখুলিভাবে ছবি দেখতে ডাকার রেওয়াজ না গড়ে ওঠার দরুন এই প্রবণতার সঙ্গে শিল্পীদের কোন বোঝাপড়াও হচ্ছে না। জনগণের ছবি যাঁরা আঁকছেন, তাঁরাও খোলাখুলিভাবে গণদর্শকের ভূমিকাকে সামনে রেখে কোন বিতর্কের সৃষ্টি করছেন না। তাঁদের মনের মধ্যেও কি এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে?

সাধারণভাবে আমাদের শিল্পীদের গণদর্শকের প্রতি বিরূপ বলে ধরে নেওয়াটা ধৃষ্টতা হবে। বিভিন্ন উপলক্ষে দেখা গিয়েছে, আমাদের বিমূর্তপন্থী শিল্পীরাও জনগণের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন, জনগণের কথা বলেছেন। গণআন্দোলনের পোস্টার আঁকতেও তাদের মধ্যে দ্বিধা নেই। গণদর্শকের জন্য একটা ব্যাকুলতা তাঁদের মনে প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয়ই হয়তো বা, কিন্তু আধুনিকতা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে জনগণ ও শিল্পীর একাত্ম হয়ে যাওয়ার মধ্যে যেন একটা খটকার মত রয়েছে। কেন এই বাধো-বাধো ভাব, কী এই ভাব?

এই প্রশ্নের একটা উত্তর সম্ভবত এই যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মধ্যে ভাব ও কর্মের যে বিচ্ছেদ ঘটে আসছে, অর্থাৎ ভাব যে কর্মকে অবলম্বন করেও কর্মকে ছোট করে দেখে এসেছে, তারই প্রভাবে শিল্পী ও গণদর্শকের মধ্যেকার ব্যবধানকে জিইয়ে রাখছে। এই প্রভাব শিল্পীর অচেতন মনেই বিশেষভাবে সক্রিয়। রূপসৃষ্টির জগৎ নিয়েই খটকা। রূপসৃষ্টির জগৎ যেন শিল্পীর একান্ত নিজস্ব; শিল্পীর সার্থকতা যেন তার কুশলতার স্বাতন্ত্র্যে; শিল্পীর হাত আর মেহনতীর হাত কিংবা শিল্পীর চোখ আর মেহনতীর চোখের জাতই যেন আলাদা। এই ধারণার প্রভাবে পড়ে একজন গণশিল্পীও রূপের জগৎকে পৃথক সৃষ্টির জগৎ বলে মনে করে বসতে পারেন কোন কোন সময়ে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জার্মান গীতিকবি হাইনরিখ হাইনের একটি উক্তির মধ্যে এই মনোভাব

প্রকাশকে পাওয়া যেতে পারে। মার্কস-এঙ্গেলসের কবি-বন্ধু হাইনে তাঁর 'জার্মেনি' নামক নিবন্ধ গ্রন্থে এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন যে, সাম্যবাদী সমাজ আসবেই, মেহনতী জনগণই আগামী দুনিয়ার মালিক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনতাকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, চিত্রভাণ্ডারে প্রবেশ করার সময় তারা যেন মেহেরবানী করে নোংরা পাগুলো ধুয়ে নিয়ে তারপর ঢোকে। যে হাইনরিখ হাইনে জার্মেনির তাঁতী বিদ্রোহের অগ্নিজ্বালাকে ধরে রেখে গিয়েছেন তাঁর গীতি কবিতায়, তিনি যে রূপের জগৎ সম্পর্কে এরকম ছুঁৎমার্গী মনোভাবের পরিচয় দিলেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে, রূপকার আর কর্মকারকে একই মেহনতের প্রয়োগকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে তিনি পেরে ওঠেননি। চারু আর কারুকে ভিন্নধর্মী করে রাখার এই প্রবণতা থেকেই সাধারণভাবে আজও মনে করা হয় যে, শিল্পীর সৃষ্টি সুন্দর, আর মেহনতী মানুষের সৃষ্টি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একটা সূক্ষ্ম আরেকটি স্থূল । একটা চিরকালের, আরেকটা ক্ষণকালের। শিল্পীর তুলির সঙ্গে কামারের হাতুড়ী কিংবা হাপড়ের মিল নেই। শিল্পীর আঙ্গুলের সঙ্গে মজুরের আঙ্গুলের কোন মিল নেই। কোন কোন শিল্পী হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ছবি আঁকলেও কিংবা মূর্তি গড়লেও নিজেদের অন্যান্য মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে পারেন না–এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, শিল্পীর মেহনত আর মজুরের মেহনত ভিন্ন বস্তু, ভিন্ন সত্তা। এই অভিমানই প্রচ্ছন্নভাবে গণমুখী শিল্পীদের মনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে অনর্থ ঘটাতে পারে।

এই অভিমানকে কি করে কাটিয়ে ওঠা যায়, গণমুখী শিল্পীকে সে কথাটা ভেবে দেখতে হবে নিশ্চয়? এইখানেই লেনিনের 'জনগণের কাছে যাও' কথাটার মর্মে উপনীত হওয়ার তাগিদ আসতে পারে। 'জনগণের কাছে যাও' কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে এই অভিমানকে কাটিয়ে ওটা যাবেনা। যায়নি।

মার্কসীয় তত্ত্ব অবশ্য গত শতাব্দীতেই পথ নির্দেশ করে রেখেছে এ বিষয়ে। রাশিয়াতে সোভিয়েত ঘটবার উদ্যোগপর্বে কিংবা ম্যাক্সিম গোর্কি শিল্পকলার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে মেহনতকে শিল্পকলার উৎস বলে প্রতিপন্ন করার পরে এ তত্ত্ব আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। তবু গত শতাব্দীর তাত্ত্বিকরা এর যে সূত্রটি দাখিল করেছিলেন, তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, হ্রাস পায়নি। মার্কসবাদের অন্যতম প্রবর্তক ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মেহনতের স্বজনাত্মক ক্রমবিকাশের মূলধারা হিসাবে মানুষের রূপান্তরিত হাতের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে শিল্পী আর মেহনতকে একাকার করে যে-ভাবে দেখেছেন, সেটা আজকের সাম্যবাদী প্রয়োগ-কালে ঐতিহাসিক নিশানা তো বটেই, তাত্ত্বিক পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে আজও প্রায় অতুলনীয়। মানুষের কাজ করার হাত দু'টি সম্পর্কে এঙ্গেলসের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"হাত শুধু মেহনত করার উপায় নয়, হাত একই সঙ্গে মেহনতের সৃষ্টি। হাত একমাত্র মেহনতের মধ্যে দিয়েই নিত্য নতুন ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হয়েছে; অভ্যাসের মধ্য দিয়ে সে পেশি, রগ আর হাড়ের বিশেষ গঠনকে দীর্ঘ সময় নিয়ে গড়ে তুলে আয়ত্তাধীন করেছে; সেগুলিকে পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে। এই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উন্নত অবস্থাকে নতুনতর ও ক্রমাগত জটিলতর হয়ে চলা ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েই মানুষের এই হাত সেই উচ্চপর্যায়ের নিখুঁত

দক্ষতায় পৌঁছেছে, যেখানে সে রাফায়েলের ছবিগুলির আবির্ভাব ঘটিয়েছে যেন কোন যাদুযন্ত্রে।" (ডায়ালেকটিস অব নেচার)

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের এই বক্তব্যের আলোকে দেখা যাবে, রাফায়েলের যুগের পাঁচশো বছর পরে বিমূর্ত পদ্ধতির ছবিতেও 'চারু আর কারু' প্রতিফলিত করছে সেই হাত আর আঙ্গুলকে, যা যেমন শিল্পীর তেমনি মজুরের লক্ষ লক্ষ বছরের মানবের পরিশীলিত উত্তরাধিকার। এই হাতেই মিলিত হচ্ছে এবং হবে শিল্পী এবং মজুরের হাত। দূর হবে আধুনিকতম ছবি এবং গণদর্শকের মাঝখানকার কল্পিত অকল্পিত ব্যবধানগুলিও। আমাদের দেশেও। এই মেহনতী হাতই জানিয়ে দেবে, চিরায়ত সুন্দর আর দৈনন্দিন প্রয়োজনের নির্মাতা হিসেবে যদিও আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করি, তবু আমরা পরস্পরের সৃষ্টিকে নিশ্চয় আপন সৃষ্টি বলেই গ্রহণ করতে পারব।

ফুল আর ফুল, পাখি আর পাখি

শীতের সন্ধ্যায় ঢাকায় গণচীনের আলো-ঝলমল চিত্র প্রদর্শনীতে প্রবেশ করে সেদিন মনে হল, রহস্যময় কতকগুলি ইশারা ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে রেখা আর রং'এর ঢেউ তুলে উন্মোচিত হল যেন কোন রূপকথার রাজ্য। ফুল আর ফুল, পাখি আর পাখি, পাঁপড়ি, পাতা, গাছ, ব্যাঙ আর ক্ষুদে পোকা থেকে শুরু করে চঞ্চল উদ্দাম ঘোড়া আর পৌরাণিক কিম্ভূতমুখো জানোয়ার অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে মধুময়ী পৃথিবীর মানব-মানবীর পাশে। প্রশান্ত পটভূমির ওপর লতা, ফুল, মাছ আর মানুষের ছন্দিত সঙ্গতিতে মুগ্ধ হতে হয়েছে। সূক্ষ্ম মেহনতের কাজে সহজ জীবন জিজ্ঞাসা। তারিফ করলাম অদৃষ্টপূর্ব, অদ্ভুত বলে! হাতীর দাঁতের কাজগুলি কি মানুষের তৈরি? এত নিটোল হল কী করে?

যে কোন চিত্র প্রদর্শনীতে পা দিয়ে প্রথম তার যে সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে দুলে ওঠে এখানে তারই বিশেষ একটা ধরনের সাক্ষাৎ পেলাম। মনে হল, এমনটি দেখিনি কখনও। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি শিল্প-সমালোচক এরিক নিউটনের কথাই ঠিক? উক্ত সমালোচকের মতে, প্রচ্যের শিল্পকলা দেশভেদে এত পৃথক যে, তাকে কয়েকটা সমান্তরাল শহরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তারা প্রতীচ্যের শিল্পের মত কোন বহমান নদী নয়, যা বহু নদীর মিলন প্রবাহ।

এরপরে ভিড় ঠেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। যা দেখেছি আর এই সবকিছু নিয়ে লেখার আগে যা ভেবেছি, তাই আপাতত পেশ করে রাখছি। ১৯৫৬ সালের স্মরণীয় দিন, মন আর অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালা এই দেখা আর লেখা।

২

আধুনিক এক প্রাচ্য-দেশীয় শিল্পসমালোচক প্রমাণ দাখিল করে বলেছেন, অজন্তার একটা অংশ ইরানী আর চীনা শিল্পীদের আঁকা। পাক-ভারতের শিল্পীদের ঐতিহ্যে তাই প্রাচীন চীনা চিত্রকলার প্রভাব থাকার কথা। আমাদের স্থানীয় পটের ছবিতে যে তুলির

টান তাতে, চীনা রেখা-তরঙ্গের স্পর্শ জড়িয়ে রয়েছে সম্ভবত। আর চীনা শিল্পীরা যখন ছবি আঁকার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন আমাদের উপ-মহাদেশে, নিশ্চয় কয়েকেটি ভঙ্গির প্রবর্তন করেই যাননি শুধু তাঁরা; ছবি আঁকার যেসব যন্ত্রপাতি উপকরণ সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেগুলি আমাদের প্রাচীনকালের শিল্পীদের হাতে হাতে ফিরেছে। সেসব উপকরণ আজও আমাদের পটুয়া অথবা অন্যান্য কলাকাররা ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যেও দুএকটা সরঞ্জাম নেই কি পরিবর্তিত আকারে?

সুতরাং চীনা ছবির রহস্যময়তার আড়ালে একটা ঐক্যের গ্রন্থি কি নেই আমাদের সঙ্গে?

গত পনেরো ষোল শতাব্দী ধরে প্রাচ্যের দেশ ও দেশান্তরে শিল্প রীতির যে লেনদেন হয়েছে, এরিক নিউটনরা তা তলিয়ে দেখেননি?

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন শিল্পরীতির যে ষড়ঙ্গের উল্লেখ রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে কিংবা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলিতে', তার সঙ্গে প্রাচীন চীনা শিল্পীর পক্ষে নির্দিষ্ট করে দেওয়া অপরিহার্য ছয় দফার অনেকাংশে মিল রয়েছে দেখা যায়।

পাঁচশ খ্রীষ্টাব্দে চীনা শিল্পীর অবশ্য পালনীয় ছয় দফার উদ্ভব হয়েছিল। যেমন (ক) ছন্দিত সজীবতা আর জীবনের গতিধারা, (খ) তুলির আকৃতি-অনুগ ব্যবহার, (গ) বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য, (ঘ) যেখানে যেমন খাটে তেমনি রং ব্যবহার করা, (ঙ) পরস্পর সমাবেশ ও (চ) অনুকৃতি ও অঙ্কনের মধ্য দিয়ে রীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

আমাদের প্রাচীন চিত্রকলার ষড়ঙ্গ অবনী ঠাকুরের মত সহজ বাংলা করে বলা যায়, কেউ রূপ প্রধান, কেউ প্রমাণ প্রধান, কেউ ভাব লাবণ্য যুক্ত, কেউ বর্ণ ও বর্ণিকা মনোহর। কেউ ষড়ঙ্গের দুটো নিয়ে চিত্র, কেউ পাঁচটা নিয়ে আঁকতে পারে ছবি। মূল শ্লোকে আছে সাদৃশ্য কথাটাও। অর্থ্যাৎ রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য আর বর্ণিকা ভঙ্গ এই ছটিকে নিয়ে আমাদের প্রাচীন ছবির জন্য ষড়ঙ্গ নির্দিষ্ট হয়েছিল। অবনী ঠাকুরের ব্যাখ্যা পড়ে মনে হয়, আমাদের প্রাচীন শিল্পীরা ষড়ঙ্গের সব কটি অঙ্গকে একই সঙ্গে আশ্রয় না করে ছবি আঁকতে পারতেন। তফাৎ হয়তো শুধু এটাই।

সুতরাং প্রাচীনের চিত্র প্রদর্শনীতে প্রাচীন রীতিতে আঁকা কিংবা তৈরি ছবি অথবা সামগ্রীতে সূক্ষ্ম কাজগুলিতে অজানিতের যে ইশারা আছে, সেগুলিকে মনে মনে সরিয়ে হয়তো আবার দেখলে পরিষ্কার প্রমাণ বেরিয়ে আসবে যে, প্রাচ্য শিল্পকলাও একটা বহমান নদী, যা বহু নদীর মিলন প্রবাহ।

৩

আজকের প্রধান সমস্যা অবশ্য এই যে, শুধু প্রাচীন প্রমাণ দাখিল করে আমরা পরস্পরের নৈকট্যকে নিশ্চিন্তচিত্তে আর অনুভব করতে পারি না।

আমাদের ছবির জগতে অনেক দিন ধরে ইউরোপীয় রীতির প্রভাব পড়েছে। ১৯৫২ সালের পর থেকেই আমাদের শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন। অতি-আধুনিক রীতির সঙ্গেই এই যোগ।

এ তরফ থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, ফারসি কিংবা ইটালির আধুনিক ছবি আঁকার পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের আধুনিকতম শিল্পী ও রসিকচিত্তের যে কারণে সংযোগ, সেটা কতখানি সম্ভব গণচীনের আধুনিকতম চিত্রকলা পদ্ধতির সঙ্গেও?

প্রথমে এরিক নিউটন এবং হার্বার্ট রীডের মন্তব্য দিয়ে বিষয়টিকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই দুজনেই পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক।

এরা উভয়েই চীনা ছবিতে কিংবা চারুকলার অন্যান্য সামগ্রীতে মানব-মানবীর রক্ত মাংসে গড়া চেহারা পাননি। চীনা ছবি হচ্ছে তাঁদের মতে শিল্পীর ধ্যানরূপ, মানসচিত্র। চীনা ছবির পটে মানব-মানবীরা তাদের হাস্যলাস্য নিয়ে নিজেদের জাহির করেনি। চীনা শিল্পীর ছন্দসংগতির সামগ্রিকতায় প্রকৃতির শান্ত রূপতরঙ্গে মানুষও যেন কয়েকটা তুলির টান। উভয় সমালোচকই তাই অতৃপ্ত।

এরিক নিউটন এবং হার্বার্ট রীড উভয়েই চীনা ছবি ও চারুকলার বিভিন্ন সামগ্রী দেখে সম্মোহিত হবার পরেও একথা জানিয়েছেন। প্রথমে প্রশংসা বাণীর উল্লেখ করা যাক। এরিক নিউটন বলেছেন, "আমি এমন সব চীনা ছবি দেখেছি যাদের রেখাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, মনে হয়, কাগজের ওপর রেশমের সুতো কেউ ফুঁ দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে"। হার্বার্ট রীড 'আধুনিক চীনা চিত্রকলা' নিবন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের হাতের কলমের মতই চীনাদের হাতের তুলি স্বচ্ছন্দ। চীনা ছবি সীমাহীনতার চাবিকাঠি, অথচ তা ছোট একটুখানি। এত প্রশংসা করার পরে উভয় সমালোচকই রেখার ঢেউ কিংবা ধ্যান-ময়তা ও তন্ময়তার ফাঁকে খুঁজেছেন হাস্য-লাস্য-স্বেদময় মানবতাকে, চেয়েছেন সুতীব্র আবেগকে। আধুনিক ইউরোপীয় ছবির সর্বাঙ্গ জুড়ে আজ যে মানব-মানবীর আক্ষেপ ও বিক্ষুব্ধ প্রকাশ, তা নাকি চীনা ছবিতে নেই।

গণচীনের চিত্রপ্রদর্শনীর ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দেখার পরে মনে হয়েছে, উভয় সমালোচকই এখনও চীনারীতিতে সম্মোহিত হয়ে রয়েছেন। এই কারণেই তাঁরা আজ ইতিমধ্যে কি ঘটেছে কিংবা কি ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখতে পাননি এবং হয়ত খোঁজও করেননি। নয়াচীনের শিল্পীরা আজ যে তুলি চালাচ্ছেন, কাঠখোদাই-এর কাজ করছেন, সেখানে মূল দর্শনীয় শৃঙ্খলমুক্ত মানব-মানবী। ঢাকার প্রদর্শনীতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রতিলিপি দেখেও আমরা আকৃষ্ট হয়েছি। মানুষ এখানেও রেখা তরঙ্গের অংশ, যোগ ছিন্ন হয়নি উত্তরাধিকারের রীতির সঙ্গে। কিন্তু তীব্র আবেগ রং-এ এবং রেখায় স্ফীত হয়ে উঠেছে বসন্তের পলাশ ফুলের বন্যার মতো। বিশেষ করে একটি প্রতিলিপির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ছবিটির নাম 'সামন্ততন্ত্রের অবসান।' দাসখতের দলিলগুলো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আগুনে। আর্তনাদ করছে কিম্ভুতকিমাকার তোরণগুলো। জনতা আনন্দে অধীর। সমস্ত টা মিলে যেন কয়েকটা উৎক্ষিপ্ত ঢেউ।

গালা, মাটি আর পাথর আজ মানব-মানবীতেই প্রধানত রূপান্তরিত হচ্ছে। এই মানব-মানবীরা মুক্তি সংগ্রামের ধারক-বাহক। কিন্তু এক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম কাজের ধারা রয়ে গিয়েছে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। এজন্যই হয়তো বা ছবি কিংবা মূর্তি আকৃতিকে ছোট করে রাখা হয়েছে। চীনা তুলির কাজ তা না হলে বেকার হয়ে যাবে? বৃহৎ বা

মনুমেন্টালের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন বা মিনিয়েচারের সঙ্গতিই গণচীনের চিত্রকলা-চারুকলার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ।

৪.

আধুনিক চীনা ছবিতে কিভাবে মানবতা এসেছে সেটা লক্ষ্য না করায় এরিক নিউটন অথবা হার্বার্ট রীড প্রাচীন ষড়ঙ্গেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন, তাঁরা হয়তো খুঁজেছেন আধুনিক ফারসি কিংবা ইটালির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানব-মানবীকেই হুবহু। তাঁরা সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার রীতি-পদ্ধতিতে উন্মোচিত মানবাত্মাকেও এড়িয়ে গিয়েছেন।

লেখাটি গণচীনের চিত্রকলার পর্যালোচনা হিসেবে ১৯৫৭ সালের প্রথমদিকে ঢাকার একটি কাগজে ছাপা হয়েছিল।

চলচ্চিত্রের জনতা প্রবণতা

পদার্থবিদ্যা আর রসায়নশাস্ত্রের সর্বশেষ আবিষ্কারগুলির প্রয়োগ এবং শিল্পকলার সমস্ত বিভাগের শিল্পী ও উপকরণের সমাবেশে নির্মিত চলচ্চিত্র একলা চলার শিল্পকলা নয়। নির্মাতা এখানে গোষ্ঠী এবং দর্শক এখানে জনতা। একে ব্যক্তিগত চিত্রভাণ্ডারে সাজিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র সার্থকতা নেই। এর কারুকার্যের অসামান্য দক্ষতা সত্ত্বেও একে কোনমতেই অভিজাত বলা যায় না। অভিজাত করে রাখ যায় না। জনতার সামনে উপস্থাপিত শিল্পকলা হিসেবেই চলচ্চিত্রের জন্ম এবং জনতাকে কোন পর্যায়েই ছাঁটাই করে কিংবা দূরে ঠেলে দিয়ে এর প্রক্ষেপণ সম্ভব নয়। এর কারিগরি দিকের যত উন্নতি হচ্ছে, এর প্রক্ষেপণীপটের আয়োজনও ততই দর্শকের সমাজকে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর করে চলেছে। এর জনতাপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফরাসি চিত্রপরিচালক রেনে ক্লেয়ারের একটি অভিমতের উদ্ধৃতি দেখলাম সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সোভিয়েট গ্রন্থে। রেনে ক্লেয়ার চলচ্চিত্রের জনতা-প্রবণতাকে একটি স্থায়ী ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চলচ্চিত্রের দর্শকদের এই সমষ্টিগত সত্তাকে আমরা আমাদের দেশেও ছোট বড় যে কোন ছবিঘরে গেলেই অনুভব করতে পারি।

কিন্তু চলচ্চিত্রের এই জনতা-সম্পর্কিত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে স্ববিরোধিতা। বিশেষ করে দুইভাবে এই স্ববিরোধিতা কাজ করে আসছে।

প্রথমত, প্রক্ষেপণ শুরু হলে রূপালি পর্দার ওপর যে চিত্রমালা প্রবাহিত হতে থাকে, সেগুলি রঙ্গমঞ্চের নাটক কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো দর্শকদের সঙ্গে জৈবিক যোগাযোগ রক্ষা করে না। এদিক দিয়ে চলচ্চিত্র নিজের মধ্যেই নিজে নিবদ্ধ। সমুদ্র, পাহাড়, ঝর্ণা কিংবা ঝড়ের মতোই সেগুলি নৈসর্গিক, দর্শকদের হাসি-কান্নায় নিরাসক্ত। পর্দার ওপরে যে জীবনের স্রোত বয়ে যেতে থাকে, তাতে দর্শক সমাজের উৎসাহ উত্তেজনা বিদ্রূপ হাততালি বিন্দুমাত্রও সঞ্চারিত হতে পারে না। টি. এস. এলিয়ট নির্বাক ছবির আমলে এবং তাঁর 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' কাব্যরচনার প্রায়

সমসাময়িককালে চলচ্চিত্রের চরিত্রের এই একতরফা ব্যাপারটাকে তাঁর সমগ্র চরিত্র হিসেবে দেখে চলচ্চিত্রকে জীবনের শিল্পরূপ থেকে বাদ দিয়েছিলেন। নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যে তফাৎ এবং জীবন্ত শিল্পকলার আসল সমঝদার হিসেবে সাধারণ শ্রমজীবী সমাজের যে সক্রিয় ভূমিকা, সেই দুটি দিককে সামনে এনে তিনি লিখেছিলেন, "একজন শ্রমজীবী চলচ্চিত্রগৃহে গেলে তার মনটা অর্থহীন বাজনায় নিবীর্য হয়ে যায় এবং পর্দার ওপরের ঘটনাগুলি তার মস্তিষ্কের আয়ত্তের বাইরে নিদারুণ দ্রুতগতিতে ঘটে যেতে থাকে। শ্রমজীবী দর্শক একতরফাভাবে শুধু গ্রহণই করে, দেয় না কিছুই। জীবনে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।" এই প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন আরও যে, শ্রমজীবীরা গানের জলসায় গলা মেলাতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রে তার কোন সুযোগ নেই। অবশ্য টি. এস. এলিয়ট এই অভাবকে স্ববিরোধিতা মনে করেন নি। সেদিন তাঁর কাছে চলচ্চিত্র এবং জনতার সম্পর্কহীনতা বলে মনে হয়েছিল এই দিকটিকে। তবে তাঁর কথার মধ্য দিয়ে জৈবিক সম্পর্কের অভাবের কথাটা যে বেরিয়ে এসেছে, এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। টি. এস. এলিয়টের মতো নেতিবাচক মনোভাব না থাকলেও এবং চলচ্চিত্রের প্রতি চূড়ান্ত অনুরাগী এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের চের্কাসভ চলচ্চিত্র এবং নাটকের মধ্যে যে তফাৎ টেনেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, তাতেও দেখা যাবে, চলচ্চিত্রের উপরোক্ত নৈসর্গিকতা একটা স্ববিরোধিতা এবং সমস্যা বিশেষ। একই সঙ্গে চলচ্চিত্র এবং নাটকের অভিনেতা হিসেবে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে চের্কাসভ দেখিয়েছেন, যে কোন একটি নাটকের অভিনয়ে দর্শক-সমাজের সঙ্গে অভিনেতার পারস্পরিক প্রভাবপ্রসূত ও অনবরত পরিবর্তনশীল সৃজনশীল বিনিময়ের মধ্যে নতুনতর বিকাশের সুযোগ আছে; কিন্তু চলচ্চিত্রে অভিনয় করার পরে একবার ছবি তোলা হয়ে গেলে আর সেখানে দর্শকসমাজের সঙ্গে অভিনেতার দেওয়া-নেওয়া সংযোগ প্রসূত পরিবর্তন পরিবর্ধনের কোন সুযোগই থাকে না। কারিগরি দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চের নাটকের গতিশীলতার তুলনায় চলচ্চিত্রের আয়োজন নিয়োজনের প্রায় সীমাহীন বিস্তার থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র একদিক দিয়ে অভিনেতা ও দর্শকের সম্পর্কের ব্যাপারে অনমনীয়।

চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় স্ববিরোধিতা নিহিত এর ব্যবসায়িকতার ধারায়; পুঁজিবাদী মুনাফা অর্জন-সর্বস্বতার ব্যবসায়িকতার এই ধারা প্রধানত দুইভাবে চলচ্চিত্রকে দর্শক-জনতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একতরফা পরিবেশনায় নিয়োজিত করে আসছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই এই রীতি শেকড় গেড়ে রয়েছে। দর্শকসমাজ ক্রমবর্ধমান হারেই দর্শনীর টাকা চিত্রগৃহের বাইরে টিকেট বাতায়নে জমা দিচ্ছে। একমাত্র এটাই বাস্তব এবং দুই তরফা। চলচ্চিত্র-গৃহে ঢুকবার পরে সেখানে আর কোন কিছু দেওয়ার অবকাশ নেই। ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র বাস্তব নিরপেক্ষ অথবা বাস্তব-বিরোধী স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টি করে তাতে দর্শক সমাজকে অভিভূত করে রেখে দেয়; আবার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম উৎকণ্ঠার পর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে দর্শকের মনটাকে যেন বড়শীতে গেঁথে নিয়ে খেলিয়ে বেড়ায়। সুখস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রের এই ব্যবসায়িক ধারা জনতার মধ্যে দর্শককে একক, বিচ্ছিন্ন এবং আত্মনিবদ্ধ করে ফেলে। চলচ্চিত্র এখানে

নিজে নিরাসক্ত হলেও দর্শক এতে এতো বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে প্রেক্ষাগৃহের জনতাকে তো ভুলে যায়ই, বাইরের সমাজ সংসার এবং দেশ ও পৃথিবীকেও বিস্মৃত হয়। শুধু তাই নয়, সে হয়ে পড়ে আত্মবিস্মৃতও। যৌন আবেদন এই জৈবিক আত্মবিচ্ছিন্নতার মূল উপকরণ হিসেবে নিয়োজিত হয়েছে। তাছাড়া, নিছক কল্পনাসর্বস্ব ইচ্ছাপূরণের ভাবলৌকিকতার ফানুসের খেলাও এখানে কম নয়। দর্শক-নরনারী তাদের আশাভঙ্গের ঘাটতি পূরণ করে এখানে, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে অনেকটা অফিম সেবনের প্রক্রিয়ায়। এর মোহাবেশ বাস্তব জীবনেও তাদের ঘিরে রাখে। চলচ্চিত্রের হিরো বা নায়ক অলৌকিক ও অসাধ্য সাধনের ক্ষমতার অধিকারী। হিরোয়িন বা নায়িকা চিরযৌবনা উর্বশী। দার্শনিক ভাষায় সুখস্বর্গের নাম 'সাংগ্রিলা'। আটপৌরে ভাষায় ব্রিজিট বার্ডোট কিংবা ক্লার্ক গেবল। চলচ্চিত্রের স্বপ্ন আর উৎকণ্ঠার ধারায় জনতা উদভ্রান্ত, উৎক্ষিপ্ত। এই চলচ্চিত্রের ধারা জনতাকে জীবনবিমুখ, জগৎবিমুখ, জনতাবিমুখ করে রাখার চেষ্টা করে আসছে। জনতার মননশক্তিকে তছনছ করে দেবার চেষ্টা করে আসছে। এখানে দ্বিতীয় স্ববিরোধিতা প্রথম স্ববিরোধিতাকে কাজে লাগাচ্ছে। অর্থাৎ দর্শক শুধু নেবে, দেবে না কিছুই।

২.

চলচ্চিত্রের এই প্রধানত দ্বিবিধ স্ববিরোধিতাকে কাটিয়ে উঠে অথবা অপসারিত করে চলচ্চিত্রেও দর্শক এবং জনতার সম্পর্ককে দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে জীবনের শিল্পরূপ হিসেবে শতদলের মতো বিকশিত করে তোলার চেষ্টাও চলে আসছে গত সত্তর বছর ধরে। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রের প্রায় জন্মাবধি না হলেও অন্তত গত পঞ্চাশ বছর ধরে, বিশেষ করে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী মুনাফা বৃত্তি ঝাড় বংশ লোপ পাওয়ার দরুন এবং জনগণের ব্যাপক আশাবাদী বিপ্লবী উদ্যোগের পটভূমি গড়ে ওঠায় চলচ্চিত্রের স্ববিরোধিতা থেকে মুক্তিলাভের ভিত্তি তৈরি হয়। কিন্তু শুধু একথাটা বলাটাই সত্যের অপলাপ হবে। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও এবং খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই স্ববিরোধিতা থেকে চলচ্চিত্রকে মুক্ত করার জন্য চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের এবং শিল্পীদের প্রগতিশীল একাংশের সাধনা নিয়োজিত হয়ে এসেছে। তফাৎটা হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্রী দেশে ব্যবসায়িক, অবাস্তব ও স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টির ধারার বিলোপসাধন করা হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশে নিষ্ঠাবান বা বামপন্থী নির্মাতা ও শিল্পীরা স্বপ্নজগতের ধারার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, জনতাকে শিল্পকলার সংস্পর্শে বাস্তব নবজীবনের অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্রের নৈসর্গিকতা বা একতরফা প্রবণতার দিকটাকে হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র এবং দর্শক সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক যাতে সক্রিয় সংগ্রামী সৃজনশীলতার উপাদান হিসেবে কাজ করে, সেজন্য উভয় ক্ষেত্রেই চেষ্টা চলে আসছে। জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স, জাপান এবং বৃটেনে নয়াবাস্তববাদ ও নবতরঙ্গবাদ এই প্রচেষ্টারই বিকাশের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার কৃত্রিমতার ভেজাল রয়েছে। কিন্তু স্বপ্নজগৎ থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং দর্শক সমাজের মধ্যে সচেতনতার

বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এখানে নিষ্ঠার অভাব নেই। 'বাইসাইকেল থিফ' আকাশ থেকে পড়েনি। সে এসেছে চলচ্চিত্রে স্ববিরোধিতা কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। চার্লস চ্যাপলিনের আত্মজীবনী পড়তে গিয়ে একটা দিক অনেকেরই নজরে পড়বে। এই বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিল্পী দর্শকসমাজকে যেমন খুশী খেলাতে ও নাচাতে পারেন, সে সম্মোহন শক্তি তাঁর মধ্যে আছে। কিন্তু আত্মজীবনীতে দেখা যাবে, এই শিল্পী বরং বিপরীত আচরণ করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত ছবিগুলির প্রথম মুক্তির দিনগুলি হয়েছে তাঁর কাছে যেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মনে উৎকণ্ঠা। দর্শকরা কিভাবে ছবিটিকে গ্রহণ করলো, সে কথা পুরোপুরি জানতে না পারা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাননি। এই অস্বস্তি যাঁর মনে জমা হয়ে আছে, তিনি কি কখনো বিস্মৃতির ছবি তৈরি করতে পারেন পরিহাস এবং রগড়ের ছবিতেও। তাঁর ছবির ধারা মনমতো না হওয়াতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৭ সালে কোটিপতি শাসকচক্র আবিষ্কার করলো, হলিউডকে কমিউনিস্টরা দখল করে ফেলেছে। আসল কথাটা এই যে, স্বপ্নের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তব জীবনের ছবি তৈরির দিকে ঝোঁক বেড়ে যাচ্ছিল, যেটা কায়েমী স্বার্থের পছন্দসই হয়নি। জন হাওয়ার্ড লসন, ড্যালটন ট্রাম্বো, আলবার্ট মালটস, আলভা বেসি এবং ক্লিফোর্ড ওডেৎসের মতো চিত্রনাট্য রচয়িতাদের সাহয়তায় চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীদের একাংশ যেসব ছবি তৈরি করেছেন, সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে এবং বাইরে চলচ্চিত্রের মানকে দিয়েছে উন্নীত করে, চলচ্চিত্রের স্ববিরোধিতাকে কাটিয়ে উঠতে করেছে সহায়তা। চিত্রনাট্য রচয়িতাদের কারাগারে পাঠিয়ে এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ছাঁটাই করে এই জীবনশিল্পপ্রবণতাকে ধবংস করতে পারেনি কোটিপতিরা। এই ধারা অদম্য। ভবিষ্যতে এর বিকাশকে ব্যবসায়িকতার ধারা আর কোণঠাসা করে রাখতে পারবে না।

কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে বিপ্লবী ধারার সূচনা হয়, তা পুঁজিবাদী ব্যবসায়িকতার ধারার নাগালের বাইরে থেকেছে। বিশ্বের সমস্ত সৃজনশীল সংগ্রামী ও নিষ্ঠাবান শিল্পকলা-প্রয়াসকে এই বিপ্লবী ধারা প্রেরণা দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

এই ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে রয়েছেন জিগা ভের্টভ, সার্জি আইজেনস্টাইন এবং অন্যান্য। এঁদের একজনকে আরেকজন থেকে পৃথক করা যায় না। সোভিয়েট চলচ্চিত্রের সমস্ত নির্মাতা ও কারিগর এবং শিল্পী এই জীবনের শিল্পরূপ গড়ে তোলার যৌথস্রষ্টা। বিশ্বচলচ্চিত্র শিল্পের পঞ্চাশবর্ষ উপলক্ষে আইজেনস্টাইন একথাটা স্মরণ করিয়ে দেন ১৯৪৭ সালে। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন যে, জনগণই তাঁর চলচ্চিত্রের স্রষ্টা। জনগণ অর্থাৎ দর্শক সমাজ। এই সমস্ত স্রষ্টার মধ্যে এখানে দুজনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে।

সেভিয়েট চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা জিগা ভের্টভ মনে করতেন, চলচ্চিত্র কাজ করবে চোখের মত। একে তিনি 'চলচ্চিত্র চক্ষু' হিসেবে দাখিল করেছিলেন। তিনি এর যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য।

জিগা ভের্টভের ভাষায়: 'এই চলচ্চিত্র চক্ষুর সংজ্ঞা কি? প্রথমত এবং প্রধানত এই চলচ্চিত্র-চক্ষু হচ্ছে ভালভাবে দেখা। চলচ্চিত্রের ক্যামেরার সাহায্যে আমরা যে ধাবমান রূপকল্পগুলিকে দেখি, সেগুলিকে ব্যাখা করা, জীবনের মধ্যে আমাদের নিজেদের এমনভাবে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করা, যাতে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার ধারণারই আর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

চলচ্চিত্র চক্ষু হচ্ছে জীবনের অতিরিক্ত জটিল আঁকাবাঁকা গতিপথে আলো ফেলা এবং তাঁর হিসেব নেয়া। এ হচ্ছে যে কোন দেশের অধিবাসীদের যে কোন স্তরের মধ্যে এবং ভূপৃষ্ঠের যে কোন জায়গায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় ঘোষণা এবং সমস্ত সামাজিক অভিজ্ঞতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখার সামর্থ্য।

চলচ্চিত্র-চক্ষু হচ্ছে চলচ্চিত্র দর্শকদের সংগ্রামী হুঙ্কার। এই দর্শকেরা হচ্ছে সেই মানুষ, যারা জনগণের দৃষ্টিকে দেখতে পায় এবং তৈরি করে তোলা সেই দৃষ্টিকে।

'এই চলচ্চিত্র-চক্ষুর মধ্যে দিয়ে আমরা বিশ্বের মেহনতী মানুষের বিপ্লবে অংশ গ্রহণকে অভিব্যক্ত করি সেই দিনগুলিকে নিকটতর করার উদ্দেশ্য নিয়ে, যেদিন শ্রমজীবী জনগণ জীবনকে পরিচ্ছন্নভাবে এবং সঠিকভাবে দেখতে শিখবে নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করে। এইখানেই নিহিত রয়েছে আমাদের কার্যক্রমের অসাধারণ সাফল্য বিশ্বের সর্বহারা মেহনতী মানুষের বিপ্লবের নামে জগৎকে দেখা এবং দেখাতে পারা।'

সোভিয়েট বিপ্লবের পরে জনগণের শিল্পকলার সমস্ত বিভাগে সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় রচনায় যে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত প্রয়াস শুরু হয়, তাকে ভিত্তি করেই এবং তাকে নির্ভেজালভাবে সামনে এনেই ভের্টভ স্ববিরোধিতামুক্ত চলচ্চিত্র ধারার প্রবর্তন করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সার্জি আইজেনস্টাইন এসে একে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেই এর মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে সৌন্দর্যের উপাদান রয়েছে ধরে নিয়ে এর সঙ্গে শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগের শিল্পী ও উপাদানের যোগাযোগ ঘটিয়ে সত্যকে নতুনতর সৌন্দর্যে এবং জ্ঞানে অভিষিক্ত করে তোলেন। চলচ্চিত্র-চক্ষুতেই আইজেনস্টাইন শিল্পীর কারুকর্ম ও যাদু স্পর্শ প্রয়োগ করেন। আইজেনস্টাইনের ভাষায়: 'চলচ্চিত্র-চক্ষুর সৌন্দর্যানুভূতি থেকে চারপাশের জগতের নিসর্গ সম্পর্কে ধারণার রূপকল্প-প্রয়োগ মারফত শিল্পীর চিত্র রূপায়ণে এই যে বির্বতন, একে আমাদের সোভিয়েট চলচ্চিত্রের বিকাশের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে।' আইজেনস্টাইন দর্শককে সচেতন করার ওপর বিশেষভাবে জোর দিলেন। দর্শকের বুদ্ধির ভিত্তিকে জাগ্রত করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। এ জন্যই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু এবং কাহিনীকে বহুধারায় ভাগ করে দর্শকের প্রতি মুহূর্তের আবেগ ও মননের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন এবং তাঁর এই 'মন্তাজ' প্রথা মারফত তিনি চলচ্চিত্রের একতরফা চরিত্রের দিকটাকে দুই তরফা করলেন। এতে যে গতি তিনি সঞ্চারিত করলেন, তাতে চের্কাসভের আপসোস হয়তো মিটল না, কিন্তু দর্শক সমাজ এবং চলচ্চিত্র ঘনিষ্ঠতর হল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভের্টভ এবং আইজেনস্টাইন তথা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী চলচ্চিত্রের রূপকাররা চলচ্চিত্র ও দর্শকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দ্বিতীয় ধরনের

স্ববিরোধিতা অনেকাংশে মিটিয়ে এনেছেন। নৈসর্গিকতাকে নমনীয় ও সচেতন করেছেন দর্শককে উদ্যোগী করে। আইজেনস্টাইনের চোখে দর্শকের স্থান যে কোথায়, সে সম্বন্ধে তাঁর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দাখিল করা যেতে পারে এখানে:

"ম্যাক্সিম গোর্কি এক জায়গায় বলেছেন, কিভাবে লিখবো? এ প্রশ্ন নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। অবশ্য আমার সামনে প্রশ্নটা সূত্রায়িত হয়ে রয়েছে এবং সে সূত্র হচ্ছে এই : আমি এমনভাবে লিখবো যাতে মানুষ সে যেই হোক না কেন, কাহিনীর পৃষ্ঠা থেকে তার অস্তিত্বের সেই সজীবতার শক্তি এবং তার আধোকল্পনাময় সেই বাস্তবতার উন্মেষ নিয়েই বেরিয়ে আসতে পারে, যার মধ্যে দিয়ে আমি তাকে দেখেছি এবং বুঝেছি।"

'মন্তাজ' পদ্ধতির শক্তি হচ্ছে এখানে যে, উপরোক্ত সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই পদ্ধতি দর্শকের আবেগ অনুভূতি এবং মনকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে।

চলচ্চিত্রের জনতা প্রবণতাকে এইভাবে মুক্ত রাখার এবং মুক্ত করার ব্যবস্থা আমাদের সামনে রয়েছে।

৩.

দর্শক সমাজ তথা আমাদের দেশের দর্শক সমাজও এই মুক্তধারাকে প্রসারিত করার প্রয়াসী হতে পারে। আমাদের দেশ হচ্ছে এখনও স্বপ্নছবির বাজার। দেশি এবং বিদেশি স্বপ্নছবিতে আমরা নানা কারণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছি। এই ব্যবসায়িক ধারাকে অপসারিত করতে না পারলেও কোণঠাসা করা দরকার। এই কাজ অবশ্য সহজ নয়। তবে আলোর বৃত্তকে প্রসারিত করতেই হবে।

চলচ্চিত্রে দিক রূপ ও কর্ম নির্ণয়ে চলচ্চিত্র সংঘ

সার্জি আইজেনস্টাইনের উক্তি অনুসারে, চলচ্চিত্র আর পারমাণবিক বিদ্যা আমাদের শতাব্দীর দুটি যুগান্তকারী সৃজনাত্মক পদক্ষেপ।

তবে এরা উভয়েই বিজ্ঞানের আবিষ্কার হলেও চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই মানবিক এবং এ পর্যন্ত পারমাণবিকবিদ্যা কম বেশি মানবনিরপেক্ষ থেকেছে। পারমাণবিকবিদ্যা বরং আরও মানব সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। মানব হিতকর কাজে এর প্রয়োগ ঘটলেও ললিতকলা এর সংসর্গ থেকে শতহস্ত তফাতে থাকতে চায়। কিন্তু চলচ্চিত্র যখন ইলেকট্রনবিদ্যার যাবতীয় ফলশ্রুতি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণের সমস্ত আবিক্রিয়াকে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নিচ্ছে, তখন সে ললিতকলার সমস্ত বিভাগকেও নিজের মধ্যে একাকার করে নিচ্ছে। পারমাণবিকবিদ্যা চলচ্চিত্রের মারফত মানব-পক্ষীয় হচ্ছে। চলচ্চিত্রের আবেদন এবং সম্ভাবনা আমাদের যুগকে আবদ্ধ করে ফেলেছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্ত্রীতে।

এইভাবে একত্রিত হওয়াতেই ললিতকলার সমস্ত বিভাগের সৃজনশীল কর্মীরা চলচ্চিত্রের কাছে তাঁদের দাবী পেশ কারার অধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। এমন কি, চলচ্চিত্রের নির্মাণের ব্যাপারেও তাঁরা হয়েছেন অংশীদার। লোক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যানুভূতি এর মধ্যে পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই একে আরও বেশি করে কাছে পাওয়ার দাবী প্রখর হয়ে উঠেছে লোকসাধারণের তরফ থেকে। চলচ্চিত্রের সর্বজনীন শিল্পরূপ সর্বজনকে দিয়েছে সেই অধিকার, যা তারা চলচ্চিত্র নির্মতাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন।

আইজেনস্টাইন যখন সোভিয়েট ইউনেয়নের চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁদের সর্বস্বপণ করে কাজ করার জন্য, তখন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং চলচ্চিত্র দর্শকদেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন বৈকি। টেলিভিশনের যুগে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিপুল-সম্ভাবনাকে সামনে রেখে তিনি বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্রের বিপুল ও জটিল সম্ভাবনা ঠিক তেমনিভাবে মানব সমাজের আয়ত্তাধীন হবার অপেক্ষায় রয়েছে, যেমন করে পদার্থবিদ্যার নব-আণবিক যুগের মানব হিতকর দিকগুলো রয়েছে সমগ্র মানব সমাজের আয়ত্তাধীন হওয়ার অপেক্ষায়।'

চলচ্চিত্রের আইজেনস্টাইন কর্তৃক উত্থাপিত সমগ্র মানবসমাজের এই আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা নিশ্চয় একটা কল্পনাবিলাসে দরদী অভিব্যক্তি হিসেবে আসেনি। চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কারিগরদের জন্য এই প্রস্তাবিত ভূমিকা যৌথ উদ্যোগের সেই তাগিদ হিসেবে সামনে এসেছে-যাতে নায়ক এবং নায়িকা থেকে শুরু করে শব্দযন্ত্রী পর্যন্ত সবাই অনুপ্রেরিত। দর্শকদের কাছে এই আহ্বান এসেছে সচেতন ও সংগঠিত উৎসাহ এবং মূল্যায়ন ও রসাস্বাদনের দায়িত্ব নিয়ে। আমরা চলচ্চিত্র দর্শক সংঘকে এই দ্বিতীয় দায়িত্বটি অনায়াসে দিয়ে দিতে পারি। এই ধরনের সংঘে কারা থাকবেন তাও আমরা বলে দিতে পারি। এতে থাকবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং দর্শকেরা, কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পীরা, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিকেরা। এই ধরনের চলচ্চিত্র সংঘগুলো হবে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যানুভূতি মৌচাক। এই মধুচক্র থেকে লোকসাধারণের কোন স্তরকে, তাঁরা শিল্পী হন কিংবা শ্রমজীবী হন, যদি দূরে সরিয়ে রাখা যায়, যদি লোক-সাধারণের কোন অংশকে চলচ্চিত্র সংঘের মতামত গঠন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে সে সংঘ হবে পোকায় খাওয়া। এর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কথাটাকে এখানে আরো পরিষ্কার করে নিয়ে আসা যাক। চলচ্চিত্রের রসাস্বাদন ও মূল্যায়নের জন্য গঠিত সংঘকে হতে হবে উন্মুক্ত সংস্থা। যে মুহূর্তে একে একটা সংকীর্ণ বৈঠকখানায় আবদ্ধ করা হবে, সে মুহূর্তেই চলচ্চিত্রের শিল্পরূপের সৃষ্টির সঙ্গে এর নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের দেশের সমস্যাটাও এই যে, আমাদের চলচ্চিত্রের রসচক্রগুলিতে কৃত্রিম আভিজাত্যের দিকে কিংবা পল্লব-গ্রহিতার দিকেই ঝোঁক। এই কারণে রসিক ব্যক্তিদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের চলচ্চিত্র সংঘের প্রচেষ্টার ফল হয়েছে টবের ফুল গাছের মতো নিছক সান্ত্বনা। অবশ্য এই ব্যাপারটা শুধু যে আমাদের দেশেই ঘটেছে তা নয়, অনেক দেশেই এমন হয়েছে। এই প্রবণতার একটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পটভূমিও রয়েছে। এখানে হস্তক্ষেপ করাটা মনে হয়েছে অসম্ভব।

চলচ্চিত্র তথাকথিত স্থূলচারী জনতার ললিতকলা হিসেবেই জন্ম নিয়েছিল। আমাদের শতাব্দীর শুরুতে ফ্রান্সে মিলিয়ে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এডউইন পোর্টার যে কাজ করেছিলেন, সেগুলি জনতার চারু অনুভবের মাধ্যমেই পরিবেশিত হয়েছিল। এই চিত্রনির্মাতাদের মনের মধ্যে দর্শক হিসেবে যারা স্থান পেয়েছিল, তারা ছিল মেলা আর জলসাতে সমবেত জনতা। ১৯১৪ সালে চার্লস চ্যাপলিনের আলোর আশার মূলে রয়েছে এই সত্য। সেই সব দিনের অল্প সময়ের ছায়াছবিগুলি ছিল বাহ্যত স্থূল ও কর্কশ। কিন্তু তাদের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতো, তা ছিল জুঁই ফুলের মতো তরতাজা। অলস স্থূলতার আমদানী হলো সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে লক্ষপতি আর কোটিপতিরা এর মধ্যে পেলো মুনাফার গন্ধ। এই লক্ষপতি আর কোটিপতিরা যে সব ছবিতে হাত দিল সেই সব ছবিতেই তারা জনতার কুসুম-কোমল হৃদপিণ্ডকে উপড়ে ফেলল। 'ব্যবসা' কথাটা আসর জুড়ে বসলো। একচ্ছত্র পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রকে আফিমের বড়ি হিসেবে পরিবেশন করা শুরু করলো। আমাদের শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমেরিকার আপটন সিনক্লেয়ারের লেখা 'তেল' উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদী একচ্ছত্র পুঁজিপতিদের চলচ্চিত্র-দর্শনের ভোগাত্মক বর্ণনা রয়েছে।

অবশ্য একথাটা এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্পী এবং পরিচালক কিংবা কারিগররা মুনাফাখোরদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। এঁরা মানবতার শিরশ্ছেদে রাজী হননি। এঁরা মূল স্রোতধারাকে মরতে দেন নি, যদিও এই স্রোতধারা অনেক সময় দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে। এঁরা সংগঠিতভাবেই প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন। এঁদের যখন আন-আমেরিকান বা দেশদ্রোহী বলা হয়েছিল, সে কলঙ্কে এঁরা ভ্রূক্ষেপ করেননি। এঁরা মাথা পেতে নিয়েছিলেন নির্বাসনকে, বেকারত্বকে, অনাহারকে। চার্লস চ্যাপলিন অস্বীকার করেছিলেন হলিউডে ফিরে যেতে, যদিও হলিউড ছিল তাঁর শিল্পীজীবনের কর্মকেন্দ্র। জন হাওয়ার্ড লসন, আলবার্ট মালটজ এবং আরও এমনি শত শত বিদ্রোহী শিল্পী ও লেখক শিল্পীদের স্বাধীনতা এবং জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

এ খবর এবং তাঁদের তৈরি ছবি অবশ্য আমাদের কাছে কমই পৌঁছেছে। আমরা হাড়ে হাড়ে জেনেছি, সাম্রাজ্যবাদী একচ্ছত্র পুঁজিপতি চক্রগুলি কি ধরনে জঘন্য ছবি আমাদের ওপর চাপিয়েছে। আমরা আফ্রো-এশীয় আর ল্যাটিন আমেরিকার বাসিন্দারা দেখেছি আমাদের দেশকে আফিম-ছবির মুনাফা লোটার বাজার হিসেবে মনে করে এসেছে মুনাফাখোরেরা। মর্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার এই যে, স্বাধীনতার পরেও আমাদের এভাবেই চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। পাক-ভারত উপমহদেশের লক্ষপতিরা সাম্রাজ্যবাদী একচ্ছত্র পুঁজিপতিচক্রের তল্পীবাহক হয়ে এই আফিম ছবির বাজারই বড় করেছে। স্বাধীন পাকিস্তান এবং স্বাধীন ভারতে এই লক্ষপতিদের হাতে রয়েছে চলচ্চিত্রের চাবিকাঠি।

বৃহৎ পুঁজির বিভিন্নচক্রী মহলের ষ্টিমরোলারের সম্মুখীন হয়ে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের দর্শক সংঘ কিংবা রসচক্রগুলি মানবতার পতাকাকে তুলে ধরেছে।

প্রত্যক্ষভাবে চলচ্চিত্র সৃষ্টির মধ্যে এঁরা নিজেদের দাখিল করতে পারেনি, তাই এদের প্রভাব থেকে গিয়েছে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য চলচ্চিত্রের জগতে অন্যান্য শক্তি কাজ করছে এবং সেগুলি আমাদের পক্ষে থাকবে। আটচল্লিশ বছর আগে সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যুদয় বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী একচ্ছত্র পুঁজিপতিচক্রের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক গণচীনের অভ্যুদয় এই শেকল ছেঁড়ার ব্যাপারটাকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। আইজেনস্টাইন ছিলেন একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। সোভিয়েট বিপ্লবে তাঁর নবজন্ম হলো। কারণ, সোভিয়েট ললিতকলা জনগণের মধ্য থেকে নতুন শিল্পীদের ডাক দিচ্ছিল। আইজেনস্টাইন প্রথমে রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেন পরিচালক হয়ে, তারপর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন চলচ্চিত্রকে। আমাদের শতাব্দীর শুরুতে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপের পুরোগামীরা যে মানবতার ধারাকে উন্মোচিত করেছিলেন, আইজনস্টাইন তাকে সম্প্রসারিত করলেন। পুরোগামীদের একজনের নাম চার্লস চ্যাপলিন, যিনি আজও প্রভাতের শুকতারা।

চলচ্চিত্রের নব নব দিক রূপ ও কর্মধারা এইভাবে দেশে-দেশান্তরে সামনে এসেছে। নতুন গুণান্বিত ছবি তৈরি হয়েছে, উৎরে গিয়েছে। এদের পেছনে কাজ করেছে নব-বাস্তবতাবাদ। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে উৎসারিত হয়েছে এই ধারা বিভিন্ন দেশে। ইটালি, ফ্রান্স, জাপান এবং সুইডেনে উঁচু মানের ছবি তৈরি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রানুরাগীর সহায়তার প্রশ্নকে চলচ্চিত্রের পেশা থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা যায়নি। ইটালির চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আলবার্তো মোরাভিয়ার নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি চলচ্চিত্রের জন্য যে সত্য এবং গভীরতর সত্যের জন্য তাগিদ দিয়েছেন, ইটালির নব বাস্তবতাবাদী ছবিতে তা কাজ করেছে। সত্যজিৎ রায়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি এসেছেন সোজাসুজি চলচ্চিত্রের রসচক্র থেকে চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। তিনি আজ 'তারকাও' তৈরি করেছেন। লক্ষপতি মুনাফাশিকারীরা এতদিন প্রচার করে এসেছে যে, তারকারা বেরিয়ে আসে তাদের সিন্দুক থেকে। সত্যজিৎ রায় এর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর।

চলচ্চিত্রের এই মুক্তধারার মূলে যে কারণটি কাজ করেছে, তার অবতারণা প্রথমেই করা হয়েছে। কারণটি এই, চলচ্চিত্র যদিও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, তবু এ অন্তঃশীল এবং আঙ্গিকগত প্রসারণ ক্রিয়ার উৎস হচ্ছে মানবিক সম্পর্ক। বাইরের লোক বলে এতে কিছু নেই। যাকে আমরা বাইরের লোক বলি তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে উঁচু মানের ছবি তৈরি করার কর্মকাণ্ডে। কাজটি হচ্ছে স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের কাজ।

আইজেনস্টাইনের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি জাপানের কাবুকী নাট্য এবং ছবির মতো কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জাপানী সংস্কৃতিতে চলচ্চিত্রের যে উপকরণ রয়েছে, সেগুলি রয়ে গিয়েছে জাপানি সিনেমা ঘরের বাইরে।' জাপানী সিনেমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'জাপানের সিনেমা হচ্ছে কতকগুলি ব্যবসায়ী সংঘ, কতক পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ, অমুক এবং অমুক তারকা, অমুক এবং তমুক নাটক।'

আইজেনস্টাইন জাপানী কাবুকী থেকে চলচ্চিত্র গড়ার কজে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। কাজেই আমাদের চলচ্চিত্র সংঘগুলির নিরুৎসাহিত হওয়ার কোন কারণ থাকবে না, যদি তারা আমাদের লোকজীবনে এবং লোকশিল্পকলায় যোগরক্ষা করে চলতে পারে। আমাদের চলচ্চিত্র সংঘের ভূমিকা অপরিহার্য। আমাদের জঙ্গম জনতা আছে। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ আছে। শুধু মনে রাখতে হবে যে, সংকীর্ণতা যেন আমদের কখনো পেয়ে না বসে। আমরা যেন কখনো না বলি, 'আমাদের একা থকতে দাও।'

নামকরা উপন্যাসের নামকরা ছবি

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের মৃত্যুর পরে একদিকে যেমন তাঁর লেখা নিয়ে বিশ্বের সব দেশে নতুন করে আলোচনা চলছে, তেমনি তাঁর কয়েকটি প্রখ্যাত বই নিয়ে তোলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও নতুনভাবে পর্যালোচনা হয়েছে। একটি সাহিত্যিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িক পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, হেমিংওয়ের 'দি ওল্ডম্যান এন্ড দি সি' ছাড়া অন্য কোন বইয়ের চিত্ররূপ লেখকের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি।

বস্তুত হেমিংওয়ের সবচেয়ে নামকরা উপন্যাস 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস।' এই উপন্যাসের প্রথম যে চিত্ররূপ হলিউডের সেরা এবং প্রখ্যাত প্রযোজক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সহায়তায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার আগে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, তাতে উপন্যাসের কাঠামোটা ছাড়া আর সবকিছুই ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই উপন্যাসটিরই চিত্ররূপের যে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে, তাতে অবশ্য লেখকের বক্তব্যকে যথাযথ রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি দেখে হেমিংওয়ে কিছুটা খুশি হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি তাঁর বই নিয়ে তোলা ছবি কোন ছবিঘরে বেশিক্ষণ বসে দেখতে পারতেন না; উঠে বেরিয়ে যেতেন।

হেমিংওয়ের লেখা এবং সেই লেখার ওপর ভিত্তি করে তোলা ছবির মধ্যে এই ধরনের মিলের অভাব স্বভাবতই সেই পুরনো প্রশ্নটাকে টেনে আনতে পারে। উপন্যাসের যথাযথ চিত্ররূপ কতদূর সম্ভব? আর এই প্রশ্নেরই সূত্র অন্যান্য প্রশ্নেরও অবকাশ সৃষ্টি করে। যেমন, উপন্যাসের যথাযথ রূপ চলচ্চিত্রে উপস্থিত করা কি যুক্তিসঙ্গত? উপন্যাস ও চলচ্চিত্র, এই দুটি শিল্পরূপ কি পৃথক নয়? বিশেষ করে যেসব অবিস্মরণীয় উপন্যাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা, প্রতিটি পংক্তি অবিচ্ছেদ্য, তাকে তাৎপর্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে অনেকাংশে অপসারিত করা কি শিল্পরূপ বোধসম্মত?

প্রশ্নগুলি নিয়ে শুধু বিশেষজ্ঞদের নয়, সর্বসাধারণের পক্ষেও আলোচনার একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, তিরিশের দশক থেকেই কিংবা আরও কিছু অধিক কাল যাবৎ আমেরিকার হলিউড অথবা অন্যান্য দেশের বিভিন্ন চিত্রসংস্থা বিশ্বের নামকরা উপন্যাসগুলিকে নিয়ে উঁচুদরের ছবি তুলে আসছে। উপন্যাস নিয়ে তোলা ছবি আমাদের চোখসহ হয়ে গেছে। এছবির ব্যাপারে আমরা মোটামুটি জানি।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ধরনের ছবির রেওয়াজ শুরু হয়েছিল কতকগুলি অনিবার্য কারণে। প্রথমত লিও টলস্টয়, চার্লস্ ডিকেন্স, সিনক্লেয়ার লুইস, ভিক্টর হিউগো ও এমিল জোলা এবং পার্লবাক প্রমুখ ঔপন্যাসিকের নাম কিংবা 'রিসা', 'রেক্সন', 'টেল অব টু সিরিজ', 'এরোস্মিথ', 'লা মিজারেবলস', 'নানা' এবং 'গুড আর্থ' প্রমুখ বই-এর নাম ছবি তোলার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত চলচ্চিত্রের সামঞ্জস্য সাধন করে যে বিষয়বস্তুটি, এইসব উপন্যাসে তার সংস্থিতি প্রবল হওয়ায়, চলচ্চিত্র নির্মাতারা এ বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত বোধ করতে শুরু করেছিলেন যে, এদের নিয়ে তোলা ছবি সবসময়েই জমাট-বাঁধা থাকবে। তৃতীয়ত যেহেতু সবাক চলচ্চিত্রের জন্য দরকার পড়েছিল সংলাপের এবং যেহেতু উপন্যাস সাহিত্য গড়ে উঠেছে অন্যতম প্রধান উপাদান সংলাপকে ভিত্তি করে, সেজন্য সাবেক চিত্রনির্মাতারা উপন্যাসের চিত্র রূপায়ণকেই সহজতর উপায় বলে মনে করেছিলেন। চতুর্থত লিও টলস্টয়, ডিকেন্স, সিনক্লেয়ার লুইস, ভিক্টর হিউগো, এমিল জোলা ও পার্ল বাক প্রমুখ ঔপন্যাসিকের বইগুলি অতি বিশিষ্ট নায়ক-নায়িকা প্রধান হওয়ায় এদের মধ্যে হলিউডের চিত্র তারকাদের জন্য বহু উপযোগী মুখচ্ছবি ও চরিত্র পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অন্যান্য কারণ ছিল হয়তো এবং এখনো রয়েছে হয়তো। যেমন, চিত্রনির্মাতারা মনে করেছিলেন যে, উপন্যাসের মধ্যে যে নরনারীর সম্পর্কের নিগূঢ় বর্ণনা রয়েছে, তার সংযোগ চলচ্চিত্রকে করে তুলবে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এই বিশেষ আকর্ষণটাকে কোন কোন চিত্রনির্মাতা দেখেছিলেন একান্ত স্থূল দৃষ্টিতেই। এইসব নানাবিধ কারণ উপন্যাসের চিত্ররূপায়নের মূলে কাজ করে এসেছে অথবা আজও আসছে। এদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এদের নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত সাধারণ দর্শকমণ্ডলী মাথা না ঘামালেও যখন তখন খোঁজ করলেই বিস্তারিত জানতে পারেন।

আমরা যারা বাংলার ছবি দেখতে ভালবাসি, তাদের কাছেও আলোচ্য প্রশ্নের একটা পটভূমি দৃষ্টিগোচর রয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্র অবশ্য নির্বাক যুগেই উপন্যাস নিয়ে শুরু করেছিল তার শুভযাত্রা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চিত্ররূপ স্মরণীয়। সবাক যুগে বাংলা ছবির অগ্রগতিতে উপন্যাস যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' বাংলা ছবিকে শুধু একটা জ্বলন্ত বিষয়বস্তু দিয়েছিল তাই নয়, তাকে দিয়েছিল ভাববাদী বাস্তবের একটা বিশিষ্ট রূপধারা। তারপর সৌরীণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাবলা' এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' উপন্যাস বাংলা ছবিকে উত্তীর্ণ করে নিয়েছে বিশ্বের প্রথম সারির ছবিতে। আবার অনেক বাংলা উপন্যাসের চিত্ররূপ সার্থক হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস কিংবা শরৎচন্দ্রের আরো অনেক বই-এর চিত্র রূপায়ণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝির' যে রূপ 'ডে শ্যাল ডন' নামক ছবিতে দেওয়া হয়েছে, তাতে আমাদের মিশ্রপ্রতিক্রিয়া হয়েছে। কাজেই 'উপন্যাসের যথাযথ চিত্ররূপ সম্ভব কি না'–এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে আমরা বাংলা ছবির সাধারণ দর্শকমণ্ডলীও জড়িত হয়ে পড়েছি। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের মনে তাঁর নিজের লেখা বই-এর সাধারণ হলিউডি চিত্ররূপ যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, তার তীব্রতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এর কারণ আমরা আমাদের বহু পরিচিত বইগুলিকে

তাদের চিত্ররূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বই ও ছবির মিল ও অমিল দুই-ই আমাদের কাছে তীব্রভাবে উপস্থিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'দেবদাস' ছবি 'দেবদাস' উপন্যাসকে যথাযথ অনুসরণ করেছে। আবার সংসার ছবিও অপরাজিত উপন্যাসকে যথাযথ অনুসরণ করেছে। অথচ এই অনুসরণ করা এবং না করা উভয়েই পেয়েছে সার্থকতা। আবার অনুসরণ হোক বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হোক, দুইয়ের ব্যর্থতাও যে আমাদের চোখে বিঁধে রয়েছে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এ কথাটা অবশ্য আমরা সাধারণভাবে বুঝি যে, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের নির্মাণের উপকরণগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রের সংযোজক দুটি পৃথক ধারায় স্থাপিত থাকায় দুটি শিল্পরূপ স্বতন্ত্র থেকে যেতে বাধ্য। তাছাড়া, উপন্যাসের জন্ম হয়েছে যেমন চলচ্চিত্রের অনেক আগে, তেমনি আজ পর্যন্ত এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গতিপরিণতি এর মধ্যে ঘটেছে, যাদের নিয়ে উপন্যাস শিল্পের সমস্যার অন্ত নেই।

আবার অন্যদিকে, চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সমগ্র শিল্পরূপের ইতিহাসেই একটা সম্পূর্ণ নতুন সত্তা নিয়ে গড়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র যদিও অন্যান্য সমস্ত শিল্পরূপের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসকেও আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, তবু উপন্যাস এবং অন্যান্য শিল্পরূপ ব্যতিরেকেও তার বিকাশের নিজস্ব উপকরণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের চিত্ররূপ একেবারে নতুন জিনিস। এই জন্যই উপন্যাসকে চলচ্চিত্র মারফত জনপ্রিয় করে তোলা কিংবা চলচ্চিত্রকে উপন্যাসের মাধ্যমে মর্যাদা সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেন, তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান যে, এদের একের কাজ অপরকে দিয়ে পুরোপুরি মেটানো কিছুতেই চলতে পারে না। আবার এদের স্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়াসও যুক্তিযুক্ত কিংবা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

সুতরাং আমাদের বক্তব্যটা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের যে সংযোগ প্রথম মহাযুদ্ধের বছর দশেক পর থেকে ঘটেছে, তার কাছ থেকে আমরা এমন একটা কিছু দাবী করতে পারি না, যা থেকে মনে হতে পারে যে, আমাদের কাজ হচ্ছে দু'টি শিল্পরূপের একের সঙ্গে অপরের সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়া। এটা নিশ্চয় কেউ আশাও করেন না, সে তিনি যতই না কেন উপন্যাসের চিত্ররূপ সম্বন্ধে উৎসাহিত হন। উপন্যাসের যথাযথ চিত্ররূপের মধ্যে যথাসম্ভব পারস্পরিক সমঝোতা হচ্ছে একদিককার সার্থকতা ও ব্যর্থতার প্রশ্ন। এখানে একদিককার কথাটা বলছি এজন্য যে, উপন্যাস রচনায় চলচ্চিত্রশিল্পী যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে বিষয়টা আমাদের আলোচনাতে আসছে না।

আলোচ্য বিষয়কে এভাবে দেখলে এবং সোজাসুজি কিনারা করতে গেলে সঙ্গত বক্তব্য সম্ভবত এই হবে যে, উপন্যাসের যথাযথ চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব এবং যথাযথ চিত্ররূপের প্রয়োজনও রয়েছে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সংযোগই কাম্য। অবশ্য এখানে শিল্পরূপের উৎকর্ষসাধনের তাগিদ এমন একটা শিল্পরূপ-বহির্ভূত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, যাকে অপসারিত করতে না পারলে উপন্যাসের যথাযথ চিত্ররূপ তো দূরে থাকুক, শুধু কাঠামোতে কিংবা আংশিক উপকরণ নিয়ে উঁচুদরের

চলচ্চিত্র গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়ায় তখন, যখন চিত্রপ্রযোজকরা কোন একটা নামকরা উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব কিনে নিয়ে পরিচালকদের নির্দেশ দেন যে, ছবি তুলবেন মুনাফার অঙ্ককেই সর্বোচ্চ তুলবার জন্য। যেসব সস্তা পদ্ধতি ও সূত্র চলচ্চিত্র শিল্পে প্রশ্রয় পেয়েছে, সেগুলিও কাজে লাগাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-প্রযোজকেরা যদি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কায়েমীস্বার্থবাদী ও রক্ষণশীল হয়, তাহলে ছবির প্রাণ বন্দী হয়েই পড়ে।

এখানে একটা উদাহরণ দিলে হয়তো কথাটা পরিষ্কার হতে পারে। হলিউডের কোন এক চিত্রনির্মাতা জগৎ-বিখ্যাত সোভিয়েট চলচ্চিত্র-পরিচালক আইজেনস্টাইনকে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক থিওডর ড্রাইজারের লেখা 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি' উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখে দিতে বলেছিলেন। আইজেনস্টাইন বহু পরিশ্রম করে তা করে দিয়েছিলেন। উক্ত চিত্রনির্মাতা-প্রতিষ্ঠান এজন্য তাঁকে পারিশ্রমিকও দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য আরেকজনকে দিয়ে একই বইএর ভিন্ন একটি চিত্রনাট্য লিখিয়ে তা দিয়ে 'এ্যান আমেরিকান ট্রাজেডির' চিত্ররূপ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। এর ফল হয়েছে এই যে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতার সহযোগিতায় উপন্যাসের চিত্ররূপের যে সার্থকতাময় সম্ভাবনা ছিল, তা থেকে দর্শক-জগৎ বঞ্চিত হয়েছে। হেমিংওয়ের বই নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যর্থতার পেছনে কোন কোন চলচ্চিত্র-প্রযোজকের এই রক্ষণশীলতাই বিশেষভাবে দায়ী ছিল না কি?

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লেনিন

লেনিন শুধু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মহাবিপ্লব ঘটাননি, তিনি বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও পুরোধা। সংস্কৃতির যে মৌলিক রূপান্তরের তাগিদ আমরা আমাদের দেশেও অনুভব করছি, তারও উদ্‌গাতা লেনিন। লেনিনের এই পুরোধার ভূমিকাটিকে বুঝবার জন্য প্রথমে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রূপটিকে বুঝে নেওয়া দারকার। কোন্ অর্থে বিপ্লব, কিভাবে বিপ্লব? এর উত্তর ঠিক করে নেবার জন্য আবার সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের দিকে তাকানো প্রয়োজন।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগের ইতিবৃত্ত নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে, মানুষ প্রস্তর বা উপপলীয় যুগেও সংস্কৃতি-বর্জিত ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার আদি মানবের যে চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে তাতে বুঝতে পারা যায়, মানুষ প্রকৃতির রূপে বিভোর থাকেনি, নিজেও সে রূপচর্চা করেছে। মানুষ শুধু প্রকৃতির তাল আর সুরে ছন্দে মুগ্ধ থাকেনি, সে সুরকার হয়েছে। তার ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুযায়ী হলেও আদি মানুষ আদি কাজেই একটা রুচির পরিচয় দিয়েছে। মানুষ তার কণ্ঠস্বর আর জিহ্বাকে সোচ্চার করেনি, তাকে দিয়েছে ভাষা আর ভাষার উত্তরাধিকার এবং সেই উত্তরাধিকারকেও দিয়েছে অফুরান ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ জৈবিক, সামাজিক, বৈষয়িক, আত্মিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সত্তায় বিধৃত হয়েছে যে মানুষের জীবন, তাতে সংস্কৃতি এসেছে যেন সহজাত বৃত্তি হিসেবে। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকনা কেন, তার জীবনযাপনে প্রকাশ পেয়েছে একটা বিশেষ শৈলী বা

ভঙ্গী এবং একটা সত্তা। রূপ রস ভাষা প্রতিভাস ধ্বনি বর্ণ সুর তালের এই বিশেষ বিশেষ শৈলী ও সত্তা ইতিহাসের অগ্রগতির পথে দেশ-ভেদে ও কালভেদে রূপান্তরিত হয়েছে, বিকশিত হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করে সমৃদ্ধ হয়েছে, কখনও একে অপরকে আত্মসাৎ করেছে, কখনও অপরের মধ্যে মিশে রয়েছে। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে সম্পর্কিত হয়ে এসেছে ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যায়ে নৃত্যে সঙ্গীতে চিত্রে বাদ্যে সাজসজ্জায় প্রসাধনে আলাপনে আচারে আচরণে। এরমধ্যেই অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাত ঘটে এসেছে, তারতম্য হয়েছে লোকায়তে অভিজাতে। উত্তরাধিকার জর্জরিত হয়েছে শ্রেণীশোষণে। কোথাও ঘটেছে নব অভ্যুদয়, কোথাও ধরেছে ক্ষয়।

মানবসংস্কৃতির এই ঐতিহাসিকতা, এই বিচিত্র প্রবাহ, সমৃদ্ধি ও গভীরতার ক্রমাভিব্যক্তি প্রমাণিত করেছে যে মানুষ তার সাংস্কৃতিক জগতে চিরবিপ্লবী। মানুষ কতভাবে নিজেকে সাজিয়েছে, অভিব্যক্ত করতে চেয়েছে, ভরে তুলতে চেয়েছে তার জৈবিকতার কঙ্কালকে কায়িক সুষমায়। এসব কিছুর হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে পদে পদে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হতে হয়। এত গান আছে, এত রূপ আছে, এত আদল আছে, এত রুচি আছে, এত মৃন্ময়তা আছে, এত চিন্ময়তা আছে এই সংস্কৃতির বিকাশে ছোট একটি গ্রামীণ এলাকাতেও যে যুগ যুগ এর হিয়াতে হিয়া রেখেও মনে হয়, আরও না জানি কী রেখে গিয়েছে অনুভব করার!

তবু আমাদের শতাব্দীতে একটা বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এত বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টির মধ্যেও, এত সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধি সত্ত্বেও। এবং এই বিপ্লব সংঘটিত হলো লেনিনের নেতৃত্বে। বিশ্বব্যাপী দ্যোতনা এই ঘটনার। এও এক বিশ্ববিপ্লব।

২

ইউরোপে চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁর ভাববিপ্লব, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘটেছিল যন্ত্রশিল্প বিপ্লব। উনিশ শতকের শেষ দিকে শুরু হল বিজ্ঞানবিপ্লব। ধনতন্ত্রের মুনাফাখোরির স্বার্থপরতা এদের খর্ব করে রাখে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে এদের পরিপূর্ণতা সাধনের তাগিদ নিয়ে এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। দেশে দেশে সংস্কৃতির অঙ্গনে আমরা এই বিপ্লবের লক্ষণগুলিকে কোথাও পরিপূর্ণভাবে, কোথাও বা স্ফূটনোন্মুখভাবে প্রকাশ পেতে দেখছি। এরা এমন কয়েকটি লক্ষণ এবং এরা এমনভাবে যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে যে, এদের একটি বিশেষ বিপ্লবের আখ্যাতেই আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই লক্ষণগুলি নিম্নরূপ। দেশে দেশে মেহনতী মানুষেরাই হতে চলেছে সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়ামক, রক্ষক এবং সঞ্জীবক। মেহনতী মানুষের স্বার্থে ও সর্বাঙ্গীন বিকাশকে ঘিরেই মানব সংস্কৃতির সকল কাজের ঐতিহাসিক আয়োজন আজ ছন্দিত হতে শুরু হয়েছে। মানব সমাজের আদিকাণ্ডে মেহনতী মানুষই ছিল সংস্কৃতির মূলাধার। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণীসমাজের পত্তন হয়েছিল, তার ফলে মেহনতী মানুষের চুম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তে শোষক শ্রেণীর চুম্বকক্ষেত্রই হয়েছিল সংস্কৃতির নিয়ন্তা। ইতিহাসের ধারায় বারবার নিপীড়িত মেহনতী মানুষ বিদ্রোহ করে

এই চুম্বকক্ষেত্রকে ভেঙ্গে নিজেদের চুম্বকক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছে কিন্তু, শ্রেণী-সমাজ বজায় থাকার দরুন এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে শ্রেণীসমাজের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তাতে মেহনতী মানুষের চুম্বকক্ষেত্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যে শুধু নতুন সংস্কৃতির বিকাশকে অনিবার্য করে তুলেছে তা-ই নয়, অতীতের সমগ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এই চুম্বকক্ষেত্রের চারদিকে নতুন প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে সজ্জিত ও আয়োজিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক আয়োজন একদিকে যেমন 'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হও' ধ্বনির ভিত্তিতে বিশ্বজনীন, তেমনি সমস্ত জাতীয় সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত বিকাশেরও সহায়ক। এর কারণ, সমাজতন্ত্রের যুগ হচ্ছে একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গনের যুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালেই আমরা দেখছি প্রায় শতাধিক জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পতাকা নিয়ে সামনের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মেহনতী মানুষের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চুম্বকক্ষেত্রে এরাও সমভাবে শরিক।

এই চুম্বকক্ষেত্র রেনেসাঁর ভাববিপ্লব, আঠারো শতকের যন্ত্রশিল্প বিপ্লব এবং উনিশ-বিশ শতকের বিজ্ঞান বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গত তিনশ বছরের যন্ত্রশিল্প বিপ্লবের ক্রিয়াকলাপ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়িকতা ও মুনফাবৃত্তিকে প্রধান করে তুলেছিল। রেনেসাঁর ভাববিপ্লবকে খর্ব করার কাজেই শিল্পবিপ্লবের পণ্যোৎপাদনের প্রাচুর্য এবং ভোগবাদকে কাজে লাগানো হয়েছিল। মেহনতী মানুষের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চুম্বকক্ষেত্র ব্যবসায়িকতা ও মুনাফাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করে ভাব বিপ্লব, যন্ত্রশিল্প বিপ্লব ও বিজ্ঞান বিপ্লবকে নিয়োজিত করেছে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে পরিপূর্ণ করে তোলার কাজে। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে কোটি কোটি মানুষ, শত শত জাতি, শতশত ভাষা হাজার হাজার বছরের পাথর-চাপা সরিয়ে চিরকালের মত বেরিয়ে এসেছে।

মোটামুটি উপরোক্ত চরিত্র নিয়েই আমাদের মেহনতী শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমাদের সকলের সামনে উদ্ঘাটিত।

৩

লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম সার্থক প্রযোজক। দুনিয়ার মেহনতী মানুষের চুম্বকক্ষেত্র যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারাকে নির্দিষ্ট করেছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন লেনিন। এটি ঐতিহাসিক সত্য। লেনিন যদি অক্টোবর বিপ্লবের ঝুঁকি না নিতেন, তাহলে জোড়াতালির মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক বিতর্ক হতে পারতো, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হতো না। অবশ্য যে ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে এই বিপ্লব আজ উদঘাটিত, তা লেনিনের ঝুঁকি নেওয়ার সময় এতটা পরিষ্কার ছিল না। এর কারণও ঐতিহাসিক।

লেনিন কিভাবে এই ইতিহাসের উন্মোচক এবং সাংস্কৃতিক মানবিক উত্তরাধিকারের নব-উজ্জীবনের দিক দিয়েও কিভাবে তাঁর ভূমিকা বিপ্লবাত্মক, সে কথাও এই সূত্রে পরিষ্কার হতে পারে।

লেনিনের ধ্যানজ্ঞান নিয়োজিত ছিল ইতিহাসের সম্মুখ গতিপথের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে, যেটি নির্দিষ্ট হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর (স্মিচকা) ভিত্তিতে শ্রমিক রাজ কায়েম করায়। এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়েছিল বছরের পর বছরের আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাঁর এবং তাঁর বলশেভিক বা কমিউনিস্ট সাথীদের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং এই কেন্দ্র থেকেই উৎসারিত হয়েছিল সোভিয়েট গণ-সংস্কৃতির কল্পনা ও পরিকল্পনা। বিপ্লবই ছিল সাংস্কৃতিক চিন্তারও কেন্দ্রবিন্দু। অক্টোবর বিপ্লবের মুখে মার্কসের একটি উক্তির পুনরুক্তি করে লেনিন বলেছিলেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থান একটি শিল্পকলা।

অর্থাৎ লেনিনের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা যে একান্তভাবে বিপ্লবাশ্রিত ছিল, তার মূল প্রেরণা এসেছিল মার্কসীয় চিন্তাধারা থেকে। সমাজ বিপ্লব সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তির পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয় এবং এই বিপ্লবকে ঘটাবার জন্যেও প্রয়োজন পড়ে সংগ্রামী বিপ্লবমুখী সাংস্কৃতিক মানস আন্দোলনের। এই সাংস্কৃতিক মানুষ ও বিপ্লবের পুরোধা হয় সেই শ্রেণী, যার নেতৃত্বে সমাজের সমস্ত নিপীড়িত মানুষ যুগান্তরের মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে। লেনিনের দৃষ্টিতে এই মার্কসীয় সূত্র অনুযায়ী সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক শ্রমিক শ্রেণী হয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নায়ক-প্রস্তুতি এবং ফলশ্রুতি এই উভয় দিক দিয়েই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অক্টোবর বিপ্লবের বারো বছর আগে ১৯০৫ সালে 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' নামক নিবন্ধে যেমন তিনি 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তাধারাকে' সাহিত্য রচনার পুরোভাগে আনার জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন, তেমনি ১৯২০ সালে শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতির ওপর একটি প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়াতেও সেই একই কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন। কারও মুখরক্ষা করতে তিনি ছিলেন নারাজ।

লেনিনের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ:

আত্মিক ও মানসিক বিকাশের সমস্ত উপকরণ ও সম্ভারের ওপর বর্তাবে জনগণের সমষ্টিগত অধিকার। শিক্ষা হবে সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলা গণজীবন ও জনচেতনাকে প্রতিফলিত ও সমৃদ্ধ করবে এবং তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হবে গণজীবনের প্রতিটি স্তরে ও বিভাগে। এতকাল সংস্কৃতি মোটামুটি 'দশহাজার' সুবিধাভোগীর বিলাসিতার খায়েশ মিটিয়েছে, এবার সংস্কৃতি সমস্ত মেহনতী মানুষের আত্মিক ও মানসিক ক্ষুধা মেটাবে। একদিকে যেমন মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলিকে মুষ্টিমেয়ের সুবিধাভোগের চক্র থেকে মুক্ত করা হবে, তেমনি বিলাসী সুবিধাভোগী শ্রেণীর পরজীবী মানসের দরুন এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মুনাফা বৃত্তি ও ব্যবসায়িকতার দরুন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশে দেশে যে অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও স্থূলতা এবং আত্মপরায়ণতা দেখা দিয়েছে, সেগুলির উৎসাদন ঘটানো হবে। সাংস্কৃতিক অভিজাত্য ও অস্পৃশ্যতার অবসান করা হবে। লোকায়ত উৎসবের ধারাকে উজ্জীবিত করে তাতে ভরে দিতে হবে মেহনতী মানুষের নবজীবনের বাণী। যৌথ সত্তা হবে প্রধান। গড়ে তুলতে হবে মজুর কৃষকদের মধ্য থেকে নতুন বুদ্ধিজীবী

গোষ্ঠী, মজুর কৃষকদের সঙ্গে তাদের থাকবে নাড়ীর যোগ। সাবেক বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে নতুন করে। বেশভূষা, আলাপে-আচরণে, আদব-কায়দায় একটি কথাই পরিষ্কার হয়ে উঠবে, 'সবকিছু মেহনতী মানুষের জন্যে, সবকিছু মেহনতী মানুষের চোখে, শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দৃষ্টিতে।

এই বক্তব্যগুলিকে লেনিন এবং তাঁর সাথীরা বিপ্লবের পরেই কাজে লাগিয়েছিলেন। উপরোক্ত নীতির প্রয়োগক্ষেত্রের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারবো, সেখানে অক্টোবর বিপ্লবের পরে কী ঘটলো।

বিপ্লবের পরে প্রাথমিক অব্যবস্থার দিনগুলিতে বই ছাপাবার জন্যে প্রয়োজন মত কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না? ঠিক হলো, শ্রমিক কৃষকদের জন্যে দরকারী বই ছাপানোকে দেওয়া হবে অগ্রাধিকার। ধনী ও জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাসাদগুলিতে যেসব চিত্রভাণ্ডার ছিল, সেগুলিকে জনগণের পরিদর্শনের জন্য স্থায়ীভাবে খুলে দেওয়া হলো। যেখানে সমস্ত ছবি এবং নিদর্শনের বক্তব্য গণদর্শকদের বুঝিয়ে দেবার জন্যে পরিচায়ক নিযুক্ত করা হল। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার খোলা হল জনগণের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শেকস্‌পিয়র, গেটে, ডিডেরট এবং টলস্টয় প্রমুখের গ্রন্থাবলি লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল। রাশিয়ার বিশ্ববিশ্রুত নাট্যমঞ্চসমূহের দরজা খুলে দেওয়া হল জনসাধরনের জন্যে এবং ঠিক হল, প্রবেশপত্রের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কারখানার শ্রমিক এবং অন্যান্য মেহনতীদের। ব্যালে নৃত্যের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থা। শ্রমজীবী মানুষকে নায়ক-নায়িকা করে নাটক ও নৃত্য-নক্সার পত্তন হল। কারখানায় কারখানায় নাট্যমঞ্চ তৈরি হলো। লোকনৃত্য পেল নবজীবন। কবিতা আর উপন্যাস লেখার ধারা বদলে গেলো। কবিরা হয়ে উঠলেন চারণকবি। সদ্যমুক্ত সমস্ত নিপীড়িত জাতির মানুষ ফিরে পেলো তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করে তোলার উৎসাহ ও অধিকার। লেখক লেখিকা এবং শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির নতুন পাঠ নিতে শুরু করলেন জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থেকে, কলকারখানায় গ্রামে-গ্রামান্তরে, কর্মক্ষেত্রে। যে কাজ করেছিলেন গত শতাব্দীতে ফ্রান্সের এমিল জোলা কিংবা ভ্যানগগ কিংবা রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোর্কি বিচ্ছিন্নভাবে, তাই হল সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সৃজন শিল্পীদের সাধারণ মৌলনীতি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লেনিনের তাগিদে ম্যাক্সিম গোর্কি রাজধানী ছেড়ে গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক জীবনের সূর্যোদয় হল সমাজের নীচুতলায়; ওপর তলায় হল সূর্যাস্ত।

লেনিন এবং তাঁর সাথীরা উদ্দেশ্যকে গোপন করেননি। তাঁরা খোলাখুলি বলেছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব উদ্দেশ্যমূলক। এই কারণে স্বভাবতই লেনিনের জীবদ্দশাতেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরে এবং বাইরে। আজও এর জের চলছে। সংস্কৃতি ও মানবতার নামে প্রশ্ন করা হয়েছে কখনও শত্রুতামূলকভাবে, কখনও বন্ধুত্বমূলকভাবে। প্রশ্ন হয়েছে, এটা কি ধরা বাঁধা কঠোরতা নয়? এটা কি সূক্ষ্ম উচ্চ রুচির পরিপন্থী নয়? এটা কি উগ্রতা নয়। বল

প্রয়োগ নয়। এটা কি শিল্পীর স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়? এটা কি আবহমান রুশ মাতৃকার অবমাননা নয়?

রুশ সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের মধ্যে অনেকে লেনিনের বৈপ্লবিক সংস্কৃতি চিন্তার পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রয়োজনকে ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁরা গেল গেল রব তুলেছিলেন। লেনিনকে এবং সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী শ্রমিক গোষ্ঠীকে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন এক ধরনের কালাপাহাড় হিসেবে। ইউরোপের অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী মহলে লেনিন এবং তাঁর অনুসারীরা বর্বরতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। মানব সভ্যতার ভিত উপড়ে ফেলে দিচ্ছেন লেনিন এবং তাঁর অনুসারী বলশেভিকরা, এই ধরনের একটা ধারণা ছড়ানো হয়েছিল। ধ্বংসের দিকটাকেই অনেকে সামনে এনেছিলেন। ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স এতে কিছুটা উল্লসিত বোধ করলেও একে নেতিবাচকই মনে করেছিলেন এবং বলশেভিকবাদকে একটা প্রকাণ্ড ঝাড়ুর সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, এতে প্রতীচ্য সভ্যতার জঞ্জাল দূরীভূত হচ্ছে। আমেরিকার মরিস হিণ্ডাস রাশিয়া পরিক্রমণ করে বই লিখলেন, 'মানবতা উন্মুলিত' (Humanity uprooted)। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অনেকে বলেছেন স্বভাব বিরোধী, ঐতিহ্য বিরোধী।

লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীরা জর্জরিত হয়েছিলেন প্রশ্নে প্রশ্নে, শত্রুদের এবং বন্ধুদেরও। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি চিন্তায় আরও শক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, এটা সংকীর্ণতা নয়, সংকীর্ণতার অবসান। এটা অবক্ষয় থেকে মুক্তি। এটা নতুন মানবতা, মুক্ত মানবতা, মানব সমাজের শৃঙ্খল মুক্তি। আবহমান রুশ সংস্কৃতির শৃঙ্খল মুক্তি। এটাই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা।

এই বিতর্কের সত্যতার যাচাই হল কর্মক্ষেত্র। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল লেনিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নীতি। দেখা গেল, জীর্ণ পাতাগুলি ঝরে গিয়েছে, কিন্তু বসন্ত সমাগমে নতুন পাতায় সজ্জিত হয়েছে কানন ভূমি। যাঁরা এক সময় সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন বরমাল্য নিয়ে। সিডনি এবং বিয়াট্রিস ওয়েবের ' সোভিয়েট সাম্যবাদ এক নতুন সভ্যতা' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এর বিবরণ পাওয়া গেল দ্ব্যর্থহীনভাবে। ফ্রান্সের রোঁমা রোলাঁ অভিনন্দিত করলেন, মানবতার প্রমুক্ত বিশাল ভিত্তিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গেলেন তখন এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যোগাত্মক ও সৃজনশীল দিকটাকে দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালে। সাত বছর সময় পেয়েছিলেন তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোড়াপত্তন করতে। কিন্তু দুর্ধর্ষ এই কর্মবীর সাত বছরেই একদিকে যখন অর্থনৈতিক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, রাজনৈতিক বিপ্লবের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করেছেন, তখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেও সমানতালে প্রবাহিত রেখেছেন। লেনিন অমর হয়েছেন তাঁর সাংস্কৃতিক চিন্তারও ফলবানতায়। লেনিন প্রধানত চিহ্নিত ছিলেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্ববিপ্লবের ধারক বাহক হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্ববিপ্লবের বিরুদ্ধে বাঁধ দেবার জন্যই সামাল সামাল রব তুলছিল। তাদের ধারক বাহকেরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়নি। বরং এ

ব্যাপারে তারা গোঁফে তা দিয়ে মানবতার রক্ষক সেজে নিশ্চিন্তে বসেছিল। কিন্তু অচিরেই তারা দেখতে পেলো, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইতিহাসের নয়া ক্ষেত্র হিসেবেও লেনিন এবং তাঁর সাথীদের হতে গড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্ব-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং তাতে বিশ্বের দেশে দেশে গণমুখী সংস্কৃতির তরঙ্গ-দোলা উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। ফ্রান্সের আঁদ্রে জিদের মত ঝানু লেখকেরা প্রথম ধাক্কায় এই তরঙ্গ দোলায় ভেসে বেড়ালো। সামাল সামাল রব উঠলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মহলে এ ক্ষেত্রেও। দেখা গেল, সমগ্র মানবসমাজই উদ্বেলিত হতে পারে এমন উপকরণ এবং এমন প্রবণতা এবং এমন বিকাশ উপচে পড়েছে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। এই অনিবার্য ভবিষ্যতকে কি করে ঢাকা যায়, বিকৃত করে দেখানো যায়, সেটাই হল কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা তারা আজও চালিয়ে যাচ্ছে। এ চেষ্টা অবশ্য ভরা নদীতে বালির বাঁধ।

৪

প্রশ্ন এই যে, কঠোরতাতেই কি এই ফল ফলেছে?

তা নয়। শুধু কি জঞ্জাল সাফ করায় নতুনের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে? শুধু শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম দ্বারাই মানব সভ্যতার নব জাগরণ সম্ভব হয়েছে? শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্য দিয়েই স্থূলতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে? তা নয়। শুধু সংস্কৃতির মালিক শ্রমিক এবং কৃষক এই নীতিটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারাতেই কি কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষক বিশ্ব মানব সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে কার্যত আদায় করার পথ করতে পেরেছে? তা নয়।

লেনিন এবং তাঁর সাথীরা কঠোরতা ছাড়াও আরও কিছু ভেবেছিলেন, আরও কিছু করেছিলেন যেগুলি একইভাবে এবং একই সঙ্গে বিপ্লবাশ্রিত। লেনিন এবং তাঁর সাথীদের ধ্যান-জ্ঞানেরই এরা অংশ। এই দিকটাকে লেনিন তাঁর বিভিন্ন ব্যাখ্যায় এবং কাজে উদঘাটিত করে রেখে গিয়েছেন। লেনিনের কঠোরতা কিংবা তথাকথিত একগুয়েমির মধ্যে ছিল একটা খোলা সংস্কারমুক্ত মার্কসবাদী মন। বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মারফত।

প্রথমত, লেনিন ছিলেন মার্কসবাদী দর্শনের সৃজনশীল অনুসারী। মার্কস তাঁর, 'দার্শনিক ফয়ারবাখ সম্পর্কে অভিমত' লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' কথাটির উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। লেনিন তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই উক্তিকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করে বুজিয়েছেন। মানুষই জগতের পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং করবে এবং নতুন জগৎও সে সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ যন্ত্র নয়, মানুষ যন্ত্রী।

দ্বিতীয়ত, মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা সম্বন্ধেও লেনিন উন্মুক্ত মার্কসবাদী চিন্তারই পরিপোষক ছিলেন। লেনিনের বক্তব্য এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট: 'মার্কসবাদ সংকীর্ণতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিশ্ব সভ্যতার বিকাশের উদাত্ত পথে এর উদ্ভব এবং

এর অগ্রগতি। মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদেরা যে প্রশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপন করেছিলেন, মার্কবাদ তারই উত্তর দিয়েছে।'

১৯০৫ সালে 'পার্টি এবং পার্টি সাহিত্য' নিবন্ধে যখন শ্রমিক শ্রেণীর এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যের অধিকারের কথা তিনি জোর দিয়ে বলেন, তখন তাঁতে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সাহিত্য হবে মুক্ত সাহিত্য। এই সাহিত্য মানব সমাজের বিপ্লবী চিন্তাধারার সর্বশেষ বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করে তুলবে সমাজতন্ত্রী শ্রমিক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও জীয়ন্ত কাজ দিয়ে। এই সাহিত্য অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের শ্রমজীবী সাথীদের অভিজ্ঞতার স্থায়ী সক্রিয় সংযোগ স্থাপন করবে।'

১৯২০ সালে শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতির ওপর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাবে লেনিন এই সংযোজককে আরও স্পষ্টভাবে সামনে এনে বলেছিলেন, 'কোন নতুন শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি নয়। বর্তমান সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ঐতিহ্য এবং ফল, তাদেরই বিকাশ সাধন। এই বিকাশ সাধনের কাজ চলবে মার্কসীয় বিশ্বদর্শন অনুযায়ী এবং শ্রমিকরাজের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ও সংগ্রামের অবস্থা অনুযায়ী।'

তৃতীয়ত, লেনিন ও ম্যাক্সিম গোর্কির সহযোগিতায় পাওয়া যায় লেনিনের মানবিকতার নিশানা। ম্যাক্সিম গোর্কিকে লেনিনের সংস্কৃতি জীবনের প্রতিভূ বলা যেতে পারে, যদিও দুই এক ক্ষেত্রে বিরোধ যে না হয়েছে, তা নয়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিজের মনের সঙ্গেও বিপ্লবীকে কোন কোন সময় লড়তে হয়। লেনিন যখন সোভিয়েট বিপ্লবের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছেন এবং এজন্য ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ এবং সশস্ত্র গণবিপ্লবের আয়োজন করছেন, তখন বন্ধু ম্যাক্সিম গোর্কির মধ্যে পেয়েছেন তাঁর সাংস্কৃতিক সংগ্রামের স্ফূর্তি। বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বের মুখপত্রে গোর্কি ছিলেন লেনিনের সাহিত্য সম্পাদক। গোর্কির 'মা' বইটিকে লেনিন বিপ্লবের প্রস্তুতির ব্যাপারে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে লেনিনের অনুরোধে গোর্কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একথা বিশ্ববিশ্রুত যে, গোর্কি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির মানুষ। গোর্কি ছিলেন অকুণ্ঠ মানবতাবাদী। লেনিনকেও তিনি তাই মনে করতেন। লেনিনের মৃত্যুর পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধ্যান-ধারণার সূত্র তৈরি করতে গিয়ে গোর্কি লেনিনের বক্তব্যকেই মূল হিসেবে সামনে রেখেছিলেন। 'মেহনতই হচ্ছে সমস্ত সংস্কৃতির মূলধারা'—গোর্কির এই সংজ্ঞা বস্তুত লেনিনেরই সংজ্ঞা। ফ্রান্সের রোমাঁ রোলাঁ কিংবা ইটালির গ্রামচি গোর্কিকেই সোভিয়েট সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুরোধা মনে করেছেন এবং তাঁকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে লেনিনকে জানিয়েছেন অভিনন্দন।

চতুর্থত, আমরা দেখতে পাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল মানব সংস্কৃতির প্রতি আস্থা। ক্লারা জেটকিনের একটি প্রশ্নের জবাবে লেনিন বলেছিলেন, 'প্রেম হচ্ছে জৈবিকতা এবং সংস্কৃতির যোগফল।' লেনিন তাঁর এই একটি মাত্র উক্তি দ্বারাই মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখে যেতে পারতেন।

পঞ্চমত, এর পরেই দেখতে পাই লেনিন মানবীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফসলের অক্লান্ত রুচিবান চায়নিক। কোথাও কোন রকম উন্নাসিকতা প্রকাশ করেননি বলে এবং একেবারে নিরক্ষর চাষী মজুরদের সঙ্গেও অত্যন্ত সহজভাবে কথাবার্তা বলতেন বলে

তাঁর এই পরিচয়টা হয়তো আমাদের অনেকের কাছে আড়ালে থেকে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর বইগুলি পড়লেই ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে তাঁর তীক্ষ্ণধার ও বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক চিন্তাধারাকে বুঝিয়ে বলার জন্যে তিনি রুশ ও বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন উক্তি ও ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়েছেন। লেনিন শুকনো কাঠের রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনীতিকে হয়তো বা কাঁটাওয়ালা গোলাপ গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কাঁটাও যেমন সত্য, ফুলও তেমনি সত্য। তাঁর বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের অশান্ত ও অস্থির চারণে সংস্কৃতি ছিল অন্তঃশীল। 'কি করতে হবে' গ্রন্থের নাম থেকে শুরু করে বক্তব্যের অভ্যন্তরে রুশ বিপ্লবী সাহিত্য ও চিন্তাধারা সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, এই বইটি হচ্ছে রাশিয়াতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের পথে প্রথম তথাকথিত একগুঁয়ে পদক্ষেপ। একজন নিবন্ধকার আরও দেখিয়েছেন, লেনিনের দর্শন সংক্রান্ত 'বস্তুবাদ ও এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' নামক কঠিন বইটিতে রয়েছে একাধিক উপন্যাস থেকে প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি।

ষষ্ঠত, শুধু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে, সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তি বলতে লেনিন তাদের রাজনৈতিক সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মুক্তিকেও সোভিয়েট বিপ্লবের একটি আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করেছেন। এর অর্থ, সোভিয়েট সংস্কৃতিকে লেনিন একফুল বলে মনে করেননি, শতফুল বলে মনে করেছেন।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে টলস্টয় সম্পর্কে লেনিনের অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। টলস্টয়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্যান ধারণা অনুপস্থিত তবু জীবনের যে জ্বলন্ত বাস্তব চিত্র তিনি এঁকে গিয়েছেন তাঁর বইগুলিতে, তাকে লেনিন তাঁর কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণবিপ্লবের আয়োজনে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ বলে মনে করেছিলেন এবং সাথীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেছিলেন। টলস্টয়কে যখন নৈরাজ্যবাদী ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-পন্থী শান্তি বাদী বলে কোন কোন উগ্রপন্থী নাকচ করতে চেষ্টা করেন, তখন লেনিন এই প্রচেষ্টার কঠোর সমালোচনা করেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির মধ্য দিয়েই হয়তো একথা বুঝতে পারা যাবে, একটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুর দিকে একাগ্রচিত্তে ধাবমান হয়েও লেনিন কেন বিপ্লবকে বিচ্ছিন্ন করেননি, কেনই বা নিজেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি মানবতার ধারা থেকে কোনক্রমেই।

লেনিন, গোর্কি, গ্রামচি

বিয়াট্রিস এবং সিডনি ওয়েব যে সোভিয়েট সাম্যবাদকে নতুন সভ্যতা নামে অভিহিত করেছেন, তার প্রতিষ্ঠাতা বলশেভিক দলের নেতা লেনিন মানব সভ্যতার বৈষয়িক ও আত্মিক ও মানসিক উপাদানগুলিকে ঠিক কীভাবে দেখেছিলেন? সভ্যতার এই উভয় দিক সম্বন্ধে কি ধরনের চিন্তাধারার তাগিদ দিয়েছিলেন তিনি?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে প্রথমে আমরা লেনিনের তাত্ত্বিকতার দিকটাতেই তাকাতে পারি। লেনিনের সমগ্র জীবনকে আমরা প্রধানত দুর্ধর্ষ কর্মবীরের অক্লান্ত

সংগ্রামী প্রয়াসের দুর্বার প্রবাহ হিসেবেই জানি। তাঁর গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামোর চুলচেঁরা বিচার বিশ্লেষণ এবং নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টির পথ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে সেই সৃষ্টির ব্যাপারে নিয়োজিত। আপাত দৃষ্টিতে এই বিষয়বস্তুতে রসকষহীন নির্মম যুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে ভাবলৌকিকতা বা রোমান্টিসিজমের অবকাশ না থাকাই স্বাভাবিক। অবিশ্রান্ত বিতর্কের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে লেনিনকে সারাজীবন অগ্রসর হতে হয়েছিল। দাখিল করতে হয়েছিল প্রমাণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেনিনের লেখা 'সাম্রাজ্যবাদ' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তত্ত্ব আর তথ্যের মধ্যে চুল পরিমাণ ফাঁক থাকা সম্ভব হয়নি। সুতরাং লেনিনের তাত্ত্বিকতায় আবেগ অনুভূতির তথা আত্মিকতার স্থান আমরা হয়তো অনেকে আশাই করিনা। কিন্তু মনটাকে যদি প্রস্তুত করে নেয়া যায় সমগ্র সত্যকে দেখবার জন্য, তাহলে দেখা যাবে দুরূহ তত্ত্ব সম্পর্কিত লেখাতেও একটা প্রবল অনুভূতি প্রবণতা অন্তঃসলিলার মত সেখানে করে যাচ্ছে। লেনিনের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'কি করতে হবে' এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর 'স্বপ্ন দেখতে চাই' অধ্যায়টিতে লেনিন তাঁর বিপ্লবের পরিকল্পনাকে জোরদার করার জন্য পিসারেভের একটি মতকে দাখিল করেছিলেন। পিসারেভের বক্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ: 'মানুষ যদি স্বপ্ন দেখা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হত, যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতকে ছাড়িয়ে গিয়ে যে বস্তু তার হাতে সবেমাত্র গড়ে উঠছে তার সমগ্র ও সম্পূর্ণ রূপকে সে ফুটিয়ে তুলতে না পারতো, তাহলে আমার তো ধারণাতেই আসে না, মানুষ শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং লৌকিক ক্রিয়াকর্মে আয়াসসাধ্য কাজ হাতে নেবার জন্য সেটি সম্পন্ন করার উৎসাহ পেতো কোথা থেকে! স্বপ্ন ও বাস্ত বের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা কোন ক্ষতিই করে না, যদি সে লোক স্বপ্ন দেখে আর সত্যিকার বিশ্বাস থাকে তার সেই স্বপ্নে, যদি সে জীবনকে সর্বান্তঃকরণে লক্ষ্য করে এবং তার অভিজ্ঞতাকে আকাশ-কুসুমের সাথে মিলিয়ে দেখে। স্বপ্ন ও জীবনের মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তবেই সব কিছু শুভ হয়।' আত্মিকতাকে লেনিন যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার এমনি প্রমাণ আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আসল কথা এই যে, তিনি দ্বন্দ্বমূলক গতিবাদী বস্তু-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন যে কোন ধরনের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী।

তিনি ছিলেন তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রেও মুক্তমনা। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর একটা মন্তব্য এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে: 'মানুষের জ্ঞান একটি সরল রেখা নয়, কিংবা বলা যেতে পারে, মানুষের জ্ঞান একটি সরল রেখা অনুসরণ করে চলে না। তাকে একটি বক্ররেখা বলা যেতে পারে এবং এই বক্ররেখাও চক্রের পর চক্র সৃষ্টি করে সীমাহীনভাবে এগিয়ে চলে। কোন রেখার একটা টুকরোকে একতরফাভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র বলে মনে করলেই গাছের আড়াল পড়ে অরণ্য আর দেখা যায় না, এবং তার ফলে পাঁকের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়।' লেনিন খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীকে পাদ্রী সাহেবের গোঁড়ামির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মার্কসবাদী হিসেবে লেনিন একথা বিশ্বাস করতেন যে, সমাজবিপ্লব ঘটাতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আমূল বদলে দিতে হবে এবং পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশ ও মুক্তিই মানুষের আত্মিক তথা মানসিক

বিকাশকে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কসপন্থী হিসেবেই সব সময় একথা মনে রাখতে হবে, 'মানুষই মুক্তি বা পরিবর্তন ঘটাবার নায়ক।' এই কারণেই আত্মিক বা মানসিক প্রস্তুতির ওপর লেনিন চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু হয়তো এক্ষেত্রে বাস্তবে যা দাঁড়িয়েছিল, তাহলো এই যে, লেনিনের এই তাগিদের দৃশ্যমান ধারা প্রবাহিত হয়েছিল অনেকাংশ তাঁর মূল তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের বাইরে।

এখানে আমাদের প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে লেনিনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রামাণ্যে পৌঁছতে হয়। টলস্টয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারার অমিলটাই বড় ছিল; কিন্তু টলস্টয় লেনিনের কাছে মহৎ শিল্পীর আখ্যাই পেয়েছিলেন। ইয়েলেনা স্তাশোভা লেনিনের সঙ্গে বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি লেনিনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটি এই: লেনিন ম্যাক্সিম গোর্কিকে নিয়ে একটি ছবির প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন। গোর্কিকে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি তাঁর কর্মস্থলে, তারপর কথায় কথায় বললেন, 'সুন্দর যা তা যদি পুরনো হয়, তবুও তাকে বাঁচাতে হবে, তাকে অনুসরণ করতে হবে।' লেনিন টলস্টয় এবং পুশকিনের প্রসঙ্গ টেনেই একথাগুলি বলেছিলেন। লেনিনের এই ধরনের বক্তব্যগুলিকে এক জায়গায় করে তাঁর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং করার দরকারও আছে। কিন্তু এই ধরনের কথা বলার সময় এবং সুযোগ তিনি কতটুকুইবা পেয়েছেন? আমাদের কৌতূহল হয়তো পুরোপুরি নিবৃত হয় না। আমরা আরও নিকট থেকে তাঁকে জানতে চাই।

এই প্রসঙ্গেই আমরা লেনিনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর তৃতীয় প্রমাণ্যে উপনীত হতে পারি।

লেনিনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু শুনেছি। লেনিনের আকর্ষণ-শক্তি ছিল বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির মত। তিনি শ্রমিক কৃষকদের যেমন টানতে পারতেন, তেমনি এণ্ডারসন নেক্সোর মত লেখকদেরও আকর্ষণ করতে পারতেন।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে ইউরোপের কায়েমী স্বার্থবাদীরা লেনিনের মঙ্গোলীয় কালমাকে ছাঁচের মুখের ছায়া দেখতো পেতো ক্রেমলিনের জানালায় আর আঁৎকে উঠতো। কিন্তু লেনিন একথা জানতেন এবং তাঁর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন যে, তিনি সর্বজ্ঞ নন, এবং তিনি সব কাজ করতে পারেন না। বিপ্লবের আয়োজনের মধ্যেও তিনি যে যৌথ দায়িত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মরিস ডব লেনিনের এই কার্যকরী নৈর্ব্যক্তিকতাকে এমন সময়ে সামনে এনেছেন যখন ব্যক্তিপূজা বা পার্সনালিটি কালটের ব্যাপারে সাম্যবাদীদের মধ্যে খোলাখুলি বিতর্কের ঠিক সৃষ্টি হয়নি।

লেনিনের এই নৈর্ব্যক্তিক কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায় ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার ব্যাপারে। লেনিন ম্যাক্সিম গোর্কিকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর সাংস্কৃতিক সাধনার বিকল্প হিসেবে; ম্যাক্সিম গোর্কিকে নস্যাৎ করে নয়, নিজেকেই

গৌণ করে তুলে। অক্টোবর বিপ্লবের আগের কথাই ধরা যাক। লেনিন যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন, তখন ম্যাক্সিম গোর্কিকে তিনি টেনেছেন তাঁর চিন্তাধারার অঙ্গ হিসেবে একথা জেনেও যে, ম্যাক্সিম গোর্কি সাংস্কৃতিক চিন্তার ব্যাপারে স্বাধীনচেতা। বিপ্লবের কাজে, মেহনতী জনগণের মানসিক প্রস্তুতি ঘটাবার কাজে লাগবে, একথা বলেই লেনিন গোর্কিকে তাঁর 'মা' উপন্যাস এবং জীবনস্মৃতি লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যখন বোলশেভিক পার্টির মুখপত্র প্রোলেতারি এবং প্রাভদা বের করলেন, তখনও গোর্কির শরণাপন্ন হলেন সাংস্কৃতিক লেখার জন্যে। তারপর ১৯১১ সালে যখন 'আলোকচ্ছটা' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হল রাশিয়ার ভেতর থেকে, তখন লেনিন গোর্কিকে অনুরোধ করলেন পত্রিকাটির সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনার ভার গ্রহণের জন্যে। গোর্কিও সব সময়েই সহযোগিতা করেছিলেন, এ ব্যাপারেও রাজি হয়েছিলেন। বিপ্লবের পরে লেনিন তাঁকে যখন জনগণ থেকে লেখক-লেখিকা গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করলেন, গোর্কি সে দায়িত্বও নিয়েছিলেন। গোর্কি লেনিনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিভূ হিসেবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলেই ইটালির বিপ্লবী নেতা গ্রামচি ১৯১৯ সালে অর্দিন নুয়োভো নামক পত্রিকা বার করে তাকে লেনিন, সোভিয়েট আর ম্যাক্সিম গোর্কিকে একাত্ম করে দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে লেনিনের মৃত্যুর পরে গোর্কি হয়েছিলেন লেনিনীয় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পুরোধা। এই কারণেই লেনিনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝতে হলে ম্যাক্সিম গোর্কিকেও বোঝা দরকার। ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি লেনিনের যে অন্তহীন আস্থা ছিল, তাতে অবশ্য অনেকে তলা থেকে উঠে আসা সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের প্রত্যাশাকেই দেখেছেন। একথাটা নিশ্চয় সত্য। একান্ত সত্য। লেনিন সঙ্গে সঙ্গেই চেয়েছিলেন যে, সমস্ত মেহনতী মানুষ নরনারী-নির্বিশেষে ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে সৃষ্ট মানব সম্পদ আয়ত্ত করার সক্ষমতা অর্জন করুক। আজ যখন সারা দুনিয়ার দেশে দেশে মেহনতী মানুষ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক ও মানসিক বিকাশের দায়িত্ব নিয়েছে বা নিতে চলেছে, তখন তারা যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত জ্ঞানের রাজ্যকে কিছু বিশেষজ্ঞের জন্য রেখে দেয়, তাহলে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে যাবে। সুতরাং চামচে করে দুধ খাওয়ানোর মত জ্ঞানের রাজ্যে ধাত্রীর কোলে জনসাধারণকে শিশু করে রেখে মানসিক খোরাক দেওয়ার যে রেওয়াজ জনসাধারণের অভিভাবকদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে চলে এসেছে, তাকে খতম করে দিতে হবে।

১৯১৯ সালে লেনিনীয় সমাজবিপ্লবের অনুষঙ্গ হিসেবে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে যে ধারণা-তরঙ্গ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে উৎসারিত হয়েছিল, সেখানে তার রূপারেখাতে কোন কুয়াশার আবরণ ছিল না। ইটালির গ্রামচির লেখাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে তোগলিয়াত্তি, গ্রামচি এবং তাঁদের অন্যান্য সাম্যবাদী সাথী, ইটালিতে গণঅভ্যুত্থানের উদ্যোগ আয়োজনের মুখে 'অর্দিন নুয়োভো' নামক যে পত্রিকা বার করেন, তার এক সংখ্যায় ইটালির পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দাভিঞ্চির চতুর্থ শত বার্ষিকী উপলক্ষে একটি লেখা বার করা হয়। ঐ সংখ্যাতেই সম্পাদকীয়মণ্ডলীর তরফ থেকে একটি নিবন্ধ

প্রকাশ করে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিতে হয়। কারণ, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এসবের কি দরকার, এই ধরনের প্রশ্ন নিজেদের মধ্যেই কোন কোন মহল তুলেছিলেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিওনার্দো দাভিঞ্চির অবতারণার ব্যাখ্যায় বলা হয়:

'আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত যে, আমাদের পাঠক পাঠিকা এবং বন্ধুরা বিস্মিত হবেন না, কারণ এই শতবার্ষিকী দ্বারা আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অনুসরণে ব্যর্থতার পরিচয় না দিয়ে বরং যে কথা প্রথমে বলেছিলাম, তাকেই আংশিকভাবে অন্তত বাস্তবায়িত করছি। আমাদের মুখপত্র কি ধরনের হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন উপলক্ষে আমাদের বক্তব্যে বলেছি। কমপক্ষে এই মুখপত্রের কাজ হবে উচ্চতর এবং পূর্ণতর জীবনের জন্য পাঠক-পাঠিকার মানসিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশকে উৎসাহিত করা। আমাদের সীমাবদ্ধ উপকরণ নিয়েও আমরা নিজেরাই কেন আমাদের তরুণ সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার কাজে হাত দেবো না? তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কত গভীর বিশ্বাস নিয়ে, কত প্রত্যাশা নিয়ে। সমাজতন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার যখন অভ্যুদয় ঘটবে, তখন তো সেটা একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাই হবে এবং তার লক্ষ্য হবে মানুষের জ্ঞানের সমস্ত বিভাগ দ্রুত আয়ত্ত করা। কার্যিক আবশ্যকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজনে এটা করতে হবে।

'হাজার হাজার বছরের কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে যেসব ভাবধারা সঞ্চিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন কোন ভাবধারার রয়েছে চিরন্তর মূল্য। সেগুলি বিনষ্ট হবে না, হওয়া উচিতও নয়। বুর্জোয়া তথা ধনতন্ত্রের ধারক বাহকেরা তাদের রাজত্বে যে অধঃপতন এনেছে, তার একটি লক্ষণ হচ্ছে এই সব মূল্যবোধকে চেতনা থেমে মুছে দেওয়া। শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক ক্ষমতা দখল করার পরে প্রবৃত্ত হবে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে ফিরে পেতে। তারা আত্মার বিরাণ রাজ্যকে পরিপূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করবে নিজেদের জন্যে এবং মানব-সমাজের জন্যে।

'আজকের দিনে রুশ শ্রমিকেরা ম্যাক্সিম গোর্কির নেতৃত্বে এই কাজই করছে। যেখানে যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী ও পরিণত অবস্থায় এগিয়ে চলেছে, সেখানেই এ কাজ করতে হবে। ওপরতলার পচনকে অপসারিত করে তার স্থান নেবে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী প্রাণশক্তি।'

এই সমস্ত বক্তব্যে লেনিনের উপস্থিতি সম্বন্ধে যাতে কোন অস্পষ্ট অস্বচ্ছ ধারণা না থাকে, সেজন্য বলা দরকার যে, ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে অর্দিন নুয়োভোতে কর্মপন্থা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাতে লেনিনের ভাবধারার অনুসারিতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয় যে, লেনিনের বিভিন্ন লেখা অর্দিন নুয়োভোতে প্রকাশ করা হয় এবং অর্দিন নুয়োভোর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলি ইটালির ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থায় লেনিনের ভাবধারারই তর্জমা। অর্দিন নুয়োভো সমাজের মুক্তিসম্পাদনের কাজে লেনিনের বক্তব্যকেই মর্মভূমিতে রেখেছিল, 'সুন্দর যা তা' যদি পুরনো হয়, তবুও তাকে বাঁচাতে হবে।'

বলাবাহুল্য, বর্তমানকে বিকশিত এবং ভবিষ্যতকে সম্ভব করার প্রয়াসের আত্মিক ও মানসিক অনুষঙ্গেরই এটা অঙ্গ।

আইরিশ, বাংলা, সীয়ান ওক্যাসি

পরাধীনতার জ্বালা কালো বাদামী সাদা কিংবা হলদে নির্বিশেষে যে কোন বর্ণের মানুষের বুকে তুষের আগুনের মত জ্বলে। সাম্রাজ্যবাদী পররাজ্যগ্রাসীরা গায়ের রং দেখে পরাভূত কোন দেশের মানুষকে দমন-চর্বণ থেকে রেহাই দেয় না। এ সত্য বিশ শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে বাংলার যুবশক্তির সামনে অবারিত হয়েছিল, বিশেষ করে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতাসংগ্রামের আঘাত-প্রত্যাঘাতের রক্তক্ষরা ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। একই ইংরেজ শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে একই সময়ে নিয়োজিত বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী অভ্যুদয় আর আইরিশ সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম একই ধরনের ভাবকল্পনায় গ্রথিত হয়েছিল।

আর একটি ঘটনাও সামনে এসে গিয়েছিল তখন। সে সময়ে স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের উচ্ছেদকারী রুশবিপ্লবও বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদকারী আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামের মত বাংলার গণশক্তির চিন্তাশীল অংশটিকে চুম্বকের মতই আকর্ষণ করেছিল। তবে বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে ভাবপ্রবণ নিম্নমধ্যবিত্ত যুবশক্তি ছিল অগ্রণী। সেই কারণে রুশ এবং আইরিশ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত এই অগ্রণী শক্তির চেতনা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নের বিশেষ পরিমণ্ডলেই ঘেরা ছিল। রুশ বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগের বেপরোয়া তরুণ-তরুণী আর বোমা ডিনামাইটের যে অধ্যায় তুর্গেনভের উপন্যাস বিধৃত, তারই আকর্ষণ ছিল বেশি। রুশ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক সোভেয়েট বিপ্লব ছিল যেন এই অধ্যায়েরই পরিসমাপ্তি। কথাটাকে আরেকভাবে বলা যেতে পারে। আইরিশ সন্ত্রাসবাদী মুক্তিসংগ্রামের আলোকেই সেদিন রুশ বিপ্লবের ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে বাংলার যুবশক্তির প্রথম পরিচয়। ড্যান ব্রিনের 'আইরিশ স্বাধীনতার জন্য আমার সংগ্রাম' বইটি ছিল বাংলার অগ্নিযুগের ছেলেমেয়েদের প্রিয় গ্রন্থ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক টেরেন্স ম্যাকসুইনি কারাগারে রাজনৈতিক মর্যাদা আর দেশের মুক্তির দাবীতে পঁচাত্তর দিন অনশন করে প্রাণ দিয়েছিলেন। ইংরেজ রাজস্ব উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বাংলার যতীন দাস একই ধরনের দাবীতে কারাগারে চৌষট্টি দিন অনশন করে যখন প্রাণ দিলেন, তখন বাংলার যৌবনের মর্মভূমিতে যতীন দাস ম্যাকসুইনী যমজ ভাই-এর মত আসীন হয়েছিলেন।
এই যখন ছিল আবহাওয়া, তখন স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যে আইরিশ সাহিত্যের তীব্র প্রতিফলন হতে পারতো। কিন্তু তা' হয়নি। এর কারণ হয়তো এই যে, আইরিশ গল্প কবিতা নাটক কিংবা উপন্যাসের যে ধারার সঙ্গে সে সময়ে বাংলার যোগাযোগ ঘটেছে, তার মধ্যে আইরিশ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পাওয়া যায়নি। কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণার বাংলা সেদিন যাদের আলেখ্যের সন্ধানে ছিল, তাদের পাওয়া যায়নি আয়ার্ল্যাণ্ডের সমসাময়িক সাহিত্যে।

যে জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যভিত্তিক ভাবান্তর বিশ শতকের সূচনায় আইরিশ তরুণ তরুণীদের নামিয়েছিল মরণপণ মুক্তিসংগ্রামে, তার উদগাতা কবি ইয়েট্স জাতীয় নাট্যমঞ্চ ও নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তবু ইয়েটসের লেখা, বাংলার

যুবশক্তিকে তৃপ্ত করতে পারেনি। ইয়েটসের সাগরবেষ্টিতা মাতৃভূমির ভাবপ্রতীকগুলি ১৯১৬ সালের এপ্রিলে আরদ্ধ তিক্ত, রক্তাক্ত ও ক্রুদ্ধ মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকদের বাস্তব জীবনকে আশ্রয় করে মূর্ত করে উঠতে পারেনি। ইয়েটসের লেখার প্রভাব তাই বাংলা সাহিত্যে এত ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার ভূমিকা-লেখক ইয়েট্স গীতাঞ্জলির গণ-ধর্মিতার উল্লেখ করে পাঠক-মনে চমক লাগালেও যেসময়ে বাংলা সাহিত্য তাঁকে গ্রহণ করার জন্য তৈরি হয়েছিল, সে সময়ে সাড়া জাগাতে পারেনি। এর কারণ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ বিশ শতকের আয়ার্ল্যাণ্ডের মমতাহীন অগ্নিশিখাগুলিকে তিনি তাঁর কবিতাতেও উৎকীর্ণ করেননি।

আরেকজন একান্তভাবে আইরিশ জন মিলিংটন সিঞ্জ। সিঞ্জের নাটক থেকেও দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্য কিছু নিতে পারেনি, যদিও বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মাঝিমাল্লাদের জীবনের ছবির সঙ্গে সিঞ্জের নাটকের লোকজীবনের অনেক ছবির মিল রয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সশস্ত্র পর্যায় শুরু হওয়ার আগেই সিঞ্জের মৃত্যু হয় ১৯০৯ সালে। ১৯১৬, ১৯২০ কিংবা ১৯২২ সালের আইরিশ অভ্যুদয়ের রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণীও সিঞ্জের নাটকে নেই। আইরিশ লোকজীবনের অশান্ত আত্মার মর্মন্তুদ ছবি সিঞ্জের নাটকের পাত্রপাত্রীরা। লোকসভার ব্যবহার ইয়েট্সের চেয়েও গভীরতর, যদিও ইয়েট্সই এব্যাপারে তাঁকে তালিম দিয়েছিলেন হাতে কলমে। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সুযোগ দেয়নি, বাংলা যা চেয়েছে তার কোন ছবি তাঁর ব্যঞ্জনাধর্মী কথাটিকে ফুটিয়ে তুলে রেখে যেতে। সিঞ্জ বেঁচে থাকলে একাজ করতেন কি না, অর্থাৎ ১৯১৬, ১৯২০ এবং ১৯২২ সালের রক্তাক্ত সংগ্রামের ছবি আঁকার মতো মনের শক্ত পরিচয় দিতে তিনি রাজী হতেন কি না, সে তর্ক এখানে তুলে লাভ নেই।

এই দুজন খাঁটি আইরিশ লেখক ছাড়াও আরও দু'জন আইরিশ লেখকের সংস্পর্শ বাংলা সাহিত্য এসেছে। এঁদের একজন নাট্যকার বার্নার্ড শ। আরেকজন ঔপন্যাসিক জেমস জয়েস। এই দুজনেরই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছে। কিন্তু সে প্রভাবের সঙ্গে বিপ্লবী আইরিশের সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দুজনেরই ইয়েট্স এবং সিঞ্জের স্বপ্ন-কবিতার আয়ার্ল্যাণ্ডকে পরিত্যাগ করেছিলেন। দুজনই প্রবাসী শিল্পী। একজন লণ্ডনে, আরেকজন প্যারিসে। বার্নার্ড শ আয়ার্ল্যাণ্ডকে নিয়ে একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন যুধ্যমান দুই পক্ষকেই চিন্তার দিক দিয়ে দেউলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্যই যেন। আইরিশ স্বপ্ন সাধনার রূপকার হিসেবে এটা করেননি তিনি। কিছুটা যেন মধ্যস্থ যুক্তিবাদী মীমাংসা-সন্ধানী হিসেবেই তিনি নাটকটি লিখেছেন। সুতরাং তাঁর 'জন বুলের অন্যদ্বীপ' থেকে বাংলা সাহিত্য কিছু নিতে পারেনি। বাংলা তার পক্ষপাতিত্ব তীব্রভাবেই সামনে রেখেছে। বার্নার্ড শর কাছ থেকে বাংলা যা গ্রহণ করেছে, সে অন্য বিষয়। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম চূড়ান্ত বিতর্কমূলক উপন্যাস 'ইউলিসিস'-এর লেখক জেমস জয়েসকে প্রথমত দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সহজভাবে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত: তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের রক্তাক্ত গণ-মুক্তি সংগ্রামের ছবিও আঁকেননি তাঁর উপন্যাসে, যদিও তাঁর সমস্ত লেখাই আয়ার্ল্যাণ্ডকে নিয়ে এবং বিশেষ করে বিদ্রোহী নগরী ডাবলিনকে নিয়ে।

জেমস জয়েসের লেখার পটভূমি আইরিশ। আইরিশ নর-নারীর চরিত্র এবং চিন্তা-স্রোত এবং বাক্যপ্রবাহ তাঁর লেখার উপকরণ। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর বক্তব্য: 'হেথা নহে, হেথা নহে অন্য কোনখানে।' আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেন সমাজবিপ্লবে উত্তরিত হতে পারলে না, তার কারণ অনুসন্ধানে জেমস জয়েসের আইরিশ চরিত্র ও ঘটনা বিচার কাজে লাগলেও, বর্তমান শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের সময় সীমায় বিস্ফোরিত আয়ার্ল্যাণ্ডকে একটা আন্দাজ করে বসিয়ে নিতে হচ্ছে এই মূল্যায়নে। এরকমভাবে ইয়েটস, সিঞ্জ এবং এমনকি বার্নার্ড শর লেখাও কমবেশি কাজে আসবে আজকের আইরিশের সঙ্গে যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে চায় আজকের বাংলা, তাহলে। কুলপ্লাবিনী নদীর যেমন একটা খাত আছে, তেমনি জয়েসের লেখায় যোগাত্মক (Positive) অংশ আছে। গতশতাব্দীর প্রথম দিকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছিলেন বলে যে তরুণ আইরিশ যুবা রবার্ট এমেটের ফাঁসী হয়েছিল, তাঁর উল্লেখ জয়েস করেছেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও কথাটা থেকেই যায় যে বাংলা যখন আইরিশের একান্ত কাছাকাছি হয়েছিল, তখন জয়েসের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করলে তাতে নিরুৎসাহের কারণ ঘটতো। বর্তমান শতাব্দীতে যে জাতীয়তাবাদীভাব দিয়ে আইরিশ নব জাগরণের শুরু, তাতে জয়েস আশার কিছু দেখেননি।

এখানে একটা কথা উঠেতে পারে। উপরোক্ত লেখক ছাড়া আইরিশ মুক্তি সংগ্রামের রক্তাক্ত ছবি আর কোন কবি কিংবা ঔপন্যাসিক অথবা নাট্যকারের কলমের মুখে বেরিয়ে আসেনি? এখানেই সীয়ান ওক্যাসি সম্বন্ধে কথা ওঠে। এর একটাই জবাব আছে। সাহিত্য যে অপ্রত্যাশিত আর অখ্যাত লেখক লেখিকাদের কলমের ওপরেই বিশেষ করে সন্ধিক্ষণগুলিতে ভর করে, সে সম্বন্ধে বাইরে থেকে একটা ধারণা ঠিক করতে করতেই বেশ কিছু সময় পার হয়ে যায়। তাছাড়া অনেক ফুল ফোটে, সুরভি ছড়ায়, তাকে বার করতেও সময় লাগে। কারণ, প্রতিভাকে আবিষ্কার করার অথবা নতুন লেখার কদর করার যে মানদণ্ড ভাষ্যকারদের হাতে থাকে, তা হয়তো একেবারেই পুরানো হয়ে রয়েছে। এই ধরনের মানদণ্ড দিয়ে ঠাহর করা যায় না সীয়ান ওক্যাসির মতো আকাশভেদী মহীরুহসম প্রতিভাকেও। তাছাড়া কোথাও না কোথাও একটা পর্দা ছিল, যাতে আড়ালে পড়ে গিয়েছিলেন সীয়ান ওক্যাসি। যদি সেদিন এই পর্দা না থাকত, তাহলে বাংলা সেদিন আইরিশদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতো, 'তোমাকেই তো খুঁজেছি। ১৯১৬, ১৯২০ আর ১৯২২ সালের যে রক্ত আর অশ্রুকে, যে তিক্ততা আর বেদনাকে, যে অদম্য আশাবাদী আর অপারজেয় মা বোন ভাই আর পিতাকে, যে বিদ্রোহী জনগণের আয়ার্ল্যাণ্ডকে চেয়েছি আইরিশ সাহিত্যে, তার রূপকার তো তুমি।'

আজকে পর্দা সরে গিয়েছে। কিন্তু সীয়ান ওক্যাসির লেখার সঙ্গে বাংলার সংযোগ ভালভাবে বুঝে নিতে হলে প্রথমে বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের যে চরিত্র চিত্র আঁকা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশককে আমরা বেশ কিছুটা পেছনে ফেলে

এসেছি। সীয়ান ওক্যাসির আইরিশ নাটকে মুক্তি সংগ্রামীদের যে ছবি রয়েছে, তাকে বাংলার ছবির সঙ্গে না মিলিয়ে হয়তো পুরোপুরি ধরতে পারব না।

২

১৯০৭-০৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত কিংবা বলা যেতে পারে খুদিরামের ফাঁসি থেকে সূর্য সেনের ফাঁসি পর্যন্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী মুক্তিসংগ্রামের কয়েকটি পর্যায়ে টুকরো টুকরো আলোকচিত্রের মত বিপ্লবীদের ছবি উৎকীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন কারাকাহিনীতে, আত্মজীবনীতে অথবা বীর-জীবনীতে। এদের অধিকাংশই ইতিহাসের তথ্য বা মালমশলা। এদের সঙ্গে রয়েছে সংগ্রামী পর্যায়গুলির তত্ত্ব বা জবানবন্দী। মাঝে মাঝে কোন কোন কারা-কাহিনী অথবা বিপ্লবী জীবনী তথ্য এবং তত্ত্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে সাহিত্যে। আলোক চিত্র হয়েছে শিল্পীর হাতে আঁকা আর মর্মনিংড়ানো রক্ত মাংসের মানুষ। শুধু চিত্তাকার্ষক নয়। ব্যাপকতর ও গভীরতর মানবিকতার অজস্র সুরে সমৃদ্ধ হয়েছে। তবু বাংলা চেয়েছে আরো কিছু এবং বাংলার খ্যাতিমান লেখকরা এই দাবীকে নিজেদের তাগিদ বলে মনে করেছেন এবং পূরণ করেছেনও সাধ্যমতো।

যে সময়ের কথা এখানে আলোচ্য, সে সময়ে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু দুদিক থেকে বাংলা নন্দনতত্ত্বে অপাংক্তেয় ছিল। প্রথমত, সরকারি নিষেধ এবং দ্বিতীয়ত শিল্পকলার তথাকথিত জাত রক্ষার ঝামেলা হাত প্রায় বেঁধে রেখেছিল প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরও। উপরন্তু সমগ্র জীবনের রূপকার হিসেবে বিপ্লবী জীবনের রূপ দেওয়াতে মনের মধ্যে খটকা ছিল। চরিত্র-চিত্র আর ঘটনাকে কতটা গ্রহণ করলে শিল্পকর্ম প্রচারের পর্যায়ে চলে যাবে না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত জীবনের।

এক সারি উপন্যাস আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এক নিশ্বাসেই নাম করা যায় এদের। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা', গোপাল হালদারের 'একদা', মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', বনফুলের 'সপ্তর্ষি'। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অধ্যায়ের কিংবা যাদের জীবনের কথা এখানে বিবেচ্য, তার কিংবা তাদের সম্বন্ধে এই সব উপন্যাস কখনো তীব্র ঝংকারে কখনো বা মৃদুসুরে, কখনো প্রধানতভাবে ও আলাপে, কখনো বা প্রধানত আঘাত ও সংঘাতের বর্ণনার মধ্য দিয়ে, কখনও খণ্ডিতভাবে, কখনোবা পরিপূর্ণ আলো ফেলে বিচ্ছেদাত্মক ও রক্তাক্ত এবং বেদনাবিদ্ধ আলেখ্য আঁকা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীয়ন্ত' উপন্যাস একই বিষয়বস্তুর ওপরে আলো ফেলেছে বিশেষ করে মনোবীক্ষণ পদ্ধতিতে।

উপরোক্ত উপন্যাসের সারিকে অথবা এই ধরনের আরও যে সব উপন্যাস লেখা হয়েছে তাকে বাংলার বিশ কিংবা তিরিশের দশকের যুবশক্তি পূর্ণমূল্য হয়তো দেয়নি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যে অমূল্য নামে তরুণ বিপ্লবীর ছবি আছে এবং যাকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন অতুলনীয় স্নেহে এবং নিষ্ঠায়, তার খবর খুব একটা ছড়িয়ে পড়েনি সেদিনকার তরুণ সমাজে। 'ঘরে বাইরে' একটা প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে লেখা. এই বাইরের খোলসটাই সেদিন ছিল তার পরিচয়। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নায়ক-

নায়িকারদের বক্তব্যও সেদিন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের একাংশের পছন্দ হয়নি। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ না হলে হয়তো এই বইটির কাছ থেকে বিপ্লবীরা আরও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ও চিত্র দাবী করতেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধাকে' আড়াল করে রেখেছিল তাঁর বিপ্লবী কবিতা আর গান। সেদিন বইটির সম্যক ও সঠিক বিচার হয়নি। গোপাল হালদারের 'একদাই' সম্ভবত সন্ত্রাসবাদীদের কাছে গ্রহণীয় হত, কিন্তু যখন এ উপন্যাস প্রকাশিত হল, তখন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীর সাম্যবাদী গণবিপ্লবের পথে কৃষক-মজুরের সংগঠনের কাজে নেমে গিয়েছে। সুতরাং 'একদা' ফেলে আসা দিনগুলির জ্বালাময় সত্যের স্মৃতিকেই শুধু সামনে এনেছে। 'ভুলি নাই' এবং 'সপ্তর্ষি' এইভাবেই সত্য স্মৃতিকেই সামনে এনেছে যেন ভুলে না যাই কত অশ্রু ঝরেছে, কত রক্ত ঢেলেছি, কত প্রাণ দিয়েছি, কত ঘর ভেঙ্গে গেছে, কত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, কত সাহসিকতা বজ্রের মত জ্বলে উঠেছে মমতাময়ী বাংলায়-এইভাবেই শেষের দিকের বইগুলি লেখা।

বাংলার অশান্ত তরুণ ও তরুণীদের আত্মদানের ছবি রবীন্দ্রনাথ আরও এঁকেছেন, কিন্তু সে কিছুটা প্রতীক ধরনের। 'মুক্তধারার' অভিজিৎ বাংলার ছেলে। 'রক্তকরবী'র রঞ্জন আর নন্দিনী বাংলার ছেলেমেয়ে। যারা ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতার উপাদানেই তৈরি। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের নতুন দিগন্তে এরা অভিযাত্রী। তখনও বাংলার সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই দিগন্ত খুব পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠেনি বলেই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা না হলে তিনি অন্তত 'ঘরে বাইরে' ধরনের উপন্যাস এই গণমুক্তিসংগ্রামের উপাদান দিয়েই লিখতেন। ১৯০৮ কিংবা ১৯৩০ সালের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড কিন্তু এত স্পষ্ট ছিল যে, সেখানে প্রতীকের কোন প্রশ্ন ওঠেনি। এই জন্যেই আমরা পেয়েছি বাস্তববাদী উপন্যাস এই সব ঘটনার ভিত্তিতে। রবীন্দ্রাথ শিল্পকলার জাত বাঁচাতে পারেননি সমসাময়িক রাজনৈতিকতার তথাকথিত আবর্ত থেকে। কোন ঘটনা পেকে সূর্যমুখী ফুলের মতো ঝুনো না হওয়া পর্যন্ত তার সম্বন্ধে লেখা যায় না বলে যে একটা মত প্রচলিত আছে, তার তোয়াক্কা তিনি করেননি। তিনি হয়তো তাঁর 'এই যেমন দেখা তেমন লেখার' ধাক্কার মধ্য দিয়ে, বাংলার লেখক লেখিকাদের একটা বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা একে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে আনতে পেরেছে। ১৯০৮ থেকে ১৯৩৫ সালের বাংলা উৎকীর্ণ রয়েছে বাংলা সাহিত্যে।

বাংলা একদিন আইরিশ সাহিত্যের কাছে যা চেয়েছে তাকে এবার পাওয়া যাবে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এবং বাংলা যাদের চোখ দিয়ে একদিন আইরিশ মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিল তাদের ছবি বুকে এঁকে নিয়ে সীয়ান ওক্যাসির লেখা পড়তে গেলেই বাংলার সঙ্গে এই লেখায় মিল আর অমিল দুটোই খুব তীক্ষ্ণভাবে সামনে এসে যায়। প্রথমেই যেসব বিষয়ে মিল আছে সেগুলি এক নজরে দেখে নেয়া যেতে পারে।

৩

প্রথমত, সীয়ান ওক্যাসির নাটকে তরুণ বয়সী সংগ্রামীদের প্রাধান্য। প্রাণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা ১৯০৮ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত যেভাবে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করতো না, সীয়ান ওক্যাসির নাটকেও আইরিশ ছেলেরা তাই করে। শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও তাই করে। একটি নাটকে দেখা যায়, ম্যাকগোয়ের নামক এক তরুণ যখন একটা ঘটনা ঘটাতে চলেছে, তখন সে বলে যাচ্ছে যে সে প্রজাপতি ধরতে যাচ্ছে। মিনি পাওয়েল নামে একটি তরুণী সুটকেস বোঝাই বোমা নিজের ঘরে নিয়ে যায় তার দয়িতকে পুলিশের ঘেরাও থেকে বাঁচানোর জন্যে। ধরা পড়ার পরে ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে সে প্রাণ দেয়।

'লাঙ্গল এবং তারা' নামক নাটকে ডাবলিনে ১৯১৬ সালের এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সময় যখন শ্রমিকসমাজের তরফ থেকে 'লাঙ্গল এবং তারা' আঁকা পতাকা এবং জাতীয়তাবাদীদের তরফ থেকে 'তে-রঙ্গা' পতাকা পাশাপাশি উড়িয়ে মরণপণ প্রতিজ্ঞা করা হয়, তখনকার সংলাপ প্রণিধানযোগ্য।

ল্যানগন–বিপ্লবের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লিথেরো–তোমার তো মা আছেন ল্যানগন।

ল্যানগন–আয়ার্ল্যাণ্ড মায়ের চেয়ে বড়।

ব্রেনান–তোমার তো স্ত্রী আছে, ক্লিথেরো।

ক্লিথেরো–আয়ার্ল্যাণ্ড স্ত্রীর চেয়ে বড়।

এই সূত্রেই আসে দ্বিতীয় মিলটির কথা। বাংলার মতোই মায়ামমতা আর ভালবাসায় ঘেরা ঘরের মাতা-বধূ-ভগ্নীর বাহুবেষ্টনী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আইরিশ তরুণদের মরণোৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। সীয়ান ওক্যাসি বিদ্রোহের অগ্নিশিখা আর মৃত্যুলীলার ছবির পাশে এই কান্না আর কোমলতাকে ধরে রেখেছেন। যে আদর্শবাদ তরুণ তরুণীদের কাছে প্রাণোৎসর্গই চায় শুধু, তার পাশে সুন্দরভাবে বাঁচবার এবং নিবিড় করে নীড় বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে সাজানো যে, সীয়ান ওক্যাসি কোন্‌টিকে বড় বলতে চান সেটা ধরা মুস্কিল হয়ে পড়ে। একটি নাটকে তাই দেখি, ছেলে মাকে বলছে, 'আদর্শই হচ্ছে আসল কথা; আবার যদি মরার ডাক আসে, আবার যাবো।' এর পাশেই মেয়ে মাকে বলছে, 'কোন রং-এর ফিতেটা দিয়ে চুল বাঁধবো মা?' এখানে যে কথাটা বলতে চাই, সেটা এই যে, বাংলা উপন্যাসে যেভাবে কোমলতা আর রূঢ়তা পাশাপাশি সাজানো আছে কিংবা ১৯০৮ থেকে ১৯৩৫-এর বাংলায় যেভাবে সাজানো ছিল, সেইভাবেই সীয়ান ওক্যাসির নাটকে রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের পটভূমি ছাড়া যে প্রাণোৎসর্গের অর্থ হয় না, সে কথাটা বাংলায় যেমন পেয়েছি, তেমনি পাই সীয়ান ও ক্যাসির নাটকে। এই একই উপাদান তুর্গেনিভের বিভিন্ন উপন্যাসে এবং কিছুটা নতুনভাবে গোর্কির 'মা' উপন্যাসে পাওয়া গিয়েছে এবং এই কারণে বাংলা এদিক দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। ভালবাসা আর কোমলতায় লালিত নয় যে প্রাণ, সে তো যন্ত্র মাত্র। তার উৎসর্গও যান্ত্রিক।

৪

এবার বাংলার ছবির সঙ্গে যেখানে যেখানে সীয়ান ওক্যাসির আইরিশ ছবি মেলে না, সেখানে তাকিয়ে প্রথমেই দেখবো, সীয়ান ওক্যাসির লেখা সবই নাটক এবং বাংলার বিপ্লবীদের আলেখ্য সবই উপন্যাস। এই নাটকও আবার বিন্দুমাত্র আগোছালো নয়। ছাঁকা কথা ছাড়া এতে কোন আল্‌গা কথা নেই। স্থান কাল পাত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং, প্রায় প্রত্যেকটি নাটকে কোন দম্পতি অথবা প্রণয়ী-প্রণয়িনী কোন একটা ঘটনার ভিত্তিতে সংকটের পর সংকটে জড়িয়ে পড়তে থাকলেও তারা নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি করে না। জটিলতা আসে বৈপ্লবিক পদক্ষেপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে। আমরা এতে ঠিক অভ্যস্ত নই। কোন একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে; এই ঘটনাটির পরিণতি যেন একটা চুম্বক; এই চুম্বককে কেন্দ্র করে কোন একটি পরিবার এবং তার আশেপাশে বিভিন্ন প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনী নিজ নিজ জীবনের দ্বৈত কিংবা পরিবারগত অথবা একক ধারায় একটা পরিণতিতে পৌঁছবার জন্যে এগিয়ে চলেছে। অথচ বিন্দুমাত্র যান্ত্রিক নয় কোন পাত্রপাত্রী। প্রত্যেকেই জীবন্ত, বাঙময়, ঝাঁজওয়ালা—নিজ নিজ চরিত্রানুযায়ী। কোন চরিত্রই ছাঁচে ঢালা নয়। বরং কিছুটা যেন নৈরাজ্যবাদী। প্রত্যেকেরই এক ধরনের 'মগরামি' আছে। আর এর সঙ্গেই আছে গানের পর গান। একক গান, যৌথ গান। অথচ এ গানে নাটকের গতি বিন্দুমাত্র শ্লথ হয় না। সীয়ানের নাটকে শুধু গানই নেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপিও দেওয়া আছে। তাতেও নাটকের গাঁথুনিতে কোথাও চিড় ধরে না। এদিক দিয়ে গ্রীক নাটকের সঙ্গে যেন মিল আছে। গ্রীক নাটকের কোরাস ও সংলাপকে শ্লথ করে না। উপরন্তু পরিহাসে কৌতুকে ভরে রেখেছেন সীয়ান তাঁর সমস্ত নাটককে। এধরনের নাটক মঞ্চায়িত না হলে এর সমস্ত রূপ চোখের সামনে বেরিয়ে আসার কথা নয়। কিন্তু মঞ্চায়িত হবার সুবিধে আমাদের এখানে নেই। আপাতত, নাটক পড়তে হবে উপন্যাসেরই মত করে, যেটা বাংলা উপন্যাসের মত সাবলিল হবে না কোন দিক দিয়েই অসংখ্য তথাকথিত ভাবগভীর মুহূর্ত থাকা সত্ত্বেও। সুবিধে এই যে, একবার অপরিচয়ের পর্দা ছিঁড়ে ঢুকতে পারলেই দেখবো আমাদের চেনা তরুণ-তরুণীরা ভিড় করে আছে এই সব নাটকে।

সীয়ান ওক্যাসির নাটকের সঙ্গে 'চার অধ্যায়' থেকে শুরু করে 'জীয়ন্ত' পর্যন্ত উপন্যাসের আরেকটা জায়গাতেও মিল নেই। বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী অভ্যুদয়ের কর্মকাণ্ড প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ তরুণী এবং তাদের পরিবারের সংগ্রামকে আশ্রয় করেছে। সীয়ান ওক্যাসির নাটকের পাত্রপাত্রীরা কিন্তু প্রায় সকলেই শ্রমজীবী। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ অভ্যুত্থানের কথা আমরা জানি। ড্যান ব্রিনের লেখার মধ্য দিয়ে সে কথা আমরা পেয়েছি। তাতে যে শ্রমিক পরিবারগুলির তরুণ-তরুণীরাও গভীর ও সক্রিয়ভাবে জড়িয়েছিল, তা আমাদের সাধারণভাবে জানা নেই। বিশ কিংবা তিরিশের দশকের বাংলা এইভাবে শ্রেণীগত দিকটা ততটা খেয়াল করে দেখেনি নিশ্চয়।

ডাবলিনের শ্রমিক এলাকাগুলিতে একাধিক পরিবার অধ্যুষিত গৃহের ঘরের মধ্যে ঘর এবং ঘরের পাশে ঘর এবং গৃহ-পার্শ্বের সড়ক বা গলির দৃশ্যপটে মোটামুটি চার ধরনের মোকাবেলায় সীয়ান ওক্যাসির শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বিন্যস্ত। প্রথমটি সরাসরি বৃটিশ রাজের উৎখাতের লক্ষ্য নিয়ে সোজাসুজি সশস্ত্র শ্রমিক-নাগরিক বাহিনী গঠন করে বিদ্রোহ ঘোষণা।

শ্রমিক শ্রেণী এখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল অভ্যুত্থানের নায়ক; সমাজতন্ত্রী নেতা কনোলীর নেতৃত্বে ১৯১৬ সালের ডাবলিনে এপ্রিল মাসে ইস্টার বিদ্রোহে তিন হাজার শ্রমিক প্রাণ দিয়েছে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নেতা হিসেবে কনোলী এবং তাঁর সাথীদের ফাঁসি হয়ে যাবার পরে শ্রমিকশ্রেণী প্রায় নেতৃহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে যায় মাইকেল কলিন্স, গ্রিফিথ, ডিভেলরা প্রমুখ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের হাতে। ১৯২০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা দাবীতে যে বিদ্রোহ শুরু হয়, তার মূল উদ্যোগ থাকে এই নেতৃত্বেরই হাতে। ডাবলিনের শ্রমিক তরুণ তরুণীরা এই নেতৃত্বেরই নির্দেশিত পথে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করে ইস্টার বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ধারাবাহী হিসেবে। এর পরেই ১৯২২ সালে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায় স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং পূর্ণস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপন্থী হিসেবে। বৃটিশ রাজের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্যসম্পন্ন আইরিশ ফ্রী স্টেট স্থাপিত হওয়ার পরে জাতীয়তাবাদীদের একাংশ একে গ্রহণ করে এবং আরেক অংশ একে বর্জন করে। শুরু হল এই দুই অংশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ধারাতেই রক্তক্ষয়ী মোকাবেলা। এতেও ডাবলিনের তরুণ বয়সী শ্রমিকেরা শরিক হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একে তৃতীয় ধরনের মোকাবেলা বলা যেতে পারে। চতুর্থ ধরনের যে মোকাবেলাতে সারা আয়ার্ল্যাণ্ডের এবং বিশেষ করে ডাবলিনের শ্রমিক শ্রেণী নিয়োজিত হয়, সেটি হচ্ছে প্রথমোক্ত তিন ধরনের মোকাবেলায় সাধারণত অন্তঃশীলভাবে যে সাম্যবাদী সমাজের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে শ্রমিকশ্রেণী, তাকে খোলাখুলিভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই। এই পটভূমিতেই লেখা সীয়ান ওক্যাসির নাটক 'তারাটা লাল হয়ে গেলো।'

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পুরোগামী পতাকাবাহী হলেও শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে পারেনি। জাতীয়তাবাদী মধ্যস্বত্ত্ববাদীদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামির ধারক-বাহক গীর্জার যাজকদের প্রাধান্যই বজায় থেকেছে। সীয়ান ওক্যাসি নিজে একজন পুরোপুরি জঙ্গী শ্রমিককর্মী হিসেবে কনোলীর নেতৃত্বে ইস্টার বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়ে তিনি জড়িত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন যে সব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরই হালুয়া রুটির জন্য বেশি দরবা-দাবরি শুরু হয়ে গেল। সীয়ান ওক্যাসিকে এই কারণেই দেখা যায়, বৃদ্ধ বয়সে বৃটেনে বসবাস করতে। ১৯৬৪ সালে মৃত্যুও হয়েছে তাঁর বৃটেনে। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কারের' সম্পাদক মণ্ডলীর একজন হিসেবেই তাঁর নাম শেষ পর্যন্ত ছাপা হত।

কিন্তু সংগ্রামী শিল্পী জীবনের এত জটিলতা সত্ত্বেও এবং লাল পতাকা আর লাল গোলাপের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে তিনি খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করলেও এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেও আইরিশ মুক্তি সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পর্যায়কে তিনি যে নিষ্ঠা দিয়ে দরদ ঢেলে তাঁর নাটকে অভিব্যক্ত করেছেন, এমনভাবে আর কেউ করেননি। শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রাণ উৎসর্গ করেছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পর্যায়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের জয়গান গেয়ে, ঠিক যেমন বাংলার ছেলে-মেয়েরা প্রাণ দিয়েছিল হাসতে হাসতে, তেমনিভাবেই। সীয়ান ওক্যাসি তাঁর এই ধরনের নাটকে গোঁজামিল দিতে চেষ্টা করেননি, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আইরিশ তরুণ তরুণীদের জয়গান গাইতে দ্বিধা করেননি। তাঁর 'শ্যাডো অব এ গানম্যান' (Shadow of a gun man) নাটক এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বিশ এবং তিরিশের দশকের বাংলাকে সামনে নিয়েই যদি আইরিশ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক খুঁজতে যাই, তাহলে প্রথমে 'শ্যাডো অব এ গানম্যান'-এর মত নাটকই আমাদের মনে ধরবে। এর পরে আমরা সীয়ান ওক্যাসির অন্য সব নাটকের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করবো, কারণ বাংলা সাহিত্যে আরও আলো জ্বালা হয়েছে জাতীয়-মুক্তি ও গণ-মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে।

সীয়ান ওক্যাসি ডাবলিনের জাতীয় নাট্যমঞ্চ থেকেই নাটক লেখার প্রেরণা ও শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি এদিক দিয়েই ইয়েটসেরই অনুসারী। আইরিশ শ্রমজীবী জনতার মুখের ভাষাকে তিনি তাঁর নাটকে প্রখরভাবে উপস্থিত করেছেন। সীয়ান ওক্যাসি ইয়েটসের মতই লোকভাষী শিল্পী। কিন্তু সীয়ান ওক্যাসির কলমে এই লোকভাষা বেরিয়ে এসেছে প্রত্যক্ষ রক্তাক্ত সংগ্রামের তীক্ষ্ণ তীব্র আভরণহীন সত্যকথার মাধ্যম রূপে। এর মধ্যে তিনি হেঁয়ালি খোঁজেন নি। হেঁয়ালি ভরেননি। দরিদ্র ডাবলিনের যে বাস্তব রূপ আমরা জেমস জয়েসের অজস্রভাষিতার মধ্যেও পাইনি, তাকে পেয়েছি সীয়ান ওক্যাসির লেখায়। জয়েস এবং ইয়েটসের লেখার সঙ্গে না মিলিয়ে পড়লে আমরা সীয়ান ওক্যাসির অনন্যতাকে বুঝতে পারবো না।

সীয়ান ওক্যাসি জাত-আইরিশ। তবে তিনি সাম্যবাদী আইরিশ বলেই এই অনন্যসাধারণত্বে পৌঁছতে পেরেছেন।

তবে আগেই বলেছি, সীয়ান ওক্যাসির নাটক পড়তে হলে প্রচলিত উপন্যাসের সাবলিল কাঠামোতে অভ্যস্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাকে কিছুটা ধৈর্য নিয়ে এগোতে হবে।

শেখ সাদী যাঁকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারতেন

শেখ সাদী বলেছিলেন: 'যদি পারো তবে খর্জুর বৃক্ষের মত ফলবান হয়ে দানশীল হও; তা যদি না পারো তবে দেওদারের মত আকাশভেদী স্বাধীনচেতা হও।' এই দুই বিকল্পের কোন একটা হওয়া সম্ভব, এ নিশ্চয়তাবোধ তাঁর ছিল নিশ্চয়।

তের শতকের এই ইরানী কবি এমন এক বিদ্রোহী কথাশিল্পী যাঁকে সেদিনকার রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় পরিবেশ কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তবু, অনেকেই জানে, শেখ সাদী যা দেখেছিলেন তাই লিখেছেন। অন্ততপক্ষে পক্ষপাতী ছিলেন তিনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্য আর সৌন্দর্যকে কবিতায় মূর্তিমন্ত করে তোলার। এই কারণে তিনি মানুষের জন্য দুটো আয়ুর সুপারিশ করে বলেছিলেন যে, একটা আয়ু দরকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, আরেকটা আয়ু দরকার সেই অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য। সুতরাং একথা অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, খর্জুর বৃক্ষের মত ফলবান ও দানশীল আর দেওদারের মত স্বাধীনচেতা মানুষ তাঁর চোখে পড়েছিল, চাটুকারে পরিবৃত স্বৈরাচারী সামন্তবাদী পরিবেশেও। নজরে পড়েছিল ধূম্র-মুক্ত বহ্নিশিখা এখানে সেখানে নিপীড়িত জনসমাজের মধ্যেই।

শেখ সাদি যদি আমাদের বিশ শতকে জন্মাতেন, তাহলে তিনি নতুনতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কালোত্তীর্ণ নতুন কবিতা লিখতেন নিশ্চয়। জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-যাত্রার এই শতকে তিনি হয়তো আরেকটি শতাব্দীর আয়ু চেয়ে বসতেন সত্য এবং সার্থক কবি হবার জন্যে। ইরানেও যা ঘটেছে এই শতকে, তার কথা লিখবার জন্যে তিনি হয়তো আর্জেন্টিনার বীর বিপ্লবী চে গুয়েভারার মতো একবিংশ শতকের মানুষ হিসেবে নিজেকে দাখিল করে বসতেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের ইরানের যে স্ফুলিঙ্গগুলি চাপা পড়ে রয়েছে তেলওয়ালা দেশি-বিদেশি মালিকদের পীড়ন, অস্ত্র ঝনঝনা, হুল্লোড় আর জাঁকজমকের নীচে, তাকে শেখ সাদী নিশ্চয় তুলে আনতেন 'বজ্র মাণিকের মালা' গাঁথবার জন্যে। হয়তো শেখ সাদীর মতো কোন কবি জন্মেছেন আজকের ইরানে, হয়তো কোন কারাগারে বসে বুকের রক্তে লিখেছেন গণমুক্তিসংগ্রামের কথা। কিন্তু আমাদের কাছে এ-কবিতা অজানা। তাই শেখ সাদীর কথাই মনে হয়। মনে হয় আজ যদি তিনি জন্মাতেন, তাহলে আমরা জানতে পারতাম কী ঘটেছে ইরানে এই শতাব্দীতে। তাঁর কবিতাকে হয়তো কেউ স্তব্ধ করে রাখতে পারতো না। বিশেষ করে তুর্কী ইরানীর জীবন কাহিনীর একটা রেখাচিত্র হাতে নিয়ে মনে হয়েছে, আজ শেখ সাদী খর্জুর বৃক্ষ আর দেওদারের উপমাকে নতুনভাবে সাজাতেন। তিনি লিখতেন, নিজেকে বিলিয়ে দাও এবং স্বাধীনচেতা হও একই সঙ্গে, কারণ এই দুটোই একসঙ্গে সম্ভব। আজকের ইরানে এ ব্যাপার ঘটেছে। মহাকাব্য লিখতে না বসে শেখ সাদী তাঁর নিজস্ব ধরনের একটি দীর্ঘ গদ্য কবিতা লিখতে পারতেন এই তুর্কী ইরানীকে নিয়ে, যার জীবন উৎসর্গিত হয়েছে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে। আপাত ব্যর্থতার ছাইপাশ থেকে তুলে নিয়ে অবধারিত সার্থকতায় উত্তরিত করে দিয়ে যেতেন শেখ সাদী বিপ্লবী তকী ইরানীর আজও অবজ্ঞাত মহাকাব্যিক বীরের জীবন কথাকে। এই জীবনকথায় কবিতা, বিজ্ঞান আর মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সংগ্রাম একীভূত হয়ে রয়েছে।

তকী ইরানীর জন্ম ইরানের তাব্রিজ শহরে, তেসরা সেপ্টেম্বর ১৯০২ সালে। পাঁচ বছর বয়েসে তকী চলে আসেন তেহরানে এবং এখানেই তাঁর পড়াশোনার পালা শুরু হয়। বাবা এবং মা স্বল্পবিত্ত হলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তকী এবং তাঁর দুই বোন পেয়েছিলেন শিক্ষার সুযোগ।

১৯২০ সালে তকী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময়ে ইরানে শুরু হয়েছে ইংরেজ তেলওয়ালাদের খপ্পর থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামের ঝটিকাক্ষুব্ধ দিনগুলি। পরবর্তীকালে এই সংগ্রামই চলেছে মার্কিনী তেলওয়ালাদের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পরে ইরানের জনগণের মনে এসেছে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ধ্যানধারণা। তকী এই সংগ্রামী আবহাওয়ার যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর চোখ ছিল নতুন দুনিয়ার নবদিগন্ত আর অন্তরে ছিল শেখ সাদীর মত ইরানী কবিদের অগ্নিবাণী।

তখন ইরানের সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের অনেকে ইউরোপ যাচ্ছেন বিপ্লবী চিন্তাধারার আঁচ পাওয়ার জন্যে। তকী প্রগতিশীল বিপ্লবী তত্ত্বকে আরো ভাল করে বুঝে নেয়ার জন্যে ১৯২২ সালে জার্মানি রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। একটা কাজও নিলেন: একটি পত্রিকার প্রুফ দেখার চাকুরি। ১৯২৮ সালে তিনি বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে নিবন্ধ দাখিল করে ডক্টরেট পেলেন। এরপরেও আরও দুবছর থেকে গেলেন বার্লিনেই। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি এবং আরবি কবিতার ওপরে বক্তৃতা করতেন তিনি এ সময়ে। ইতিমধ্যে মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি তাঁর প্রথম বই লিখেছেন ১৯২৭ সালে। বইটর নাম 'মনস্তত্ত্ব'। তাছাড়া ফার্সি সাহিত্যের ওপরেও বই লিখেছেন। যেমন সাদী, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত, নাসির-ই-খসরুর জাফরনামা। এছাড়া ইরানের সাম্যবাদী দলের যে সব সদস্য তখন জার্মানিতে বসবাস করছিলেন তাঁরা কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, সিতারায়ে সুরখ্ (লাল তারা), পেকার (সংগ্রাম), বেরাকে ইনকিলাব (বিপ্লবের পতাকা)। এই পত্রিকাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদলেও তকী ছিলেন শীর্ষস্থানীয় খাটিয়ে।

১৯৩০ সালে জার্মেনি থেকে দেশে ফিরে এসে ডক্টর তকী ইরানি একদিকে যেমন শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তলা থেকে গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজেও হাত দিলেন। ১৯২৯ সালে ইঙ্গ-ইরানী তেল কোম্পানির শ্রমিকেরা তদানীন্তন ইরানের বৃহত্তম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত করেছিল এবং মে দিবসও পালন করেছিল তারা। ১৯৩০-৩১ সালে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিল এবং পর পর কয়েকটা ছোটখাট ধর্মঘট হয়ে গেল। তকী বললেন, দুইস্তরে একই সঙ্গে কাজ করতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে চুপচাপ গণসংঠনও গড়ে তুলতে হবে। সে সময়ে এ কাজের যেমন উপযুক্ত সংগ্রামী আবহাওয়া ছিল, তেমনি শাসক গোষ্ঠীর তরফ থেকে বিরোধিতাও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ১৯৩১ সালে দুহাজার প্রগতিশীল কর্মী ও বুদ্ধিজীবী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তিরিশের দশকের শুরু থেকেই ডক্টর তকী ইরানীকে অক্লান্ত কাজ আর গণসংগঠন তৈরির গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল।

তখন তেহরানে এই নবীন বয়সী বিজ্ঞান-শিক্ষককে পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তকী ইরানীকে বিজ্ঞানশিক্ষক হিসেবে পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে দরখাস্ত পর্যন্ত করেছে। এই

বিজ্ঞান শিক্ষক ১৯৩৬-'৩৭ সালে শিক্ষা বিভাগের একজন পরিচালক হিসেবেও গৃহীত হয়েছিলেন। বিদ্যালয়গুলিতে যেসব বিতর্ক হতো, তাতে তকী ইরানী মধ্যমণির মত চলাফেরা করতেন। তিনি এই শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও যেমন মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকেই কাজ করতেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মেহনতী মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে শেখাবার কাজও চালাতেন পুরোদমে। একদিকে, তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠ্য বই লেখার কাজে হাত দেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদির ওপর একসারি বই বেরিয়ে আসে তাঁর কলম থেকে। পাশাপাশি তাঁর কলমে বেরিয়ে আসে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ', 'বিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব', 'মরমীবাদ ও বস্তুবাদ' নামক বই। ১৯৩৪ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল—'দুনিয়া'। এই 'দুনিয়া' পত্রিকার মধ্য দিয়েই তকী ইরানী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা এবং উপনিবেশবাদও সাম্রাজ্যবাদী কব্জার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানাতে শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে সরকারি আদেশে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ডক্টর তকী ইরানী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। তেহরানের বুদ্ধিজীবী আর তরুণ সমাজের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রসারের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে তিনজনকে নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয়, তকী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৩৭ সালে শাসকচক্র সাম্যবাদীদের ওপর বড় রকমের আঘাত হানলো। তিপ্পান্নজনকে বিপ্লব প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত ও গ্রেফতার করে তেহরানের কারাগারে আটক করা হলো। তকী ইরানী হলেন এই তিপ্পান্নজনের একজন।

এই কারাজীবনেই তকী এমন একটি কাজ করলেন, যা শেখ সাদীর উত্তরাধিকারীরাই উপযুক্ত। ১৯৩৭-৩৮ সালের শরৎ থেকে শীতকাল পর্যন্ত সাতমাস তকী ইরানীকে কাটাতে হয়েছিল নির্জন কারাগারে। কারাগারের বিভিন্ন জায়গায় আবদ্ধ নির্যাতিত সাথীদের কাছে একটি ছোট চিঠি পাঠিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছিলেন তকী। এটা হয়েছিল 'অপরাধ' এবং এই অপরাধেই তাঁকে আটকানো হয়েছিল নির্জন কুঠুরিতে। তাঁর বিছানা আর কাপড় চোপড় থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়। একটা সুতির চাদর ছিল তাঁর, এটাই ছিল শেষ পর্যন্ত তাঁর বিছানা। এটাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিরাভরণ শক্ত মেঝের ওপর নিদ্রা যেতে হত তাঁকে। জেলখানার লোকেরা এই মেঝেটাকেও প্রত্যেক দিন ধুয়ে স্যাঁতেসেঁতে করে দিয়ে যেতো। খাওয়ার অবস্থা ছিল নিকৃষ্ট, তৃতীয় শ্রেণীর। তকী দেখলেন, এরকম একা অবস্থায় তিনি যদি তাঁর দেহ-মনকে সর্বদা সজাগ রাখতে চেষ্টা না করেন, তাহলে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়বে। তিনি ঠিক করলেন যে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তিনি তাঁর শিক্ষকতা-জীবনের সক্রিয় আর সচল অভিনয় চালিয়ে যাবেন। প্রতিদিন সকালে উঠে বন্দীজীবনের বরাদ্দ করা এক টুকরো রুটি আর পানি খাবার পরে শুরু হতো তাঁর অভিনব অভিনয়। তিনি মেপে মেপে পা ফেলে কুঠুরির মধ্যেই ততখানি পথ পায়চারি করতেন, যতখানি তাঁর বাসা থেকে বিদ্যাভবনে পৌঁছুতে লাগতো। তারপর কয়েক ঘণ্টা চলতো পড়ানোর অভিনয়। সামনে যেন ছাত্রছাত্রীরা বসে রয়েছে, এমনি কল্পনার ছবি সামনে রেখে ডক্টর তকী ইরানী মেঝের ওপর ইঁটের টুকরো দিয়ে বিজ্ঞানের সূত্র আর অঙ্কের হিসাব ঘষঘষ করে লিখতেন, বক্তৃতা করে

বুঝিয়ে দিতেন। তারপর সারাদিনের ক্লাস শেষ হয়ে গেলে বাসায় ফিরতেন। অর্থাৎ ঠিক ততখানি দূরত্ব পায়চারি করতেন কুঠুরির মধ্যে, যতখানি বাইরে তাঁর বাসায় ফিরতে লাগতো। সবটাই অভিনয়, তবে সচল অভিনয়। এই অভিনয়ই ছিল নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম, যা তকী ইরানীকে নির্জন কারাবাসে স্ফূর্তি জোগাতো। নির্জন কারাবাসের মেয়াদ শেষ হলে যখন তিনি অন্যান্য সাথী ভাইদের সঙ্গে একত্রিত হলেন, তখন শুরু হলো নতুন লড়াই। রাজনৈতিক মর্যাদার দাবীতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটে শরীক হবার দায়ে বন্দীদের কয়েকজনকে কারা-কর্তৃপক্ষীয়রা নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিল। তকী ইরানী ছিলেন বাছাই করা প্রহৃতদের মধ্যে একজন।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে শুরু হল তিপ্পান্নজনের বিচার। ইরানের বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলা। তকী ইরানী তাঁর সাথীদের বললেন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বক্তব্য বলবেন। বিচারালয়কে তকী ইরানী আর তাঁর সাথীরা নতুন দুনিয়ার নতুন মানুষের বক্তৃতা মঞ্চে পরিণত করলেন। শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবার জন্য মেহনতী মানুষের সহজ সরল প্রত্যাশা ও সংকল্পকে পেশ করা হল এই বক্তৃতামঞ্চ মারফত। অন্যান্য সাথীর সঙ্গে তকী ইরানীরও সাজা হয়ে গেল। দশ বছরের জেল। তারপর ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারির এক কুয়াশা ঢাকা দিনে ৩৮ বছর বয়সে শেখ সাদীর কবিতার সম্ভাব্য বিপ্লবী নায়কের মৃত্যু হল কারাগারে। টাইফয়েড হয়েছিল তাঁর। টাইফয়েডে আক্রান্ত এক বন্দীর কুঠুরীতে তাকে আটক রাখার ফলেই তিনি এই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কোনরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি।

মাত্র আটত্রিশটি বছরের মধ্যে তকী ইরানী ইরানের জনগণের জন্যে যা রেখে গিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত আখ্যানে অনমনীয়তা আর কমনীয়তা, বিদ্যা আর মেহনত, সংগ্রাম আর ভালবাসা, জ্ঞানের সাধনা আর নির্যাতন বরণ, কবিতা আর বিজ্ঞান স্তবকে স্তবকে সাজানো রয়ে গিয়েছে ইরানের গোলাপের পাপড়ির মত। কবিতার চর্চা করলেও আয়ু তিনি পাননি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপ দেবার। তবে মেহনতী জনগণ চির-আয়ুষ্মান এবং নিদ্রোত্থিত। সুতরাং শেখ সাদী আমাদের কালে জন্মালে যাকে নিয়ে গদ্যমহাকাব্য লিখতেন, তাঁর জীবনকথা অলিখিত থাকবে না।

শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে

সাহিত্য

সাহিত্যের সংজ্ঞা

শিল্পী বললেই আমরা এক বিশেষ ধরনের লোককে বুঝি। কেউ পটুয়া, কেউ নট, কেউ গায়েন, কেউ বায়েন, কেউবা কবি। এরা এক বিশেষ ধরনের কাজ করে, যাকে আমরা বলি শিল্পকলা। এই শিল্পকলায় প্রকারভেদ আছে। কিন্তু সবাই এক ব্যাপারে পারদর্শী, তাই এক জাতের। এরা আমাদের মনে রঙ ধরিয়ে দেয়। আমাদের বাসনা, ভয়, ঘৃণা, আশা প্রমুখ আবেগকে সক্রিয় করে; আমাদের মানবীয় প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করে, বইয়ে দেয় এক নতুন ধারায়। আমাদের সরু মোটা অনুভূতি নিয়ে এদের কারবার। পাথরে হোক, রঙে রেখায় অক্ষরে হোক, তারে বা টানা চামড়ায় অথবা কুমড়োর খোলে হোক, শিল্পী এরা অভিন্ন এদিক দিয়ে যে এরা সবাই আমাদের প্রবৃত্তি, আবেগ ও অনুভূতিকে দোলা দেয়, ঘুম পাড়ায়, নাচায়, মাতায়, সক্রিয় করে। যে কোন ধরনের শিল্পকলার উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রথমত এরা আমাদের আবেগ ও অনুভূতিকে কতোখানি স্পর্শ করতে পারলো তার উপর। আমরা স্পর্শমাত্র কতোখানি সামিল হতে পারলাম, তার উপর নির্ভর করে শিল্পকলার শিল্পীর সার্থকতা।

সাহিত্য এমনি একটি শিল্পকলা।

শিল্পী তাজমহল গড়ে, হয় সে স্থপতি। শিল্পী রেখা-রঙে কালিঘাটের পট আঁকে; নাম নেয় সে চিত্রশিল্পী। শিল্পী ভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালন ও আঙ্গুলের মুদ্রার মাধ্যমে জারী কথক নাচ নাচে, হয় সে নর্তক-নর্তকী। কণ্ঠে হোক যন্ত্রে হোক তাল-মান-লয়ে ধ্বনিতরঙ্গ তুলে সুর ও সঙ্গীত প্রবাহ বইয়ে দেয় ধ্রুপদ বা ভাটিয়লীতে; শিল্পী হয় সুরকার। অঙ্গভঙ্গিকে ও চলাচলকে সংহত করে আবৃত্তির মাধ্যমে চরিত্র ও ঘটনাকে যাত্রায় এবং নাটকাভিনয়ে অবিকল হাজির করে শিল্পী; তাকে বলি অভিনেতা। আর শব্দ এবং পদবিন্যাসের মাধ্যমে রক্ত মাংসের মানুষকে তাদের পারস্পারিক সম্পর্কে ব্যক্ত ক'রে শিল্পী হয় কথাশিল্পী। সাহিত্য হচ্ছে শব্দ এবং পদ বিন্যাসের শিল্পকলা।

সাহিত্যের সাধনযন্ত্র কথা। থরে থরে স্তবকে স্তবকে সাজানো কথার পর কথা। কালিদাসের মেঘদূতে যেমন, নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীতেও তেমনি। সেকসপীয়ারের নাটকে যেমন, গোর্কীর উপন্যাসেও তেমনি।

মায়াকভস্কীর কবিতায়, পূর্ববঙ্গ গীতি কাব্যে কথাই শিল্পীর অবলম্বন। সুললিত, ঋজু, ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া, মন্দ্রিত এবং ঘুমঘুম ও ব্যঞ্জনাময় কথার কথা সাজিয়ে কথাশিল্পী পঙক্তি থেকে শুরু করে মহাকাব্য লিখে বসে।

যার কথার উপর দখল নেই তার কথাশিল্পী হবার যোগ্যতা নেই।

কথাশিল্পী অন্যান্য শিল্পকলার সমঝদার হতে পারে, নিজের রচনার মধ্যে তার দখলকে সঞ্চারিত করতে পারে, এতো অহরহ চোখে পড়ে। সাহিত্য অন্যান্য শিল্পকলাকে আপনার অঙ্গীভূত করে নেয়। রোমাঁ রলাঁর উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফে পাই সুরের আস্বাদ। ইস্কাইলাস ইউরিসাইডিসের নাটক হয়েছে ক্লাসিক বা বনেদী সাহিত্য।

শকুন্তলা নাটকে দুষ্যমন্তের সামনে যেন সত্যিকার শকুন্তলার আলেখ্য। এমন বর্ণনা। শব্দের পর শব্দ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্বরবর্ণের সঙ্গতি, অনর্গল নির্গত আলাপ, সমগ্র নিসর্গকেও মূর্তিমন্ত করে তোলে। আবার কারুর লেখায় চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে নগরীর মালা। মনে হয়, কথাশিল্পীর হাতে কম্পাস আর স্কেল রয়েছে। মার্কিন লেখক সিনক্লেয়ার লুইসের বই, "মেইন স্ট্রীটের" কাঠামোতে স্থপতির হাত রয়েছে। ইত্যাদি। এইসব কারণে সাহিত্যের সংজ্ঞায় কথা ছাড়াও অন্যান্য শিল্প পদ্ধতির আমেজ এসে লাগে। শিল্পীর বিশেষ কৃতিত্ব কোন্ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে, সেটা বলতে গিয়ে দ্বিধা জাগে। কিন্তু সঠিক জবাব বার করাও খুব কঠিন নয়। যে সাহিত্য অন্যান্য শিল্পকলা অন্যান্য শব্দ বিন্যাসকে ছাড়িয়ে যায়, তার উৎকর্ষ প্রকট হতে পারে অন্যান্য শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিস্তারে; কিন্তু সেই কারণে সাহিত্যমর্যাদা যে বাড়বেই এ-কথা বলা যায় না। কথার প্রতিপত্তি অনস্বীকার্য। সাহিত্যকার প্রধানত শব্দশিল্পী। আর শব্দশিল্পী শিল্পী হিসেবে আমাদের মানবীয় প্রবৃত্তি, আবেগ, এবং অনুভূতির কারবারী, আমাদের মানবিকতা কথাকে আশ্রয় করে মেঘ দর্শনে ময়ূরের মতো আত্মপ্রকাশ করে তাকেই বলবো সাহিত্য ।

সাহিত্য কি, এই প্রশ্নের জবাব উপরোক্ত সংজ্ঞায় সহজ ও সরল মনে হয়। কিন্তু এব্যাপারটা সরল নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে থরে থরে সাহিত্য সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। পাঁচ হাজার বছর আগেকার সাহিত্য থেকে শুরু করে অতি আধুনিকের মেটামুটি সঞ্চয়। গ্রীসের মহাকবি হোমার থেকে শুরু করে কালিদাস, ওমর খৈয়াম ও সেক্সপিয়ারের পাশাপাশি সোভিয়েটের শলোকভ, চিনের লুসুন, বাঙালি সুকান্ত, শেকোয়ার ইকবাল এবং মহাশ্মশান কাব্যের কায়কোবাদের লেখা এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। কথা, কথা, কথা, যাদু মাখা কথা। ঝলমলে ঋজু সোজা বাঁকা কথা। সাজনদার সবাই কথা শিল্পী।

কিন্তু আমরা সব্বাইকে শিল্পকলার স্বীকৃতি দিয়ে উঠতে পারিনা। গত ৫ হাজার বৎসর ধরে যে অগণিত কথা শিল্পী যুগে যুগান্তরে কথার মালা দখল করে গিয়েছেন আমারা তাদের একই মূল্যে কদর করি না। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি কোন এক বই যে দিনকার লেখা সে দিন নিশ্চয় এর আবেদন ছিল প্রচণ্ড। শিল্পী আর সমঝদারদের বাসনা কামনা একে অবলম্বন করে তরঙ্গিত হয়েছিল। আজ গ্রন্থাগারে এমন অধিকাংশ বুড়ো প্রজাপ্রতির মতো মরে পড়ে আছে। কারো মধ্যে ছাই চাপা পড়ে রয়েছে স্ফুলিঙ্গ, প্রাণের অগ্নি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে যায়নি। তবে বইয়ের মধ্যে ঠেলে ঢুকতে হয়। অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, ছাই ঘাটতে হয় আগুনের কণা খুঁজতে। কথার পর কথা সাজানো। কিন্তু হারিয়ে গেছে সেই জাদু। যা দিয়ে একদিন অগণিত হৃদয়কে মাতিয়েছিল, হৃদয়ে হৃদয়ে তুলেছিল আবেগের উঁচু নিচু ঢেউ। শুধু যে অসংখ্য কথা-শিল্পীকে আমার খারিজ করে দিচ্ছি তা নয়, যাদের আমরা যে কোন কালে যে কোন দেশে সমাদর করে বরণ করে নেই তাদের বিশেষ বিশেষ বই আমদের রসবিচারের মনাদণ্ডে টেকেনা। বনিয়াদী যুগ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত অনেক নামজাদা লেখকের অনেক লেখাই বাতিল করে দিয়ে থাকি। এমনকি সেকস্‌পিয়ারের কোন

কোন বই। রীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা, রোঁমা-রোঁলার নাটক সম্মন্ধে আমরা বলি, এ লেখার স্বার্থকতা কি? আধুনিক এক ধরনের উপন্যাসে একটি লোকের একদিনের নিত্যান্ত সাধারণ কথা লিখতে গিয়ে ৫ শত পৃষ্ঠার বই হয়ে যায়। যে সব বই দিয়ে এরকম বিস্তৃত লেখা শুরু হয়েছে, তাদের বৃহৎ আকৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছেন। পাঠকের পক্ষে সামলানো মুশকিল। স্বভাবতই আসে কথার অপচয়ের ও সংযমের সমস্যা। কিন্তু এরা যে দিন থেকে এসেছে প্লাবনের মতো সেদিন থেকে কারুর মিতাচারের পরোয়া করেনি। গত দুই শতাব্দী ধরে দৈনন্দিন আটপৌরে ঘটনা নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস লেখার ধারা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে আসছে। ঘটনা যুগান্তকারী হলে তো কথাই নেই। এক চার্লস ডিকেন্সের সবগুলি বই শেষ করতে বহু সময় লেগে যায়। সোভিয়েট উপন্যাসেও এই কথার প্রাচুর্য। তবে এদের আবেদনকে অস্বীকার করবে কে? বরং বই মোটা না হলেই সাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। হৃদয় অতৃপ্ত থাকে। আমাদের হৃদয় চায় বিস্তার ও গভীরতা। এমন আগে চায়নি। এমন হৃদয় আগে ছিল না, এমন কথাতেও ছিল না প্রয়োজন। শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে আমাদের মন বসেনি। প্রশ্নটা সোজাসুজি আরেকভাবে আসছে। অতীতের সমসাময়িকরা এ ওর লেখাকে খারিজ করতো। আমরাও তাই করছি। কোন বই দুটি মেয়ের, কোন বই বহুমনের, কেউ মহাজন, কেউ হীন।

কথার লালিত্য, ব্যঞ্জনা, সংযম ও প্লাবন, স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা কালে কালে রক্ষকের আকুতিকে তুচ্ছ করে পরিবর্তিত হয়ে এসছে। নতুন নতুন হৃদয় নিয়ে কারবার করে এসেছে এরা যুগে যুগে। নতুন নতুন ধরনের মানুষের অনুভূতির নতুন নতুন উত্তোরণের সাহিত্য কায়া বদলেছে। আর একই কালে সাহিত্যের নানা রূপ–হৃদয় অভিন্ন।

এই দ্বিবিধ রূপ ও বিস্তার আমাদের সাহিত্যের সংজ্ঞাটিকে গোলমেলে করে তোলে। গত পাঁচ হাজার বৎসরের অলিখিত ও লিখিত কথাসরিৎ সাগরে আমরা ডাঙ্গা খুঁজে পাই না। প্রশ্ন জাগে কথা ও আবেগ অনুভূতিকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কিছুর উপর সাহিত্যের আবেদন নির্ভর করে কি? কথাকে ছাড়িয়ে মানবীয় প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতির আবেদন ছাড়িয়ে অন্য কোন উপাদান আছে সাহিত্যে যা তাকে একটি বিশিষ্ট শিল্পকলায় উতরে দিয়েছে? কথা বদলে যায়, হৃদয় বদলে যায়–বিভিন্ন হয়। তবে কোন সে সূত্র যা এদের যুগ যুগান্তরে গ্রন্থিত করে সাহিত্যকে একটি সামগ্রিক বিশেষত্ব দেয় এবং যার সাহায্যে আমরা কথাশিল্পীকে গায়েন, স্থপতি, নর্তক ও অভিনেতা থেকে আলাদা করতে পারি? কোন সে বনিয়াদ যার গঠনের চরিত্র বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কথা নতুন সাজে সন্নিবিষ্ট হয়?

পণ্ডিত ও আলেমরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ যুগে যুগান্তরে এ বিষয়ে মতামত দাখিল করে গিয়েছেন। বিশেষত্বের সূত্রটি কখনো পরিস্ফুট হয়েছে, কখনো ছিঁড়ে গিয়েছে। কালে কালে মানুষ আপন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বনিয়াদকে স্পর্শ করেছে, আবার হারিয়েছে। কিন্তু কে সে? কেন তাকে পেয়েও পাই নি? কি করে পাব তাকে?

ভাষ্যকারদের কাছে আমাদের প্রশ্ন

ভাষ্যকাররা সাহিত্য দপর্ণ হাতে নিয়ে সাহিত্যকে চিনতে ও চেনাতে চেষ্ঠা করে আসছেন স্মরণীয় কাল থেকে। কিন্তু সামগ্রিক ভাষ্য পাওয়া এক সমস্যা। কখনো অলঙ্কারটুকু, কখনো গুঞ্জন, কখনো মধু সাহিত্যের অন্তঃসার বিবেচিত হয়েছে। কারুর মতে সাহিত্য যুগ যগান্তরের সঞ্চিত বোধি। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের ব্যাখ্যায় কাব্য বা সাহিত্য মানুষের আবেগের পরিশোধক। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতানুসারে আধুনিক কাব্য জিজ্ঞাসার গ্রন্থকার মত দিয়েছেন, সাহিত্য সভ্যতার মৈত্রেয়ীরূপী সাধনার একটি ধারা। কর্মগন্ধহীন শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চার মতোই একটি ধারা। এই হিসাবে সাহিত্য রস ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। এক কথায় কাব্য আর উপনিষদ যেন সহোদর। অর্থাৎ কাব্যও ঊর্ধ্বলোকের সন্ধানী। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে সাহিত্যের বিচার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাহিত্যের উপকরণ সম্পূর্ণরূপে লৌকিক। কখনো সিদ্ধান্ত হয়েছে লৌকিক হোক আর অলৌকিক হোক, সাহিত্য নিজেই নিজের পরিচয়। শিল্পেই শিল্পের সার্থকতা–এই মতানুসারে সাহিত্যে অন্য–নিরপেক্ষ রূপের প্রাধান্য। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, যার একদিকে মধু আর একদিকে ভ্রমরগুঞ্জন সেই তো সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় যা সঙ্গে থাকে তাইতো সাহিত্য; মানুষের জীবনলীলার সাথী। আধুনিক ভাষ্যকারদের আরও নানান মত। কেউ সংজ্ঞা দিয়েছেন, সাহিত্য শিল্পী ও গ্রহীতা–কে যুক্ত করে একই উপলব্ধিতে। কেউ এই উপলব্ধিকে সংক্রামিত দেখেছেন একই কর্মে।

আধুনিক এক ভাষ্যকারের মতে, সাহিত্য লেখকের বক্তব্যের বাহন। কথার কাজ তাই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়া দরকার যাতে লেখকের বক্তব্য পরিষ্কার ফুটে উঠে চশমার কাচের তলায় বই এর মতো। এই বক্তব্য আবার প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক। এই আধুনিক ফরাসি লেখকের মতে, মনস্তত্ত্ব হচ্ছে সাহিত্যের একটি স্থায়ী সূত্র। এই লেখকই আবার বলেন, সাহিত্যের বিষয় হচ্ছে বিশ্ব জগতের মানুষ। অস্পষ্ট ভাবে একটা সামগ্রিক সংজ্ঞা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু লেখক যখন বলেন, লেখক বিমুক্তভাবে নব জীবনের চালকের কাজ করেন, তখন মানুষ চলে যায় বিশ্ব জগতের উপরে।

দেহের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যকে আরও ঘনিষ্ট করে দেখাবার জন্য এক ধরনের ভাষ্যকার বলেছেন, সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ মনোরাসায়নিক। কেউ বা বলেছেন সাহিত্যের সূত্র পাওয়া যাবে নিতান্ত পার্থিব ও সামাজিক পরিবেশে। কারুর মতে আবার সাহিত্য দেহজাত হলেও দেহকে অতিক্রম করেছে। দেহাত্মবাদীরা সাহিত্যে কায়াকান্তির সন্ধানী।

ইংল্যাণ্ডের আধুনিক কবি স্পেণ্ডার আগে মনে করতেন, সাহিত্য ধ্বংসাত্মক, এখন মত বদলে জোর দিচ্ছেন সৃজনাত্মক চরিত্রে। স্থূল সূক্ষ্ম পরস্পরবিরোধী এমনি আরো আনেক সংজ্ঞার কথা আমরা জানি। দৃষ্টিকোণে এক আধ ডিগ্রীর পার্থক্য, কিংবা আরো কম। তবু নানারকম আলো ছায়ায় অপরূপ।

এই বিভিন্ন সংজ্ঞার মাঝখানে আমাদের কথা আর আবেগের সংজ্ঞাটিকে হাজির করে যদি আমরা মনে করি, এর সভ্যতার সামনে টিকতে না পেরে অন্যান্যরা সসম্মানে পিছু

হউবে, তাহলে আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করবো। কাল কালান্তরে বিভিন্ন সংজ্ঞা এক একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হয়েছে এবং আজও এদের কয়েকটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এটা ঠিক যে সাহিত্য দর্পণে প্রতিফলিত ভাষ্যগুলির কোনটাই আর সামগ্রিক বিচারের মানদণ্ড হিসাবে আংশিকভাবে গ্রাহ্য হবে না, তবুও এদের ফাঁকা বলে একপাশে ঠেলে দিয়ে শুধু সহজ অভিজ্ঞতার সত্য হিসাবে আমাদের ভাষ্যকে দাঁড় করাতে পারবো না। কথা ও আবেগের সহজ সরল উপকরণ দিয়ে সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করাতে পারলেই আমাদের সংজ্ঞা প্রমাণসিদ্ধ হবে না। ফতোয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি? গত পাঁচ হাজার বৎসরের জমানো কথার শুধু ভাণ্ডার পেশ করে কিংবা মানবীয় প্রবৃত্তি, আবেগ ও অনুভূতির বৈচিত্র্য তুলে ধরে আমরা ব্যাখ্যার ভারই যেন না বাড়াই সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সাহিত্যকে দেখতে হবে তার ইতিবৃত্তের জন্মসূত্রে, আঁকা বাঁকা গতি পরিণতিতে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো, সাহিত্যের জন্ম ও বৃদ্ধির অবিরাম অগ্রগতিকে, যার মধ্য থেকে উপরোক্ত নানা সংজ্ঞা যুগে যুগান্তরে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ফলে বাতিল হয়েছে, সম্ভব করেছে নতুন সংজ্ঞাকে। আমরা যদি বিচার করতে পারি সমগ্রতায়, তাহলেই আমাদের সংজ্ঞা ফতোয়া হবে না। মনে রাখা দরকার, আমরা যে সহজ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি, আগেকার ধাপে ধাপে উত্তীর্ণ আংশিক সিদ্ধান্ত গুলির অনেক তথ্য তার অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। আংশিক সিদ্ধান্ত গুলির মধ্যে ফতোয়ার সঙ্গে ছাই এর গাদার মধ্যে নানা জিজ্ঞাসার অগ্নি কণাও আছে। আমাদের কর্তব্য, এই জিজ্ঞাসাগুলিরও কিনারা করা। সাহিত্য বিচারে ফতোয়ার সন্তুষ্টি পরিহার করতেই হবে। ভাষ্য যত সূক্ষ্ম ন্যায়সম্মত ও সমৃদ্ধ হোক না কেন, সে যদি আংশিক হয় তবে আমরা বাধাগ্রস্থ হবো। মধু থেকে যেমন ফুল হয় না, তেমনি রস থেকে সাহিত্য হয় না। কথা আর আবেগক নিয়ে সাহিত্য, এই কথাও সমধিক অদ্ভুত মনে হবে যদি একে সাহিত্যের গতি পরিণতির দিক থেকে না পাই।

সাহিত্যের এই গতি পরিণতির সামগ্রিক ইতিবৃত্ত ঘাটতে গিয়ে আমরা একটি দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হই। সাহিত্যের নাড়ির বন্ধন রয়েছে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে। শুধু তাই নয়। নাড়িতে নাড়িতে বাঁধা সে সাধারণভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে, মানবতার সঙ্গে, সমগ্র মানব-সমাজের গতি বিস্তারের সঙ্গে। সাহিত্যকে বুঝবার জন্য তাই সমগ্র মানব-সমাজের বিকাশ সমন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন সংস্কৃতির জন্ম বৃদ্ধির ইতিবৃত্ত জানার। সংস্কৃতিকে জানতে গিয়ে জানতে হয়, মানবীয় প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতিকে, মানবদেহকে। জানতে হয় মনন বা চেতনার স্বরূপকে। সঙ্গে সঙ্গে এদের সবাইকে নিয়ে প্রকৃতিকে।

আলোচনার মাঝখানে এদের মাত্রাধিক্য হলে সাহিত্য বিচার চাপা পড়ে সমাজতত্ত্ব ভারী হয়ে যেতে পারে। অথচ মানব সমাজ, সংস্কৃতি, মনন বা চেতনা এবং মানবদেহ সমেত পরিবেশের ইতিহাসসম্মত ও পরস্পরনির্ভর গতি প্রকৃতি নির্ণয় করতে না পারলে আমরা কোন জিজ্ঞাসার কিনারা করতে পারব না। আমাদের সাহিত্য চিন্তায় মোটামুটি একটা সর্বাত্মক পটভূমি আনতেই হবে। কারণ ফতোয়া দিয়ে আজকালকার

সমৃদ্ধমনা মানুষকে প্রবোধ দেওয়া সম্ভব নয়। নতুন সমাজের নতুন মানুষ সমগ্রভাবে জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য এগিয়ে আসছে।

[দুই]

মানব-সমাজের ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠাগুলি উল্টে দেখা যাবে, মানুষ সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির ক্রমবিকাশের অংশ হিসাবে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা হয়ে এলো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে। একটি জীবিকা আর্জনের হাতিয়ার; দ্বিতীয়টি মনন বা চেতনা। দলবাঁধা মেহনতি মানুষ দলবাঁধা অন্যান্য জীব থেকে ভিন্ন সত্তায় পৌঁছেছিল এদের সহযোগে। এই দুই উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে সেই আদিম যুগেই দল হয়েছিল সংগঠিত সমাজ। এই দিক থেকে সমাজকে তৃতীয় বিশেষত্ব বলবো। ক্রমবিকাশের পথে এদের আত্মপ্রকাশ। এরা নিরন্তর ঘাত, প্রতিঘাত ও মিলনের মধ্যদিয়ে একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পরস্পরের পার্থক্যের প্রসারের দিকে এদের রয়েছে গতি। এদিক দিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমগ্র ধারার অংশ হিসাবে রয়েছে এদের ঐক্য। স্বতন্ত্র হিসাবে সার্থক হতে গিয়ে একে অন্যের প্রতিকূল। আবার সমগ্র হিসাবে সমৃদ্ধ হতে গিয়ে একে অন্যের অনুকূল। এদের কোনটিকেই সম্পূর্ণ পৃথক করে পাওয়া এবং পরীক্ষা করা যায় না, যদিও নির্দিষ্ট করা যায় এদের নিজ নিজ বিশেষ ক্রিয়ায়।

জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার

জীবিকা সংগ্রহের ব্যাপারে দৈহিক সক্রিয়তা বা পরিশ্রম আদি উপাদান-অপরিহার্য। তবে দৈহিক উপাদানকে অধিকতর সমর্থ করেছে হাতিয়ার। হাতিয়ার আয়ত্তে আসার পর মানব সমাজ অন্যান্য জীবকে নিশ্চিতরূপে ছাড়িয়ে এসেছে। অগ্রসর হয়ে এসেছে তার পর থেকে ক্রমাগত। প্রকৃতির কাছ থেকে অর্থ বা গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণ সংগ্রহের জন্য মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকেই হাতিয়ার বার করে নিয়ে আসে। গড়তে এবং উন্নত করতে শেখে। উদাহরণ, শিকারের জন্য পাথরের ফলা; ভারী জিনিস সামলাবার জন্য ঠেকা; গলানোর জন্য আগুন; পরে কর্ষণের জন্য লাঙ্গল। এই সব হাতিয়ার তৈরি এবং ব্যবহার করার মেহনতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে দলবাঁধা মানুষের পরস্পর সম্পর্ক বা সংগঠন, অর্থনৈতিক সমাজ। হাতিয়ার উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন হাতিয়ার আমদানি হলে দেখা গিয়েছে, অর্থনৈতিক সমাজের রূপান্তর হয়। অবশ্য, পুনরুক্তি হলেও বলতে হয় যে মেহনত বিনা সর্বোত্তম হাতিয়ারও বেকার ও ব্যর্থ। মানব সমাজের গতি ধারার আদিতে গায়ের খাটনি ছিল প্রধান নির্ভর। আঙ্গুল আর পেশীর সঞ্চালনের উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হতো। আজকাল আঙ্গুল আর পেশীর, চোখ আর কানের কাজ করে যন্ত্র। তবু মেহনত অপরিহার্য। কারণ মূলত হাতিয়ার বা যন্ত্র মানুষের সক্রিয়তার অঙ্গ হিসাবে স্বয়ংক্রিয়। সক্রিয় মানুষের সাধনায় তার জন্ম। মানুষের সক্রিয়তায় তার প্রসার।

সক্রিয় মানব

মানব সমাজের চরিত্র বিচারে দেখা যাবে, সমাজ সক্রিয় হয় বিভিন্ন ব্যক্তির এক সূত্রে গাঁথা সক্রিয় সহযোগিতায়। বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক প্রকৃতি এক; অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র হলেও মানব দেহ মূলত একই ভাবে গঠিত। সাদা হোক, কালো হোক, খুলি ও চোয়ালের আকৃতি যেমনই হোক, সাধারণ মানবিক (দৈহিক) উপাদানগুলি প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান। সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এই দেহগত ঐক্য রয়েছে; গোষ্ঠীর মধ্যে তো অত্যন্ত স্পষ্ট। একই কাজে নানা লোক তাই এক ধরনের প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে ওঠে বসে। অন্যান্য জীবের মতো এই প্রবৃত্তি আবেগ অনুভূতি দেহজাত। রক্ত মাংসের দেহের দিক থেকে দেখলে মানুষ অন্যান্য জীব থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। এদিক দিয়ে আদিম যুগে মানুষ অন্যান্য জীবের আরো কাছাকাছি ছিল। তবে আদিম কালেই দৈহিক স্বভাবেও পরিবর্তন আসছিল। অন্যান্য জীবের মতো পঞ্চেন্দ্রিয় অব্যাহত থাকলেও শুধু চেহারাই বদলাইনি, বদলেছিল অন্তর্লোকও। কারণ মানুষের বিশেষ সমাজ সংগঠন।

প্রকৃতির সঙ্গে যে সরাসরি যোগে অন্যান্য জীব সচল হয়, প্রকৃতি ও মানব দেহের মধ্যে সে সরাসরি যোগ নেই। প্রকৃতির আহ্বানে মানুষ সরাসরি সাড়া দেয় না। পাখির মতো, প্রজাপতির মতো। প্রকৃতির নানা ডাক যখন পাখি এবং প্রজাপতির দেহ তন্ত্রীতে এসে বাজে, তখন সাড়া দেয় দেহগত ভাবে; অপেক্ষা করে না অন্যান্যের সম্মতি বা সঙ্গতির। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ কিন্তু সমাজ মারফত। অন্যান্য জীবের মতো খালি চোখে মানুষ প্রকৃতি দেখে না। ক্রিস্টফার কডওয়েলের ভাষায়, প্রকৃতিকে মানুষ দেখে সামাজিক চশমা দিয়ে। অবশ্য এটা ঠিক যে, চশমার কাজ মাঝে মাঝে এত বেশি স্বচ্ছ হয় যে চোখ খালি বললে অত্যুক্তি হয় না। সমাজ শিথিল হলে এই অবস্থা হতে পারে। হয়। কিন্তু সুদূর অতীতেও মানুষ একসঙ্গে দেখেছে। দশের চোখে তাদের রূপের নিশানা; দশের জীভে তাদের আস্বাদ। ইত্যাদি। যেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ চলে অর্থনৈতিক সমাজ মারফত, সেহেতু মানবীয় প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতিতে আসে যোগসূত্র–সংগঠন। সূক্ষ্ম হোক আর স্থূল হোক।

অবশ্য অন্যান্য জীবের প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতি অনিয়ন্ত্রিত নয়। তবে তাদের নিয়ন্ত্রণের মালিক সরাসরি প্রকৃতি। একচ্ছত্র সেখানে প্রকৃতির রাজত্ব। মানুষ কিন্তু সেই আদিম যুগেই খানিকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। বিশ্ব প্রকৃতির গতি পরিণতির মধ্যে দিয়ে মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রকৃতির অন্ধি সন্ধিতে প্রবেশ করার ফলে মানুষও কাবু করেছে প্রকৃতিকে। মানবদেহ নিজস্বতা অর্জন করেছে অর্থনৈতিক সমাজ সংগঠিত করে। মানব দেহের নিয়ন্ত্রণের ধারা অভিনব।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আলাদা দেহগত প্রবৃত্তি, আবেগ ও অনুভূতিকে সমাজ যে উপায়ে এক কর্মের সূত্রে গাঁথে তার একটি জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার আর একটি মনন বা চেতনা। এই মনন বা চেতনা, দেহগত বা ইন্দ্রিয়গত। নানা ব্যক্তি একই কর্ম ধারায় শামিল করার উপযোগী সরঞ্জাম দেহের মধ্যেও রয়েছে। মানব দেহের সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ এবং সকল স্নায়ুর মিলনকেন্দ্র মস্তিষ্ক যে এই সরঞ্জাম, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ। এই ইন্দ্রিয় মারফত সমাজ আর ব্যক্তির যোগাযোগ কাজ করে।

যখন এই মননেন্দ্রিয় কাঁচা অবস্থায় ছিল, তখন আর এর ভূমি ছিল নিশ্চয় নগণ্য। পরবর্তীকালে অধিকতর বিকাশ হয়েছে। এর ভূমিকা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মানব দেহ যে নির্দেশ মানে তা অতীন্দ্রিয় নয়। তা প্রাকৃতিক, সামাজিক ও দৈহিক। যোগাযোগের উপাদান জৈব শরীরের ক্রমবিবর্তনের ফলে মানবদেহে বিকশিত হয়েছে। এই মনন বা চেতনার তিনটি বিশেষত্ব।

প্রথম, শিল্পকলার দিক

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সক্রিয় থাকে জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে প্রধানত: প্রকৃতির কাছ থেকে রসদ সংগ্রহের ব্যাপারে। আপন পরিবেশ নিংড়ে সমাজবদ্ধ মানুষ ভোজ্য পেয় এবং অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্য আহরণ করে। পরিবেশকে আয়ত্তে আনে হাতিয়ার ও সরঞ্জামাদির সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে মেহনতি মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান নিবিড় পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবেগ অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্বাক্ষর এঁকে দেয় বিশ্ব প্রকৃতির উপর। বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রিক অথবা খণ্ডিতভাবে মানুষের কামনা-বাসনার শীলমোহরে অঙ্কিত হয়ে চেহারা পাল্টে ফেলে। গিরিশিখর হয় মৌনী ধ্যানী। ফুল হয় সুগন্ধি। শ্রাবণের বারিধারা হয় প্রিয়ার অশ্রু। ঝড় হয় বেদনার দীর্ঘশ্বাস। নিসর্গকে মানুষের অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে উঠতে বসতে হয়। বাঁশের টুকরো হয় বাঁশি। হাড়ের টুকরো গলায় মালা হয়ে দোলে। মাটি হয় মৃৎপাত্র, যার ভঙ্গিমার তুলনা প্রকৃতিতে মেলে না। আবেগের পাল্লা ভারী এদিকে। মনন বা চেতনা এখানেও সূত্র ধরে থাকে। তবে আবেগের টান বেশি। শিল্পকলা তাই মূলত আবেগপ্রবণ। বিশ্ব প্রকৃতির যে নানা উপাদান মানুষের কামনা বাসনার স্বাক্ষর গ্রহণ করে জীবনের ভঙ্গিমাকে ব্যঞ্জনা দেয় তারাই তো শিল্পকলার উপাদান। অবশ্য এদের উৎস হচ্ছে অর্থনৈতিক সমাজ ও জীবিকা। মনন রয়েছে এদের সাথে জড়িয়ে। শিল্পকলা তাই মননকে বাদ দিতে পারেনি একেবারে।

দ্বিতীয়, বিজ্ঞানের দিক

বিশ্বপ্রকৃতির সর্বাত্মক নিয়মগুলি অলঙ্ঘ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ কর্মে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানে মানব প্রকৃতির প্রভাব বেশি হলেও শিল্পকলার সমঝদারদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, প্রকৃতির নিয়ম সংসার কর্মে মানব দেহের মধ্যেকার শিরদাঁড়ার মতো গোপন থেকে সক্ষমতা বা অক্ষমতার যোগান দেয়। কিন্তু মানব দেহের সুষমা তো শিরদাঁড়ার খুঁজলে পাওয়া যাবে না। শিল্পকলার মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি, সমাজ, চেতনা। কিন্তু প্রকাশ আবেগে, স্পৃহায়। রঙে সুরে রেখায় যাকে পাই এলায়িত।

কিন্তু শুধু শিল্পকলা নিয়ে মানুষের জীবন থাকেনি এবং থাকবেও না। মানব জীবনের সার্থকতার আরও দিক আছে।

মানুষ দেখতে পেয়েছে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রের প্রসার সম্ভব যদি তা বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মগুলির বিরোধী না হয়। প্রকৃতি একদিক দিয়ে নমনীয়, যেমন শিল্পকলার দিকে। আরেক দিকেও নমনীয়, যেমন বিজ্ঞানের দিকে। কিন্তু এখানে প্রকৃতির

মেজাজটা পরখ করে দেখতে হয়। প্রকৃতির গোপন রহস্য মানুষকে টেনে নিয়ে চলে এক অভিজ্ঞতা থেকে আরেক অভিজ্ঞতায়। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের সার সংগ্রহের ভার পড়ে মননের উপর।

এখানে চেতনার কাজ হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মগুলির সূত্র ধারা। বিশ্ব প্রকৃতির চলার নিয়মগুলি নিয়ে এই যে চেতনার কারবার, একে বলে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সামগ্রিক হতে পারে, যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞান, আংশিক হতে পারে যেমন সমাজ বিজ্ঞান, আরও পরিমিত হতে পারে যেমন মনোবিজ্ঞান। আবেগ অনুভূতি ও স্পৃহা দিয়ে মণ্ডিত করে শিল্পকলায় যেভাবে প্রকৃতিকে দেখি, এভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখলে প্রকৃতির ছাঁকা নিয়মগুলি বার করা সম্ভব হবে না। আরোপিত হবে আমাদের খুশি মাফিক সংজ্ঞা। বিজ্ঞানের বেলায় চেতনাকে তাই সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হতে হয়। চেতনা পরিদর্শক মাত্র। সংবাদদাতা। প্রকৃতির পাল্লা ভারী এখানে। যেহেতু সমাজ ও মানবদেহ প্রকৃতির অংশ, সেজন্য এদের নিয়েও বিজ্ঞানের কারবার। লক্ষণীয় যে সমাজ–বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে না। মনে হয়, কী নির্মম ও অনাসক্ত এই বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানেরও বিকাশ ও পরিবর্তন আছে। কারণ প্রকৃতি থেকে মানুষ পর্যন্ত সবাই পরিবর্তিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে। চেতনার কাজ হচ্ছে নিয়মগুলিকে শুধু জানা নয়, নিয়মগুলির পরিবর্তনের সঙ্গেও তাল রাখা।

তৃতীয়, ভাবাদর্শ বা দর্শনের দিক

চেতনা বা মনন ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে এমন একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে যার ফলে প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিদেহের পারস্পরিক খবর যাতায়াত করে, তারই মধ্যে দিয়ে। সামগ্রিক তত্ত্বটি তাই জমা হয় মস্তিষ্কে। একের নয়, সকলের সহযোগে। চেতনার এই সর্বাত্মক দিক হচ্ছে ভাবাদর্শ বা দর্শন। শিল্পকলা এবং বিজ্ঞান থেকে শুরু করে এদের যারা উৎস তারাও এই ভাবাদর্শ বা দর্শনের আওতায় এসে যায়। চেতনার এই সর্বগ্রাহী দিকটারও বিকাশ আছে। কারণ চেতনার উপাদান বিশ্ব প্রকৃতির অংশ সমাজ ও মানবদেহে জন্মেছে ও লালিত হয়েছে। অবিরাম ঘাতপ্রতিঘাত বৃদ্ধিসমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

সংস্কৃতি

আদিমকালে কারুকাজ, যাদু ও ভাবুকতা নিয়ে ত্রিধারায় চেতনা সঞ্চারিত ছিল। সে দিন এরা ছিল নেহাৎ কাঁচা ও রূঢ়। শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ভাবার্দশের আদি উপাদান তিনটি এতো অপরিণত ছিল যে এদের আলাদা করে নির্দিষ্ট করা সম্ভব ছিল না। এমন মিলে মিশে একাকার ছিল এরা যে, আমরা আজ যে নিদর্শন পাচ্ছি, তাকে আলাদা আলাদা করে ভাগ করতে পারি না।

একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, যন্ত্রে যেমন (crude) ভারী তেলের প্রয়োজন হয় তেমনি আমাদের আদি_ পূর্বপুরুষদের জীবিকার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল সেদিনকার আত্মিক মনন বা বাসনা গত উপাদান। ভারী তেলের মতো নেহাৎ মোটা তবে কাজের জিনিস। নিতান্ত স্থূল হলেও সাধারণ জৈব প্রবৃত্তির সংস্কার সাধিত হয়েছিল মানুষের

বেলায়। এই মনুষ্যত্ব যে যে বস্তুতে আত্মপ্রকাশ করছিল, তারা স্বভাবতই সংস্কার সাধিত জীবন যাত্রার অবলম্বন। এদের নিয়ে এলো সংস্কৃতি।

প্রাগৈতিহাসিক রূপান্তরের উপাদানগুলি আদি মানুষের স্নায়ুমজ্জা এবং অর্থনৈতিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়নি। অবশিষ্ট খুলি আর হাড়ের পাশে মানবীয় চিহ্নগুলি রেখায় রঙে রয়ে গিয়েছে। লাখ লাখ বছর আগেকার কবর খুঁড়ে বার হচ্ছে সেগুলি। সেদিনকার ব্যবহৃত তৈজসপত্রে রয়ে গিয়েছে মরমী মানুষের দিন যাপনের আবেগী স্বাক্ষর। চেতনার সমস্ত দিকগুলি এদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়নি। কামনা বাসনার পাল্লা এদের মধ্যে ভারী। চুলচেরা বিচার করলে হয়তো বা পাওয়া যাবে এদের মধ্যে কতটুকু ভাবাদর্শ, কতটুকু বিজ্ঞান, কতখানি শিল্পকলা।

আদি মানবের নিতান্ত স্থূল আত্মিক উপাদান সংস্কৃতি বা কৃষ্টি নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে সংস্কৃতির রূপান্তর হয়েছে। রদবদল হয়েছে প্রচুর। সংস্কৃতি বলতে আজ আমরা মাননস্নিগ্ধ অনুভূতি প্রধান এক বিশেষ ধারার নানা উপাদানকে বুঝি। এই ধারায় পাওয়া যাবে, রুচিরীতি সাজসজ্জা খেলা পুঁথিপত্র অলঙ্কার প্রসাধন বিলাস শিল্পকলা প্রভৃতি। সেদিন জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞানের উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সংস্কৃতি ছিল আটপৌরে। আজকের মতো ভাষার সত্তা আলাদা ছিল না তখন। ভাষা ছিল সংস্কৃতির অঙ্গ। তবু সেদিনকার মনন সম্পদ ছিল অতি নিম্নস্তরে।

ইতিহাস বিজ্ঞানীদের সহায়তায় আমরা সংস্কৃতির মূল ধারাটিকে বুঝতে পারছি আজ। যেমন পারছি বিজ্ঞান ও জীবন-জিজ্ঞাসার ধারাকে বুঝতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি রুচি-রীতি শিল্পকলা প্রভৃতিকে নিয়ে সংস্কৃতির ধারাটি কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে ইতিহাসের ধাপে ধাপে, যদিও সে আদিম যুগ পেরিয়েই দখল ছেড়ে দিয়েছে আরো নবাগতদের। যেমন ধর্মকে, দর্শনকে, বিজ্ঞানকে। সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান চৌহদ্দীতে আমরা পেয়েছি আবার মোহনীয় ও সামান্যের সমাবেশ। সদ্য পরিবর্তনশীল। দাবাখেলা ও গ্রন্থাগারের মতো দীর্ঘস্থায়ী উপকরণের সঙ্গে টুপি, কাগজের ফুল এবং খেলনাও সংস্কৃতির উপকরণ। নিজে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। পরিবেশ, হাতিয়ার, বিজ্ঞান, দর্শন ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে। উল্লেখ বাহুল্য যে, এই সমৃদ্ধি ঘাতসংঘাতময়-তির্যক। হাড়ের মালা এই ভাবে মুক্তার মালা হয়েছে।

সাহিত্য

কুঁড়ির মধ্যে দিয়ে যেমন পাপড়ি বেরিয়ে আসে, তেমনি সংস্কৃতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলা। আর শিল্পকলার ক্রমবিকাশের মধ্যে থেকে এসেছে সাহিত্য।

[তিন]

আদিম যুগে সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এবং অব্যবহিত পরে নিজস্ব চেহারায় শিল্পকলার মান যে নীচু ছিল, তা আমরা অল্প আয়াসেই বুঝতে পারি। কয়েক হাজার বছর আগে নেমে গেলে, সংস্কৃতির পার হয়ে আসা পথের নিশানাগুলি দেখতে দেখতে

আমরা দূর অতীতে পৌঁছে দেখবো, অত্যন্ত কাঁচা, আটপৌরে সহজ সরল ধাতব চাং-এর স্তরে ছিল সেদিন শিল্পকলা। যেমন বিষয় বস্তুতে, তেমন বহিরঙ্গে।

এসময় শিল্পকলার বিভিন্ন ধারাগুলি বেরিয়ে আসেনি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে। নাচগান অভিনয় আবৃত্তি ভঙ্গী রেখা আদিবাসীর গুহা গহ্বরে কিংবা আদিম আবাসে লীলায়িত হয়নি তা নয়। কিন্তু ওরা একের সঙ্গে আর বড় বেশি জড়িয়ে ছিল। যেখানে নিজস্ব ধারায় উৎসারিত হয়েছিল, সেখানেও ব্যঞ্জনা ছিল স্থূল, খাদভর্তি। ঝলসানো মাংসে মাটির ডেলা মেশানো লবণের মতো তারা ছিল অপরিশ্রুত।

সে সময়ে সবাই ছিল শিল্পী। অর্থাৎ সাধারণভাবে সকলেরই শিল্পী হওয়া সম্ভব ছিল। ঢাকের কয়েকটা তাল, নাচের কয়েকটা ভঙ্গি, গানের কয়েকটা কলি, কয়েকটা রেখা টেনে হরিণ বা বন্য মহিষের মুখ বা দেহের চেহারা ফুটিয়ে তোলা—ইত্যাদি যেন একমুঠো শিল্পকলা আবদ্ধ ছিল সংকীর্ণ পরিধিতে। উপকরণ ছিল সামান্য। পৃথিবী ছিল গণ্ডী আঁকা। গোষ্ঠীর বাহিরে মানুষের নিকট পরিচয় ছিল না। লোক সংখ্যা ছিল অল্প।

মানব সমাজে রূপান্তর ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, সভ্যতার উপকরণ এবং সংস্কৃতির অভিব্যক্তির পরিব্যপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, শিল্পকলা হয়েছে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র। সাহিত্য তার নিজ সত্তা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে। সাহিত্যিকে মানুষ তাই কোন প্রত্যাদেশ বা দৈববাণী থেকে পায়নি। সাহিত্য শিল্পকলার খানিকটা পরিণতির ফল।

সমাজে কর্মবিভাগ

সমাজে কর্ম বা শ্রম বিভাগের উদ্ভব ও বিকাশ লক্ষ্য করার বিষয়। উপকরণ সংগ্রহের স্তর থেকে উপকরণ তৈরির স্তরে যাওয়া, কৃষি ও প্রাথমিক শিল্পের বিকাশ, কৃষি ও শিল্পে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ কাজে উপযুক্ত লোক নিয়োগ—এরা এক ঐতিহাসিক মহাপ্রক্রিয়া পার হয়ে আসে। কোথাও ধীরে ধীরে, কোথাও মৌলিক পরিবর্তন বা মোড় ফেরার সময় প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাধিত হয় আদিম মানবের নব রূপায়ণ।

আদিম কর্ম বিভাগের এই বিকাশপ্রক্রিয়া শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ফলিত হয়। এই ভাবেই আদি কবি বা কবিগণের উদ্ভব। আদি কবি এসেছে আদি শিল্পীদের মধ্য থেকে বিশেষ গুণী হিসাবে। আদি শিল্পীরা আসে সমবেত সাধারণ শিল্প প্রয়াসের গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

এই গুণগত পরিবর্তন কি করে সাধিত হলো?

আদিম যুগে মানুষ কোথাও বহুদূরে বিক্ষিপ্ত, কোথাও ঘন সন্নিবিষ্ট খুব ছোট ছোট গোষ্ঠী সমাজে বসবাস করতো। গোষ্ঠীগুলি প্রায় একই স্তরে সাধারণ মানবিক জৈবিক জীবন যাপনের কারবারী হলেও ছিল পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আপাত দর্শনে তুকতাকের সিলমারা। নিজ নিজ গোষ্ঠীদেবতা ও পিতৃমাতৃকায় সমর্পিত প্রাণ। মূলত গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতির আহরণ ও উৎপাদনের হাতিয়ার সমবেত ব্যবহারে বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত। গোষ্ঠীর সভ্যেরা প্রাকৃতিক বিপদ বিসম্পাত ও শত্রুগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে সমভিত্তিতে নিয়োজিত ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে যে যার কাজে লেগে যেত। বয়োবৃদ্ধ

গোষ্ঠীপতিরা যোগাতো অভিজ্ঞতা। সেদিনকার পার্থক্য ছিল দেহগত—নারী শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, হিসাবে। কিন্তু সারা গোষ্ঠীরই ছিল যেন একটি দেহ। সামগ্রিক দেহ। নাড়ীতে নাড়ীতে, রক্তের টানে বাঁধা। বৈষম্যের প্রশ্নই উঠতোনা। উঠতোনা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন। ব্যক্তি দেহগতভাবে একে অন্য থেকে পৃথক হলেও আদিম সমাজে এ পার্থক্যে প্রতি ব্যক্তির বিশেষত্ব জাহির হয়নি। ব্যক্তি সক্রিয় ছিল সমূহের মধ্যে। বিভিন্ন কাজের স্তর ছিল অত্যন্ত নীচুতে।

আহরণ পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কর্ম বিভাগের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে এলো নতুনভাবে নিয়োজনের তাগিদ। এলো আক্ষেপ। তবু গোষ্ঠীসমাজের ব্যক্তিসভ্যদের পরস্পর সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় আরও নতুন ঘটনার সংযোগে। নতুন ঘটনা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসপ্রথার প্রবর্তন। এদের উপর ভর করে একদল লোকের উদ্ভব হলো যারা ব্যক্তিত্ব জাহির করতে পারে। আরেক দলকে করতে হয় আত্মবিলোপ।

আদি যুগে প্রথম দিক দিয়ে যখন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রকৃতিজাত গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে দ্বন্দ্বকলহ হোতো, তখন পরাজিত গোষ্ঠীর কোন হতভাগ্য বন্দী সব চেয়ে জঘন্য ও ভারী কাজটা করার জন্যও গৃহীত হোতো না। পরাজিত মাত্রই নিহত হোতো। বেঁচে থাকার উপকরণে ভাগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না তখন।

অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে যখন উপকরণ ও তার উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, কর্মবিভাগের সূত্রপাত হলো, তখন দাসপ্রথার প্রবর্তন হলো পরাজিত গোষ্ঠীর দক্ষ লোকদের প্রাণে না মেরে কাজে লাগিয়ে, অথবা ভারী ভারী কাজে সাধারণ পরাজিতদের নিযুক্ত করে। এইভাবে গোষ্ঠীর আওতার মধ্যে এল একদল লোক, যাদের পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করা হয় জীয়ন্ত শ্রমযন্ত্র বলে। কর্মবিভাগের প্রথম মৌলিক প্রকাশ হিসাবে বেরিয়ে এলো যে সংগঠন তার অপ্রচ্ছন্ন তাগিদ হলো উপকরণ যোগাড় ও তৈরির কাজে বহিরাগতদের আমরণ শোষণ করা। গোষ্ঠীর জীবিকা ও হাতিয়ারের নিয়োগের ফলে বহিরাগতরা গোষ্ঠীর সভ্য হিসাবে স্বীকৃত না হলেও এদের নিয়েই গোষ্ঠী প্রসার লাভ করলো। হাতিয়ারে ও উৎপাদনে এলো উন্নতি। অপরপক্ষে উপকরণের প্রসার, কর্মবিভাগে উত্তরোত্তর নব প্রয়োজনের চাপ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা প্রবর্তনে সামাজিক সম্পর্কের রদবদলের ফলে গোষ্ঠীসমাজের গর্ভে যে নয়া বন্দোবস্তের তাগিদের তীব্র আক্ষেপ তলে তলে চলছিল, তা প্রধানত দাস সদস্যদের নিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ভারী ও খাটো কাজে নিযুক্ত গোষ্ঠী সদস্যদের জুড়ে নিপীড়িত শ্রেণীর গোড়াপত্তন করে দিল। ছিঁড়ে গেল গোষ্ঠীগত নাড়ীর বন্ধন। তৈরি হলো শ্রেণীগত নাড়ীর বন্ধন। ক্ষুদ্র পরিসরে হোক, আর বৃহৎ পরিসরে হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হলো শোষক ও শোষিতের, অধিকারীর আর অনাধিকারীর, বিত্তবান আর বৃত্তহীনের, পরজীবীর আর শ্রমজীবীর। খেতখামার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব উপাদান ও হাতিয়ারের মালিকানা চলে গিয়েছিল মুষ্ঠিমেয়ের হাতে। ঐ সব হাতিয়ার সরঞ্জাম নিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে অধিকাংশ লোক চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় তৈরি করে মুষ্টিমেয়ের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা খুদ কুড়োয় পেটভর্তি করে দিন গুজরান করতে শুরু করলো। শোষক ও

শোষিতের অবশ্য কোনদিনই মিল হয়নি। নিরন্তর চলে এসেছে তিক্ত সংঘাত। খোলাখুলি বা চাপা।

এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার প্রবর্তন কোনো প্রত্যাদেশের ফলে হয়নি। কারুর পূর্ব পুরুষই ক্ষেত খামার, গৃহপালিত পশু, বাগবাগিচা ও যন্ত্রাদির উপর জন্মগতভাবে দখলকার ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে গোষ্ঠীর আয়ত্তে যখন চাষের জমি এবং পালিত জানোয়ার চলে এল এবং যখন ক্রীতদাস গ্রহণ করা শুরু হলো তখন খবরদারির শুরু হলো ব্যক্তিগতভাবে। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে সংগঠনের কেন্দ্র ও বৃত্ত গড়ে উঠেছিল। সংগঠনে যারা নিযুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে পরিচালকরা নিজেদের সাংগঠনিক প্রাধান্যকে ব্যক্তিগত অধিকারে কায়েমী স্বত্বে মিলিয়ে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব কায়েম করলো। এক দিনে এ প্রাধান্য ও ফরমান আসেনি। ধাপে ধাপে চলেছে এর প্রস্তুতি।

স্বাভাবতই সারা গোষ্ঠীর মধ্যে যে শিল্পকলা ও জ্ঞান চেতনা ছড়িয়ে ছিল, তারও মৌলিক পরিবর্তন হয়। সমগ্র সমাজের এক অংশে পরিচালক, আর অংশে মেহনতী। সমগ্র সমাজের লাখ লাখ বছরের জীবনধারা বেয়ে যে সহজ সামান্য মনন বা চেতনা উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, তার সারতত্ত্ব ছিল সারা সমাজের সমষ্টিতে ছড়িয়ে। শ্রেণীসমাজে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মননের সার জমা হলো মালিকদের অংশে। পরিচালক বা মালিকশ্রেণী হলো সারা সমাজের পক্ষে মননের জিম্মাদার। আর অধিকাংশ মানুষ শুধু মেহনতের ভারবাহী হয়ে গেল।

এরপর থেকে যে শ্রেণীশাসিত সমাজের ইতিবৃত্ত আমাদের চোখের সামনে উন্মীলিত হয়ে এসেছে, তাতে বরাবরই দেখা গেছে, একটি বিশেষ শ্রেণী বিশেষ যুগে সমগ্র সমাজের চেতনার জিম্মাদার হিসাবে সামগ্রিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে জুগিয়ে এসেছে চেতনা ও মনন। সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার দিক দিয়ে এবং এইভাবে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার দিক দিয়ে এই ঘণীভূত শ্রেণীর চেতনা কার্যকরী অংশগ্রহণ করেছে। অভিজ্ঞতার তত্ত্ব ছড়িয়ে ছিল সারা সমাজে; তার তুলনায় সে তত্ত্ব যখন জমা হলো এক বিশেষ অংশে যার হাতে সমাজ জীবনের মূল অর্থনৈতিক সূত্র, তখন কার্যকরিতা স্বভাবতই বেশি হতে বাধ্য।

মনন বা চেতনা এইভাবে যেমন সমাজ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন হলো, তেমনি নিশ্চয়ই শিল্পকলা সম্পর্কেও।

অর্থনৈতিক সমাজ, আবেগ এবং চেতনা যেহেতু পরস্পরকে দিয়ে নিয়ে আঘাতে সংঘাতে ক্ষতি বৃদ্ধিতে এগিয়ে চলে আসছে, সেজন্য এটা সহজেই বোধগম্য যে চেতনা যদি কনিষ্ঠতর সে সমৃদ্ধ হলে যেমন একদিকে অর্থনৈতিক জীবন উন্নত হবে, তেমনি আবেগভিত্তিক শিল্পকলাও প্রসার লাভ করবে। প্রকৃতির সত্য তথা বিজ্ঞানও অগ্রসর হবে। কাজেই শ্রেণীশাসিত সমাজের প্রর্বতনে মানবীয় মূল্য না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে।

কিন্তু যাবতীয় উন্নতি রক্তসিক্ত হয়েছে শ্রেণী শোষণের চক্রে। মানব সমাজের সর্ববিধ সম্পদ কমে তো নাই-ই বরং বেড়েছে। কিন্তু সে সম্পদ জমা হয়েছে মুষ্টিমেয়

মালিকের বালাখানায়। কখনো ক্রীতদাসের মালিক কখনো ভূমিদাসের মালিক কখনো মজুরিদাসের মালিক পথ আগলেছে সার্থকতার। মালিক শ্রেণীর চেতনা একদিকে যেমন ইতিহাসের বিশেষ স্তরে সমগ্র সমাজের চেতনার জিম্মাদার হিসাবে কাজ করেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজকে দাবিয়ে রেখেছে অচেতনতার গভীর তিমিরে। মূলত শোষক শ্রেণী স্বার্থপরায়ণ শাসক। প্রথম দিকে সমাজের মেহনতের সঙ্গে যে সংযোগ থাকে তা অচিরেই ছিন্ন হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণীর মনন হয় জীর্ণ পঙ্কিল। শ্বাসরোধ করে সমাজের।

এই শ্রেণী শোষণের চক্রান্ত ভাঙবার জন্য আজ যে আমরা বলছি সমাজতন্ত্রের কথা, বালাখানার পুঁজি করা সকল সম্পদ সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দেবার কথা বলছি মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধির আত্মবিরোধ দূর করতে পারবো। সমগ্র সমাজের পক্ষ হয়ে সচেতন মজুর শ্রেণী নতুন অর্থনৈতিক সমাজের মর্মকেন্দ্রে পরিচালক হিসেবে যে পরিবর্তনে হাত দিয়েছে, তার চরিত্র এই যে, সে আর পূর্বগামীর মতো শ্রেণীশাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে না। বরং শ্রেণীশাসিত সমাজের অবসান করে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি সম্পর্কে যে চেতনা মজুর শ্রেণীতে তার বিশিষ্ট সামাজিক জন্য জমা হয়েছে, নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে সমাজের সকলের মতো তাকে সঞ্চারিত করে দেবে। দিয়েছে। দিচ্ছে। মুষ্টিমেয় ভোগীর শ্রেণী বাধা দেবে; চেতনার মধুভাণ্ডার ঘিরে রাখবে। কিন্তু সমবেত শক্তিতে সে বাধা চূর্ণ হবে। সমগ্র সমাজের যে নতুন ভূমিকা সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী ব্যবস্থায়, তার ফলে চেতনার সব সমাজ ছড়িয়ে পড়লেও মান উন্নত হতে বাধ্য।

ফিরে আসা যাক আবার পূর্বকথায়।

শ্রেণীশাসিত সমাজের পত্তনে নতুন মননে শিল্পকলা তথা সাহিত্য উন্নত হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর "রিপাবলিক" গ্রন্থ পড়লে স্পষ্ট হয় যে, মননের উন্নত পর্যায়ের সাংগঠনিক ভূমিকা পূর্বের তুলনায় সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধন করেছে। প্লেটো দাসপ্রভুভিত্তিক শ্রেণী সমাজের পক্ষ থেকে সাহিত্যের পরিবর্তন দাবী করেছিল; সেদিন শ্রেণী প্রভাবিত সমাজ–সাহিত্যের সংঘাত সৃষ্টিমুখী ধারা উপচে পড়েছিল। অজস্র উপকরণ বিচিত্র প্রচেষ্ট, নানারকম আঙ্গিক ও আধার, সূক্ষ্ম কারুকাজ বেরিয়ে এসেছিল।

তবে সবই শৃঙ্খলিত–শ্রেণী শাসন ও শোষণে অভিশপ্ত। কালে কালে তাই প্রশ্ন উঠেছে–কবে এই বৈপরীত্যের শেষ হবে। বিশেষ করে আবেগের ব্যাপারটা ধরা যাক। এই প্রসঙ্গে মননের।

আদি কবিতা

আদি শিল্পকলার মূলে ছিল জীবিকার জন্য কাজ–কর্মের সহযোগী স্পৃহা ও আবেগ। এই স্পৃহা আবেগ আদিম গীতিনৃত্য নাট্যের মধ্য দিয়ে উপচে পড়তো, আদিম রেখাচিত্রে তরঙ্গিত হতো। আদি কবিতা গীতি নৃত্য-নাট্যের বিকাশের ফলে কথার ধারা বেয়ে বেরিয়ে এল তার নিজস্ব সত্তায়। এই আদিম কথাশিল্প বিকাশিত হয়ে ক্রমে

বহু শাখা সম্পন্ন সাহিত্যে পরিণত হলো। আদি গীতি নৃত্যনাট্যের উৎসের সন্ধান তাই সাহিত্য বিচারকদের একটি প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আদি নাচ গান অভিনয় একটি জড়ানো অনুষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে সমস্ত সদস্যই শামিল হতো। এর খানিকটা ভাষা, খানিকটা নাচ, খানিকটা ঘটনা জড়িয়ে সমবেত কামনা বাসনা ও আবেগ একটা রূপলোকে সৃষ্টি করতো। যেন ফসল বুনছে বা কাটছে, যেন হরিণ শিকার করছে, যেন বিতাড়িত করেছে ভৌতিক বিস্ময়কে। আসল নয়, নকল। বাস্তব নয়, রূপলোক। কল্পনা বা দেবমালা। কিন্তু এর উৎস আর মোহনা জীবিকাই। জীবিকা ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে ধাপে ধাপে। ভাষা অস্ফুট, নাচ একঘেয়ে, ঘটনা সামান্য। রূপায়িত ছন্দে। কাজকর্ম বেতালা ছিল না। কিন্তু কাজকর্মের সহযোগী যে শিল্পকলা, তাতে ছন্দ অপরিহার্য। ছন্দ দোলাতো নানা মানুষকে এক কাজের এক স্বপ্নের তালে।

ছন্দ ছিল আদি কবিতার অপরিহার্য উপাদান।

শিল্পকলার দিক মানবীয় প্রবৃত্তি, অনুভূতি ও আবেগের দিক। মানব-দেহের সক্রিয়তার দিক। যেখানে কামনা বাসনা বাস্তব পরিবেশ এঁকে দেয় প্রেয়কে, শ্রেয়কে। গীতি নৃত্যনাট্যের রূপলোকেও ফুটে উঠতো এই প্রেয় ও শ্রেয়ের চেহারা। গোষ্ঠীর সামনে জলজ্যান্ত হয়ে ভেসে উঠতো যে ছবি, তা মানবের সংস্পর্শে প্রকৃতির রূপান্তর। সাধারণ এই ছবি একই ছন্দে একই রেখায়, একই স্পন্দনে গোষ্ঠীর সবাইকে শামিল করত। চোখ বুজলেও নানা ব্যক্তি এই রূপলোক দেখতে পেত একই সঙ্গে। একই আবেগে একই মনন কাজ করত।

উৎসব শেষে মিলিয়ে যেত এই রূপলোক। ভাষা আর ব্যঞ্জনাময় হয়ে রনিয়ে ফিরতো না। পা ফিরতোনা পায়ের তালে তালে, ঘটনা হারাতো নিবিড়তা। কিন্তু বারংবার যেহেতু জীবিকার আয়োজন ফিরে আসতো, সেজন্য রূপলোকেরাও স্পন্দিত একসূত্রে গ্রন্থিত হয়ে ফুলে উঠতো মালা হয়ে।

শিল্পীদের মায়ালোক

বাস্তব পরিবেশের মধ্যে নতুন সৃষ্টির এই মায়ালোকে গোষ্ঠীর সদস্যরা যে শামিল হতো, তারা কিন্তু উৎসবান্তে এই মায়া বা রূপলোককে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতো না। এর ছন্দকে তারা ধরতো নিজ দেহে, হৃদস্পন্দনে। কর্মে প্রকৃতি আয়ত্বে আসে বাস্তব ফলন হয়ে, ছন্দে প্রকৃতি আয়ত্বে আসে রূপলোক হয়ে।

গীতি নৃত্যনাট্যের অংশীদার যারা তারা অতি সহজেই এই ছন্দের শরীক হয়ে রূপলোক তৈরিতে লেগে যেতো। এক সূত্রে গাঁথা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভোর হয়ে যেত প্রেয় ও শ্রেয়ের অনুভূতিতে, আবেগে ও মননে।

তরঙ্গিত আবেগের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যদের মধ্যে মনন এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, রূপলোকেই ডেকে আনছে বাস্তব পরিবর্তনকে। আধুনিক কালের তুলনা দিয়ে বলা যায়, কল্পনা আনছে বাস্তবকে।

অথচ বাস্তব থাকে রূপলোকের গোড়ায়।

এই বাস্তব পরিবেশকে যখন আমরা কেবল তার বর্তমান চেহারা দেখে বিচার করি, তখন তার সবটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। বাস্তব পরিবর্তনশীল এবং তার গতিধারায় তার আসন্ন রূপ নিহিত থাকে। মানুষ আপন প্রয়োজনানুসারে এই নিহিত সত্তায় পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত বাস্তব পরিবেশকে অনুকূলে আনতে পারে না। বাস্তব পরিবেশ বলতে আমরা বুঝবো, সম্ভাবনার উপাদান সমেত বাস্তব। এই সম্ভাবনাই রূপলোকের কাঠামো। শিল্পীর মায়ালোকে স্বপ্নকল্পনা এই বাস্তব সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। এই সম্ভাবনা কর্মে প্রতিফলিত হয়ে শ্রেয় ও প্রেয়কে দেয় আকৃতি।

কিন্তু এক্ষেত্রে আবেগের পাল্লা ভারী। বাস্তব থাকে সঙ্গোপনে, বাসনা ও কামনা তাকে ভর করে শতদল মেলে দেয়। জগৎটা উল্টো ঠেকে। মনে হয় দীপক রাগে আগুন জ্বলে। মল্লারে আসে বর্ষা।

ইতিপূর্বে হাজার হাজার বৎসর ধরে চেতনার সামগ্রিক দর্শন বহুদর্শী এবং দূরদর্শী দুই হলেও জীবনের মূল ভিত্তিকে সম্পূর্ণ দেখতে পায়নি। হয় আংশিকভাবে দেখেছে, নয় উল্টো দেখেছে। মানুষের মনে হয়েছে ইচ্ছা থেকে, রূপলোক থেকে, কল্পনা থেকে, মানুষের প্রেয় ও শ্রেয়কে পাওয়া যাবে। আদিম অধিবাসীরা মনে করতো, জাদুকরের তুড়িতে প্রকৃতির রদবদল হয়। কিন্তু ভোজবাজী যে আসলে অজান্তে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সে কথা তাদের খেয়ালে আসেনি। তেমনি তারা মনে করতো গীতি-নৃত্য নাট্যে বন্য মহিষ শিকারের রূপলোক প্রার্থিত বস্তুকে সম্ভব করে তুলবে। সেদিন তাদের উচ্চারিত আকুতি যে পূর্বতন শিকারের অভিজ্ঞতাকে সুডৌল করেছে, এ খেয়াল তাদের চেতনায় সম্ভব হয়নি। মানুষের ভাবাদর্শ যতদিন শিল্পকলা ভোজবাজীর বাস্তব রূপ উৎঘাটনের উপযোগী সংস্থায় পৌঁছতে পারেনি, ততদিন রূপলোককে মূল হিসাবে নেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চেতনা যখন ঘনীভূত হলো শ্রেণীসমাজে তখন জগত বিস্তৃত এবং দৃষ্টির প্রসার হয়েছে। কিন্তু দৃষ্টিটাই গিয়েছে উল্‌টে। মেহনত তৈরি করছে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান, কিন্তু চেতনা জাহির করতে শুরু করেছে, সে না থাকলে কিছুই হতো না। তার ফতোয়া ছাড়া কোন কিছু সম্ভব নয়।

আমরা আজ চেতনার এমন এক স্তরে পৌছেছি, যখন শ্রমিকশ্রেণী এই মাথাভারী মুখ থুবড়ে পড়া সমাজে চেতনা ও মেহনতের সামঞ্জস্য বিধান করতে শুরু করেছে। সারা পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণী এই সামঞ্জস্য বিধানের ধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্ত রকম ফতোয়ার পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

এই প্রস্তুতি চলে এসেছে ফতোয়ার পাশাপাশি।

গীতিনৃত্যনাট্যের উপাদানগুলি ছিল মানবীয়। মানবীয় সম্পদ যখন বৃদ্ধি পেল, তখন গীতিনৃত্যনাট্যের উপাদানগুলি সমৃদ্ধ হবে এতে আর আশ্চর্য কি? বেরিয়ে এলো নিটোল নিগূঢ় ছন্দোবদ্ধ শব্দ-পদ-বিন্যাস। ষোড়শ শতাব্দীর একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন, কবিতা আদিম মানুষের ব্যবহৃত ছন্দোবদ্ধ কথা।

এল কবিতা। জীবিকার বাঙ্ময়ী সুষমার আকুতি। সে জীবিকা সামাজিক। কাজেই কাবিতাও সামাজিক। নানা বরদাতা দেবদেবীর স্তুতি। কিন্তু আসলে মানুষের

বাসনা ও কামনা। সম্ভাব্য জীবিকার ছবি তাতে। সমাজ সম্পর্কের ছাপ সুস্পষ্ট। বাহন ওজস্বী কথা। এল সাহিত্যের ভ্রূণ। শিল্পকলার অন্যান্য ধারায় ওতপ্রোতভাবে মিশে যাওয়া শব্দ ও পদবিন্যাসের কারিগরেরা বিশিষ্ট হলো অন্যান্য স্বায়ত্তসত্তাপ্রাপ্ত শিল্পীদের মতো। বাজনদার, নর্তক, চিত্রকর প্রভৃতির পাশে একদল কবি সমাজে জায়গা পেল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভাষার কিছুটা পরিমাণ বিকাশ সাধিত হবার পর প্রত্যেকটি গোষ্ঠীতে এই ধরনের অভিনব মানুষ সম্ভব হয়। সেদিন কাব্যছন্দ অনুপ্রাস শুধু পদ্যের আকারে ব্যক্ত হয়নি। গদ্যকাব্যও সেদিন ব্যঞ্জনা বহন করেছে। অবশ্য এ গদ্যও ঝঙ্কার-মুখর। পুরুষ পরম্পরায় সমর্পনের উপযোগী। স্মরণের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে উত্তরিত।

যে আক্ষেপ গোষ্ঠীসমাজে ক্রিয়া করছিল শ্রেণীসমাজের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা কাব্যে বা আদি সাহিত্যে সক্রিয় হলো। দেবদেবীগীতি রূপান্তরিত হলো মহাকাব্যে। এল বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাট্যকাব্য, গীতিকবিতা ও গদ্য আলাপন ইত্যাদি। অক্ষর আদি ছবি থেকে বেরিয়ে কাব্যের বাহন করা হয়েছে। দেবদেবীরা চালান গেলেন ধর্মে দর্শনে। নরনারী প্রকৃতি প্রধান হলো সাহিত্যে।

কিন্তু সমাজ তো শ্রেণীশাসিত। মধুপায়ীরা একদিকে, আরেকদিকে গরলপায়ীরা। একদিকে আনন্দ, আরেকদিকে বিষাদ। চেতনার রূপ নিয়ে খেলা একদিকে, আর একদিকে অন্ধ নিয়তির তাড়নায় সর্বহারা রূপের ভিখারী।

সাহিত্যে নানা বিভাগের প্রাথমিক হিসাব

সাহিত্য আদিতে লিখিত ছিলনা। কারণ অক্ষর এসেছে শ্রেণী সমাজের মুখে। সাহিত্য আদিম পুরুষ পরম্পরায় দূরতম অতীত থেকে দূরতর অতীতে সমর্পিত হয়। তারপর একদিন ভাষা অক্ষরের জিহ্বায় পুনরুচ্চারিত হলো। সাহিত্য হলো লিপিবদ্ধ। শিল্পীর তুলির মতো কবির কলম হলো জাদুদণ্ড। তবু তার রূপসত্তাটি বদলায়নি। রইল সেই ধ্বনি ব্যঞ্জক শব্দ বা পদ-বিন্যাস।

ভাষা

সাহিত্যের কথা আনীত হয়েছে ভাষা থেকে। কিন্তু ভাষা আর সাহিত্য এক নয়। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য প্রথমত ভাষার আদিতে যাওয়া যেতে পারে।

সামাজিক সংগঠনে যোগাযোগ সাধন ও কর্মধারায় উচ্চারিত বিভিন্ন শব্দ সংগঠিতরূপে ভাষা হিসেবে দানা বেঁধেছে। স্ট্যালিন তারা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় এই সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"মানুষ পশুস্তর থেকে সামাজিক ব্যক্তির স্তরে উঠেছে মেহনতের সাহায্যে। মেহনত তার মনকে করেছে সমৃদ্ধ, তার ভাষা ও সাংস্কৃতিকে করেছে বিকশিত। মেহনতের মধ্যে জরুরী হয়ে ওঠে সাহচর্য। মেহনতের প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে পরস্পর সাহচর্যের মাধ্যম বিকাশ লাভ করে। সে মাধ্যম ভাষা। এই ভাষা সমাজ ও মানবীয় চিন্তার বিপ্লবে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভাব বিনিময় ছাড়া, পরস্পর সাহচর্য ছাড়া জীবিকা উৎপাদন অসম্ভব, সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। আবার সমাজ থেকে আলাদা

হয়ে ভাষা টিকতে পারে না। সুতরাং ভাষা ও তার বৃদ্ধি সমৃদ্ধির কানুন বোধগম্য হতে পারে, সমাজের এবং জনতার ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। সমাজ ও জনতা ভাষার অধিকারী। সমাজ ও জনতা আবার ভাষার সৃষ্টি ও আধার।" (ভাষাতত্ত্ব সমস্যা)

নির্ঝরে পুষ্ট হয়ে মহানদী যেমন বিস্তার লাভ করেছে, তেমনি ভাষাও পরিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে। প্রবাহের মতোই সে বহমান। উপকরণ সামান্য থেকে প্রচুর হয়েছে একে অপরে যুক্ত হয়ে। বিশ্বজগতের পরিধি মানব-সমাজের অভিজ্ঞতার বিস্তারের সহগামী–ক্রমপ্রসারী। মানবীয় সম্পর্ক ক্রমাগত বিচিত্র ও উন্নত হয়েছে। ভাষা, শব্দ ও পদের সমাহারও হয়েছে অনুরূপ। সমাজ থেকে যেমন ভাষার উৎপত্তি, তেমনি ভাষা সমাজকে তার (সমাজের) পরিবর্তন ও বিকাশে সহায়তা করে আসছে।

যে কোন জাতীয় ভাষায় আজকাল পাওয়া যাবে কমপক্ষে আটদশ হাজার থেকে লক্ষাধিক শব্দের সমাবেশ। আদিযুগের গোষ্ঠীর হাতিয়ার ও সংগঠন যেমন ছিল অপরিণত, তেমনি সেদিন ভাষাও ছিল একমুঠো। কিন্তু একমুঠো হলেও তাই সেদিন মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র প্রকাশ ক্ষমতা দিয়েছিল। জীবিকার হাতিয়ার যেমন সমগ্র গোষ্ঠী সমাজের সহযোগে গড়ে ওঠে, তেমনি ভাষাও গড়ে ওঠে সমগ্র সমাজের সহযোগে। প্রত্যেকটি বস্তু এবং বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ উচ্চারণ এবং ব্যাকরণসম্মত পদ ব্যবহার করে প্রত্যেকটি পৃথক ঘোষণার সামর্থ অর্জন করেছিল মানুষ সংগঠিতভাবে–জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত হয়ে। মানব-সমাজের অগ্রগতির উপাদান হিসাবে ক্রমবিকাশের পথে এসেছে ভাষা শব্দ, পদ, ব্যাকরণ। ভাষার একটি বিশেষত্ব এই যে সমাজ শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেলেও ভাষার সামাজিক রূপ অক্ষুণ্ন থেকেছে।

বাস্তব পরিবেশের সম্পর্কে, জীবনযাপনে শিল্পকলায় ভাষার যে প্রয়োগ তাই সাহিত্যের কথাশিল্পের দিক। আদি শিল্পকলায় মিশ্রিত উপকরণের অন্যতম হিসাবে ভাষার স্থান হয়েছিল। শিল্পকলার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন উপকরণের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুভাষিত শিল্পকলা তার সাহিত্যসত্তা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

সাহিত্য একদিক দিয়ে শব্দ এবং পদবিন্যাস। কিন্তু এই তার সব পরিচয় নয়। সাহিত্য মূলত শিল্পকলা। অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর। পরস্পরকে উন্নত করে আসছে ভাষা ও সাহিত্য।

আপাতদৃষ্টিতে ভাষা ও সাহিত্যকে মনে হবে পাত্রাধার তৈল বা তৈলাধার পাত্র। কিন্তু সাহিত্যকে মৌলিকভাবে বিচার করতে গেলে শিল্পকলার বিচার প্রধানত প্রয়োজন। ভাষা প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ভাবাদর্শের বাহন। সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শিল্পকলার সঙ্গে। সমস্ত শব্দ ও পদবিন্যাসই সাহিত্য নয়। মানব-সমাজের জীবনের অভিজ্ঞতা শব্দ ও পদবিন্যাসে লিপিবদ্ধ হলেই সাহিত্য হয়ে যায় না। মানব-সমাজের অগ্রতির পথে, জীবনের সৌন্দর্য সাধনার প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে এসেছে শিল্পকলা। বিশেষ একটি ক্রিয়াকলাপ হিসাবে তার উৎপত্তি ও বিকাশ। ভাষাকে আশ্রয় করে, কথাকে অবলম্বন করে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে একটি অঙ্কুর সাহিত্য। তারপর পরিণত হয়েছে বনস্পতিতে। বিশাল সে মহীরুহ। আজ কত

তার নিজেরই শাখা। মহাকাব্য গীতিকবিতা এবং নাটকের আধুনিক সংস্কার হয়েছে। এসেছে নতুন আঙ্গিক। উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প।

[চার]

সাহিত্য যে সামাজিক সওগাত, এ সম্বন্ধে ইদানীং অল্পসংখ্যক সাহিত্যের কারবারী দ্বিমত পোষণ করেন। সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে, এ সম্পর্কে আজকালকার পণ্ডিতরা ওয়াকিফহাল। এদের গবেষণা থেকেই আমরা পাই, গ্রীক কাব্য নাট্যগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে জীবিকা। গ্রীক সাহিত্যের পণ্ডিতেরা অবশ্য মতামত পেশ করেন পুরনো কায়দায়। জীবিকা অর্জন ও মেহনত নয়, জীবিকা উপভোগের আনন্দই ছিল সাহিত্যের উৎস। গ্রীক নাটকের শুরুতে ছিল সমবেত গান–যাত্রার সখী ও সখাদের গানের, আদি সংস্করণ। এই গান সংলাপের সঙ্গে সংগঠিত হয়ে নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গান ছিল খুশির সাড়া। ফসল বা আঙ্গুরের রস এর প্রধান উপাদান ছিল। অবশ্য মানুষের নানা সমস্যা এই খুশির উপাদান মিশিয়ে দেয় রক্ত আর অশ্রু।

দু হাজার বছর আগেকার রোমান কবি দার্শনিক লুক্রোটিয়াস তার কাব্যগ্রন্থে দেখিয়ে যান প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে শিল্পকলার জন্ম। বাঁশি ও নাচ থেকে শুরু করে কৌতুক ও কাহিনী সবই প্রকৃতির নানান শব্দ ও ছন্দ থেকে শেখা। কিন্তু লুক্রেটিয়াসের মতে শিল্পকলার জন্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, সার্থকতা আনন্দে। এ আনন্দ অবকাশে লীলায়িত।

আজ পরখের এই কষ্টিপাথর সচরাচর ব্যবহৃত হচ্ছে। লুক্রেটিয়াসের মতামত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে। শ্রেণী প্রভাবের ছায়া থেকে যদিও মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে এইভাবে আনন্দে লীন করে দেখেছেন। "বাংলাভাষা পরিচয়" গ্রন্থের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ পড়ে প্রথমে মনে হয়, এ কি উদার ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ছি?

রবীন্দ্রনাথের বাস্তবমুখিতার পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। "সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্খাপূর্ণতার জগত সৃষ্টি করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয়নি, তাকে মূর্তিমান করে মেটাচ্ছে সে আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার সংসার রচনায় চরিত্র রচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড় করে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে। .... শুক্তির মধ্য ব্যাধিরূপী মুক্তার মতো কখনো কখনো আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য–মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকেও তাঁর সাহিত্যবিচারে অঙ্গীভূত করেছেন–"মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু।"

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের বাস্তবমণ্ডলী হচ্ছে, বাইরে থেকে মানুষের আপন করে নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের আপনার সঙ্গে মেলানো সৃষ্টি।

আরও তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে এসেছে এই মত : "বর্তমান যুগে পূর্বযুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না।" (সাহিত্যের স্বরূপ)

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নিত্যকে ছাড়তে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন,–"তাহোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রসসম্ভোগের যে নিয়ম আছে, তা মানুষের নিত্যস্বভাবের অন্তর্গত।"

আধুনিক তত্ত্বসাহিত্য হাতড়ালে মাঝে মাঝে চমকপ্রদ মন্তব্যও মিলে যায় একাধিক।

জার্মান কবি রাইনার মারিয়া রিলকের মতে, কবিতা অনুভূতি নয়, অভিজ্ঞতা। একটি মাত্র কবিতা লিখতে হলে চাই যে অভিজ্ঞতা–তা নানা শহরের, নানা জনের উপাদানের। কবিতা লিখতে হলে জানা চাই নানা জীবজন্তুকে, পাখিদের উড়ে যাওয়া, জানা চাই ফুলেরা ভোরবেলা কী ভঙ্গি করে ফোটে। মুমূর্ষুর পাশেও নিশ্চয় বসেছে কবি। শুধু তাই নয়। মৃতের পাশে ঘরের মধ্যে বসেছে সে। জানালা খোলা, ঘরে কলরব। অভিজ্ঞতা বহু বর্ষে মিশে যায় রক্তে। একাকার হয়ে যায় শিল্পীর সত্তায়। তারপর এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে কবিতার প্রথম শব্দ বেরিয়ে আসে নিমজ্জিত স্মৃতি থেকে।

এখানে অপ্রত্যাশিত কথাটায় এসেছে দ্বিধা। এতগুলি অভিজ্ঞতার ধাপ বেয়ে উঠে কেন অদৃশ্য পাখায় ভর করবে? কেন দেখতে পাবোনা এই ডানাকে?

হয় প্রকৃতি থেকে, নয় সমাজ থেকে, আর নয় তো মানবদেহ থেকে সাহিত্য উৎসারিত–এ সম্পর্কে স্বীকৃতির অভাব নেই। কিন্তু পারস্পরিক যোগাযোগের সূত্র, বাস্তব ও রূপলোকের পরস্পর গতিবিধি সম্পর্কে স্বীকৃতিতে বাধা রয়েছে। এই কারণেই আংশিক সংজ্ঞায় আজও আমরা আচ্ছন্ন। মানুষের জীবন যাকে অবলম্বন করে বিকশিত হচ্ছে, সেই যে প্রকৃতির কাছ থেকে জীবিকা সংগ্রহের হাতিয়ার আর অর্থনীতির ভিত্তিতে পরস্পর মানবীয় সম্পর্ক, সে সমন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়নি, বরং অপরিপূর্ণ রয়েছে। কাজেই অবাস্তব না হলেও আংশিক সংজ্ঞা হবে, এত আর আশ্চর্য কি?

কালে কালান্তরে সামাজিকতা সম্পর্কে সাহিত্যতত্ত্ব আংশিক ব্যাখ্যা নিয়ে প্রসারলাভ করেছে। অন্য উপায় ছিল না। কারণ আদিম সমাজে মানুষ সমষ্টিগত জীবনযাপন করলেও শিল্পকলা, বিজ্ঞান, ভাবাদর্শের দিক থেকে অতি নিম্নস্তরের ছিল। মনন বলতে পারেনি মানুষ কি করছে? পরবর্তীকালে শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শের জন্ম ও বৃদ্ধি হলো। আবেগ যেমন তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ হলো, মননও দিলো পাল্লা।

সে সমৃদ্ধি তার অমর রেখা এঁকে নিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে। পরিবর্তনের ছায়ায় নতুন রঙ বেরোয় তার।

পরবর্তীকালে আমরা অজন্তার পরে শকুন্তলাকে পেয়েছি। পেয়েছি মল্লার, ধ্রুপদ, ভাটিয়ালী, গজল। পেয়েছি সেক্স্পীয়ার, ওমর খৈয়াম, ভিক্টোর হুগো, মাইকেল গোর্কিকে। আরও অনেক কিছু পায়নি। আলেকজান্দ্রিয়ায়, বাগদাদে, নালন্দায় আরও কত অজস্র শিল্পকলা সম্ভার–কত সাহিত্যগ্রন্থ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কামানের গোলা এবং লুব্ধ হাত মহাদেশে মহাদেশে আরও কত লেখা কারুকলা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাখ্যা সম্পর্কেও একই কথা। শ্রেণীসমাজের পত্তনের পর থেকে যেমন সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য দাস, ভূমিদাস, মজুররা বিদ্রোহ করেছে; সেই বিদ্রোহের সঙ্গী সার্থক সুষমা ও সৌন্দর্য বিচার বিদ্রোহের মতোই ব্যর্থতার দলে মিশে গেছে পঞ্চভূতে। আমরা যা পেয়েছি তা থেকে দেখতে পাচ্ছি শিল্পী যেমন কারুকাজ করেছে তেমন বিচারও করেছে। মিলটন একদিকে কবিতা লিখেছেন, আরেক দিকে কবিতার প্রকৃতি নির্ণয় করছেন। আবার এক শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, আরেক শিল্পী বিচারে বসেছেন। কিন্তু শ্রেণীসমাজ বলবৎ থাকার ফলে যোগাযোগ সাধিত হয়নি।

সাহিত্য একতারা থেকে সেতারে, সহজ থেকে দুরূহে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে উন্নত হয়েছে। গোষ্ঠী থেকে কৌমে, কৌমে থেকে জাতিতে, জাতি থেকে আন্তর্জাতিক সমাবেশে সাহিত্য তার আবেদন নিয়ে প্রসারিত হয়েছে সকল বাধা বিপত্তি পার হতে হতে। ব্যক্তিমূল্য সমন্ধে অসচেতন পরিবার গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তিমূল্য সম্পর্কে ক্রমশ অধিকার সজাগ অথচ শ্রেণীপ্রভুত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ সমাজ মানুষ পার হয়ে চলেছে সাহিত্য। পূর্ব ব্যক্তিত্ব, সর্বাত্মক সমষ্টি, শ্রেণীহীন সমাজ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আবাস ভূমি আর কল্পনা নেই। পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে এই নতুন সমাজ মানুষের বিকাশের সকল প্রতিবন্ধককে দূর করে দিয়েছে–সাহিত্যকে দিয়েছে সমগ্রতা। সাহিত্য তাই একদিকে ঐতিহ্যে আর একদিকে নবসৃষ্টিতে উচ্ছল। মানব সমাজের জীবন-প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রায় মিহি মোটা নানারূপে রূপায়ণ বহমান থেকেছে। শ্রেণীসমাজের পাষাণচাপা ঠেলে মুক্তধারাকে অব্যাহত রেখেছে সক্রিয় মানুষ নিশ্চয়ই। মেহনতী মানুষ। মেহনত তো মানব-সমাজের অগ্রগতির অপরিহার্য উপাদান। মেহনতের ছোঁয়ায় ঘুমন্ত জমি কলকারখানা করাত সচল হয়। মেহেনত সকল সংস্কৃতির জাদুদণ্ড। শিল্পকলা এবং সাহিত্যেরও। মেহনত জুগিয়ে আসছে সাহিত্যের অফুরন্ত সৃজনীধারা। মেহেনত জীবিকার অগ্রসর হাতিয়ারের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে শোষকশ্রেণীর নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, যদিও আবার পায়ে পড়েছে সেই নিগড়। কারণ একভাবে না একভাবে ব্যাক্তিগতভাবে সম্পত্তি প্রথা জীইয়ে রেখেছে একদল মালিককে আর অধিকাংশ নিঃস্বকে।

সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস ব্যেপে সংস্কৃতি তথা শিল্পকলা ও সাহিত্যের উপকরণ সঞ্চিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শ্রেণীসমাজে তাদের কদর করতে পারেনি। যেখানে যেখানে শ্রেণীসমাজ বিদ্যমান, সেখানে সাহিত্য আজও তার সমৃদ্ধি সত্ত্বেও শৃঙ্খলিত, বিকৃত, খণ্ডিত, নিপীড়িত। সাহিত্য বিচারের কি করে এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে?

শ্রেণী সমাজের সাহিত্যে চেতনা একদিকে একচেটিয়া, অন্যদিকে মেহনতের ভার। একদিকে ভাব, অন্যদিকে অভাব। একদিকে রস আর সুষমা, আরেকদিকে স্থুল শব্দসম্ভার। তাই দেখি একদিকে ফেলা রয়েছে সাহিত্য দর্পণ আর গীতগোবিন্দ; আরেকদিকে ডাকের বচন থেকে শুরু করে শূন্য পূরাণ। একদিকে অমিয় মাধুরী, আরেকদিকে ধানের নাম। একদিকে বেশি সূক্ষ্ম, আরেকদিকে বেশি সরল। একদিকে বিদগ্ধ, আরেকদিকে ইতর। একদিকে ঐতিহ্যের পাকা অলঙ্কার, আরেকদিকে বহমান হালকা ঋতুর ফুল। একদিকে পীত বসন, আরেকদিকে দিগম্বর। একদিকে অমৃত, আরেকদিকে গরল। শ্রেণীসমাজের সাহিত্য সংজ্ঞা একদেশদর্শী না হয়ে পারে? সংজ্ঞা দেবার অধিকারীও তো অবনত শ্রেণীগুলির চৌহদ্দীর মধ্যে ছিল না। যে দু একজন বিদ্রোহীর পুঁথি অগ্নিদগ্ধ হয়নি, তাদের কথা বাদ দিলাম।

কোন একটা বিশেষ শ্রেণীসমাজ যে কায়েমী হয়ে টিকতে পেরেছে তা নয়। নিরন্ত র চলেছে শ্রেণীসংগ্রাম। কয়েক শতাব্দী পর পর এক একটা নতুন শ্রেণীসমাজের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে অপরাপর শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করেছে। ক্ষমতা দখলের সময়ে নতুন শ্রেণী অন্যান্য অবনত শ্রেণীর সহায়তা নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীকে অপসারিত করে সামাজিক সম্পর্কে রদবদল এনেছে। ফারাসি বিপ্লবের সময় সামন্তদের পরাজিত করে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা যখন ক্ষমতা দখল করে, তখন ফ্রান্সের কৃষক ও শহরের গরীবদের সাহায্য নিয়েছিল। অবশ্যই কাজ হাসিলের পর কৃষক, মজুর ও অন্যান্য গরীবদের সম্পর্কে এদের মতলব ফাঁস হয়ে যায়। যে কোন উপনিবেশের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখবো, বড় বড় পুঁজিপতিরা ক্ষমতা দখলের তাগিদে গত পঞ্চাশ বছর ধরে জনতাকে ডেকেছে বিভিন্ন সময়; অবশ্য শেষ পযর্ন্ত সামন্ত আর বিদেশী রাজের সঙ্গে আপোষ করায় মতলব ফাঁস হতে দেরি হয়নি।

তবুও এই যুগান্তরকালে অল্প সময়ের জন্য হলেও নিপীড়িত অবনত ও ক্ষমতাহীন শ্রেণীগুলির সমাবেশের মধ্য দিয়ে জনতার নিশ্চত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হবে। সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ এই সময় বিজলীর মতো চমকে উঠে দেখিয়ে দিয়েছে, বঞ্চিতের বাহুবেষ্টনের নাগালের মধ্যে থরে থরে সেজে ওঠা সার্থকতা।

ইতিহসে তাই সাহিত্যের সংজ্ঞায় বিদ্রোহী অবনত শ্রেণীদের জনতা এবং মেহেনতের ভূমিকা দেখা দিয়েছে কালে কালে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুশ্রেণী শ্রেয় ও শ্রেয়কে আত্মসাৎ করেছে। জনতাকে তার আদিম আমলের সাহিত্যরীতিতে ফিরে যেতে হয়েছে সামান্য নতুন সুষমা সঙ্গোপনে নিয়ে। সংজ্ঞা জনতাকে পরিহার করেছে। জনতাকে বর্জন করেছে।

সকল আংশিকতার, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির, অসার্থক সৎ প্রচেষ্টার বিপ্লবোত্তর একটা শুভ পরিণতি যে সম্ভব সামগ্রিক সংজ্ঞায় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজতন্ত্রী সমাজে–কিংবা জনগণতন্ত্রী সমাজে তা সমাজতন্ত্রের পুরোযায়ী। সেখানে সমাজের সকল সদস্য, পুরুষ হোক, নারী যুদ্ধ শিশু হোক–পাথরের হাতিয়ার জাদুঘরে জমা দিয়ে আজ মুক্ত যন্ত্রপুরীর উদ্গাতা।

কোটি কোটি সচেতন মানুষের মনের ত্রিধারায় সেখানে প্রকৃতি সমাজ আর ব্যক্তির পরস্পর–সম্পর্ক সঞ্জীবিত হচ্ছে। শিল্পকলা, ভাবাদর্শ আর বিজ্ঞান সেখানে

আর শৃঙ্খলিত নয়। যোগাযোগের সূত্র সেখানে ছিন্ন নয়, পদদলিত নয়। মনন সেখানে প্রকৃতি, সমাজ আর ব্যক্তিকে রূপান্তরিত করার কাজে সক্ষম। অবশ্য, প্রকৃতি সমাজ আর ব্যক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর সম্মেলনের উন্নত স্তরেই মননের এই ক্ষমতা রয়েছে।

সাহিত্যের সামগ্রিক সংজ্ঞার নাম সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ। এই সংজ্ঞা ইদানীং ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েট দেশে সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনার পঞ্চবার্ষিকী কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এই সংজ্ঞা।

সেখানে মজুর শ্রেণী সমগ্র সমাজের যোগাযোগের সূত্রধার হিসাবে অন্যান্য অবনত শ্রেণীকে পরিচালিত করে পুরাতন শ্রেণী সমাজের বদলে নতুন শ্রেণীহীন সমাজের পত্তন করেছে। কর্মে ও মননে নতুন অর্থনীতির নায়ক সেখানে মজুর শ্রেণী। জীবিকা অর্জনের হাতিয়ারের সবচেয়ে অগ্রগামী কর্মী। যন্ত্রপুরীর রহস্যের কারবারী হিসাবে তারা মুক্তির নেতা। মেহনতের দিক থেকে, সংগঠনের দিক থেকে, চেতনার দিক থেকে। কিন্তু এই নতুন অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথাকে তুলে দিয়েছে। তাই এবারকার ইতিহাসের নায়করা জনতাকে দূরে ঠেলছে না কার্যোদ্ধারের পরে। তাই রচিত হয়েছে শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তিস্বরূপ মেহনতী শ্রেণীগুলোর ঐক্য। মজুর, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের ঐক্য।

চেতনা ও মেহনতের অবাধ যোগাযোগ হয়েছে তাই ইতিহাসের বর্তমান স্তরে। সংজ্ঞার আংশিক হবার সম্ভবনা নেই; বরং উত্তরোত্তর উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

সাহিত্যকে সমগ্রভাবে দেখবার সূচনা হয় সাম্যবাদের প্রবর্তক কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখায়। ১৮৪৮ সালে সংগ্রামী মজুর শ্রেণীর মুক্তিস্বপ্নকে একটা বাস্তব কর্মপন্থায় রূপ দেবার জন্যে এই দুই মনীষী বিপ্লববাদীর ডাক পড়েছিল। রচিত হয় সাম্যবাদী ইস্তাহার। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাহিত্যকেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য সামগ্রিক তত্ত্বে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিষদ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি। দিক দর্শন মিলে শুধু। লেখকের শ্রেণীসূত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দেখা যায় গণ্ডিতে আবদ্ধ সাহিত্য আধুনিক কালে কি করে বিশ্ব সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেল্স নিজেরা যৌবনে কবিতা লিখেছিলেন। র্জামানির দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিখ হাইনে এবং ক্রাইল গ্রাথকে নিয়ে তাঁরা সাম্যবাদী সমাজের পথে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবাণী রচনায় প্রবৃত্ত হন। পরে অবশ্য চেতনা-সঞ্জীবিত ত্রিধারার মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানই তাদের সাধনাকে টেনে নেয়। আন্দোলন সংগঠনের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন তাঁরা। কিন্তু শিল্পকলা–বিশেষ করে সাহিত্য বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সমপরিমাণে আগ্রহী, এর বহু প্রমাণ আছে। সেক্স্পীয়ারের নাটক কার্ল মার্ক্সের কণ্ঠস্থ ছিল। ফরাসি ঔপন্যাসিক বালজাকের ভূরি ভূরি লেখা আয়ত্ত ছিল তাঁর। গ্রীক নাট্যকারদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান যেমন ছিল, তেমনি সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাও ছিল। তিনি এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলেন যে সহজ আদিকালের শিল্পকলা কি করে টিকেছে সুসভ্যকালে। এই জিজ্ঞাসা উন্মুক্ত।

মজুর শ্রেণী আপন মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্র সমাজের মুক্তি আনছে। তার চেতনা ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট পথ নির্দেশ করছে। মানব-সমাজের এতকালের ঐতিহ্য নতুন সমাজে এসে ঢেলে দিচ্ছে সওগাত। সাদরে গৃহীত হচ্ছে তা "মানবীয় ঐতিহ্য" নামে। মার্ক্সীয় সাহিত্য সংজ্ঞা তো সামনের দিকে উন্মুখ রয়েছেই। মজুরশ্রেণীর ভাবাদর্শ সঙ্কীর্ণচেতণার দর্শন হবে কি করে? অতীতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাদের নিয়ে মিলিয়ে দেয় সে নতুনের সঙ্গে।

শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে

আমাদের এই বিংশ শতাব্দী এবং বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যবাদের অভ্যুদয়ের উদয়াচল। অপরদিকে এই শতাব্দী ধনিকতন্ত্রের অস্তমিত হওয়ার কাল। এই কালসন্ধিতে সর্বদেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের জীবন ও সাধনা পরস্পর বিরোধী আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলাভূমি হতে বাধ্য। শিল্পীচিত্রের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সর্বজনীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ও দায়িত্বশীলতা এই শতাব্দীর শুরু থেকেই নতুন কালের রসায়নের ভাণ্ডে কখনো অপূর্ব বর্ণবিভাময় নব উপাদান গড়ে তুলেছে, কখনো ধুম্রবহ্নি সমন্বিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিভার জন্য ডেকে এনেছে বিপর্যয়, কিংবা সৃষ্টিকে করেছে অনাসৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের বোরিস পাস্তারনাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের লেখক-জীবনের বিস্ফোরিত গতি পরিণতি এই দ্বন্দ্বের লীলাভূমিকে প্রকট করে দেখিয়েছে।

এই পটভূমিতে স্বভাবতই শিল্পীচিত্তের পরস্পরবিরোধী আকর্ষণ বিকর্ষণগুলির এবং বিশেষ করে স্বাতন্ত্র্য ও সর্বজনীনতার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন এককালের একটা মূল প্রশ্ন হিসাবে সামনে এসেছে।

এই প্রশ্নের সমাধানে অগ্রসর সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যবাদের পক্ষপাতী তাত্ত্বিকরা বলেছেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সর্বজনীনতা ও সর্বসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীলতাকে শিল্পী সাহিত্যিকরা মূল প্রেরণা হিসাবে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করলেই অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। অপরদিকে ধনিকতন্ত্রের পক্ষপাতী তাত্ত্বিকরা বলেছেন, ধনিকতন্ত্রের অতীত স্বর্ণযুগের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক স্বতঃস্ফূর্ততায় ফিরে গেলে শিল্পী সাহিত্যকদের সংকটের সমাধান হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রের তান্ত্রিকরা বলেছেন, যৌথ সমাজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সাফল্যের মাধ্যমেই শিল্পী সাহিত্যিকদের মনোভূমি পরস্পর বিরোধিতার আবর্ত থেকে মুক্ত হবে। ধনিকতন্ত্রের তান্ত্রিকরা যে কোন রকম যৌথ প্রবণতাকে পরিহার করার জন্য শিল্পী সাহিত্যিকদের যুক্তি জোগাচ্ছেন। কোন কোন তাত্ত্বিক অবশ্য মধ্যপন্থা বার করে কিংবা তৃতীয় কোন অভিনব পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় শিল্পীচিত্তের সংকটত্রাণসূত্র দাখিল করে যাচ্ছেন।

ইতিহাসের জয়পতাকা সমাজতন্ত্রের হাতেই রয়েছে। ইতিহাসের রায় সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিকদের পক্ষে রয়েছে। সুতরাং সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, উপরোক্ত ত্রিপাক্ষিক মতামতের সংঘাতে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বই মুক্তির পথ। এখানে

সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয় এই কারণে যে, সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরেও জটিলতা রয়েছে। এই জটিলতা বৈচিত্র্যের, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জীবনের জটিলতা। এই কারণে শিল্পীচিত্তের স্বাতন্ত্র্য ও সর্বজনীনতার প্রশ্নে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে বির্তকের অবকাশ, অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন প্রচণ্ড মত-সংঘাত ঘটেছে। আভ্যন্তরীণ বলে এর তীব্রতা কম হয়নি। বরং একেক সময়ে মনে হয়েছে, প্রথমে উল্লেখিত তিনপক্ষের অভিমতের সংঘাতকে ছাপিয়ে গিয়েছে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরের তাত্ত্বিকদের আভ্যন্তরীণ বির্তক। এই বির্তকও মীমাংসার দাবিদার।

সুতরাং শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়াস একটি বহুমুখী ও জটিল বিষয়। তবে মীমাংসার পথ অনির্দেশ্য নয়, এই পথ অন্ধকার পথও নয়। এ পথে কখনও সোজাসুজি, কখনও আঁকাবাঁকা হয়ে অঝোর ধারায় আলো এসে পড়ছে। এই আলোকধারাগুলিকে কেন্দ্রিভূত করতে হবে সামনের দিকে।

[দুই]

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার যুগ্ম উদ্গাতা কার্ল মার্ক্‌স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স্ ঘোষণা করেছিলেন, ধনিকতন্ত্রের দুনিয়াব্যাপী সম্প্রসারণ একদিকে যেমন বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়ে বসেছে নিজের মৃত্যুবাণরূপে, তেমনি উদ্ভব ঘটিয়ে বসেছে বিশ্বসাহিত্যের। সেদিনকার বিশ্বসাহিত্যের মূল পাদপীঠ ছিল অবশ্য ইউরোপ। সে ছিল যন্ত্রবিপ্লবের পরীক্ষাগার। মার্ক্‌স–এঙ্গেলসের বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতার উত্তরাধিকারে সজাগ আমাদের শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের কালে বিশ্ব সাহিত্যের পাদপীঠ আর শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ নেই। সুতরাং, বিশ্বসাহিত্যের পরিধি ও বৈচিত্র্য আজ সাগর থেকে মহাসমুদ্রে পরিণত। সেই দেশান্তরের সাহিত্যশিল্পীরা আজ বিশ্বশিল্পী। তাছাড়া বিশ্বশিল্পী যে শুধু সাহিত্যের ডুবুরী নন, তিনি যে সঙ্গীত, ছবি, নাটক, ভাস্কর্য প্রভৃতির অশ্রান্ত রূপকার, সে কথাটা পূর্বাপেক্ষে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে প্রকশিত হয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে। বৃটেনের হার্বার্ট রীড কিংবা সোভিয়েট ইউনিয়নের আইসেনষ্টাইনের লেখা "শিল্পকলা" সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনাগ্রন্থে ছত্রে ছত্রে এর অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ। এই প্রাচীরভেদী অীঙ্গকার বিশেষ করে আইসেনষ্টাইনের লেখায় এক বহমান মহাসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। এবম্বিধ পটভূমিতে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের মুখোমুখী হবার যে কোন প্রয়াসে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার প্রবণতা আসা স্বাভাবিক।

সুতরাং, আমার আলোচনার প্রয়াসকে প্রথমেই সূত্রে আবদ্ধ করে উপস্থিত করছি। এরপরে একে একে আসবে এদের ব্যাখ্যা।

[তিন]

আমাদের প্রথম প্রতিপাদ্য এই যে, একালের শিল্প-সাহিত্যিকদের ব্যক্তিক অস্থিরতা এবং অগ্নিপরীক্ষা প্রধানত সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং ব্যাপক

অনুপূরক হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের কার্যক্রমের পরিপূরণেই এদের সমাধান অবধারিত। ধনিকতন্ত্রের তাগিদে কিংবা মরণকামড়ের প্ররোচনার ফলেই সমাজতন্ত্রের যুগের শিল্পীচিত্তে দ্বন্দ্ব ও আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে কিংবা হয়ে চলেছে বলে আমাদের মনে মাঝে মাঝে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটা ভ্রান্ত। সামজতন্ত্রই শিল্পীচিত্তকে অভাবিতপূর্ব নব নব দিগন্তে পৌঁছে দিয়ে এই শতাব্দীতে নতুন করে শিল্পী স্বাধীনতার প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, ধনিকতন্ত্র শিল্পী-সাহিত্যকদের মুখগুলিকে সমাজতন্ত্রের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তুতির দিনগুলিতে নিবদ্ধ করার যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ধনিকতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে গত শতাব্দীতেই শিল্পীচিত্তের কাছে তার যেটুকু আবেদন ছিল, সেটুকু হারিয়েছে। সুতরাং শিল্পীরা অন্তর্জ্বালা মেটাবার জন্য পিছনের দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকালেও দল বেঁধে পিছন দিকেই চলবেন বলে যাঁরা ভাববেন তাঁরা নিজেদের স্থাপন করবেন ইতিহাসের বাইরে। ধনিকতন্ত্রের বুকজ্বালা অগ্নিশিখায় যে শিল্পীরা ঝাঁপ দিবেন বিভ্রান্ত হয়ে, তাঁরা আর জীবনের গান গাইবেন না, জীবনের আলপনা আঁকবেন না।

তৃতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণেই মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের সর্বময় মুক্ত পরিবেশে শিল্পীচিত্তের অপঘাত ও অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে সত্য, কিন্তু এই সম্প্রসারণকেও হতে হবে সর্বতোভাবে সজাগ ও সচেতন। সামগ্রিক লক্ষ্যের দিকে যেমন সমাজতন্ত্রের কাণ্ডারীদের থাকা চাই একাগ্রতা, তেমনি যে বিশেষ ধারাগুলি এই লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত, তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টানাপোড়নের জন্যও থাকা দরকার শত সহস্র চোখ। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে উন্মেচিত অগ্রগতি এবং বিকাশের যতগুলি তাগিদ ও ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে চলেছে, বহির্মুখী কিংবা অন্তর্মুখী নির্বিশেষে তাদের সকলকে তথা প্রত্যেককে দিতে হবে পরিপূর্ণ সুযোগ। এই সব উদ্যোগকে এবং আকাঙ্ক্ষাকে দিতে হবে পূর্ণ মূল্য। সমাজতন্ত্রের মূল করণীয় কিংবা অগ্রগতির মূল ধারা সার্থকতার দিকে চলতে থাকলে অন্যান্য সমস্ত সোতধারা যথাসময়ে সার্থকতায় পৌঁছে যাবে বলে মনে করে নিলে শিল্পীচিত্রেত্তর স্বাধীনতার প্রশ্নের সমাধান বিলম্বিত হবে অথবা ছাইচাপা থেকে যাবে অন্তর্দাহ। এই ছাইচাপা-অন্তর্দাহ মূল করণীয়ের মুখেই প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়ে বসবে মাঝে মাঝে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দায়িত্ব ও করণীয় সর্বজনীন দায়িত্ব এবং করণীয়। এই করণীয় অবিভাজ্য। সমাজতন্ত্রের বিবেচনার মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন ঠিক সেইভাবে সমাধান দাবী করে, যেমনভাবে যৌথখামার দাবী করে ট্রাক্টর। এই দাবী অপ্রতিরোধ্য।

প্রথম প্রতিপাদ্য (ক)

মুষ্টিমেয়ের ভোগদখল ও স্বেচ্ছাচার থেকে সমাজের অপরিমেয় অধিকাংশের অধিকার ও মেহনতের ফলকে মুক্ত করে সর্বজনীনতাকে সকল সম্পদ সৃষ্টির মূল চাবীকাঠিতে পরিণত করার প্রতিজ্ঞাতেই সমাজতন্ত্রের নামকরণ হয়েছে। গত শতাব্দীতে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে দিগন্তে নতুন যাত্রাপথের দিশারী তারা হয়েই সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দেয়।

বিংশ শতাব্দীতে এই দিশারী তারা নিকটতর হয়েছে। বিপ্লব ও নির্মাণের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের দর্শন সমষ্টিগত অধিকারভিত্তিক যৌথ সংহতির জীবনযাবনের প্রয়োজনকে অপরিহার্য ও অনিবার্যরূপে উপস্থাপিত করেছে। এই সমষ্টিসত্তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যতন্ত্রের কাণ্ডস্বরূপ। কিন্তু এই কাণ্ডকে বৃক্ষ মনে করলে ব্যাপারটা অন্ধের হস্তী দর্শনের সমতুল্য হবে। সমাজতন্ত্র তার মূল ও কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিকই, কিন্তু তার অসংখ্য পত্রপুট সূর্যের কাছ থেকে নিংড়ে বার করে নিয়ে আসবে সমগ্র বৃক্ষের জন্য রূপ রস বর্ণ, প্রাণের অভিব্যক্তি প্রাণ। খোলা চোখ নিয়ে দেখলেই এই ব্যাপার দেখা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা সাম্যতন্ত্রের সংহতি আদিম গোষ্ঠীসমাজের অপরিণত সংহতি নয়। এ কালের সংহতিতে গুণগত রূপান্তর অবধারিত। সমাজতন্ত্রকে যাঁরা নব-ঐতিহাসিক সাম্যতন্ত্রের উপক্রমনিকা বলে মনে করেন, তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ক্রিস্টফার কডওয়েলের একটি বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। কবিতার উৎস ও গতিপরিণতি সম্বন্ধে কডওয়েলের প্রখ্যাত "মায়া ও বাস্তব" গ্রন্থের এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ ব্যাখ্যারও দাবী রাখে না, যথা "ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতি থেকে সাম্যতন্ত্রে যাওয়ার জন্য যে সম্মুখ পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় সেটা আদিম গোষ্টী-সাম্যতন্ত্রের সামাজিক সংহতিতে ফিরে যাওয়াও বটে। কিন্তু এই ফিরে যাওয়ার সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারও রয়েছে। এই অনেক কিছু হচ্ছে আদিম সাম্যতন্ত্র এবং এ কালের সাম্যতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালীন সমস্ত বিকাশ ও উন্মোচন, সমস্ত শ্রমবিভাগ। এই সমস্ত বিকাশ, উন্মোচন, ও শ্রমবিভাগের দরুনই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিকতা এবং চেতনার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সামাজিক সংহতিতে প্রত্যাবর্তন যদিও সমাজের যৌথ সত্তায় এবং অখণ্ডত্বে ফিরে যাওয়া, কিন্তু এই সমাজে উপর থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার প্রশ্নই আসতে পারে না। এখানে চেতনাতে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় সর্বজনসম অংশীদার।

এই 'সর্বজন সম-অংশীদার' কথাটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতন্ত্রের সুদূরপ্রসারী দ্বৈত সত্তার প্রতি এখানে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা' আমাদের একটিমাত্র বিদুৎ-ঝলকে দেখিয়ে দেয়, এখানে বহু-ব্যক্তিকতারও কী এক অভূতপূর্ব অভ্যুদয় চিহ্নিত। এই বহু-ব্যক্তিকতাকে কি বৃক্ষের অগণিত পত্রপুটের সঙ্গে তুলনা করা যায় না?

এ প্রশ্নকে অনুসরণ করে আরও বিস্তারিত আলোচনা এবং মতামতে প্রবেশ করা যেতে পারে। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতি পরিণতি তুলনা করা যাক প্রথমত।

এই শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক অভ্যুদয়গুলির দিকে তাকালে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, সেটা এই যে, গণ মানবসত্তা, যৌথসত্তা কিংবা জনতাসত্তার মহাপ্রবাহ উৎসন্ন করে দিচ্ছে ব্যক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস এবং পরশ্রম-শোষণের ভিত্তিভূমিগুলিকে। এই মহাপ্রবাহের কলোচ্ছ্বাসের তুলনায় ফরাসি বিপ্লবের গণঅভ্যুত্থানগুলিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বলে মনে হয়। বহু-ব্যক্তিকতার ক্ষেত্রেও এই তুলনা প্রযোজ্য। সামন্তবাদী স্বৈরাচারের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারাগারের প্রাচীর-বিধ্বংশী ফরাসি বিপ্লব ব্যক্তিক ও জাতিসত্তাগত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যে পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরেছিল, তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদীদের বিশেষ সামাজিক ও

রাজনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে সমগ্র লোকসমাজের হাতে তথা সমগ্র বিশ্বমানবের হাতে তুলে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রে সমাজের সকল মানুষের তথা প্রত্যেকটি মানুষের অর্গলমুক্তি সুনিশ্চিত, কারণ, শোষণ, বঞ্চনা এবং পরস্বাপহরণের যে মূল ব্যবস্থা মানুষকে মানুষের ক্রীতদাস, ভূমিদাস অথবা মজুরীদাসে পরিণত করে এসেছে, সমাজতন্ত্র তাকে অপসারিত করে দিচ্ছে। গণবিপ্লব নিয়ে শুরু হলেও ফরাসি বিপ্লব এটা করতে পারেনি। ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত যে এক বিশেষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালী এবং ক্ষমতাকামী গোষ্ঠীর হাতে পড়েছিল, তারা সামন্তবাদী ভূস্বামী প্রথার ফাটলে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী শিল্পবিপ্লবের পাদপীঠ স্থাপন করেছিল। শোষণ, বঞ্চনা ও পরস্বাপহরণের একটা রদবল হয়েছিল মাত্র। গত শতাব্দীর ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক বালজাগ, হিউগো, স্তাঁদাল, জোলা এবং আনাতোল ফ্রাঁসের (যাঁকে বর্তমান শতাব্দীর লেখকও বলা যায়) লেখায় এই রদবদলের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি বিস্তারিতভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে। ভিক্টর হিউগোর "লা মিজারেবল্স" উপন্যাস এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই আমেরিকা মাহাদেশে যে সার্বভৌম মার্কিনী প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল প্রায় এই সময়ে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায়, একটা প্রজাতান্ত্রিক গণস্বাধীনতা সংগ্রাম একটি বিষয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালী চক্রের ক্ষমতা–লাভে পর্যবসিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে ফরাসি বিপ্লবের তরঙ্গগুলি আসড়ে পড়ার পরে সমান্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উলটপালট ঘটলেও অপরিমেয় অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যে জুটেছিল দাসত্বচক্রের হেরফের। এই ইউরো-মার্কিন সামাজিক ও রাষ্ট্রীক গতি পরিণতিই গত দুই শতাব্দীতে একচেটিয়া পুঁজিবাদ তথা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং এর চূড়ান্ত স্বৈরাচারী অভিব্যক্তি, যুদ্ধবাদী, ফ্যাসিবাদের ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করেছে। এই ভিত্তিভূমিকে ধবংস করার লক্ষ্য সামনে রেখে সামজতান্ত্রিক বিপ্লবী মতাদর্শ গড়ে ওঠে গত শতাব্দীতে। এই হিসাবে বলা যায়, ফরাসি বিপ্লবের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভূলুণ্ঠিত পতাকাকেও তুলে নিয়েছে এই সমাজতন্ত্র। এই পতাকার সামনে অবশ্য এবারকার পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে : "ব্যক্তি-স্বাধীনতার সর্বজন সম-অংশীদার।"

সমাজতন্ত্রের বহুব্যক্তিকতার এই মহাবিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ইউরো-আমেরিকা নয়, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি মানুষের সমাত্মক মুক্তি-অভিযাত্রা অঙ্গীভূত। সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আফ্রো এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার গণ অভ্যুদয়গুলির সূত্রপাত–সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলির ভাঙ্গনের সূত্রপাত।

বহুব্যক্তিকতার এই ব্যাপকতা ও গভীরতার জঙ্গম দুনিয়া একটা সাধারণ যুগের অঙ্ক হতে পারে না নিশ্চয়। শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের সমাধানও এই কারণেই জটিল?

[পাঁচ]

প্রথম প্রতিপাদ্য (খ)

সমাজতন্ত্রের অভূতপূর্ব বহুব্যক্তিকতাকে বৃটিশ আইরিশ লেখকশিল্পী অস্কার ওয়াইল্ড (জন্ম ১৮৫৬–মৃত্যু ১৯০০) যেভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, তা' এখানে উল্লেখযোগ্য। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবাত্মা" (The soul of man under Socialism) গ্রন্থে লিখেছিলেন : "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেকটি লোকই সমাজের সাধারণ সমৃদ্ধি ও সুখের শরিক হবে। যদি দুর্বিপাক আসে তাকে কারুরই দুর্ভোগের ইতরবিশেষ হবে না। অপরদিকে সমাজতন্ত্র ব্যাপারটাই হবে নতুন একটি মূল্য। এর কারণটি সহজ। সমাজতন্ত্রের পরিণতি হবে ব্যক্তিকতা।

"এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যক্তিকতা তার বিকাশের ব্যাপারে আজ যেখানে কম বেশি নির্ভর করছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর, সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার উচ্ছেদ দ্বারা এর কি উপকার সাধিত হতে পারে? এর উত্তর খুব সহজ।

"এ কথা সত্য যে, বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বায়রন, শেলী, ব্রাউনিং, বদলেয়ার কিংবা ভিক্টর হিউগোর মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী কিছুসংখ্যক মুষ্টিমেয় লোক কমবেশি পরিপূর্ণভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে উপনীত হতে পেরেছেন। ধরে নেওয়া যাক, সমাজতন্ত্রে এই সুবিধাটা তুলে নেওয়া হলো। ব্যক্তিকতার ক্ষেত্রে এর কী ক্রিয়া হবে? এতে উপকারটাই বা কী হবে? উপকারটা হবে এই ভাবে :

"সমাজতন্ত্রের পরিবেশে ব্যক্তিকতা হবে অনেক-অনেক-বেশি প্রমুক্ত। অনেক অনেক বেশি মার্জিত এবং এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ঘনীভূত। মানব-সমাজের মধ্যে যে মহান প্রকৃত ব্যক্তিকতা অন্তর্নিহিত ও সম্ভাব্যরূপে বিদ্যমান রয়েছে, আমি তাঁর কথাই বলছি।

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তিকতার ক্ষতি করেছে, এর আসল রূপকে সামনে আনতে দেয়নি, মানুষকে তার সম্পত্তির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তির। এর পাল্লায় পড়ে ব্যক্তিকতা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মুনাফা, ব্যক্তিকতা এর লক্ষ্য নয়।

"সমাজতন্ত্র ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, যে নতুন ব্যক্তিকতার জন্য কাজ করছে, তা হবে ত্রুটিহীন ও সুসঙ্গতি। গ্রীকরা যা চেয়েছিল কিন্তু যাকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি, সমাজতন্ত্র আনছে সেই সুসঙ্গতিকে। গ্রীকরা চিন্তার দিক দিয়ে আনতে পারলেও কাজে পুরোপুরি আনতে পারে নি, কারণ তাদের সমাজে দাস ব্যবস্থা ছিল .....। রেনেসাঁও একে চেয়েছিল কিন্তু আনতে পারেনি, কারণ তাদের সমাজে দাস ব্যবস্থা ছিল .....। একমাত্র শিল্পকলা ক্ষেত্র ছাড়া এরা সুসঙ্গতিকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে পারেনি।"

অস্কার ওয়াইল্ড বিংশ শতাব্দীর একজন বিপ্লবী ভবিষ্যৎবাদীর মতোই পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছিলেন সমাজতন্ত্রের সুস্পষ্ট বহুব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিতকে।

কিন্তু তাঁর এই সূত্রকে তিনি একটা সরল যোগ অঙ্কের মতো কষেছিলেন মনে করলে ভুল করা হবে।

একথা ঠিক যে, সমাজতন্ত্রকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তিদাতা হিসাবে, কিন্তু এই স্বাগত জানানোটা ছিল প্রধানত প্রচণ্ড অভিমানী শিল্পীচিত্তের তাগিদের সঙ্গে জড়িত। শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল : "এ পর্যন্ত ব্যক্তিকতার তীব্রতম যে রূপায়ণকে দুনিয়া জেনেছে, তা হচ্ছে শিল্পকলা। আমার ইচ্ছা হয় আরও বলি, শিল্পকলা হচ্ছে ব্যক্তিকতার একমাত্র প্রকৃত রূপায়ণ।" সুতরাং সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরেও দ্বন্দ্ব সংঘাত যে ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন জাগরূক। "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবাত্মা" নিবন্ধের মধ্যেই তিনি শুরুতে জানিয়ে নিয়েছিলেন, "মানুষের প্রথম গুণ হচ্ছে বিদ্রোহ করা।" অবশ্য এজন্য তিনি সমজাতন্ত্র থেকে তফাতে থাকবার কথা চিন্তা করতে পারেননি। তিনি সেসময় সুস্পষ্ট দেখতে পেরেছিলেন সমাজতন্ত্রের মুক্তধারার পূর্ণ সামাজিক সংহতি এবং বৃক্ষের অগণিত 'পত্রপুট'রূপী বহুব্যক্তিকতার দৈত রূপায়ণকে।

[ছয়]

প্রথম প্রদিপাদ্য (গ)

এই শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নের মধ্যে বহুব্যক্তিকতার অনিবার্য বিকাশের অভিযাত্রাকে আজ অবশ্য গত শতাব্দীর এক অশান্ত শিল্পীর ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েই বিচার করা সঙ্গত হবে না। সমাজতন্ত্র আজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান ঘটনা এবং বর্তমান ঘটনারা যেভাবে স্থূলসূক্ষ্মে জড়িত হয়ে বিভিন্নমুখী সংগ্রামের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ঘটে থাকে, সমাজতন্ত্রের বহুব্যক্তিকতার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে এবং ঘটছে। এ কারণেই ব্যাপারটা একটা অগ্নিপরীক্ষা, কারণ মানব-সমাজের ইতিহাসের সম্পূর্ণ একটা নতুন পর্যায়ে যৌথসত্তা ও ব্যক্তিকতার সঙ্গতি সাধিত হতে চলেছে। এই শতাব্দীতে শিল্পী-জীবনের সার্থকতার প্রশ্নে যাঁরা ব্যক্তিক স্বাধীনতার ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁরা কিভাবে সমাজতন্ত্রের মুক্তধারার দ্বৈতরূপকে গ্রহণ করেছেন, সেটা লক্ষণীয়। এখানে রোঁমা রোলা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমাদের আলোচনার মূল মর্মে পৌঁছেছে বলে আমার ধারণা। সুতরাং এঁদের দুজনকে সামনে আনা যাক।

উনিশ-বিশ শতকের যুগসন্ধির এক অশান্ত সঙ্গীতশিল্পীকে নায়ক করে লেখা উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তফ"-এর রচয়িতা রোমাঁ রোলাঁ ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ফেডর গ্লাডকভ এবং ইলিয়া সেলভিনস্কির কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণকারী মুক্ত শ্রমিকদের শিবিরে আমি মানবতার এবং চিন্তার স্বাধীনতার দুই পবিত্র পতাকা বহন করে এনেছি। এই পতাকা দুটিকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকার-সচেতন হে আমার বন্ধুগণ, আপনারা স্বাধীন এবং স্বাধীন বলেই আপনাদের অজ্ঞাতসারেই আপনারা সত্যকার স্বাতন্ত্র্যবাদী। মানবতার পতাকা যে আপনারই বহন করছেন, সম্ভবত তা আপনারা জানেন না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"তে বোলশেভিক একনায়কত্বের প্রতি নীতিগত বিরূপতা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে রোমাঁ রোলাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি একই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বললেন, সোভিয়েট-সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা শ্রমিক-একনায়কত্ব নিজেই নিজেকে নাকচ করে বহুব্যক্তিকতাকে মুক্তধারায় উৎসারিত করে দিচ্ছে।

রোমাঁ রোলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত প্রায় একই ধরনের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে একথাটা বেরিয়ে আসে যে, ধনিকতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার ঐতিহাসিক গর্ভাঙ্কে অভাবনীয় যৌথসত্তা এবং অকল্পনীয় বহুব্যক্তিকতার যে উদ্ভব ঘটেছে, তাদের সংশ্লেষণ ঘটানোর জন্য এই দুই শিল্পীই ছিলেন উন্মুখ। এই কাজটা কিন্তু সহজ হয়নি। এই কারণে এই দুই শিল্পীর চিন্তার জগতে আবর্তেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

রোমাঁ রোলাঁর "আমি বিশ্রাম করবোনা" গ্রন্থের অধিকাংশ নিবন্ধ অথবা পত্রাবলিতে এই ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিফলিত হয়েছিল।

একটা দৃষ্টান্তও দেওয়া যাক। স্টালিনের জীবনী লিখেছিলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং রোমাঁ রোলাঁর সমসাময়িক সংগ্রামী শিল্পী আঁরি বারবুসে। তিনি এর আগে ১৯১৭ সালের সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। সে সময়টা ছিল সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালের অগ্নিপরীক্ষার যুগ এবং এর ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান নিয়ে ফ্রান্সের সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে বারবুসে ছিলেন শতকরা শতভাগ সোভিয়েটপন্থী। রোমাঁ রোলাঁ বারবুসের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেননি সেদিন। বিতর্ক যখন চরমে উঠেছিল, তখন ১৯২২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে রোমাঁ রোলাঁ বারবুসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই :

"প্রিয় বারবুসে, আমার ধারণা, এক অটল বিশ্বাস আপনার জীবনের মূল ভিত্তি। আমার মুখ থেকে এই যে মন্তব্যটা বেরিয়ে এসেছে, এটা নিশ্চয় তিরস্কারের উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসেনি। আমরাও জীবনের ভিত্তি এক অটল বিশ্বাস। ভালর জন্যই হোক, কিংবা মন্দের জন্যই হোক জানিনা, আমার দেবতা এবং আপনার দেবতা গণতন্ত্রের রথের চাকায় বাঁধা। আপনার দেবতা সাম্য, আর আমার দেবতা স্বাধীনতা। রাসিনের সেই বৃদ্ধের মতো আমিও বলি, এই দুই দেবতাই শক্তিমান। কিন্তু তারা সব সময় মনের মিল রেখে চলে না। আসুন আমরা সঙ্গতি স্থাপন করি। আর, আমার-আপনার দেবতাদের মধ্যে যদি বিরোধের অবসান নাও হয়, তবু আসুন আমরা করমর্দন করি।"

রবীন্দ্রনাথের "শ্যামলী" কাব্যগ্রন্থের 'অমৃত' কবিতা কিংবা 'কালের যাত্রা' নাটকে সমাজতন্ত্রের যৌথসত্তার প্রতি স্বীকৃতিজ্ঞাপনের সঙ্গে রয়েছে ব্যক্তিসত্তার এমন একটি বিদ্রোহী এবং খেয়ালী অভিব্যক্তি, যাকে অনির্দেশ্য বলে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য, যে কবি জীবনের প্রায় সায়াহ্নে পৌঁছে লিখেছেন, 'বাহিরে বহুর সঙ্গে জড়িত এ হৃদয় আমার' তিনি কিংবা রোমাঁ রোলাঁ যে অনায়াসে আগুন নিয়ে খেলা করে গিয়েছেন, এ সত্যটা এখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এর কারণ, এঁরা দুজনেই একটা আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হয়েছিলেন যে, যা কিছু হবে সবই সমাজতন্ত্রের মধ্যে হবে। হতে হবে। হওয়া চাই। এঁরা যখন সংশয় প্রকাশ করেছেন, তখনও ধনতন্ত্রীদের প্ররোচনায় তা করেন নি। ধনিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সোভিয়েট ইউনিয়নকে 'অসহ্য মশালের আলো' হিসাবে দেখে তাকে অপসারিত করার জন্য ষড়যন্ত্র এবং প্ররোচনার জাল বিস্তার করেছে. তখন রোমাঁ রোলাঁ আঁরি বারবুসের পাশে দাঁড়িয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। রোমাঁ রোলাঁ জানতেন, সমাজতন্ত্রের যৌথসত্তা শিল্পীচিত্তের ব্যক্তিক মুক্তি-প্রবণতাকে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছে, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ব্যাপারে সমাজতন্ত্রই শিল্পীর সহায়।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতীতিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাকভারতের পশ্চাদ্‌পদ মানুষের সংগ্রামী আক্ষেপের পটভূমিতে সংস্থাপিত দেখতে পাওয়া যায়। 'রাশিয়ার চিঠি' এই কথাই বলে।

[সাত]

প্রথম প্রতিপাদ্য (ঘ)

সমাজতন্ত্রের বহুব্যক্তিকতার সঙ্গে জড়িত হয়েই ঘটেছে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের বির্তকের উদ্ভব।

ম্যাক্সিম গোর্কির "মা" উপন্যাসের মধ্যে প্রাক্ বিপ্লব যুগেই আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারায় বীজাকারে পরিদৃষ্ট হয়েছিল সমাজতন্ত্রের যৌথসত্তা ও ব্যক্তিকতার সমন্বয় ও সংঘাতের ছবি। ১৯৩৪ সালে ম্যাক্সিম গোর্কির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট লেখক সম্মেলনে ব্যক্তিকতা ও যৌথসত্তার সুসঙ্গতি বিধানের এই তাগিদই খোলাখুলি প্রকাশ পেয়েছিল, স্থান পেয়েছিল সোভিয়েট লেখকদের ঘোষণাপত্রে।

এই তাগিদ সমাজতন্ত্রের নিজস্ব তাগিদ।

[আট]

দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য (ক)

অধ্যাপক জর্জ টসমন তাঁর "মার্কসবাদ ও কবিতা" নামক আলোচনা গ্রন্থে চারশত বছর আগেকার শেক্‌সপীয়রকে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের দলে টেনেছেন তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগুলিকে স্বর্ণসঞ্চয়ের লোভের অভিশাপের পরিণতি হিসাবে অভিহিত করে। তাঁর এই প্রয়াসকে একটা সাম্প্রতিক জেদ বলে চিহ্নিত করলে হয়তো করা যেতে পারে। কিন্তু গত শতাব্দীতেই ইংরেজ কবি সুইনব্যর্ণ একাজ করেছিলেন শেক্‌সপীয়রের "কিং লিয়ার" নাটককে সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা হিসাবে অভিহিত করে। সুইনব্যর্ণ এজন্য বিশ্লেষণও দাখিল করেছিলেন। এই বিশ্লেষণের পিছনে কাজ করেছিল শিল্পীসাহিত্যিকদের এক সাধারণ প্রবণতা। এই প্রবণতা ছিল ধনিকতন্ত্রের মূল্যবোধগুলির প্রতি হতাশ্বাস ও তীব্র বিরূপতা। এই প্রবণতার দরুনই গত

শতাব্দীতে ফ্রান্সের কবি রাঁব (Rimband) এবং তাঁর সাথীরা সাম্যবাদী শ্রমিক অভ্যুত্থান প্যারী কমিউনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। রাবঁ ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের সময় একটা সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। অথবা কবিতা লেখার ক্ষেত্রে রাবঁ ছিলেন চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন : 'যদি কেউ কবি হতে চায়, তবে তার প্রথম অধ্যয়ন হবে ষোল আনা আত্মজ্ঞান অর্জন।'

রাবঁ কিংবা সুইনব্যর্ণের মতো স্পর্শপ্রবণ ভাবুক-শিল্পীদের কাছেও ধনিকতন্ত্রের বক্তিকতার কোন আবেদন ছিলেনা। তাঁরা বরং সমাজতন্ত্রের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিকতাকে সংযোজিত করে নিয়েছিলেন সমাতন্ত্রের স্বপ্ন ও সংগ্রামের সঙ্গে।

উনিশ শতকের আরেকজন শিল্পীর কথা ধরা যাক। এই শিল্পীর ভ্যান গগ। আমেরিকার একালের ঔপন্যাসিক আর্ভিং স্টোনের লেখা "লাস্ট ফর লাইফ" (জীবন-লালসা) ভ্যান গগের শিল্পীজীবনের প্রত্যয়ের দিকটাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিত্রিত করেছে। ভ্যান গগ ধনিকতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর শিল্পীজীবনের শুরুতেই। তারপর তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সাম্যতন্ত্রের প্রতি। এই সাম্যতন্ত্র ছিল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও শিল্পীমনের রং-এ রাঙানো। কিন্তু একথা তো বলা যেতে পারে যে, ধনিকতন্ত্র রেনেসাঁর শিল্পকীর্তি নিয়েও ভ্যান গগের মনে বিন্দুমাত্র জায়গা করতে পারেনি।

লিও টলস্টয়ের উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তিনি সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন না, এ কথা অবশ্য ঠিক। তিনি ছিলেন এক ধরনের নৈরাজ্যবাদী, যেখানে সহযোগিতা স্বর্তঃস্ফূর্ত। সমাজতন্ত্রবাদ তাঁর সমসাময়িককালে যেভাবে যৌথ সত্তায় পৌঁছবার পথ নির্দেশ করেছিল, তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব নৈতিকতা দিয়ে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, সমাজতন্ত্রবাদীরা ধনিকতন্ত্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমাজতন্ত্রে স্থানান্তরিত বা রূপান্তরিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং এজন্য সমাজতন্ত্রীরা ধনিকতন্ত্রের শিল্পসম্প্রসারনের তথা কলকারখানার নোংরামিটাকে অবিশ্রিতভাবে অবাঞ্ছিত ব্যাপার বলে মনে করে না; সমাজতন্ত্রীরা মনে করে যে, ধনিকতন্ত্র যে কলকারখানা গড়ছে, সর্বহারা শ্রমিকদের জড়ো করছে বস্তিতে বস্তিতে, তারাই হচ্ছে ধনিকতন্ত্রের মৃত্যুবাণ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপকরণ ও শক্তি। টলস্টয়ের কাছে এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা দারিদ্র্যকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়ার শামিল ছিল। অর্থাৎ নিজের মৃত্যুবাণ তৈরি করতে করতে ধনিকতন্ত্র যে অগণিত চাষীকে সহরের পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করে মারে, সেটাই টলস্টয়ের সামনে বড় সমস্যা ছিল। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, ধনিকতন্ত্রের কোন আবেদনই ছিল না টলস্টয়ের শিল্পীমনের কাছে।

এইভাবে যাচাই করতে বসলে দেখা যাবে যে, উনিশ শতকেই শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের একটা দিকের নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। শিল্পী-সাহিত্যকরা তাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ধনিকতন্ত্রের দ্বারস্থ হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেননি উনিশ শতকেই। এই শতাব্দীতে তারই জের চলছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

[নয়]

দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য (ঘ)

বৃটেনের ধনিকতন্ত্রের সম্প্রসারণ সাধিত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধমে। বৃটেনের পৃথিবীব্যাপী ঔপনিবেশক সাম্রাজ্যের সম্পদের উৎস উনিশ শতকে অনেকেরই কাছে অফুরন্ত মনে হতে পারতো। এমনকি, এর বদৌলতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পর্যন্ত একটা অভিজাত স্তরের সৃষ্টি হয়েছিল, যার জের চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরেও। কিন্তু শিল্পীচিত্তে পৌঁছে এই মোহ ঘটাবার মত ব্যাপারটা বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে।

উনিশ শতকের প্রখ্যাত কবি ও চিত্রশিল্প উইলিয়াম মরিস থেকে শুরু করে এই শতাব্দীর কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার পর্যন্ত সমস্ত "সূক্ষ্ম কাজের কারবারিরা" ধনিকতন্ত্রকে পরিহার করে আসছেন। এমনকি, এই শতাব্দীর গোড়াতে "ফরসাইট সাগা" উপন্যাসের লেখক জন গলসোয়ার্দির মতো আত্মসচেতন ও অভিজাতমনা লেখকও ধনিকতন্ত্রের মৃত্যুসঙ্গীত গেয়ে গিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। গলসোয়ার্দির "ফরসাইট সাগা'র" কোন কোন খণ্ড স্টালিনের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়েনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসাবে সেখানকার গণপাঠকদের মনকে নাড়া দিয়েছিল।

গলসোয়ার্দির সমসাময়িক টমাস হার্ডির উপন্যাস 'টেস'কে আমেরিকার সাহিত্য সমালোচক ক্যালডার্টন সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। ইংল্যাণ্ডের কৃষিতে পুঁজিবাদীদের প্রবেশের দরুন যে মর্মন্তুদ সমস্যার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ক্ষেত মজুরদের জীবনে এই শতাব্দীর শুরুতে, 'টেস' নামক চাষী মেয়েটি তার জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, উইলিয়াম মরিস, বার্ট্রাণ্ড রাসেল কিংবা বার্নাডশ'র লেখায় সমাজতন্ত্রবাদকে বিকল্প আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যে চিন্তাধারা প্রকাশ্য প্রচারে অভিব্যক্তি চেয়েছে, তা'ই ফল্গুধারার মতো কাজ করেছে আরো অনেকের লেখায়। উইলিয়াম মরিসের "নিউজ ফ্রম নোহোয়ারের", বার্নার্ড শ'র "ইবসেন তত্ত্বের সারসত্তা" এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'স্বাধীনতার নানা পথ' বৃটেনের শিল্পী সাহিত্যিকদের মনে ধনিকতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণকেও খেলো এবং জলো করে দিয়ে গিয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থই ব্যক্তিক অভিরুচি প্রবণতা এবং সমাজতন্ত্রের অপরিহার্যতা-বোধের রাসায়নিক মিশ্রণের উদাহরণ হিসাবে বৃটিশ বুদ্ধিজীবী মানসে জাগ্রত। বার্নার্ডশ' যেভাবে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন কিংবা বার্ট্রাণ্ড রাসেল যেভাবে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে না গ্রহণ না বর্জনের পাল্লায় ফেলেছিলেন, তাতে সমাজতন্ত্র ও শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ বৃটেনে রয়ে গিয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিতে চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারেননি।

এককভাবে আরেকজনের দৃষ্টান্তও এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স (জন্ম ১৮৮৫ মৃত্যু ১৯৩০)। ইদানীং তাঁর "লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার" উপন্যাস নিয়ে যে হৈ চৈ শুরু হয়, তা এখনও স্তিমিত হয়ে

যায়নি। তাঁকে এই শতাব্দীর একজন অনন্যসাধারণ শিল্পী হিসাবে বিবেচনা করার চেষ্ট হয়েছে সাম্যবাদী এবং ভূতপূর্ব সাম্যবাদী তাত্ত্বিকদের তরফ থেকে। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সাম্যবাদী শিল্পতাত্ত্বিক ক্রিস্টফার কডওয়েল তাঁর "স্টাডিস ইন ডাইং কালচার" গ্রন্থে লরেন্সের উপন্যাস ও শিল্পীজীবনের বিশ্লেষণ করেছিলেন সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে। এর পরবর্তীকালে ভূতপূর্ব সাম্যবাদী কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার তাঁর 'ক্রিয়েটিভ এলিমেন্ট' নামক গ্রন্থে লরেন্সকে কেন্দ্রবিন্দু করেছেন তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের। ডি. এইচ. লরেন্স এই শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের দ্বৈতসত্তার আকর্ষণ বিকর্ষণে উন্মোচিত শিল্পীচিত্তের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রকে শুরুর দিকে আকর্ষণীয় বলেই মনে করতে পারেননি। মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ড কিংবা ইউরোপের প্রতি বিরূপতা ছিল তাঁর কাছে প্রায় জন্মগত। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হালচাল দেখে সেদেশের প্রতিও বিরূপ হলেন তিনি। সোভিয়েট রাশিয়াতে যাওয়া তাঁর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। গেলে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক, বোলশেভিকবাদ তথা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁর বিরূপতা সেখানে গেলেও থেকে যেতো। কিন্তু একথাতো সত্য যে ধনিকতন্ত্রের প্রতিও তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলনা। বরং তার উপন্যাসগুলি এবং বিশেষ করে কয়লার খনি অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা উপন্যাসগুলি ধনিকতন্ত্রের ব্যক্তিকতার মূল্যবোধগুলিকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে গিয়েছে।

[দশ]

ধনিকতন্ত্র যে শিল্পীচিত্তের দ্বন্দ্ব ঘুচাতে পারে না, সে যে অনেক আগেই শিল্পীচিত্তে তার আবেদন হারিয়ে বসে আছে, এই সত্যটা বিশ্ব ধনিকতন্ত্রের এই শতাব্দীর বর্শাফলক মার্কিনী ধনিকতন্ত্রের প্রতি মার্কিন দেশের শিল্পীদের মনোভাবের মধ্য দিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বেরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তোরকালে মার্কিনী ধনকুবেরদের প্রচারপত্রগুলি ধনিকতন্ত্রের জয়গান গেয়ে শুধু পশ্চিশ ইউরোপে নয়, আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকাতেও এবং বিশেষ করে জাপানে শিল্পীমহলে একটা ধনিকতান্ত্রিক চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করতে আংশিকভাবে সক্ষম হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু তারই গোড়ায় যে গোলদ রয়ে গিয়েছে, সেটাকে সে চাপা দেবে কি করে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তোরকালের প্রথম দশকে পশ্চিম ইউরোপে এবং জাপানে ধনিকতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বাসনের অধিকর্তা হিসাবে মার্কিনী ধনকুবেররা যখন ব্যক্তিগত 'আত্মিক' জয়ডঙ্কা বাজিয়েছে জোরে-শোরে, তখন তার নিজের ঘরের বিদ্রোহী শিল্পীদের মুখচাপা দেওয়ার জন্য সে চেষ্টা করেছে বৈকি, কিন্তু তাতে সফল হবার জন্য তাকে দেড়শত বছরের মার্কিনী সাহিত্যশিল্পের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টাও করতে হয়েছে, যেটা অসম্ভব। উনিশ এবং বিশ শতকেই মার্কিনী ধনিকতন্ত্রের স্বর্ণযুগ এবং এই সময়ের মধ্যে প্রধানত যদিও এই দেশের সাহিত্য-শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ, মহৎ শিল্পীদের অধিকাংশই ধনিকতন্ত্রকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করে ধনিকতন্ত্রবিরোধী ভূমিকাকে প্রধান ও প্রত্যক্ষভাবে সামনে নিয়ে নিজেদের আত্মিক সত্তার মুক্তিক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। উপন্যাস সাহিত্যের যে সব

শিল্পী গত একশত বছরে দিকপাল হিসাবে পরিচিত, তাঁদের প্রায় সকলেই ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মার্ক টোয়েন, জ্যাক লণ্ডন, থিওডোর ড্রাইজার, আপটন সিনক্লেয়ার, জন ডসপ্যাসোস, সিনক্লেয়ার লুইস, আর্নেস্ট হেমিং ওয়ে এবং জন স্টাইনবেক প্রমুখ কথাশিল্পীর লেখা যে বিশেষ বিপ্লবী ধারাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে, তার মধ্যে রং'এর বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু গতি তার একই দিকে। সে গতি ধনিকতন্ত্রের বিপরীত যেকোন বৈপ্লাবিক সামাজিক রূপান্তরের দিকে। নাটকের বিকাশেও ইউজিন ও'নীল ক্লিফোর্ড ও ডেট্স কিংবা আর্থার মিলারের স্বাক্ষর একই ধারায় অঙ্কিত রয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাক্ষর অনেকাংশে নিরপেক্ষ হলেও শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা সেখানে প্রতিফলিত।

বস্তুত, এমার্সনের মতো যেসব লেখককে মার্কিন জাতীয়তাবাদের উদগাতা বলে গত দেড় শতাব্দীর ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদেরও প্রত্যক্ষভাবে ধনিকতন্ত্রের পক্ষপাতী হিসাবে দাখিল করা মার্কিন ধনকুবেরদের পক্ষে দুরুহ কাজ। সম্ভবত এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে ডেভিট লিলিয়েন্থাল তাঁর 'বিগ বিজনেস' গ্রন্থে বৃহৎ একচ্ছত্র পুঁজিপতি সংস্থার পক্ষে ওকালতী করার সময় মন্তব্য করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসামান্য বিজ্ঞানীর অবদানের পাশে অসামান্য সাহিত্যশিল্পীর দৈন্য লক্ষণীয়। ডেভিট লিলিয়েন্থালের এই ধরণের মূল্যায়ন থেকে এ সত্যটাই বেরিয়ে এসেছে যে, মার্কিনী ধনকুবেররা প্রথমত, অসামান্য বিজ্ঞানীদের ফলিত বিদ্যাকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে, যদিও বিজ্ঞানীদের মনকে তারা পায়নি। দ্বিতীয়ত, তারা অসামান্য সাহিত্য শিল্পীদের লেখাকেও আত্মসাৎ করতে পারেনি, মনকেও পায়নি। বিশেষ করে বৃহৎ একচ্ছত্র পুঁজিপতি-সংস্থার সঙ্গে মার্কিন শিল্পীদের সংঘাত যেন একটা জন্মগত ব্যাপার বলে মনে হয়। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিস্থলে মহাবিদ্রোহী লেখক জ্যাক লণ্ডনের উদ্ভব যে একান্তভাবেই সাবলিল ছিল, একথাটা মনে রাখা দরকার। জ্যাক লণ্ডনের "আত্মকথা" গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে জ্যাক লণ্ডন একটা লোহার ডাসার খোঁজ করেছিলেন, যা দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন মার্কিনী অন্তঃসারশূন্য ধনিকতন্ত্রকে উপড়ে ফেলে দিতে।

জ্যাক লণ্ডনের উত্তরসূরী সিনক্লেয়ার লুইস তাঁর 'মেনস্ট্রীট' উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন, "মার্কিনী শহরগুলির রাজপথগুলি মার্কিনী কীট্সদের সমাধিফলক দিয়ে তৈরি।" এ কথা লেখার সময় তাঁর মনে ছিল নিশ্চয় ইংরেজ তরুন কবি কীট্সের নিদারুণ অকালমৃত্যুর কথা।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন লেখক শিল্পীদের একটি মহল কারখানা এবং ব্যবসায়ের অধিপতিদের নায়ক করে বই লেখায় মেতে ওঠেন। এই প্রবণতা ধনকুবেরদের একচ্ছত্র প্রচারপত্রে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছিল। মুক্তধারার পতাকাবাহীরা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন শিল্পীর এই আত্মবিক্রয়ে। মুক্তধারার পতাকাবাহীদের এই ক্ষোভ ও ক্রোধের দলিলগুলির মধ্যে আলবার্ট মালট্জের "সিটিজেন রাইটার", হাওয়ার্ড ফাস্টের "সাহিত্য ও বাস্তবতা" এবং জন হাওর্য়াড লসনের "দি আমেরিকান সিন" ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

নতুনতর অগ্নিশিখা। ধনকুবেরদের প্রলোভনের ফাঁদ এবং সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে এই লেখাগুলি মার্কিনী মহৎ শিল্পীদের বিদ্রোহের ধারাকে সামনে রেখেছে।

প্রখ্যাত লেখক আলবার্ট মালট্‌জ ১৯৪৮ সালে নিউ ইয়র্কের হোটেল আস্টরে সেন্সরশিপ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আহুত লেখক, শিল্পী এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "শিল্পী হাঁটু গেড়ে বসে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু সে শিল্প সৃষ্টি করতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত সে এভাবে শিল্প সৃষ্টি করেনি। তবে কেন আজ সে একাজ শুরু করবে? কেন তাকে করতে হবে? কার এ নির্দেশ? কেন?" ("সিটিজেন রাইটার")।

হাওয়ার্ড ফাস্টের "সাহিত্য ও বাস্তবতা" জ্যাক লণ্ডনের উত্তরাধিকারকে বিদ্রোহের পতাকা হিসাবে উড়িয়ে দিয়েছে মার্কিনী ধানকুবেরদের অতি-মুনাফার দুর্গচূড়ায়। পরবর্তীকালে হাওয়ার্ড ফাস্ট নিজের অতীতকে অস্বীকার করলেও এই বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন থেকে গিয়েছে।

জন হাওয়ার্ড লসন তাঁর "সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পীর ভূমিকা" নিবন্ধে মার্কিনী শিল্পীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ক্রোধ হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের ইঞ্জিন। মার্কিনী শিল্পীদের সাময়িক বিভ্রান্তি কেটে যাবে, এই আশা জানিয়ে লসন উপরোক্ত নিবন্ধের শেষে লিখেছেন :

"সময় আসছে যখন আমেরিকার শিল্পীরা মহান কবিতাকে, গৌরবজ্জ্বল দেশের সঙ্গীতকে বর্ণে বর্ণে চিত্রিত করবে, লেখায় লেখায় বাঙ্ময় করে তুলবে, গানে মুখর করে তুলবে। জীবনের এই কবিতা আমেরিকার জনগণের আত্মিক ও নৈতিক শক্তিতে নিহিত রয়েছে। আর আমেরিকার জনগণ নিয়োজিত রয়েছে একচ্ছত্র পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

"স্বাধীনতার আর্দশকেই আজ স্বাধীন করা দরকার। স্বাধীনতার ধারণাকে পুঞ্জীভূত মিথ্যা থেকে মুক্ত করে পরিশুদ্ধ করা দরকার। এই স্বাধীনতার আদর্শকে তুলে ধরতে হবে তার সহজ মহিমায়, জনগণের একত্রিত সত্তায়, যেখানে জনগণ তাদের মতপার্থক্যকে দূর করে নেবে কাজ করার, সৃষ্টি করার, নির্মাণ করার সাধারণ প্রয়োজনের জরুরী তাগিদে। একাজ কেউ একলা করতে পারে না।

"শিল্পকলার পরিপূর্ণ শতদল বিকাশ আসবে সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে মানুষ পরিপূর্ণ সচেতনতা নিয়ে নিজেদের ইতিহাস নিজেরা গড়ে তুলবে। মানবসমাজ প্রয়োজনের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে উত্তরিত হবে। এইভাবেই ব্যাপারটাকে সামনে এনেছেন এঙ্গেলস।

"আমেরিকার মহৎ লেখক-শিল্পী উইলিয়াম ডিন হাওয়েলসও রুচির ক্ষেত্রে একই ধরনের ভবিষ্যৎকে তুলে ধরেছেন।"

মার্কিনী একচ্ছত্র পুঁজিপতিদের সমস্ত জারিজুরি, সমস্তরকম 'জনধনতন্ত্রের তত্ত্বকথা' সমস্তরকম চাপ ও ভীতি প্রদর্শন যে শিল্পীচিত্তকে সন্ত্রস্ত করতে অথবা বাগ মানাতে ব্যর্থ হয়েছে, জন হাওয়ার্ড লসনের উপরোক্ত ঘোষণাই কি তার প্রমাণ নয়?

[এগারো]

বিংশ শতাব্দীতে শিল্পীচিত্ত যে ধনিকতন্ত্রের প্রতি সাধারণভাবে বিমুখ হয়ে গিয়েছে, তার মূলে রয়েছে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং ধনিকতন্ত্রই যে এদের মূলাধার সে সত্যের উদঘাটন। এই শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বধনিকতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধের দরুন অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক শোষণের স্বার্থ এবং মুনাফার বাজার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন যে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলো তার মধ্য দিয়ে ধনিকতন্ত্রের মুনাফাভোগীদের "মানবিক ও ব্যক্তিক মূল্যবোগুলিকে" ধনিকতন্ত্রের কর্ণধারেরা নিজেরাই পদদলিত করে চুর্ণ বিচূর্ণ করে ইতিহাসের জঞ্জালে নিক্ষেপ করে দিল। অপরদিকে, এই বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত মন্থনের মধ্য দিয়েই ধনিকতন্ত্রের মৃত্যুবাণ বেরিয়ে এল মানব-সমাজের জন্য নবজীবনের ছাড়পত্র নিয়ে। অভ্যুত্থান ঘটলো পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থা সোভিয়েত রাশিয়ার। দেখা গেল, নব মানবিক মূল্যোবোধ থরে থরে সাজানো রয়েছে এই নতুন বিপ্লবী সমাজ ব্যবস্থার করপুটে। দেখা গেল, ধনিকতন্ত্রী সমেত অতীতের বিভিন্নতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত মানবিক সম্পদগুলি সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার নব-মানবিক মূল্যোবোধগুলির মধ্যে পুনরুজ্জীবিত এবং পুনরাশ্রিত। গত শতাব্দীর ফরাসি কবি রাবঁ কিংবা ভিক্টোর হিউগোর মতো মহৎ শিল্পীদের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর প্রভাতী শিল্পীরা বিকল্প সমাজতান্ত্রিক মূল্যোবোধের বাস্তবায়নকে অনেক বেশি সুনিশ্চিতভাবে আয়ত্তাধীন দেখতে পেলেন। নবজাত সোভিয়েট দেশ দেখে দেশে ফিরবার পরে বৃটিশ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল সাধারণভাবে বিপ্লবকে গ্রহণ করতে না পারলেও গণচিত্তে নব-মানবিক মূল্যবোধের অভুদয়ের সূর্যজ্বালাকে স্বীকৃতি দিলেন তাঁর "বলশেভিকবাদের তত্ত্ব ও কর্ম" গ্রন্থে। সোভিয়েট সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার এই জন্মলগ্নের নব মূল্যবোধের বিচারে আর না এগিয়ে ধনিকতন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাব, যেসব শিল্পী সাহিত্যিক বিকল্প ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি, তাঁরা অন্তত ধনিকতন্ত্রকে মানবধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ বলে বুঝতে পেরে এর মানবিক মূলোবোধের রং চঙে আবরণটাকে আর কোন মতেই বরদাশত করতে রাজী নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনিকতন্ত্রী দেশ হিসাবে উঠে আসা খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন লেখকের দৃষ্টান্ত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের একজন হেমিংওয়ে আর একজন ডস প্যাসোস, হেমিংওয়ের উপন্যাস "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্" এবং ডস প্যাসোসের উপন্যাস "১৯১৯" ধনিকতন্ত্রের গলাফোলানো ব্যক্তিক মূল্যোবোধের বুলিগুলোকে নির্মমভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। ধনিকতন্ত্রের সভ্যতার প্রচারকের পোশাকটা যে কপটতা ও ছলনার সাজসজ্জা ছাড়া অন্য কিছু নয়, এই ধরনের বক্তব্য এই দুটি উপন্যাসের উপজীব্যের মারফত অলঙ্ঘনীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও বিকল্প ব্যবস্থা এই দুটি গ্রন্থেই অস্থায়ী প্রতীতির রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, তবু বিশ্বযুদ্ধের মূলাধার যে ধনিকতন্ত্রী বিষবৃক্ষ, তার ছলাকলা এতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মর্মন্তুদ বর্ণনার মাধ্যমে উদঘাটিত হয়েছে। উপন্যাসের বাস্তববাদী আঙ্গিক ধনিকতন্ত্রের অবধারিত মৃত্যুর সত্যকে ক্ষমাহীনভাবে টেনে বার করে এনেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের শিল্পীদের এই ধরনের কাজগুলি শুধুমাত্র যা ঘটে গিয়েছিল তার ময়নাতদন্ত ছিল না। তখন সামনে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং ধনিকতন্ত্র বা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হাতেই ছিল এর সাজসজ্জার উদ্যোগ। ধনিকতন্ত্রী অস্ত্রব্যবসায়ীরা মুনাফার পাহাড় জমাবার জন্য বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা রণসাজে সাজছিল। একদিকে বিশ্বের পণ্যের বাজারকে নিজেদের মধ্যে নতুনভাবে ভাগ বন্টন করার জন্য এবং অন্য দিকে তারা তৈরি হচ্ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য। সুতরাং শিল্পীদের রূপসৃষ্টির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভবিষ্যতেও। সুতরাং কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে অপরিমেয় অধিকাংশ শিল্পী সাহিত্যিকের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ছিল ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযোজিত। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ-মানস গড়ে উঠেছিল, তার পুরোভাগে ছিলেন ফ্রান্সের রোমাঁ-রোলাঁ এবং আঁরি বারবুসে যাঁদের যথাক্রমে "দিসোল এনেচন্ টেড" এবং "আণ্ডার ফায়ার" উপন্যাস দুটি ইউরো-আমেরিকান যুদ্ধ বিরোধী সাহিত্যের পথিকৃৎ এবং দিকদ্রষ্টা।

এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ইটালি, জার্মানি, স্পেন এবং জাপানে ধনিকতন্ত্রের উলঙ্গ স্বৈরাচারী যুদ্ধবাদী নখদন্ত বেরিয়ে এলো, ফ্যাসিবাদ তথা নাৎসীবাদ, ফ্যালাঙ্গিবাদ ও জঙ্গী একনায়কত্ববাদের মধ্যে দিয়ে। বিশ্বধনিকতন্ত্রের মানস সন্তান এই ফ্যাসিবাদ সমস্ত স্বাধীনচেতা শিল্পীর কণ্ঠরোধ করলো, হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। সমাজবিপ্লব এবং আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে নিয়োজিত বিশ্বধনিকতন্ত্র বা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বর্শাফলক ফ্যাসিবাদের কাছে একমাত্র বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারই হচ্ছে স্বাধীনতা। ফ্যাসিবাদের দৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতা শুধু বিলাস মাত্র ছিল না, শিল্পীর স্বাধীনতার ক্ষেত্র ছিল বিদ্রোহের আঁতুড়ঘর। সুতরাং ব্যক্তি সৌন্দর্য সৃষ্টির রেঁনেসা যুগের যে সব ভাব ও উপকরণ নিয়ে ধনিকতন্ত্র এই শতাব্দীর শুরুতেও বাজীকরের খেলা দেখিয়েছে, ফ্যাসিবাদ এসে সেগুলোকেও নাকচ করে দিল। জার্মানির নাৎসী প্রচার কর্তা গোয়েবলসের মুখে একটা কথা লেগে থাকতো : "সংস্কৃতির নাম শোনামাত্র আমার হাত চলে যায় পিস্তলের বাটে।"

পশ্চিম ও মধ্যে ইউরোপের ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারের প্রস্তুতি পর্বের শ্বাসরোধকর পরিবেশের আভাস পাওয়া যেতে পারে ফ্রান্‌জ কাফ্‌কার গল্প ও উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদের পটভূমিতে। এই ফ্যাসিবাদ যখন রক্ত পাগল হয়ে উঠল, তখন পিকাসো আঁকলেন এর বীভৎস চেহারাকে 'গের্নিকা' ছবিতে। ফ্যাসিবাদের অতিজাতীয়তাবাদী কিংবা আদি-মতবাদী মুখোসটাতে আকৃষ্ট হয়ে জার্মানির নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টম্যান, আয়ারল্যাণ্ডের কবি ইয়েটস্‌, নরওয়ের ঔপন্যাসিক নুট হামসুন এবং আমেরিকার কবি এজরা পাউণ্ডের মতো যে কয়েকজন শিল্পী ফ্যাসিবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য জানালেন, তাঁদের ধারণা ছিল রুগ্ন ধনতন্ত্রের একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘেটেছে এবং সেটা ফ্যাসিবাদ। কিন্তু বিশ্বের অপরিমেয় অধিকাংশ শিল্পীকে ফ্যাসিবাদ কিংবা বিশ্ব ধনিকতন্ত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। শিল্পীরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতার তাগিদে, শিল্পসৃষ্টির বেঁচে থাকার তাগিদে। সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীরা

সামগ্রিকভাবে বিশ্বধনিকতন্ত্র বা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কারণ, এ সত্য তাঁদের কাছে গোপন থাকেনি যে, ফ্যাসিবাদ ধনিকতন্ত্রেরই অস্ত্র, এই শতাব্দীতে সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র। দেশের মেহনতি মানুষকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, পরদেশকে অধীন রাখার লক্ষ্য সামনে রেখে, সমাজতন্ত্রী দেশগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই শতাব্দীতে ধনিকতন্ত্র যে অস্ত্র বিশেষভাবে শাণিয়েছে, সেটা ফ্যাসিবাদ। শিল্পীরা তাঁদের এই সচেতনতাকে ব্যক্ত করেছেন প্রাণ দিয়ে, জীবন দিয়ে, কারাবরণ করে, নির্বাসন বরণ করে। স্পেনের গণতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদের হামলা থেকে বাঁচাবার জন্য শিল্পী সাহিত্যিকরা যে "আন্তর্জাতিক ব্রিগেড" গঠন করেন, তার মূলে ছিল শিল্পীদের এই সচেতনতা, এই সংগ্রামী সচেতনতা ছিল শিল্পীর স্বাধীনতাকে বাঁচাবার তাগিদ।

[বারো]

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আফ্রো-এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার যেসব দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, সে সব দেশে বিশ্বধনিকতন্ত্রের প্রতি কোন মোহ থাকা স্বাভাবিক নয়। শিল্পীরা ধনিকতন্ত্রের প্রতি বিরূপ হতে বাধ্য, কারণ বুকের রক্ত ক্ষরিয়ে তাঁদের জানতে হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদ হচ্ছে মূলত ধনিকতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ "সভ্যতার সংকট" নিবন্ধে এই চেতনাকে দিয়েছিলেন অগ্নিবাণী। গণচীন যে এত দ্রুত সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করে গেলো, তার মূলেও অনেকখানি কাজ করেছে এই অভিজ্ঞতা। এই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিল্পীরা হয়েছেন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্মকাণ্ডের শিল্পী। অত্যন্ত সহজ ও সাবলিল এই উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ধনিকতন্ত্রের প্রতি বিরোধিতার পরবর্তী পদক্ষেপ সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

তবুও সদ্যমুক্ত আফ্রো-এশিয়া কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার যে সব দেশ এখনো পিছিয়ে পড়ে আছে সামন্ততন্ত্রের অর্থনীতি নিয়ে, সে সব দেশে যেহেতু "দেশজ" ধনিক-বনিকদের একাংশ কোথাও কোথাও মুক্তিসংগ্রামে শরীক হয়েছে, সেজন্য তাদের শ্রেণীগত মূল্যোবোধগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে সজীব বলে মনে হয়। এই কারণেই যখন পশ্চিম ইউরোপ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকতন্ত্রী মানবিক মূল্যোবোধগুলি একেবারে পচে গলে খসে পড়েছে, তখন আফ্রো-এশিয়া কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার কোথাও কোথাও ধনিকতন্ত্রী মূল্যোবোধ মাঝে মাঝে ফুল ফুটিয়ে বসেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালেই। এর ফলে স্বভাবতই এসব দেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের মহলে ধনিকতন্ত্রের পক্ষে গলা উঁচু করে কথা বলার লোকের একান্ত অভাব আজও ঘটেনা।

কিন্তু পুনরুক্তিদোষ ঘটলেও আবার এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিশ্ব ধনিকতন্ত্রের মূল কাঠামো যেখানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং এই কাঠামোকে ধ্বংস করার মাধ্যমেই যেখানে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির নবজন্ম সাধিত হয়েছে, সেখানে উল্লেখিত উঁচু গলা হারিয়ে যাচ্ছে ধনিকতন্ত্র-বিরোধ শিল্পীদের ঐকতানে। হারিয়ে যেতে বাধ্য।

[তের]

তৃতীয় প্রতিপাদ্য

আমার তৃতীয় প্রতিপাদ্য এই যে, সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণেই শিল্পীচিত্তের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এই সম্প্রসারণকে হতে হবে অতিমাত্রায় সচেতন, অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও বিকাশের যতগুলি সম্মুখগামী তাগিদ ও ক্রিয়ার উদ্ভব হয়ে চলেছে, তাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে বক্তব্যটা সোজাসুজি এই দাঁড়ায় যে, শিল্পীর সৃষ্টির প্রতি সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে থাকতে হবে প্রতি মুহূর্তে সজাগ, স্থূলে কিংবা সূক্ষ্মে সুক্ষে কৌতূহলী ও সহায়।

এটা নতুন কোন প্রস্তাব নয়। এটা যা ঘটেছে, তার থেকেই তুলে নেওয়া ইশারা। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই এই সংবেদনশীলতার তাগিদ এসেছে। তবুও ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পূর্ণ মূল্য দেবার উপর কতখানি জোর দেওয়া উচিত, সেটা আরও তীক্ষ্ণভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

যান্ত্রিকতা যে কোন প্রশ্নে পরিত্যাজ্য। যান্ত্রিকতায় যে অনর্থ ঘটেছে, একথা অস্বীকার কারাও নিরর্থক। সমাজতন্ত্রের ও শিল্পীচিত্তের পূর্ণ ও মুক্ত বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয় এই অস্বীকৃতি। বরং স্বীকৃতি হতে পারে সহায়ক। কিংবা, যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তির ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগে প্রথমাবধি যে জোর দেওয়া হয়েছে সেটাকেই সামনে আনা যেতে পারে। এখানে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তির তাগিদটা যে ঠিক কি ধরনের, সেটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

[চৌদ্দ]

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যুগ্ম উদ্গাতা কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলসের পত্রাবলিতে সমাজতন্ত্রের তাগিদগুলির যে অভাস দেওয়া হয় তাদের শিল্পরূপগত ভাব, উপকরণ, কর্ম ও ব্যক্তিক দিকগুলির পূর্ণ মূল্যায়নেরও গভীরাশ্রয়ী এবং বহুদর্শী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। সমাজতন্ত্র যখন বাস্তব ঘটনা হয়ে ভূমিষ্ঠ হলো, তখন উপরোক্ত তাগিদগুলি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল। এখানে প্রথমত সোভিয়েত কবি মায়াকভ্স্কির (জন্ম ১৮৯৪-মৃত্যু ১৯৩০) একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি দাখিল করছি এই ধরনের প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত হিসাবে। কবিতার পঙক্তিগুলি নিম্নরূপ :

আমি চাই,
আমি যা তৈরি করছি
রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে
তার মূল্য নির্ণয়ের বিতর্কে
রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার
ঘাম ছুটে যাক।
আমি চাই,
একজন উঁচু দরের শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ হিসেবে

যে ভালোবাসা প্রাপ্য হয়েছে আমার
এবং আমাদের হৃদয়ের,
তা যেন আমি পাই।

আমি চাই,
কলমকে বন্দুকের সমকক্ষ করতে,
শিল্পায়ন তালিকায় তার স্থান হোক
লোহা লক্কড়ের পাশে।

আমি চাই,
সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংস্থার
আলোচ্য বিষয় প্রথম স্থান লাভ করুক
"কবিতার উৎপাদন পরিমাণ" সম্বন্ধে
ষ্টালিনের রিপোর্ট।

মায়াকভ্স্কির এই কবিতার নাম 'স্বদেশাভিমুখে'। ১৯৫২ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে জাহাজে বসে তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন। মায়াকভ্স্কির এই উদ্ধত দাবীকে স্টালিন মেনে নিয়েছিলেন তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আখ্যা দিয়ে। মায়াকভ্স্কির এই উদ্ধত দাবী একটা ব্যতিক্রম ছিলনা। বরং সাধারণভাবে সে সময়ের সোভিয়েট শিল্পীচিত্তের তাগিদই ছিল এই ধরনের নিরাবরণ দাবী। মায়াকভ্স্কির পরীক্ষা নিরীক্ষার পাশাপাশি আরেকজন সোভিয়েট লেখকের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং এতদসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই লেখকের নাম পস্‌টভ্স্কি।

পস্‌টভ্স্কি তাঁর "সোনার গোলাপ" নামক নিবন্ধগ্রন্থে সোভিয়েট সাহিত্যের প্রথম পর্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর পরে ম্যাক্সিম গোর্কির নেতৃত্বে আরো অনেকের সঙ্গে মিলে নবীন যুবা পস্‌টভ্স্কি "কলকারখানা গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত" নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল যে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সরেজমিনে গিয়ে, দেখাশোনা করার পরে লেখকেরা এই ইতিবৃত্ত লিখবেন। একেক দল একেকটি কারখানা বেছে নিয়ে একাজ করবেন। পস্‌টভ্স্কি কারখানা নির্বাচন করলেন, কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে লিখতে রাজী হলেন না। তাঁর মনের কথা ছিল এই যে, সাহিত্যের গ্রন্থে লেখকের ব্যক্তিত্ব অঙ্কিত হওয়া উচিত, বাস্তবের সংস্পর্শে তাঁর মনে যে ক্রিয়া হয়েছে সেটা প্রকাশ পাওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, গ্রন্থকে লেখকের ব্যক্তিগত শিল্পশৈলী এবং ভাষা সজ্জায় একক হয়ে উঠতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মনে করতেন যে, ঠিক যেমন একটা বেহালাকে তিনজন লোক এক সঙ্গে বাজাতে পারে না, তেমনিভাবেই দলবদ্ধ হয়ে একটা বই লেখা সম্ভব নয়। গোর্কিকে পস্‌টভ্স্কি এই কথা খোলাখুলি জানালেন। গোর্কি তার অভ্যাসানুযায়ী আঙ্গুল দিয়ে টেবিল বাজাতে বাজাতে বললেন : "দেখো ছোকরা। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বলে নাম কিনে

বোসোনা। যাও, লিখে ফেলো তোমার ইতিবৃত্ত। তবে, মোদ্দা কথাটা মনে রেখো, আমাদের ডুবিয়োনা।"

পস্‌টভ্‌স্কি তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করেছেন "সোনার গোলাপ" গ্রন্থের অন্যান্য নিবন্ধে। সাল্‌টিকভ-শেড্রিনের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছেন তিনি : "লেখকের আনন্দ তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, তাঁর নিজের বিবেক তাঁর সহকারীদের বিবেকের সঙ্গে এক গ্রামে বাঁধা রয়েছে।" এরপর পস্‌টভ্‌স্কি নিজের কথা যা লিখেছেন তা এই : 'বিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন লেখক এক মুহূর্তের জন্যও পিছিয়ে যেতে পারেন না। ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, যেখানে তার পূর্বসূরীরা থেমে গিয়েছিলেন সেখান থেকে তাঁকে তুলে নিতে হবে অসমাপ্ত দায়িত্বভারকে এবং তাঁর সমসাময়িকরা তাঁর উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন তাঁকে পালন করতে হবে। সাল্‌টিকভ-শেড্রিন উচ্চারণ করেছিলেন সত্যবাণী, যখন তিনি বলেছিলেন যে, সাহিত্য যদি এক মুহূর্ত নীরব থাকে তবে সেটা জাতির মৃত্যুর শামিল হবে।

লেখাকে শুধুমাত্র একটা শিল্পকর্ম বা পেশা বলে মনে করলে চূড়ান্ত ভুল করা হবে। লেখা হচ্ছে সৃষ্টির জন্য অন্তরের একটা ইচ্ছা।

যন্ত্রণা এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে এই ইচ্ছাকে রূপ দেবার ব্যাপারে কোন বস্তুটা লেখককে তাগিদ দেয়?

প্রথমত, লেখকের নিজের হৃদয়ের আহ্বান।

যাঁর মধ্যে লেখার ইচ্ছা জেগেছে তাঁর বিবেকের আহ্বান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস তাঁকে বন্ধ্যা জীবনযাপন থেকে নিরস্ত করে। লেখকের আত্মা যে বহুমুখী চিন্তা ও আবেগে টইটম্বুর হয়ে যায়, সেগুলিকে লোক-হৃদয়ে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। তবু একটি লোককে একজন লেখকে পরিণত করার জন্য শুধু হৃদয়ের আহ্বানই যথেষ্ট নয়। আমাদের যৌবনে যখন পর্যন্ত আমাদের আবেগের কাঁচা জগৎটা জীবনের আঘাতে সংঘাতে ইস্পাত হয়ে ওঠেনা, ততক্ষণ আমরা আমাদের হৃদয়ের আহ্বানের প্রতিধ্বনি করি। আপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে আমরা আরও একটা জোরালো আহ্বানে সাড়া দেই। এই আহ্বান হচ্ছে কালান্তরের আহ্বান, আমাদের জনগণের আহ্বান, মানব সমাজের আহ্বান। আমরা মানবের বীক্ষণকে তীক্ষ্ণধার করার কাজে ব্যাপৃত হয়।"

পস্‌টভ্‌স্কি লেখকের তথা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাধনায় এই দ্বৈত গতি-সত্তার অবিচ্ছিন্ন ঐকিক ও যৌগিক চিত্রকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সামনে নিয়ে এসেছেন :

(১) "ভিনসেন্ট ভ্যান গগ, ফ্রুবেল, বরিসভ-মুসাটভ, গগাঁ এবং আরো অনেক চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নের পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের জনগণ বিশ্বের সমস্ত আত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী যে সব সঙ্কীর্ণচেতা এবং কপট সমালোচক সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, তাঁদের বিতাড়িত করতে হবে আমাদের মধ্য থেকে। তাঁরা যত চেষ্টাই করুক না কেন, সৌন্দর্য টিকে থাকবে। তাঁকে নির্মূল করা সম্ভব নয়।"

(২) "মিখেল প্রিশ্‌ভিন সাহিত্যের মহান লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত এবং তিনি তাঁর সারা জীবন লেখার কাজে নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেছেন : লেখকের আনন্দ এই নয় যে, তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা। লেখকের আনন্দ এই যে, তিনি এবং তাঁর প্রতিবেশীরা একই রক্তে মাংসে গড়া।"

উনিশ শ' বিশ সাল থেকে শুরু করে উনিশ শ' চৌষট্টি পর্যন্ত পস্‌টভ্‌স্কি তাঁর এই ঐকিক ও যৌগিক সত্তাকে অব্যাহত রেখেছেন এবং আমৃত্যু অব্যাহত রাখবেন বলেই মনে হয়। এই জন্য তাঁকে এই শতাব্দীর শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে সামনে রাখার প্রবল যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন যেহেতু সমাজতন্ত্রের তথা সাম্যবাদের ভিতপ্রস্তরস্বরূপ, সেই কারণে, আমাদের প্রতিপাদ্যকে প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে আরো দৃষ্টান্ত দাখিল করছি। এরপরে গণচীন এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশ থেকে তথ্যাদি থাকবে। এইভাবে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবার আগে তৃতীয় প্রতিপাদ্যের সূত্রটাকে আবার ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় প্রতিপাদ্য প্রধানত একটা আহ্বান। এই আহ্বানে বলা হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত অগ্রগতি ও বিকাশের যতগুলি সম্মুখগামী তাগিদ ও ক্রিয়ার উদ্ভব হয়ে চলেছে, তাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে কথা উঠতে পারে যে, মায়াকভ্‌স্কি এবং পস্‌টভ্‌স্কির দৃষ্টান্তই তো প্রমাণ করে, তাগিদটা সোভিয়েট সমাজের সামনে সব সময়েই জোরালোভাবে বর্তমান রয়েছে। এই কথার জবাব সুস্পষ্টভাবে দেওয়া দরকার। যেহেতু তাগিদটা নানাভাবে স্বীকৃত হলেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছে, সেই কারণে একে এমনভাবে উদঘাটিত করে দেওয়া দরকার যে, ভবিষ্যতে এই স্বীকৃতি কোন রকম বিতর্কেই আর যেন চাপা না পড়তে পারে। অতীতের স্বীকৃতিটা ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত স্বীকৃতির ভিত্তি।

সোভিয়েট ইউনিয়ন, গণচীন কিংবা অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের অন্তর্জীবনের মুক্তধারাকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা আড়াল করতে চেয়েছে এবং এখনও চাইছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরাও অনেক সময় এই মুক্তধারা সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং এই জন্যই জানা ঘটনাকেও নতুন করে জানা দরকার।

সোভিয়েট ইউনিয়নের দৃষ্টান্তেই ফিরে যাওয়া যাক।

প্রাক্ সোভিয়েট বিপ্লব যুগেই স্তানিসলাভ্‌স্কি ছিলেন মস্কোর রঙ্গমঞ্চের জগতে প্রতিষ্ঠিত এবং এই কারণে বিশ্ববিশ্রুত। বিপ্লবের পরে এই শিল্পী তার সমস্ত প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের রঙ্গমঞ্চের মানোন্নয়নে। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক কর্মকর্তারা তাঁকে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষায় সর্ববিধ সাহায্য করেছিলেন। সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চের অন্যতম দিকপাল সার্জি অব্রাজট্‌সভ তাঁর "আমার পেশা" গ্রন্থে স্তানিসলাভস্কির উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের এক সাক্ষাৎকারের প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে :

"লিখে পড়ে স্তানিসলাভ্‌স্কি হওয়া যায় না। তবে তাঁর কাছ থেকে শিখে নেওয়া যায়। এই শিখবার ব্যাপারটা অবশ্য নিষ্ফল হবে যদি শিক্ষার্থী স্তানিসলাভ্‌স্কির আসল গুণকে অর্জন করতে না পারে। স্তানিসলাভ্‌স্কির এই আসল গুণটি ছিল এই যে,

জীবনকে অনুভব করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন যৌবনোচ্ছল, তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা ছিল তীক্ষ্ণ, সত্যের জন্য সংগ্রাম ছিল তাঁর আপোষহীন এবং নিজের লক্ষ্যে তাঁর ছিল পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এই বহুমুখী গুণ সহজে অর্জনীয় নয়। সেদিন (১৯৩৫ সালে) স্তানিসলাভ্স্কির বাসা থেকে ফিরে এসে আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম যে, প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষে খোলা চোখে, নির্ভয়ে সংস্কারমুক্ত মনে জগৎটাকে দেখা কত অপরিহার্য। ভাবছিলাম, শিল্পীর পক্ষে নিজের লক্ষ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা, যে পথ তিনি বেছে নিয়েছেন তাতে বিশ্বাসস্থাপন করা কত দরকারী। দরকারী এজন্য নয় যে, শিল্পী এ পথের অধিকারী। দরকারী এজন্য এই পথ শিল্পীর জন্য ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য এ বিশ্বাস তখনই সম্ভব যখন শিল্পী বুঝতে পারেন যে, তাঁর সাধনা কোন একটা প্রয়োজনে লাগছে; নিজের প্রয়োজনে নয়, অন্যের প্রয়োজনে। ব্যক্তিগত সাফল্য ঠিক তখনই বাস্তব এবং পূর্ণ হয়ে ওঠে যখন শিল্পীর সাফল্যে প্রমাণিত হয় যে, সমাজ তাঁকে চায়। শিল্পীর ব্যর্থতা কিংবা অবজ্ঞাত থাকাটাই সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ব্যাপার নয়, সবচেয়ে বেশি দুঃখের ব্যাপার হয় যখন শিল্পীকে যে সমাজ চাইছে এই বিশ্বাস শিল্পীর মনে থাকে না।"

শিল্পীর ঐকিক ও যৌগিক সত্তার তাগিদ স্তানিসলাভ্স্কির জীবনে বিপ্লবোত্তর কালে যে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, তার আভাস উপরোক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কি?

সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ সার্জি আইসেনস্টাইনের (জন্ম ১৮৯৮-মৃত্যু ১৯৪৮) পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং মতামতগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট সমাজতন্ত্র যখন সবেমাত্র স্থাপিত হয়, তখন আইসেনস্টাইন ছিলেন নবীন রাষ্ট্রের প্রাথমিক রক্ষাকার্যে নিয়োজিত একজন ইঞ্জিনিয়ার সৈনিক। যখন নির্মাণের কাজ শুরু হলো, তখন তিনি প্রবেশ করেছিলেন রঙ্গমঞ্চে পরিচালক শিল্পী হিসাবে। সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চে যে অভিনবত্বের প্রবর্তন করলেন তিনি তার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো চলচ্চিত্র প্রযোজনা। আইসেনস্টাইন এবং তাঁর সহকর্মীরা মিলে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গড়ে তুললেন সোভিয়েট বিপ্লবী চলচ্চিত্র শিল্পকে, যার অনন্যসাধারণত্ব সেদিন স্বীকৃত হলো বিশ্বজুড়ে, যার প্রভাব কাজ করেছে আমেরিকার হলিউডে এবং যা নতুনভাবে গুণান্বিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের বিশ্বের নানাদেশের নয়া বাস্তবাদী চলচ্চিত্রের ধারায়। এই কাঠখড় পোড়াবার সমস্ত উপকরণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষীয়দের কাছ থেকে পাওয়া যায় এবং সেও এমন সময়ে যখন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে নানা দিক থেকে বিব্রত। উল্লেখযোগ্য এই যে, আইসেনস্টাইনের সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাই ঘটেছিল স্টালিনের আমলের প্রথম পর্বে। বিশ্ব চলচ্চিত্র শিল্পের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আইসেনস্টাইন সোভিয়েট চলচ্চিত্র ও নিজ বক্তব্যের যে পর্যালোচনা পেশ করেন, তার শেষ পঙ্ক্তিগুলি এখানে উলেখযোগ্য :

"চলচ্চিত্রের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল। এর বিশাল ও জটিল সম্ভাবনাগুলি এখন মানব সমাজের আয়ত্তাধীন হবার অপেক্ষায় রয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন আনবিক যুগের আশিসের দিকগুলি যেমন মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়েছে সেবাব্রত নিয়ে, এও ঠিক সেই রকম ব্যাপার কিন্তু আমরা বহু শতাব্দীর সৌন্দর্যতাত্ত্বিক

গবেষণাকে আজও সামান্যই কাজে লাগাতে পেরেছি চলচ্চিত্রের উপকরণ ও সম্ভাবনাগুলোকে আয়ত্তে আনার ব্যাপারে। অথচ ক্ষমতা কিংবা আবেগ কোন দিক দিয়েই আমাদের অভাব নেই। আমরা পিছনে পড়ে আছে শুধুমাত্র রক্ষণাশীলতার জন্য, গড্ডালিকা প্রবাহের জন্য। চলচ্চিত্রের কারিগরি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব অভূতপূর্ব সমস্যা একে আরেকের ঘাড়ে পড়েছে, তাদের সম্মুখীন না হয়ে আমরা গা বাঁচিয়ে চলছি। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অগ্রগতিতে আমাদের শঙ্কিত হবার কিছু নেই।"

একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট সুরকার শোসটাকোভিচের কথা। এই সুরশিল্পী পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুর শিল্পীদের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। নিজের দেশে তিনি সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত। অক্লান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিতপ্রাণ এই শিল্পী সোভিয়েটের বিপ্লবী সুরজগতে যথেষ্ট বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছেন। তিনি জীবন-প্রবাহের বহুমুখিতা ও জটিল শক্তি সম্পর্ককে তাঁর ঐকতানগুলোতে ঝঙ্কৃত করে অভিব্যক্ত করেছেন। এ জন্য তিনি তথাকথিত কিম্ভূতকিমাকার এবং কাদাকারকে তাঁর সুর-সঙ্গতির সুন্দরের পরিধিতে শামিল করে নিয়েছেন। তাঁর কড়ি ও কোমল এবং সুমিত ও অমিতের মিশ্রণ যে অস্থিরতাতে বিস্ফোরিত হয়েছে, বাস্তবের গভীরতম স্তরে গিয়ে যে স্পন্দন তুলেছে, তাতে 'ছককাটা সমাজতন্ত্রের পল্লবগ্রাহী' রসবিচারকেরা বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু স্টালিনের আমলে হোক কিংবা ক্রুশ্চেভের আমলে হোক, শোসটাকোভিচ যতখানা সমালোচিত হয়েছেন, তার চেয়ে আনেক বেশি আদৃত হয়েছেন। তাঁর সুরের পরীক্ষা কখনও অবরুদ্ধ হয়নি।

আমাদের শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ব্লাডিমির নেপ্রভ (VLADIMIR DNEPROV) তার 'বাস্তববাদী নন্দনতত্ত্বের সমর্থনে' নামক নিবন্ধে সমাজতন্ত্রী বাস্তবাদী হিসাবে শোসটাকোভিচকে যেভাবে দেখেছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য।

"ব্লাডিমির নেপ্রভ প্রথমে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন : "আমরা অভিনবত্বের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করি। কারণ, নতুন আঙ্গিক গঠনের ব্যাপারে শিল্পীর রক্ষণশীলতা কিংবা কাপুরুষতা আধুনিক যুগের বিশিষ্ট শিল্পীসত্তাকে বাস্তবসঙ্গতভাবে উপলব্ধি করার পথে প্রতিবন্ধকতা করে। আধুনিক যুগ লক্ষণীয় দ্রুততার সঙ্গে পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বন্দ্বময় ঐতিহাসিক শক্তি সমূহের জটিল সমাহার। এ যুগের বৈশিষ্ট হচ্ছে নব নব পরিবর্তনের আসামান্য প্রাচুর্য। সোভিয়েট বিপ্লবের প্রথম দিকে বিভিন্ন নন্দনতাত্ত্বিক মহলের সংঘাত আমাদের শিখিয়েছে যে, সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা অভিনবত্ব থেকে উপকৃত হয়ে যাবে। আমরা এই রীতিরই অনুসারী।"

ব্লাডিমির নেপ্রভ এরপরেই শোসটাকোভিচ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেশ করেছেন :

"শোসটাকোভিচ সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদে পৌঁছবার জন্য যে পথ নিয়েছেন, সেটা হচ্ছে একটা প্রশ্নের সমাধান। এই প্রশ্নটা হচ্ছে : আধুনিক শিল্পকলার কোন আঙ্গিকগুলি ফলপ্রসূ এবং কোন আঙ্গিকগুলি পশ্চাদ্‌পদ ও ফাঁপা?"

ব্লাডিমির নেপ্রভ শোসটাকোভিচকে এইভাবে ব্যতিক্রম ও অভিনবত্বের শিল্পী হিসেবে অভিবাদন জানিয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, শোসটাকোভিচ কিম্ভূতকিমাকারকে গ্রহণ করেছেন ঠিকই তাঁর সঙ্গীতের বলয়ে, কিন্তু তিনি নিজে কিম্ভূতের বলয়ে আবদ্ধ হননি। যাঁরা কিম্ভূতকিমাকার বলয়ে নিজেদের আবদ্ধ করেছেন, কিংবা করতে ইচ্ছুক, তাঁদের সম্বন্ধে ব্লাডিমির নেপ্রভের মনে কোন প্রশ্রয়ের আবকাশ নেই। এখানে পশ্চিম ইউরোপের অভিনব মনোবাস্তববাদী কবিদের সম্পর্কে নেপ্রভের বক্তব্য উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে : 'রূপকথায় যেমন আছে, ঠিক তেমনিভাবে মনোবাস্তববাদী (Surrealist) কবিরা তাদের আয়নাটাকে ভেঙে ফেলেছেন, কারণ এই আয়নাটাতে যে জগৎ প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেই জগৎটাকে তারা পছন্দ করেননি। তাঁরা সমস্ত বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ বাস্তব তাদের ক্লেশ দিয়েছে। জীবনে যা কিছু ঘটেছে সেগুলিকে তাঁরা বুঝতে পারেননি। আশাহত হয়ে তাঁরা সাধারণভাবে যুক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে গররাজী হয়েছেন, পারম্পর্যের বাইরে কাব্য করেছেন। তাঁরা বাস্তবের দুর্বোধ্য ভাঙা টুকরো জড়ো করে কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেছেন। শুধুমাত্র একটা বিষণ্ন ব্যক্তিক সুর এই বিশৃঙ্খলাতে খানিকটা ঐক্য আরোপ করেছে। জীবনের প্রতি এই ধরনের অসন্তোষ কি বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনকে মেটাতে পারে? পারে না। কারণ বিপ্লবী, সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে আবেগ ও যুক্তির মিলনের উপর, উচ্চ নৈতিক অনুভূতি এবং প্রত্যয়ের মিলনের উপর, একই ভাবাদর্শ এবং অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত জনগণের ঐক্যের উপর।"

অবশ্য এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে রাখা দরকার যে, মনোবাস্তববাদী কবিদের সম্বন্ধে শেষ কথা এই নয় যে. তারা তাদের আয়নাটাকে ভেঙে ফেলেছেন; নেপ্রভ এ কথাও বলেছেন যে, এদের মধ্যে অনেকে আবার আয়নাটাকে জোড়া লাগিয়েছেন, মুখোমুখি হয়েছেন বাস্তবের। ফ্রান্সের লুই আরগঁ এবং পল এলুয়ার প্রমুখ যে সব অনন্যসাধারণ কবি মনোবাস্তববাদ থেকে সার্বিক বাস্তববাদে উত্তীর্ণ হয়েছেন, যারা সক্রিয় সংগ্রামে যোগ দিয়ে দুর্গত ও প্রতিরোধব্রতী জনগণের কবি হিসেবে নিজেদের চিনতে পেরেছেন, তারা কবিতা এবং জীবনকে ঘনিষ্ঠতর করেছেন। তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বাস্তবের কর্মময় বিপ্লবী ধারণা থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নন্দন চেতনার উদ্ভব হয়ে থাকে।

এখানে শিল্পীচিত্তের দ্বৈতসত্তার তাগিদকে ব্লাডিমির নেপ্রভ যেভাবে শোস্‌টাকোভিচকে সামনে রেখে সূত্রায়িত করেছেন, তাকে যান্ত্রিকভাবে ক্রুশ্চেভ যুগের ললিতকলার পুনর্মূল্যায়ন হিসেবে আলাদা করে দেখতে গেলে ভুল হবে। সোভিয়েট জীবনে বারবার এই তাগিদ দেখা দিয়েছে। উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট লেখক সম্মেলনে যে পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয়, তার বিবরণ একটি তদানীন্তর সাময়িক পত্রিকা থেকে তুলে নিয়ে এখনে দাখিল করা যেতে পারে। এই বিবরণে বলা হয় :

"সোভিয়েট লেখক লেখিকারা নিম্নলিখিত লক্ষ্য গুলির সম্মুখীন : (১) যে লোকায়ত রূপকথা যে কোন ললিতকলার উৎস এবং যার আদিম প্রাণপ্রাচুর্যের গুরুত্বের উপর ম্যাক্সিম গোর্কি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, তার ঐতিহ্যকে সোভিয়েট

সাহিত্যের অঙ্গীভূত করতে হবে। (২) সাহিত্যে কর্মের উচ্চ গুণের জন্য আবিশ্রান্ত প্রয়াস চালাতে হবে, এই ব্যাপারটির বিচিত্র ও বিভিন্নমুখিতাকে বুখারিন সামনে এনেছে। (৩) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি বার করতে হবে, যার সাহায্যে একদিকে যেমন প্রত্যেক শিল্পী তার স্বভাব, ধারা এবং রুচি ও রীতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে ইচ্ছামতো লিখতে পারবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সাহিত্যের তা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে লক্ষ্যে উপনীত হয়ে।

এখানে যে পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে সেটি হলো 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা'। এর বিশ্লেষণের জন্য আলাদা নিবন্ধের প্রয়োজন। দু' এক কথায় সামাজতন্ত্রী বাস্তবতা হচ্ছে বাস্তবাদের প্রত্যয়সম্পন্ন সেই পদ্ধতি, যা জগতের বর্ণনা দেয় জঙ্গমতায়। এই জগৎ শুধু যে রকম আছে সেরকমটি নয়, এই জগৎ যেমনটি হওয়া উচিৎ এবং হবে, সেই রকমের।

এই পরিপ্রেক্ষিতের পটভূমিতে সেদিনকার সোভিয়েট লেখক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল : সব কিছুরই আনুমোদন রয়েছে, একমাত্র খারাপ লেখা বাদে।

নতুন জগৎ সৃষ্টির ব্যাপরে উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে যে কথা বলা হয়েছিল, উনিশ শ পঁয়ষট্টি সালে শলোকভ তাই বলেছেন। উনিশ শ' পয়ষট্টির মার্চ মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক লেখক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে শলোকভ সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদ সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এই :

"আমি তাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই না। তাছাড়া যে কোন হাতে কলমে কাজ করনেওয়ালার মতো আমি বৈজ্ঞানিক সূত্রায়নে অপটু। তবে আমি একটি সংজ্ঞা দিয়ে থাকি। সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ হচ্ছে জীবন সত্যের ললিতকলা। পার্টির প্রতি লেনিনীয় আনুগত্য রক্ষা করে শিল্পী এই সত্যকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করে। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে, আমার মতে, সমাজতন্ত্রী বাস্তাববাদের শিল্পপদ্ধতি হচ্ছে সেই পদ্ধতি যা জনগণকে নতুন জগৎ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।"

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে লোকসাহিত্য এবং বহুজাতিসত্তার সাহিত্যের সামনে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে, তাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পীদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে বলেই বহুমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্র। এরা সোভিয়েট সমাজে মুক্তি পেয়েছে বলেই সোভিয়েট সমাজের কাছ থেকে পরিপূর্ণ বিকাশ দাবী করেছে। ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুতি কবি লুই আরাগঁ তার "সোভিয়াট সমাজতন্ত্রের ইতিহাস" গ্রন্থে উনিশ শ' চৌত্রিশের সোভিয়েট লেখক সংঘ সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতিসত্তার সাহিত্যের প্রতি যৌথ স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

লোক সাহিত্য ও বিভিন্ন জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশভিত্তিক সাহিত্য তথা ললিতকলার প্রতি স্বীকৃতি শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নকে একদিকে যেমন সীমাহীন সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাপ্তি দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে গভীরতা।

সোভিয়েট সমাজ শিল্পীর বাধাহীন বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করা রয়েছে সর্বস্তরের লোক জীবনের বাধাহীন বিকাশের নিশ্চয়তা। এই নিশ্চয়তার মূল রয়েছে সেই উৎসে, যা চিরস্রষ্টা। এই উৎস হচ্ছে মেহনত। এই উৎসের বিংশ শতাব্দীর পথিকৃৎ ম্যাক্সিম গোর্কি। তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলিকে ভিত্তি করে বৃটিশ মার্কসপন্থী এরিক হার্টলে উনিশ শ' বাহান্ন সালে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের যে সূত্র দাখিল করেছেন, সেটিও এখানে উস্থাপন করে রাখা যেতে পারে :

"সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা মেহনতের স্বজনশীলতার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সত্য হচ্ছে এই যে ললিতকালা একদিকে যেমন মেহনতের সৃজনশীলতার সম্প্রসারিত রূপ, তেমনি তার প্রতিচ্ছবিও বটে। ললিতকলা পরিবর্তমান সামাজিক সম্পর্কের স্তর ও চরিত্রকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রতিবিম্বিত ও প্রভবিত করে।"

উপরোক্ত সত্যকে ধ্রুবতারা করে সোভিয়েট ইউনিয়নের লেখক শিল্পীরা উনিশ শ' সতেরো সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে পর্যায়ে পর্যায়ে যে যে দ্বৈতসত্তার বিকাশ ঘটিয়ে সোভিয়েট সাহিত্য ও ললিতকলায় সম্মুখগামী ধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন সেখানে নেতৃত্বের তরফ থেকে মাঝে মাঝে বিরক্ত কিংবা প্রত্যাখ্যানের ঝটকা এসে লাগলেও 'বিদ্রোহী'রা শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেঘমুক্ত হয়েছেন। মায়াকভ্স্কিকে স্টালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আখ্যা দিয়েছিলেন। আবার ক্রুশ্চেভও মায়াকভস্কির কবিতা উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯৫৬ সালের সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মায়াকভ্স্কির পুরো কবিতার উদ্ধৃতি দাখিল করলেন।

ক্রুশ্চেভ কর্তৃক এইভাবে একটা রাজনৈতিক তত্ত্বগত নির্ঘণ্টে কবিতার আমদানী হয়তো সোভিয়েটের বাইরে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের মর্মভূমির খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা বিস্মিত হননি। বিপ্লবের আয়োজন যখন চলছে তখন বোলশেভিক পার্টির পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল পুশকিনের কবিতার একটি পঙ্ক্তি থেকে। লেনিনের গ্রন্থের 'কি করতে হবে' শিরোনামটি নেওয়া হয়েছিল উনিশ শতকের এক উপন্যাস থেকে।

স্টালিনের আমলেই (প্রথম দিকে) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক জেনারেল সেক্রেটারী জর্নি ডিমিট্রভ সোভিয়েট লেখকদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে 'ডন কুইক্সোট' এর মতো উপন্যাস লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জড়তা ও মূর্খতার উপর কশাঘাত হানার জন্য বিদ্রূপের প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ঝানভ যখন শুধু বিদ্রূপের বিরুদ্ধেই নয় যে কোন রকম অভিনবত্বের উপর খড়গ উত্তোলন করেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল শিল্পীচিত্তের দ্বৈতসত্তার সম্মুখগামী তাগিদ অস্বীকৃত হলো। কিন্তু উনিশ'শ বাহান্ন সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির উনিশতম কংগ্রেসে ম্যালেনকভের রিপোর্টে স্টালিনের উপস্থিতিতেই ছিন্ন হলো যবনিকা। ম্যালেনকভের রিপোর্টে দেখা গেল, শিল্পীচিত্তের স্বাধীনতার প্রশ্ন সতর্কতার কড়া তাগিদের মধ্যেও নতুন দিগন্তে উপস্থাপিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিররই বক্তব্যের মাধ্যমে। ম্যালেনকভ

উপন্যাসে প্রতিনিধি স্থানীয় এবং অসামান্য চরিত্রের মধ্যে একটা যোগ সূত্রের তাগিদ দিয়ে আহ্বান জানালেন লেখক শিল্পীদের নতুন সৃষ্টিতে। ইলিয়া এরেনবুর্গের 'শীতের অবসান' উপন্যাস সম্ভব হলো এই পটভূমিতেই।

এরই পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেলো, প্যাস্টেরনাকের 'ডাঃ জিভাগো'র মতো উপন্যাস বিপ্লবের প্রবাহের বাইরে ছিটকে বেরিয়ে গেলেও তাঁর কবিতাকে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী সমাজ এবং কর্তৃপক্ষ সাদরে স্থান দিয়েছে সাংস্কৃতিক জীবনে। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট নাটকের যে অনুবাদ প্যাস্টেরনাক করে রেখে দিয়েছেন, তাকে অবলম্বন করে তৈরি সাম্প্রতিক সোভিয়েট ছবি প্রমাণ করে যে, বিপ্লবের যেমন বর্জন করার প্রবণতা আছে, তেমনি আছে গ্রহণ করার, আপন করে নে'য়ার প্রবণতা।

এই প্রবণতাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের একই সঙ্গে প্রতিনিধি-স্থানীয় এবং বিদ্রোহী কবি মায়াকভ্স্কির তাগিদ কার্যকরী রয়েছে। কবি সহযাত্রী ইয়েসেনিন এবং প্যাস্টেরনাকের সঙ্গে মায়াকভ্স্কির মতভেদ ছিল। কিন্তু ইয়েসেনিনের মৃত্যুর পরে মায়াকভ্স্কি এই নব দিগন্তের অভিসারীকে দিয়েছিলেন অকুণ্ঠ সমর্থন।

কি করে ভাল কবিতা লিখতে হয়, সেকথা মায়াকভ্স্কি বুঝিয়েছিলেন প্যাস্টেরনকের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। সোভিয়েট সমাজ সাম্যের সর্বোচ্চ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত এ তাগিদ এই ভাবেই থাকবে। তবে এই নিশ্চয়তাকে আরও সজাগ হতে হবে। জন্ম যন্ত্রণা আদিম যুগে ছিল, আজ আছে, আগামীতেও থাকবে।

কিন্তু সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ প্রতিটি জননীকে দেবে মাতৃসদন। আকাশে মেঘ দিতে পারে, কিন্তু সূর্য তারা তাতে আবদ্ধ থাকে না। বিজলী বাতির যুগে ঝড়ের রাত্রিতে মোমবাতি জ্বালিয়েও অনেক সময় আলোর অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এখন গণচীনের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্যকে পুনরায় গোড়া থেকে যাচাই করে দেখতে পারি। গণচীনেও মূলত সোভিয়েট শিল্পীদের ধরনের অভিজ্ঞতা ও তাগিদের প্রকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কারণ গণচীনও সমাজতন্ত্রী দেশ। তবে, প্রথমত গণচীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে। দ্বিতীয়ত, ত্রিশোত্তরকালে ইয়েনানকে কেন্দ্র করে বেশ খানিকটা মুক্ত এলাকা নিয়ে সমাজতন্ত্রের একটা পরীক্ষাগার স্থাপিত হলেও লেখক-শিল্পীরা একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন বেশ কিছুকাল এবং সেই সংগ্রামকে রূপ দিয়েছেন লেখায় ললিতকলায়। সুতরাং এই দুই পর্যায়কেই আমাদের চোখের সমতনে রাখা দরকার সমাজতন্ত্রী গণচীনের শিল্পীচিত্রের বিচারে। নিকটতর কাল থেকেই শুরু করা যেতে পারে। উনিশ শ' সাতান্ন সালে অর্থাৎ গণচীনে সমাজতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার আট বছর পরে এমন একটা তীব্র বিতর্কের উদ্ভব হয়, যাতে চীনের বিপ্লবের জন্য অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে যে সব লেখক শিল্পীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে অবিশ্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা বিপ্লবেরই জন্য চালিয়ে এসেছেন তাঁদেরই মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী লেখিকা টিংলিং, লেখক চেন চি-হ্সিয়া এবং আধুনিক রূপক রচয়িতা ফেং হুয়ে ফেং নিন্দিত হয়েছেন তাঁদের কয়েকটি অভিমতের জন্য। টিংলিং এর অভিমত যতটুকু পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয়, তিনি

কারও ফরমায়েস অনুযায়ী লিখতে রাজী নন। সে ফরমায়েস যদি জনসাধারণের হয় কিংবা পার্টির হয়, তাতেও নয়। টিংলিং বলেছেন, একজন লেখক বা লেখিকা যদি জীবনে একটা সার্থক বই লিখতে পারেন, তবে সর্বসাধারণের উচিত সেই বইটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। ফেং হুয়ে ফেং সাহিত্যকে প্রধানত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে চান। তাঁর বক্তব্য এই যে, বর্তমানে (গণচীনে) আমলাতান্ত্রিকতাই সমাজতন্ত্রের জয়লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। এঁদের যারা নিন্দা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য এই যে, টিংলিং ব্যক্তিবাদের পক্ষ অবলম্বন করে বুর্জোয়া লেখিকা হয়ে গিয়েছেন, ফেং হুয়ে ফেং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের উপরে ঝোঁক না দিয়ে নিছক গলদের ব্যাপারটা নিয়ে পাঁক ঘাঁটাঘাঁটির পক্ষপাতী এবং চেন চি হ্‌সিয়ার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সাহিত্য-শ্রমিক কৃষক এবং সৈন্য বাহিনীর সেবা করবে বলে যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে (যেমন ইতিপূর্বে চৌ এন লাই এর এক ভাষণে) তাতে তিন একমত নন।

চীনা লেখক সংঘের ভাইস চেয়ারম্যান ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি এক ভাষণে সাহিত্যে দুটি ধারার মধ্যে সংগ্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে টিংলিং চেন হি-হ্‌সিয়া ফেং হুয়ে ফেং গ্রুপের বিরুদ্ধে উপরোক্তভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন, চীনের লেখকরা টিং লিং এবং চেন চি হ্‌সিয়ার পার্টি বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা চালিয়েছেন, সেটা হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্নে সংগ্রামের অংশ। এটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সমাজের মধ্যেকার শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিফলন।

উনিশ শ' আটান্ন সালে দেখা যায় এই বিতর্ক তীব্রতর হলো। টিংলিং, চেন চিহ্‌সিয়া এবং ফেং হুয়ে ফেং এর বক্তব্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। তবে এঁদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে এঁদের বক্তব্যের আভাস পাওয়া গিয়েছে। উনিশ শ' আটান্নতে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মাও তুন কর্তৃক সম্পাদিত 'চীনা সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকার এক সংখ্যায় ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান একটি আক্রমণাত্মক লেখার মাধ্যমে গল্পলেখক লিউ পিন ইয়েন, সাহিত্য সমালোচক ফেং হ্‌সুয়েহ ফেং এবং এই ধরনের অন্যান্য লেখক লেখিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, এঁরা বাস্তববাদ তথা জীবনের আলো এবং অন্ধকার উভয়ের শিল্পী হবার নামে সমাজতন্ত্রের মহান নির্মাণকার্যকে প্রতিহত করছেন। এই অভিযোগে আরও বলা হলো যে সমাজতন্ত্রের নির্মাণের অন্ধকার দিকটাকে উদঘাটিত না করে শুধু সাফল্যের প্রশংসা করাকে সত্যকে চাপা দেওয়া হয় বলে এঁরা প্রচার করছেন এবং এইভাবে 'জীবনে হস্তক্ষেপ' করার নাম করে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধতা করছেন। ইয়াও ওয়েন ইউয়ান তাঁর অভিযোগকে উপস্থিত করলেন তিনভাগে ভাগ করে :

১। উপরোক্ত লেখক লেখিকারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে চালালেও 'গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' এবং 'সূত্রবাদ নিপাত যাক' এর ধ্বনি তুলে মার্কসবাদের মূল সুত্রগুলিকে অস্বীকার করেছেন।

২। এঁরা নিজেদের 'সংস্কারক', 'অভিনবের প্রবর্তক', 'জীবনে হস্তক্ষেপকারী', 'ললিতকলার নতুন নতুন পরীক্ষাগার' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। এঁরা 'লেখক

লেখিকার স্বাধীনতা' দাবী করছেন এবং এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে, এঁরা 'শতফুল ফুটতে দাও' নীতির সমর্থক।

৩। এঁরা পুরানো জং ধরা শিল্পরীতিকে খুঁড়ে বার করে আধুনিক জামা পরিয়ে শেষ চেষ্টা করছেন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এগুলিকে তুলে ধরবার।

ইতিপূর্বেই অবশ্য মাও সে তুং'এর একটি প্রশ্নোত্তরমূলক নিবন্ধে এই বিতর্কের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকটি প্রশ্ন এবং তাদের উত্তরগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য :

১। 'মানব প্রকৃতির তত্ত্ব' অর্থাৎ শ্রেণী-বহির্ভূত মানবপ্রবৃত্তির প্রশ্নে মাও'এর বক্তব্য এই যে, শ্রেণী সমন্বিত সমাজে মানবপ্রবৃত্তি শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত হয়।

২। 'সমস্ত সাহিত্য ও ললিতকলার মূলে আছে প্রেম—এই যুক্তি সম্পর্কে মাও' এর বক্তব্য : প্রেম একটা প্রারম্ভিক ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে যেটা আরও বেশি মূলগত। প্রেম হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত একটি ধারণা।

৩। 'সাহিত্য ও শিল্পকলা সব সময়েই পক্ষপাতহীনভাবে, সমান জোর দিয়ে, সম পরিমাণে আলো এবং অন্ধকারের দিককে উপস্থাপিত করে এসেছে'—এই যুক্তি সম্পর্কে মাও' এর বক্তব্য :

একমাত্র সত্যকার বিপ্লবী লেখক এবং শিল্পীরা প্রশংসা ও গলদ উদঘাটনের মধ্যে সমতা রক্ষার সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারেন। যে অন্ধ শক্তিগুলি জনগণকে বিপদাপন্ন করে তাদের প্রত্যেকের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে এবং জনগণের প্রত্যেকটি বিপ্লবী সংগ্রামকে প্রশংসা করতে হবে। বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এটাই।

৪। 'সাহিত্য ও ললিতকলার কাজ সবসময়েই ছিল গলদ উদঘাটন করা'—এই যুক্তি সম্বন্ধে মাও' এর বক্তব্য : আমি আগেই দেখিয়েছি যে, যা খারাপ তাকে ধরিয়ে দেওয়ার কাজ শুধু সাহিত্য ও ললিতকলার উপরেই বর্তায়নি।

৫। 'প্রবন্ধের যুগ এখনও শেষ হয়নি এবং লু হ্সুন যে রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছেন তা এখনও সঠিক পদ্ধতি'—এই বক্তব্যের জবাবে মাও' এর বক্তব্য : জনগণের শত্রুদের আক্রমণ করার প্রয়োজনের সময়েই শুধুমাত্র লু হ্সুন' এর জীবন কেটেছিল অন্ধশক্তির রাজত্বকালে; তাঁর স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার ছিল না। সেজন্য তিনি তাঁর তীব্র বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন। কিন্তু তিনি জনগণ সম্বন্ধে যে রীতিতে প্রবন্ধ লিখতেন, তা শত্রুদের সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের রীতি থেকে পৃথক ছিল। আমরা বিদ্রূপাত্মক লেখাকে সমগ্রভাবে বর্জন করতে চাই না, কিন্তু এর অপ্যববহার আমাদের বর্জন করতে হবে।

৬। 'আমি (লেখক শিল্পী) গুণ ও সততার প্রশংসা করতে বসিনি। ভাল দিকের প্রশংসা করলেই মহৎ শিল্পকলা হয় না এবং খারাপ দিককে উদঘাটিত করলে নিকৃষ্ট শিল্পকলা হয় না।' এই বক্তব্যের উত্তরে মাও সে তুং বলেছেন, 'এক ধরনের লোক আছে যারা জনগণের মহান লক্ষ্যের ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করে না। এরা প্রথমত নিজেদের কিংবা নিজেদের স্তাবকদের নিয়েই ব্যস্ত। এরা নিজেদের এবং নিজেদের

স্তাবকদের প্রশংসায় কখনও ক্লান্ত হয় না। এদের ক্ষুদ্র চক্রের মধ্যে আরও কিছু লোক হয়তো আছে। এই ধরনের লোকগুলি বিপ্লবী শিবিরের পরগাছা বিশেষ। এই আত্মপ্রসাদকামীদের জন্য কোন জায়গা বিপ্লবী জনগণের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নেই।

৭। 'আমরা যে জায়গা নিয়েছি সেটা সঠিক, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, আমরা সঠিক ভাবধারাকে আয়ত্ত করেছি। শুধুমাত্র আমাদের প্রকাশের পদ্ধতি ভাল নয় এবং এই কারণেই ফল ভাল হচ্ছে না।'

মাও সে তুং এই প্রশ্নে আত্মসমালোচনা এবং বাস্তাব কাজের উপর জোর দিয়েছেন। মাও সে তুং এর উপরোক্ত জবাবগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায়, উনিশ শ' সাতান্ন সালে যে উন্মুক্ত বিতর্কের সূত্রপাত হয় চীন লেখক সংঘের মধ্যে, তাতে চেন্ চি-হ্সিয়া-টিং লিং-ফেং হুয়ে ফেং গ্রুপের নিন্দাকারীরা মাও সে তুং' এর কাছ থেকে যুক্তিগত সমর্থন লাভ করেছেন। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেখা গেল, টিংলিং গ্রুপের আর কোন সাড়াশব্দ নেই। এই লেখক লেখিকারা অবিপ্লবী কিনা, তার প্রমাণ ইতিহাস করবে, কারণ অতীতের ছাই ফুঁড়ে অনেক সময় অগ্নিকণা বেরিয়ে আসে। এঁদের কাছ থেকে সরাসরি আর কিছু না শোনা পর্যন্ত এঁদের সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। এঁদের বিদ্রোহের লেখন ভবিষ্যতের কষ্টিপাথরের জন্য জমা থাকছে, অবশ্য যদি স্বর্ণলেখার কোন সম্ভাবনা থেকে থাকে, তবেই। কিন্তু গণচীনের শিল্পীচিত্তের তাগিদ কি শুধু এই গ্রুপেই সীমাবদ্ধ? উনিশ শ' ছাপান্ন সালে ফিরে গেলে দেখা যাবে, না তা নয়।

এখানে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি এর প্রমাণ। উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগানকারী গণচীনের প্রতিনিধিদলের সহকারী নেতা লাও শেহ্ 'স্বাধীনতা এবং লেখক' নাম দিয়ে যে নিবন্ধ পেশ করেন, তার মাঝখানে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি পেশ করেন :

'একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক উদ্দীপনা হচ্ছে সেই অন্যতম উপাদান যা চীনের লেখকদের লিখতে অনুপ্রাণিত করে আসছে। চীনের সর্বত্র জনসাধারণ ভালভাবে থাকছে, লেখকরাও ভাল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, রাজনৈতিক জীবনে মর্যাদা পাচ্ছেন। সুতরাং তাঁরা কি করে উৎসাহিত না হয়ে পারেন, চুপ করে থাকতে পারেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমার দিকেই তাকান। স্বাধীনতার আগে আমি যত লিখতাম, তার চেয়ে এখন বেশি লিখি। আমি প্রত্যেকদিন লিখি, এমনকি ছুটির দিনেও লেখা বাদ দেই না। রাজনৈতিক উদ্দীপনা আমাকে আমার অন্তরের আনন্দ, নতুন নতুন মানুষ, নতুন নতুন জিনিস এবং আমাদের নতুন সমাজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে লিখতে তাগিদ দেয়। আমার মনে হয়, চীনের যে কোন লেখকের অনুভূতি এটাই। কে কোন্ পার্টির অনুগামী, তাতে ব্যাপারটার হেরফের হয় না। কমিউনিস্ট পার্টি হোক, ডোমোক্র্যাটিক-লীগ হোক, কিংবা আমার মতো লোকদের কোন পার্টি না থাক, সর্বক্ষেত্রেই একই ঘটনা। আমরা কঠোরভাবে পরিশ্রম করে লিখি এবং জনগণের সেবা করি।

কিন্তু, রাজনৈতিক আনুগত্য, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের এই বিভিন্নতার জন্যই আমার দেখা যায়, আমরা সব সময় ভাল লেখা লিখতে পারি না। উপরোক্ত কারণে, আমাদের রাজনৈতিক উদ্দীপনা যত প্রবলই হোক না কেন, বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মানুষ এবং নতুন নতুন জিনিস দিয়ে লিখতে বসলে আমরা দেখি আমাদের লেখা উত্‌রোচ্ছেনা। আমি নিজে এ কথাটা ভাল করেই বুঝি।

উদ্দীপনা আছে, সামনে যোজনব্যাপী পদক্ষেপ করে এগিয়ে যাবার উদ্বেলতা আছে। কিন্তু আমার রাজনৈতিক বোধ এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা আমার চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখনই, যখন আমি বিপ্লবী সংগ্রামের ঘটনাবলিকে শিল্পকলার পূর্ণ জীবন্ত রূপচ্ছবিতে ঢেলে সাজতে যাই। আমার লেখা ফাঁকা এবং শীর্ণ লেখা হয়ে যায়, কারণ আমার সঙ্গে যেসব ঘটনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, সেগুলি সম্বন্ধে আমি লিখি। বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত লেখক এইভাবে দুর্ভোগ ভুগছেন। উল্লেখ বাহুল্য যে, এই ব্যর্থতা আমাদের কাজের বিঘ্ন ঘটায়।

অপরদিকে, আমাদের লেখক লেখিকাদের মধ্যে আছে তারা যাদের বয়স হয়েছে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে, যারা সত্যকার সংগ্রামে শরিক হয়েছে, এবং যাদের লিখবারও সাহস রয়েছে। এদের সমস্যা আলাদা। যেহেতু বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই এরা বড় হয়েছে, সেজন্য এদের সাংস্কৃতিক পারদর্শিতা এবং সাহিত্যিক শিক্ষার মান, সাধারণত, উঁচু দরের নয়। যখন এরা নিখুঁত নিভাঁজ গ্রন্থ লিখতে যায় তখনই বুঝতে পারা যায় এদের কাজে কোথায় বাধা পড়ছে। প্রবীণ লেখক লেখিকাদের সমস্যা এই যে, তাঁরা কুশলা গৃহিণী হলেও তাঁদের ভাত রাঁধার চাল নেই। অন্যদিকে, নবীন লেখক লেখিকাদের সমস্যা এই যে, এই গৃহিণীদের চাল আছে, কিন্তু রান্না করার কুশলতা নেই।

যে কোন সাহিত্য কর্ম যে রাজনৈতিক প্রচারের একটি অস্ত্র, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু একে হতে হবে সত্যকার সাহিত্য, তাতে থাকবে শক্তি, তাতে থাকবে আকর্ষণ। সাহিত্যের নিজের কতকগুলি বিধান আছে। সেই বই কেউ পড়বে না, যাকে মনে করা হচ্ছে সাহিত্য কিন্তু যা শুধু রাজনৈতিক গলাবাজী দিয়ে ঠাসা।

যে লেখক লেখিকারা নিজেদের লেখার উন্নতি চায় তাদের পক্ষে রাজনীতি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। তারা যদি যে যুগে বাস করছে সে যুগের যোগ্য লেখক লেখিকা হয়ে লিখতে চায়, তাহলে তাদের রাজনীতি সম্বন্ধে লেখাপড়া করতে হবে। গত কয়েক বছরে দেখা দিয়েছে, প্রবীণ এবং নবীন নির্বিশেষে লেখক লেখিকারা মতাদর্শের দিক দিয়ে নিজেদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে। তারা স্বেচ্ছায় এবং সোৎসাহে অধ্যয়নে যোগ দিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবধারাগুলিকে জীবন থেকে আলাদা করা যায় না। সত্যকার জনগণের যা চাহিদা এবং যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি লেখক লেখিকারা বেমওকাভাবে তাদের লেখায় রাজনৈতিক দিকটার উপর বেশি ঝোঁক দেয় এবং প্রকৃত জীবনের অভিজ্ঞতার দিক থেকে তাদের লেখার গুরুত্বকে বিবেচনা না করে, তাহলে তাদের লেখা সফল ও সার্থক হয় না। এই লেখা কতকগুলো একঘেয়ে সাধারণ সত্যে গজ গজ করে কত গুলো বাধাধরা সূত্রের চারদিকে এর অবস্থান। গত কয়েক বছরে সূত্র-বদ্ধতার একটা

ব্যারাম আমরা দেখেছি, একঘেয়ে সাধারণ সত্য নিয়ে বাড়াবাড়ি আমরা দেখেছি সহিত্যের ক্ষেত্রে। একথা সত্য যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের ব্যপারে আরও ভালভাবে কাজ করার জন্য লেখকলেখিকাদের কঠোর অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে, মতাদর্শের দিক দিয়ে উন্নতিসাধনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে হোক কিংবা আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগে হোক, তারা তাদের লেখককে উপদেশে ঠেসে দেয় কিংবা যদি তাদের লেখায় কোন কাঠামো অথবা রূপকল্প না থাকে, তবে তারা একেবারেই ভুলপথে চলে যাবে।

যে লেখক কিংবা লেখিকা সব সময়েই জড়সড় এই ভেবে যে, সে গৃহীত নীতির খেলাফ কিংবা বিপ্লবের ক্ষতি করে বসলো বুঝি, সে সব সময়েই দেখতে পাবে যে তার হাত পা বাধা। সে সাহস করে কিছুই লিখতে পারেনা। অথচ সাহস এবং সৃজনশীল লেখা অবিচ্ছেদ্য। সৃজনশীলতা যদি না থাকে, তাহলে লেখকলেখিকারা ভাল নকল নবীশে পরিণত হয় এবং সেটা হচ্ছে সাহিত্যের অবনতির লক্ষণ।"

লাও শেহ্'র উপরোক্ত বক্তব্যে শিল্পীচিত্তের দ্বৈত তাগিদ কি তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে আসেনি? যাতে এই বক্তব্যকে বিচ্ছিন্ন উক্তি বলে মনে না হয়, সেজন্য আর একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্যটা পেশ করেছিলেন লু টিং ঈ, ঊনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার দফতরের পরিচালক। তিনি বলেছিলেন :

'শিল্পী সাহিত্যিকদের অবশ্যই জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবে শিল্পী সাহিত্যকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে নিষেধ ও নির্দেশ সাহিত্য ও শিল্পকলাকে শুধুমাত্র পিছুটান দিতেই পারে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে সূত্রানুযায়ী খারাপ রুচির লেখা।'

পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষার পটভূমিতে শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়িত্ব যে সর্বময় কর্মকাণ্ড এবং দৃষ্টি দাবী করে, তারা সোভিয়েট এবং গণচীনের অভিজ্ঞতাকেই কমবেশী সমর্থন দেয়। এখানে যে তথ্য পেশ করা যাচ্ছে, তাতে এই কথাটাই সামনে বেরিয়ে অসে।

বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন বিভাগীয় তাত্ত্বিকদের লেখা নিয়ে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'চ্যালেঞ্জ অফ্ মার্ক্সিজম্' নামক সংকলন গ্রন্থে 'ললিতকলা এবং জনগণ' নিবন্ধটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিল্পীর স্বাধীনতার তাগিদকে সর্বাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সচেতন ও অনিরুদ্ধ কর্মধারারূপে উপস্থিত করেছে। নিবন্ধকার এ.এল. মর্টন মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশ পোল্যাণ্ডের মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশ পোল্যাণ্ডের ললিতকলাগত পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন, সেটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপণে সহায়তা করে।

এ.এল. মর্টন প্রথমে সাধারণভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের কষ্টিপাথরে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিল্পীর বিশেষ ভূমিকা এবং করণীয়কে নির্ধারিত করতে গিয়ে বলেছেন:

'যে কোন সমাজে ভাবাদর্শগত সৌধকে শেষ পর্যন্ত তার বস্তুগত ভিত্তির অনুষঙ্গ হতে হবেই। এই কারণে এতকাল ধরে আমরা ললিতকলাকে যেরূপে জেনে এসেছি, সমাজতান্ত্রিক ললিতকলার রূপ হবে তাদের চেয়ে পৃথক। কিন্তু এই পরিবর্তন এক মুহূর্তের মধ্যে কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধিত হতে পারে না। বরং, এই পরিবর্তন আসবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এই সংগ্রাম চলবে একটা সমগ্র ঐতিহাসিক যুগে ব্যাপৃত হয়ে। এই সমগ্র যুগে শিল্পী এবং তার পারিপার্শ্বিক সমাজ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। যে পরিবর্তনটা আসবে সেটা সদিচ্ছার ফল হিসাবে আসবে না। সেটা আসবে একটা ভিন্নতর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টির ফলশ্রুতি হিসাবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য যে পথহারা কিংবা আশাহত কিংবা তুচ্ছ লোকজনকে চিত্রিত করতে সাধারণভাবে অস্বীকার করে চলবে, তার কারণ এই নয় যে, এদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কারণ, এই যে, এই ধরনের লোকজন প্রতিনিধিত্বমূলক লোকজন হবে না। এদের সমস্যাবলিও হবে না কেন্দ্রীয় সমস্যাবলি। এরা সমাজতন্ত্রী সাহিত্যে গৌণচরিত্র হয়ে দেখা দেবে, নায়ক-নায়িকা হিসাবে নয়। ধনিকতন্ত্রের আমলের সাহিত্য এরা কিন্তু নায়ক নায়িকা হিসাবেই সামনে এসেছে, কারণ ধনিকতন্ত্রের সমাজে পথহারা এবং ছিন্নমূলেরাই হয়েছে প্রতিনিধিস্থানীয়। এই ভিন্নতার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রী সমাজ শিল্পীকে দেবে সেই দৃষ্টি যা দিয়ে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন।

এই আবিষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পী দেখতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজে তাঁর দায়িত্ব একজন বিজ্ঞানী কিংবা একজন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বের সমান। তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর দায়িত্বের জাত আলাদা নয়। তিনি দেখতে পাবেন, জীবনের বাইরে কারও সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায় না, কারণ শিল্পী যা কিছু কাজ করবেন তারা সবই অন্যান্য সকলের জীবনকে প্রভাবিত করবে। এ অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পী ন্যায়সূত্র অনুযায়ী সিদ্ধান্ত টানবেন যে, শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে শিল্পীর সৃষ্টিকে প্রত্যাখান করার ব্যাপারে সমাজের স্বাধীনতা। সমাজ শিল্পীকে ডেকে বলতে পারে, 'দেখো, তুমি যা সৃষ্টি করেছ তা' আমাদের কাছে মূল্যবান নয়, কারণ তোমার এই সৃষ্টি আমাদের আরও ভালভাবে বাঁচতে সাহায্য করে না।' অবশ্য এরপরেও শিল্পীর এ স্বাধীনতা থাকবে যে, তিনি সমাজকে বুঝিয়ে বলবেন, সমাজের ধারণা ভুল, শিল্প যা করেছেন সেটা মূল্যবান। তবে সমাজের শেষ কথাটাই টিকবে। আমরা ধারণা, এটাই সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষা ও তাগিদের সারসত্তা, যাকে গ্রহণ করা শিল্পীর পক্ষে কঠিন হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রহণ না করলে শিল্পী এবং সমাজের মধ্যে সহযোগিতা বা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে অচলাবস্থা দেখা দেবে। ললিতকলা যদি গুরুতর কিছু বলতে চায়, তাহলে এই দেওয়া এবং নেওয়ার অস্তিত্ব একেবারেই অপরিহার্য।

এই ধরনের নিরীক্ষার লক্ষ্য শিল্পীকে বাধ্য করা নয়, এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পীর উপলব্ধিকে গভীরতর করা। কাজটা এখানে এই নয় যে, শিল্পীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমাজতন্ত্রী ধারায় শিল্পসৃষ্টি করতে অথবা সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তুলতে সম্মত করতে হবে। কাজটা হচ্ছে এই যে, শিল্পীকে সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী করে তুলতে হবে, যাতে সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রাম শিল্পীর স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় এবং

শিল্পীর পক্ষে অন্য কোনভাবে শিল্পসৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একমাত্র এই ভাবেই শিল্পী সত্য সত্যই উপলব্ধি করবেন যে, তাঁর ভূমিকা সমাজের বিপক্ষে নয়, বরং পক্ষে। এইভাবেই আমরা শিল্পীর কাছ থেকে আমাদের কালোপযোগী গভীরতা এবং গুণসম্পন্ন সমাজতন্ত্রী ললিতকলাকে পেতে পারি।'

এ. এল. মর্টন এরপর পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট নেতা ভি. গোমুলকার লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দাখিল করে উপরোক্ত বক্তব্যকে গুণান্বিত করেছেন। গোমুলকার বক্তব্যটি সমাজতন্ত্রী পোল্যাণ্ডের একটি তীক্ষ্ণ মনোভাব, যা সমসাময়িকভাবে অবজ্ঞাত হয়ে আবার পুরোপুরি সামনে এসেছে। বক্তব্যটি এই : "বর্তমান সাংস্কৃতিক নীতি শিল্পীদের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে নিশ্চয়তা দিয়েছে। এই সাংস্কৃতিক নীতি শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ-বিহীন পরিস্থিতিতে ললিতকলার অভিব্যক্তিগুলিকে খুঁজে নেবার জন্য শিল্পীকে দিয়েছে স্বাধীনতা।

আমাদের পার্টি আমাদের জনগণের অভিমত এবং প্রয়োজনকে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত করেছে এবং এইভাবে ভাবাদর্শগত উপায় সমূহের মাধ্যমে আমাদের পার্টি সংগ্রাম করে চলেছে এমন এক ললিতকলার জন্য, যা' সহজবোধ্য, যা শ্রমজীবী জনগণের প্রিয় এবং একান্ত কাছের জিনিস হতে পারে এবং যা' শ্রমজীবী জনগণের সমাজতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খাকে প্রকাশ করতে পারে। আমরা সেই সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী, যা' আঙ্গিকে বাস্তবাদী, বিষয়বস্তুতে সমাজতন্ত্রবাদী এবং বিশ্ব ও মানবের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। আমরা এই ধরনের সাহিত্যকে ব্যাপকতম জনপ্রিয়তার দাবীদার বলে মনে করি। আমরা একই সঙ্গে প্রগতিশীল শৈল্পিক সৃষ্টিকেও সমর্থন করি যা' মানসিক দিগন্তকে প্রসারিত করে এবং নৈতিক চরিত্র আর সৌন্দর্যের অনুভূতিকে গড়ে তোলে। আমরা প্রাচীন ও সমসাময়িক লেখক লেখিকাদের এমন সব গ্রন্থাবলি প্রকাশ করি যারা মার্ক্‌স্‌বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও নিজেদের বিশেষত্ব দ্বারা মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে সাহায্য করে। আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি সেই ললিতকলা যা' মানুষের অন্যান্য আত্মিক প্রয়োজনকে পূরণ করে। এই ধরনের প্রয়োজনগুলি হচ্ছে মানসিক বিশ্রাম, সাংস্কৃতিক আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি।

শৈল্পিক সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত উপরোক্ত সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নীতির সফল বাস্তবায়ন শিল্পীদের উপরেও নির্ভরশীল। আমাদের যে সমাজে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে শিল্পীদের পারিপার্শ্বিক জগৎ। সেখানে শিল্পীরা কোন্ স্থান গ্রহণ করেবেন, সেটা তাঁদের পক্ষ হয়ে আর কেউ বলে দিতে পারে না। শিল্পীরা এবং একমাত্র শিল্পীরাই অর্থাৎ লেখক-লেখিকা এবং অন্যান্য শিল্পীরাই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং গুণ অনুযায়ী পছন্দ করে নিতে পারেন নিজেদের স্থানকে এবং সেই অনুসারে তাঁরাই সিদ্ধান্ত করতে পারেন কী ধরনের শৈল্পিক কাজ তাঁরা করবেন।"

(আজকের মার্ক্‌সবাদ, এপ্রিল, ১৯৫০, পৃ. ১১৯-১২০)

ভি. গোমুলকার উপরোক্ত বক্তব্য যে বিশেষভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক তার একটি প্রমাণ এই যে, শিল্পীর স্বাধীনতা এবং দায়িত্বের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করে সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী সমাজের লক্ষ্যে তাদের পরিপূর্ণভাবে আকর্ষিত ও নিয়োজিত

রাখার তাগিদ পোল্যাণ্ডের আরেকজন প্রখ্যাত তাত্ত্বিকের লেখাতে তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে এসেছে গোমুলকার উপরোক্ত উক্তির দশ বছর পরে। নেতৃস্থানীয় এই কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকের নাম আডাম শাফ। পঞ্চাশোত্তর বছরগুলিতে পোল্যাণ্ডে অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের যে ঝোঁক দেখা যায় যুবসমাজের মধ্যে, তাকে পুরোপুরি খণ্ড করে আডাম শাফ মার্ক্স্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ জোরালোভাবে সামনে এনেছেন। কিন্তু তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দর্শনের বিরুদ্ধে ভাবদর্শনগত সংগ্রাম চালাতে গিয়ে কোনরকম নেতিবাচক সমালোচনা বা নিরীক্ষার পদ্ধতিকেই যেন মার্ক্স্‌বাদ গ্রহণ না করে।

তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই :

"কোন নিরীক্ষাকে যদি আমরা কার্যকরী করতে চাই, তবে এই নিরীক্ষার নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করার ক্ষমতা চাই-

(১) এই নিরীক্ষার ভিত্তি হবে যথোচিত জ্ঞান এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্যের যথাযথ উল্লেখ। প্রতিপক্ষের মতামতকে খণ্ডন করেত হবে যথাযথ যুক্তি দ্বারা।

(২) প্রতিপক্ষের মতামতের নিরীক্ষা বা সমালোচনা করতে গিয়ে যে সব সমস্যার দরুন উক্ত মতামতগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে সেগুলিকে বের করতে হবে।

(৩) নিরীক্ষা বা সমালোচনার কাজ হবে এই সমস্যাগুলির বিকল্প ও যোগাত্মক সমাধান বাত্‌লানো। এইভাবে কাজ না করলে আমরা হেরে যাবো এবং যারা এই সমস্যাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নিয়ে বসে আছে, তাদের জেদ বেড়ে যাবে। এর ফলে দাঁড়িয়ে যাবে এমন একটা অবেগাশ্রিত প্রতিবন্ধকতা, যাকে সাধারণ বুদ্ধি এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনার অধমতম শত্রু বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

মার্ক্স্‌বাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি একটি 'উন্মুক্ত তত্ত্ব'। এই কারণেই মার্ক্স্‌বাদের গোঁড়ানীতিবাদী বিকৃতিকে ঋজু অর্থে সংশোধনবাদ নামে অভিহিত করা উচিত। এই সংশোধনবাদ হচ্ছে অধমতম সংশোধনবাদ। কারণ, গোঁড়ানীতিবাদী বিকৃতি মার্ক্স্‌বাদের সৃজনশীলতার মৌলিক তত্ত্বকে অস্বীকার করে মার্ক্স্‌বাদের বৈজ্ঞানিক সারসত্তাকেই অস্বীকার করে বসে।"

সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তোলার অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতন্ত্র থেকে উৎসারিত সমস্ত অনিরুদ্ধ সৃজনাত্মক ধারাকে পূর্ণ মূল্য দেবার যে দৃষ্টিভঙ্গী পোল্যাণ্ডে জাগ্রত ও প্রসারিত, তাকে হাঙ্গারীতেও প্রায় ধারাবাহিকভাবে মুখর হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে।

সমাজতন্ত্রী দেশ হাঙ্গারীতে ১৯৫৬ সালের রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলির মধ্যে প্রমাণিত হয় যে, পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী বিষবৃক্ষের মূলগুলিকে এখানে ওখানে ছড়ানো অবস্থায় রেখেই সেখানে দ্রুত সমাজতন্ত্রী সৌধ নির্মাণের যে চেষ্টা চলেছিল পঞ্চাশোত্তর কয়েক বছরে, তাতে যান্ত্রিকতা দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে এবং বিশেষ করে

লেখক-শিল্পীদের একাংশকে সমাজতন্ত্রের পক্ষভুক্ত করার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করা হয়নি। এই অবস্থাতে যখন ১৯০৬ সালে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিগুলির দূতাবাসগুলির সঙ্গে যোগসাজস করে প্রতিক্রিয়াশীলের সমাজতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘটালো, তখন তাদের ভাঁওতার চক্রে 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীরাও পড়ে গেলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জর্জ লুকাকসের মতো প্রখ্যাত মার্ক্স্‌বাদী নিরীক্ষাবিদও এই চক্রে পড়েছিলেন। রক্তক্ষয়ী ঘটনার মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রী হাঙ্গারীর মার্ক্স্‌বাদী নেতৃত্বের মধ্যে এল সর্বাত্মক চিন্তা। যে যান্ত্রিকতা এসেছিল দৃষ্টিভঙ্গীতে তা দূর হয়ে গেলো। এই পটভূমিতেই এই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাভব এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যাবর্তনের পরে হাঙ্গারীর নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত হলো, তাঁরা যেমন পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদে ব্রতী হলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সজাগ হলেন যে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে যান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দিয়ে লেখক শিল্পী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেরকমটা আর যেন না ঘটে।

মার্ক্স্‌বাদকে বিকলাঙ্গ করে ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই সংশোধনবাদ নামে অভিহিত হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও বলে আসা হয়েছে যে, কোন খণ্ডিত পরিস্থিতিতে যান্ত্রিকভাবে সংগ্রামের নামে প্রয়োগ করতে গিয়েও যদি মার্ক্স্‌বাদকে নিছক কেতাবী নীতি হিসাবে খাড়া করা তবে তা' হবে সংশোধনবাদ। ১৯৬৪ সালে হাঙ্গারীর কমিউনিস্ট নেতৃত্বের তরফ থেকে যে সাংস্কৃতিক নীতির সূত্র উপস্থাপিত হয়েছে, তার একটি অনুচ্ছেদ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সংশোধনবাদের উপরোক্ত দ্বিবিধ চেহারাকে সামনে রেখেই মার্ক্স্‌বাদী বিপ্লবী সাংস্কৃতিক নীতিকে সুদূরপ্রসারী ও সর্বাত্মক প্রয়োগ ক্ষেত্র দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক নীতির এই অনুচ্ছেদটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যান্ত্রিকতার ভুল আর করা হবে না, কারণ যান্ত্রিকতা যেমন সংকীর্ণতাকে ডেকে নিয়ে অসে, তেমনি সুবিধাবাদের উদারতাকেও প্রশ্রয় দিয়ে বসে। যান্ত্রিকতার পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা এবং আপোষ অর্থাৎ দুই ধরনেরই সংশোধনবাদ।

সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারনের দলিলের এতদ্‌সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি এ বিষয়ে একান্ত ভাবেই স্পষ্ট। এতে বলা হয়েছে :

"রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে, সেগুলি স্বাভাবিকভাবে সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু শুধু একথা বললেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ত্রুটিগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সাংস্কৃতিক নীতির ক্ষেত্রেও ভুল করা হয়েছিল এবং এই ভুল ভ্রান্তির উৎস ছিল ব্যক্তি-আরাধনাবাদের সঙ্গে মিশে থাকা নিছক অভিপ্রায়ী (Subjective) মনোভাব। কিংবা ভুল ভ্রান্তির মূলে ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে মনগড়া হিসাব নিকাশ। এই ধরনের ভাবনাচিন্তা মনোভাব হয়ে গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার প্রবণতাগুলিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, নয়তো আপোষ রফা এবং নীতিবিগর্হিত সুবিধা প্রদানের মনোভাবকে উৎসাহিত করেছে।"

পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গারীর বিশেষ অবস্থার পটভূমিকে এবং পূর্ব ইউরোপের যে কোন সমাজতন্ত্রী দেশের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী সমাজে শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়িত্বের প্রশ্নের প্রতি কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হওয়া উচিত, সেই দিকেই এখন আমরা দৃষ্টিকে নিবন্ধ করতে পারি এবার। এ বিষয়ে অষ্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট কবি এবং নাট্যকার আর্নেস্ট ফিশারের বক্তব্য বিশেষভাবে সহায়ক।

১৯৫৯ সালে ভিয়েনাতে প্রকাশিত "ললিতকলার প্রয়োজনীয়তা" গ্রন্থে আর্নেস্ট ফিশার বিশেষ করে জার্মেন বিপ্লবী নাট্যকার বারটোল্‌ড্ ব্রেখটের অভিমতসমূহকে সামনে রেখে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও করণীয়কে উপস্থিত করেছেন, তাতে মার্ক্‌স্‌বাদী শিল্পরূপ নিরীক্ষা পেয়েছে সেই সর্বময়তা যা সংশোধনীবাদী পিছুটান এবং গোঁড়া নীতিবাদী বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে নাকচ করে নিশ্চিত করেছে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী সুস্পষ্ট পথরেখাকে। এ হচ্ছে সেই প্রগতির পথ, যেখানে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর ভাষায়, "শ্রেণীমজ্জা এবং শ্রেণী সংঘাত-সমন্বিত ধনিকতন্ত্রী সমাজের জায়গায় এসে গিয়েছে সেই সমাজ, যার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্তস্বরূপ।"

(দ্বিতীয় অধ্যায়, সর্বশেষ অনুচ্ছেদ, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো)।

সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী সমাজে 'ললিতকলার কাজ যে খোলা দরজাকে ভাঙ্গা নয়, বন্ধ দরজাকে চাবী দিয়ে খোলা' সে কথাটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে আর্নেস্ট ফিশার যেভাবে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন, তারপরে এর কোন ব্যাখ্যার নিশ্চয় দরকার থাকতে পারে না।

আর্নেস্ট পিশারের বক্তব্য :

সমাজতন্ত্র শিল্পী বিশ্বাস করেন যে, মানুষ বিকাশের সম্ভাবনা হচ্ছে সীমাহীন। কিন্তু তাই বলে তিনি কোন চূড়ান্ত "স্বর্গরাজ্যে" বিশ্বাসী নন। এমন কি পারস্পরিক বিরোধিতার ফলপ্রসূ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের জঙ্গমতায় তাঁর বিশ্বাসকে তিনি কখনও পরিত্যগ করেন না। (কথাটি নিম্নোক্ত কবিতার কয়েকটির পঙ্‌ক্তিতে বললে এই দাঁড়ায়) :

হে স্বর্ণযুগ! তুমি ধরা দেবে না কোনদিন।
তবু আমাদের দৃষ্টির সামনে পৃথিবীতে তুমি
ধাবমান থেকো।
সমুদ্র ফিরে আসুক তার উৎসে-ঝর্ণায়
বিশ্বের প্রভাতের অসংখ্য স্বপ্নের অতল তলে
ভবিষ্যতের মুখ প্রতিবিম্বিত হোক ।
বীরের রূপকথা হোক প্রাজ্ঞ মানবজাতির লক্ষ্য।

(আর্নেস্ট ফিশারের একটি কবিতা থেকে)

সমাজতন্ত্রী শিল্পী নব সমাজকে যেভাবে তার ভিত্তিমূলে গ্রহণ করে, সেই ভাষাটির মধ্যে রয়েছে যাচাই করে দেখারও তাগিদ। মার্ক্‌স্ নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সম্বন্ধে

যে কথা বলে গিয়েছেন, সেকথা সমাজতন্ত্রী সমাজসমূহে পৌঁছেও প্রযোজ্য। মার্কস বলেছেন, "এরা নিরন্তর আত্মসমালোচনা করে চলে; এরা এদের অগ্রগতির পথে বারংবার থমকে দাঁড়ায়; নতুন করে যাত্রা শুরু করার জন্য পা-বদল করে নেয়।" সুতরাং স্যতকার সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদ একই ধরনের যাচাই করনে-ওয়ালা বাস্তবতাবাদ। সমাজতন্ত্রী সমাহকে মূলত গ্রহণ করে এবং যোগাত্মক (Positive) সামাজিক দৃষ্টির আধিকারী থেকে শিল্পী এই বিশ্লেষণমূলক বাস্তবতাবাদকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। একথা ঠিক যে, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আর পারিপার্শ্বিক জগতের বিরুদ্ধে ভাবলোকিক প্রতিবাদে লিপ্ত হয় না। কিন্তু শিল্পীর 'আমি' এবং তাঁর সমাজের মধ্যেকার ভারসাম্য কখনও স্থবিরতা-প্রাপ্ত হবার নয়। বিরোধ এবং ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই ভারসাম্যকে বারংবার প্রতিষ্ঠিত করে যেতে হয়।

নতুন বাস্তবতাকে ব্যক্ত করার জন্য চাই অভিব্যক্তির নতুন নতুন আঙ্গিক। যদি একথা কেউ বলেন যে, সমাজতন্ত্রী ললিতকলা ধনিকতন্ত্রের আমলের আঙ্গিকগুলিকে এবং বিশেষ করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় নবজাগৃতি বা রেনেসাঁর ললিতকলাকে কিংবা ঊনিশ শতকের রুশ বাস্তবতাবাদকে নিয়েই কাজ করে যাবে, তাহলে সেটা হবে ফরমানদারী। রেনেসাঁতে কয়েকজন মহান শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু সমাজতন্ত্রী ললিতকলা কেন অন্যত্রও (আঙ্গিকের জন্য) দৃষ্টিপাত করবে না? সে কেন শিখবে না মিশরীয় কিংবা আজটেক (প্রাচীন মেক্সিকো) থেকে, আইকন থেকে? সমাজতন্ত্রী ললিতকলা কেন শিখবে না মানে (Manet), সেজাঁ, মূর এবং পিকাসোর কাছে থেকে? টলস্টয় এবং ডস্টয়েভ্‌স্কির বাস্তবতা অনুপম; কিন্তু তাই বলে সমাজতন্ত্রী ললিতকলা কেন অঙ্গিকের পাঠ নেবে না হোমার এবং বাইবেল, শেক্‌স্‌পীয়র এবং স্ট্রিণ্ডবার্গ, স্টেন্ডাল এবং প্রুস্ত, ব্রেখ্‌ট এবং ওক্যাসি রাবঁ এবং ইয়েটসের কাছ থেকে? এখানে অনুকরণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখানে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের আঙ্গিক ও অভিব্যক্তির উপকরণকে ললিতকলার আধারে ঢালাই করে নেওয়া, যাতে এই ললিতকলা সীমাহীন বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতাময় বাস্তবতার সঙ্গে মিলতে পারে। গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে বিশেষ বিশেষ শৈল্পিক পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে, পদ্ধতিগুলি যত ভালই হোক না কেন, নতুন নতুন আঙ্গিকে নতুন নতুন বিষয়বস্তুকে ব্যক্ত করা কিংবা মানবিক বিকাশের হাজার হাজার বছরের ফলশ্রুতির সংশ্লেষণ সম্ভব হবে না। গোঁড়ামির সঙ্গে নতুন আঙ্গিক কিংবা সংশ্লেষণ খাপ খায় না।

সমাজতন্ত্রী দুনিয়ায় এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং এই আলোচনাকে থামানো যাবে না। মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মুক্তধার সমাজতন্ত্রী সারসত্তাসম্পন্ন ললিতকলা অতীতের যে কোন ললিতকলা অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, নির্ভীকতর এবং বিষয়ে ও আঙ্গিকে, প্রয়াসে এবং গন্ডিবৈচিত্র্যে অধিকতর সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। অনমনীয়তা ও ভ্রান্তিতে কিংবা বাধা ও বিপত্তিতে নিরুৎসাহিত হবার কিছু নেই। 'দ্বন্দ্বাত্মক গন্ডিবাদের প্রশস্তি' কবিতায় ব্রেখ্‌ট যে কথা বলেছেন, সেকথা এই অবস্থাতে এবং অন্যান্য অবস্থাতে প্রযোজ্য :

যদি এখনও বেঁচে থেকে থাকো তুমি,
তবে কখনও বোলো না, এ হবার নয়।

আজ যা নিশ্চিত, আগামীতে তা' অনিশ্চিত
বস্তুপুঞ্জ আজ যেমন আছে, তেমন থাকবে না
এবং
দিনান্তের আগেই যা হবার নয় তা' হবে ।"

আর্নেস্ট ফিশারের এই বক্তব্যকে আরও দ্ব্যর্থহীন করে সামনে আনার জন্য "ললিতকলার প্রয়োজনীয়তা" গ্রন্থ থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দাখিল করা যেতে পারে, যথা :

"সমাজতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে 'ললিতকলার বাজার' পুঁজিবাদী ফাটকাবাজারীদের পাইকারীভাবে তৈরি পণ্যের জোগান থেকে রেহাই পেয়েছে, সেখানে প্রধান কর্মকাণ্ড হচ্ছে দ্বিবিধ : (১) জনগণকে ললিতকলার যথার্থ আনন্দ উপভোগের দিকে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ জনগণের শিল্পবোধকে জাগ্রত ও অনুপ্রাণিত করে চলা; (২) শিল্পীর দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করা। এই দায়িত্বের অর্থ এই নয় যে, শিল্পী প্রধানত প্রচলিত রুচির নির্দেশ মেনে চলবেন কিংবা অমুক অথবা তমুকের ফরমান অনুযায়ী লিখবেন, ছবি আঁকবেন, সুর রচনা করবেন। বরং দায়িত্বের অর্থ এই যে, শিল্পী শূন্যচারী হবেন না এবং তিনি এই সত্যটাকে উপলব্ধি করবেন যে, শিল্পীকে যার কাছে শেষ পর্যন্ত জবাবদিহি করতে হবে সে হলো সমাজ। বিভিন্ন উপলক্ষ আসতে পারে যখন দেখা যাবে এই সাধারণ সামাজিক নিয়োজন কোন বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নিয়োজনের সঙ্গে মিলছে না। মায়াকভ্স্কি এ কথাটা বহু পূর্বেই জানিয়েছেন। কোন একটি শিল্পকর্মকে যে প্রথম থেকেই প্রত্যেকে বুঝে ফেলবে এবং অনুমোদন করবে, তা' হতে পারে না। ললিতকলার কাজ খোলা দরজাকে ভাঙ্গা নয়। ললিতকলার কাজ হচ্ছে বন্ধ দরজাকে চাবী দিয়ে খোলা। কিন্তু শিল্পী যখন নতুন বাস্তবকে আবিষ্কার করেন, তখন তিনি একাজ শুধু নিজের জন্যই করেন না। তিনি এটা করেন অন্য সকলের জন্য যারা জানতে চায় তারা কোন্ জগতে বাস করছে, কোথা থেকে তাদের আগমন, কোথায় তারা চলেছে। শিল্পী সমাজের জন্য শিল্পসৃষ্টি করেন। পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই সত্যদৃষ্টি খোয়া গিয়েছিল, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক সমাজে কিংবা গথিক ললিতকলার যুগে এই সত্যতৃষ্টি ছিল স্বতঃস্বীকৃত। এই যে আকাঙ্ক্ষিত সংশ্লেষণ, এই যে সমাজের যৌথসত্তার সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার ঐক্য, একে রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এই কাজের জন্য চাই বিস্তর অসঙ্কীর্ণ চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা । প্রত্যেকটি মহান বিপ্লবই এক একটি বিস্ফোরণময় সংশ্লেষণ। কিন্তু জঙ্গম সামঞ্জস্যের মধ্যেও অস্থিরতা বারংবার ফিরে আসে। নতুন অবস্থায় নতুন সংশ্লেষণ করতে হয়। যুবক মায়াকভ্স্কির ভাবলৌকিক এবং ব্যক্তিপ্রবণ বিদ্রোহ বিপ্লবের কাছ থেকে নিয়েছিল তার মহৎ সারসত্তাকে। ব্যক্তিগত এবং যৌথ অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই ঐক্য স্থবির নয়। একে স্থবির করে রাখা যায় না। বিশেষত ফরমান দিয়ে তো কোন মতেই রাখা যায় না। সমাজতন্ত্রী ললিতকলা ঐক্যের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ থেকে শক্তিসংগ্রহ করবে, যাতে শেষ পর্যন্ত ধীরস্থির এবং কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমস্ত রকম বিরুদ্ধতার লক্ষণগুলি অপসারিত হয়।

আমাদের এই শতাব্দীর শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে আর্নেস্ট ফিশারের উপরোক্ত বক্তব্যগুলির পরে আর বিশেষ কিছু বলার থাকে কি?

আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ

প্রথমে দেখা যাক, আধুনিক চিত্রকলা বলতে পারা যায় কাকে? এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিকে ধরে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। "শেষ সপ্তক" কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেন,

জগতে রূপের আনাগোনা চলেছে
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক একটি রূপ
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানা দ্বারে
এরা প্রতিরূপ না।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলিকে তাঁর এই উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আমরা প্রথমে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারি এবং তারপরে আধুনিক চিত্রকলার মর্ম কথাটতেও পৌঁছতে পারি। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে যেকথা প্রথমেই মনে হয় সেটা এই যে, পঞ্চভূতের রামধনু-দুনিয়া তাঁর তুলির পোঁচে পোঁচে হয়েছে কিম্ভূত। শুধু তাই নয়, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্য-কবিতাগুলিতে যাখন রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিকের এবং প্রতিবেশীদের অবিকুল ও অবিকৃত বাণীরূপ ফুটিয়ে তুলবার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন ঠিক তখন তাঁর চেয়ে দেখা কোন মেয়ের মুখ কিংবা জীবের দেহকে তিনি ছবিতে একেঁছেন উদ্ভট করে। এই ছবিগুলি হয় অবিকল নয়, এরা অভিনব। 'শেষ সপ্তক' থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত পঙক্তি ক'টিতে যে ব্যতিক্রম ঘটানোর দাবি রয়েছে, তাকে তাই চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের রূপসৃষ্টির মর্মবাণী বলা যেতে পারে। কিন্তু এই মর্মবণী কি একান্তভাবে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথেরই একটা অভিনব প্রয়াসের বা খেয়ালের কৈফিয়ত? তা নয়। আধুনিক চিত্রকলার নমুনা যাঁদের খানিকটাও নজরে পড়েছে, তাঁরাই বলবেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির জগতে এক বিশেষ পরীক্ষার পতাকাবাহী। বলবেন রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি কিংবা কৈফিয়ত উনিশ বিশ শতকের এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের চিত্রশিল্পীদের কাজের বিশেষত্বের প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছবির অঙ্গ' নিবন্ধের মধ্য দিয়েও তাঁর আধুনিকতার প্রতি প্রবণতাকে ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে তিনি ছবি এবং কবিতাকে অনেকটা সেইভাবে পাশাপাশি সাজিয়েছিলেন, যেমনভাবে সার্ত্রে ছবি এবং কবিতাকে পাশাপাশি সাজিয়ে বলেছিলেন যে, এরা উভয়েই অস্বচ্ছ (Opaque)। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য। ... ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্টি হয়।' এই ধরনের সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি যে, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের

কাজে যেমন, ঠিক তেমনি বিংশ শতাব্দীর রূপসৃষ্টি ও রূপ নিরীক্ষার মুখপাত্র হিসাবে অভিহিত চিত্রশিল্পীদের কাজে সাধারণত মানব মানবী ও তাদের পরিবেশের অবিকল বাইরের চেহারাটা একটা আবরণ বিশেষ। এই ধরনের শিল্পীরা যে সব ছবি আঁকছেন, বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যবিহীনতার মধ্য দিয়ে এই বক্তব্য বেরিয়ে আসছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর আভ্যন্তরীণ সত্তাকে প্রকাশ করাই হচ্ছে এর মূলাধার বা সত্যরূপের উপস্থাপন। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিরূপ হচ্ছে ছলনা মাত্র। পিকাসো তাঁর কিম্ভূতকিমাকার মূলাধারগুলিকে স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়ে বলেছেন, 'দর্শকরা যেটাকে মনে করছেন অনাসৃষ্টি, আমার কাছে তাই রূপসৃষ্টি।'

আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন বস্তুকে অথবা নানান্ মানুষের মুখাবয়বকে আলো এবং রং'এর লীলা কিংবা ভাবের বিস্ফোরণ হিসাবে দেখে নিটোলভাবে কিংবা ভেঙে ভেঙে ছবিতে রূপ দেবার পদ্ধতি ঊনিশ বিশ শতকে উপরোক্ত প্রতিরূপ-লঙ্ঘী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই বিমূর্ত বা প্রতিরূপ লঙ্ঘী ধারা থেকে যে সব দুর্বোধ্য ছবি বেরিয়ে আসছে, সেগুলিতেই আধুনিক চিত্রকলার আধুনিকতার সন্ধান করা হচ্ছে সাধারণত, যদিও আধুনিক চিত্রকলার পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি প্রতিরূপকে সব সময়েই যে নাকচ করেছে তা নয়। আধুনিক চিত্রকলার প্রখ্যাত শিল্পীরা বিমূর্ত ছবির পাশাপাশি নিয়ে এসেছেন অবিকৃত মূর্ত প্রতিরূপকেও। তাঁরা এঁকেছেন অসংখ্য ও অজস্র প্রতিরূপ, যেগুলো উদ্ভট কিংবা কিম্ভূতকিমাকার তো নয়ই, বরং সুষমায় সুমিত ও আনন্দঘন ভঙ্গিমার অভিব্যক্তি। কুশ্রী ও কদাকারের প্রতিচ্ছবিও শিল্পীর দরদী মনের সংস্পর্শে স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং আধুনিক চিত্রকলার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে, সুমিতার হাত ধরে চলেছে অমিতা, কারণ রবীন্দ্রনাথের ছবিতে অমিতার ধারাই অবশ্য প্রবলা।

[দুই]

আধুনিক চিত্রকলাকে এইভাবে চিহ্নিত করে নিয়ে জনগণের সঙ্গে এর সম্পর্কের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে যেখানে খটকা লাগে, সেখানে মূল বিতর্কটা দাঁড়ায় এই যে, আধুনিক চিত্রকলার প্রতিরূপ-লঙ্ঘী প্রবণতা কি জনগণকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তোলেনি? উদ্ভট ও বিমূর্তধারার প্রবলতার দরুণ আধুনিক চিত্রকলা কি গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি? হাইনরিখ হাইনের ভাষায় জানি যে, ললিতকলা হচ্ছে জীবনের আয়না। এই সংজ্ঞার পটভূমিতে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কী রকম আয়না যেখানে জনগণ জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখে তার অর্থ বুঝতে পারে না, তাকে আপন করে নিতে পারে না? সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার তাত্ত্বিকরা বিমূর্ত আধুনিক চিত্রকলার ব্যাপারে আপত্তি করে এসেছেন, এই কারণেই। জনগণ ও শিল্পকলা যাতে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুরে সরে না যায়, তার তাগিদ প্রকাশ পেয়েছে দুর্বোধ্য চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের তাত্ত্বিকদের এই আপত্তি নেতিবাচক রূপ পরিগ্রহ করেনি। আধুনিক চিত্রকলা এবং জনগণের সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে একটি আকর্ষণ বিকর্ষণ ও সংশ্লেষণের গতিময় সম্পর্কে। এখানে এই গতিময় সম্পর্ক সম্বন্ধে

সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সমগ্র ঊনিশ-বিশ শতকের আধুনিক চিত্রকলাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের তথা মার্ক্সবাদের প্রথম সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র, সেজন্য সোভিয়েটের তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণের দৃষ্টান্ত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[তিন]

সোভিয়েট ইউনিয়নের গণমুখী চলচ্চিত্রের অমর রূপকার আইসেনস্টাইন তাঁর শিল্পকর্মের বিশেষ ধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যেসব বক্তব্য লিখিতভাবে দাখিল করে গিয়েছেন, সেগুলিতে ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতকের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে শুরু করে বিশ শতকের পিকাসো পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রকলার সমস্ত পথিকৃৎ সম্বন্ধে তিনি যেসব মন্তব্য রেখে গিয়েছেন, সেগুলি চিত্রকলার তাত্ত্বিকদেরও পথের সন্ধান দিতে পারে। চলচ্চিত্রের একজন রূপকার হয়েও রং ও রেখার ব্যাপারে আইসেনস্টাইন যে অসামান্য বিশ্লেষণ দিয়ে গিয়েছেন, তাতে বিস্মিত হওয়ায় কিছু নেই। কারণ, চিত্রকলায় তিনি আনাড়ি ছিলেন না। চলচ্চিত্র তৈরি করার সময় আইসেনস্টাইন অনেক সময় নিজেই বর্ণিত বিষয়ের একটি গতিশীল ধারাবাহিক রেখাচিত্র এঁকে নিতেন। আঁকা ছবির নরনারীর ভঙ্গিমাগুলি ছিল তাঁর চলচ্চিত্রের পাত্রপাত্রীদের অভিনয় ও আলোকচিত্র গ্রহণের নির্দেশনামা। এই রেখাচিত্রগুলির যেসব নমুনা রয়ে গিয়েছে, তাতে আধুনিক চিত্রকলার অভিনব কিন্তু প্রতিরূপী ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট।

আইসেনষ্টাইন গত শতাব্দীর প্রখ্যাত বিপ্লবী চিত্রশিল্পী ভ্যান গগের তুলি ও রং'এর কাজ সম্পর্কে ধারণা পেশ করতে গিয়ে আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিমূর্ত চিত্রকলার রূপকার হিসাবে পরিচিত পাবলো পিকাসোর শরণাপন্ন হয়েছেন। পিকাসো ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, 'কোন কোন চিত্রশিল্পী আছেন, যাঁরা সূর্যকে একটা হলদে রং এর চিহ্নে রূপান্তরিত করেন, আবার এমনও চিত্রশিল্পী রয়েছেন যাঁরা তাঁদের শিল্পকুশলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় একটা হলদে রং'এর চিহ্নকে সূর্যে রূপান্তরিত করেন।' আইসেনস্টাইন বলেছেন যে, ভ্যান গগকে শেষোক্ত ধরনের শিল্পীরূপে পরিগণিত করা যেতে পারে। তিনি তাঁর এই দাবীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভ্যান গগের একটি উক্তি দাখিল করেছেন। ভ্যান গগ বলেন, 'আমার চোখের সামনে যে রয়েছে তাকে ঠিক সেইভাবেই প্রতিফলিত না করে আমি যথেচ্ছভাবে রং ব্যবহার করি নিজেকে জোরালোভাবে প্রকাশ করার জন্য।' আইসেনস্টাইন তাঁর চলচ্চিত্রের গতিতরঙ্গ এভং ভ্যান গগের রঙের কাজের গতিতরঙ্গের মধ্যে মিল খুঁজতে গিয়ে ভ্যান গগ এবং পিকাসোর ছবি আঁকার পদ্ধতিতে সায় দিয়েছিলেন। পিকাসো তো বিমূর্তপন্থার তথা প্রতিরূপ লঙ্ঘনের অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত। রং'এর ব্যবহারের দিক দিয়ে ভ্যান গগ কি এই ধারার প্রতি গত শতাব্দীতেই সম্মতি দিয়ে যাননি।

আইসেনস্টাইনের এই ভ্যান গগ-প্রীতি ও পিকাসো-প্রীতির মধ্য দিয়ে সমগ্র সোভিয়েট ললিতকলার বিকাশধারার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় অঙ্কিত রয়েছে। সে পরিচয় এই যে, সোভিয়েট শিল্পীরা 'আগুন' নিয়ে খেলা করতেও কখনও দ্বিধা করেন নি। সোভিয়েট ললিতকলা মূলত গণমুখী হওয়ার দরুন যে কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতার প্রতি বিমুখ হলেও সোভিয়েটের আওতার বাইরের শিল্পীদের কোন দেয়াল দিয়ে বাইরে রাখতে চেষ্টা করেনি। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সর্বপ্রথম ১৯২৯ সালে মস্কোতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্বোধ্য বলে এই সব ছবির সুনাম দুর্নাম দুইই ছিল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পীরা তথা জনগণ ভিড় করে এই ছবি দেখেছিলেন।

আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সোভিয়েট কবির সপ্ততিতম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৯৬৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নেরই পাঝিৎসভ ও বি. শ্রাগিন কবির দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুনভাবে উপস্থিত করতে গিয়ে আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর যে মতামতকে সামনে এনেছেন, সেগুলিও নেতিবাচক নয়। মায়াকভ্স্কির 'ফরাসি চিত্রকলার সপ্তাহব্যাপী পর্যালোচনা' নামক নিবন্ধসমূহের ভিত্তিতে পাঝিৎসভ্ ও বি. শ্রাগিন দেখিয়েছেন যে, পিকাসো দেলনে (Delauney), ব্রাক এবং লোগর প্রমুখ শিল্পীর রং ও তুলির কাজ সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল থাকলেও এবং এঁদের ছবির প্রতি অনুরাগ থাকলেও মায়াকভ্স্কি এই শিল্পীদের ভবিষৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল এই যে, এই প্রতিভাবান শিল্পীরা নিছক আঙ্গিকের অন্বেষণে পথহারা হতে পারেন। অবশ্য উপরোক্ত "ফরাসি চিত্রকলার সপ্তাহব্যাপী পর্যালোচনা" নামক নিবন্ধেই দেখা যায়, মায়াকভস্কি পিকাসোর অস্থিরতাকে, তাঁর অবিশ্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাকে 'শিল্পীর অসন্তোষ' হিসাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, পিকাসো প্রমুখ শিল্পীরা জীবনের ভিড়ের মধ্যে স্থান খুঁজে দেবেন এবং ললিতকলাকে প্রশস্ত গণতান্ত্রিক মহাপথের পথিক করে দেবেন। মায়াকভস্কির মৃত্যু হয় ১৯৩০ সালে। পিকাসো স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে এর কয়েক বছর পরে জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে যে 'গের্নিকা' নামক ছবি এঁকেছিলেন, সেটি এবং এই ধরনের অন্যান্য ছবি মায়াকভ্স্কির প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছে।

এই 'গের্নিকা' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন, এটি বিমূর্তপন্থী হলেও জনগণের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। পিকাসোর এই ছবিটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৃটিশ ললিতকলাবিদ হার্বার্ট রীড যে কথা বলেছেন, মায়াকভ্স্কির প্রত্যাশা তারই আভাষ।

হার্বার্ট রীডের মন্তব্যটি এই : "এই ছবিটির যিনি শিল্পী সেই পিকাসোকে 'ডেসাস্ট্রেস' নামক ছবির শিল্পী গয়া'র (Goya) পাশে শুধু জায়গা করে দিলেই পিকাসো সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হবে না। গয়াও ছিলেন একজন মহান শিল্পী। কিন্তু তাঁর অন্তরের সাড়া ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং তার উপকরণ ছিল পরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ। পিকাসো গয়ার চেয়েও সর্বজনীন, তাঁর ব্যবহৃত প্রতীকগুলি আটপৌরে, ঠিক যেমন হোমার, দান্তে এবং সার্ভেন্তিসের প্রতীকগুলি নিতান্তই আটপৌরে। আর–মহৎ শিল্পকর্ম

সমস্ত গোষ্ঠীকে এবং সমস্ত শ্রেণীকে অতিক্রম করে ঠিক তখনই জন্ম নেয়, যখন ব্যাপকভাবে অর্জিত সাধারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিশে যায় নিবিড়তম আবেগ।"

হার্বার্ট রীড যে গণমুখী ধারাকে "গের্নিকা" ছবিতে মূর্ত হতে দেখেছেন, মায়াকভ্স্কি তাকে সম্ভাবনা হিসাবে নিহিত দেখেছিলেন পিকাসোর অসন্তুষ্ট শিল্পীচিত্তে।

মায়াকভ্স্কির সমসাময়িক লেখক পস্টোভ্স্কি আধুনিক চিত্রকলার 'ইম্প্রেসনিজম' নামক ধারা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তার 'স্বর্ণকণিকা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ইম্প্রেসনিজম-পন্থীরা আমাদের দেশে কোনদিনই জয়প্রিয় হয়নি। তবু আমি মনে করি, এঁদের কাছ থেকে এবং ফরাসি চিত্রকলা-পদ্ধতির শিল্পীদের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। .... এই শিল্পীরা আলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে তীক্ষ্ণতর করেছেন। যে সব ছবি এঁরা এঁকেছেন সেগুলি মানবিক আনন্দসমূহের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে।"

পস্টোভ্স্কির এই বক্তব্যও নিশ্চয় নেতিবাচক নয়। তাঁর বক্তব্যের উৎস হচ্ছে আধুনিক চিত্রকলা এবং জনগণের সম্পর্ক গতিময় আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং সংশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী—মার্ক্স্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

[চার]

এই সুস্পষ্ট যোগাত্মক সংশ্লেষিত মূল্যবিচারের পদ্ধতিকে ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁরা বিমূর্ত চিত্রকলাকে কৃত্রিম উৎসাহ প্রদান করেছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জয়ধ্বজা হিসাবে । আধুনিক চিত্রকলাকে গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রকলা বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁদের এই কসরৎ নানা দিক দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। বিমূর্ত চিত্রকলা সম্বন্ধে ধনিকতন্ত্রী প্রশস্তির ধূম্রজাল ভেদ করলে দেখা যাবে, প্রকৃত ঘটনা এই যে, এই বিমূর্ত চিত্রকলাই যখন ধনিকতন্ত্রী গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল, তখন ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকরাই এর বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেছিলন।

বস্তুতপক্ষে বিমূর্তবাদী বা প্রতিরূপ-লঙ্ঘী চিত্রকলার পথিকৃৎ শিল্পীদের জীবন হচ্ছে ধনিকতন্ত্রী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জীবন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন. আই. এইচ. বাউর কর্তৃক রচিত 'আমেরিকার আধুনিক চিত্রকলার বিপ্লব ও ঐতিহ্য' গ্রন্থে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বিমূর্ত চিত্রকলার সমালোচকদের বিরোধিতার মুখে শিল্পীদের সংগ্রামের যে বর্ণনা রয়েছে, তার উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। উপরোক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় ১৯০৮ সালের একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। এই বছরে আমেরিকাতে বিমূর্ত চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন কয়েকজন শিল্পী, যারা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে প্রখ্যাত ফরাসি অভিব্যক্তিবাদী বা এক্সপ্রেসনিস্ট-পন্থী শিল্পী মাতিসের আঁকা ছবি দেখার পরে একজন দর্শক লিখেছিলেন, 'এই বীভৎস বিকৃতি দেখার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে ললিতকলা ও জীবনের প্রতি বিস্বাদ এসে যায়।'

পুরো মন্তব্যটা হচ্ছে এই : 'প্রায় সমস্ত অতি আধুনিক ফরাসি চিত্রকরদের মতোই মাতিসের মনে রয়েছে কায়িক বিকৃতির প্রতি আকর্ষণ। এই বিবমিষামূলক এবং অমঙ্গলজনক আকর্ষণ বা ইচ্ছার বশে শিল্পী নগ্নদেহকে এবং বিশেষ করে নারীর নগ্নদেহকে এমন ইতর ভঙ্গিমায় এবং প্রকৃতিবিরোধী বীভৎস চেহারায় চিত্রিত করেন যে, ললিতকলার পদ্ধতিগত কুশলতাকে ছাপিয়ে সামনে বেরিয়ে আসে এমন এক অস্বাভাবিক বস্তু যাকে দেখলে ঘৃণা হয়।

মাতিস এই গা-ঘিন ঘিন করা অপস্বভাবকে এমন আশ্চর্য দক্ষতা এবং বিস্ময়কর চাতুর্যের সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন যে এই ছবি দেখলে দর্শকের মনে ললিতকলা এবং জীবনের প্রতি বিস্বাদ এসে যায়।

জন. আই. এইচ. বাউর কর্তৃক রচিত উপরোক্ত গ্রন্থের মুল প্রবণতা আধুনিক চিত্রকলার পক্ষে থাকলেও এই বইটিতে দেখানো হয়েছে যে আমেরিকাতে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে আধুনিক চিত্রকলা ছিল উপহাসের বিষয়। গ্রন্থকার একটি তদানীন্তন মন্তব্যকে হুবহু তুলেছেন; যথা, "একটি আট বছরের পাজী মেয়েকে রং পেনসিল (প্যাসটেল) হাতে দিয়ে এবং দুয়েক চুমুক মদ খাইয়ে একটা সাদা দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে একলা ঘরে বন্ধ করে রাখলে দেয়ালে সে যে ছবি আঁকবে বিমূর্তপন্থীদের ছবির সঙ্গে সেটি মিলে যাবে।' অর্থাৎ আধুনিক চিত্রকলাকে ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা শুরুতেই নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে দেখে নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের সংশ্লেষিত গণশিল্প রূপের বিরুদ্ধে তাঁরা এই বিমূর্ত চিত্রকলাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাতে গিয়ে নিজেদের বক্তব্যকে ঢেলে সেজেছেন।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রী বা মার্কস্‌বাদী তথা সাম্যবাদী তাত্ত্বিকরা জনগণের তরফ থেকে আধুনিক চিত্রকলাকে বুঝতে চেয়েছেন। বিমূর্তবাদী শিল্পীদের মধ্যে অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখেই ছবি এঁকেছেন। জনগণ এই শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে বিমূর্ত কিংবা প্রতিরূপপ্রবণ দুই ধারারই ছবি আঁকতে। ফরাসি মনোবাস্তববাদীদের পথিকৃৎ আঁদ্রে ব্রেতঁ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এবং তাঁর দলের শিল্পীদের আনুগত্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি, মার্কস্‌বাদের প্রতি। ভ্যান গগের সারা জীবনের সাধনাতে ছিল এই জনগণমুখিতা। পিকাসোর শিল্পী-মানস ও রূপসৃষ্টির মধ্যে প্রাণের উপকরণ হিসাবে কাজ করেছে লোকজীবন, সংগ্রামী গণজীবন, মেহনতী মানুষের জীবন।

মার্কস্‌বাদীরা যা দাবী করে আসছেন বা চেয়ে আসছেন, সেটা হচ্ছে আধুনিক চিত্রকলার শিল্পীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে যেন কোন মতেই বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন। এই দাবী অবশ্য কোন কোন সময়ে রূঢ় শুনিয়েছে। এর প্রয়োজনও যে ছিল না তা নয়। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক চিত্রকলা কি পথভ্রষ্ট হয়নি? ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকদের হাতের টেক্কা হিসাবে কাজ করেনি কি?

[পাঁচ]

ভ্যান গগ এবং পিকাসো প্রমুখ শিল্পীর জীবন ও শিল্পদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক চিত্রকলা এবং জনগণের সম্পর্কের প্রাণবন্ত দিকটাকে সর্বদা সামনে রাখলে মার্কসবাদীদের দাবীটা এমনভাবে জড়তামুক্ত থাকবে যে আধুনিক চিত্রকলা এবং জনগণের নাড়ির যোগ শত বিতর্কেও ছিন্ন হবে না।

ভ্যান গগের দৃষ্টান্তেই প্রথমে আনা যাক। ভ্যান গগের শিল্পীজীবনের এটি একটি জ্বলন্ত চিত্র। এতে দেখা যায় ভ্যান গগ ছিলেন গণশিল্পী। টমাস এ ক্রাভেনের (Thomas. A Craven) লেখা "ফেমাস আর্টিস্টস্ এণ্ড দেয়ার মডেল্স" গ্রন্থে এই চিত্রটি আছে। ক্রাভেন লিখেছেন :

"উসুলার সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ভ্যান গগ বেলজিয়ামে খনি-শ্রমিকদের মধ্যে নিজেকে বাইবেলের একজন স্বনির্বাচিত ব্যাখ্যাকাররূপে সমাহিত করে দিলেন। খনি-শ্রমিকরা তাঁর কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন কারণ তিনি তাঁদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। ভ্যান গগ খনিশ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের বই পড়া শেখাতেন, রোগীর সেবা করতেন, বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্তদের যত্ন নিতেন। তিনি কয়লাখনির মজুরদের যে ছবি আঁকতে শুরু করলেন, তাতে এমন একটি বিশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠল যা পর্বতকে টলাতে পারে। এই সব ছবিতে এমন স্বর ধ্বনিত হলো যাকে একদিন সমগ্র মানব সমাজ শুনতে বাধ্য হবে বলে বুঝতে পারা গেল।

এরপর ভ্যান গগ তুলি আর রং নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। শুরু হলো রং'এর আক্ষেপ বিক্ষেপ। রং আর রং। অশান্ত রং। ভ্যান গগ যখন অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্ত থাকতেন, তখন তুলি আর রং'এর তরঙ্গ স্থিমিত হতো, তখন তিনি ললিতকলা সম্বন্ধে গভীরতম চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতে পারতেন। টলস্টয় এবং ডিকেন্সের মতো তিনি মনে করতেন, ললিতকলার একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার, একটা বাণী থাকা দরকার। এর অর্থ নিশ্চয় একটা নৈতিক বিধি থাকা নয়। এর এমন একটা অর্থ যা মানুষের সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসবে এবং দুনিয়াটাকে প্রত্যেকটি মানুষের ভালভাবে থাকবার জায়গা করে তুলবে। ভ্যান গগ ছিলেন গরীব বেচারা। তিনি অশিক্ষিত আবেগের জন্য, চাষীদের জন্য, কারিগরদের জন্য, মাঝি মাল্লাদের জন্য ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, তাঁর প্রত্যেকটি ছবি আজ ফাটকা বাজারের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীলাম-ঘর এর পরিক্রমা চলছে ধনবান সংগ্রাহকদের কক্ষে এবং মিউজিয়মে। ঐশ্বর্যের বর পুত্রেরা ছাড়া এ ছবি সংগ্রহ করা কারুই সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, যখনই তাঁর আঁকা ছবির কোন সংগ্রহ জনসাধারণের সামনে কোন প্রদর্শনীতে উন্মোচিত হয়, তখন দূর দূরন্ত থেকে জনতা ছুটে আসেন। তাঁরা ভ্যান গগের যন্ত্রণাবিদ্ধ চিন্তাধারার উলঙ্গ ও সূর্যোজ্জ্বল মানবতার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন"।

ধনিকতন্ত্র ভ্যান গগের প্রতি যে চরম অবিচার করেছে এবং ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক উপেক্ষিত জনগণ ভ্যান গগের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন,

ক্রাভেনের লেখায় তা' তীক্ষ্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদীরা তথা মার্ক্সবাদীরা এই জ্বলন্ত চিত্রকে নিশ্চয় সবসময় চোখের সামনে রাখবেন।

ফিন্‌কেলস্টাইন তাঁর "ললতিকলা ও সমাজ" গ্রন্থে পিকাসো সম্বন্ধে যে আলেখ্য দিয়েছেন, সেটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। ফিন্‌কেলস্টাইন দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের তথা লোকশিল্পীদের মুক্তিসংগ্রাম পিকাসোর উদ্ভট ভাবাশ্রয়ী ছবিগুলিতেও বাস্তব জীবনাদর্শকে সম্পৃক্ত রেখেছে। ফিন্‌কেলস্টাইন বলেছেন, "পিকাসোর শিল্পীশৈলীতে নিছক বিদ্রোহ দেখতে গেলে ভুল করা হবে, কারণ তাঁকে কোনক্রমেই সেই নিরানন্দ নিরালম্বপন্থীদের মধ্যে ফেলা যায় না, যাঁরা দুরূহ শিল্পরূপে শুধু নিজেদের প্রকাশ করতে চান। তাঁর শিল্পশৈলী মূলত মহৎ লোকশিল্পীদের শিল্পশৈলী। প্রকৃতির কাছ থেকে আহৃত সমস্ত উপকরণকে পিকাসো লোকশিল্পকলার ধারায় আনন্দোচ্ছলচিত্তে ব্যবহার করেছেন।

ফিন্‌কেলস্টাইন পিকাসো সম্বন্ধে আরেক জায়গায় বলেছেন, 'বিমূর্তপন্থীদের অবিসম্বাদী নেতার আঁকা ছবি দেখে উপর থেকে মনে হয়, তিনি বাস্তবের বাইরে দূরতম মেরুতে অবস্থান করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানবিক এবং সবচেয়ে বেশি তীব্র আবেগের অধিকারী।'

এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে ফিন্‌কেলস্টাইন বিমূর্তপন্থার প্রতি পিকাসোর মনোভাব সর্ম্পকে ১৯৩৫ সালে পিকাসোর নিজেরই একটি উক্তি দাখিল করেছেন। পিকাসোর বক্তব্য :

"বিমূর্ত ললিতকলা বলে কিছু নেই। আপনাকে কোন বিষয়বস্তু নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে সর্বদা। পরে আপনি বাস্তবের সমস্ত আভাসকেই মুছে ফেলতে পারেন। তখন আর কোনদিক দিয়েই কোন বিপদ থাকেনা, কারণ তখন বিষয়বস্তুর ধারণা তার সেই চিহ্নকে এঁকে রেখে গিয়েছে যা অপসারণের অতীত। এই ধারণা থেকেই শিল্পী কাজ শুরু করেন। এতে তাঁর ভাবনা চিন্তা উদ্রিক্ত হয় এবং আবেগ-অনুভূতি আলোড়িত হয়। ভাবনাচিন্তা এবং আবেগ-অনুভূতি শেষ পর্যন্ত শিল্পীর কাজের মধ্যে বন্দী অবস্থায় থাকবে।"

বিশ্বশান্তির সংগ্রামী প্রতীক শান্তি পারাবতের চিত্রকার পাবলো পিকাসোর উপরোক্ত উক্তি আধুনিক চিত্রকলা এবং জনগণকে সংশ্লেষিত গতিময় দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার মার্ক্‌স্‌বাদী পদ্ধতির একটি অপরিহার্য উপকরণ। মার্ক্‌স্‌বাদীরা চেষ্টা করবেন একে আরও পরিচ্ছন্ন করতে।

কবিতা এবং ছবিকে অস্বচ্ছ বলে অভিহিত করলেও এবং এই প্রসঙ্গে "চিত্রশিল্পী কোন অর্থকে চিত্রিত করেন না" বলে মন্তব্য করলেও সার্ত্রে তাঁর "সাহিত্য কি" গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, "চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি হচ্ছে সারা বিশ্বের জন্য খোলা জানালা।"

মার্ক্‌স্‌বাদীরা এই বক্তব্যকেও গ্রহণ করে একে আরও পরিচ্ছন্ন করে নেবেন। নিতে পারবেন। কারণ চিরজীবী মেহনতী জনতা তাঁদের তত্ত্বের চিরমুক্ত প্রাণের উৎস!

[ছয়]

আধুনিক চিত্রকলা এবং জনগণের সংশ্লেষিত সম্পর্ক-ভিত্তিক ছবিকে যোগাত্মক (positive) মনোভাব নিয়ে দেখে তাকে একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপি গণমুক্তি-অভিযানের আয়না এবং আলোকের ঝরনা-ধারা করার মার্কস্‌বাদী প্রচেষ্টা আরও একটা দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। এই দিকটাকে আরও গভীর, আরও স্বচ্ছন্দ, আরও গতিময় করা দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই দিকটা হচ্ছে আধুনিক চিত্রকলায় আফ্রিকার গণমানবের কিংবা মেক্সিকোর গণমানবের কিংবা আফ্রো এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার আরও অন্যান্য দেশের গণমানবের প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা চিত্র ও ভস্কার্যরীতির পুনরভ্যুদয়। মেক্সিকোর মার্কস্‌বাদী চিত্রশিল্পী রিভেরা কিংবা সিকুয়েরিয়স স্বদেশে চিত্রকলায় যে বিপ্লব এনেছেন, তা' একান্তভাবে গণমুখী। এইভাবে আফ্রো-এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা লোকচিত্রকলা ও লোকভাস্কর্যকে আধুনিক চিত্রকলা আপন করতে প্রয়াসী হয়েছে। এই প্রয়াস কোন কোন ক্ষেত্রে একটা সংশ্লেষিত রূপ পেয়ে উঠতে পারেনি বলেই দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

পিকাসোর আঁকা পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক ছবির দুর্বোধ্যতার এটিও একটি কারণ সুতরাং আধুনিক চিত্রকলার নানান্ মিশ্রিত উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন ধারায় যে পারস্পরিক রীতি-লঙ্ঘন-প্রবণতা কাজ করে চলেছে, তার মূল গতিটা হচ্ছে ব্যাপকতম জনগণের অনিরুদ্ধ বিকাশ ও মুক্তিরই গতি।

আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত

"হে প্রাচীন কাণ্ডারী মৃত্যু,
তোমার আশায় ফেনায়িত বিষের আরক
শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করতে দাও আমাদের।
আমাদের চিন্তাকে প্রদীপ্ত করতে চাই এই আগুনে
স্বর্গ হোক নরক হোক, আমরা
অতল গুহার তলায় পৌঁছতে চাই,
কী আসে যায়, অজানায়
দেখতে চাই নতুন জীবনকে, নতুন দেবতাদের।
— বদলেয়ার

'শিল্পী অভিযাত্রা করেন অনুভূতির নতুন নতুন সমুদ্রে। জ্ঞানে যে বাস্তবলোক আয়ত্ত হয়, তার শক্ত ভূমিতল শিল্পীর পায়ের নীচে থাকে না। শিল্পী অতি অস্থির, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'সৌন্দর্য'—ক্রিস্টফার কডওয়েল।

স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সে সম্পর্কে পিসারভ লিখেছিলেন :

'ব্যবধান একাধিক। আমার স্বপ্ন (প্রথমত) স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতকে ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে সামনে, কিংবা (দ্বিতীয়ত) এমন একদিকে আড়াআড়িভাবে ছিটকে চলে যেতে পারে যে স্বাভাবিক ঘটনাস্রোত কোনদিনই সেমুখো হবে না।

প্রথম ব্যাপারটা যদি ঘটে, তাতে আমার স্বপ্ন কোন ক্ষতি করবে না; শুধু তাই নয়; আমার স্বপ্ন মেহনতী মানুষের প্রাণশক্তিকে সাহায্য করবে, উদ্দীপিত করবে। এ স্বপ্নে এমন কিছু নেই যা শ্রমশক্তিকে বিকৃত বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত করতে পারে। তাতো নেই-ই, বরং মানুষ যদি এই ভাবের স্বপ্ন দেখা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতো, যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতকে ছাড়িয়ে গিয়ে যে বস্তু তার হাতে সবেমাত্র গড়ে উঠছে তার সমগ্র ও সম্পূর্ণ রূপকে ফুটিয়ে তুলতে না পারতো, তাহলে আমার তো ধারণাতেই আসে না মানুষ শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং লৌকিক ক্রিয়াকর্মে বিস্তৃত ও আয়াস-সাধ্য কাজ হাতে নেবার এবং সম্পন্ন করার উৎসাহ পেত কোথা থেকে।...স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা' কোন ক্ষতিই করেনা যদি যে লোক স্বপ্ন দেখে, তার সত্যকার বিশ্বাস থাকে সে স্বপ্নে, যদি সে জীবনকে সর্বান্তঃকরণে লক্ষ্য করে এবং তার অভিজ্ঞতাকে আকাশকুসুমের সাথে মিলিয়ে দেখে, অর্থাৎ সাধারণভাবে বলতে গেলে সে যদি তার কল্পলোক বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে যায় সচেতনভাবে। স্বপ্ন ও জীবনের মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তবেই সবকিছু শুভ হয়।

– লেনিন কর্তৃক তাঁর কি করিতে হইবে গ্রন্থে 'স্বপ্ন দেখতে চাই' অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত।

'শিল্পকলা মানবচরিত্রের একটি বন্য এবং নিয়ন্ত্রণবিরোধী দিক থেকে উৎসারিত হয়। শিল্পী এবং হুকুমনবীশের (Bureaucrat) মধ্যে সদাসর্বদাই এক গভীর পারস্পরিক বৈরীতা থাকতে বাধ্য; এব্যাপারে বহুকালব্যাপী সংগ্রামে শিল্পী সদাসর্বদা প্রকাশ্যত পরাভূত হলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। শিল্পী মানবসমাজের জীবনে যে আনন্দ সঞ্চারিত করে, সেজন্য মানবসমাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই কৃতজ্ঞতাতেই শিল্পীর জয়। মানব-প্রকৃতির বন্য দিকটির যদি পরোপকারব্রতী অবুঝ আমলাতন্ত্রীর সুশৃঙ্খল নিয়মে চিরকালের জন্য বশীভূত করা হয়, তাহলে বাঁচবার তাগিদমাত্রই ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে মরে যাবে। বিভীষিকায় ভরা বর্তমান জগৎ যদি হাজার গুণ খারাপ হয় তবুও তা উপরোক্ত প্রাণহীন বিশ্ব-শবদেহের চাইতে শ্রেয়ঃ। যে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র স্বতোৎসারিত ও মুক্ত চিত্তকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধে, তার চাইতে শত ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও নৈরাজ্যবাদী সমাজ ভাল। সাধারণত এই নিয়মের দুঃস্বপ্নই শিল্পীদের এবং সাধারণভাবে সৌন্দর্যপ্রিয় লোকদের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সারসত্তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা শিল্পকলাকে অসম্ভব করে তুলতে পারে। সমাজতন্ত্রের কোন কোন বিশেষ ব্যবস্থাতেই শুধু এ বিপদ দেখা দিতে পারে। উইলিয়াম মরিস সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তিনি শিল্পী ছিলেন বলেই প্রধানত সমাজতন্ত্রীপন্থী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে অযৌক্তিক কাজ করেননি তিনি।

কোন বিশেষ ব্যবস্থার দৌলতে নয়, একমাত্র স্বাধীনতাতেই শিল্পকলা বিকশিত হতে পারে। অতএব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ জন্যে বিশেষ সুবিধার বরাদ্দ থাকা

দরকার। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, ধনিকতন্ত্রী সমাজের তুলনায় সুবিবেচক সমাজতন্ত্র শিল্পী ও বিজ্ঞানীকে দিতে পারে লক্ষগুণ বেশি সুবিধা। কিন্তু এই দেওয়াটা নির্ভর করে কি ধরনের আনুকূল্যময় সমাজতন্ত্র বেছে নেওয়া হচ্ছে এবং তাতে উল্লেখিত সুবিধার কি ব্যবস্থা হচ্ছে তার উপর।

– বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক লিখিত "স্বাধীনতার বিভিন্ন পথ" (Roads to Freedom) গ্রন্থের 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও শিল্পকলার স্থান' অধ্যায় থেকে।

[দুই]

উপরোক্ত চারটি উদ্ধৃতি শিল্পীচিত্তের বিশেষত্বের ব্যাপারে গত একশত বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কক্ষে উচ্চারিত হলেও, এদের মূল সুরের মধ্যে একটি মিল রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন খনিজ চাং-এ দানা বেঁধে থাকলেও, একই তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন বিচ্ছুরিত হতে থাকে, এও প্রায় ঠিক তেমনি। অথবা, আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত যেন এক রামধনুর মতো যাতে ঝড়োমেঘের বিদ্যুৎজ্বালা যোজনা করা রয়েছে।

শিল্পীচিত্তের যে উত্তেজিত অবস্থা শিল্পীকে অতল গুহার তলায় টেনে নিয়ে যায়, সমুদ্রবক্ষে হাঁটতে প্ররোচিত করে, নির্দিষ্ট চিন্তাকে ছাড়িয়ে স্বপ্নদোলায় দুলিয়ে বেড়ায়, হুকুমনবীশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, সেই বিশেষ বস্তুটির নির্ণয়কার্য বোধ হয় খুব বেশি আয়াসসাধ্য নয়। শিল্পীচিত্তের যে বস্তুটির প্রাবল্যের দরুন শিল্পী আকর্ষিত হন সামান্য ব্যতিক্রমে, তা হচ্ছে আবেগ। আবেগপ্রবণতাই শিল্পীকে পণ্ডিত এবং সাধারণ সংসারী থেকে পৃথক করে।

খ্যাতনামা ব্রিটিশ শিল্পকলা-সমালোচনা হার্বার্ট রীড এ ব্যাপারটা খুব ভালভাবে উপস্থিত করেছেন : 'শিল্পীকে আমরা যে সম্মান দেখাই তা এমন একটা লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যিনি তাঁর বিশেষ গুণাধিকার বলে আমাদের পক্ষ হয়ে আমাদের আবেগ-সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করেছেন।'

হার্বার্ট রীডের যাবতীয় সৌন্দর্যতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরাও শিল্পীচিত্তের বিশেষ আবেগ-ভিত্তিক ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর উপরোক্ত উক্তিতে সায় দেবেন বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু শিল্পীচিত্তের আবেগের গতিপরিণতি কি নিয়ন্ত্রণহীন, অবাধ্য, অসতর্ক, সর্বভেদী? এ আবেগ কি স্বয়ংসিদ্ধ? এ আবেগের উপর কি কালের, সমাজের পারিপার্শ্বিকের রং লাগে না? ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উত্তরিত গুণ এতে সংক্রমিত হয় না?

হাজার হাজার বছরের বহুবিধ সমাজ-পর্যায় পার হয়ে এসেও এই আবেগ যে তার আদিম সত্তা থেকে বঞ্চিত হয়নি তাতে কোন তর্ক তোলা উচিত নয়। কারণ আমরা তো চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছি যে, শিল্পী যেন একটি বিস্ফোরক। অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলক সামনে রেখে যেভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে বাঁধ ভেঙ্গে চলেছেন তাতে অনুভূতির আতিশয্য তার আদিম মৌলিকতা নিয়ে ঝলমল করছে। গত শতকের জার্মান গীতি নাট্যকার ও সুরকার ভাগনারের 'নুরেমবার্গের ওস্তাদ ও সাকরেদ' সহজ অনুভূতিকে সৃষ্টিক্ষম শিল্পীচিত্তের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত

করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকেও যেন এরই প্রতিবিম্ব পড়েছে। কিন্তু এদের উপর দিয়েও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, মুক্তিমুখী আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত কি এমনই একটি 'মুক্তিসত্তা' যা এমনভাবে আলগা থেকে যায় যে, মানব মনের ভাঙ্গাগড়ার বৈচিত্র্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না?

রবীন্দ্রনাথের কালের যাত্রা নাটকের 'কবি' চরিত্র এমনভাবে অঙ্কিত যে, মনে হয় তার কাছে সকল কালান্তরের পরিবর্তন তুচ্ছ। এটা কি একটা বিশেষ নাটকের বিশেষ চরিত্রের বিশেষত্ব, না শিল্পীচিত্তমাত্রেরই রূপরেখা?

যখন কেউ বলেন যে, শিল্পীর অনুভূতির আদিমতা অপরিবর্তনীয়, তখন বদলেয়ার, কডওয়েল, লেনিন এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্যকে তিনি আর পৃথক করতে পারেন না। শিল্পীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলতে গেলে বলা যায় যে, রাবোঁ, মায়াকভ্স্কি এবং প্যাস্তেরনাকের মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিরা কোন পার্থক্য দেখেন না। ক্রুশ্চেভ যে মায়াকভ্স্কির লেখাকে হুকুমনবীশদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন তাঁর পুরো একটা কবিতাকে ১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করে, তার সঙ্গে প্যাস্তের নাকের ডা. জিভাগোকে নিয়ে পশ্চিমী প্রধানদের বিভিন্ন ভাষণের কোন পার্থক্যও এই ধরনের ব্যক্তিরা দেখতে পান না।

কিন্তু শিল্পীর মন কি এই সহজ সূত্রেই বিশ্লেষিত হতে পারে?

[তিন]

গত শতকের ফরাসি কবি বদলেয়ার এমন একটি শিল্পকলাধারার প্রবর্তন করে যান, যা দেখিয়ে দেয় যে, শিল্পীচিত্তের অনুভবে বাস্তব মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে এবং কবিতায় তা' সংক্রেমিক হতে পারে। বস্তুত সহজ অনুভবের সঙ্গে বাস্তবের এক অভিনব সংমিশ্রণ বদলেয়ার থেকে শুরু করে টি, এস, এলিয়ট পর্যন্ত কবিদের লেখার ধারাকে গত কয়েক হাজার বছরের কবিতা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে 'কাব্য' নামে যে চতুর্দশপদী কবিতাটি লিখেছেন, তাতে শিল্পীচিত্তকে এক ধরনের অপাপবিদ্ধ মুক্তিসত্তা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। যথা :

> জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
> অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

কিন্তু বদলেয়ার কি এই রীতিকে বিপর্যস্ত করে দেননি? বদলেয়ারের কবিতা সুস্পষ্টভবে বুঝিয়ে দেয় যে, বদলেয়ার এবং তাঁর সতীর্থদের মধ্যে শিল্পীচিত্তে বাস্তবের সংস্পর্শ এমন এক গুণাত্মক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল যা ইতিপূর্বে হয়তো ইটালির দান্তের মধ্যেই আভাসের মতো প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু আকর্ষিত শিল্পীচিত্তের মর্ম-উপাদান অনুভূতি ও আবেগ কি তার কোন দিক নিয়ে, আর কোন ভাবে সংস্পৃষ্ট হয়নি, সম্পর্কিত হয়নি?

উদাহরণত প্রশ্ন করা যেতে পারে, ক্রিস্টফার কডওয়েল কিভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছেন।

[চার]

কডওয়েল তাঁর 'মায়া ও বাস্তব' গ্রন্থে লিখেছেন : 'কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষ তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে আবেগের সূত্রে একত্রিত হয়, আপন অন্তরে নিমজ্জিত হয়ে। সুতরাং ধনিকতন্ত্রের কোন কবি যখন মনে করেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকেই জাহির করছেন, অথবা অন্তঃস্থলে নিহিত শিল্পকলা জগতে প্রবেশ করে যখন কবি মনে করেন যে, তিনি বাস্তব থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, তখন উক্ত কবি প্রকৃতপক্ষে প্রমাণসিদ্ধ বাস্তবের সামাজিক দুনিয়া থেকে আবেগঘন চেতনার সামাজিক দুনিয়ার প্রবেশ করেছেন।

এই আবেগঘন চেতনা কথাটা প্রণিধানযোগ্য। কডওয়েল চেতনা ও আবেগের মধ্যে একটা ক্রমসমৃদ্ধমান সর্ম্পক লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত কডওয়েল বার বার এর তাৎপর্যের দিকে সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যথা: "শিল্পকলা মানব-মনের আবেগ জগতে তাদের যন্ত্রের মতো সুর সৃষ্টি করে। শিল্পকথা মানুষের চেতনার আবেগসত্তাকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেয় যাতে সে আগের চাইতে বেশি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিশ্বজগতের ডাকে সাড়া দিতে পারে। কবিতা যে মানব-প্রাণের অভিব্যক্তি, ঠিক তারই মতো গণিত ও সুরের ফলপ্রসূ বিরোধেই কবিতায় উৎপত্তি।" হার্বার্ট রীড কডওয়েলের মতো মার্কসবাদী না হলেও এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে দিব্যোপলব্ধির্র উপর জোর দিলেও আবেগ ও চেতনাকে এক এক সময় কডওয়েলের মতো পরস্পর নিবদ্ধ করে দেখেছেন। এখানে লিও টলস্টয়ের একটি বক্তব্য এবং এই বক্তব্যের উপর তাঁর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। লিও টলস্টয় শিল্পকলার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'শিল্পকলা হচ্ছে শিল্পীর অভিজ্ঞতা দিয়ে সর্বসাধারণকে সংক্রমিত করার উপাদান।' হার্বার্ট রীড এখানে অভিজ্ঞতা বলতে প্রত্যক্ষলব্ধ সহজ অনুভূতি বলেছেন এবং টলস্টয়ের সংজ্ঞার উপর মন্তব্য করেছেন কিছুটা অবাক হয়ে : "এ রকম একটি অতিরিক্ত সরল সংজ্ঞা নিয়ে টলস্টয় কি করে এত বড় শিল্পী হলেন আশ্চর্য! এই সংজ্ঞায় শিল্পকলার জটিল গঠনকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি এ মত পোষণ করিনা। শিল্পকলার কাজ এই নয় যে সে অনুভূতিকে পাত্রান্তরে চালান দেবে, আর অন্যান্যোরা সেই অনুভূতির অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করবে। নীচুদরের শিল্পকলাতেই নিছক অনুভূতি স্থানান্তরের ব্যাপারটা চলতে পারে। ... প্রকৃত পক্ষে শিল্পকলার কাজ হচ্ছে অনুভূতিকে প্রকাশ করা এবং অনুধাবনকে চালান দেওয়া। [এখানে অবশ্য উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞতা কথাটার ভিন্ন অর্থও করা হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানী দার্শনিক হোয়াইটহেডের মতে : "অভিজ্ঞতার মধ্যে যে উপাদানটি শিল্পকলাকে সম্ভব করে তোলে তা চেতনা।"]

এখানে অন্য আরও কথা আসতে পারে। টলস্টয় শিল্পী হিসাবে সহজ পন্থী ছিলেন; হার্বার্ট রীড তার অভিজ্ঞতা কথাটাকে ঠিকই ব্যবহার করেছেন; কিন্তু টলস্টয় যদি হার্বার্ট রীডের মতো অনুধাবন-সচেতন হয়ে খানিকটা রীডের উচ্চগ্রামে তাঁর উপন্যাসগুলিকে বাঁধতেন, তাহলে কি গ্রন্থগুলো হার্বার্ট রীডের কবিতার মতো কিছুটা খর্বিত হয়ে যেতো না? "আনা কারেনিনা" উপন্যাসের অন্ধ আবেগ ও হাতড়ে হাতড়ে

চলা আত্মিক জাগৃতির মিশ্রিত ও সংঘাতময় কাহিনী কি টলস্টয়েরই লেখা হিতোপদেশ দানের জন্য লেখা হিতোপদেশমালায় পরিণত হতো না? ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স শিল্পীসত্তা বজায় রাখতে গিয়ে অবশ্য একেবারে বেলাইনে চলে গিয়েছেন; তিনি বুদ্ধি ও চিন্তাকে জীবনসত্তার বিকৃতির উপাদান বলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু চেতনা ও আবেগ-প্রবণতার যে সঠিক রাসায়নিক সংমিশ্রণ হলে শিল্পীর অভিযাত্রা সার্থক হতে পারে, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করাও কঠিন।

তবু চেতনা যে আকর্ষিত শিল্পীচিত্তের অনুভূতিপ্রবণতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, এতে কোন দ্বিমতের অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না। শিল্পীর মন আর্কষিত হতে পারে, কিন্তু তার মৌলিক উপাদানগুলি তো সাধারণ মানুষের মনেরই অনুরূপ। আধুনিক মনোবিজ্ঞনীরা এই সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্রতী রয়েছেন, নির্ণয় করেছেনও। এই তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান চৈতন্যের রং একটু লাগবেই অনুভবে, যেমন অনুভবের রং লাগবেই জ্ঞান চৈতন্যে।

পুরানো উদাহরণই দেওয়া যাক।

শেক্‌সপীয়র জন্মেছিলেন ধণতন্ত্রের প্রত্যূষে, জয়গান করেছিলেন তিনি সেদিনের নতুন সূর্যের। উচ্ছ্বাস জড়ানো রয়েছে সেখানে সেদিনকার ভারতমহাসাগর সেঁচা মুক্তা নিয়ে। কিন্তু সেই নিছক সৌন্দর্য কামনার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল জ্ঞানচৈতন্য। 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রারম্ভেই বুঝতে পারা যায়, ছড়িয়ে দেওয়া বীজের মধ্যে কোন্‌টা মারা যাবে, কোনটা ফলন্ত হবে। শেক্‌স্‌পীয়রের পাত্র-পাত্রীদের সহজ অনুভবের উত্তালতিমিরতরঙ্গেও পড়েছে আলোকরেখা। সহজ উচ্ছল আনন্দে রয়েছে চেতনার দংশন। এই দংশন, এই ছিন্নভিন্ন মন, এই চেতনাঘন আর্কষিত আবেগ—এও শিল্পীচিত্তের উপাদান।

জার্মান কবিকুলশিরোমনি গ্যেটের নাটক "ফাউস্ট" থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নাটকের প্রস্তাবনায় কবিকে যখন একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মানবীয় নাটক পেশ করার জন্য বলা হলো, তখন কবি বললেন, "তাহলে আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার সেই সপ্নের দিনগুলিকে যখন আমি নিজেই পাইনি আকৃতি, যখন গান উদ্বেল হয়ে উঠতো আমার মধ্যে, আর সুরেলা কল্পনাগুলি ভিড় জমাতো ঝাঁকে ঝাঁকে। আমার ছিলনা কিছুই, তবু দরিদ্র ছিলাম না। ফিরিয়ে দাও আমাকে সেই যৌবন।"

উত্তরে ভাঁড় বললেন, 'বন্ধু! যৌবনের দরকার তোমার রয়েছে ঠিকই। কিন্তু নিপুণ আঙ্গুল দিয়ে যদি চেনা তারে ঘা দিতে হয়, যদি প্রত্যেকটি হৃদয়কে কোন সুচতুর পরিকল্পনায় ঝঙ্কৃত করতে হয়, যদি যেমনটি চাও তেমনি দাগ ফুটিয়ে তুলতে চাও, তাহলে বন্ধু, বহুদর্শীর প্রয়োজন রয়েছে, এই আমার মত।'

অজর যৌবনীদীপ্তি এবং বহুদর্শীর সারাৎসারপ্রাপ্তির যোগাযোগেই লেখা হয়েছিল "ফাউস্ট" নাটক। সেদিন ফরাসি বিপ্লবের যুক্তিতত্ত্বের তথা চেতনার ঝড়ো হাওয়া জার্মেনীর শুকনো বিবর্ণ পাতাগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছিল। উত্তুঙ্গ অনুভূতি এবং গূহ্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা অনেকটা স্বচ্ছন্দেই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ বা পরিবেশ পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই ঘনিষ্ঠতা কেন আরও একটু নিবিড় হবে না?

[পাঁচ]

হবে এটাইতো স্বাভাবিক। এবং এটাকে মেনে নেওয়াই হবে স্বাভাবিক।

কিন্তু ইদানীং একটা সংঘাত দেখা দিয়েছে এবং ব্যাপারটা এই জন্য বেশ জটিল হয়ে পড়েছে।

হয়তো বিজ্ঞানই এর জন্য দায়ী। প্রথমত মনোবিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে তার নিজের মনের গুহায়; শিল্পীর চেতনা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত প্রকৃতিবিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে মহাকাশের জ্যোতির্জগতে। এখানে মানুষ হয়ে পড়ছে বহির্বিক্ষিপ্ত। সাধারণ মানুষের মনে এই চেতনার প্রসার এক জটিল উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। আর্কষিত শিল্পীচিত্তে এই চেতনা নিশ্চয় আবেগ অনুভূতিকে একটা পথসন্ধিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দর্শনিকরা, সমাজবিজ্ঞানীরা বর্তমান জীবনের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও জটিলতাকে বিশেষ এক একটা ধারায় বা কাঠামোয় সম্বৃত করছেন। জীবনকে নিয়ন্ত্রিতও করছেন তাঁরা। অথবা বলা যেতে পারে এক একটা দার্শনিক চিন্তাভিত্তিতে জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এখানেই সংঘাত বাধছে শিল্পীর সঙ্গে। কারণ শিল্পীরা তো আদিম আবেগাতিশয্য থেকে বঞ্চিত হননি এবং হননি বলেই তো তাঁরা শিল্পী।

এখানে শুধু সর্তকবাণী দিয়েই আমার লেখাটি আপাতত শেষ করছি।

ইতিহাসের পুররাবৃত্তি হয় বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এ কথাটাকে পুরোপুরি মানতে অসুবিধা হওয়ায় একজন মনীষা মন্তব্য করেছেন : "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঠিকই হয়। তবে প্রথমে যেটা ছিল ট্রাজেডি, পরে সেটা ফার্স বা প্রহসনে পরিণত হয়।"

যারা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আকর্ষিত শিল্পীচিত্তের জটিলতার তথা অনুভূতি ও বাস্তবতা এবং চেতনার মিশ্রণগত জটিলতার সমাধানের পরিবর্তে ফিরে যেতে চান আদিম জীবনে, তাঁরা কি প্রহসন ডেকে আনবেন না? অথবা যাঁরা সুশৃঙ্খল দর্শনের সুস্পষ্ট কাঠামোতে শিল্পীচিত্তকে জুড়ে দিতে চেষ্টা করবেন সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির পথে চলবার জন্য, তারা কি শিল্পীমনকে শৃঙ্খলিত করবেন না?

ব্রিটিশ মার্ক্স্পন্থী লেখক এলিক ওয়েষ্ট বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বার্নার্ড শ' ঘূর্ণীবায়ুর কাঁধে সওয়ার হতে চেয়েছিলেন ঝড়ের চাকা ধরে গতি ঠিক করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ফ্যাবিয়ানবাদ তাঁর শিল্পীচিত্তকে চেপে রেখেছিল এবং এই জন্যই বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেখানে তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে বেশি আরোপিত করেছিলেন, সেখানে শিল্পকলা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তাঁর নাটকে এই তত্ত্বের স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়াতেই শিাল্পকলা আপেক্ষিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছে।

এর উপরে মন্তব্য 'নিষ্প্রয়োজন'; তবে বার্নার্ড শ'র অগ্রসর চেতনা ছাড়া কি শেক্স্পীয়রের নাটক থেকে সেন্ট জোয়ানকে তুলে এনে নতুন করে রূপ দেওয়া সম্ভব হতো? শেক্স্পীয়র যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে বার্নার্ড শ' সার্থক হতেন কি?

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

১

এক শতাব্দী আগে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর ইতালিয় অনুবাদের ভূমিকাতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, 'ইতালির শ্রমিকশ্রেণী থেকে নতুন দান্তে বেরিয়ে আসবেন।' শোষণমুক্ত সমাজের জন্যে শ্রমজীবী জনগণের লড়াই রূপের জগৎকে কীভাবে সঙ্গি হিসেবে দেখে, এঙ্গেলসের উক্তিটিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে। এক কথায় একে বলা যেতে পারে আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপের দিশা। যেমন এর বিশালতা, তেমনি এর গভীরতা। এ শুধু ভাব নয়, এ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত সৃষ্টি আর কাজ। দেশে দেশান্তরে যুগে যুগান্তরে মেহনতী মানুষের 'রূপ লাগি ঝুরে মন'। তার অসংখ্য অজস্র অভিব্যক্তি। সমস্ত অবক্ষয় ও আবিলতা ও মৃত্যুকে সরিয়ে সরিয়ে 'অভিনব ধরণী' গড়ার জন্যে মানবাত্মাকে অপরূপ রূপে সাজানো। এরকমের একটি প্রেষিত সামনে থাকাতে আমাদের অসমাপ্ত বিপ্লবের উপমহাদেশের সমস্ত দুঃখদৈন্যের ও বিকারের এবং আশাভঙ্গের মধ্যেও কমিউনিস্ট কবি মখদুম মহীউদ্দিন বলতে পেরেছেন, "আমি সূর্যকে পান করেছি।" কালো আফ্রিকার শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আমিলকার কাব্রাল মৃত্যুর আগেই লিখে রেখে গিয়েছেন, "মুক্তিযুদ্ধ একটা সাংস্কৃতিক দ্যোতনা। আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রভাণ্ডার যুগ-যুগান্তর ধরে গড়া গণ-মানবমানবীর রূপের জগৎ।" মায়াকভ্স্কি বলেছিলেন, "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, এসো বালতি ভরে নাও।" কখনও বলেছেন, "প্রাণের ঝর্ণা বয়ে চলেছে বাধাবিপত্তি ভেদ করে, পুরো ঠোঁট ডুবিয়ে পান করো।"

এই সত্যকে সচেতন কমিউনিস্টদের তো জানার কথা, বলার কথা। তবু, মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোথাও কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে বিচ্যুতি ঘটলে কিংবা সংকীর্ণ চিন্তা মাথা তুললে, যারা নিজেদের মার্কসবাদী মনে করেন তাঁদেরও কেউ কেউ বলে বসেন, 'সমস্ত যজ্ঞটাই পণ্ড। দোষটা কমিউনিজমেরই, দোষটা মার্কসবাদেরই।' আত্মগ্লানিতে এঁরা আশেপাশের আবহাওয়া ভারী করে তোলেন।

অথচ ইদানীংকার কত ঘটনাই তো আমাদের সামনে রয়েছে, যাতে নব নব ব্যবস্থায় কমিউনিস্টদের আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপের দিশা প্রমাণিত। শুধু প্রমাণিত নয়, প্রসারিত। দুটো ঘটনার কথা এখানে বলা যায়।

২

একটা ঘটনা ঘটেছে '৮১ সালের আগষ্ট মাসে। গ্রীসের বিশ্ববিদিত কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধা সুরকার মিকিস থিওডোরাকিস কিউবার রাজধানী হাভানাতে গণনাট্যের ধারায় একটি বিশেষ 'বৃন্দগান, আবৃত্তি ও বৃন্দবাদ্যের অনুষ্ঠান' পরিবেশন করেছেন। বিষয়-পাবলো নেরুদার 'সাধারণ গান' (ক্যান্টো জেনারেল) কাব্য। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যাহ্নে রচিত নেরুদার এই কাব্যগ্রন্থটি ইলিয়া এরেনবুর্গের ভাষায় নতুন ধরনের

উপন্যাস। ললিত ও কঠোর গাঁথুনিতে গাঁথা কোমল ও কঠোর চরিত্রাবলিকে নিয়ে লেখা খণ্ড খণ্ড কবিতার অগ্নিমালা। সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরের মুক্তি সংগ্রামের মর্মবাণী। কেন্দ্র হচ্ছে মেহনতী মানুষের জয়গাথা। মিকিস থিওডোরাকিসের পরিচালনায় একক গানে, সমবেত সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে এবং বৃন্দবাদ্য-সঙ্গতে অংশ নিয়েছেন গ্রীস এবং কিউবা ও অন্যান্য দেশের প্রায় দুশ কুশলী পুরুষ ও নারী শিল্পী।

এই উপলক্ষে হাভানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মিকিস বলেছেন, "নেরুদার মৃত্যুসংবাদে গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন একাধারে মহৎ প্রতিভা ও বিপ্লবী। তাঁর 'ক্যান্টো জেনারেল' আমাদের সময়ের মহৎ সাহিত্য- মহাকীর্তিসমূহের অন্যতম। সমসাময়িক শিল্পকলা, আমার মতে যা হওয়া উচিত, তার সঙ্গে 'ক্যান্টো জেনারেল' মিলে যায়। জনগণের প্রতি নিবেদিত এই শিল্পকর্মটির পরিধি হচ্ছে বিশাল। জনগণের সঙ্গীত আমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। এই জনগণের সঙ্গীতকে ভিত্তি করেই আমি কতকগুলো বিস্তারিত কাজ করেছি। 'ক্যান্টো জেনারেল' এদের একটি। আমার কাছে 'ক্যান্টো জেনারেল' কাব্য হচ্ছে গণ-নাট্য সঙ্গীত। বিশেষ করে যারা জনগণের জন্যে লড়াই, তাদের হৃদয়জোড়া এর প্রভাব। চিলিতে একভাবে এই কাব্যের সাঙ্গীতিক রূপ দেওয়া হয়েছিল, আমি তা শুনেছিলাম। আমি আরেকভাবে রূপ দিয়েছি। এর কারণ, রূপসৃষ্টির কোন বর্ডার নেই।"

মিকিস থিওডোরাকিস আরও বলেছেন যে, চিলিতে নেরুদা ও সালভাদর আলেন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ 'ক্যান্টো জেনারেল'-এর সঙ্গীতালেখ্য তৈরির জন্যে তাঁর সাধ ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে।

হাভানার এই অনুষ্ঠানের খবরে আরও জানা গিয়েছে যে, অনুষ্ঠানটি নেরুদার মাতৃভাষাভাষী দেশের মধ্যে কিউবাতেই প্রথম আয়োজিত হয়েছে। তবে, ইতিপূর্বে গ্রীসে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 'ক্যান্টো জেনারেল' মহাসমারোহের সঙ্গে শোনানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, মিকিস থিওডোরাকিস নিজস্ব অভিমতকে ব্যক্ত করার ব্যাপারে কখনও দ্বিরুক্তি করেন নি। তাঁর অভিমতগুলো সব সময়েই খাড়াখাড়া ধরনের। হাভানাতে এবারও তিনি বলেছেন, "আমার কাছে শিল্পকলা রাজনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত এবং আমি রাজনীতি বলতে বুঝি জনগণের স্বাধীনতা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্যে সংগ্রাম।" তিনি বলেছেন, তাঁর মাতৃভূমি গ্রীসকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। 'ক্যান্টো জেনারেল'কে তিনি বেছে নিয়েছেন ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে। 'ক্যান্টো জেনারেল' আমাদের বিশ্বের জনগণের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাতে উদ্দীপিত।

মার্কসবাদ ও কমিউনিজমে সুদৃঢ় আস্থা ও প্রত্যয় নিয়েই নেরুদার রূপের বিস্তৃত জগৎকে মিকিস থিওডোরাকিস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন নতুনতর ভাবে, কারণ তাঁর কাছে শিল্পকলার কোন বর্ডার নেই।

৩

আরেকটা ঘটনা সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরিতে একটি বিশেষ রূপের জগতের চর্চা। এই রূপ আমাদের উপমহাদেশেরই বৈভব। এর সাধক একজন হাঙ্গেরিয় ডঃ চার্লস ফাবরি। সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরি ডঃ ফাবরিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তাঁর জন্ম হাঙ্গেরিতে ১৮৯৯ সালে। মৃত্যু ১৯৬৮ সালে ভারতে। বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হবার পরে ড. ফাবরি ইউরোপের দেশেদেশান্তরে বসবাস করছিলেন এবং তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে, তখন তাঁকে একজন পুরাতত্ত্ববিদ ও ললিতকলার জহুরী হিসেবে ১৯৩৩ সালে শান্তি-নিকেতনে বক্তৃতা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণ জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই তাঁর ভারতে আসা। এরপর তিনি লাহোর মিউজিয়ামে কাজ করেন এবং হরপ্পা খননে অংশ নেন। ১৯৩৯ সালে বৃটেনের নাগরিক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিয়ে জাহাজে লণ্ডন যাবার সময় 'দি ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যামিংগো' নাম দিয়ে একটি উপন্যাস লেখেন। বৌদ্ধ শিল্পকলার দেবী মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি এবং বাস্তবিকই গোলাপী শাড়ি পরা লাহোরের এক মহিলার প্রতীক ছিল ভারতীয় হংসী। এতে আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রয়াসের এবং প্রয়োজনের কথাটা বড় হয়ে উঠেছে। আরেকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী অগ্নিহোত্রী' নাম দিয়ে। এটিও বর্তমান উপমহাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে লেখা। আনন্দ কুমারস্বামীকে তিনি গুরু বলতেন। কিন্তু যেখানে ভিন্ন মত হতেন সেখানে চুপ করে থাকতেন না। ড. ফাবরি 'ওড়িসি' নৃত্য এবং দ্রাবিড় ও দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি এদের মধ্যে হরপ্পা, মহেনজোদারো এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। বুদাপেস্ট থেকে ১৯৮০ সালে ড. চার্লস ফাবরির উপরোক্ত জীবনকথা এবং পুরাতত্ত্ব ও রূপ-চর্চার এবং 'ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যামিংগো' উপন্যাসের একটি সঞ্চয়ন প্রকাশ করা হয়েছে। আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপের দিশারী ড. চার্লস ফাবরি সম্বন্ধে এই সঞ্চয়নে যেসব টুকিটাকি খবর রয়েছে, সেগুলির মধ্যে একটি ঘটনা মর্মস্পর্শী। ড. ফাবরি শৈশবে বুদাপেস্টে রুশ ব্যালে-নাচ দেখেছিলেন। প্রধান ব্যালে নৃত্য-শিল্পীর সঙ্গে তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন এবং এই শিল্পীর ছোট ছোট হাতের তারিফ করেন। সেই শিল্পী কিন্তু তাঁকে বলেছিলেন, হাতগুলো বড়ো হলেই বরং ভাল হতো, কারণ তিনি তাহলে হাতের মুদ্রাগুলিকে দর্শক মণ্ডলীকে আঁকা স্পষ্ট করে দেখাতে পারতেন। চার্লস ফাবরির মনে এই কথাগুলি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। নাচের প্রতি তাঁর রূপসন্ধানী মন ব্যালে নাচ থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ফাবরি এই ব্যালে নাচের প্রতিচ্ছবি পেয়েছেন ওড়িসি ও কথক নাচে।

আমাদের উপমহাদেশের রূপের জগতের প্রসার ঘটাবার ব্যাপারেও মিকিস থিওডোরাকিসের ভাষায় বলা যায়, শিল্পকলার কোন বর্ডার নেই।' এটা হাঙ্গেরিয় কমিউনিস্টরাও দেখিয়ে দিলেন।

কমিউনিস্ট সৌন্দর্যতাত্ত্বিক লুকাচের মাতৃভূমি হাঙ্গেরি যেমন তার সন্তান লুকাচকে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক বলে মনে করে, তেমনি ড. চার্লস ফাবরিকে নিয়েও তাদের গর্বের সীমা নেই। ভারতীয় পিতা ও হাঙ্গেরিয় মায়ের সন্তান অমৃত শেরগিলের আঁকা অনেক ছবিও সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরি ছেপে বার করেছে।

কমিউনিজম তথা মার্কসবাদের জন্যেই এ কাজগুলো হচ্ছে। তবে তাঁরা কোন 'বর্ডার রাখছেন না', কারণ মেহনতী মানুষের পৃথিবীতে কোথাও বর্ডার নেই।

৪

একটি বই-এর কথা বলা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। নাম 'মীরাটে ষড়যন্ত্র' (Conspiracy at Meerat)। লেখক লেস্টার হাচিনসন। বিষয় ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের উপমহাদেশের আলোছায়া রূপ। জেলখানারও চেহারা দিয়েছিলেন। হাচিনসন, স্প্রাট আর ব্রাডলি এখানে এসেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে সাম্রাজ্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের শ্রমিক-ভিত্তি তৈরির কাজে সহায়তা করার জন্যে। তাঁরা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বইটি এই অভিজ্ঞতার ফসল। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে বিপ্লবের আয়োজনটাই ছিল উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা রূপের জগৎকে সঙ্গী করে চলেন, তার সাক্ষী এই বই।

এতে শুরুতেই আছে ইতালি হয়ে জাহাজে চড়ে বোম্বেতে এসে নামার কথা। ইতালিতে কয়েকদিন ছিলেন। এক কথাতেই সেরেছেন। লিখেছেন, তাঁর মনে হয়েছিল, ইতালির আকাশটি সুন্দর, কারণ ফ্যাসিস্টরা একে ছুঁতে পারেনি। আরেকটি সুন্দরের কথা আছে। গড় মুক্তেশ্বরের মেলায় সন্ধ্যা-রাতে স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীরা নদীতে যে প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছিল, সেগুলিকে ভেসে যেতে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, এদের ধর্মে অনেক ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সে নিঃসন্দেহে সুন্দর। গ্রামাঞ্চলের তরুণী যুবতীদের গর্বিত ও শক্তিশালী চলার ভঙ্গী দেখে তিনি বলেছিলেন, এরা দেবীপদবাচ্যা।

হাচিনসন ছিলেন কৌতুক এবং পরিহাসপ্রিয়। উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ও জেলখানার গরাদকেও তিনি কৌতুকে বিদ্ধ করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার তিনি 'The Empire of the Nations' এর লেখক। কমিউনিজম বা মার্কসবাদ যদি বিশেষ করে প্রাচীন ঐতিহ্যের রূপচর্চাকে দূরে রাখতো, তাহলে তিনি নিশ্চয় গড় মুক্তেশ্বরের মেলার নদীতে প্রদীপ ভাসাবার ব্যাপারটা নিয়ে এতটা আবেগ প্রকাশ করতেন না। তখনও সমাজতন্ত্র মাত্র একটি দেশে জয়ী হয়েছে এবং কমিউনিজমের সৌন্দর্যতত্ত্বেরও পরীক্ষাগার সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে। তখনকার তুলনায় ষাট সত্তর বছর পরে আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ দেখার ব্যাপারে যে অবিশ্রান্ত প্রসার ক্রমাগত ঘটে চলেছে, তার সম্মতি পেলে হাচিনসন কোন কোন ব্যাপারে তার সুন্দরকে বুঝতে পারার অপারগতাকে কাটিয়ে উঠতে পারতেন।

৫

হো চি মিনের একটি বক্তব্য দিয়ে প্রসঙ্গের শেষ করবো। হো চি মিন কমিউনিস্ট ছিলেন। তার কবিতাতে কমিউনিজম কোন বর্ডার সৃষ্টি করে নি। তিনি সুন্দরকে আর কমিউনিজমকে একাঙ্গ করেছেন। ভিয়েতনামের মানুষ যে সুন্দরকে চিনেছে, তারই ভাষাতে তিনি এই সংজ্ঞা দিয়েছেন। ভিয়েতনামে প্রাচীনকালের একটা জরীর থলে সম্বন্ধে প্রবাদ রয়েছে। এর মধ্যে হাত দিলে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায়। হো চি মিন বলেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এই জরীর থলে।

হো চিন মিন অবশ্য জানতেন এবং জানিয়েও গিয়েছেন যে, বুকের রক্ত ঢেলে মুক্তিযুদ্ধ করে সৃষ্টি সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হয়।

মার্কসীয় বাতাবরণ : শতাব্দীকালের সাহিত্যে

১

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এবং ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের পথিকৃৎ ও রচয়িতা কার্ল মার্কসের জীবনাবসান হয়েছিল ১৮৮৩ সালে ৬৫ বছর বয়সে। ১৯৮৩ সালে এই ঘটনার শতবার্ষিকী সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লবের গত এক শতাব্দীকালের প্রাণবন্ত ধারার কার্যকারিতার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কাজ চলতে থাকবে। দেশে-দেশান্তরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে মার্কসীয় অবদানও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তারই সূত্রে এখানে দুচার কথা লেখা। সাহিত্য অবশ্য একটা খরস্রোতা নদীর মতো। এখানে বর্তমানই চোখই বেশি টানে। সেইজন্য অতি সাম্প্রতিককে সামনে আনতেই হবে। সেটা আনবো। তবে অতীতের নানা রং এর দিনগুলিকে কয়েক মুঠো হলেও আনতেই হবে।

২

সাধারণভাবে সাহিত্যের দুটি অন্যতম প্রধান ধারা। একটি সৃষ্টিমূলক ও আরেকটি তাত্ত্বিক। মার্কসীয় ক্ষেত্রে তাই। সৃষ্টিমূলক ধারায় মার্কসীয় বাতাবরণের প্রাধান্য। তাত্ত্বিক ধারায় মার্কসীয় সূত্রের প্রাধান্য। সৃষ্টির দৃষ্টান্ত গোর্কির 'মা', ব্রেখ্‌টের নাটক, মায়াকভস্কি ও হো চি মিন ও পাবলো নেরুদার কবিতা, লু সনের গল্প। তত্ত্বের দৃষ্টান্ত গোর্কি, ফিনকেলস্টাইন, লুকাচ, লুই আঁরাগ, রালফ ফক্‌স ও ক্রিস্‌টোফার কডওয়েলের বই। তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের লেখাও এর মধ্যে পড়ে। একেবারে ঘরোয়া দৃষ্টান্ত গোপাল হালদারের উপন্যাস 'ত্রিদিবা' এবং নিবন্ধের বই 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। প্রথমটি সৃষ্টিমূলক, দ্বিতীয়টি তাত্ত্বিক। একই ব্যক্তির সৃষ্টি ও তত্ত্বের কাজ থেকে দুটি ধারাকে বিশিষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ও নিবন্ধে ভিন্ন মেজাজ ও পদ্ধতি। যেমন রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভল্‌গা থেকে গঙ্গা' এবং 'মানবসমাজ'। একটি উপন্যাস, আরেকটি নিবন্ধ। পদ্ধতির দিক দিয়ে দুটি ধারা কখনও কাছাকাছি আসতে পারে, কখনও সম্পর্কটিকে খুঁজে বার করতে হয়। অবশ্য মার্কসীয় বাতাবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লব এবং এদের বাতাবরণ গত এক শতাব্দীর সাহিত্যের সমস্ত রকমের আঙ্গিকের কাজের মুক্তধারাকে কিভাবে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করে আসছে, তার একটা ধারণা উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে করা যেতে পারে বলে আশা করা যায়।

ব্যাপারটা বিশ্বব্যাপী। ছোট ও বড় দেশ নির্বিশেষে কাজ হয়েছে গভীরভাবে ও বিস্তারিতভাবে। সুতরাং, বিশদভাবে কোথায় কি হয়েছে জানাতে গেলে শুধু মাত্র নাম করেও কুলানো যাবে না। সারা বিশ্ব জুড়ে আদিম গোষ্ঠীতন্ত্রের আওতায় রয়েছেন

এমন অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত শিল্পোন্নত বিশ্ব-নাগরিকতার মানসিকতা নিয়ে জীবনযাপন করছেন কোটি কোটি নাগরিক যাঁরা মার্কসীয় বাতাবরণে প্রভাবিত। এই অবস্থায় কতকগুলো মূল প্রশ্ন ও বৈশিষ্ট্যকে মাত্র তুলে ধরেই সাহিত্যের মার্কসীয় ধারার অবদানকে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝবার চেষ্টা করছি।

৩

প্রথমেই একটা প্রশ্ন পরিষ্কার হয়ে থাকা দরকার। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে মার্কসীয় সূত্র ও বিপ্লব এবং উভয়ের বাতাবরণকে কিভাবে ও কতখানি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাই আমাদের দেখা উচিত। মার্কস কিংবা বিশিষ্ট মার্কসবাদীদের অথবা এদের লেখা কোন বিশেষ বই বা সূত্রের উল্লেখ থাকা-না-থাকা নিয়ে কোন সাহিত্যের কাজের মূল্য যাচাই করা উচিত নয়। মার্কসের অথবা তাঁর লেখার কোন উল্লেখ থাকলে যেমন বাড়াবাড়ি করে দেখা ঠিক নয়, তেমনি না থাকলে সেই সাহিত্যের কাজ মার্কসীয় বাতাবরণের বাইরে পড়ে যায় না।

বেশ কিছুকাল আগেকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য সময়কালের শুরুতে ১৮৮০'র দশকে যুবক বার্নার্ড শ 'আনসোস্যাল সোসিয়ালিস্ট' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। এর একটা ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, মার্কসের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়ে তাঁর অর্থনীতির ধারণা আমূল বদলে গিয়েছিল। এই উপন্যাসটিও ছিল, সমাজ সম্বন্ধে বোধোদয়, সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-ঘেঁষা। এতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দারুণভাবে নিন্দিত এবং নতুন সমাজব্যবস্থার জন্যে চিন্তাচেতনার তাগিদ ছিল। কিন্তু একে কখনও কেউ মার্কসীয় তত্ত্বের প্রলেতারীয় উপন্যাস বলে দাবি করেননি। অপরপক্ষে টমাস হার্ডির 'টেস্' উপন্যাসে কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই এক গ্রামীণ সর্বহারা নারীর বঞ্চিত জীবনের কাহিনী রয়েছে এই উপন্যাসে বাস্তব বর্ণনার পটভূমিতে। টমাস হার্ডি 'ক্যাপিট্যাল' পড়েছিলেন কিনা সেকথা কেউ বলেননি। তবে তিরিশের দশকের এক বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্য সমালোচক 'টেস'কে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম প্রলেতারীয় উপন্যাস বলে অভিহিত করেন। তিনি ইংলান্ডের কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের দাপটে সর্বহারা কৃষিমজুরদের বঞ্চিত জীবনের প্রতীক হিসেবে 'টেস'কে বিচার করেছেন। এই দুটি উপন্যাসের পাশাপাশি তলস্তয়ের 'রিসারেকসান' উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৯০ সাল নাগাদ তলস্তয় 'রিসারেকসা' লিখেছিলেন। এই উপন্যাস তাঁর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তের কাজ। এতে যেমন উদগ্র মানবিকতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাত্ত্বিকতা যার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ধরনের খ্রীষ্টীয় সমাচার রয়েছে। শেষের দিকে এক জায়গায় তিনি কার্ল মার্কসের ক্যাপিট্যাল বইটির নাম করেছেন নির্বাসিত বিপ্লবীদের চিন্তাধারার প্রসঙ্গে। এই নামোল্লেখ নিয়ে 'রিসারেকসান' উপন্যাসের মার্কসীয়তা বিচার করতে যাওয়াটা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, মার্কসীয় বাতাবরণের ছাপ আগের দু'টি বইএর মতো এতেও পড়েছে। তলস্তয়ের পছন্দ-অপছন্দকে অতিক্রম করেছে জীবনসত্য।

এবার কাছাকাছি সময়ের কয়েকটা ঘরোয়া উদাহরণ দেয়া যাক খানিকটা বিস্তারিতভাবেই।

আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ শতকের বিশের দশকে মার্কসীয় বাতাবরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ১৯১৭ সালের রুশ সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে। সোভিয়েত বিপ্লবের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সারা বিশ্বে সঞ্চারিত হওয়াও এর একটি কারণ। কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কাব্যে এর সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রমজীবী জনগণের বিদ্রোহের ব্যাপারটাতে শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়েই শিবরাম চক্রবর্তীর কাব্য ও তত্ত্বের আবির্ভাব মস্কোপন্থী হিসেবে। 'পথের পাঁচালী'র রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া লেখক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাসটির উল্লেখ করা দরকার এখানে বিশেষভাবে। এই উপন্যাসে নায়ক অপূর্বের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও আত্মীয় প্রণব যে কমিউনিস্ট হয়ে গেলো তাই নয়, অপূর্ব স্বয়ং এর আরণ্যক অধ্যায়ে মেহনতী মানুষদের নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা করেছে, সেগুলি কমিউনিস্টদের পক্ষে যেতে পারতো। অপূর্ব আর প্রণব পরস্পরের পরিপূরক। এরা বিরোধী নয়। অপূর্ব তার রোমান্টিক ধারায় দেশ-দেশান্তরের পরিক্রমায় যাবার সময় বন্দী কমিউনিস্ট প্রণবকে চিঠি লিখে যায়।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার এই দিকটাকে সাধারণ আলোচনায় কোন আমলই দেয়া হয়নি। এই দিকটাকে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার নিরীক্ষায় আনা দরকার তাঁর সমস্ত সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে ধারণার জন্যে। তবে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অথবা 'অপরাজিত' উপন্যাসকে মার্কসবাদী বলাটাও খণ্ডিত বিচার হয়ে যাবে।

এইভাবেই 'পথের দাবী' ও 'রক্তকরবী'কে দিয়ে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন অন্যান্য সাহিত্যকৃতিকে ছাপিয়ে গেলে সেটাও খণ্ডিত বিচার হবে। এমন কি কাজী নজরুল ইসলামকে একজন পুরোদস্তুর মার্কসবাদী বলে দাবী করলে মার্কসীয় তত্ত্বের যে একটা অবিভাজ্য দিক আছে তাকে লঙ্ঘন করা হবে।

তবু বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের কাজগুলিতে মার্কসীয় বাতাবরণ অবশ্যই কাজ করেছে। আমাদের বক্তব্য এর বেশি নয়।

আরেকটি কথা।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারার উল্লিখিত শিল্পীদের সাধনার ধারাটিও বিবেচনার দাবীদার। এঁরা সকলেই জীবনশিল্পী হিসেবে জীবন সত্যকে সমস্ত অন্তর ঢেলে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মন ছিল খোলা। শুধু বাস্তবের জন্যে নয়, সম্ভাবনার জন্যেও। আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গণঅভ্যুত্থানের কর্মসূচিতে বিশের দশকে যুক্ত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব। এর যতটাছিল বাস্তব, তার চেয়ে বেশি ছিল সম্ভাবনা। আমাদের সাহিত্যের জীবনশিল্পীরা বাস্তবের পাশাপাশি এই সম্ভাবনাকে বড় করে দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বাস্তবের চাইতে কল্পনার বাড়াবাড়ি রয়েছে বলে যে অভিযোগ আমরা অনেক সময় নিজেরাই করে থাকি, সেই বিচারবুদ্ধি এক্ষেত্রে কোন

দ্বিধার সৃষ্টি করেনি। সাহিত্যে সম্ভাবনাকে নিয়ে যে বড় কাজ হয়, তারই প্রমাণ বরং এই আলোচ্য লেখাগুলিতে রয়েছে। মার্কসীয় বাতাবরণ এই প্রয়াসকে সুস্থিত করেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের এবং উপন্যাস ও গল্পের এবং নিবন্ধের মার্কসীয় সত্তার ব্যাপারটা নিয়ে বিতর্কের খুব বেশি অবকাশ নেই। তিনি তো আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বাংলাভাষ্যের রচয়িতাও। কিন্তু শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুটি কাজের মার্কসীয় চরিত্র বিতর্কিত হতে পারে। অন্তত 'রক্তকরবী'র অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। এখানে আমাদের যুক্তিটা খুব সংক্ষেপে দিয়ে রাখছি।

শরৎচন্দ্র যখন 'পথের দাবী' লিখছেন, তখন কল্লোলযুগের নবীনেরা সমাজের নীচুতলার নরনারীর কলরবকে সাহিত্যে আনছেন কোদালকে কোদাল রূপে চিত্রিত করে। শরৎচন্দ্র কিন্তু রেঙ্গুনের কারখানার শ্রমিকদের একেবারে মাঝখানে 'পথের দাবী' সমিতিকে বসিয়ে নীচুতলার মানুষকে এক বিশাল আয়তন দিয়ে দিলেন। এদের জীবনের মধ্য থেকে তিনি বার করে আনলেন সব্যসাচীর স্বাধীনতা ও সাম্যের বিপ্লবী তত্ত্বকে। সারা উপন্যাস জুড়ে সব্যসাচীর বিশ্বজোড়া বিপ্লবের ব্যাখ্যার দৈর্ঘ্য সে সময়ে কারও কারও চোখে রসহানি বলে মনে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র পরবর্তী সময়ের জন্যেও লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাসটি।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' শতাব্দীকালের জন্যে লেখা। শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে তো নিশ্চয়ই। একে বর্তমান ভারতবর্ষের জাতীয়-সংহতির একটা জরুরি-কাজ বলেও প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। সব্যসাচীর বিপ্লবের জন্যে যারা সমবেত হয়েছেন তাঁরা সকল ধর্মের সকল বর্ণের সকল অঞ্চলের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটিও লেখা হয়েছিল কল্লোলযুগের শুরুতে। এর একটা প্রতীকী আবরণ রয়েছে। কিন্তু সেটি নিমিত্ত মাত্র। কারণ, রবীন্দ্রনাথ এর যে ভূমিকা লিখেছেন, তাতে চটকলের বস্তিতে 'মরতে আসা' মজুর ও মজুরনীদের সামনে রেখেই যে বাস্তবকে এঁকেছেন তা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেকার লেখা 'অচলায়তন' ছিল শাস্ত্রের লৌহবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'রক্তকরবী' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আলোড়িত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই নাটক। এখানে অবশ্য নানা রকমের টানাপোড়েন রয়েছে। সেগুলো আংশিকভাবে সেই সময় বাস্তব; কতকগুলো আবার রবীন্দ্রমানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। তবে যে কবি আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে 'বিশ্বপরিচয়' লিখেছেন, তিনি মার্কসীয় অর্থনীতির তর্কবিতর্কও একেবারে শোনেননি, তা বলা যায় না। এখানে শুধু তাঁর সাঁওতাল মেয়ে কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি তাঁর চিন্তার আয়তন কিছুটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে:

> আমার মাটির ঘরখানা
> আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা
> ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে।
> ঈষৎ সংকোচে ভাবি, এ কিশোরী মেয়ে
> পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
> করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
> নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনকরা

শুশ্রূষার স্নিগ্ধ সুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁদকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে
নিয়ে আসে মাটি।

(৪ঠা মাঘ, ১৩৪১, শান্তিনিকেতন)

৪

বিশের দশকের পরের পঞ্চাশ বছরে মার্কসীয়-বিপ্লবের সম্ভাবনার বাস্তব অংশ প্রসারিত হয়েছে। এই সময়ে প্রথম দিকে গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' লেখা এবং 'ত্রিদিবা' উপন্যাসের শুরু। তবে তিরিশের এবং চল্লিশের দশকে মার্কসীয় ধারায় যাঁরা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন তাঁরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা বহু প্রচারিত। এঁরা দৃষ্টান্ত হতে পারেন।

এঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর মার্কসীয় ধ্যানধারণাকে খোলাখুলি স্বীকৃতি দিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তিনি তিরিশের দশকের দিন বদলের পালা নিয়ে মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখেছেন। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' দৃষ্টান্ত। চল্লিশের দশকেও এই ধারাকে তিনি ছাড়েননি। প্রমাণ 'মন্বন্তর' উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকের শেষের দিকে 'শহরতলী' উপন্যাসকে শ্রমিক আন্দোলনের কাজে লাগান। চল্লিশের দশকে তিনি তিরিশের দশকের তারাশঙ্করের স্থান নেন। তারাশঙ্কর কংগ্রেসের সমর্থক থেকে যান এবং এদিক দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে মার্কসবাদকে সামনে আনার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে পরিষ্কার কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার ফলে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাঁর তরফ থেকে সরাসরি কাজ বেরিয়ে আসে। তিরিশের দশকের শুরুতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্ট হবার ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক ছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত মতাদর্শেরও সংঘাত। চল্লিশের দশকে এই মতাদর্শের সংঘাতকে পুরোভাগে রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনেই অবশ্য আমাদের উপমহাদেশের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন বরাবর। এই আন্দোলন ছিল মার্কসীয় বাতাবরণেরই সৃষ্টি। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি প্রেমচাঁদের অভিভাষণটি স্মরণীয়। তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালে প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে বসে সর্বাঙ্গীণভাবে একমত হতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা কেউ মৃত্যু পর্যন্ত প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলন থেকে সরে যাননি।

'৪৭ সালের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার নতুন নতুন পরীক্ষার পটভূমিতে একটা অভিযোগ উঠেছে যে তত্ত্ব তাঁর দৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। ইদানিং কেউ কেউ এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিটাই খুব সংকীর্ণ। বস্তুতপক্ষে '৪৭ সালের পর সারা উপমহাদেশের সঙ্গে সঙ্গে দুই বাংলায় গণজীবন ও

ব্যক্তিজীবনের যে বিপর্যয় ঘটে এবং বিপ্লবের ধারাকে নতুন করে তুলে আনবার জন্যে যে সামগ্রিক প্রয়াসের প্রয়োজন পড়ে, তাকে চোখের সামনে রাখলে বরং বলতে হবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরে থেকে সেই সময়ের বিপর্যয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সত্যস্বরূপকে সাহিত্যে স্থাপন করতে পেরেছেন।

দিনবদলের নতুন পালার জটিলতা ও ব্যাপকতার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের বিপ্লবের অসমান ও আঁকাবাঁকা ধারাকে পুরোপুরি আয়ত্ত না করতে পারার ফলে সাহিত্যের সৃষ্টিতে ব্রতী লেখক-লেখিকাদের অন্তর্জ্বালাটা কি বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত নয় আমাদের। এমনকি তারাশঙ্করের মনেও ছিল অসন্তোষ। এঁকে 'ফ্রাস্ট্রেসান' বলা যেতে পারে।

সুতরাং আমরা বলবো, দোষটা মার্কসীয় তত্ত্বের নয়। বরং, নানা কারণে আমাদের সাহিত্যে মার্কসীয় তত্ত্বকে পরিহার করে চলার একটা প্রবণতার দরুন দিনবদলের মর্মবাণীকে উচ্ছলভাবে বিশের, তিরিশের এবং চল্লিশের দশকের মতো পাওয়া যাচ্ছে না। একটা নেতিবাচকতার হাওয়া সাহিত্যের আশাবাদকে মুষড়ে দিতে চাইছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নেতিবাচক হওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির ধারাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যে সৃষ্টির ধারা আর তাত্ত্বিক ধারা এক নয় বলেই শিল্পীর মনের চূড়ান্ত যন্ত্রণা অবিশ্রান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে চায়। এই সত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শুরুতেই একটি কৈফিয়ত দিয়ে নিয়েছি যে, এই আলোচনায় কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র দাখিল করবো। সুতরাং পাঠক পাঠিকারা আলোচ্য সমগ্র সময়ের সমস্ত নামী ও অনামী কবি কথাশিল্পীদের কাজের নিজ নিজ হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে উপরোক্ত প্রশ্নটিকে খতিয়ে দেখবেন এই অনুরোধ।

এখানে বিশিষ্টভাবে গত তিরিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের একজন দুর্ধর্ষ তাত্ত্বিক ও শিল্পীর নাম শুধু করবো। তিনি হলেন বাংলাদেশের কবি ও নিবন্ধকার হাসান হাফিজুর রহমান। মাত্র ৫০ বছর বয়সে '৮৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চার আদর্শের বিপ্লবী ধারাকে প্রথমাবধি লালন করে আসছিলেন তাঁর কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে; ওই চার আদর্শ জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র। '৫২ সালের রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারির গণঅভ্যুত্থানের ভাষ্যকার হিসেবে ছাত্রজীবনে তাঁর কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল নিজস্ব শৈলীতে। আধুনিক বাংলা কবিতার জটিল মানসের অভিব্যক্তি পাওয়া যায় ওই কবিতায়; তিনি আমৃত্যু এই ধারাতেই বাংলাদেশের বিপ্লবকে রূপ দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি লিখেছেন বাংলাদেশের সমৃদ্ধতম প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর লেখা তাঁর প্রবন্ধ দুই বাংলার শতাব্দীকালের একটি সম্পদ।

মার্কসীয় বাতাবরণ তার নিজস্বতাকে বিকশিত করে তুলবার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। তাঁকে আমরা বাংলাদেশের পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁর সমাহার বলতে পারি। এই দুই ফরাসি কবির মতো হাসান হাফিজুর রহমানকেও প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন নতুন শৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। দাপটের

সঙ্গেই তিনি সেটা করে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই আমরা আরেকটি বিষয়ে এসে পড়ছি।

৫

গত শতাব্দীকালে সাহিত্যে মার্কসবাদ যে অবদান রেখেছে, সেটা অনুকূল পরিবেশে ঘটেনি, প্রধানত প্রতিকূল পরিবেশেই ঘটেছে। বিপ্লব যেসব দেশে সফল হয়েছে, সেখানেও সাহিত্য সৃষ্টি ও তত্ত্বের ধারা নতুন সমাজ গড়ার দুঃসাধ্য প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে। অন্যত্র মূলেই বাধা এসেছে অচলায়তনের মনিবদের তরফ থেকে। কখনও মারমূর্তিতে, কখনও রক্তকরবী নাটকের রাজার কায়দায়। বাধা একেবারে ভিতর থেকে। ফ্যাসিস্টরা উৎখাত করতে চেয়েছে লেখক-লেখিকাদের। বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা লেখক-লেখিকাদের ওপর প্রচ্ছন্ন চাপ দিয়েছে কিংবা কিনতে চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এটা চলছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাহিত্যে মার্কসীয় বাতাবরণকে একটা নতুন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা হচ্ছে যুদ্ধবাজদের স্নায়ুযুদ্ধ। বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ফ্যাসিবাদীরা অধিকাংশ লেখক-লেখিকাকেই ইতিপূর্বে বৈরি করেছিল, তাদের কাজকে মূল্য দিতে চায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের দুর্নিবার প্রবাহকে প্রতিহত করার স্নায়ুযুদ্ধের খাতিরে সাহিত্যে সরাসরি দখল নিতে চেষ্টা করে আসছে। ভাবাদর্শের লড়াই স্নায়ুযুদ্ধের বড় ভাগীদার। সাহিত্য ভাবাদর্শের বাহন। এই জন্য সাম্রাজ্যবাদ সাহিত্যে শিবির গড়েছে এবং এই শিবিরে লেখক-লেখিকাদের ছলে বলে কৌশলে ঢোকাবার জন্য একটা রণনীতি গড়ে তুলেছে। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ কোন মানবিক মূল্যবোধ জোগাতে অসমর্থ, সেজন্য তার সাহিত্য শিবিরের ভাবাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানবজীবনের অর্থহীনতা ও নৈরাশ্য, নিছক জৈব জীবনের উৎপ্রেক্ষা।

সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির সাহিত্য-তাত্ত্বিক গিওর্গি লুকাচ সাম্রাজ্যবাদের এই স্নায়ুযুদ্ধের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে তাঁর নব প্রকাশিত 'যৌক্তিকতার বিনাশ' বা 'দি ডেস্ট্রাকশন অব রিজন্' বইটিকে নিয়োজিত করেন। এতে তিনি দেখান যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হিটলারের স্থান গ্রহণ করেছে এবং মানুষের বিচারবুদ্ধির বিনাশ সাধন করে একটা উন্মত্ত জনমতকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নতুন বিশ্বযুদ্ধে নিয়োজিত করার চেষ্টা করছে।

বইটি প্রধানত দর্শনভিত্তিক। তবে লুকাচ বিশেষ করে বইটির উপসংহার অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিভাজন ও বিভ্রম সৃষ্টির প্রয়াসগুলিকে উদঘাটিত করেছেন। '৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরই যে সাম্রাজ্যবাদের ওই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণও এই বইতে রয়েছে। অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বিশিষ্ট লেখক সেদিন শূন্যতাবাদের পরিপোষক হিসেবে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের পক্ষভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, লুকাচ তার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবসমাজের তরফ থেকে যৌক্তিকতার নব-অভ্যুদয়ের সমাবেশ হিসেবে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসকে লুকাচ আশার পতাকা হিসেবে স্থাপন করেছেন

বইটিতে। সার্ত্রের মতো লেখকরা সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এই তাঁর বক্তব্য।

সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের একটা বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় বিভীষিকা ও সন্ত্রাস। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্টদের সঙ্গে অতীতে কোন সময় সাধারণ মেলামেশার জন্যেও শতশত সাংস্কৃতিক কর্মী ও লেখক-লেখিকাদের রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা ছাড়াও নানাভাবে নিগ্রহ করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মার্কসবাদী সংগঠনের ওপর প্রচণ্ড নিগ্রহ তো নেমে আসেই। চার্লস চ্যাপলিনকেও তাঁর কর্মভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সপরিবারে বেরিয়ে আসতে হয়। তাঁর স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নাট্যকার ইউজিন ও'নিলের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও স্বামী ও পুত্রকন্যা নিয়ে দেশত্যাগ করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। মার্কসবাদী লেখক-লেখিকাদের তো কথাই নেই, সাধারণ বিবেকসম্পন্ন লেখক-লেখিকাদের যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা চার্লস চ্যাপলিনের লাঞ্ছনা থেকেই বুঝতে পারা যায়।

সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযুদ্ধের যে তল্পীবাহকেরা বিভিন্ন দেশে সাহিত্যের মার্কসীয় বাতাবরণকে নষ্ট করে দেবার জন্য প্রয়াস আজও চালিয়ে আসছে, তারা স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখক-লেখিকাদের নিগ্রহের ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চায়। সাধারণভাবে এই অধ্যায়টা চাপা পড়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিশ্ববিদিত লেখক ১৯৪৮ সালের বিভীষিকার দিনগুলিকে তাঁর একটি নতুন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। এই লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট। উপন্যাসের নাম 'দি এস্টাবলিশমেন্ট'। ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রকাশিত।

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ উপন্যাসে রয়েছে ১৯৪৮ থেকে '৫০ সালের ঘটনাবলি। এতে ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কোরিয়ার যুদ্ধের সূচনা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছাড়া বাদবাকী সবটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জীবনের ছবি। উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছে একটি বিত্তবান পরিবারের লেখিকা কন্যা। এই কন্যা বিয়ে করেছিল স্পেনে প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষে যোগদানকারী আন্তর্জাতিক লিনকন্ ব্রিগেডের একজন মার্কিন ইহুদী স্বেচ্ছাসেবীকে। এদের পরিচয় হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বমুহূর্তে প্যারিসে। মেয়েটি তখন একজন লেখিকা হিসেবে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সংস্পর্শে আসে। যুদ্ধ বাঁধার পরে দেশে ফিরে আসে। এটা হচ্ছে পশ্চাদ্‌পট। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, গোয়েন্দা পুলিশ মেয়েটির খোঁজ খবর নিচ্ছে। ব্যাপারটা মেয়েটির পরিবার পরিজনের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল। বিশাল বিত্ত এদের সকলের। কালিফোর্নিয়ার সর্বত্র ছাড়ানো। মেয়েটির ভাই তখন এস্টাব্লিশমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। এস্টাব্লিশমেন্টের অর্থ হচ্ছে সেই বৃহৎ পুঁজিপতিচক্র, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা। মেয়েটি অবশ্য ভিন্ন ধরনের। সে বরং তার অর্থসম্পত্তিকে একটা সেবাসংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। এই সেবাসংস্থার সূচনা হয়েছিল স্পেন থেকে ১৯৩৮-৩৯ সালে ফ্রান্সে শরণার্থী আহত প্রজাতন্ত্রীদের চিকিৎসার জন্যে। সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ছিল না, কিন্তু শ্রমিক ধর্মঘটের সময় সাহায্য কেন্দ্র কাজ

করেছে। লেখাই এখন তার পেশা। এ সব সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো সে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সমগ্র উপন্যাসটির মূল ঘটনাধারা এই অভিযোগ, কংগ্রেসী তদন্ত, বিচারালয়ে বিচার, কারাদণ্ড এবং কারাজীবনের কথা। স্বাধীনচেতা এই লেখিকাকে জেলখানায় পায়খানা সাফ করতে হয়েছে। তারই কারাজীবনের সূত্রে যেসব বন্দিনীর কথা আছে, তাদের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে মার্কিন সমাজব্যবস্থার গভীর সংকটের ছবি আছে। তবে উপন্যাসটির প্রধান চিত্র লেখিকার নির্যাতন। অন্ধ সোভিয়েতবিরোধী স্নায়ু-যুদ্ধের রণনীতির পাশবিক চিত্র। 'স্পার্টাকাস' ও 'ফ্রীডম রোড' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা হাওয়ার্ড ফাস্টকে ঐ সময়ে যে অভিযোগ ও নির্যাতন ও বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এই 'দি এস্টাব্লিশমেন্ট' উপন্যাস কি তারই কাহিনী? এতদিন পরে লিখলেন কেন? হাওয়ার্ড ফাস্ট তো বস্তুত পক্ষে নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বলয় থেকে। তিনি কেন এ ধরনের উপন্যাস লিখলেন? এই প্রশ্নের জবাবের জন্যে তাঁর গত তিরিশ বছরের সাহিত্য ও জীবনকে জানা দরকার। সেটা এই নিবন্ধে সম্ভব হয়নি। তবে উপন্যাসটিকে এখানে যথাযথ উপস্থিত করা হয়েছে এবং আমরা যা দেখাতে চাই তা দিতে পেরেছি বলেই আমাদের ধারণা।

বর্তমানে সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের স্নায়ুযোদ্ধারা সরাসরি নিপীড়ন ও বিভীষিকার পথ নিচ্ছে না অথবা নিতে পারছে না। কিন্তু তারা বিভাজন ও বিভ্রান্তিসৃষ্টির উপায় ও প্রয়াসগুলোকে স্নায়ুযুদ্ধের কাজে জোরেশোরে লাগাচ্ছে। তবে সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহকেরা বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায় নিপীড়ন ও বিভীষিকার পথটাকে ধরে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়াস তো আছেই। তবে আশাবাদ দমিত হয়নি। সমাজতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসারিত হচ্ছে। সাহিত্য এক্ষেত্রে অস্ত্রের চেয়ে কম কাজ করছে না।

৬

লাতিন আমেরিকাতে মার্কসীয় বাতাকরণের কাজ সাহিত্যে সমস্ত বিভীষিকা ও বিভ্রান্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। গত দুই দশকের মধ্যে লাতিন আমেরিকায় যে দুটি উপন্যাসকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে তারা হলো গুয়াতেমালার আস্টুরিয়সের লেখা 'দি সাইক্লোন' এবং কলাম্বিয়ার মার্কোয়েসের 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা'। এই উভয় উপন্যাসেই দেখানো হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ পুঁজিপতিরা লাতিন আমেরিকায় ছোট ছোট দেশগুলিতে একইভাবে বৃহৎ ভূস্বামী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'দি সাইক্লোন' উপন্যাসের সমস্ত ব্যাপারটাই এই আগ্রাসন নিয়ে লেখা। 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতায়' এই আগ্রাসন উপন্যাসের একটি অংশ মাত্র। কিন্তু এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণী দুটি উপন্যাসেই তীব্রতায় প্রায় সমান। এই আগ্রাসনের ওপর প্রকৃতির প্রতিশোধটা প্রতীকী। ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রের চেতনা।

এরা দুটি দৃষ্টান্ত। এটাই হচ্ছে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সাধারণ ধারা। এখানেও বলে রাখা যেতে পারা যে, এই সব লেখায় মার্কসের নাম কিংবা মার্কসীয়

তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নেই। তা সত্ত্বেও এরা মার্কসীয় বাতাবরণকে শক্তিশালী করেছে। এরা যে একটা বিশেষ অনগ্রসর অঞ্চলের নরনারীর অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে বৃহত্তর জগতের কাছে অপরিচিত একটা পরিবেশকে ভিত্তি করেই কাজ করেছে, সেখানেও মার্কসীয় বিশ্ববিপ্লবের অন্তঃস্রোতগুলি সক্রিয়। এইভাবে আঞ্চলিকতা যুক্ত হয়েছে সমগ্র মহাদেশ কিংবা জগতের সঙ্গে। মার্কসীয় বাতাবরণের এটা একটা বড় কাজ।

সর্বক্ষেত্রে মার্কসীয় বিজয়বৈজয়ন্তীকে চিত্রিত না করেও কি প্রখ্যাত মার্কসপন্থী লেখকেরা এই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাননি? তত্ত্বকে ও বাতাবরণকে শক্তি জোগাননি? এ ধরনের কাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শলোকভের উপন্যাস 'ডন নদীর গতিপথে', হো চি মিনের 'কারাগারের রোজনামচা' এবং পাবলো নেরুদার 'মচ্ছপিচ্ছ' কাব্যের নাম করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবি বা ঔপন্যাসিক তাঁদের কাজের ভূমিকাতে মার্কসীয় ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্বের কথা জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের লেখায় সত্য ও প্রাণবন্ত অনুভবকে কোন মার্কসীয় সংজ্ঞা ছাড়াই উপস্থিত করা হয়েছে। এটাও একটা ঘটনা। সম্প্রতি গণচীনের আধুনিক কবি আই চিং-এর বেজিং থেকে প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ এই ঘটনার দৃষ্টান্ত।

৭

সাহিত্যের সৃষ্টির ধারার পাশাপাশি তত্ত্বের ধারাও মার্কসীয় তত্ত্ব ও মার্কসীয় বাতাবরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈভব তৈরি করেছে। এই বৈভব সৃষ্টির ধারাকে সঞ্জীবিত ও অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। এ সম্বন্ধেও দ'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে নিবন্ধ শেষ করবো।

গিওর্গি লুকাচ তিরিশের দশকের শেষের দিকে মস্কোতে বসে 'ইউরোপিয় বাস্তবতাবাদের নিরীক্ষা' (Studies in European Realism) নাম দিয়ে যে বইখানি বালজাক প্রমুখ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, হাঙ্গেরিতে ফিরে গিয়ে তার একটি ভূমিকা লিখেছেন ১৯৪৮ সালে। এই ভূমিকার একটি অংশ নিম্নরূপ :

"মার্কসবাদ প্রত্যেকটি ঘটনার বৈষয়িক মূলসূত্রকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চালায় এবং এই সব ঘটনাকে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কে ও গতিধারায় স্থাপন করে সেই নিরিক্ষে বিচার করে দেখে। মার্কসবাদ এই গতিধারায় বিধানগুলোকে চিহ্নিত করে নিয়ে এদের মূল থেকে ফুল পর্যন্ত বিকাশকে প্রামাণ্য বলে প্রতিপন্ন করে নেয়। এইভাবে এগিয়ে চলে মার্কসবাদ প্রত্যেকটি ঘটনাকে নিছক আয়েশী, যুক্তিবহির্ভূত ও অতীন্দ্রিয় কুয়াশার ঘের থেকে মুক্ত করে তুলে আনে এবং বোধের উজ্জ্বল আলোয় উপস্থিত করে।"

মার্কসবাদে গোঁজামিল দেয়া কিংবা মার্কসীয় মূলসূত্রগুলিকে অনমনীয় ও অকেজো বলে অভিহিত করা দূরে থাকুক, লুকাচ সাহিত্যের যত বেশি বিস্তারে ও গভীরে প্রবেশ করেছেন ততই বেশি করে মূলসূত্র নিয়ে কাজ করেছেন এবং মার্কসীয় মূলসূত্রের পুনরুজ্জীবনের বা রেনেসাঁর তাগিদ দিয়েছেন। তবে তিনি এইসব মূলসূত্রের স্থূল

প্রয়োগের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে মার্কসীয় মূলসূত্রগুলি চূড়ান্ত সূক্ষ্ম জীবনের তন্তুগুলির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায় এই সূক্ষ্মতম তন্তুগুলির কাজ করে। স্থূলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লুকাচের বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে দেখানোর মধ্যে।
তত্ত্বের প্রসঙ্গে আরেকটি দৃষ্টান্ত।

মার্কসীয় তত্ত্ব ও বাতাবরণ দিয়ে আফ্রিকাতে যারা মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের একজন হচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ছোটগল্প ও উপন্যাসের লেখক আলেক্স লা গুমা। তিনি ১৯৭৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের মুখপাত্র 'সেচাবাতে' আফ্রিকার গিনি বিসাউ' এর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আমিলকার কাব্রালের বক্তব্যকে সংগ্রামের দিকদ্রষ্টা হিসেবে উপস্থিত করেছেন। আফ্রিকাতে মার্কসবাদী বাতাবরণের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক এই আমিলকার কাব্রাল। তিনি ইউনেস্কোতে পঠিত তার সংস্কৃতি বিষয়ক নিবন্ধে লিখেছিলেন : "সাম্রাজ্যবাদ তার আধিপত্যের প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক নিপীড়নের আশ্রয় নেয়। অপর দিকে নিপীড়িত জনগণ যে মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তুলতে এবং তাকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়, তার মূলে থাকে তাদের সংস্কৃতি। প্রচণ্ড নিপীড়নের মুখেও জনগণ তাদের সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখে। কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ চূর্ণ হবার পরেও তারা যে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়, সেটা সাংস্কৃতিক।"

এখানে মার্কসীয় তত্ত্ব সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায় তুলে দিয়েছে প্রচণ্ড আশাবাদ।

দস্তয়েভস্কি : দিন বদলের পালায়

উনিশ শতকের রুশকথাশিল্পী ফিওদর দস্তয়েভস্কি সম্বন্ধে 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থে হাঙ্গেরির মার্কসবাদী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ গিওর্গি লুকাচ ১৯১৪ সালে লিখেছিলেন যে, দস্তয়েভস্কি অনাগত লেখক লেখিকাদের জন্যে এক নতুন ধরনের বাস্তবতাবাদের খসড়া রেখে গিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 'খসড়াগুলো' সমগ্র বিশ শতকের বিশ্ব সাহিত্যের প্রাণসত্ত ধারা হিসেবে আজও সক্রিয়। বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগের গল্পে উপন্যাসে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট' এবং 'দি ইডিয়ট' উদ্দাম মানবতাবাদী যৌবনের ভাবের ঘোর পাঠিকাকে টানে তাঁর এই পরিচিতিকে সামনে রেখে। বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিনবদলের পালায় তাঁকে ঘিরে যে ভাবাদর্শের লড়াই চলছে সেটাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

দস্তয়েভস্কির কষ্টিপাথার সাহিত্যে একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদী-সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে কিছুটা ফুটিয়ে তোলাও এই আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতন্ত্রের প্রসার ও জাতীয় মুক্তির প্রবাহকে ঠেকাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা কমিউনিজমের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে যুগপৎ ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই চালিয়ে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুদয়কে স্তব্ধ করার জন্যেই পঞ্চাশের দশকে শাসকচক্র আইন করে কমিউনিজমের প্রচারকে নিষিদ্ধ করেছিল। এরা এই লড়াইয়ে সাহিত্যকেও একটা বড় রকমের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

আইরিশ জোটনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কোনার ক্রুইজ ও'ব্রায়েনের লেখা 'রাইটার্স এণ্ড পলিটিক্স' বইটিতে এই সাহিত্যের ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বইটির ১৯৬৫ সালের সংস্করণে 'দুই ভাল্লুক' নামের নিবন্ধে ও'ব্রায়েন জনৈক মার্কিন লেখকের 'দস্তয়েভস্কি অথবা তলস্তয়' নামক গ্রন্থের একটা সারমর্ম দাখিল করেছেন। সারমর্মটা হলো এই যে, গ্রন্থকারের মতে তলস্তয় ও বলশেভিকদের মধ্যে কেনো পার্থক্য নেই। তলস্তয় বলশেভিকদের মতো বিশেষ কতগুলো নীতির কাঠামোতে জনগণকে কায়িক ও মানসিকভাবে গড়ে তুলতে চান। দস্তয়েভস্কি এই ধরনের কাঠামোর বিরোধী। 'দস্তয়েভস্কি অথবা তলস্তয়' গ্রন্থের লেখক তলস্তয়কে বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্টবিরোধী এবং প্রকারান্তরে বিধাতাপুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকামী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে বলশেভিকদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। তিনি দস্তয়েভস্কিকে খ্রিষ্ট ও ঈশ্বরের একাগ্র অনুগামী এবং মানবতাবাদের উদার প্রতিভূ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। এইভাবে দস্তয়েভস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ভাবের লড়াইতে নিয়োজিত করা হয়েছে।

ও' ব্রায়েন তাঁর নিজস্ব জোটনিরপেক্ষতাবাদী বিচার বিবেচনা দ্বারা 'দস্তয়েভস্কি অথবা তলস্তয়' গ্রন্থের তলস্তয়বিরোধী যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলশেভিকদের সমর্থনে কিছু বলেননি। তবে ঠাণ্ডা লড়াই-এর পশ্চিমী প্রবক্তারা কি সাংঘাতিক অজ্ঞতা ও অন্ধতা এবং যুক্তিহীনতার আশ্রয় নিতে পারেন, সেদিকটাকে প্রকটভাবেই তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে ও ব্রয়েনের বিশ্লেষণের বিস্তারিতে যাব না। এখানে শুধু কিভাবে দস্তয়েভস্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার একটা নমুনা দেয়া হলো মাত্র।

দস্তয়েভস্কিকে পশ্চিমী স্নায়ু যুদ্ধবিদরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে কমিউনিজম তথা মার্কসবাদী লেনিনবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে আরও বহু কায়দায় ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের যেসব প্রবক্তা পশ্চিমী স্নায়ু যুদ্ধের পরিচালকদের খপ্পরে পড়েন, তাঁরা দস্তয়েভস্কিকে তাঁদের পথিকৃত বলে ঘোষণা করেন এবং দস্তয়েভস্কির উপন্যাস ও গল্পের ব্যাখ্যাও করেন সেইভাবে। তাছাড়া, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে প্রচার চালান যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কি বর্জিত, উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এই প্রচারও নানা ধরনে করা হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের নায়করা দস্তয়েভস্কিকে শুরু থেকেই বাতিল করে দিয়েছেন। আবার কখনও বলা হয়েছে যে, শুরুতে সম্মান দেখানো হলেও পরে তাঁকে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমী

প্রচারে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, দস্তয়েভস্কি পৃথক মতের, পৃথক ভাবাদর্শের মানুষ। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে 'ডিসিডেন্টের' মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে যাঁরা ডিসিডেন্ট হিসেবে মাঝে মাঝে উদ্ভূত হয়ে থাকেন, তাঁদের উঁচু শিল্পী ও বিজ্ঞানীর জাতে তুলবার জন্যে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা দস্তয়েভস্কির নামকে ব্যবহার করেছেন। সাধারণত দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ডিসিডেন্টরা খ্রিষ্ট ও ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা করেন। দস্তয়েভস্কিকেও যে এই প্রচারণায় খৃষ্টানুসারী ও আধ্যাত্মসাধক রূপে উপস্থিত করা হয়, তার কারণটাকে সহজেই বুঝতে পারা যায়।

২

এখানে স্বভাবতই আমরা জানতে চাইবো, সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য ঠিক কি ধরনের। দস্তয়েভস্কির সমাদর ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা, ধারাবাহিকতা, গভীরতা ও মতাদর্শগত মূল্যায়নে কি পশ্চিমী বিরুদ্ধ প্রচারণার যথেষ্ট জবাব দেয়া হয়েছে?

এ ক্ষেত্রেও দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা দেখাবো যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কিকে বরাবর যে সম্মান দেয়া হয়ে আসছে, তার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। ১৯২১ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে দস্তয়েভস্কির জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি লিখেছিলেন, 'দস্তয়েভস্কি হচ্ছেন মহাশক্তির সামাজিক বিবেক'। উনিশ শতকের বস্তুবাদী 'গণতন্ত্রী' লেখক বেলিনস্কির যে রচনাবলি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়, তাতেও তদানীন্তন উদীয়মান লেখক দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাসের হৃদয়গ্রাহী মূল্যায়ন ছিল। বেলিনস্কি ছিলেন দস্তয়েভস্কির প্রথম দার্শনিক শিক্ষক-সাথী। ১৯৮১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কির মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। ১৯৮১'র সোভিয়েত ইউনিয়নের ইনস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরা (Instrannya Literatura) দস্তয়েভস্কির ওপর যে আলোচনার ব্যবস্থা করে, তার একটি বিবরণ এই পত্রিকার ১৯৮১'র প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এই বিবরণটিই সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির ইংরেজি মুখপত্র 'সোশ্যাল সায়েন্সস' পত্রিকার'৮২ সনের ১নং সংখ্যায় অনুবাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনার একটি চুম্বক আমরা এখানে দাখিল করছি। তার আগে একটি কথা বলে রাখা যায়। এই আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলেরই দস্তয়েভস্কির ওপর বই রয়েছে। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে দস্তয়েভস্কির বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর ও ব্যাপকভাবে আলোচনার ভিত্তিতে বহুনিবন্ধ ও গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আইনস্টাইন শতবার্ষিকীর সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি আইনস্টাইন-জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। বইটি লিখেছেন কুজনেতসভ। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানে আইনস্টাইন এবং শিল্পরূপে দস্তয়েভস্কিকে এই লেখক একই ধরনের সঙ্গতির স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ বিপুল অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনবার ক্ষমতার দিক দিয়ে দুজনে তুলনীয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের

জীবনীতে দস্তয়েভস্কির এধরনের উল্লেখ আমাদের এক মার্কসবাদী বন্ধু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে না শোনালে হয়তো আমরা খেয়াল করতাম না। এই সূত্রেই জানা গেল, আইনস্টাইনের আলোচ্য জীবনী লেখক দস্তয়েভস্কিরও জীবনী রচনা করেছেন। সেই বইটির তর্জমা পাওয়া যাবে কিনা জানিনা। তবে আইনস্টাইনের জীবনী থেকেই বুঝতে পারা যায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও আগ্রহ কত সামগ্রিক।

উপরে উল্লিখিত ইনস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরায় প্রকাশিত আলোচনার সারমর্মটি নিম্নরূপ :

১. দস্তয়েভস্কির চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত গণবৈপ্লবিক রাজনীতিকে বর্জন করে মানুষের আধ্যাত্মিক মোক্ষের দিকটাকে প্রাধান্য দিলেও জনগণের ভ্রাতৃত্বের দাবী ও আদর্শকে প্রবলভাবেই ধরে রেখেছে। ফরাসি বিপ্লবের লির্বাটি ও ইকুয়েলিটিকে রাজনৈতিকতার দিক দিয়ে পরিত্যাগ করলেও দস্তয়েভস্কির ফ্রেটারনিটি তাঁর রচনাবলিকে শেষ পর্যন্ত ঐক্যসূত্রে গেঁথে রেখেছে।

২. মার্কসের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের মানবাত্মা সম্পর্কিত বক্তব্যের আলোকে দস্তয়েভস্কির মানবাত্মার বিচারকে বুঝতে পারা যায়। দস্তয়েভস্কি বুর্জোয়া অমানবিক অর্থসর্বস্বতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, যেমনটি ছিলেন মার্কস।

৩. ধ্রুপদী বাস্তবতাবাদের দুটো ধারা। একটা ধারা হচ্ছে, মন ও মানসিকতা থেকে বস্তুজগতে যাওয়া। এই ধারার শিল্পী সার্ভেন্টিস, রাবেলাইস ও স্তান্দাল। আরেকটি ধারা হচ্ছে বস্তুজগত থেকে মন ও মানসে যাওয়া। এই ধারার শিল্পী বালজাক। দস্তয়েভস্কি প্রথম ধারার শিল্পী।

৪. দস্তয়েভস্কির চিত্রকল্পগুলি অস্তিত্বের বিকাশের অভিব্যক্তি। এরা বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গীয় চিত্রকল্পের বিপরীত।

৫. দস্তয়েভস্কির গল্প উপন্যাসের চরিত্রাবলিতে যেসব অতিপ্রাকৃত দিক রয়েছে, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে বাস্তব মানসিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ও বিন্দু বিন্দু ছবি দিয়ে গড়া।

৬. শেকসপীয়র এবং দান্তে যেমন তাঁদের নিজ নিজ যুগে নিজ নিজ দেশের শৈল্পিক অভিব্যক্তির জাতীয় ধারাবাহী ছিলেন, দস্তয়েভস্কিও তেমনি তাঁর নিজযুগের নিজ দেশের শৈল্পিক অভিব্যক্তির ধারাবাহী ছিলেন।

৭. মানুষকে সমাজতন্ত্র, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র থেকে এবং তার ভার ও আদর্শ থেকে আলাদা করা যায় না। এটাই হচ্ছে দস্তয়েভস্কির মনস্তাত্ত্বিকতা। দস্তয়েভস্কি নিজেই বলেছেন যে, তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক লেখক বলা হয়, তবে তিনি আসলে একজন বাস্তবতাত্ত্বিক।

দস্তয়েভস্কির প্রথম গুরু হেগেল। তিনি নিশ্চয় হেগেলের ইতিহাসের দর্শন গ্রন্থটি পড়েছিলেন। এর প্রতিফলন রয়েছে তাঁর 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে। তবে তিনি অন্ধভাবে হেগেলের অনুসরণ করেননি। হেগেল তাঁর নায়কদের "যা কিছু বাস্তব তাই যুক্তিসঙ্গত"-সূত্রের মাপকাঠিতে বিচার

করেছেন। কিন্তু দস্তয়েভস্কি তাঁর সময়ের বর্তমান বাস্তবের নিন্দা করেছেন অবিচার ও নিষ্ঠুরতার জন্যে।

৮. দস্তয়েভস্কি চিন্তার রাজ্যে কখনও নিঃসঙ্গ ছিলেন না। শুরুতে তিনি রুশ বস্তুবাদী বেলিনস্কির কর সাহচার্য পেয়েছিলেন। এর পরে প্রতিটি পর্বে তাঁর দুয়েকজন করে দার্শনিক সঙ্গী ছিলেন। 'দি ইডিয়ট' উপন্যাসটি লিখবার সময় দস্তয়েভস্কি ভলটেয়ার ও ডিডেরোর গ্রন্থাবলি পড়েছিলেন।

৯. দস্তয়েভস্কির 'দি পসেসড' বা 'দানোয় পাওয়া' উপন্যাসটিতে সামাজিক বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতা ও তাদের অনুগামীদের ধিক্কার দেয়া হয়েছে। স্বভাবতই বরাবর এই বইটি বিতর্কের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এটি বিতর্কমূলক সন্দেহ নেই। তবে মতাদর্শগত উগ্রতার পরিণাম চিন্তা করে এবং বিশ শতকের পর্বে পর্বে এই উগ্রতা যে অপহ্নব ঘটাচ্ছে তার আলোকে এই উপন্যাসটিকে দেখতে হবে।

১০. তলস্তয়ের যুদ্ধ ও শান্তি উপন্যাসের ঠিক পরেই দস্তয়েভস্কির 'দানোয় পাওয়া' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন, তলস্তয়ের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর হিসেবেই দস্তয়েভস্কির এই বই লেখাও তাঁর বক্তব্য।

কিন্তু একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, সমস্ত দিক দিয়ে উপন্যাস দুটি আলাদা। বিষয়বস্তু ও কাহিনী রচনার শৈলী, স্থান ও কাল, কালক্রম ও তার গতি, ছন্দ ও দ্বন্দ্ব সবই আলাদা। এদের যোগ এবং সাদৃশ্যও রয়েছে। দুটি উপন্যাসেই রয়েছে শিল্পরূপের বিন্যাস, বাস্তবতার বিন্যাস, রুশ বাস্তবতার বিন্যাস। দুটি উপন্যাসেই রয়েছে সত্যের উপস্থাপন এবং জনগণের দুঃখকষ্টের জন্যে যন্ত্রণা-রাশিয়ার জন্যে, মানুষের জন্যে, মানবসমাজের জন্যে যন্ত্রণাবোধ।

সুতরাং, এই দুটি উপন্যাসকে কিংবা তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে তাঁদের একই সুর বিন্যাসের পরিপূরক হিসেবে দেখা উচিত।

১১. দস্তয়েভস্কি যে সম্পদ রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াপন্থী সূত্রগুলির তুলনায় বিপ্লবী সত্যগুলি অপরিমেয় ভাবে প্রবল।

৩

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দস্তয়েভস্কিকে বর্জন করা দূরে থাকুক, তাঁকে সব সময়েই বড় করে সামনে রাখার দিকটাকে সামনে জাগরুক রাখলে দিন বদলের পালায় দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে লড়াই-এর আরেকটা ব্যাপারও পরিষ্কার হতে পারে।

সেটা এই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের ওপর ভর করে আসছে, তাঁরা শুধু দস্তয়েভস্কির ক্ষেত্রে নয় তথাকথিক সমস্ত ডিসিডেন্টদের ক্ষেত্রেই সত্যের নামে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করার অধিকার দাবী করলেও নিজেরা সত্য ও সামগ্রিকতার ধার ধারেন না। দস্তয়েভস্কির মাত্র একটা দিককে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়ে তাঁরা তথাকথিত ডিসিডেন্টদের দস্তয়েভস্কির স্তরে তুলতে চান।

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার লৌহনিগড়ে আবদ্ধ দেশগুলিতে বিদ্রোহী শিল্পী সাহিত্যিকদের বরাবরই যে চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে সত্যকথনের অপরাধেই, তার কথা এখানে বিস্তারিতভাবে আনার দরকার নেই। শুধু মার্কিন বিপ্লবী মানবতাবাদী ঔপন্যাসিক জ্যাক লণ্ডনের বসতবাড়িটিও যে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা লড়াই-এর পশ্চিমী সাহিত্য তাত্ত্বিকরা সাহিত্যকে ব্যবহার করার ব্যাপারে নৈতিকতার ধার ধারে না। সুতরাং দস্তয়েভস্কিকে ব্যবহার করাটা একটা পরিহাসও বটে। দস্তয়েভস্কির একটা বড় উপাদান ছিল নৈতিক শক্তির উদ্বোধন। পশ্চিমী স্নায়ুযুদ্ধবিদরা একজন শিল্পীকে সমগ্রভাবে উপস্থিত করার নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করে আসছেন। তাঁদের কাছে দস্তয়েভস্কি শুধুমাত্র তাঁদের কাজের কাজি।

৪

সোভিয়েত ইউনিয়নের গত সাত দশকের পর্বে-পর্বান্তরে দস্তয়েভস্কিকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যখন তাঁর কোন কোন দিককে নেতিবাচক বলা হয়েছে, তখন তাঁর ইতিবাচক দিকগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে সামনে আনা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত ইনাস্ত্রান্নায়া লিতারেতুরার আলোচনার বিবরণটিতে এই পর্যালোচনার ধারা পরিষ্কারভাবে সামনে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বলা দরকার, এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপার নয়। এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ। সকল দেশেই মার্কসীয় বিচারের সাধারণ প্রয়োগ।

এই প্রসঙ্গে হাঙ্গেরির গিওর্গি লুকাচের সর্বশেষ লেখায় দস্তায়েভস্কির যে উল্লেখ রয়েছে তাকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে দস্তয়েভস্কিকে দেখবার ধারাবাহিকতা হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

গিওর্গি লুকাচ শুধু নিছক দার্শনিক বা সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ ছিলেন না। তিনি ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক হিসেবে জার্মানিতে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি সাহিত্যে, সৌন্দর্যে এবং দর্শনে মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বের ধারাবাহিক প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭১ সালে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বহু উত্থানপতনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই মনীষী একটি আত্মজীবনী লিখে রেখে গিয়েছেন। দীর্ঘজীবনের এবং বিশ্বব্যাপী আলোড়নের কয়েকটিমাত্র চুম্বক তিনি দিতে পেরেছেন এই খসড়ায়। এর মধ্যেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তলস্তয় এবং দস্তয়েভস্কির কাছ থেকেই তিনি প্রথম যৌবনে পৃথিবীকে বদলে দেবার বিপ্লবের একটা আদল ও আদর্শ পেয়েছিলেন।

তলস্তয় এবং দস্তয়েভস্কি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পূনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন যদি তিনি অনুভব করতেন তবে তা নিশ্চয় লিখে যেতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। ১৯১৪ সালে যা বলেছিলেন, সেই কথাই আত্মজীবনীতেও বলেছেন।

তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি ছিলেন জরাজীর্ণ শোষণ ও বঞ্চনা এবং যুদ্ধে আকীর্ণ পৃথিবীকে নতুন মুক্ত পৃথিবীতে রূপান্তরিত করার প্রথম দিশারীদের মধ্যে দুজন।

লুকাচের এই আত্মজীবনীর খসড়ার আরেকটা চুম্বক আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে প্রসঙ্গিক। লুকাচ তিন জায়গায় তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কিকে একসঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

লুকাচ দেখিয়েছেন যে, মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের কাছে এদের দুজনকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করাটা একান্তই স্বাভাবিক। দুজনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। ব্যবহারে দুজনের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুজনেই শোষণমুক্ত ও যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী গড়ার কাজে অপরিহার্য। কারণ দুজনেই যুগযুগান্তের বঞ্চিত ও দুঃখী জনগণকে তাদের শিল্পরূপের মর্মকেন্দ্রে গভীর আন্তরিকতা দিয়ে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দার্শনিক বক্তব্যের তলা খুঁড়লে দুজনেরই লেখা থেকে বেরিয়ে আসে কোটি কোটি ভূমিদাসের মুক্তির আর্তি।

প্রবীণ ও নবীন দুই মহাবিদ্রোহী সহযোগী

১

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ, উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদী অবক্ষয়, জাতিগত ও বর্ণগতবৈষম্যের নিপীড়ন; আরেকদিকে আন্তর্জাতিকতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়-মুক্তি, শান্তি, গণতন্ত্র ও জাতিগত ও বর্ণগত সাম্য প্রতিষ্ঠার গণঅভ্যুদয়। এই দুই-এর পাশাপাশি শতাব্দীর শেষ পর্বে আমরা এমন কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন বা সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছি যেগুলির মধ্যে কোনকোনটি প্রাচীন হলেও গত শতকের শেষ দিক থেকে নতুন আকার নিয়েছে। কোন কোনটি আধুনিক হলেও তীব্রতায় শতাব্দীকালের মধ্যেই বহু পুরানো সমস্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

এখানে আমরা এই ধরনের পুরানো ও নতুন মিলিয়ে চারটি প্রশ্নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে দুজন লেখকশিল্পীর সৃষ্টি ও কর্মকাণ্ডে খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি। এরা হলেন ফ্রান্সের রোমাঁ রলাঁ এবং জার্মানির আর্নেস্ট টলার। রলাঁর জীবনকাল ১৮৬৬-১৯৪৪। টলারের জীবনকাল ১৮৯৩-১৯৩৯। এরা দুজনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজনকারীর অবস্থান নিয়েছিলেন। এঁদের কাজে আমাদের আলোচ্য প্রশ্নগুলির মোকাবেলা দুটি প্রজন্মের পরম্পরায় আমাদের সময়ের মধ্যেও এসে গিয়েছে। এই পরম্পরায় রয়েছে সহমর্মিতাও।

যে চারটি প্রশ্নের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে আমরা খতিয়ে দেখবো, সেগুলি নিম্নরূপ :

(এক), বার্ধক্য বা প্রৌঢ়ত্ব এবং যৌবন বা তারুণ্যের পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক। সমস্যাটা শুধু দুই বা বহু ব্যক্তির বয়সের ব্যবধান নয়, একক ব্যক্তির বয়সের তারতম্যেরও সমস্যা। ব্যাপারটা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু গত এক শতকে ও সম্প্রতি বার্ধক্য ও যৌবনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধের নিদারুণ অবনতি ঘটেছে। সামাজিক ও পারিবারিক এবং আত্মজীবনে বয়সের

তারতম্যের অবমূল্যায়ন নিয়ে আসছে তিক্ততা ও উপেক্ষা। জীবন ও মৃত্যুর ভাবনাচিন্তাদর্শনও এতে জড়িয়ে পড়ছে।

(দুই), ব্যবহারিক জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রয়োগ দ্বিবিধ সমস্যার আমদানী করেছে। প্রথমত, মানুষের প্রকৃতিদত্ত গতিকে যন্ত্রের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রের দাম মানুষের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটা যেমন মানবিক ও বৈজ্ঞানিক সংকটের, তেমনি এর সমাধানও আধুনিক জীবনে ভারসাম্য আনার এবং মনুষ্যবোধের নতুন প্রয়োজনীয়তার।

(তিন), ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক। এই সমস্যাটি সমাজের এবং সেই সঙ্গে পরিবারের ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতার প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের সঙ্গে ব্যক্তির সহযোগিতার প্রশ্ন। আমাদের সময়ে সমাজতন্ত্র ব্যক্তি ও সমষ্টির সহযোগিতাকে স্বচ্ছন্দ ও গভীর এবং প্রসারিত করছে। তেমনি অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস ও মৃত্যু থেকে একটা বিচ্ছিন্নতার দর্শনের এলিয়েনেশন (অন্যভবন বা খণ্ডীকরণ) তত্ত্বকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীনতা বলে প্রমাণিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের বদ্ধমূল ধারণা দিয়ে ব্যক্তিকে ঘিরে দিচ্ছে।

(চার), শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্বে নতুন মাত্রা। শ্রমিকশ্রেণী আজ বহুদেশে সমগ্র সমাজের নিছক বাহক থেকে পরিচালকের ভূমিকায় চলে এসেছে। সাধারণভাবেও শ্রমজীবীমাত্রই এই ভূমিকায় যুক্ত হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবীই যুক্ত। শ্রমজীবীর বৈজ্ঞানিকচেতনা এবং আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজন। অথচ এটাও সত্য যে শ্রমজীবীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে। চরিত্র ও চেতনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য গোঁজামিল। শ্রমিককে নিজের সঙ্গেও লড়তে হবে।

২

এবার আমরা রলাঁ ও টলারের লেখায় ও কাজে যেভাবে যে কোন প্রশ্ন শিল্পীর হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে সেভাবেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবো। এর আগে দুজনের পরিচয়কে নতুন করে ঝালিয়ে নিচ্ছি। কারণ রলাঁ কোন কোন সূত্র আমাদের সামনে থাকলেও টলার প্রায় না থাকারই শামিল। এটাই বাস্তবতা। টলারের কথা তাই বেশি বলছি।

রলাঁ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জন ক্রিস্টোফার বা 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের রচিয়তা রলাঁ ইউরোপের বিবেক নামে পরিচিত। যুদ্ধের আগেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং বিশেষ করে তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন চলছে এবং লেনিন যখন নির্বাসনে থেকে নতুন করে শ্রমিক আন্তর্জাতিক গড়ে তুলে যুদ্ধ থামাবার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে গণবিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন করেছেন, তখন রলাঁ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ার স্থল ও নৌসেনারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদের সহযোগিতায় শ্রমিক-কৃষক-জনগণ জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে, তখন লেনিন দেশে ফিরবার সময় রলাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। গোর্কিকে

লিখেছিলেন, 'রলাঁকেও নিয়ে চলো।' এই ঘটনা থেকে রলাঁর অবস্থানটি তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে আসে। তাঁর নতুন চার খণ্ডের উপন্যাস 'বিমুগ্ধ আত্মা' (The Soul Enchanted) এই অবস্থানের প্রক্রিয়ার শিল্পরূপ। এর প্রধান চরিত্র নারী।

টলার: আর্নেস্ট টলার যুদ্ধকে পেরিয়ে এসেছিলেন ভিন্নভাবে। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন ২০ বছর বয়সে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈনিক হয়ে রণক্ষেত্রে যেতে হয়েছিল। সেই মুহূর্তে যুদ্ধবাজদের প্রতারণার আবহাওয়ায় তাঁর ধারণা ছিল তিনি ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে তাঁর চোখ ও মন দুইই খুলে গেলো। তিনি কবিতা লেখা শুরু করলেন যুদ্ধের নারকীয় কাণ্ডকারখানা নিয়ে। এই সঙ্গেই তিনি নাটক লিখলেন 'রূপান্তর' (Transfiguration)। এক যুবকের মোহভঙ্গ এবং শান্তি ও বিপ্লবে দীক্ষা। তখন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যুদ্ধকে সমর্থন করায় এর মধ্যেকার বামপন্থীরা বেরিয়ে এসেছে এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এবং বিশেষ করে এদের বড় অংশ স্পার্টাসিস্টরা (Spartacist) রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিয়েবক্‌নেখটের নেতৃত্বে সৈনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন। টলার স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি ট্রেঞ্চের বিপ্লবী কবি হয়ে পড়েন।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে গণঅভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হলো। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধফেরত স্থলসৈনিক ও নৌসেনাদের সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। সামন্তবাদী যুদ্ধবাজ সেনা-অফিসাররা এর বিরুদ্ধে।

১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে বার্লিনের শ্রমিক অভ্যুত্থানকে পেশাদার সেনাবাহিনীর সামন্তবাদী অফিসাররা বন্দুকের জোরে দমন করলো। কিন্তু গণতরঙ্গ থামলো না। এপ্রিলে মিউনিখে ব্যাভেরিয়ার শ্রমিক রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে স্থাপিত হলো। তখন টলার মিউনিখে। তিনি ব্যাভেরিয়ার শ্রমিক রাষ্ট্রের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন।

শ্রমিক সমিতিগুলিকে নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্র অবশ্য মাত্র ১৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল। সেনাবাহিনী এসে এখানেও বন্দুকের জোরে শ্রমিকরাষ্ট্র ভেঙ্গে দিল। টলার ও তাঁর যে সমস্ত সাথী বেঁচে রইলেন, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। টলারের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হলো। ১৯১৯ সালের জুলাই মাস শুরু হলো তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ।

এই জেলখানাই কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো টলারের ঝড়ের বেগে নাটক লেখার জায়গা। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন জেলখানায় পাখির বাসা নিয়ে 'সোয়ালো কাব্য'। এই কাব্যে আছে তাঁর কারাগারের গানগুলির মতো বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে পড়া জার্মানি ও সেইসঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তির অধীরতা। নাটকগুলি লিখলেন তিনি তখনকার জার্মানিতে এবং সাধারণভাবে ইউরোপে বিপ্লবের পতাকাবাহী শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে। তাঁর নাটকের নায়ক সবাই একেবারে সাধারণ শ্রমিক। এইসব নাটক বার্লিনে ও জার্মানীর অন্যসব শহরে মঞ্চস্থ হবার পরে তিনি নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই ধূমকেতুর মতো উত্থান এক এক সময়ে নজরুলের উত্থানের সঙ্গে

তুলনীয়। টলার পাঁচ বছর পুরোপুরি সময় জেল খেটে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বের হবার আগেই তিনি এত সম্মানিত হলেন যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বিশিষ্ট জার্মান নাগরিকদের আবেদনপত্র বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর নাম থাকতো।

আর্নেষ্ট টলার স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সেই অংশের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলেন যাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংযোগ হয়েছিল। তাঁর এই আনুগত্য সাথী ও জনগণের প্রতি তাঁর অনমনীয় সংহতি-চেতনা। জেল থেকে মুক্তি তাঁর কাছে আনন্দের ছিল না, কারণ তাঁকে হাজার হাজার বন্দী সাথীকে জেলে ফেলে আসতে হয়েছে।

জেল থেকে বেরিয়ে তিনি নিজেকে নির্দলীয় সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন।

জেলে থাকতে তিনি লেনিনের নীতির সমর্থনে বন্ধুদের চিঠি লিখেছিলেন। টলার জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন খোলা মন নিয়েই। জেলে থেকে হিটলারের প্রতি ঘৃণা তিনি তীব্রভাবে একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন। হিটলারের সাকরেদরা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে তাঁর নাটকের অভিনয়ের সময় হামলা করেছিল। টলারের নাটককে তারা দুশমন ঘোষণা করেছিল। জেল থেকে টলার বেরিয়ে এসেছিলেন যুদ্ধবাজ হিটলার ও তার ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে তাঁকে দেশ ছাড়তে হলো। তিনি আত্মজীবনী লিখলেন আমি জার্মান ছিলাম। তিনি জার্মানির যুদ্ধবাজ শাসক ও শোষক ফ্যাসিবাদী চক্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করলেন তিরিশের দশকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে।

নির্বাসনে তাঁর মৃত্যু হলো। তার আগে অবশ্য ১৯৩৭ সালে তাঁর 'কারাগারের চিঠি' এবং 'কারাগারের গান' একত্র করে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলো। এর ভূমিকায় টলার সংক্ষেপে জানালেন কিভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লবের পক্ষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান নেবার পরে জেলে পৌঁছেছিলেন। এর মধ্যে আছে টলার ও রলাঁর সংযোগসূত্রের দলিল। কারাগারে চিঠির গুচ্ছে রোঁমা রলাঁকে লেখা দুটি চিঠি রয়েছে। আরেকটি চিঠি রয়েছে স্তেফান কাছে, যার সমগ্র বিষয়বস্তু রলাঁ। আমরা উপরোক্ত দুই লেখক শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লব, শান্তি ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে রলাঁ ও টলারের চিন্তায় সহমর্মিতা ও কর্মকাণ্ডের সহযোগিতায় একটা আভাস আশা করি দিতে পেরেছি।

এবার আমরা উপরোক্ত তিনটি চিঠি এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি। এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে এমন সব প্রশ্নের ব্যাপারে টলার ও রলাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলির উল্লেখ নিবন্ধের শুরুতেই করেছি। এই দুই মহাবিদ্রোহী লেখক শিল্পীর পারস্পরিক প্রগাঢ় বন্ধুত্বও এই চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। রলাঁর প্রতি টলারের শ্রদ্ধাবোধ যে কত গভীর ছিল সেটাও জানা যায়।

প্রথম চিঠিটি নিম্নরূপ:

রোঁমা রলাঁকে

প্রিয় শিক্ষক,

প্রায় দুটো বছর জেলখানায় কাটিয়ে দিলাম। মাঠের মতোই এই জীবন সঙ্গহীন। ধাবমান দিনগুলোর একঘেয়ে বিবর্ণতা সত্ত্বেও এই জীবন আমাকে অনেকগুলো কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধ প্রহর এনে দিয়েছে। আমি তাই মনে করি না যে, বছর দুটো বৃথা গিয়েছে। মানসিকভাবে আমি জেলখানায় ঢোকার প্রথম দিনগুলোতে যেমন অবিচলিত ছিলাম, আজও তাই রয়েছি। হয়তো আমি আমার জীবনের অজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হয়েছি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাকে আমি একেবারে তলানি পর্যন্ত নিংড়ে নিয়েছি। অনেক তিক্ত ভাবনাচিন্তাকে এখন সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে হবে। সাধারণ কারাবাস হচ্ছে জীবনের শিক্ষাগৃহ। এমন একটা শিক্ষগৃহ যেখানে মানুষকে তার অন্তঃসারে পাওয়া যায়। জার্মানির ব্যাভেরিয়ায় বসে এই মুহূর্তে আমি কারাগার থেকে মুক্তির কথা ভাবছিনা, কারণ সারা ব্যাভেরিয়াই হচ্ছে এখন একটা কারাগার। যে পেশাদার সেনাবাহিনীর অফিসাররা সম্প্রতি ক্ষমতাদখলের চেষ্টা করেছিল সেই কাপ্পিস্‌ট্‌দের জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমা করে দিচ্ছে। কার্ল লিয়েবকনেখট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের, ৩২ জন নৌ-সেনার এবং গুস্টাফ লাণ্ডাউয়ের খুনীরা প্রজাতন্ত্রের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। অথচ ন্যায়ের জন্য যারা লড়ছে, তাদের জেলে আটকে রাখা হচ্ছে। জার্মানির পার্লামেন্টে জনৈক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আমাদের 'লাল জানোয়ার' বলে অভিহিত করেছে। এদের ধৃষ্টতা কোথায় পৌঁছেছে সেটা দেখুন।

দ্বিতীয় চিঠি:

রোঁমা রলাঁকে

প্রিয় রোঁমা রলাঁ,

আপনার চিঠি আজই পেয়েছি। আমার কাছে এই চিঠি মহামূল্যবান। বিদেশি ভাষায় লেখা বলে আপনার মূল চিঠিখানি আমাকে না দিয়ে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। মা অনুবাদ করে সেই চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন। তাই আপনার চিঠির জার্মান ভাষ্যটি আমি পেয়েছি।

আপনি যদি জানতেন আপনার চিঠি পড়ে কত সুখী হয়েছি। আপনার চিঠি আমার কারাগারের সাথীকে দেখালে সে হাসিমুখে বললো, এই চিঠি পাবার জন্যই জেলে আসা যায়। অবশ্য কথাটা যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে সেটা গ্রহণ করা গেলেও জেল যে মানবসমাজের ক্ষতি করে এটা মনে রাখা দরকার।

আমি আজ আমার 'কারাগারের গানগুলি' আপনাকে ডাকে পাঠাচ্ছি। এরা আমার কাছে গানের চেয়েও বেশি। এরা লিপিকা, এরা আহ্বান, এরা ঘোষণা। যেসব মানুষ গতানুগতিক জীবনযাপন করে এবং ভুল করেও ভাবে না যে, তারা তাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার দারুণ অপরাধী, তাদের এই গানগুলি উত্যক্ত করে তুলতে চায়।

এই কথাটার এখানেই ছেদ টেনে বলতে চাই, আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীটা হত্যাকাণ্ডের এবং সেই সঙ্গে নানাধরনের জঘন্য অপরাধের এবং মানুষের দেহমনের যন্ত্রণা ও অপমানের ডাইনির কড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কড়াইটা একেবারে ফুটন্ত।

তাই নয় কি? এই হট্টগোলের মধ্যে কে আমার কথা শুনবে? আজকের জাঁদরেল রাষ্ট্রনেতারা? যারা তাদের দেশবাসীদের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে আরেকটা পাহাড়ের চূড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারা? তারা কি নীচু তলার মানুষের কাছে থেকে শুনতে চাইবে?

আমার গানগুলি তাদের কাছেই অর্থবহ হয়ে উঠবে যারা ভবিষ্যতের মানুষ, তারা যুবাযুবতীরা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানবতা সমস্ত রোগ শোক দূর করার ক্ষমতা রাখে। এই যুবাযুবতীদের কাছে মানবতাই হচ্ছে বাস্তবতা। বড় বড় রাষ্ট্রনেতারা যাকে বাস্তবতা মনে করে, তার চেয়েও অনেক বড় এই বাস্তবতা। এই যুবাযুবতীরা অনুভব করে যে তারা নিপীড়িত। এরা সমস্ত অত্যাচারের অবসান চায়। আমার গানগুলি এদের সঙ্গেই কথা বলবে।

তারপর যেমন করে গমের দানা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে যদি এই গানগুলি থেকে ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ড বেরিয়ে আসে, তাহলে চারুশিল্প যতখানি যা করতে পারে তা এই গানগুলিও করবে।

হুইটম্যান বলেছিলেন, "যখন কেউ একটি বইকে ছোঁয়, তখন সে একটি মানুষকেও ছোঁয়।" এই বক্তব্য আমার বইটি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দুঃখের বিষয় অনেক লেখকের লেখায় একটা কথার যন্ত্রকে ছুঁতে হয়।

প্রত্যেকটি কবিতার শিকড় হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমরা যাকে রূপ বলি, সে হলো ভালবাসা।

তৃতীয় চিঠি:

স্তেফান সোয়াইগকে

বিষয় : রোমাঁ রলাঁ

প্রিয় সোয়াইগ,

আপনি রোঁমা রলাঁ সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি "মানবসমাজকে ভালবাসেন কারণ তিনি মানবসমাজের প্রতি যত না বিশ্বাস রাখেন তার চেয়ে বেশি দুঃখবোধ করেন।" কিন্তু এইটেই হচ্ছে বোধহয় একমাত্র অবিচল ও তিক্ততাবিহীন ভালবাসা।

বিশ্বাস প্রায়শই হতাশ্বাসে পরিণত হয়। এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই বিশ্বাস পরিণত হয় তিক্ততায়, শত্রুতায় এবং মানবসমাজের প্রতি ঘৃণাতেও।

আমি এই জন্যেই সেই সব সংগ্রামীদের সব সময় চোখের সামনে রাখি যাদের কাছে বিশ্বাস থাকা না থাকাটা বড় কথা নয়। এরা একটা আদর্শে বলিয়ান হয়ে সংগ্রাম করে চলে। এই আদর্শ হচ্ছে সমাজে সচেতন আত্মবিকাশের জন্য সহযোগিতার আদর্শ। এই কর্তব্য পালনে এগিয়ে চলার অর্থ হচ্ছে, একটি যৌথজীবন নির্মাণ করে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান করা। (এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের সব চেয়ে বড় করণীয়।) এইভাবেই জীবনের রহস্যময় যুক্তি ছাড়া উপাদানকে একটা

পরিসীমার মধ্যে আটকে দেওয়া যায়। এই ভাবেই জীবনের অযৌক্তিক উপাদান তার আপন ঝাঁপিতে গিয়ে মুখগোঁজে এবং দুর্বোধ্যতার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখে।

কোন কোন গোঁড়া সমাজতন্ত্রী মনে করে যে, জীবনের যুক্তিছাড়া উপাদানগুলোকে একেবারে নির্মূল করে দেয়া যায়। এই ধারণাটি কিন্তু সঠিক নয়।

এখানে আমি যেভাবে বললাম, ইউরোপের মানুষের ভবিষ্যৎ কি সেই ধরনের সংগ্রামী হয়ে ওঠা নয়? সেই ধরনেরই বীরত্ব নয়?

৪

উপরোক্ত তিনটি চিঠিতে আমরা আমাদের আলোচ্য চারটি প্রশ্নের মধ্যে বিশেষ করে দুইটি দ্বন্দ্বাত্মক আশাবাদের মধ্যে প্রসারিত অবস্থায় পেয়েছি। এই দুটি হচ্ছে বার্ধক্য ও যৌবনের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তি এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির সহযোগিতা। কাব্যিকতা ও নাটকীয়তা টলারের যুক্তির বাহন। এই চিঠি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর কবিতা ও নাটকের গতি ও শক্তি এবং সত্যনিষ্ঠাকে। এরই মধ্য দিয়ে আমরা আয়নার মধ্যে তখনকার বিশ্বের অন্তরের রূপটি দেখতে পাই।

আরও চিঠি পেলে আমরা দুজনের এবং দুই প্রজন্মের পরম্পরায় পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টাকে আরও বিশদভাবে দেখতে পেতাম। কিন্তু সে উপায় নেই। টলারের পত্রাবলিতে আরেকটি চিঠিতে তিনি এক বান্ধবীকে জানিয়েছেন, "রোঁলাঁ আমার কবিতার বই-এর ভূমিকা লিখছেন, তুমি জেনে খুশি হবে"।

তবে সমসাময়িক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা এই সময়ে আরেকখানি চিঠি টলার লিখেছিলেন একই মেজাজে। লিখেছিলেন রোঁলাঁর বন্ধু আঁরি বারবুসেকে। সুতরাং এই চিঠিকে দুই প্রজন্মের যুক্ত উপলব্ধি হিসেবে নিতে পারি।

আঁরি বারবুসের জীবনকাল ১৮৭৩-১৯৩৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা বারবুসের 'আগুনের তলায়' (Under Fire) উপন্যাস যুদ্ধের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাস ছিল সমস্ত জাতির যুদ্ধরত সাধারণ সৈনিকদের ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে বিশ্বজনগণের শান্তি ইস্তাহার।

যুদ্ধ শেষ হলে বারবুসে তাঁর 'ক্লার্তে' পত্রিকা (পরিচ্ছন্ন চিন্তা) মারফত ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রের ফ্রন্ট গঠন করেন। রোঁমাঁ রলাঁ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট হয়ে যান, তার মূলে রয়েছে বারবুসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। রলাঁর এই দিকটিতে তাঁর 'শিল্পীর নবজন্ম' (I will Not Rest) গ্রন্থে পাওয়া যাবে। বিশের এবং তিরিশের দশকে রলাঁ ও বারবুসে যেমন সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ, নাৎসীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁরা দুজনে ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য আয়োজিত গণবিক্ষোভের পুরোভাগে স্থান নিয়েছিলেন। ফ্যাসিবিরোধী পপুলার ফ্রন্ট গঠনেও ছিলেন তাঁরা সহায়। তাঁরা যুক্তভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ নিয়েছিলেন। রলাঁ ও বারবুসের এই একাত্মতাকে মনে

রেখেই আমরা বারবুসের কাছে টলারের চিঠিখানি এখানে দাখিল করছি। চিঠিখানি নিম্নরূপ:

আঁরি বারবুসে-কে

প্রিয় আঁরি বারবুসে,

এইমাত্র সংবাদপত্রে দেখলাম, আপনি আমার লেখা নাটক 'রূপান্তর' (Transfiguration) ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করছেন। আপনি হচ্ছেন সমাজতন্ত্রের শিক্ষক ও পথিকৃৎ। সেই আপনিই আমার লেখা নাটককে জনসমক্ষে আনছেন। এতে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

১৯১৭ সালে যখন নাটকটি লিখি তখনই এটি আমার কাছে সৌন্দর্যানুভূতি ও আত্মকথার চেয়ে বেশি কিছু ছিল। যেভাবে প্রচারপুস্তিকা লেখা হয়, সেভাবে আমি নাটকটি লিখেছিলাম। এর মধ্য দিয়ে আমি যুদ্ধকে আক্রমণ করেছিলাম এবং হরতালের ডাক দিয়েছিলাম। এরপরে নাটকটি অনেক জায়গায় গোপনে পড়া হয়। পুলিশ জানতে পারেনি। এই নাটক লেখার মধ্য দিয়েই আমি এমন বেশ কিছু সাথীকে জড়ো করি যারা দৈনন্দিন বৈপ্লবিক কাজে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে।

আজ জার্মানিতে বিপ্লব পরাজিত। বর্বরতা, নৈতিক ও আত্মিক অবক্ষয়, মিথ্যাচার, কপটতা এবং মুনাফাবাজীর আজ জয়জয়কার। কিন্তু সমাজতন্ত্র পরাজিত হয়নি। বিপ্লবীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু যে আদর্শের জন্য তারা লড়ছে তাকে কি বর্বরতা এবং উপরোক্ত আরও অন্যান্য উপায় দ্বারা হত্যা করা যায়?

এবার আমরা রলাঁর দিক থেকে তাঁর মনের গভীরে যে বিষয়গুলি লালিত হয়েছিল, সেগুলি একটা অভাস পেতে চেষ্টা করবো।

রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে রচিত হয়েছিল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোবেল পুরষ্কার পাওয়ায় এর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জাঁ ক্রিস্তফ ঘনায়মান ফরাসি-জার্মান সংঘর্ষ এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বযুদ্ধের মুখে আন্তর্জাতিক সমঝোতার একটি ঘোষণাপত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল, এর বিষয়বস্তুর জন্য উপন্যাসের নায়ক জাঁ ক্রিস্তফ বা জন ক্রিস্টোফারকে রলাঁ করেছিলেন ফ্রান্স ও জার্মানীর মনন ও জীবনের সেতুস্বরূপ। দুটি দেশই যাতে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার উপরে উঠে হাত মেলাতে পারে, সেজন্য তিনি নায়ককে করেছিলেন সবাত্মকভাবে বিদ্রোহী। জাঁ ক্রিস্তফ ছিলেন জন্মে জার্মান, বসতিতে ফরাসি। তাঁর জার্মান নাম জন ক্রিস্টোফার ক্রাফ্‌ট। জার্মান ভাষায় ক্রাফট শব্দটির অর্থ শক্তি বা ফোর্স। এই ক্রাফট নামকরণটিও নায়কের বিদ্রোহী শিল্পীজীবনের সঙ্গে যেন সঙ্গতি রেখেই দেয়া হয়েছিল। জাঁ ক্রিস্তফ এর চরতিকথাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

জাঁ ক্রিস্তফ জার্মানির সামন্তবাদী পরিবেশে জন্মালেও সেখানে সঙ্গীতশিল্প চর্চার আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিল। শৈশবেই সে ধ্রুপদী ইউরোপিয় সঙ্গীতে বাদনে ও শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। কৈশোরে সে সঙ্গীতেও উদীয়মান প্রতিভা। বার্লিনে

পর্যন্ত তার চাহিদা। কিন্তু জার্মানিতে থাকা তার হলো না। কারণ সে যেমন জন্মশিল্পী, তেমনি জন্ম জনগণমুখী। পেশাদার সেনাবাহিনীর লোকদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের একটা সংকটের সময় সে জনসাধারণের পক্ষ হয়ে লড়ে বসলো। তাকে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য দেশ ছাড়তে হলো। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে সে পৌঁছে গেলো শিল্প ও ললিতকলার বিপ্লব-নগরী প্যারিসে। এখানে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়। চলনে বলনে সমাজে সে ফরাসি হয়ে যায়। প্রেমিক, দরদী, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী জাঁ ক্রিস্তফ। কোন বিশেষ মতাদর্শেই অবশ্য সে নাম লেখায় না। সে কোন সীমান্তও মানতে চায়না। বিটোফেন, মে-দিবস, ভগবদ্গীতা সবই তার কাছে বিদ্রোহের উপাদান। জীবন হচ্ছে যৌবন। কিন্তু সে যে প্রজন্মের মানুষ, সেই প্রজন্মটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্রিস্টোফার দেখতে পাচ্ছে, ইউরোপের জাতিগুলি একদল অন্ধের মতো ধেয়ে চলেছে পারস্পরিক ঘৃণা ও স্বার্থপরতার পিচ্ছিল পথে ধ্বংসের মুখে। জনগণ কোণঠাসা। যৌবনই পারে বিপর্যয়কে ঠেকাতে। নতুন প্রভাতের স্বপ্ন নিয়ে ক্রিস্টোফার নিউমোনিয়ায় মারা গেল বর্ষশেষে।

যে বহুসংখ্যক নারী ও পুরুষচরিত্র জন ক্রিস্টোফারের জীবনে যুক্ত হয়ে একটি নির্ঝরকে নদীতে পরিণত করেছে, তাদের নিয়েই অবশ্য চারখণ্ডের বৃহৎ জাঁ ক্রিস্তফ। কিন্তু সংক্ষেপে রোঁমা রলাঁর এবং জাঁ ক্রিস্তফের জীবনের ও সংগ্রামের বিষয়গুলিকে সামনে আনার জন্য একটা ছকেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের।

এই ছকটিকে সামনে রেখে জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে মন নিয়ে রলাঁ প্রবেশ করেছিলেন, সেটিকে বুঝবার জন্যে। প্রথমে একটি মুখবন্ধ, তারপর মূল উপন্যাসের একটি সামান্য অংশ।

(এক) 'জাঁ' ক্রিস্তফ' উপন্যাসের চতুর্থ বা শেষ খণ্ডের একটি মুখবন্ধে রলাঁ নিজেকেই দাখিল করেছেন। মুখবন্ধটি নিম্নরূপঃ

আমি একটি প্রজন্মের বিয়োগাত্মক কাহিনী লিখলাম। এই প্রজন্মের এটা হচ্ছে অন্তিম সময়। আমি এর ভাল কিংবা মন্দ কোন কিছুই লুকাইনি। আমি এর গভীর বিষণ্ণতাকে, এর বিশৃঙ্খল আত্মাভিমানকে, এর বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসগুলোকে লুকোতে চেষ্টা করিনি। এই প্রজন্ম একটা অতিমানুষিক কর্তব্যের দুর্বহ বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে। বোঝাটা সারা বিশ্বেরই। বিশ্বের নৈতিকতার, সৌন্দর্যবোধের, বিশ্বাসের নতুন মানবসমাজ গড়ে তোলার কর্তব্যের বোঝাকে এই প্রজন্মই যে বয়ে নিয়ে এসেছে, সে ঘটনাকেও আমি লুকোইনি।

হে যুবকেরা, হে আজকের মানুষেরা! তোমরা আমাদের উপর দিয়ে দল বেঁধে পায়ে পা মিলিয়ে চলে যাও। তোমাদের পায়ের তলায় আমাদের মাড়িয়ে চলে যাও। ঠেলে সজোরে এগিয়ে চলে যাও সামনে। তোমরা আমাদের চেয়ে আরও বড় হও, আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হও।

আমি নিজের দিক থেকে আমার আত্মাকে বিদায় জানাচ্ছি। আমি আমার আত্মাকে খোসার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। এর মধ্যে সারপদার্থ আর কিছু নেই।

জীবন হচ্ছে মৃত্যুপরম্পরা, পুনর্জীবনপরম্পরা। হে ক্রিস্তফ, আমাদের নতুন করে জন্মাবার জন্য মরতেই হবে। জাঁ ক্রিস্তফ বইটি শেষ করে আমি একে সমস্ত জাতির সেইসব স্বাধীনচিত্ত মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি, যারা কষ্ট পায়, সংগ্রাম করে এবং যারা অবশ্যই জয়ী হবে।

(দুই) জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাসের সর্বশেষ অধ্যায়ে নায়কের চিন্তাস্রোত এবং কথাবার্তার একটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে দাখিল করছি রলাঁকেই বুঝবার জন্য।

এই শেষ অধ্যায়ের কুশীলব হচ্ছে সবাই নতুন প্রজন্মের মানুষ। বিশেষ করে দুজন তরুণ যুবা। একজন হচ্ছে ক্রিস্টোফারের বন্ধু কবি অলিভিয়েরের ছেলে জর্জ। আদর্শবাদী কবি অলিভিয়ের প্যারিসে মে দিবসের শ্রমিক বিক্ষোভের সময় সামরিক পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে শ্রমিকদের পক্ষে ব্যারিকেডে অবস্থান নিলে সামরিক পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে মারা যায়। ক্রিস্টোফার এই সময়ে অলিভিয়েরের পাশে ছিল। বন্ধুর মৃত্যুতে ক্রিস্টোফার গভীরভাবে শোকার্ত ও মর্মাহত হয়েছিল। সুতরাং পিতৃহীন জর্জকে ক্রিস্টোফার নিজের ছেলের মতো দেখেছে। দ্বিতীয় তরুণ যুবা অলিভিয়েরের শিষ্য এমানুয়েল। সে হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের কবি।

ক্রিস্টোফার বুঝতে পারছিল যে, এই দুজনের সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ যেন কিছুতেই সহজ হচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না তার প্রজন্ম। ইউরোপিয় চিন্তার বিবর্তন ত্বরিতবেগে অগ্রসর হয়ে চলছে। ঘটনাটা এমনভাবে ঘটছে যেন নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং নতুন মোটর ইঞ্জিনগুলো এর গতিকে বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

মানসিক সংস্কার ও আশার যে ভাণ্ডার আগেকার আমলে মানবসমাজকে কুড়ি বছর মনের খাদ্য জোগাতে পারতো, সেটা আজ পাঁচ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটা মনোপ্রজন্মের পর আরেকটা মনোপ্রজন্ম ধেয়ে চলেছে। এক প্রজন্মের ঠিক পেছনেই আরেক প্রজন্ম। এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মকে অহরহ মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সময় হাঁকছে, "এগিয়ে চলো সবাই হেঁইও"।

ক্রিস্টোফার এমানুয়েলকে বললো, "এটাই হচ্ছে বিধান। যৌবন বার্ধক্যকে মাটি চাপা দেয়া। তবে আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন আমরা কাউকে বৃদ্ধ বলবার আগে তার ষাট বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। এখন ঘটনাটা অনেক বেশি দ্রুতবেগে ঘটছে। এটা বেতারের যুগ, এরোপ্লেনের যুগ। হত-ভাগা প্রজন্মের এরা কেউ বেশি দিন টিকবে না।"

রলাঁ তাঁর এই উপন্যাসকে নিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পতাকা হাতে প্রবেশ করেছিলেন যুদ্ধ থামাবার সংকল্প নিয়ে। ভাসা ভাসা আশাবাদ ও রঙীন স্বপ্নের লোকই ছিলেন না তিনি। যুদ্ধের মধ্যে অথবা যুদ্ধোত্তর সেই বিপ্লব ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য তিনি তৈরি ছিলেন, যার জন্ম হয় বাস্তব থেকে। এই জন্যেই ঝড়ের পাখিদের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক ঐক্য। তিনি জানতেন যৌবনের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে এখানেই। যুদ্ধ থেমে যাবার পরে ঝড়ের পাখি

তরুণযুবা আর্নেস্ট টলারের আবির্ভাবকে তিনি যে স্বাগত জানালেন, তার মূল রয়েছে তাঁর এই শিল্পী চরিত্রে।

টলারের মধ্যে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবস্থানের মধ্যে প্রধান সদর্থক ও নির্দেশক শক্তিকে সক্রিয় দেখতে পেলেন। এই শক্তি শ্রমিকশ্রেণী। ধূমকেতুর মতো টলার সেদিন সামনে এসেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর নাট্যকার হিসেবে। অবশ্য নাটক যা করে, টলার তাই করেছিলেন। শ্রমিককে বিপ্লবের নায়ক করার জন্য প্রায় নিজের সঙ্গেও যুঝতে হয়েছে। এই নিজের সঙ্গে লড়াইটা বরং টলারের নাটকে প্রাধান্যই পেয়েছে। এখানে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার ভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্যেও তীব্র লড়াই করতে হয়েছে শ্রমিককে। এই লড়াই অবশ্য কোন বিমূর্ত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিকতার জন্য নয়। এই লড়াই মানব সমাজের মুক্তির লড়াই, সংহতিসাধনের লড়াই। সংহতির মুক্তিতে ব্যক্তির উত্তরণের লড়াই।

রোঁমা রলাঁ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রকিশ্রেণীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, এই নাও তোমাদের হাতে আমার হাত। মনে রাখতে হবে, সমস্ত বাস্তবতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়েই যে শ্রমিকশ্রেণী নতুন সমাজ গড়তে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন রলাঁ।

এজন্য প্রকৃতপক্ষে রলাঁর প্রস্তুতিও অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। রলাঁ রচনা করেছিলেন ফরাসি বিপ্লবের গণনাট্য। রলাঁ রচনা করেছিলেন ফরাসি বিপ্লবের গণনাট্য। রলাঁ রচনা করেছিলেন গণ-উপন্যাস কোলা দ্য ব্রিউগঁ। (Colas De Breugnon)। লুকাচ ১৯৩৭ সালে ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। এর একটি অধ্যায় রোলাঁর উপরোক্ত উপন্যাস ও রলাঁ। টলারের নাটকের মতো এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা এসেছে গতরখাটা জনগণের মধ্য থেকে তাদের মুখের ভাষা নিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর নাট্যকার টলার ও গণনাট্যকার রলাঁর বন্ধুত্বের সেতু এই ঘটনাটিও। টলার এ ঘটনাকে সামনে না আনলেও গতরখাটা মানুষ যে দুই নাট্যকারের মেজাজকে ঘনিষ্ঠ করেছে, এই সত্য আমাদের আনন্দিত করে।

এই নাট্যকারের মেজাজের দরুনও রলাঁ প্রচণ্ড গতির প্রত্যেক যৌবনের জয়গান করেছেন। যৌবন মানুষকে বড় করেছে যন্ত্রকে অতিক্রম করে।

রলাঁ তাঁর বিবেকানন্দ জীবনীতে যৌবনেরই জয়গান করেছেন।

৫

অন্য দিক থেকে তরুণযুবা টলার রলাঁকেই যেন অভয় দিতে চেয়েছেন যন্ত্রের ব্যাপারে বেতারযন্ত্রকে বিশ্বব্যাপী জনগণের শান্তির সমাবেশের খবরা-খবরকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়ে।

টলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়ঙ্কর রূপকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর সোয়ালো-কাব্যগুচ্ছ একটি কবিতায় লিখেছিলেন,

"ইউরোপ তার এরোপ্লেনের জন্য গর্বিত

আমি গর্বিত আমার সোয়ালো পাখিদের জন্য ।"

কিন্তু কোন মানুষ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, তার উপরে তো নির্ভর করে যন্ত্রের ভালমন্দ দিক । টলার বেতারযন্ত্রকে বিশ্বের জনগণের বৈপ্লবিক শান্তির অভিযানের সীমান্তলঙ্ঘী বাহক রূপে দেখিয়েছেন ।

রলাঁ নিশ্চয় এতে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন ।

আমাদের সাম্প্রতিক জীবনে যন্ত্রের দ্বন্দ্বাত্মক প্রশ্নেও টলারের 'বেতারযন্ত্র' নিয়ে আবেদনে রলাঁর সম্মতি রয়েছে বুঝে নিতে আমরা যন্ত্রের প্রয়োগের মানবিক উপায়গুলি নিয়ে ভেবে দেখতে পারি ।

৬

আলোচনার সমাপ্তি টানছি টলারের একটি কবিতা দিয়ে । এই কবিতাটি টলার রলাঁকে জেল থেকে পাঠিয়েছিলেন । কবিতাটি নিম্নরূপ:

উষাকালের আগে

একটি বছর, একটি প্রহর সময়ের প্রান্তরে কি পরিচয় রাখে? এরা হচ্ছে সেই অকর্ষিত ক্ষেত, যা আমাদের বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করে ।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ধ্রুপদী কবি মায়াকভস্কি

১

শ্রমজীবীরা বিশ্বের দেশে দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে অথবা আজ হোক কাল হোক করবে । সমস্ত মৌল অর্থনৈতিক সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা জারী প্রথম কাজ । শিল্পকলা সাহিত্যেরও দখল নেয়া এই কাজের অন্তর্ভুক্ত । এই একান্ত বাস্তব ও অনিবার্যভাবে সম্ভাব্য বাস্তব থেকে উদ্ভব হয়েছে সাহিত্য শিল্পকলার নতুন সংজ্ঞা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের । এই সংজ্ঞার মূলসূত্র, শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ড এবং ইচ্ছা ও অনুভবই সাহিত্যশিল্পকলার চালকশক্তি ।

এই সংজ্ঞার সূচনা ঐতিহাসিকভাবে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবে, কারণ এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই প্রথম শ্রমজীবীদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সাহিত্য শিল্পকলার প্রবর্তন হয়েছে ।

মায়াকভস্কির বিশেষত্ব এই যে, যাঁরা সাহিত্য শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের দখল নেয়ার কাজে সৃজনশীলতায় এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যেও তিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন । মায়াকভস্কি তাঁর কাজ ও চিন্তা দ্বারা যেমন সোভিয়েত দেশে তেমনি সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরের জন্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী কবি হিসেবে ব্রতী ছিলেন, রয়েছেন এবং আগামীতেও থাকছেন ।

মায়াকভস্কির কবিতার ভূমিকা ও দায়িত্বের মূলে শুধু কি এই মূলবীজটিই বিবেচ্য? অর্থাৎ তিনি কাব্যে শ্রমজীবীদের প্রাধান্য ঘটাবার সঙ্গে আরও কি করেছেন, যেগুলোর আবশ্যকতা ছিল এবং পরেও থাকবে?

এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা দরকার এজন্য যে, ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে অধিককাঠামোর নতুন বিন্যাসের প্রবহমান প্রক্রিয়া কাব্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ব্যক্তিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং তরল অনুভবের সংস্থান প্রধানত কাব্যেই চাইবে মানুষ আগামীতেও।

অগাস্টিনো নেতো, পাবলো নেরুদা, নিকোলাস গিলেন, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কাজের ধারায় আমরা গণ-বিপ্লবের কাজের কথা ও সৌন্দর্য উভয়কেই খুঁজি।

সুতরাং প্রশ্ন, মূল ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মায়াকভস্কি ব্যক্তিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ও তরল অনুভবগুলোর মধ্যে কী ধারার পরিসর তৈরি করেছেন নিজের কবিতার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সকল কবিতার জন্যে?

২

এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মায়াকভস্কির কবিতার গনগনে অঙ্গার ঘাঁটলেই দেখা যাবে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ধ্রুপদী কবি তিনি নতুন ভিত্তি স্থাপন ও অধিকাঠামো বিন্যাসের কাজ একই সঙ্গে করেছেন।

মায়াকভস্কির কবিতা ও তার সহযোগী কাজগুলোতে প্রথমে ভিত্তি স্থাপনের এবং পরে অধিকাঠামোর উপাদানগুলোকে পরীক্ষা করলে আমাদের এ বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা বেরিয়ে আসবে।

৩

কাব্যে শ্রমজীবীদের পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন এবং অবিসম্বাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মায়াকভস্কির কাজের একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে তাঁর একাগ্রতার মধ্যে।

মায়াকভস্কি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন, 'তাকে আমি কমিউনিস্ট বলবো না যে অতীতের সেতুটাকে না ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ভবিষ্যতে যেতে চাইবে।'

কবিতায় শ্রমজীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তাগিদের তীব্রতা বুঝতে পারা যায় এই উক্তিতে।

মায়াকভস্কি ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯৩০। যখন তিনি ১৯১৭ সালে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবে শরিক হন, তখন তাঁর বয়স ২৪। অর্থাৎ তিনি তাঁর আয়ুষ্কালে ১৪ বছর মাত্র পেয়েছিলেন সোভিয়েত যুগে কাজের জন্য। নতুন কাজের পরিমাণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সোভিয়েত কয়লাখনির শ্রমিক বীর স্থাখানভের মতোই দৃষ্টান্ত স্থাপক।

বিপ্লবের আগেই রাগী আধুনিক নতুন ধরনের পরিশীলিত কবি হিসেবে নাম করেছিলেন তিনি। ১৭ বছর বয়সেই রীতিদ্রোহী ভবিষ্যৎবাদী কবিদের অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে কাজ শুরু করে ম্যাক্সিম গোর্কির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম যৌবনের কাজও শক্তি ও পরিমাণের দিক দিয়ে নিরন্তর সাধনারই পরিচায়ক।

কিন্তু সোভিয়েত বিপ্লবের শ্রমজীবীদের কবি হয়ে যে কাজ তিনি করলেন, তা গুণে ও পরিমাণে ১৪ বছরের সময়ের মধ্যে অভাবিতপূর্ব। কবির ১৩ খণ্ডের রচনাবলির মধ্যে ১২ খণ্ডই বিপ্লবোত্তর।

ঝড়ের সঙ্গে ঝড়ের বেগে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে সঙ্গে থেকে একাদিক্রমে বছরের পর বছরের ৩৬৫ দিনের নিরন্তর মুক্তিযুদ্ধ ও নির্মাণের হাজার কাজের অভিজ্ঞতাকে বিদ্যুৎ জ্বালার মতো সংগ্রহ করে তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী ধারা তৈরি করতে হয়েছিল। কাব্যের দুটি মূল ধারা যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে। একটি লোককাব্য, আরেকটি মহাকাব্য ও গীতি কবিতার পরিশীলিত ধারা। লোককাব্যে শ্রমজীবী জনগণের অস্তিত্ব প্রাধান্য পেলেও এতকাল পরিশীলিত কাব্যে এবং সাধারণভাবে পরিশীলিত সাহিত্যে শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের স্থান ছিল অকিঞ্চিৎকর। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এসে এই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। মায়াকভস্কি কাব্যে এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীর ভাঙ্গার অগ্রদূত।

পরিশীলিত এবং বিশেষ করে আধুনিক ধারার কবিতায় শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েত বিপ্লব ও জগৎব্যাপী অভ্যুত্থানকে প্রাধান্য দেবার জন্যে কবি হিসেবেই উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে মায়াকভস্কিকে। কারণ, কবিতা লিখে যে ধ্রুপদী কাজ করেছেন, তার যাচাই হয়েছে তৎক্ষণাৎ। বিপ্লবী সৈনিক সমাবেশে, কারখানা ও যৌথখামারে গণসমাবেশে নিত্য নতুন লেখা আবৃত্তি করতে হয়েছে। অসংখ্য বৃত্তি ও বিভাগের অগণিত ধরনের শ্রমজীবী নরনারীর অভিজ্ঞতাকে কষ্টিপাথর করে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন তিনি। চারণের মতো তাঁকে যেতে হয়েছে দূরে দূরান্তে। এই সময়সাপেক্ষ ভ্রাম্যমানতার মধ্যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কি ঘটেছে তা লক্ষ্য করতে হয়েছে। তাঁর ১৪ বছরের সোভিয়েত পর্বেই তিনি ফ্রান্সে, জার্মানিতে, মেক্সিকোতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিবাদীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। কবিতার কাগজ বের করেছেন সোভিয়েত পর্বেও একাধিক। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯২০ সালে জনগণকে সর্বশেষ খবর জানানোর জন্যে সংবাদসংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন। ওই সময় ৩ হাজার পোস্টার ও ৬ হাজার শিরোনামা লিখেছিলেন। এগুলো ছিল ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গবাণী। ১৯২৮ সালে সারা সোভিয়েত দেশে পরিভ্রমণ করার সময় কবিতার শ্রোতাদের কাছ থেকে ২০ হাজার প্রশ্ন সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে একটা বই লেখার কথা ভেবেছিলেন।

অর্থাৎ, শ্রমজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমজীবী সমস্ত গুণ আয়ত্ত করেছিলেন।

যখন চিন্তা করা যায়, 'বেডবাগ' ও 'বাথ হাউস' নামের দুটি পূর্ণাঙ্গ গদ্য নাটক লিখেছিলেন তিনি এই ১৪ বছরের মধ্যেই তখন তাঁর শ্রমময়তাকে উপলব্ধি করা যায় তীব্রভাবে।

মায়াকভস্কি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্রেরও একজন নীতিনির্ধারক ও নির্মাতা। তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, চিত্রনাট্য লিখেছেন। বছরের পর বছর আইজেনস্টাইন ও অন্যান্য সাথীর পাশাপাশি কাজ করেছেন তিনি।

সুতরাং বুঝতেই পারা যায়, কী বিস্ময়কর তাঁর পরিশ্রম ও জেদ এবং চেতনা এবং গতি ও নির্দিষ্টতা।

এর মধ্যে সময় করে একটি আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন তিনি গদ্য কড়চার রীতি।

একটি কড়চায় তিনি বলেছেন, একটি উপন্যাসকে তিনি মাথায় নিয়ে ঘুরেছেন, কিন্তু লিখে উঠতে পারেন নি।

তার অবস্থাটা ছিল এই রকম।

তাঁর সাথী কবি আসেয়েভ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, মায়াকভস্কি কোন খসড়া না করেই কবিতা লিখতেন। কাটাকুটি কম থাকতো। প্রকৃতপক্ষে ভাবনাগুলোকে তিনি মাথায় করে নিয়ে ঘুরতেন এবং সেখানেই ঠিকঠাক করে নিতেন। এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তার তীব্রতা তাঁর একটি উক্তি দ্বারা অনুধাবনীয়। মায়াকভস্কি একটি কবিতায় লিখছেন:

'এক টন শব্দের ধাতু ছেঁকে আমি বার করে আনি একেকটা কথা।'

মায়াকভস্কি ১৯২০ সনে 'পুশকিনের প্রতি' কবিতায় লেখেন, "আমার লঘু মস্তিষ্কে হাজার টনের ভার চাপানো রয়েছে।"

এই সমস্ত কিছুকে নিয়েই অবশ্য মায়াকভস্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী কবি।

তিনি শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন সারা সোভিয়েত দেশে এবং সীমান্ত ছাড়িয়ে।

'ইহা' কাব্যে মায়াকভস্কি কবিতা লেখার প্রক্রিয়াকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কবির মস্তিষ্ক থেকে কবিতার উৎপাদন যেন যন্ত্র থেকে একটা সুন্দর কিছু বেরিয়ে আসার শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া।

কমিউনিজমের আদর্শে নিয়োজিত শ্রমজীবীদের সঙ্গে মায়াকভস্কির একাত্মতার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত দুটি অনুচ্ছেদ:

(ক)

"শ্রমজীবীরা
    কমিউনিজমে আসে
    পাতাল থেকে খনি থেকে
    কাস্তে থেকে কারখানা থেকে।
আমি কমিউনিজমে
    নিজেকে নিক্ষেপ করেছি
    কবিতার উঁচু চূড়া থেকে।
কারণ এছাড়া আমার জন্যে
    কোনো প্রেম নেই।"

(ঘরে ফেরার পথে- ১৯২৫)

(খ)

আমি যে কবি আমার
বজ্রনাদী শক্তি সমস্তই
সঁপেছি তোমাকে হে
আমার শ্রেণী
তুমি ন্যায়যুদ্ধে ব্রতী।
'শ্রমিকশ্রেণী' কথাটাকে কাব্যে ব্যবহারে
বড়ই বেয়াড়া মনে করে তারা
যারা কমিউনিজম কথা শুনলেই
আঁতকে ওঠে।
এই কথাটা কিন্তু আমাদের কাছে
বিশাল সঙ্গীত
এ সঙ্গীতে মৃত জেগে উঠে
অবতীর্ণ হতে পারে সংগ্রামে।
(লেনিন-১৯২৪)

৪

মায়াকভস্কি যে কমিউনিজমের আদর্শে তাঁর কবিতার ধারাকে কিভাবে উৎসারিত করেছিলেন, তার প্রকাশ শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি সংগ্রামে দিশারী লাল পতাকা ব্যবহারে।

প্রেক্ষাপটটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঝড়ের গতিতে অগ্রসর সোভিয়েত বিপ্লব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ডে বহুজাতিকে শ্রমজীবী জনগণকে সমমর্যাদা দিয়ে একত্রিত করেছে, এগিয়ে নিয়ে এসেছে লাল পতাকা। শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রক্ষমতার বর্ণিল ঘোষণা। চেতনার তড়িৎশিখা। সারা বিশ্বের মেহনতী মানুষের ভ্রাতৃত্বের শপথ-ছবি।

এই লাল পতাকার মধ্যেই তাই পাওয়া যাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী উপাদানকেও।

এই প্রয়োগ যে মায়াকভস্কির কবিতা রীতিতেও একটা বৈশিষ্ট্য, তার দৃষ্টান্ত-নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলি:

ঈগলের চোখ কি কখনো ঝাপসা হয়?
আমরা কি মান্ধাতা আমলের দিকে ফিরে তাকাতে পারি?
বুক টান করো, কাঁধ সোজা করো
আকাশে আকাশে আটকে দাও
হিল্লোলিত লাল পতাকাগুলোকে।
প্রশ্নই ওঠে না ডানে যাবার।
বাম!

বাম!
বাম!

(লেফ্‌ট্‌-১৯১৮)

চিরকাল মনে আমাদের থাকছে
লাল পতাকা
অনেভা অঙারের মতো
জ্বলন্ত।

(সেভের্দেলভেস্ত)

এগিয়ে চলো। ঐ সম্মুখে লাল পতাকা।
ঘরকুণোর পঙ্কশয্যা ছেড়ে বার হও।
আমাকে বার চারেক ধরবে বার্ধ্যকের জুজু,
তবে ফিরিয়ে আনবো যৌবনকে প্রতিবারই
শেষটায় কবর নাগাল পেতে পারে আমার।
তখন যেখানে মরিনা কেন
গান গেয়েই মরবো।
যে আঘাটাতেই ঢলে পড়ি না কেন,
নিশ্চিত জানি,
যারা শুয়ে আছে লাল পতাকার তলায়
আমি তাদের একজন হবার যোগ্য।

(ইহা-১৯২২-২৩)

(আমার কাব্যের)
শেষ পাতাটাও
তোমাদের দিচ্ছি
হে শ্রমিকশ্রেণী পৃথিবী গ্রহের
আমাদের সবাইকেই
লাল পতাকার তলায়
একত্রিত করেছে
অশ্রান্ত শ্রম অনশন অনাহার।

(উচ্চকণ্ঠে-১৯৩০

৫

লাল পতাকার এই ব্যবহার থেকে একটি সিদ্ধান্তে যেতে চাই।

মায়াকভস্কি যে কবিতায় শ্রমজীবীর প্রাধান্য প্রকাশের জন্যে দ্ব্যর্থহীন অবস্থান নিয়েছিলেন, লাল পতাকার উপরোক্ত ব্যবহারগুলি তার স্মারক।

এই সূত্রেই মূর্ত প্রতীক নিয়ে কাজ করার বহুকালের কাব্যিক সংকোচকে ভাঙবার জন্যেও এই লাল পতাকার ব্যবহার লক্ষণীয়।

আধুনিক কবিতার বিমূর্ত প্রতীক এবং স্বপ্নমঙ্গলের রীতির ব্যবহার করেননি মায়াকভস্কি। মূর্ত রূপকল্প ও প্রতীককে নানা কৌণিকতায় প্রয়োগ করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। লাল পতাকার প্রতীক ব্যবহারেও এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। উপরন্তু মায়াকভস্কি কখনও তাঁর রূপকল্প ও প্রতীকের কৌণিক প্রয়োগের পুনরাবৃত্তি করেননি। তাঁর মূর্ত রূপকল্প ও প্রতীক এইজন্যে অসংখ্য। মায়াকভস্কি মহাজীবনের কবি। শ্রমজীবীদের বিপ্লব সোভিয়েত দেশে একটা বহুকালের জনগণের ঈপ্সিতকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে এবং সারা বিশ্বেই তা করতে যাচ্ছে—এই প্রক্রিয়াটি তাঁর কবিমানসে উদঘাটিত হয়েছিল। দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও যে অজস্র বিচিত্র অনন্য রূপ উন্মোচিত হচ্ছিল তাকে মনের পটে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না যেন। কিন্তু যে অসংখ্য মূর্ত রূপকল্প তাঁর মনে জেগেছিল, সেগুলিকে সীমাহীনভাবে সজাগ থেকে থেকেই ধরেছেন।

এত অজস্রতার দরুন তাঁর মূর্ত রূপকল্পগুলিও দুর্বোধ্য হয়েছে প্রধানত দুটো কারণে। প্রথমত, অভিজ্ঞতার এত বেশি কৌণিক বাস্তব আলেখ্যের খেই রাখতে পারেননি তাঁর সমসাময়িকরা সকলে। দ্বিতীয়ত, বিশাল ও বিচিত্র ও বহমান অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখার জন্যে তিনি সংক্ষিপ্ত বাকরীতি প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত এবং বিদগ্ধ বাকরীতি সত্ত্বেও মায়াকভস্কি তাঁর প্রত্যেকটি কবিতাকেই শ্রমজীবী জনগণের কাছে হাজির করে যাচাই করে নিয়েছেন তার সত্য ও সৌন্দর্যকে।

লেনিনের অনুসারী মায়াকভস্কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূলসূত্র-'জনগণের জন্যে সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাই যেন এক ধরনের গণভোট দ্বারা মায়াকভস্কি নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন।

মায়াকভস্কির একটি নিশ্চয়তা, মেহনতী নরনারী যে বিশাল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন মানবতার আঁচ নিয়ে গড়ে উঠেছে, তিনি সেখান থেকেই মানবমানবী ও উপকরণ নিয়েছেন। এমনকি কিম্ভূতকিমাকার কিংবা ভোজবাজী ধরনের কাণ্ডকারখানাও যখন নিয়েছেন তখন নিশ্চয় জেনেছেন, শ্রমজীবীরা ব্যাপারগুলোকে তাঁর চেয়ে বেশি ভাল জানেন।

শ্রমজীবী জনগণও তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। তাঁরা যেটা বুঝতে পারেন নি, সেটা হাঁকডাক করে বুঝে নিয়েছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কবিতা শুনেছেন লালফৌজের সৈনিকরা, কলকারখানার শ্রমিক নরনারী, যুব সমাজ এবং কৃষকরাও।

আরও একটি কারণ ছিল দুরূহ কাব্যের এই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আদরের। মায়াকভস্কি শতকরা শতভাগ বিদগ্ধ কবিতাতে লোককাব্য বা রূপকথার রীতি কাজে লাগাতেন।

১৯২৭ সালে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের দশ বছর পালন করার সময় মায়াকভস্কি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাজের ভিত্তিটা কোথায়-

কিংবদন্তী নয়,
মহাকাব্য নয়,
পুরাণ নয়,
সবই নিঃশেষিত।
ডানা মেলে উড়ে চলো,
হে কবিতা
টেলিগ্রাম-কায়া
কাজে লেগে যাও, নত হয়ে
তৃষ্ণায় চৌচির ঠোঁটে
পিপাসা মিটাও সেই নদী থেকে
যার নাম বাস্তব ঘটনা।

(উত্তম)

এই বাস্তব ঘটনার যারা কাজের কাজি তাঁদের জয়গানে মন্দ্রিত করেছেন তিনি তাঁর কাব্যকে। দৃষ্টান্ত, একই সঙ্গে ভারি ও কোমল।

কবিতার নাম 'কুজনেস্তকস্ত্রয় ও তার নির্মাতাদের কাহিনী'।

শিরোনামায় একটি গদ্য মুখবন্ধ :

এখানে ১০ লক্ষ ওয়াগন গৃহনির্মাণের জন্য জিনিসপত্র পাঠানো হবে। একটা বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বিশাল কয়েকটা কয়লা খনি এবং লক্ষ লক্ষ লোক থাকার জন্যে এক নগরী তৈরি হবে পাঁচ বছরের মধ্যে-

মূল কবিতাটির আংশিক তর্জমা :

"মেঘেরা চলেছে ভিড় করে দল বেঁধে আকাশ ভেদ করে
ঝরঝর বৃষ্টি বুকচাপা।
কয়েকজন শ্রমিক বিছানা পেতেছে
একটা রদ্দি ছ্যাকরা গাড়ির তলায়।
ঐ শ্রমিকেরা ফিসফাস করছে
পরস্পর,
'গড়ে উঠবেই একটা বাগান নগরী এখানে
চার বছরেই পারা যাবে।'

দড়ির মতো মোটামোটা ধারার বৃষ্টি
একেকটা যেন চাবুকের ঘা।
শিসার মতো ভারী রাত কালির মতো অন্ধকার।
পরনের জামা কাদায় কাদাময় শ্রমিকদের।
মশাল জ্বলছে মিটিমিটি মিটিমিটি
ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে জাম ফলের মতো নীল শ্রমিকদের ঠোঁটগুলো।

তবু ফিসফিস ফিসফিস
'এখানেই তৈরি হবে
বাগান নগরী!'
কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয় ক্রমে
বৃষ্টি আর মেঘের তর্জন চাপা পড়ে।
বাগান নগরী তৈরি হবেই
কারণ গড়বে এমন সব লোক যারা আমার
চোখের সামনে ঐ
সোভিয়েত রুশে।"

৬

উপরোক্ত অগণিত বাস্তব ঘটনাকে ঝাড়াই বাছাই করে কবিতায় ঢালবার ব্যাপারটাকে মায়াকভস্কি আয়ত্তে রাখতে পেরেছিলেন বলে তাঁর এমন লেখা প্রায় পাওয়াই যাবেনা যা তাঁর ভাষাতেই তাঁর 'কবিচিত্তের চুম্বকাক্ষেত্র' থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে।

ভাব-প্রবণতা বেশ কিছু পরিমাণে তাঁর মধ্যে না থাকলে বিপ্লবের বিশাল ভাবপ্রবাহে শরিক হতে পারতেন কি? তিনি ছিলেন একটা 'সূক্ষ্ম তারের বাজনা'। বিপ্লবের আগে মায়াকভস্কির কাব্যচিত্তে ভাবের ঘোর খুব বেশি ছিল বিদ্রোহের বস্তুগত অবলম্বন না থাকায়। কিন্তু এই ভাবপ্রবণতাকে তিনি সংহত করতে পেরেছিলেন বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই।

কোন কাজের মধ্যে গতানুগতিকতা ও হুকুমনবিশী তাঁর কাছে ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী, কমিউনিজমের আদর্শের বিরুদ্ধে। আত্মসমালোচনা ছিল তাঁর কাছে অপরিহার্য। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে জড়িয়েছিলেন যে একটু উনিশ-বিশ দেখলে চীৎকার করে উঠতেন। এই সূত্রে তিনি এমন সব ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন যেগুলি সাংঘাতিক রকমের আক্রমণাত্মক। কর্তাব্যক্তিদের কাগুজে জল্পনাকল্পনাকে তিনি সুযোগ পেলেই ঠকতেন।

কর্তৃত্ববিলাসীদের একান্তভাবে হাস্যস্পদ করে লেখা কবিতা যখন তিনি জনসমাবেশে রসিয়ে রসিয়ে প্রত্যেকটা শব্দের উপর জোর দিয়ে পড়তেন, তখন তিনি এবং শ্রমজীবী শ্রোতৃবৃন্দ তা' তারিয়ে উপভোগ করতেন। এ ব্যাপারটাতেও মায়াকভস্কি কাব্যে কোন বিচ্যুতির প্রশ্নের উদ্রেক হয়নি। কারণ বিপ্লবই একমাত্র বিচার্য বিষয় থেকেছে। বিভিন্ন সংস্থার ভারপ্রাপ্তরা একই সঙ্গে গোটাকয়েক সম্মেলনে ব্যস্ত থাকায় সংস্থার কাছ থেকে কাজ না পেয়ে যে রাগ ঝেড়েছেন মায়াকভস্কি তাঁর 'সম্মেলন সংঘটিত কবিতায়, তাতে তিনি দেখিয়েছেন ভারপ্রাপ্তদের ধড় একটা সম্মেলনে, মাথা আরেক সম্মেলনে। আসল কাজের সঙ্গে দেখা নেই, কাগজে কাগজে সয়লাব-এই প্রবণতাটাকে কঠোর ব্যঙ্গ দ্বারা ঠুকেছেন কবি তাঁর 'কাগুজে' কবিতায়। শ্রমজীবীদের বিপ্লবের অস্থির অশান্ত সন্তান মায়াকভস্কি এখানে আপসহীন। বেশ কিছু ভোগবাদী কর্তাব্যক্তি এতে রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মায়াকভস্কি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি আলসেদের কোপানলে পড়েছিলেন। তবে বিপ্লব প্রসারিতই হয়ে চলেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকেরা এবং বিশেষ করে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে বলতে গেলে 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি পেয়েছিলেন লেনিনের সম্মতি।

এখানে মূল কথাটা এই যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং কমিউনিজমের আদর্শ জনগণের যৌথ ও ব্যক্তির মুক্তির সংঘটক হিসেবে বাস্তব ঘঠনারূপে মায়াকভস্কি এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এই বৈপ্লবিক সম্মতির আবহেই মায়াকভস্কির লেখার তাগিদ দশটা সাংগঠনিক কাজের মধ্যেও থেকেছে দ্বিধাহীন। দীর্ঘ কবিতা দাবী করেছে একেকটা বিষয়ে দীর্ঘ একাগ্রতা এবং দারুণ পরিশ্রম। মায়াকভস্কি এ দাবী মিটিয়েছেন।

মহাকাব্য লেখার দীর্ঘ কালের রেওয়াজে সায় না দিলেও মহাকাব্যিক বড় কবিতাও তাঁকে লিখতে হয়েছে সোভিয়েত বিপ্লবের বিশালতা এবং তার মধ্যকার অসংখ্য সূক্ষ্ম কাজগুলোকে ভাষা দেবার উদ্দেশ্যে। লিখেছেন তিনি কাব্যনাট্য 'মিস্ট্রি বুফে', কাব্যনাট্য '১৫০০০০০০০'। লিখেছেন আধুনিক মাহাকাব্য 'লেনিন'। 'উত্তম' নামে দীর্ঘ কবিতাও যেটিকে লুনাচারস্কি বলে ছিলেন, 'এ কবিতা কাঁসার ধাতুতে অক্টোবর বিপ্লবের ভাস্কর্য।' লিখেছেন তিনি 'ইহা' অর্থাৎ 'প্রেম বিষয়ক'। এই সব কবিতাই এমন একেকটি মূল্যবোধে আশ্রিত, যাদের প্রত্যেকটি বিশ শতকের ঘটনাবলিতে উন্মোচিত হয়ে চলেছে এবং এই কারণেও মায়াকভস্কি ভাবীকালেরও কবি হয়ে রয়েছেন।

১৯১৮ সালে লেখা 'মিস্ট্রি বুফে' অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের সংগ্রামী উল্লাসকাব্য। রূপকের ছাঁচে ঢালা। মেহনতী মানুষ আজ স্বর্গ মর্ত নরক বা ত্রিভুবন জয়ী। মেহনতী মানুষেরা দুঃখের অধ্যায়গুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই মর্তভূমি পৃথিবী গ্রহ নতুন জগতের কর্মভূমি হিসেবে নির্বাচিত। সারা পৃথিবীর বুর্জোয়াদের বা পরগাছা পরশ্রমভোগী বিলাসব্যসন-ভোগকারীদের উৎখাত করে, নরকে পাঠিয়ে ধূলোমাটি কালিঝুলি মাখা অপরিছন্ন শ্রমজীবীরা, খাদ্য বস্ত্র যন্ত্রের উৎপাদকরা দখল নিয়েছে পৃথিবীর। শেষ দৃশ্যের একটি চুম্বক লক্ষণীয়; বুর্জোয়ারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে পৃথিবীর যে ক্ষতি করেছে, মেহনতী মানুষেরা পৃথিবীর দখল নিয়ে সেগুলোকে মেরামত করে নিয়ে পত্তন করেছে মানুষের বহু প্রতীক্ষিত সাম্যের।

পর্দা উঠতেই দেখা যায়, কারখানা ও আবাসগৃহগুলো আকাশ ছোঁয়া। রেলগাড়ি, ট্রাম, মোটরগাড়ি, রংধনু গায়ে গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগরীর মাঝখানে উদ্যান, তাতে তারা, চাঁদ আর সূর্যের আলোকমালা। নানারকমের পণ্যের 'হাতুড়ি ও কাস্তের' নেতৃত্বে মঞ্চে প্রবেশ। তাদের হাতে উৎসবের রুটি আর নুন। ভিড় করে জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একধারে এক দল অপরিচ্ছন্ন মানুষ।

অপরিচ্ছন্নরা–আহা আহা আহারে।

তৈজসপত্র–হা হা হা হা হারে।

চাষী–তোমরা কারা? কাদের তোমরা?

তৈজসপত্র–কাদের আবার?

চাষী–তোমাদের অধিকারীর নাম কি?
তৈজসপত্র–আমাদের কোন অধিকারী নেই।
আমরা সবাই প্রতিনিধি।
হাতুড়ি ও কাস্তে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।
এরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতীক।

যন্ত্রদের প্রবেশঃ
যন্ত্রেরাঃ আমাদের দোষ ভুলে যাও শ্রমজীবীরা।
তোমাদের হাতে আমরা গড়া
তোমরাই জোড়া দিয়েছ
তোমরাই শক্ত পোক্ত করেছঃ
কিন্তু বুর্জোয়ারা আমাদের জবর দখল করেছিল।
ওদের হুকুমে তোমাদের খাটাতাম।
ছিঁড়তাম খুড়তাম।
এবার ঐ চাবিঁওয়ালারা খতম।
এখন আমরা স্বাধীন।
এখন আমরা তোমাদের
তোমাদের জন্যে কাজ করবো।
তৈজসপত্র–আমাদের তোমরা নাও, শ্রমজীবীরা।
খাদ্যেরা–পরগাছা আল্‌সেদের শেষ করেছ তোমরা।
রুটি এখন স্বাধীন এবং মিঠে দুই-ই।
এতদিন যা চোখে দেখেছ অথচ না পেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষেছ,
সবই তোমাদের শ্রমজীবীরা, ধরো, খাও।
অপরিচ্ছন্ন শ্রমজীবীরা এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়।

চাষী–মাটি,
এই মাটি
আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি।
ঘরামি–আমি একটা করাত নেবো।
এতকাল বেকার থেকে থেকে
আমার হাত দুটো ঢিলে হয়ে গিয়েছে।
অথচ আমার এখনও যৌবন, দেখো।
করাত–আমাকে নাও তুমি।
সেলাইজীবীনী–আমার দরকার একটা সূচেঁর। আমার হাতটা নিশ্‌পিশ্ করছে।
সূচঁ–আমাকে নাও।
ছুতোর–আমার দরকার একটা হাতুড়ির।
হাতুড়ি–নাও আমাকে।
অপরিচ্ছন্ন, তৈজসপত্রেরা, যন্ত্রেরা, খাদ্যেরা একটা

বৃত্ত রচনা করে উদ্যানে।
সমবেত ঘোষণাঃ ওটা কি আকাশ না ক্যালিকোর ছিট কাপড়?
ঐ ছিট কাপড় যখন আমরা বানিয়েছি
তখন কোন্ দরজাটা আমাদের জন্যে হাট করে খোলা না থাকবে?
আমরা পৃথিবীদের স্থপতি
আমরা গ্রহদের রূপকার।
আমরা স্রষ্টা সমস্ত আশ্চর্যের।
বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে আকাশ থেকে ঝেটিয়ে ফেলে দেব মেঘ।
আমরা নদীগুলোকে ভরে দেব মধুতে।
খোঁড়ো। চাং তোলো। সেলাই করো।
ছেঁদা করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।
অপরিচ্ছন্নদের গান:
রূপকথা আজ সত্য হলে।
বিশ্বকে আমরা মিলিয়েছি কমিউনে।
শ্রমজীবী মানুষের মালায়
সমস্ত দেশ জড়ানো।

এই কাব্যনাট্যকে সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চের প্রথম নাটক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। সোভিয়েত নাট্য পরিচালক মেয়ারহোল্ড এই কাব্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন। শোস্টাকোভিচ এর সুর সংযোজনা করেন। এঁরা সারা বিশ্বে দিকপাল হিসেবে পরিচিত। ১৯২১ সালে এই কাব্যনাট্যের জার্মান ভাষ্য মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। কয়েকটি কারখানাতেও এই কাব্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ এর মধ্যে থাকে কবিতা, শিল্পী ও তাত্ত্বিক এবং খেটে খাওয়া নরনারীর সহযোগিতা।

মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের মূল কথা যে বিশ্বের রূপান্তর ঘটানো, তার ভিত্তি স্থাপিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। শ্রমজীবীরা যাতে সারা বিশ্বকে তাঁদের ধ্যানধারণায় পরিষ্কার রাখতে পারেন, তারও পথ করে দেয় এই অক্টোবর বিপ্লব। মায়াকভস্কি এই বিশাল দার্শনিক প্রেক্ষাপটকে প্রত্যেকটি শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতার আওতায় স্থাপন করে 'মিস্ট্রি বুফে' লিখেছেন। অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে নি। কারণ মানুষ জয় করেছে ত্রিভুবনকে। এতে রয়েছে বিজ্ঞানের বাহাদুরি আর শ্রমজীবী মানুষের কেরামতী। এই কাব্যনাট্যের অনুষ্ঠান আছে সার্কাসের হাসি উল্লাস ও উল্লম্ফন আর ভাঁড়ের খেলা। শারীরিক বিস্ময়কর কসরত মেহনতী মানুষের প্রিয়। কারণ তারাই এটাতে পারদর্শী। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, গ্রীক পুরাণের মহাশক্তিধর হারকিউলিসকে গোর্কী প্রথম শ্রমবীর বলেছেন। এই সব কিছু নিয়ে এদের ছাপিয়ে রয়েছে কবিতার বাণী। সোভিয়েত বিপ্লবের দর্শন। জ্বালানির মতো একই সঙ্গে বিশাল যন্ত্রচালক এবং ঘরোয়া উনূনের উত্তাপ।

'মিস্ট্রি বুফে' লেখা এবং তার মঞ্চায়ন হতে না হতেই মায়াকভস্কি ১৯১৯-২০ সালে লেখেন ১৫০,০০০,০০০ কাব্যনাট্য। সাম্রাজ্যবাদীরা গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে এবং

অবরোধ ও হামলা করে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যে প্রয়াস করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সোভিয়েত জনগণ। এটাও ছিল জনগণের এক বিরাট অভ্যুত্থান। কবি এই বিশাল অভ্যুত্থানকে ভাষা দিয়েছিলেন ১৫০,০০০,০০০ কাব্যনাট্যে।

এই ১৫ কোটি নাম দেয়া থেকে শুরু করে এর বাক্-পদ্ধতি অভিনব এদিক দিয়ে যে, কবি যেন শুধু গণবাণীর উৎসমুখ খুলে দিয়েই গা হাত পা ঝেড়ে বসে থাকতে পেরেছেন। ভাষা আধুনিকতম, এইজন্যে একে লোককাব্যও বলা যায় না। অসাধারণ পরিশ্রম করে মায়াকভস্কি লিখেছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অহংকার নেই, কারণ, যে জনগণ বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রকে তাড়িয়েছে, তাদের কথারই তো তিনি শুধু লিপিকার। ১৫ কোটি এক ধরনের 'অটোমেটিক' লেখা, যা বেরিয়ে এসেছে বিপ্লবী জনগণের সংস্পর্শে।

এই জন্যেই প্রথমে নাম দেননি নিজের। অপেক্ষা করেছেন, অন্যেরা কাব্য-নাট্যটিকে প্রসারিত করুক। কেউ এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসায় এবং কে লিখেছে তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পরে মায়াকভস্কি নিজের নামে ১৫০,০০০,০০০ কাব্যনাট্য প্রকাশ কারনে। এই ঘটনাটা তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন ১৯২৯ সালে।

এই কাব্যের দুটি অনুচ্ছেদ লক্ষণীয় :

১. ১৫০,০০০,০০০ কথা বলছে
আমার দুটি ঠোঁটে।

২. আমি যেন মানবসমাজের নববসন্ত
শ্রমের এবং সংগ্রামের ব্যূহসজ্জায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি
আমার সমাজের গান গাইছি আমি
গাইছি আমার এ মাতৃভূমির গান।

এরপর মায়াকভস্কি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন 'ইহা' নাম দিয়ে। প্রেমকে বিপ্লবের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এভাবে প্রেমকে উদ্দীপিত করার যুক্তি দেখান। এই কবিতায় লাল পতাকার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, তবে প্রেমিকের অন্তর্জগৎ বর্ণনার মঞ্চ।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর পরই মায়াকভস্কির শোকগাথা আবার বিশ্বব্যাপী বিশাল পটভূমিতে লেখা। স্থান এবং কাল উভয় দিক দিয়েই। সময়ের দিক দিয়ে দুশ বছরে এবং স্থানের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে লেনিনের জীবনতরঙ্গের অভ্যুদয়। কার্ল মার্কস এখানে লেনিনের বড় ভাই। বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের দুশ' বছরের প্রধান লড়াইগুলো একসঙ্গে ও এমন মেজাজে বলা হয়েছে যে মনে হয় শ্রমজীবীরা আলাপ করছেন ঘরোয়া ভাবে। মানবতা, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা স্বার্থান্ধ যুদ্ধ ও ধ্বংস নিয়ে আসে স্বদেশ ও উপনিবেশিক দেশগুলিতে। তার বিরুদ্ধে লেনিন সংহত করেন সমস্ত নিপীড়ত জাতিকে ও সমস্ত নিপীড়িত মেহনতী মানুষকে এবং সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের

মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র স্থাপন করেন। বীর লেনিন ও বীর শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র কৃষক এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনার নায়ক।

লেনিনের জীবন এমনভাবে বলা হয়েছে যে, তত্ত্ব আছে পুরোপুরি, উন্মাদনাও আছে। মার্কসীয় তত্ত্বে খুঁত নেই, ঘটনার শিথিলতা নেই। তবে মূলত চরিত্র কাব্য এবং এই জন্যই বলা যায়, লেনিন আধুনিক মহাকাব্য। প্রস্তাবনাটি একেবারেই মহাকাব্যিক রীতিতে বলা,

মানুষ
সাগর পাড়ির নৌকা যেন, যদিও ডাঙ্গায়।
জীবনের
টানা হেঁচড়ায় হরেক রকমের জঞ্জাল
পাথুরে সাগর থেকে খসে খসে
আমাদের নৌকার গায়ে লেপটে যায়, তারপরে
ঝড়ের উন্মত্ত ফেনিলতা কাটিয়ে উঠতেই
রোদে পিঠ রেখে কিছুক্ষণ বসে
আঁঠালে শেওলা আর পিছল মাছের আঁশ
কাঁচিয়ে ফেলে দি আমাদের
নৌকার গা থেকে
নৌকার গায়ের মত আমারও আষ্টেপৃষ্ঠে জঞ্জাল
তাকেও নিংড়ে ফেলে দিয়ে বিপ্লবকে সাথে নিয়ে
সাগরে দিয়েছি তুলে পাল আমি
হয়েছি অনুসারী লেনিনের।

তিনটি দৃষ্টান্ত দিলে লেনিন কাব্যের মেজাজ এবং মূলমর্মটিকে পাওয়া যাবে:

১. একজন ব্যক্তির দৌড়ে কতদূর?
কারও উপকারে আসে না সংসারে।
একজন ব্যক্তি,
যত বড়ই হোক
একটা দল ছাড়া কাঠের গুড়িঁকে তুলতে
পারে না
উচুঁ বাড়ি তোলা তো দূরের কথা।
কিন্তু পার্টি মানে লক্ষ লক্ষ
কাণ্ড,
মাথা,
চোখ,
সংযুক্ত
এবং একসঙ্গে একই কাজে ব্রতী।
পার্টি

কম্পাস
আমাদের পথে ঠিক রাখে।
শিরদাঁড়া
সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর
লেনিন
এবং পার্টি
যমজ সহোদর।
কে বলবে
জননী ইতিহাসে
কে বেশি আদৃত?

২. যখন শ্রমিকেরা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়েও
তাদের বিপ্লবী পথে
প্রথম পদক্ষেপ করেছিল
দৃঢ়চিত্তে
তখন বিশাল
প্রজ্জ্বলন্ত চুল্লিতে
মার্কস তাঁর মন ও হৃদয়কে ঝালিয়ে ছিলেন।
মার্কস যেন প্রত্যেকটা কারখানায়
কাজের পালায় হাড়ভাঙ্গা খাট্‌নি খেটে
হাতে তেলকালি মেখে, প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেছেন,
তাই বাড়তি মূল্যগ্রাসী পুঁজিপতি তস্করেরা
বমাল ধরা পড়ে গেছে তাঁর হাতে।

৩. (লেনিনের মৃত্যুর পরে পথে পথে জনতা)
পতাকা নিয়ে কিংবা
পতাকা ছাড়াও ওরা এসেছে
যেন সমস্ত রুশিয়া
আবার যাযাবর হয়ে গেছে কিছুকালের জন্যে।

৪. ক. বরখাস্তের নোটিশ
খাদ্যের দোকানে জানালার ধার দিয়ে
বেকারেরা চলে যায় তাকিয়ে তাকিয়ে
পেট গিয়ে পিঠে ঠেকেছে।
ডাক তাই এলো কুঁড়েঘর আর বস্তি থেকে,
শিশুদের কান্নাকে ছাপিয়ে,
"এসো, কে বাঁচাবে
এসো অন্যায়ের প্রতিকার করবে যে,
এসো আমরাও

সংগ্রামে নামবো,
এবং যেখানে বলবে যেতে যাবো
সেখানেই ।"

খ. ঐ শোন নিগ্রো কি বলছে, তার পিঠে–
চাবুকের কত মার, বলছে ভুট্টা আর কলার বাগিচা থেকে,
"ওগো নীল, আমাদের নীল নদী,
একটা দিনকে করে দাও
কুমিরের ঝাপ্টা কিংবা
আমার রক্তের মতো--- অগ্ন্যুৎপাত ।
সে আগুনে সাদাকালো দু রং-এরই বেশি-ভুঁড়োগুলো
ঝলসে চৌচির হয়ে ফেটে যাক ।
আমার দেহের রক্ত দেয়া যেন ব্যর্থ না হয় ।
এসো তুমি আমাদের সন্ততিদের জন্যেও
হে সূর্যমুখ । হানো বিচার, আমাদের
সহায়তা করো ।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো দুশ বছরের ঘটনার চুম্বক ।

'লেনিন' কাব্যের পরেই মায়াকভস্কি দীর্ঘতম কবিতা লেখেন 'উত্তম' ।

অক্টোবরের বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে লেখা এ কবিতার মূল সুরটি হচ্ছে, বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে--- সোভিয়েত জনগণকে দেয়ালে পিঠ রেখে যে কার্যক্রম নিতে হচ্ছিল কয়েক বছর, তা সফল হয়েছে । সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগে প্রবেশ করেছে । সারা দেশে বিশাল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাড়া, কলে কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে ।

জনগণের উদ্দেশ্যে লিখেছেন--- "আনন্দের ধারা উপচে উপচে পড়ছে । এসো তোমাদের বালতি নিয়ে ভরে ভরে নিয়ে যাও" ।

আরো দুটি অনুচ্ছেদ থেকে কবিতাটির গঠন ও মেজাজ এবং উত্তরণ বুঝতে পারা যাবেঃ

ক. বই-এর দোকানগুলো
স্তূপিকৃত বই-এ বোঝাই ।
আমার নামও আছে
কবিতার গ্রন্থ তালিকায় ।
ব্যাপারটা খুব মজাদার,
গর্বেরও, তাই নয় কি?
আমার মুখে মিষ্টি হাসি ।
ঐ যে ওখানে
আমার দেশের কাজে
আমার ছোট একটুকরো কাজ ।

২. ভস্
ভোঁ,
ভস্
ভোঁ
চলো কাজ করে চলো আমার কারখানারা।
ভস্ ভস্ ভস্
চলো ইঞ্জিনগুলো আমার
কাজ করে চলো।
থেমো না
কখনো,
তৈরি করে দিও সুতির কাপড়
দেদার,
খুশি হবে আমার যুবসংঘের বালিকারা।
সুগন্ধ ঐ যে আসে ভেসে
গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
ওটা ওদের জামার আতরের।
ক্ষেত
দিগন্ত ছোঁয়া।
চাষীরা
তাদের ক্ষেতে।
প্রখর বুদ্ধি রাখে ওরা।
ইয়া বড় বড় দাড়ি
যেন ঢাল
যেন লতা গুল্মের ঝোপ।
যখন মাটি পালটে দেয় ওরা
কী দক্ষতা,
মনে হয়,
কবিতা লিখেছে।

৭

১৯২২-২৩ সালে লেখা 'ইহা'। দীর্ঘ কবিতাটি ঘটনাক্রমিকতায় 'মিস্ট্রি-বুফে', '১৫০০,০০,০০০', 'লেনিন' ও 'উত্তম' কবিতা চতুষ্টয়ের সহমর্মী। এই 'ইহা' যেহেতু প্রেমের বিশেষ ব্যাখ্যা সে জন্যে এর কিছুটা অর্থোদ্ধার আলাদাভাবে করা দরকার।

বিপ্লবের আগে মায়াকভস্কি ২২ বছর বয়সে যে 'ইজার পরা মেঘ' কবিতা লিখেছিলেন, সেটি ছিল পুরুষ ও নারীর যৌবন বয়সের সেই সর্বাত্মক প্রেম, যাকে উভয়েই মনে করে নেয় বিশ্বসংসারের মূলাধার বলে। ইতিপূর্বেও কবি বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন এই একই প্রেম নিয়ে। তবে এগুলি আকারে ছোট।

সোভিয়েত পর্বে প্রবেশ করে মায়াকভস্কি যে কয়েক হাজার কবিতা লিখলেন, সেগুলিতে নরনারীর প্রেম মূলাধার হওয়া দূরের কথা, কদাচিৎ উল্লিখিত হয়েছে। এই অবস্থায়, কবির নিজের মনের মধ্যে এবং বেশ কিছু সংখ্যক কাব্যরসিকের তরফ থেকে প্রশ্ন ছিল, কাব্যের মূলাধার হিসেবে যে প্রেম আদৃত হয়ে এসেছে, তার সম্পর্কে কবির কি কোনো বক্তব্য নেই?

১৯২২ সালে মায়াকভস্কি এই প্রশ্নের জবাব হিসেবে লিখেছিলেন, প্রথমে 'আমি ভালবাসি' নাতিদীর্ঘ বিদগ্ধ ধারার গীতিকবিতা। দয়িতাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন অনুপম মধুর ভঙ্গীতে। কিছুটা আত্মকথা, সামান্য স্বীকারোক্তি। জীবনের উপলব্ধি শুধু নারীর মন পাবার জন্যে নিয়োজিত থাকে নি। কবি তবু বলেছেন, "আমার হৃদয়টা প্রকাণ্ড হয়ে গেলো কবিতায়।"

তার পরেই বলেছেন,

যদি একলা বইতে হয়
তাহলে পিয়ানোটা কত ভারী লাগে,
একই কথা ইস্পাতের আলমারীটাকে নিয়ে।
তাহলে তোমার কাছ থেকে একা
আমার হৃদয়টাকে
ফেরত নিতে হলে কি করে
পিঠে বয়ে
নিয়ে ফিরবো?
জাহাজ কূলে ফিরে আসে
যাত্রীবাহী ট্রেন
ওরাও ফিরে আসে স্টেশনে যার যার
আমিও তোমার কাছে ফিরে আসি প্রিয়তমে।
আমার হৃদয়টা জমা তোমার কাছেই
তুমি বাক্স হৃদয়ের,
তুমি বাঞ্ছিতা, তুমি প্রেম-পাত্রী।

অতঃপর মায়াকভস্কি লিখলেন, 'ইহা'। প্রস্তাবনাতে এই সর্বনামটিকে নিয়েই বক্তব্য রেখেছেন। 'ইহা কি বিষয়ে' শিরোনাম দিয়ে শুরু করেছেন "

এ বিষয়ে, ব্যক্তিগত এবং লঘু উভয়ত,
পূর্বে বহুবার যা হয়েছে গীত
কবিয়াল কাঠবিড়ালির খাঁচে
ঘুরেছি চর্কির মতো.
ফের একবার ঘুরতে চাই।
বিষয়টা এমন যে এসেই করবে দাবী : 'সত্য চাই।'
বিষয়টা এমন যে এসেই করবে দাবী : 'চাই সৌন্দর্য।'
বিষয়টা জরাজয়ী

কখনোই যাবে না বাইরে দৃষ্টির।
সুতরাং বিশ্ব জুড়ে দোলায়িত যে লাল রেশমের অগ্নিশিখা
বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে তোমার হাতেও তুলে ধরো।
এ বিষয় পুরানো চতুর চালে চলে যায় ডুবুরির মতো
ঘটনার নীচে
গায়ের চামড়ার নীচে প্রবৃত্তির পুঞ্জে মুখ গুঁজে
তারপর ঝাঁজিয়ে উঠে বলে
'কী স্পর্ধা যে ভুলে আছো'?
গায়ের চামড়ার তলা থেকে টেনে
আত্মাকে ঝাঁকানি দেয় একচোট।
বিষয়টা একদিন এসে আমার দরজাটাকে
প্রায় ভেঙ্গে ঢুকে বললো আমার
মাথা ঝামা-ইঁট।
সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ গৌণ হয়ে গেলো।
এ আমাকে কামারের মতো
মাথা থেকে পা অবধি করলো হাতুড়ি পেটা।
এর নাম :

মায়াকভস্কি এখানে এর নাম আর বললেন না। কিন্তু পরবর্তী সর্গে প্রণয়িনীর জন্যে প্রণয়ীর অভিসারের যে পালা গাইলেন, তাতে মনে হল, সত্য-সত্যই প্রেম নামক কামারের হাতুড়ির পাল্লায় তিনি পড়েছেন। এ এক আত্মিক ঝড়ো হাওয়া আকাঙ্ক্ষার। মিলন হল না। বিরহের ইতিকথা সার শুধু।

তবে প্রেম ও বিরহ যে একান্ত বাস্তব, এ সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কবি। এই সত্যকে আরও প্রসারিত করলেন কবি শেষ পর্যন্ত। মেহনতি মানুষরা যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছে, সেখানেই প্রেম পেলো চরিতার্থতা।

একটা দিনকে হাত পেতে নিতে ভিক্ষা
তারপর জরার অশেষ দুঃখে ডুবে যাওয়া আর নয়।
বরং ঐ ভূমণ্ডল কাম্য
'কমরেড' বলে ডাকতেই
সাড়া দিয়ে কাছে চলে আসে।
নিজের ভিটেতে পড়ে মরে থাকা নয়,
বরং ডাকবো ভাই বোন বসুধাকে
সারা পৃথিবীতে আছে স্বজন আত্মীয়
সত্যি তাই। সমস্ত জগৎ
পিতা, মাতা।

সমগ্র মানব সমাজের আত্মীয়তার বিশাল সম্ভাবনাকে চোখের উপর বাস্তবায়িত হতে দেখতে পেয়ে কবি বিরহের আঘাত ভুলেছেন।

এরপরে ১৯২৮ সনে প্যারিতে বসে কবিতা লিখেছিলেন–'প্রেম বিষয়ে কমরেড কস্তরভের কাছে পত্র'। যৌবন, সৌন্দর্য, লাবণ্য, প্রসাধন, প্রেমালাপ সবকিছুকেই বাস্তব নাম দিয়ে কবি লিখেছেন, প্রেমের অনুভূতি থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা পান। তবে এখানে নিজের জন্যে খুব বেশি আশা না করে কবিতা লিখে আনন্দিত করতে চেয়েছেন সেই প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদের, যাদের ভালবাসা সরল, মানবিক, সত্য।

কবির আছে ভালবাসা একটা মহৎ অথবা পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এখানে তিনি কোপার্নিকাস হতে চেয়েছেন, অথবা আঙ্গিনায় দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানি কাঠ চিরতে চেয়েছেন। বুঝতে পারা যায়, প্রেমকে জৈবিকভাবে অথবা ভাবের ঘোর হিসেবে আবদ্ধ করেন নি। তবে 'দূরে যা দূরে যা'ও করেন নি ভালবাসাকে।

'আমি ভালবাসি' এবং ইহার বক্তব্য এগিয়েছে ভালবাসা সম্পর্কিত সাম্যবাদী মূল্যবোধ গড়ে তুলবার দিকে।

এখানেও প্রেমিকের সেই 'প্রকাণ্ড' হৃদয় নিয়ে ঝামেলা। তবে কবিতা লেখার জন্যে কবিকে উদ্বেলিত করেছে এই প্রকাণ্ড হৃদয়টাই:

রূপকল্পের,
ভাবের,
দৃষ্টির একটা ঘূর্ণিবাত্যা
বেরিয়ে এলো নগরীর চন্‌চনে গরম থেকে
তারপর তৃতীয় শ্রেণীর পানাগারে ভাগে সেদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতেই–
বাণী
আকাশের দিকে উঠে সোজা তারার দিকে ছুটে গেলো
যেন ধূমকেতু,
প্রোজ্জ্বল,
লেজটাকে অর্ধেক আকাশে ছড়িয়ে দিলো বর্ণিল পাখায়
আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল আকাশে।
জুড়োক চোখ প্রেমিক-প্রেমিকার
কুঞ্জে বসে ফুলের সুরভী নিতে নিতে ওরা তাকাক।
ওর কাজ,
জাগানো,
পথ দেখানো,
প্রেরণা জোগানো,
ঐ তাদের যারা দ্বিধায় হতমান।

৮

মায়াকভস্কির এই 'প্রেম' বিষয়ক লেখাটি থেকে বুঝতে পারা যায়, ভালবাসা সম্পর্কিত মূল্যবোধকে তিনি শুকনো ঝামার মতো সংজ্ঞায় আবদ্ধ করেন নি সোভিয়েত

পর্বেরও যেকোন পর্যায়ে, যদিও কবিতার উৎপাদনের রিপোর্ট তিনি স্তালিনের কাছে চেয়েছেন লোহার উৎপাদনের পরিমাণের পাশাপাশি।

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কুম্ভীর তাত্ত্বিকরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচারের একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করে আসছে, যার যোদ্ধা বক্তব্য, মায়াকভস্কি বিপ্লবের আগে ভাল কবিতা লিখতেন, সোভিয়েতের পাল্লায় পড়ে শুকিয়ে গেলেন। এই প্রচার যে কত ভিত্তিহীন, তার প্রমাণ উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলো। বরং, সোভিয়েত অক্টেবর বিপ্লবের ছোয়াঁ লেগেই প্রেমের সবুজ বৃক্ষ মায়াকভস্কির কাব্যে মঞ্জরিত।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। মায়াকভস্কির প্রাক্‌বিপ্লব কবিতা এবং বিপ্লবোত্তর কবিতা অবিভাজ্য। তাঁর প্রাক্‌বিপ্লব ব্যক্তিসত্তা এবং বিপ্লবোত্তর ব্যক্তিসত্তা অবিভাজ্য।

১৯২৮ সালে কড়চার ধরণে একেকটা বছর ধরে ধরে যে আত্মজীবনীর চুম্বক লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি গদ্যে, সেটি হচ্ছে এই অবিভাজ্যতার ধারাবাহিকতার দলিল।

১৯৩০ সালে মস্কোতে তাঁর কুড়ি বছরের কাজের যে প্রদর্শনী হয়, তার নামকরণও প্রমাণিত করে, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা প্রাকবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কবিতাকে একটি মালাতেই গেথেঁছিলেন। এই উপলক্ষে কবি যে ভাষণ দেন তাতেও তিনি তাঁর কাব্যের বিকাশকে তাঁর ১৭ বছর বয়স থেকেই হিসেবে ধরেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের উপযোগী চরিত্র গঠনে এবং কাব্যের কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে মায়াকভস্কি প্রস্তুত হয়েছিলেন তাঁর শৈশব থেকেই।

যে মায়াকভস্কি ১৯২৮ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগ দেন, তিনি ১২ বছর বয়সে জর্জিয়াতে স্কুলে থাকতেই মার্কসীয় পাঠ-চক্রে যোগ দিয়েছিলেন। তখন ১৯০৫ সালের বিপ্লব। ১৪ বছর বয়সে মস্কোতে স্কুলের ছাত্র। এই সময়ে তাঁর দেরাজে এঙ্গেলসের এন্টি-ডুরিং থাকতো। তিনি এই সময়েই বলশেভিক পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মস্কোর রুটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি সংগঠনের কাজ করতেন। ১৯০৮ সালে ১৫ বছর বয়সে তিনি বলশেভিকদের গোপন ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারারুদ্ধ হন। প্রায় এক বছরে জেলে থাকার পরে বয়স কম থাকায় মুক্তি পান। কারারুদ্ধ হওয়ার আগেই 'উচ্ছ্বাস' নামের গোপন বিপ্লবী কাগজে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল। জেলখানায় বসে তিনি কবিতা লিখে খাতা ভরেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা বাজেয়াপ্ত করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর নেতৃস্থানীয়কে বলেছিলেন, 'আমি সমাজতান্ত্রিক ছবি আঁকবো।' শৈশবেই ছবি আঁকায় হাতেখড়ি। জেলে যাবার আগেই স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছিল দারিদ্র্যের জন্যে মাইনে দিতে না পারায়। রাজনীতিতে থাকলেন না এই কারণে যে, শিক্ষা নেই এবং তাছাড়া সে সময়ে গোপন আস্তানায় চলে যেতে হতো। ছবি আঁকার দিকে ঝুঁকলেন এবং মস্কোর কলেজ অব পেইন্টিং এ ভর্তি হলেন। ইতিমধ্যে কবিতা লিখছেন মাঝে মাঝে। বন্ধু সহপাঠী শিল্পী ও কবি বারলিউক মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁর কবিতায়। ছবি আঁকার এবং কবিতা লেখার সমবয়সী সাথীরা মিলে 'রীতিদ্রোহী ভবিষ্যৎবাণী' দল গড়লেন। মায়াকভস্কির যখন ১৭ বছর বয়স তখনই

তাঁর কবিতা একটার পর একটা সংকলনে প্রকাশিত হতে লাগলো। মায়াকভস্কি ও বারলিউক কলেজ অব পেইন্টিং থেকে বহিষ্কৃত হলেন ভবিষ্যৎবাদী দলে থাকার অভিযোগে। এরপর থেকে মায়াকভস্কি হলেন সারা সময়ের কবিতা-কর্মী। ১৯১৫ সালে মায়াকভস্কি ম্যাক্সিম গোর্কীর সান্নিধ্য লাভ করলেন, তাঁর কাগজে লিখলেন এবং তাঁর সামনে 'ইজার পরা মেঘ' কবিতা পড়লেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধকে উপলক্ষ করে 'যুদ্ধ ও শান্তি' নাম দিয়ে দীর্ঘ কবিতা লিখলেন। তারপর লিখলেন দীর্ঘ কবিতা 'মানুষ'। এই দুটির কোনটিই সেন্সরের দরুন প্রকাশিত হলো না। এতে বস্তুতপক্ষে সৈনিকদের যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাগিদ ছিল। প্রত্যেকটি কবিতাতেই আহ্বান ছিল শান্তি ও মানবতার জন্যে মহাবিপ্লবের, মহাবিদ্রোহের। ১৯১৭ সালের অক্টোবরের বিপ্লবকে মায়াকভস্কি বললেন, 'এ আমার বিপ্লব'।

রীতিদ্রোহী বিদ্রোহবাদী হলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী। কবিতার বস্তু ও রূপ উভয় দিক দিয়েই মায়াকভস্কির একটা অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা রয়েছে তার দুই পর্বের কাজেই।

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে এ সম্পর্কে এই ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

১. ভবিষ্যৎবাদ। ২. সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা। ৩. যৌবনের প্রচণ্ড আবেগের শক্তি এবং নির্যাতিত মানুষ ও জাতিমাত্রের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের প্রতি গভীর একাত্মতা। ৪. দলবেঁধে কবিতা লেখার চেষ্টা এবং তার মধ্যেই নিজের এবং একই সঙ্গে অপরের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি। বিপ্লবী সঙ্ঘ ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক বিদগ্ধ কবিতাতে অনেকগুলো নতুন নতুন কোণ থেকে আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল সত্য সৌন্দর্য ও বাস্তব এবং ভাবের জগতে। এগুলোর মূলে ছিল যেমন ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলোর ভাংচুর, তেমনি ছিল নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্যে ক্রন্দন। এদের মধ্যে ছিল একই সঙ্গে বিকৃতি এবং সজীবতা। কবিতাতে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারাই তখন পর্যন্ত প্রচণ্ড দাপটে অধিষ্ঠিত। বিদ্রোহ ছিল চাপা আগুন। এই সময়েই বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটা রীতি দেখা দিয়েছিল। ভবিষ্যৎবাদ। এতে একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল, 'যন্ত্র এবং তার গতির মধ্যেই রয়েছে গতানুগতিকতার উচ্ছেদ।' রীতিদ্রোহ বা এই রীতিদ্রোহীদের কথা ছিল, 'আমরাই আমাদের পূর্বপুরুষ'। রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎবাদ আত্মস্থ করেছিল একদল তরুণ কবিকে। ১৯১০ সালে মায়াকভস্কি ১৭ বছরের যুবক, ভবিষ্যৎবাদী পন্থাকে পছন্দ করেছিলেন।

ভবিষ্যৎবাদী পন্থার একজন কট্টর প্রযোজক হিসেবে 'ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি' নাম দিয়ে তিনি একটি নাটকও লিখেছিলেন। নাম ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছিলেন। তিনি তখন একটা হলদে কামিজ পরে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু দেখা গেলো, যে মায়াকভস্কি চৌদ্দ বছর বয়সে এঙ্গেলসের 'এন্টি ডুরিং' এবং লেনিনের 'দুই কৌশল' পড়েছিলেন, তিনি ভবিষ্যৎবাদের রীতিদ্রোহের মধ্যেও নায়ক করেছেন দুঃখী শোষিত বঞ্চিত মানুষকেই। বুর্জোয়ারা যেভাবে ভবিষ্যৎবাদকে হাউইবাজীর খেলা হিসেবে প্রয়োগ করছিল, মায়াকভস্কি শুরুতেই তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে ইতালিয় ভবিষ্যৎবাদী মারিনেটটিকে মস্কোতে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে মায়াকভস্কি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তার পরেই তিনি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ কবি সাথীর সঙ্গে মিলে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ইতালিয় ভবিষ্যৎবাদী রীতির সঙ্গে তাদের মতভেদ আছে।

বুর্জোয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে মায়াকভস্কি যে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষায় যুদ্ধ বিরোধী কবিতা লেখেন, তাতে তিনি বুর্জোয়াদের প্রিয় অহংবাদী ভবিষ্যৎবাদী কবি সেভেরিয়ানিনকে লালসা-জর্জর গাইয়ে বলে ধিক্কৃত করেন।

মায়াকভস্কির রীতিদ্রোহিতার সেই সময়কাল চূড়ান্ত প্রকাশ বিরহ-বিক্ষুব্ধ 'ইজার পরা মেঘ' কবিতায়। তদানীন্তন প্রচলিত মূল্যবোধগুলোর উপর এলোপাথাড়ি আঘাত করেছিলেন তিনি তারুণ্যের ভাবোদ্বেলতা দিয়ে।

বিরহী চিত্তের স্বগতোক্তি এখানে চিৎকারের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই তরুণ বিপ্লবী কবি দুটি বক্তব্য এনেছিলেন, যাদের নিয়ে তিনি বিপ্লবোত্তর পর্বেও কাজ করেছেন। একটি অতিরিক্ত ভাবাবেগকে হাসির খোরাক করা। আরেকটি, 'ঐ মহাবিপ্লব আসে।' একটি বাস্তববাদী প্রেম। আরেকটি পরিবর্তনে আস্থা।

১. মারিয়া, আমার বড় ভয় পাছে তোমার নাম ভুলে যাই
ঠিক যেমন কবির মনে ভয়
বুঝিবা হারিয়ে গেল সদ্য পাওয়া একটা কথা যা
এখনও শুকিয়ে যায়নি কিংবা বিবর্ণ হয়নি,
বিধাতার মহিমার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো যার জেল্লা।
মারিয়া তোমার দেহকে
আমি সেইভাবেই ভালবাসবো এবং আদর করবো
যেমন করে যুদ্ধে পঙ্গু একজন সৈনিক
তার একটি অবশিষ্ট পায়ের সেবা করে।

২. আমি সে ব্যক্তি যাকে নিয়ে
সমসাময়িক গোষ্ঠী হাসাহাসি করে
যেন আমি একটা একটানা অশ্লীল ঠাট্টা
সেই আমিই দেখতে পাই সময়ের পর্বতমালাকে ডিঙ্গিয়ে
যে আসছে তাকে,
অথচ যাকে এখনও দেখেনি কেউ।
যেখানটাতে ব্যাহত হয়ে মরা মানুষের চোখ থমকে থেমে যায়,
উপবাসী বিপুল জনতার পুরোভাগে
দাঁড়িয়ে সেখানেই দেখি আমি মাথায়

কাঁটার মুকুট পরে বিদ্রোহের
১৯১৬ সাল ঐ
আগত অদূরেই

রীতিদ্রোহী ভবিষ্যৎবাদী বলে যখন তিনি জাঁক করে বেড়াতেন তখনকার এই কবিতাটি অথবা 'যুদ্ধ ও শান্তি' কিংবা 'মানুষ' ছিল প্রকৃতপক্ষে জীর্ণ সামাজিক রাষ্ট্রিক অচলায়তনের দুঃসহতার বিরুদ্ধে বজ্রনাদ প্রতিবাদ। তাঁর ভবিষ্যৎবাদের সারসত্তাটি ছিল নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত।

এই কারণেই বিপ্লবের পরেও মায়াকভস্কি যখন 'হলদে কামিজটি' খুলে ফেলে দিয়েছেন এবং শ্রমজীবীদের লাল পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন, তখনও তিনি নিজেকে ভবিষ্যৎবাদী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি।

বিপ্লবের পরেই তিনি যে কবি সংঘ গড়ে তোলেন, তার নাম দেন 'ভবিষ্যৎবাদী লেখক সংঘ'। তিনি যে বামপন্থী শিল্পকলা সংস্থা গড়ে তোলেন, তাতে তাঁর ভবিষ্যৎবাদী সাথীরাই হয়েছিলেন মূল সহায়। সোভিয়েত পর্বের অসংখ্য কবিতায় নিজেকে তিনি 'ভবিষ্যৎবাদী' বলে চিহ্নিত ও সম্বোধন করেছেন।

১৯১৮ সালে 'শিল্পকলায় সেনাবাহিনীর জন্যে বিধান' কবিতা লিখে তিনি জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎবাদীদের তিনি জনতার মধ্যে নামিয়েছেন:

রাস্তাগুলো হবে আমাদের ছবি আঁকার তুলি,
চৌকোনা ময়দানগুলো হবে রং গুলাবার সরা।
সময়ের হাজার পাতার খাতায় টোকা থাকবে
বিপ্লবের গানগুলো
হে ভবিষ্যৎবাদীরা, নামো রাস্তায়
ঢাকীরা এবং কবিরা এগিয়ে চলো।

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাদের মর্মবস্তু বলে যাকে তিনি মনে করতেন তাকে তিনি সোভিয়েত বিপ্লবে সমর্পণ করেছিলেন।

৯

ভবিষ্যৎবাদী ভাবধারার একটি উপাদান 'যন্ত্র' সম্বন্ধে তিনি বিপ্লবের আগে খুব বেশি না লিখলেও বিপ্লবের পরে তাঁর কাব্যের একটা বড় উপকরণ হয়েছিল এটি।

প্যারির 'ইফেল টাওয়ার', কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্রুকলিন ব্রিজ' নিয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা রয়েছে তাঁর। যন্ত্রের কীর্তি তাঁকে চমৎকৃত করতো বুঝতেই পারা যায়। কিন্তু মায়াকভস্কির উচ্ছ্বাস বুর্জোয়া ভবিষ্যৎবাদীদের উচ্ছ্বাসের বিপরীত মেরুতে উৎসারিত হতো। তার প্রমাণ রয়েছে এই দুটি কবিতাতে। 'ইফেল টাওয়ারকে' তিনি ধিক্কার দিয়েছেন ফ্রান্সের নিপীড়িত মানুষদের বিদ্রোহদের নিশানা দিতে এই লৌহমিনার ব্যর্থ হচ্ছিল বলে। 'ব্রুকলিন ব্রিজের' প্রকৌশলী বিস্ময়ের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, বেকাররা এখান থেকে অতল তলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

যন্ত্র তার যন্ত্রী শ্রমজীবীর হাতে বিপ্লবের উপকরণ হিসেবে পরালে বিশ্বের রূপান্তরের সোনার কাঠি।
যেখানে এর বিপরীত ঘটনা, সেখানে যন্ত্রের ব্যর্থতা।

কখনও কখনও যন্ত্র আর মানুষকে তিনি একাকার করে দিয়েছেন বিপ্লবের প্রযোজক রূপে। দৃষ্টান্ত, 'কমরেড নেট্টো–স্টিমার ও মানুষের উদ্দেশে।' লাতভিয়ার কমরেড থিওডোর নেট্টো সোভিয়েত ইউনিয়নের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ করার অবস্থায় শত্রুর হাতে খুন হয়েছিলেন। তাঁর নামে একটি স্টিমারের নাম হয়েছিল। বন্দরে এই নামাঙ্কিত স্টিমারটিতে ঢুকতে দেখে মায়াকভস্কি কমরেড নেট্টোকে স্মরণ করেন :

একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের মরা বাঁচা
এই প্রতিজ্ঞায় আমাদের লৌহঐক্য।
সকলে মানবসমাজের জন্যে বাঁচবো একটি ভ্রাতৃত্বের আবেষ্টনীতে।
কয়েকটা লাতভিয়া কিংবা কয়েকটা রাশিয়াতে খণ্ডিত হবে না
আমাদের পৃথিবী।
যখন মরবো,
তখন অমর হবার জন্যেই মরবো
স্টিমারে
কবিতায়
এবং যা কিছু স্থায়ী হয় তাতে ঢালাই হয়ে থাকবো।

যে দ্বিতীয় বিষয়টা প্রাক বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর মায়াকভস্কির কবিতায় ধারাবাহিকতাকে জোরদার করতো সেটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, যার একটা প্রচণ্ড প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি ঘৃণায়।

বিপ্লবের আগে 'যুদ্ধ ও শান্তি' এবং ১৯২৪ সালে লেখা 'লেনিন' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা একই ধরনের রূপকল্পের ব্যবহার করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটাবার মহাকাব্যিক বীর 'লেনিন' কাব্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যর শোষণ ও শাসনের বর্ণনা দিয়ে তার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জানানো হয়েছে, সেই রকম ঘৃণাই জানানো হয়েছে বিপ্লবের আগেও একাধিক কবিতাতে। দৃষ্টান্ত 'পেরু' কবিতাটি। লেখা ১৯১৫ সালে।

সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক শোষণের কর্তাব্যক্তিদের তিনি চিহ্নিত করেছিলেন এই বলে যে তারা–

নাচের এবং পাখির এবং তোমার
এবং আমার, পেরুর জন্যে অভিশাপ।

বিপ্লবের পরে 'পুশকিনের প্রতি' কবিতায় পুশকিন 'আফ্রিকার সন্তান' বলে সম্বোধন কিংবা আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা একাধিক কবিতায় নিগ্রোদের প্রতি ভালবাসা বন্ধুত্ব বিষয়ক দৃষ্টান্ত।

প্রাক্‌বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কবির সংযোজনা এসেছে উৎসার্গিত যৌবন থেকেও।

মায়াকভস্কি প্রেমকে বিশাল মর্যাদা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন কামুকতা ও সুরাসক্তির উপর খড়গহস্ত। যৌবন তাঁকে ভবিষ্যৎবাদী করেছিল, যৌবন তাঁকে সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের কর্মী হবার পরিশ্রম ও সাহস জুগিয়েছিল। প্রেমের কাছেও এটাই চেয়েছিলেন তিনি। প্রেম ও যৌবনকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন শ্রমজীবী জনগণের পৃথিবী রচনার কাজে।

পুশকিনের ১২৫তম জন্মদিনে ১৯২৪ সালে মায়াকভস্কি যে কবিতা লেখেন, তাতে বলেছিলেন,

আমি মায়াকভস্কি যুবশক্তির কাছে আলোকস্তম্ভ।

'মায়াক' শব্দের অর্থ আলোকস্তম্ভ। এই শব্দটাকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি কিছুটা কৌতুক এবং কিছুটা গর্বের সঙ্গে।

এই 'যৌবন' প্রশ্নে তিনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন সেটা মায়াকভস্কির সমসাময়িক অসন্তুষ্ট বুর্জোয়া কবি টি এস এলিয়ট থেকে তাঁর আধুনিকতাকে স্বতন্ত্র করে বুঝবার জন্যে সহায়ক। 'প্রুফ্রকের' মতো প্রেমের কবিতাতে টি এস এলিয়েট অবক্ষয়ী বুর্জোয়াদের প্রতি ধিক্কার দিলেও বিপ্লবের পথে পা দিতে পারেন নি। এই কারণে তাঁকে লিখতে হয়েছে 'ফাঁপা মানুষরা' অথবা বুড়ো মানুষ।

মায়াকভস্কি বিপ্লবের পথে ছুটে চলেছেন এবং এই জন্যেই বারংবার যৌবনকে ফিরে পাবার শপথ নিয়েছেন।

মায়াকভস্কির প্রাকবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর পর্বের কাজের আরও দুটি সংযোগ–১. ছবি আঁকার কাজ, ২. দল বেঁধে কবিতা লেখার কাজ।

প্রথমত, ছবি আঁকার কাজ মায়াকভস্কির কবিতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। এই পদ্ধতি 'প্রকটবাদ' বা অভিব্যক্তিবাদ। ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও শ্লেষ হয়েছে কবিতায় প্রকটবাদের অবলম্বন। বিপ্লবের আগে যেমন ছিল, তেমনি পরেও রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দল বেঁধে লেখার মধ্য দিয়ে নতুন ধারাকে জোরালো এবং অপ্রতিরোধ্য করার জন্যে ভবিষ্যৎবাদী মায়াকভস্কি বিপ্লবের আগে যত জোর দিয়েছিলেন, তার চেয়ে আরও বেশি সচেষ্ট হয়েছিলেন সোভিয়েত পর্বে।

কিন্তু এই দল বাধঁবার মধ্যে কোন গোষ্ঠীগত অন্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি।

পাস্তেরনাক ও ইয়েসেনিন–এই দুই কবি তাঁর গোষ্ঠীতে ছিলেন না। তাদের লেখার পদ্ধতি কিংবা সাধারণ কাব্যিক মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা ছিল। কিন্তু সমগ্র সোভিয়েত সাহিত্যে এবং বিশ্বের প্রগতিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে এই দুই কবির সুক্ষ্ম অনুভবের কাজগুলিকে অথবা মানবিকতা ও সৌন্দর্যগুণকে তিনি জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

তরুণ বয়সী কবিরা তাঁর কাছে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কবিতা লিখবার জন্যে কি কি করণীয়? মায়াকভস্কি বলেছিলেন, এ ব্যাপরে শেখাতে পারেন পাস্তেরনকে, যাও তার কাছে।

ইয়েসেনিন সুরাসক্ত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে গ্রামিণতা ছিল বলেও মায়াকভস্কি মনে করতেন যে, 'এ ছোকরা বিপ্লবের প্রচণ্ড কর্মকাণ্ডের দাবি মেটাতে পারবে না।' কিন্তু যখন ইয়েসিননের মৃত্যু হলো আত্মহত্যা দ্বারা, তখন মায়াকভস্কি তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে কবিতা লেখেন, তার তুলনা হয়তো কীটসের মৃত্যুতে শেলীর কবিতা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ধ্রুপদী কবি নতুন কালের পটে নতুন অগ্নিরেখাকে তরঙ্গিত করে দিয়ে লিখলেন:

ভাষা-বসনের সেরা তাঁতি জনগণ
ইয়েসেনিন তার সেরা সাকরেদ কারিগর।

এলেক্সি টলস্টয় ও তাঁর অগ্নিপরীক্ষা

'আনা কারেনিনা', 'রিসারেকসান' এবং 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের রচিয়তা লিও টলস্টয়ের জীবনসূর্য যখন অস্তমিত-প্রায় তখন 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের রচিয়তা এলেক্সি টলস্টয়ের জীবন সূর্যের উদয়। একজনের শিল্পরূপ সাধনার যখন সমাপ্তি, তখন আরেক জনের সাধনার উপক্রমণিকা। লিও টলস্টয়ের মৃত্যু ১৯১০ সালে। এলেক্সি টলস্টয়ের জন্ম ১৮৮৩ সালের ১০ই জানুয়ারি। মৃত্যু ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি।

লিও টলস্টয় উনিশ শতকের, এলেক্সি টলস্টয় বিশ শতকের। 'আনা কারেনিনা'–'রিসারেকসান'–'যুদ্ধ ও শান্তি'র লিও টলস্টয় উনিশ শতকের রুশ মহাজাগরণের মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পরূপকার।

'অগ্নিপরীক্ষার' এলেক্সি টলস্টয় বিশ শতকের রুশ মহাবিপ্লবের মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পরূপকার।

লিও টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের ঘটনাকাল উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক। নেপোলিয়নের মস্কো অধিকার এবং মস্কো ত্যাগে বাধ্য হওয়া এবং নেপোলিয়নের পরাজয়ের বিস্তারিত ঘটনা এবং যে তদানিন্তন রাশিয়াতে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল–তার মানবমানবী চরিত কথাই 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। রক্তাক্ত যুদ্ধ, স্বাধীনতা, শান্তি, প্রেম, মানবতা, দেশপ্রেম ও উদারতা নিয়ে নতুন মূল্যবোধ জাগানোর কাহিনী।

এলেক্সি টলস্টয়ের 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের ঘটনাকাল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবর বিপ্লব, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের পটভূমিতে মানব মানবী কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। জাগানো হয়েছে সাম্যবাদী কমিউনিস্ট মূল্যবোধ।

লিও টলস্টয় 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে যাদের নিয়ে লিখেছেন তাদের অনেকেরই দেখা তিনি তাঁর যৌবনে পেয়েছেন, তবে ঘটনাটি তাঁর জন্মের আগেকার ঘটনা।

এলেক্সি টলস্টয়–অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসে যাদের নিয়ে লিখেছেন তারা তাঁর যৌবনের সমসাময়িক, ঘটনাও তাই।

লিও টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তিকে' ইতিহাসের দলিল ঘাঁটতে হয়েছে। দলিল থেকে বেছে নিতে হয়েছে শিল্পরূপ বক্তব্যের জন্য মালমসলা।

এলেক্সি টলস্টয়ের 'অগ্নিপরীক্ষাকে' সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে। জীবন থেকে বেছে দিতে হয়েছে শিল্পরূপ বক্তব্যের মালমসলা। দুটো কাজই কঠিন সন্দেহ নেই। দু'টি উপাখ্যানই প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি পৌছেছে। তবু দু'টি উপন্যাস পড়েই মনে হয়, বড় বেশি সংযত। দুজনেই বড় শিল্পী, তাই বড় নির্বাচক। এখান থেকে সূত্র নিয়ে 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসটি সম্বন্ধে এবং তার শিল্পরূপকার এলেক্সি টলস্টয় সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

উপন্যাসটির তিনখণ্ড। প্রথম–দুই বোন, দ্বিতীয়–১৯১৮, তৃতীয়–বিবর্ণ সকাল।

প্রথম খণ্ডের কথা। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের জার্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তার পুর্বাহ্নে রাজধানী পেট্রোগ্রাদে রুশ বুদ্ধিজীবী যুবক যুবতীদের একটা অংশ যে অবক্ষয়ী জীবনযাপনে লিপ্ত, তার ছবি নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে।

তাঁর ইতিবৃত্তের কেন্দ্র হিসেবে লেখক বিশেষ করে বেছে নিয়েছেন দুটি বোনকে। তারা এক বুর্জোয়া ডাক্তারের কন্যা।

দাশা আর কাতিয়া। দাশা ছাত্রী, কাতিয়া এক উকিলের স্ত্রী। দাশার বয়স ১৯, কাতিয়ার ২৪। জগদ্দল পাথরের মতো বিলাসী অভিজাত পেট্রোগ্রাদের চেহারা। স্বৈরাচারি শাসন চেপে বসে আছে উপর থেকে। মধ্য স্তরে ক্ষোভ, হতাশ্বাস এবং ভোগবাদী জীবন। এর মধ্যেই কিছু কবিতা।

একেবারে নীচতলার কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের বিস্ফোরণের সামান্য প্রকাশ।

দাশা এক ইঞ্জিনিয়ারের প্রেমে পড়লো। নাম তেলেগিন।
একই সঙ্গে সে আকৃষ্ট আধুনিক কবি বেসোনোভের প্রতি।
প্রথম আকর্ষণটি ভাববাদী।
দ্বিতীয় আকর্ষণটি ভোগবাদী।

এই দ্বৈত আকর্ষণটিকে এলেক্সি টলস্টয় অবচেতন মনের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে অবচেতন মনের কাজ সোভিয়েত উপন্যাসে দাশার জীবনেই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি অভিব্যক্ত।

কাতিয়া বলতে গেলে এক সুন্দরী ভাবপ্রবণা যুবতী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই এক আকর্ষণীয় যুবা পুরুষের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

উদারপন্থী স্বামী ভাল মানুষ গোছের হলেও কাতিয়াকে সুখী করতে পারেনি।

স্বামীকে ছেড়ে কাতিয়া ফ্রান্সে চলে গেল।

দুটি বোনেরই মন দ্বন্দ্বাত্মক অবস্থায় ছিল।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে যুদ্ধ এসে স্থাবর মহলগুলিতে এনে দিল ওলটপালট। তেলেগিন যুদ্ধে বন্দী হলো। বন্দীশিবির থেকে পালালো। উপন্যাসের

প্রথম খণ্ডে ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ এই দুই বছরের ঘটনাবলিকে চুম্বকের মতো উপস্থিত করা হয়েছে। কারণ সম্ভবত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতিটাকেই বড় করে সামনে আনা। ১৯১৬ সালের শেষের দিক। মস্কোতে কাতিয়ার স্বামী নিকোলাই আই-ভানোবিচ যুদ্ধের আয়োজনে কাজ নিয়েছে। কাতিয়া ফিরে এসেছে। দাশাও ইতিমধ্যে মস্কোতে।

তেলেগিন ফিরে এলো। দেখা হলো দাশার সঙ্গে। দাশাকে নিয়ে গেল পেট্রোগ্রাদে, যেখানে সে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নিয়েছে আবার। বিবাহিত জীবন শুরু হলো।

এদিকে কাতিয়ার স্বামীর মৃত্যু হলো মস্কোতে। এর আগেই তার স্বামীর মারফত পরিচয় হয়েছিল ক্যাপ্টেন রসচিন নামক যুবা সেনানীর সঙ্গে। কাতিয়া খুঁজে পেয়েছিল এই যুবার মধ্যেই তার আকাঙ্ক্ষি দয়িতকে। শুরু হলো ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

যুদ্ধ তখনও চলছে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় কারখানাতে শ্রমিকদের অধিকার, যুদ্ধাবসান করে শান্তি এবং জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার অক্টোবর বিপ্লবের আয়োজন হচ্ছে। নৌ-সেনা আর পদাতিক সেনাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতা দখলের আয়োজন করছে পেট্রোগ্রাদের শ্রমিকরা। এই সময়ে রসচিন পেট্রোগ্রাদে কাতিয়ার খোঁজে আসে। কাতিয়া মস্কো থেকে পেট্রোগ্রাদে এসেছিল। এখানে দুজনের বিয়ে হয়। সামনে একটা ঝড় আসছে।

ঝড়ের মুখে দুটি দম্পতি, যারা প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী এবং রুশ প্রেমিক। তেলেগিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ায় শ্রমিকদের সঙ্গে তার একটা হৃদ্যতা জাগে। তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মত না থাকলেও সে প্রগতিমুখী। ক্যাপ্টেন রসচিন সেনানী হিসেবে সাবেক শৃংখলাবোধকে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী। সুতরাং তার চিন্তা সেই সময়ে বিপ্লবের বিপরীতমূখী।

দাশা আর কাতিয়ার কোন নির্দিষ্ট মত নেই–তারা নিজ নিজ স্বামীর ভাবনায় শরিক। এখানেই প্রথম খণ্ড শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ড–১৯১৮। পেট্রোগ্রাদে অক্টোবর বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। বিলাসী পেট্রোগ্রাদের শ্রীহীন চেহারা। বিলাসী বিলাসিনীরা পালিয়ে গেছে দক্ষিণে। কাতিয়া রসচিনকে নিয়ে তার বাবার কাছে চলে গিয়েছে।

দাশার একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছে। সে উদভ্রান্ত।

গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তেলেগিন লালফৌজে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে গেল। কাতিয়াকে পথে এক জায়গায় ফেলে রেখে ক্যাপ্টেন রসচেন প্রতিবিপ্লবী সাদা ফৌজের সঙ্গে যোগ দিল।

শুরু হলো সংঘর্ষপূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলে কাতিয়ার যাযাবর জীবন। দাশা গেল প্রতিবিপ্লবীদের ফাঁদে পা দিয়ে মস্কোতে। সেখানে তখন সোভিয়েত সরকারের সদর দফতর। মস্কো থেকে সরে পড়লো ষড়যন্ত্রকারীরা। দাশা এরপর উপায়ন্তর না দেখে

ফিরে গেল বুর্জোয়া ডাক্তার রাজনীতিক বাবার কাছে, যাকে নিয়ে সেই এলাকায় প্রতিবিপ্লবীরা একটা শ্বেত সরকার গঠন করেছে।

এখানে তেলেগিন এসেছে দাশার খোঁজে। কিন্তু বেড়াজালে আটকে পড়ায় দাশা তাকে ছেড়ে চলে যেতে বললো।

ক্যাপ্টেন রসচিনের এদিকে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। কী করবে ভাবছে।

এখানেই দ্বিতীয় খণ্ড শেষ।

তৃতীয় খণ্ড হচ্ছে লালফৌজের সিদ্ধান্তকারী জয়ের কাহিনী। ক্যাপ্টেন রসচিন যোগ দিয়েছে লালফৌজে। কাতিয়া শিক্ষকতার কাজ নিয়েছে। দাশা নিয়েছে নার্সের কাজ। দু'জনেই তাদের অভিজ্ঞতার অগ্নিপরিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবন সত্যকে বুঝতে পেরে অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের মধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে জীবন রহস্যের সমাধান। দুই বোনেই শেষ পর্যন্ত পেল তাদের নিজ নিজ দয়িতকে।

বিপ্লব তাদের জীবন ধারাকে, চিন্তার ধারাকে একই দিকে বিন্যাস্ত করে দিয়েছে। সেটা সাম্যবাদী সমাজে যাবার দিক।

তাদের কাছে রয়েছে কমরেড লেনিনের সোভিয়েত গণপঞ্চায়েতী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিকীকরণের সাম্যবাদী কর্মসূচি। দুটি দম্পতি সাম্যবাদী দেশ গড়ার কাজে উৎসর্গিত। বিরাট র্কতব্য। বিরাট দায়িত্ব। দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক ভাবোচ্ছ্বাস বহু দূরে ফেলে আসা স্মৃতি মাত্র। পূর্ণমিলনের এ জন্যই উৎসবের অবকাশ নেই। অভিজ্ঞতা যে চেতনা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে উভয় দম্পতিরই কাহিনী। পরস্পরকে বুঝে নেয়ার প্রেমের উপকরণ। এখানেই তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাসের উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসারের মধ্যেও নিশ্চয় পাওয়া যাবে একটা দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক অগ্রগতি ধারা। সমস্ত উপন্যাসটি অগণিত ঘটনায় পূর্ণ। এতে রয়েছে পাঁচ বছরের কাহিনী। রণাঙ্গনের এবং বিপ্লবাঙ্গনের। সমস্ত উপন্যাসটি যেন এক বিশাল তরঙ্গ ক্ষুব্ধ নদী প্রবাহ। অসংখ্য চরিত্র এই সব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। তারা কেন ঘটাচ্ছে সেটাও বলা হচ্ছে। কারণ বিপ্লবের পক্ষে হোক অথবা বিপ্লবের বিপক্ষেই হোক, প্রত্যেকটি চরিত্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং সকলেই তাদের বক্তব্য বলছে। ধ্রুপদী উপন্যাসের একটি মূল বিশেষত্বকে অর্থাৎ মুক্তকণ্ঠে কথা বলাকে অগ্নিপরীক্ষার লেখক পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রতিবিপ্লবীরা যা বলেছে, সবই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। বিপ্লবীরা যা বলেছে, তাও সবই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এত ঘটনা, এত চরিত্র এবং এত কথা তবু ছড়িয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়নি। এর কারণ, চারটি মূল চরিত্রের একটি না একটির যোগ রযেছে এই সব ঘটনা, চরিত্র ও কথার সঙ্গে। এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্যে যেহেতু চারটি চরিত্র শেষ পর্যন্ত নিয়োজিত হয়েছে, সে জন্য অসংখ্য ঘটনা চরিত্র এবং কথাও বিন্যস্ত হয়েছে একটি সুষম শিল্পরূপেও। স্বাধীনতা আর ইতিহাসের দুর্নিবার গতিপরিণতির মধ্যে একটা সম্মিলন ঘটাতে পেরেছেন বলেই এলেক্সি টলস্টয় এই ধরনের একটা সত্য ও শিল্পরূপ সম্মত মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখতে পেরেছেন।

এখানে সোভিয়েত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা এবং সোভিয়েত সাহিত্য বা উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এলেক্সি টলস্টয়ের শিল্পী জীবনের এবং শিল্পরূপ চিন্তার একটা বিশেষ গতি পরিণতিও প্রকাশ পেয়েছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কিংবা সোভিয়েত সাহিত্য বা উপন্যাস যদি স্বাধীনতাকে পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পারতো, তাহলে এলেক্সি টলস্টয়ের মতো শিল্পীকে সোভিয়েত সাহিত্য টেনে নিতে পারতো না। অপর পক্ষে এলেক্সি টলস্টয় যদি না বুঝতেন যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সাম্যবাদী পরিকল্পনার মধ্যে মানব মানবীর স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তাহলে তিনি যে অক্টোবর বিপ্লবের পরে প্যারি কিংবা বার্লিনে চলে গিয়েছিলেন, সেখানেই শেষ হয়ে যেতেন। গোর্কীর আহ্বানেও ফিরতেন না মস্কোতে। দাশা কাতিয়া তেলেগিন এবং ক্যাপ্টেন রসচিনের মতো যে সব বুদ্ধিজীবী বিপ্লবের আগে বিপ্লব থেকে দূরে ছিল, তারা যে বিপ্লবের পতাকা নিজেদের হাতে তুলে নিল—সে কথা তিনি লিখতে পারলেন এ রকম ঘটনা জীবনে ঘটেছিল বলেই। অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন স্বাধীনতা রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে।

তিনি বিপ্লবী দর্শন এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা লিখেছেন, সেটা একজন কমিউনিস্ট হিসেবেই দিয়েছেন।

উপন্যাসের এক জায়গায় একটি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর উক্তি, 'দর্শনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য দর্শন।'

আরেক জায়গায় লালফৌজের একজন নায়ক বলছে, 'বিপ্লব হচ্ছে বিজ্ঞান। এটা খামখেয়ালী ব্যাপার নয়।'

দাশা লালফৌজের এক সৈনিক মেয়েকে বলছেঃ 'কি জন্য লড়াই করছো বলতো' একজন নারী আকাশের তারার দিকে তাকাবে, চোখে তার জল থাকবে না, সে জন্য। আমিও চাই এই আনন্দকে।'

'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসে তিনটি বিষয় সামনে এসেছে। রুশ সোভিয়েত বিপ্লবের ঐতিহাসিক চিত্র। এই বিপ্লবে রুশ নরনারীর রূপান্তর এবং শিল্পী হিসাবে ও মানুষ হিসাবে এলেক্সি টলস্টয়ের গণবিপ্লবের পথে উত্তরণ এবং এর মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ধারা। এলেক্সি টলস্টয় আলাদাভাবে আত্মকথাও লিখেছেন। কিন্তু 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর যে আত্মকথা প্রকাশ পেয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিত অনেক বড় এবং গভীরতাও অনেক বেশি।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ সাহিত্যে শিল্পকলায় প্রতিনিধিত্বমূলক এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রের বৈপ্লবিক সংমিশ্রণের যে ধারা প্রবর্তনের তাগিদ দিয়েছে, 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাস তার একটি প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত।

অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে আমরা এলেক্সি টলস্টয়ের চরিত কথা পাবো। এলেক্সি টলস্টয় লিও টলস্টয়ের দূর সম্পর্কের অভিজাত কাউন্ট পরিবারের ছেলে হলেও প্রকৌশলী হিসাবেই তিনি প্রথম দিকে জীবনের দিগন্তকে

নির্দিষ্ট করেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন প্রকৌশলী স্নাতক। কিন্তু তিনি কবিতা এবং ছোট গল্প লিখতেও শুরু করেছিলেন। সুতরাং একটা সিদ্ধান্ত তাঁকে বেছে নিতে হলো। তিনি শেষ পর্যন্ত লেখক হলেন। একান্তভাবে একজন লেখক। লেখা যে একটা শিল্পরূপ তার মধ্যে তিনি মগ্ন হয়ে গেলেন।

লিও টলস্টয় চেয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ–শান্তিপূর্ণ নিরু পদ্রব হৃদয় পরিবর্তনের পথে।

এলেক্সি টলস্টয় চাইলেন সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদকে বিপ্লবের পথে।

লিও টলস্টয় নিজেকে লেখার কাজ ছাড়া আরও অন্যান্য বিষয়ে নিয়োজিত করেছিলেন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক এলেক্সি টলস্টয় লেখার মধ্য দিয়েই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন।

সোভিয়েত সাহিত্যের বিশিষ্ট বৈপ্লবিক ধারার কথা এবং বিশেষ করে সোভিয়েত উপন্যাসের বিশিষ্ট ধারার কথা তাই এলেক্সি টলস্টয়কে ছাড়া ভাবতেই পারা যায় না।

সোভিয়েত উপন্যাসের বিশিষ্ট ধারার মধ্যে এলেক্সি টলস্টয়ের বিশেষত্বটি স্মরণীয়।

সোভিয়েত সাহিত্যে আরও দুটি মহাকাব্যিক উপন্যাস রয়েছে। একটি হচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কির 'ক্লিম সামগিনের জীবন'। এটি লেখা হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের পরে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে। এই উপন্যাসের বিয়ষবস্তু ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব। দ্বিতীয় উপন্যাসটি হচ্ছে শলোকভের 'ধীরে বহে ডন'। এই বইটিও গোর্কির উপন্যাসটির প্রায় সমসাময়িক কালে লেখা হয়েছিল। এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ।

তিনটি উপন্যাসই বিশাল নদী প্রবাহ। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর 'ক্লিম সামগিনের জীবন' উপন্যাসে একজন বুদ্ধিজীবীর চরিত কথা বলেছেন, যে প্রথমে বিপ্লবের আয়োজনকে দেখেছে আল্‌গা থেকে, তারপর চুম্বকের টানে তার মধ্যে নেমে এসেছে, এবং তার পর ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পর প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে পথ খুজেঁছে। এখানে পটভূমি প্রধানত নগর। শলোকভের উপন্যাসের কসাক যুবক গ্রেগর আর কসাক যুবতী আক-সিনিয়ার প্রেমের গ্রামীণ কাহিনীতে এসে মিশেছে বিপ্লবের অমোঘ পরিবর্তনের তাগিদ। এখানে বারবার ফিরে এসেছে কসাক চাষীদের জীবন।

এলেক্সি টলস্টয় একটা সামগ্রিক ছবি দিতে চেয়েছেন। গ্রাম নগর নিয়ে যে সমগ্র রাশিয়া বিপ্লবের পথে ও নতুন জনগণের সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে বেরিয়ে এল, তাকে উপজীব্য করেছেন এলেক্সি টলস্টয়। কিন্তু তিনি এটা করেছেন প্রধানত উপলব্ধির মাধ্যমে। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরাই এখানে প্রধান।

তিনি যে 'ঘটনাবলিকে' তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছেন, সেগুলিকেও তিনি একটা সামগ্রিক রূপ দিতে পেরেছেন একজন বিশ্লেষক বুদ্ধিজীবী হয়েও।

এলেক্সি টলস্টয়ের এই বিশেষত্বকে নিয়ে আমরা যত বেশি আলোচনা করবো, তত বেশি গভীরে যেতে পারবো তাঁর চরিত বিচারে এবং সোভিয়েত উপন্যাসের চরিত বিচারে।

এলেক্সি টলস্টয়ের অন্যতম সুহৃদ সোভিয়েত লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় এলেক্সি টলস্টয় সম্বন্ধে যে কথাগুলি এখানে লিখেছেন, তার কয়েকটি পংক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য।

"তিনি একজন স্থপতির মতো কাজ না করে বরং একজন ভাস্করের মতো কাজ করতেন। তাঁর লেখক জীবনের প্রায় শুরুতেই তিনি পরিকল্পনা করে লেখার রীতি পরিত্যাগ করেন। তাঁর চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠতো ক্রমপর্যায়ে, কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হতো এবং লেখককে নির্দেশ দিত গল্পের পরিণতি সম্বন্ধে। অনেক লেখক আছেন যাঁরা চিন্তাবিদ। এলেক্সি এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি চিত্রকর। মাছকে যেমন জল থেকে আলাদা করা যায় না তেমনি তাঁকে শিল্পকলা থেকে আলাদা করা যেত না।"

'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসটিতে রয়েছে এই শিল্পীর চূড়ান্ত একাগ্রতা এবং একই সঙ্গে কমিউনিস্ট গতিধারার প্রতি আনুগত্য। এই আনুগত্য তিনি কোন সময়েই যান্ত্রিকভাবে নেননি। তিনি যে একজন প্রকৌশলী ছিলেন, সেটা কখনও কাঁটার মতো বেঁধেনি তাঁর লেখায়। তিনি তাঁর 'আয়েলিতা' নামক বিজ্ঞানোপন্যাসে প্রধানত মানব মানবীর প্রেমকে বড় করে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসটিতে কিংবা অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসে তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে। অগ্নিপরীক্ষা বইটিকে যে তিনি সমাপ্ত করেছেন সমাজতান্ত্রিক বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার ক্রজিজানভ্স্কির বক্তব্য সামনে এনে সেখানেও শেষ পর্যন্ত প্রেম এবং মানবতাই কাম্য।

পাবলো নেরুদা : অবিরত কাব্যকৃতি

১

কমরেড পাবলো নেরুদার অমর বিপ্লবী চরিতকথা ও গীতিকবিতা, আধুনিকতম কাব্যরীতির প্রয়োগ এবং মহাকাব্য 'সাধারণ সঙ্গীত' যেমন কবির মাতৃভূমি চিলির জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের, তেমনি সমভাবেই লাতিন আমেরিকাসহ গোটা পৃথিবীর শোষণমুক্ত নতুন সমাজ গড়ার প্রয়াস-ধন্য।

বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মানসের যে মৌলিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় ব্যাপক ও বিশাল বিপ্লবে নিয়োজিত এবং যার চালিকাশক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তার কাব্যের দিকটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজে পাবলো নেরুদা সামনের সারিতে থেকেছেন। দেশ-দেশান্তরে কাব্যেও যে মৌল নতুনত্ব এসেছে শত শত জাতিসত্তার সাম্যের দাবিতে এবং মুখখোলা লোকসমাজ ও বিশেষ করে নিপীড়িত শ্রেণীমাত্রের বিদ্রোহী ভাষণে, সেখানে পাবলো নেরুদা একজন

বহুজনের কাজ করেছেন। যুগযুগান্তরে পরাধীনতা ও শ্রেণীগত পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের সফলতা, ব্যর্থতা ও সম্ভাবনাকে হৃদয়বান কমিউনিস্ট কবি পাবলো নেরুদা বস্তুতপক্ষে সারা বিশ্ব পটভূমিতেই কাব্যের সূক্ষ্মতম অনুরণনের রূপ দিতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যে তাই যেমন বিশালতা, তেমনি অসংখ্য সূক্ষ্ম ছোট ছোট কাজ। স্বভাবতই নেরুদার কবিতায় রাজনীতি এসেছে, কারণ চিলির সংগ্রামী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবেই হোক অথবা বিশ্বশান্তি পরিষদের বিপ্লবী চারণ হিসেবেই হোক, কবি পাবলো নেরুদা কর্মী ও সৈনিক হয়েছিলেন। তবে মানুষের মনোজগত এসেছে তার সমস্ত উল্লাস ও রোদন নিয়ে, বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে, জৈবিকতার সাংস্কৃতিক গড়নের উত্তরণ নিয়ে তাঁর কাব্যে। আজও যা স্পষ্টরূপ হয়নি তাকে নেরুদা জোর করে স্পষ্ট করতে চাননি, কারণ তাঁর স্পষ্ট করার জন্যে প্রয়োজন মানুষের সাধনা। তিনি বাস্তবের পাশে রেখেছেন সম্ভাব্যকে, করণীয়কে। এই সমগ্র পাবলো নেরুদাকাব্য তাঁর মৃত্যুর পরে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছ থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি চর্চা ও অনুশীলন এবং মনোযোগ দাবি করে, কারণ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে তত্ত্বের ভূমিকা বেড়ে চলেছে। কাব্যের ভূমিকাও বেড়ে চলেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, নেরুদা তাঁর 'মচ্ছুপিচ্ছু' কাব্যের মধ্য দিয়ে লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের এবং এই সূত্রে বিশ্বের সর্ব দেশের শ্রমজীবী আদিবাসীদের বিশ্ব বিপ্লবে যেসব কথা বলে শরিক করেছেন, সে কথাগুলিকে সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে অনুরণিত করে তুলবার দায়িত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কাব্যে জিজ্ঞাসুদেরও এবং সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের তো বটেই।

১৯৭৩-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের নজরবন্দী অবস্থায় ৬৯ বছর বয়সে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত পাবলো নেরুদার মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহবহনকারীরা সান্তিয়োগোর কবরখানায় এবং কবরখানার পথে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গান করে যে নজির স্থাপন করেছেন, সেটা দিক-নির্দেশক। সাম্রাজ্যবাদীদের যে ফ্যাসিস্ট জল্লাদ সামরিক চক্র নেরুদার বন্ধু ও সাথী প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে হত্যা করেছে এবং যারা নেরুদারকে মৃত্যাশয্যায় নজরবন্দী রেখেছিল, তাদের আরোপিত সমস্ত বিভীষিকা ও নিষেধাজ্ঞাকে তুচ্ছ করে কবির সম্মানে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাওয়ার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবী কবি ও কবিতার এই মর্যাদা আমাদের ঈপ্সিত মূল্যবোধেরই পরিচায়ক। এই সূত্রেই স্মরণীয় 'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা' নামক আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের রচয়িতা ইউজিন পতিয়ে-র যখন ১৮৮৭ সালে মৃত্যু হয়, তখন তাঁর মৃতদেহ-বহনকারী শ্রমজীবীদের লড়তে হয়েছিল তদানীন্তন গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে। ইউজিন পতিয়ে ছিলেন প্যারি কমিউনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যে বুর্জোয়ারা প্যারি কমিউনের পতন ঘটিয়ে ২৫ হাজার শ্রমিককে প্যারি শহরে হত্যা করেছিল, তাদের বিঘোষিত শত্রু ছিলেন ইউজিন পতিয়ে। পতিয়ে-র মৃতদেহ নিয়ে ফ্রান্সের শ্রমজীবীরা আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাইতে গাইতে সরকারি শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন।

এইভাবে শ্রমজীবী জনগণের জগৎ রাজনৈতিকভাবে দুই কবির জন্যে যা করেছে, তাকে কাব্যিক বা সাংস্কৃতিক মানসিক দিক দিয়ে প্রসারিত করতে হবে সামগ্রিকভাবে ও সুদূরপ্রসারী অনুশীলনসূচি নিয়ে।

২

এই অনুশীলন বিষয়ে বিশ্বের সকল দেশেই কিছু কিছু কাজ হয়েছে। প্রয়োজন নেরুদা-চিন্তায় আরও পরিচ্ছন্নতা। প্রধানত সমগ্র নেরুদাকাব্যের ব্যাপক প্রচার এবং বিশ্লেষণ। নেরুদার সমগ্র কাব্যকে সুরক্ষিত করবার দরকার রয়েছে। এর কারণে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারা নেরুদার প্রথম যৌবনের কবিতাগুলো তাঁর পরবর্তী লেখা থেকে পৃথক করে নিয়েছে সৌন্দর্যের নামে, রসের নামে, শুদ্ধ কাব্যিকতার নামে, ব্যক্তিতার নামে। যদিও বিপ্লব, কিংবা জনগণ কিংবা শ্রমজীবী জনতা ফরমায়েস দিয়ে কবিতা লেখালে সে-কবিতার জাত যায় বলে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারা প্রচার করে আসছে, তবু তারাই কাব্য বিচারের কতকগুলো সূত্র বেঁধে দিয়েছে এবং এই সূত্র অনুযায়ী কবিতা লেখা হলেই শুধুমাত্র সেটিকে তারা স্বীকৃতি দেয়। নেরুদার অধিকাংশ লেখা তাদের সূত্রের সঙ্গে মেলে না। অথচ কিছু লেখাকে নিয়ে তারা এমনভাবে মাতামাতি করে যেন নেরুদা তাদের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে কাব্য জগতের রহস্যপুরীর দরজা খুলেছেন। 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' নামক বইটি একটি দৃষ্টান্ত।

এই বইটিকে সচেতনভাবে আমাদের তরফ থেকে নেরুদার সমগ্র বিপ্লবী কাব্যে গ্রথিত রাখতে হবে। এতে প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে কবির যে তন্ময়তা ও জৈবিকতা রয়েছে, সেগুলি কমিউনিস্ট বিপ্লবী শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বকবি নেরুদার মূল কাব্য 'সাধারণ সঙ্গীত' অথবা 'স্পেন আমাদের হৃদয়ে' এবং এই ধরনের কাব্য থেকে পৃথক নয়।

আমাদের এই বক্তব্যের এবং বিচারের পক্ষে ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত কবি ও ঔপন্যাসিক ইলিয়া এরেনবুর্গ যে-যুক্তি তাঁর 'পাবলো নেরুদা-পরিচিতি' নামক প্রখ্যাত নিবন্ধে পেশ করেছিলেন সেটি এখানে পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি নেরুদার সামগ্রিকতাকেও বুঝে নেবার জন্যে।

এরেনবুর্গ লিখেছিলেন :

"কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান"—এই কবিতার বইটি ১৯২৪ সালে প্রথম ছেপে বেরুলো। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি কবিতার সমস্ত সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো চিলির এক অখ্যাত লেখকের দিকে। ইনি নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন পাবলো নেরুদা নামে। কবির কয়েকজন অন্তরঙ্গই জানতেন যে, এটা হচ্ছে টেমুকোর অধিবাসী নেফতালি রিকার্ডো রেইসের ছদ্মনাম। বয়স তখন তাঁর মাত্র কুড়ি বছর এবং তিনি কাব্যমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন (তিন বছর আগে) ১৮২২ সালে একটি খুদে কবিতা গ্রন্থ নিয়ে।

লাতিন আমেরিকার কবিতার সেটা এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তীর্ণ হবার মাঝামাঝি অবস্থা। 'আধুনিকতাবাদ' নামে সাহিত্যিক ধারার শেষ বড় প্রতিনিধি রুবেন দারিও মারা গেলেন ১৯১৬ সালে। তিনি ছিলেন এমন একজন কবি যিনি ভার্লেনের জরাগ্রস্ত বিষণ্ন সুরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নিকারাগুয়ার ঝাঁঝরের উল্লাসমুখর সঙ্গীত। রুবেন দারিওর মৃত্যুর পর নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও দল অতীতের কাব্যের পাথরের মতো প্রাণহীন ও কঠিন প্রতীক এবং গতানুগতিক আবেগ সমেত সেই কাব্যকেই চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কেউবা প্যারির সবচেয়ে নতুন চালচলন অনুসরণ করলেন সোৎসাহে, কেউ বা আবার স্থানীয় 'মতবাদ' উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু এইসব জিনিস অবাস্তব ভোজবাজির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারল না। পারল না 'মার্কুইস', 'রাজহাঁস', 'বীণা' এবং কাব্যের অন্য সব পচা পুরানো ঠাটঠমককে ঘসে মেজে পালিশ করে বাজারে চালু করতে।

'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' বইখানিতে কোনো আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু যারাই এ বই পড়লো তারাই বুঝলো যে, এমন একজন কবির জন্ম হয়েছে যিনি বাঁধাধরা নিয়ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন, নিজের পথ খুঁজে নিতে পারবেন।

> গ্রীষ্মের বুকের মধ্যে
> এই প্রভাত ঝড়ে ভরপুর।
> মেঘেরা ভেসে চলে যাচ্ছে
> বিদায় জানানো সাদা রুমালের মতো
> সহযাত্রী বাতাস ও গুলোকে দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছে।
> আমাদের প্রণয় বিধুর নীরবতার ওপরে
> বাতাসের অসংখ্য বক্ষের স্পন্দন।

গোড়ার দিককার লেখা এই বইটি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি এই কারণে যে, এদের ভিতরে ইতিমধ্যেই পাবলো নেরুদার শিল্পরূপের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। সেগুলি হচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ, তাঁর কবিতার ভিতরকার চিত্রাবলির সজীবতা, তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিপূর্ণতা।"

ইলিয়া এরেনবুর্গ কর্তৃক উল্লিখিত নেরুদার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যে আত্মনিমগ্নতা বা বিচ্ছিন্ন একাকীত্ব ছিল না, তার একটি আশ্চর্য প্রমাণও দাখিল করা রয়েছে 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' বইটির মধ্যে কিছুটা অন্যভাবে। এই বইটির ১৬নং কবিতার নামের নীচেই লেখা রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের ৩০নং কবিতার শব্দান্তর।

নেরুদার এই কবিতাটি এবং গার্ডেনারের রাবীন্দ্রিক ভাষ্য 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর'—উভয়েরই মূলসুর ভাবলৌকিকতা। তবে এখানে যে সামীপ্যটি কাজ করেছে তা কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন ক্ষয়িষ্ণু একাকীত্বের ব্যক্তিতা নয়। 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' বইটি সম্বন্ধে এরেনবুর্গের বক্তব্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' কাব্যের লেখাগুলিকে সাজালেই বুঝতে পারা যায়, জীবনকে বিশাল সংসারের অঙ্গনে দেখবার

এবং বুঝে নেবার জন্যেও নেরুদা নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন একান্তভাবে প্রেমকে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই।

*　　*　　*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্নে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের লেখা প্রেম প্রকৃতি ও লোকায়ত বিষয়ক ছোট ছোট কবিতার ইংরেজি তর্জমার ভূমিকাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি বলেছিলেন, এটি গীতাঞ্জলি থেকে স্বতন্ত্র। নেরুদা এই বইটির ইংরেজি অথবা স্পেনিশ তর্জমা পড়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে প্রধানত প্রেমোচ্ছল ও জীবনমুখী এই বইটিতে (ইংরেজি সংস্করণে) রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের একটি ছবি ছিল। যৌবনের হৃদয়ে রাঙানো কবিতাও ছিল সাধারণ গুণনীয়ক দুজনেরই। কিন্তু 'গার্ডেনার' নিশ্চয় জীবনমুখী কথাই বলেছিল নেরুদাকে। নেরুদার বইটিতে যে প্রেম আছে এবং একান্ত নিজস্ব বাণী ও ভঙ্গীতে যা বলা আছে, তাতে জৈবিকতার প্রকাশ আছে কোথাও কোথাও, কিন্তু তাতে ক্লিন্নতা নেই, কোনো ভোগবাদী দর্শন নেই; রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' কাব্যের সামীপ্য এই মনোভাব গঠনে সক্রিয় ছিল, ধরে নেওয়া যায় না কি?

আরেকজন কমিউনিস্ট কবিকেও 'গার্ডেনার' গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি জার্মানির বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬। জার্মানির একটি কাগজে 'গার্ডেনার' কাব্যের জার্মান অনুবাদের সমালোচনা লিখেছিলেন তিনি ১৯১৪ সালে।

ব্রেখ্‌ট্ লিখেছিলেন, "এইসব প্রতি দিবসের অতি কিঞ্চৎকর অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম আর বিস্ময়কর স্পর্শপ্রবণ, অতিরিক্ত কবিতার জন্ম দিয়েছে। শব্দগুলি কোনো কাব্যিক নিয়ম, মিল বা ছন্দস্পন্দনের শিকল পরে না। এই পবিত্র রাখালিয়া নিসর্গের আছে নিজস্ব সঙ্গীত।" বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্ জার্মান কবিতায় যে একান্ত নিজস্ব ধারা এনেছেন শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি ও বিপ্লবের কাব্যিক ভাষ্যকার হিসেবে, তাতে 'গার্ডেনার' কাব্যের সুর প্রতিবন্ধকতা করে নি, বরং মানসিক উন্মেষে সাহায্যই করেছিল।

'গার্ডেনার' কাব্যের সামীপ্য ব্রেখ্‌টের মতো নেরুদার যৌবনের কবিতায় যে সুরটি ঝঙ্কৃত করেছিল সেটি ক্ষয়িষ্ণু ছিল না, ছিল ক্ষয়িষ্ণু। যদিও তাতে তখন যৌবনের মাদকতা ছিল এবং স্বপ্নবিলাসও ছিল প্রচুর পরিমাণে, তবু তাতে গাঁজিয়ে যায় নি তাঁর চিত্ত। চিলির বাইরের পৃথিবীর হাওয়া বইছিল নেরুদার স্বদেশের নিসর্গে লালিত বিরহী চিত্তের আকাশেও। সে হাওয়াকে গ্রহণ করার মতো মন এবং কাব্যে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাও গড়ে উঠেছিল সেই সময়েই। সুতরাং ১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে রক্তাক্ত গণযুদ্ধ যখন নেরুদার কবিতায় মুক্তি সংগ্রামী জনগণকে ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে সবেগে একযোগে নিয়ে এল, তার জন্যে কাব্যিক রূপকল্প ও বাণীর আয়োজন সেদিনই করতে হয়নি তাঁকে। ১৯২৪ সালেই এ কাজ করে রেখেছিলেন তিনি ব্যাপক সংবেদনশীলতা ও কণ্ঠস্বরের প্রবণতাকে ব্যক্তিক আকুতির সঙ্গে মিশ্রিত করে।

এর পরে এই ধরনের আরও দ্বন্দ্বাত্মক উপাদানের অতি সাবলিল সংযোজন তিনি ঘটিয়েছিলেন 'পৃথিবী আবাসভূমি' (১৯২৫-৩৫) কাব্যপর্যায়ে। সেখানে অবশ্য

আধুনিকতম বাস্তববাদী ইউরো-আমেরিকান কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বোদলেয়ার ও র‍্যাঁব থেকে শুরু করে পরাবাস্তববাদী সুররিয়ালিস্ট ফরাসি কবিদের লেখার অনুষঙ্গ, অনিবারণীয় মৃত্যুর যবনিকা সম্বন্ধে চিন্তা এবং দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক তনুরক্ষার আচার-বিচার ক্ষুধা ও যৌনতার চক্রায়নের দুর্বোধ্য জটিল এবং স্থূলও তীব্র তীক্ষ্ণ সহজভাষী প্রকাশনা ঘটেছিল। এই চক্রায়নের মধ্যেও গড়ে তুলেছিলেন তিনি বিপ্লবেরই মালমসলা।

১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতান্ত্রিক শক্তির মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে শরিক করে নেরুদা তাঁর কবিতায় যখন একটা নতুন পরিচ্ছেদ ঘটালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পৃথিবী আবাসভূমি' (১৯৩৫-৪৫) কাব্যপর্যায়ে আধুনিক স্বপ্নকাব্য ছেড়ে আধুনিক জাগরণী কাব্যের সূচনা করলেন, তখনও তিনি তাঁর ১৯২৫-৩৫ পর্যায়ের লেখাকে বাতিল করে দেননি, কারণ, তাতে বিপ্লবের উপাদান ছিল। এর একটা দৃষ্টান্ত তাঁর ১৯২৫-৩৫ পর্যায়ের 'পৃথিবী আবাসভূমিতে' লেখা 'ক্রোধ-উত্তেজনা-দুঃখেরা' কবিতার শীর্ষে ১৯৩৯ সালের সংস্করণে তাঁর মন্তব্য।

মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

"এই কবিতাটি ১৯৩৪ সালে লেখা হয়েছিল। তারপরে কত ঘটনাই না ঘটে গিয়েছে। যে স্পেনে বসে আমি এই কবিতা লিখেছিলাম সে এখন ধ্বংস-বেষ্টনিতে। আহা, যদি এক ফোঁটা কবিতা কিংবা ভালবাসা দিয়ে আমরা পৃথিবীর ক্রোধকে শান্ত করতে পারতেম। কিন্তু সে করা যেতে পারে শুধু সংগ্রাম করে সংকল্পবদ্ধ হৃদয় দ্বারা। বিশ্ব বদলে গিয়েছে এবং কবিতাও বদলে গিয়েছে। এই কবিতাটির ওপর এক ফোঁটা রক্ত পড়েছে, তা এই কবিতাতে থেকে যাবে, প্রেমের মতোই তা অনপনেয়। মার্চ, ১৯৩৯।"

এই মন্তব্যটি থেকে বুঝতে পারা যায়, নেরুদা তাঁর আগেকার কবিতাকে বর্জন করেন নি। পদ্ধতিকেও বর্জন করেন নি। ধারাবাহিকতার উপকরণ এবং যোগসূত্র না থাকলে এভাবে তিনি শহীদদের বুকের রক্তের ফোঁটা দিয়ে 'ক্রোধ উত্তেজনা ও দুঃখেরা' কবিতাকে শুদ্ধ করে নিতে পারতেন না।

৩

যে ধারাবাহিকতা ও যোগসূত্রের উপাদানগুলি গড়ে উঠেছিল তাঁর গোড়ার দিকের লেখাতেই সেগুলিকে আপাতত নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমত, নেরুদা বাস্তববাদী মেরুতে অবস্থান নিয়েই ভাববাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর যৌবনে চিলির নিসর্গের উদার আকাশ, বিশাল সমুদ্র ও প্রসারিত মৃত্তিকাভূমি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যেই মৃত্তিকাভূমির সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল ঘনিষ্ঠতম। বন্দর একটা প্রধান প্রতীক এই কারণেই তাঁর লেখার। এই বন্দরই লোকালয় ও নাবিকদের আশ্রয়।

দ্বিতীয়ত, নেরুদা দ্বন্দ্বমূলক গতিধারাকে তাঁর ১৯২৫-৩৫ সালের কাব্য পর্যায়েই গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, দরিদ্র ঘরে জন্মেছিলেন, এটা কখনও ভোলেন নি। শ্রমজীবীদের সঙ্গে নাড়ি বাঁধা ছিল তাঁর।

চতুর্থত, জীবনতৃষ্ণা মৃত্যুর অমোঘ উপস্থিতিকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। জীবনকণা, গাছের শিকড়, ফলের গুচ্ছ, গমের শীষ হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করার একান্ত বস্তুগত প্রতীক।

আগেকার জটিল পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেই বিভিন্নভাবে এই উপাদানগুলিকে নেরুদা অঙ্গীভূত করেছিলেন।

এই পর্যায়ের 'গার্সিয়া লোরকার প্রতি' কবিতাটিকে নেরুদা বোধ হয় লোরকার সহজ কাব্যরীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ করে নিয়েছিলেন।

এতে প্রথম দিকে সম্ভাষণের রূপকল্প যতই কেননা জটিল হোক, শেষের দিকে তা সহজ সরল এবং আমাদের উত্থাপিত যোগসূত্রের দু-একটি উপাদানকে সোজাসুজি সামনে এনেছে। মৃত্তিকার স্নেহধন্য প্রকৃতি-মানব ও চিরযৌবনের প্রতিভূ লোরকাকে নেরুদা সমকালীন জীবনের গভীর দুঃখের কথা জানিয়েছেন দারিদ্র্যের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে :

> সর্বোপরি রাতের বেলায়
> রাতের বেলায় অনেক তারা,
> এরা সবাই একটি নদীর ভিতরে,
> গরীব মানুষে ভর্তি বাড়িঘরের
> জানালাগুলির ধার দিয়ে ফিতের মতো টানা।
> কেউ মারা গেছে, বোধ হয় কেউবা
> ওরা চাকরি হারিয়েছে অফিসে,
> হাসপাতালে, এলিভেটারে,
> খনিতে,
> মানুষেরা পাশবিকভাবে আহত হয়ে-ক্ষত নিয়ে ধুকছে
> সর্বত্র রয়েছে অভিপ্রায় এবং কান্না।
> নেরুদা আরেক জায়গায় বলেছেন,
> এই হচ্ছে জীবন, ফেদেরিকো
> এই হচ্ছে একজন বিষণ্ন পুরুষোচিত মানুষ
> যা তোমাতে জানাতে পারে।
> ইতিমধ্যে তুমি নিজে নিজেই জেনেছ অনেক কিছু
> বাদবাকি জানবে ক্রমে ক্রমে, সময়মতো।

১৯২৫ থেকে ৩১ সালের মধ্যে লেখা 'পৃথিবী আবাসভূমি' কাব্যে নেরুদা লিখেছিলেন, 'আহা, আমি যেন পারি অবিরত হতে এবং বিরত হতে।' 'লোরকার প্রতি' কবিতার উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ এই দ্বন্দ্বাত্মক গতি-চেতনারই আরেকটা রূপ।

এই রূপ দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারা যায়, নেরুদা বৈপ্লবিক বিস্ফোরক উপকরণ জমা করেছিলেন অনেক আগে থেকেই।

একেবারে শুরুতেই পাওয়া যাবে এমন একটি উপকরণ:

তুমি মৌমাছিদের উন্মত্ত যৌবন,
তরঙ্গের মদমত্ততা,
গমের শীষের শক্তি।

(১৯নং কবিতা-'কুড়িটা প্রেমের কবিতা')

নেরুদার কাছে এই শস্যবীজ মানুষের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রাণ ও শ্রমের প্রতীক। একে তিনি 'সাধারণ সঙ্গীত' অথবা আরও পরে খোলাখুলি বিপ্লববাদী কবিতায় ব্যবহার করেছেন। দুটি দৃষ্টান্ত :

বুনো হাঁসের দল আর আপেলগুচ্ছ
প্রান্তর আর জলরাশি
আর অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে
অঙ্কুরিত বীজ।

(জাগো কাঠুরিয়া জাগো)

কিংবা

আমি যখন বলি, সময় হয়েছে
তখন আমি বুঝি, আবার ফিরিয়ে
আনা হচ্ছে স্বাধীনতা
আমি বুঝি হাজার হাজার থরো থরো কম্পমান
সে বীজ,
যা কিউবার মাটিতে ভালবাসায় মঞ্জরিত।
আর আমাদের মর্যাদার সেই শস্যকণা
দীর্ঘ অতীতের বিড়ম্বনা আর আতঙ্কিত
হৃদয় নিয়ে
দলিত লুণ্ঠিত ক্ষেতে খামারে
আর আমাদের আমেরিকায় বিপ্লবের
পতাকা
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

(স্বাধীনতা)

বস্তুতপক্ষে নেরুদার কাব্যের সামগ্রিকতার নিরীক্ষা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছি যে, প্রথমত তিনি তাঁর তথাকথিত অরাজনৈতিক কাব্যপর্বের পদ্ধতি ও উপকরণ ফেলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়েছেন, তা আমরা কেহ দাবি করব না। তাঁর অন্তর্মুখিতা এবং বহির্মুখিতা, স্বগতোক্তি ও প্রকাশ্য ঘোষণা, একাকীত্ব ও জনতা-প্রবণতা যোগসূত্র ধরে পরবর্তী কবিতায় মিশ্রিত হয়েছে কমিউনিস্ট হয়ে জনগণের কাছে কবিতা আবৃত্তি শুরু করার পরে পর্যন্ত।

৪

নেরুদা ১৯৪৩ সালে মেক্সিকো থেকে স্বদেশ ফিরবার পথে পেরুতে ইনকা আদিবাসী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ 'মচ্ছুপিচ্ছু' তে আরোহণ করে ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পাশাপাশি 'মচ্ছুপিচ্ছু' নিয়ে যে মহাকাব্যিক কবিতা লিখেছেন, তাতে 'পৃথিবী আবাসভূমি' ১৯৩৫-৪৫ কাব্য পর্যায়ের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষণের পদ্ধতি ছেড়ে বেশ খানিকটা আগেকার অস্পষ্ট সান্ধ্য ভাষণের পদ্ধতিতে কাজ করেছেন।

তবে, প্রাচীন ইনকা সভ্যতার নিদর্শন 'মচ্ছুপিচ্ছুর' নির্মাতা যে বিভিন্ন বৃত্তির সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষেরা, তাদেরই জয়গান 'মচ্ছুপিচ্ছু' কাব্য। 'প্রাচীন আমলে প্রত্যাবর্তন নয়' নতুন পৃথিবীতে অভ্যুত্থান'—এই আহক্ষান রেখেছেন তিনি লাতিন আমেরিকার আদিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত চাপাপড়া নিপীড়িত মানুষের জন্যে। কিন্তু, প্রথমত, সম্ভবত একটি রহস্যময় অতীতের নির্মাতাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে নেরুদা বেছে নিয়েছেন সান্ধ্য পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত, তিনি নিয়েছেন অতিরিক্ত আসক্তি-ভাষী অবচেতনার সাহায্য। এটা তিনি করেছেন কবিতার বোধ সম্পর্কিত আধুনিক ও প্রাচীন উভয় কার্যক্রমেরই প্রতীতি থেকে। কবিতা আসক্ত, বিজ্ঞান নিরাসক্ত এবং বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ উভয়ের সম্পূরক—এই তত্ত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কথা। নেরুদা এই তত্ত্বেরই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন 'মচ্ছুপিচ্ছু' লিখতে গিয়ে।

এই কবিতাটির পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সমগ্র কাব্যের পারম্পর্যের চেতনা।

মহান বিপ্লবী চেগুয়েভারার একান্ত প্রিয় এবং সংগ্রামের সঙ্গী এই কবিতাটির পদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র কাব্যের পারম্পর্যের চেতন। এতে প্রত্যক্ষ ভাষণও প্রবল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এই সময়েই 'সাধারণ সঙ্গীতে' মহাকাব্যের ছত্রে ছত্রে চিলির অংশ লিখতে গিয়ে নেরুদা প্রত্যক্ষ ভাষণের সেই পদ্ধতি নিয়েছেন যা তিনি 'স্পেন আমাদের হৃদয়ে'তে শুরু করেন, যা তিনি ১৯৩৫-৪৫ সালে লেখা যাবতীয় কবিতায় খোলাখুলি বলার ধারায় বলেছেন। 'স্তালিনগ্রাদকে অভিনন্দন' অথবা 'বলিভার প্রশস্তি' কিংবা স্পেনের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা 'লুইস কম্পানিজ' কিংবা 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় যে ঘোষক পদ্ধতি রয়েছে, তা নিয়েই তিনি সাধারণ সঙ্গীতের অধিকাংশ কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ আসক্তির গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন নেরুদা। আসক্তি, অনুরাগ, অন্তরাত্মা বা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা বা প্রীতিকে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের ধারক-বাহক কাব্য ব্যবসায়ীরা যৌন আসক্তিতেই আবদ্ধ করে দেখতে চেষ্টা করে আসছে এবং পাবলো নেরুদার বিস্তৃত জীবনের কবিতাতে যে যৌন আসক্তি রয়েছে তাকেও যৌন ব্যবসায়ীরা তাদের বিকারে টানতে চেষ্টা করেছে নানারকম ব্যবস্থাপত্র জোগাড় করে। কিন্তু নেরুদার অনুরাগের জগৎ এত বিশাল এবং একফোঁটা নয়নবিন্দু কিংবা একফোঁটা রক্ত কিংবা একটা পাখি অথবা অগণিত পাখিরা এমনভাবে তাঁর অনুরাগ বা আসক্তিকে সূর্যের আলোর কণিকার মতো নিজের ওপর টেনেছে যে, নেরুদার কাব্যের কিছু অংশে যৌন আসক্তির কথাবার্তা একটি খণ্ড প্রসঙ্গমাত্র। উপরন্তু সামগ্রিকভাবে যেটা নেরুদার কাব্যে ঘটেছে

সেটা এই যে, নর-নারীর বাস্তব সম্পর্ক ভিত্তিক প্রেমের ব্যাপারটাই বিশাল জীবনের অংশ হয়ে পেয়েছে বহুমাত্রিক মূল্যবোধ। জৈবভিত্তিক প্রেম নেরুদার কবিতায় আত্মকণ্ডুয়নের আত্ম অবরোধ তৈরি করেনি। এর মূল কারণ অবশ্য নতুন মানব সমাজ গড়ার জন্যে কোটি কোটি মানব-মানবীর হাতে হাত রেখেছেন নেরুদা। এখানেই ফরাসি আধুনিক রীতির প্রবর্তক বোদলেয়ার প্রসঙ্গ আসতে পারে। নেরুদার একসময়ে বোদলেয়ারের প্রভাবে পড়েছিলেন নর-নারীর সম্পর্ক চিত্রণ করতে গিয়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বোদলেয়ার ১৮৪৮ সালে শ্রমিক বিপ্লবে যোগ দিলেও বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে শিল্পকলার জন্যে শিল্পকলার তত্ত্বে চলে গিয়েছিলেন বিপ্লবের নব আয়োজনের পথ ছেড়ে। অপরদিকে নেরুদা স্পেনের গণতন্ত্র পরাজিত হবার পরেও আরও বেশি করে বিপ্লবের পথে নেমে-ছিলেন। তবু আসক্তি তার ব্যাপক অর্থে আসক্তিই বটে। বিজ্ঞানের নিরাসক্ত দৃষ্টির সঙ্গে এর দৃষ্টির প্রভেদ রয়েছে। এই আসক্তির মাত্রা নেরুদার কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই বেশি। বিজ্ঞানীও তাঁকে আসক্ত করেছে। প্রিয় বন্ধু এবং বিশ্বশান্তির সংগ্রামের সাথী বিজ্ঞানী জে. ডি. বার্নালের মৃত্যুর পরে ১৯৬৫ সালে পাবলো নেরুদা যে কবিতা লিখেছেন, তাতে এই ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে গভীর অন্তরঙ্গতা এবং প্রতীতির সঙ্গে সৌন্দর্য প্রিয়তা। এই কবিতার কয়েকটি লাইন:

বার্নাল, এই কথাটার
মধ্যে রয়েছে আগুন আর ঝংকার।
আমরা যদি উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে
একথাটা চীৎকার করে বলি
তাহলে পায়রারা দল বেঁধে উড়তে থাকবে
আলোর তরঙ্গমালা দরজা খোলা পাবে।
অধ্যাপক বন্ধু,
তুমি যা দিয়েছ সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ
তোমার সাহসের জন্যে, তোমার জ্ঞানের জন্যে
তোমার নামটির জন্যে।
উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে
আমরা গান করে যাব,
বার্নাল
বার্নাল
পায়রারা দল বেঁধে উড়তে থাকবে।

জীবন ও বিজ্ঞানের সত্যকে এইভাবে সুন্দর করে দেখবার এবং দেখাবার প্রবণতা নেরুদাকাব্যের একটা বড় দিক।

কিন্তু এখানেই নেরুদাকাব্যের একটা বড় রকমের বৈশিষ্ট্যও এই যে, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রবণতার দরুন কোনো বুর্জোয়া স্তাবকের পাতা ফাঁদে তিনি পা দেননি। বরং, ঘটেছে উল্টোটা। 'কারাকাসের মিগুয়েল দ্য সিলভার কাছে চিঠি ১৯৪৮' নামক কবিতাতে বুর্জোয়া স্তাবকদের প্রসঙ্গ টেনে নেরুদা লিখেছিলেন-

আমি তখন আমার প্রেমের কবিতাগুলো লিখছিলাম
সেগুলো আমার মধ্য থেকে গাছের পাতার মতো বেরিয়ে
বেড় দিচ্ছিল আমাকে।
আমি অবসাদের ঘোরে বুঁদ হয়ে রয়েছি তখন।
বেদের মতো ছন্নছাড়া তখন আমি
বর্ণমালাকে কামড়ে খাচ্ছিলাম,
তখন তারা আমাকে বললো,
'কি মহান ব্যক্তি তুমি, থিওক্রিটাস'।
আমি কিন্তু ওদের থিওক্রিটাস নই।
আমি বরং জীবনকে গ্রহণ করেছি,
তার মুখোমুখি হয়েছি,
আমি তাকে চুম্বন করেছি, জয় করেছি।
তারপর খনির সুড়ঙ্গগুলোতে ঢুকেছি
অন্যান্য মানুষ কিভাবে থাকে, তা দেখার জন্যে।
যখন বেরিয়ে এসেছি,
তখন হাতদুটোতে ময়লা ও বিষণ্নতা।
আমার হাতদুটোকে জেনারেলদের সামনে তুলে ধরে
আমি বলেছি, "তোমাদের এই অপরাধের অংশীদার
আমি হতে পারি না।"
ওরা খুক খুক করে কাশতে শুরু করেছে,
হতশ্রদ্ধা দেখিয়েছে,
দেখা হলে শিষ্টাচারের সম্ভাষণ জানায়নি,
আর আমাকে থিওক্রিটাস বলে ডাকেনি,
সর্বশেষে আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে
আমাকে ধরবার জন্যে সমগ্র পুলিশবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে।
এর কারণটা হচ্ছে এই যে,
আমি শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে
কাব্য করিনি।

স্বাধীনতা, সাম্য ও শ্রমজীবী জনগণের যারা শত্রু এবং এই শত্রুদের যারা অনুচর তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা যত বেড়েছে, তত বেশি করে কাব্যিক জগতে যাতে নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহীকে সরাসরি আনা যায় সেজন্যে নেরুদা সচেষ্ট হয়েছেন।
বিশেষ করে একটা ব্যাপার তাঁকে কাব্যিক গুণগত বৈপ্লবিক উত্তরণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নিজের জবানিতেই মৃত্যুশয্যাতেও এই উত্তরণের পরিচয় দারুণভাবে পরিস্ফুট।

বন্ধু কমরেড প্রেসিডেন্ট আলেন্দে ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের জল্লাদদের বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার তিন দিন পরে নেরুদা তাঁর আত্মজীবনীর একটি পরিচ্ছেদ হিসেবে 'স্মৃতি বিস্মৃতি অনুস্মৃতি' নাম দিয়ে যে সংযোজনটি লেখেন, তাকে

তাঁর কাব্যকৃতির মূল প্রেরণা করেন, সেকথা গভীর আবেগের সঙ্গে লেখা আছে। এখানে তার কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি :

"খরা কবলিত শুষ্ক পাম্পাস-প্রান্তরে হাঁটাচলা বড় শক্ত। এই মরু অঞ্চল যেখানে দশকের পর দশক একফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না এ জমি ছাপ রেখে যায় খীন শ্রমিকদের দেহে মনে। আগুনে ঝলসানো ওঁদের মুখ আর জোড়াজোড়া তীব্র কালো চোখ সর্বহারা মানুষের অপার নিঃসঙ্গতা মূর্ত করে তোলে। যে কেউ পথহীন অনাবাদী জমি ভেঙ্গে আন্দিজের পাহাড় চূড়োগুলোয় ওঠে, যে-কেউ গরীব মানুষের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বুঝতে চায় তাঁর আশাহত ভবিতব্যকে, যে উপলব্ধি করে এই সব দারিদ্র্য পীড়িত ও অবহেলিত মানুষ তাঁদের বহুবাঞ্ছিত আশা পূরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তারই উপর, তার উপর বর্তায় তখন এক বিরাট কর্তব্যের বোঝা। আমি এসেছিলুম ওঁদের কাছে আমার কবিতা বিছানো পথ বেয়ে, আর ওঁরা ভাই বলে ওঁদের দুঃসহ কঠোর জীবনের সঙ্গী বলে চিরকালের মতো গ্রহণ করলেন আমায়... বছরের পর বছর এইসব মরু অঞ্চল পারাপার করেছি আমি। এখানকার বাসিন্দারা আমাকে তাঁদের সেনেটর বানিয়েছিলেন। যাঁরা খনি থেকে সোনা আর তামা তোলেন অথচ জীবনে কখনও কামিজের কলার আর টাই পরেননি, আমাকে তাঁরা বানিয়েছিলেন সেই শ্রমজীবী বাহিনীর প্রতিনিধি।

জনতাই আমাকে শিখিয়েছে, জীবন কী বস্তু। এমন একটা সময় ছিল যখন আমি জনতার কাছে যেতুম কবির সহজাত ভীরুতা নিয়ে, নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষের লাজুকতা নিয়ে। কিন্তু একবার জনতায় ডুব দিয়ে আমার রূপান্তর ঘটে যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত আমি তো তারই মেদমজ্জা আর সংখ্যাগুরুর একটা কণা, মানবজাতির বৃহৎ বনস্পতির একটি পল্লবমাত্র। এযুগের কবির প্রধানত বাধ্যবাধকতা হল, নির্জনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়েও জনতার মধ্যে সহজভাবে মিশে যেতে পারা।

নির্জনতা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, চিলির তটভূমির উপর আছড়ে পড়া ঊর্মি মালার সংগ্রাম সে চিনিয়েছে আমাকে। বালু বেলার সঙ্গে সংগ্রামরত ঢেউ-এর পর ঢেউ, নোনাজলে ক্ষয়ে যাওয়া পাহাড়, সমুদ্র জীবনের রকমারি বৈচিত্র্য, পথিক পাখিদের নিখুঁত সারি বাঁধা ঝাঁক, নোনাজলের জৌলুস-এসব দৃশ্য মুগ্ধ করেছে আমায়। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি আমার জীবনের উত্তাল জোয়ারের ঢেউ, একসঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা শত শত চোখে দেখেছি আমি স্নেহের কোমলতা। হয়তো সব কবির পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু যাঁদের এই সৌভাগ্য হয়, তাঁরা চিরকাল একে হৃদয়ে লালন করে যান, তাঁদের বইয়ের পর বইয়ে একে মুদ্রিত করে রাখেন।"

মস্কোতে পাবলো নেরুদার সঙ্গে একটা বিশেষ সাক্ষাৎকার করে ইলিয়া এরেনবুর্গ কবির শান্তির সংগ্রামের প্রশস্তি-গানের জনাকীর্ণতার দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছিলেন, "পাবলো নেরুদা বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন যে তিনি সমাধান খুঁজে দিতে চান না। তবু তিনি কিন্তু নিজের মতো করে এবং কাউকে অনুকরণ না করে আমাদের যুগের একটা সবচেয়ে জরুরি সমস্যার সমাধান করেছেন। সেটা হল জনগণের শ্রম এবং সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নতুন কাব্য সৃষ্টি। রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে মহৎ কবিতা মিল খায় না-

'বিশুদ্ধ কবিতা'র প্রবক্তাদের এই নির্বোধ এবং বিরক্তিকর যুক্তির জবাব দিয়েছে তাঁর চমৎকার কবিতা।"

নেরুদা যে তাঁর কাব্যিক উপলব্ধিকে নিজে ব্যক্তিতার মধ্যে অবরুদ্ধ না রেখে এই ভাবে নিজেকে 'বহু মানুষ' হিসাবে প্রকাশ করলেন, এটা বস্তুতপক্ষে সেই কমিউনিস্ট সমাজের উত্তীর্ণ হবার সূচনা, যেখানে-'সকলে প্রত্যেকের জন্যে, প্রত্যেকে সকলের জন্যে।' (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)

এখানে নেরুদাকাব্যের একটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছেন, "নেরুদার সাধারণ সঙ্গীতে একটি কাব্যে-উপন্যাসে। অর্থাৎ এ কাব্য অসংখ্য চরিত্রচিত্র ভিত্তিক।"

ব্যাপারটা আসলে এই যে, শুধু 'সাধারণ সঙ্গীত' নয় অন্যান্য বহু কবিতাতে এসেছে অসংখ্য নর-নারীচরিত্র যাদের মধ্যে একদিকে যেমন কবি নিজের বহুমানবত্বকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, তেমনি তারা জনগণের অযুত-নিযুত বিচিত্র সত্তা, যাদের প্রত্যেকটির মূল্য সমান। এরা এমনভাবে সক্রিয় যে, মহাকাব্যিক নাটকীয়তার ঊর্মিমালার কোনো শেষ হয় না।

বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, এত নাম করে করে, ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কবিতা কি করে লিখলেন তিনি। শুধু লাতিন আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বের দেশ-দেশান্তরে মুক্তি সংগ্রামী নর-নারীর নাম করে কবি জানিয়েছেন প্রশস্তি। যেখানে নাম করেননি, সেখানেও প্রত্যেকটি মুখরেখা সুস্পষ্ট।

এই সূত্রে দুটি কবিতা বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত। একটি 'পলাতক' আরেকটি 'পার্কে মৃত্যু'। দুটিই সেই ১৯৪৮ ও তার কাছাকাছি সময়ের চিলির কবিতা, যখন নেরুদাকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হবার পরে। 'পলাতক' কবিতাটিতে করিব আত্মগোপন করার কাহিনী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সংগ্রামী নর-নারীর চরিত্র আবিষ্কারের কাহিনী।

'পার্কে মৃত্যু' কবিতা চিলির জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী যেখানে লাল-ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শ্রমিক নর-নারী সাধারণ ধর্মঘটে সমর্থন জানাতে গিয়ে সমর-কর্তাদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

এখানে যেমন সাধারণভাবে শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন আছে, তেমনি নাম করে করে কয়েকজনকে অভিনন্দিত করা আছে।

নিজেকে অসংখ্য সাধারণ ও অসাধারণ নর-নারীর সঙ্গে একাত্ম করার এই প্রবণতার আকেটি চমকপ্রদ দিকও আমরা পাই নেরুদা কাব্যে ও নেরুদাচরিত্রে। সেটি হচ্ছে নিজের দেশের, লাতিন আমেরিকার এবং সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কবি ও শিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর গভীর ব্যাপক একাত্মতা। স্পেনের পাশে গণচীন।

প্রকৃতপক্ষে নেরুদার কাব্য বিশ শতকের বিপ্লবী বিশ্ব সাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয়দের সমাবেশ-স্বরূপ। যাদের সঙ্গে কবির দেখা হয়েছে তাদের তালিকা প্রকাশ করেছেন কখনো কখনো। কখনোবা একেকজনকে বেছে বেছে অভিনন্দিত করেছেন। যাদের দেখেননি, তাদেরেও যেন চোখের উপর রেখেছেন। মায়াকভস্কির প্রতি তাঁর

ছিল গভীর অনুরাগ। বলেছিলেন, 'আমাদের তরুণ বয়সে আমরা মায়াকভস্কির কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়েছিলাম। জরাজীর্ণ কাব্যের রীত-নীতি, উষা ও প্রত্যুষের চুলচেরা বিচারের মধ্যে ধ্বনিত এক নতুন কণ্ঠস্বর: তার আওয়াজটা যেন রাজমিস্ত্রির হাতুড়ির শব্দ। সমষ্টির হৃদয়ের দিকে কবি তাঁর দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি খুঁজে পেয়েছেন শক্তি তাঁর নতুন গানের জন্যে। আমাদের যুগের কাব্যে মায়াকভস্কির শক্তি, কোমলতা ও প্রচণ্ডতাকে আজও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।" পাবলো নেরুদা এই ভাবেই কবিদের কবি, শিল্পীদের শিল্পী। স্পেনিশ ভাষার কবিদের তো কথাই নেই, অন্যান্য দূর-দূরান্তের ভাষাভাষীদের একান্ত আত্মীয় করে নিয়েছিলেন তিনি। মূল কথাটা অবশ্য 'শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়া' এবং গড়ার জন্যে সংগ্রাম করা। তাঁর 'হার্নাদেজের প্রতি' কবিতায় যে শপথবাণী, 'হাওয়ার্ড ফাস্টের প্রতি' কবিতাতেও সেই শপথবাণী। এ ব্যাপারে সামান্য খটকাও রাখতে চাননি তিনি। কবি শিল্পীদের ভালোবাসা এবং আদরও পেয়েছেন তিনি। লুই আরাগঁ লিখেছেন কবিতা, 'পাবলো নেরুদার গান'। একই সঙ্গে দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা প্রবল ছিল এবং খটকাবিহীন ছিল বলেই এই সারা বিশ্বে হাতে হাত রাখা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী ঐক্যের যে ভিত্তি আছে, তার জন্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রতিবাদীরা যে সংগ্রাম করে আসছেন, সেজন্যেও নেরুদা দুহাত বাড়িয়ে আদর জানিয়েছেন।

পাবলো নেরুদার আন্তর্জাতিকতাবোধের একটি নিদর্শন তাঁর ১৯৩৫-৪৫ সালের 'পৃথিবী আবাসভূমি' কাব্যের ৭ই নভেম্বর কবিতাটি। এই কবিতায় তিনি গণতন্ত্রী স্পেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭ই নভেম্বরের একটি সামীপ্য ঘটিয়েছিলেন। নিজেকে আশ্বস্ত করেছিলেন তদানীন্তন দুর্যোগের দিনে। আরেকটি নিদর্শন 'জার্মানির গান।' তখন নাৎসিরা জার্মানিতে ক্ষমতাসীন। নেরুদা লিখেছিলেন,

হে জার্মানি, তোমার যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয় থেকে
একটা নতুন নদী উৎসারিত হয়েছে।
দুর্ভাগ্য থেকেই এর জলধারা উঠে আসছে ওপরে।
গোপন কণ্ঠ লাল তীরভূমির ধার দিয়ে বেড়ে উঠছে
ডুবে যাওয়া মানুষ উঠে দাঁড়াচ্ছে, হাঁটছে।

এমনি আরও আরও নিদর্শনে ভরে আছে নেরুদাকাব্য। বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যের জন্যে রয়েছে মুঠো মুঠো আশ্বাস আর শপথ।*

---

* কাঠুরিয়া জাগো এবং স্বাধীনতা অনুচ্ছেদ দুটি নিয়েছি অসিত সরকার ও কমলেশ সেনকৃত নেরুদা-অনুবাদ থেকে।
স্মৃতি বিস্মৃতি অনুস্মৃতি নিয়েছি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ থেকে। বাদবাকী অনুবাদগুলি আমার অর্থাৎ নিবন্ধকারের।

গিওগি লুকাচ : মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি

১

হাঙ্গেরির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক গিওগি লুকাচ সত্তরের দশকের প্রারম্ভে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ৮৬ বছর বেঁচেছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে লুকাচ তত্ত্ব ও প্রয়োগের সম্মিলনের মার্কসীয় তাগিদের যথার্থ প্রমাণ করে গেছেন তাঁর 'উপন্যাসের তত্ত্ব' থেকে শুরু করে 'সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব' ও অন্যান্য গ্রন্থে। এই বইগুলি হচ্ছে বস্তুতপক্ষে মার্কসীয় লেনিনীয় মানবীয় জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে রসায়িত বিশ্বের সর্বকালের মানব মানবীয় জৈবিক আত্মিক রূপের পিপাসা ও তার জন্যে প্রয়াসের দিকনির্দেশনা। যেসব খনি চারশ পাঁচশ বছর চলবে বলে দাবী করা হয়, তাদের মতোই অগাধ লুকাচের রেখে যাওয়া তত্ত্বের ভাণ্ডার। কিন্তু খনির মতোই তৈরি উপাদানই রয়েছে এতে। হীরা না বলে বলবো কয়লা। কারণ, আরদ্ধ সাম্যবাদী বিপ্লবকে সম্পন্ন করার বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের জন্যে চাই ইন্ধন।

লুকাচের জীবনটাই ছিল বিপ্লবের ইন্ধন। কথা ও কাজকে ভাগ করেন নি। মার্কসীয় লেনিনীয় সৌন্দর্যতত্ত্বকে হাজার হাজার বছরের জ্ঞান ও রূপের উপকরণে সজ্জিত করার জন্যে দুরূহ বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু গণবিপ্লব তাঁর কাছ থেকে সহজ কাজও আদায় করে নিয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত উপন্যাসের উপর তাঁর তিনটি বই উপন্যাসের মতোই হৃদয়গ্রাহী।

মাতৃভূমি হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের স্নাতক গিওগি লুকাচ যৌবনে জার্মানির ধ্রুপদী দার্শনিক কান্ট ও হেগেলের কাজকে সরেজমিনে বুঝবার জন্যে বার্লিনে ও হাইডেলবার্গে দর্শনশাস্ত্রের নামী অধ্যাপকদের সাহচর্যে বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন। গুরুভার (ধ্রুপদী দার্শনিকতার টানে) জার্মান ভাষায় দখল এনেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানবত্তার ব্যাপারটা তাঁকে বাস্তব জীবনের এবং বিশেষ করে হাঙ্গেরির রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বাইরে নিতে পারেনি। বরং তিনি দর্শন ও জ্ঞানবত্তাকে টেনে নিয়েছিলেন বাস্তব পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের কার্যক্রমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে অস্ট্রোহাঙ্গেরিয় রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েতের ধরনের শ্রমজীবী রাজ স্থাপনের সঙ্গে লুকাচ নিজেকে জড়িয়েছিলেন। এই নিয়ে প্রায় শতাব্দীব্যাপী বিপ্লবের পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার অশান্ত যাত্রিক লুকাচ।

হাঙ্গেরির বিপ্লব তাঁকে তত্ত্ব ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা দিয়েছিল শুরুতেই। ১৯১৯ সালের ১৩৩ দিন স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শ্রমজীবী রাষ্ট্রে সংস্কৃতির দফতরের পরিচালকপদে বৃত হয়েছিলেন লুকাচ। একটা বিরাট বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে তিনি এই দায়িত্বে উপর থেকে আসেন নি। ইতিপূর্বেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নেমে পড়েছিলেন। ইঙ্গ-ফরাসি-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের দরুন যখন এরপর

সোভিয়েত হাঙ্গেরির পতন ঘটলো, তখনও বিপ্লবের নায়ক বেলাকুনের সঙ্গে তিনি ভিয়েনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপ্লবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে বেলাকুনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে লুকাচ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দক্ষিণপূর্ব ইওরোপিয় কার্যক্রম পরিচালিত করতেন। 'কমিউনিজমুস্' নাম নিয়ে তাঁরা জার্মান ভাষায় মুখপত্র বের করেছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি লেখেন এই কার্যক্রমেরই তাগিদে তাঁর বহু বিতর্কিত গ্রন্থ 'ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা'। ১৯৩০-৩১ সালে লুকাচ মস্কোতে মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। ১৯৩১-৩৩ সালে বার্লিনে যান জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যের কার্যক্রমে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি মস্কোর বিজ্ঞান একাডেমিতে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। বিশের দশকের পর থেকে লুকাচ বেশ কয়েকবার হঙ্গেরির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালে স্বদেশে ফিরেই তিনি সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির প্রতিষ্ঠার শরিক হন। তাঁর ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরি ১৯১৯ সালের গণবিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে তাঁকে 'অর্ডার অব রেড ব্যানার' দিয়ে সম্মানিত করেন, কারণ তিনি ছিলেন এই বিপ্লবের একজন সংগঠক।

কর্মে ও মননে এইভাবে অদম্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লুকাচের কাছে বিপ্লব তার বাস্তব কার্যকরী সংগ্রামী রূপ নিয়েই চিরজাগরূক থেকেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বেও বাস্তবজীবন তাঁর কাছে মৌল উপকরণ থেকেছে বরাবরই।

স্বদেশেই হোক অথবা নির্বাসনে হোক সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে কাজ করার জন্যে বিপ্লব তাঁকে যে অগাধ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা ও সংযোগ জুগিয়েছে, লুকাচ তাদের অপচয় বা অপব্যবহার করেননি। এদিক দিয়ে লুকাচ দীর্ঘজীবী পিকাসোর মতো খাটিয়ে মানুষ। শ্রমজীবীরা যে শোষণমুক্ত বিশ্ব গড়বার জন্যে ব্যাপৃত, একজন শ্রমজীবীর মতোই সৌন্দর্যের দিকটাকে লুকাচ পরিস্ফুট করে গেছেন তাতে।

তাঁর দুরূহ কাজও এইজন্যে বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমজীবীদের যৌথ সম্পদ। এবং এইজন্যেই স্বাভাবিকভাবে সহজ। দেশদেশান্তরের মানুষ অবশ্যই নিজ নিজ মাতৃভাষায় লুকাচের বইগুলিকে অনুবাদ করে নিয়ে এ সম্পদকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবেন।

হাঙ্গেরির লুকাচ আমাদের রাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে তুলনীয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে একেবারে নিচতলার খেটেখাওয়া মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন বৌদ্ধ দর্শনের আচার্য রাহুল। এর ফলশ্রুতি, দার্শনিক হয়েছেন খেটেখাওয়া মানুষের বিপ্লবের রূপদর্শী। তার বইগুলিতে দর্শন ও রূপের পিপাসা রসায়িত হয়েছে মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্বে, যা তাঁর উপন্যাসের মতোই রমণীয়।

লুকাচের কাজের চরিত্র ও মেজাজের একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে বের্টোল্ট ব্রেখট ও কবিতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে।

পঞ্চাশের দশকে 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য' গ্রন্থে লুকাচ লিখেছেন, "কবিতাকে যদি সফল হতে হয়, তবে সে কখনও অনিরুদ্ধ মনোময়তাকে খুটে খুটে খেয়ে খেয়ে তা করতে পারে না। এর উদ্ভবটাই হচ্ছে জীবন থেকে। বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার ব্যাপারে এর বিশেষ ধরনকে সেই একই শিল্পরূপগত বিধিবিধানগুলি নিয়ন্ত্রিত করে, যেগুলি উপন্যাস ও নাটকের নিয়ন্ত্রক। যেখানেই এই কাঠামোর অভাব ঘটে, সেখানে কবিদের স্বপ্ন জীবনের খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া অনুভবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। জার্মান অতিব্যক্তিবাদে এটা দৃষ্টান্ত হিসেবে লক্ষণীয়। এর বিপরীতটা ঘটেছে তরুণ ব্রেখটের ঘৃণায় উদ্দীপিত মহিমান্বিত 'মৃত সৈনিকের কাব্য' কবিতায়। এই কবিতাটি পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতার শুদ্ধ সম্পর্ক থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছে।"

রেখে ঢেকে মুখরক্ষা করে বক্তব্য বলা লুকাচের ধাতে ছিল না। নিজেকেও তিনি রেহাই দেন নি। এমনকি ব্রেখটকেও নয়। বাস্তব জীবন থেকে সরে গেলে সত্য এবং সুন্দর দুইই উঠে যেতে বাধ্য, এই চিন্তাকে নিজের উপরেই প্রয়োগ করেছেন তিনি। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থের যে ভূমিকা লুকাচ ১৯৬২ সালে লিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, ১৯১৫ সালে তিনি কান্ট থেকে সবেমাত্র হেগেলে পৌঁছেছেন। তাঁর নিজের লেখা বইকেই তাই মার্কসপন্থী হিসেবে তিনি বলেছেন Strait Jacket (আড়ষ্ট জামা)।

জার্মেন ও ফরাসি এবং রুশ ধ্রুপদী ঔপন্যাসিক গ্যেটে, বালজাক, ফ্লবেয়ার এবং টলস্টয়ের উনিশ শতাব্দির কাজের বিশ্লেষণে তাঁর চিন্তা ও লেখার একটা বড় অংশ লিপ্ত হলেও লুকাচ ৮৫ বছর বয়সে বিশ শতকের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে মার্কসীয় সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের পুরোভাগে থাকতে পেরেছেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা এই যে, বিপ্লবী হাঙ্গেরির মাটিতে তাঁর পা ছিল। তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যাবে এই সত্যকে এবং পাওয়া যাবে তাঁর চিরসজীবতার অন্যান্য রহস্যকে।

বর্তমান নিবন্ধে তিনটি স্তবকে লুকাচের মূল অবদানকে উপস্থাপিত করছি চুম্বকাকারে।

২

শতাব্দির শুরুতে বস্তুতপক্ষে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সাম্রাজ্যিকতার সূত্রে জার্মান ভাষার প্রচলনের দরুন এবং হাঙ্গেরি অস্ট্রোহাঙ্গেরিয় রাজতন্ত্রের মূলকেন্দ্র বিদ্যাভিবাণী ভিয়েনার দখলে থাকার ফলে একদিকে জার্মান ভাষা বাধ্যতামূলকভাবেই চর্চা করতে হতো হাঙ্গেরিয়দের। তেমনি প্রজাতান্ত্রিক হাঙ্গেরি গঠনের জন্যে পেটোফি ও কোসুথের নেতৃত্ব ১৯৪৮ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হাঙ্গেরির কাব্যের এবং উনিশ শতক শেষ হওয়ার মুখে এন্দ্রোদির নেতৃত্বে হাঙ্গেরিয় মনন পুষ্পিত হয়েছিল মাতৃভাষায় নানা শিল্পরূপের মাধ্যমে। হাঙ্গেরিয় সাহিত্যের এই বৈচিত্র্য ও প্রসারের পূর্বে লুকাচ নিবন্ধ লিখতে শুরু করে ছিলেন ১৭ বছর বয়সেই। তাঁর প্রথম বই তিনি লিখেছিলেন হাঙ্গেরিয় ভাষায় নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে। এরপরে তিনি যত বড় বড় বই লেখার কাজ করেছেন তা বস্তুতপক্ষে একই সঙ্গে দুটো ভাষায় করেছেন। একজন হাঙ্গেরিয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী, কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবেই

জার্মান ভাষায় তিনি লিখেছেন: প্রথমত, ধ্রুপদী জার্মান দর্শন এবং কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের মূল বই নিয়ে কাজ করার সময়। দ্বিতীয়ত, জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে জার্মান সাথীদের বক্তব্যের সঙ্গে সংযোজনার উদ্দেশ্যে। তৃতীয়ত, পূর্ব-দক্ষিণ ইওরোপে প্রচলিত জার্মান ভাষায় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথীদের মার্কসীয় লেনিনীয় বক্তব্যের সূত্রে একত্রিত রাখতে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির যারা চরম শত্রু, তারা সাধারণত লুকাচকে জার্মান ভাষার লেখক হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করে এসেছে তাঁকে বিপ্লবী হাঙ্গেরি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা তূরীয় অবস্থান দিয়ে তাঁরা বিপ্লবী হাঙ্গেরি সংযোগ ও কর্মকাণ্ডকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে। লুকাচকে একজন নিছক ধ্রুপদী জ্ঞানী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির বাইরে স্থাপন করে তাঁর জীবনব্যাপী কাজের মধ্যে থেকে তথাকথিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে নিংড়ে বার করে নিয়ে বুর্জোয়া বিমূর্ততার শরিক করতে চেয়েছে পুঁজিবাদের স্তাবকেরা। মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রী হাঙ্গেরির শত্রুরা খুশিমতো ব্যাখ্যা ও সম্পাদনায় মুড়ে লুকাচের কয়েকটি বইও প্রকাশ করেছে একই উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরি থেকে লুকাচকে ছিঁড়ে আলাদা করা অসম্ভব।

লুকাচ হাঙ্গেরির শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টিবর ডেরির (Tibor dery) ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পের উপর একটি নিবন্ধ লিখে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি কাগজে পাঠিয়ে ছিলেন। এই নিবন্ধটিতে টিবর ডেরিকে লুকাচ একজন মহৎ সত্যার্থী লেখক হিসেবে উপস্থিত করেছেন, যিনি হাঙ্গেরির প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব এবং গণপঞ্চায়েতী রাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরে ফ্যাসিবাদী আমলে প্রতিরোধের পতাকা বহন করেছিলেন। এই একান্তভাবে হাঙ্গেরির মুক্তিসংগ্রামের লেখককে লুকাচ গর্বের সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং মানুষের শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। লুকাচের এই নিবন্ধটিতে হাঙ্গেরির ফ্যাসিবাদী আমলের দুঃসহ দিনগুলি এবং সেই সময়ে হাঙ্গেরির মাটিতে পা রেখে একজন সমসাথী লেখকের উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখার সাধনা সামনে এসেছে লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মূলমর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই। এই মূলমর্ম হচ্ছে বুর্জোয়া অবক্ষয় ও একাকী মানুষের বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মানুষের সঙ্গে ছন্দিত ব্যক্তি মানব-মানবীর মানবীয় সারসত্তাগত উদ্বোধন ও উজ্জীবন এবং বৈপ্লবিক সক্রিয়তা। বিমূর্ত স্বপ্নের অবকাশ না রেখে বাস্তবভিত্তিক স্বপ্নচারিতা।

১৯৭৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে টিবর ডেরির মৃত্যু হয়েছে। টিবর ডেরি ছিলেন লুকাচের প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু। মেজাজের দিক থেকে দুজনেই বেশি রকম স্বাধীনচেতা। জন্মদিনের অভিনন্দনের তাই কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লুকাচ টিবর ডেরি সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন আগেও। পঞ্চাশের দশকে 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য' গ্রন্থে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার শ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ শিল্পীদের নাম করতে গিয়ে লুকাচ তাঁদের মধ্যে হাঙ্গেরির চিবর ডেবির নাম করেছিলেন।

হাঙ্গেরির মাটিতে লুকাচ যে শক্ত করে পা রেখেছিলেন এবং হাঙ্গেরির বিপ্লব নিয়ে তিনি আজীবন ভেবেছেন, তার আরেকটি দৃষ্টান্ত ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েতের ধাঁচে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর।

১৯৬৯ সাল লুকাচকে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ "কমরেড় লুকাচ, আপনি হাঙ্গেরিয় গণপঞ্চায়েতী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সময় একজন জনগণের কমিশনার ছিলেন। সেই সুবাদে আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, এই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক নীতির স্থায়ী মূল্য আপনার বিবেচনায় কি কি?"

লুকাচ জবাবে বলেছিলেন, "আমি এ তর্ক করব না যে, গণপঞ্চায়েতী প্রজাতন্ত্র সংস্কৃতির ব্যাপারে সত্যিকার সঙ্গতিপূর্ণ মার্কসীয় নির্দেশনার জন্যে সঠিক তত্ত্ব ও সঠিক প্রয়োগের অধিকারী ছিল। আমি ইতিপূর্বে উপক্রমণিকাতে বলেছি যে, আমাদের তাত্ত্বিক স্তর সত্যিই খুব নীচু ছিল। তবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে ছিল একটা গণতান্ত্রিক প্রবণতা। এই সময়কার হাঙ্গেরির সংস্কৃতিতে প্রগতিবাদী ধারাগুলির উপর এই প্রবণতা আস্থা স্থাপন করেছিল। এই প্রবণতা মর্মে মর্মে সমাজতন্ত্রী ছিল। আমার দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে সেই মূল্য যাকে আমাদের সম্মান করা এবং অব্যাহত রাখা উচিত।"

লুকাচের এই জবাবের মধ্যে ৬৯ সালে হাঙ্গেরির বিপ্লবের অব্যাহত ধারাকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চিন্তার সূত্রে গেঁথে। মাতৃভূমি হাঙ্গেরি হচ্ছে লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র এখানেও।

১৯৬৭ সালে সহ-অবস্থান সম্পর্কে তাঁর স্বদেশবাসীদেরই কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে লুকাচ হাঙ্গেরির কর্তব্যের আঁচ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহ-অবস্থান একটা শ্রেণীসংগ্রাম, তবে এর রূপ হচ্ছে ভিন্ন। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষ যাতে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করে সে জন্যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির শ্রমিক ও কৃষকদের উৎসর্গিত কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে অর্থপূর্ণ জীবন ফলিয়ে তুলতে হবে। শুধু মাত্র এভাবেই কানাগলিতে আবদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবীদের মুক্তির পথ দেখাতে পারি। আমাদের কাছে তারা এইটেই চাইছে। আমি মনে করি, এই ব্যাপারটা শিল্পকলা ও দর্শনের যাবতীয় প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারটা সামনে আসবে। পরশুদিন না হলেও, আগামী পাঁচ বছর কিংবা দশ বছর পরে আসবে।

আমাদের সেই মুহূর্তের জন্যে তৈরি হতে হবে যখন একেবারে বদলে যাওয়া পৃথিবীতে একেবার পরিবর্তিত অবস্থাতে আমরা কার্যকরীভাবে মার্কসবাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারব। মার্কসবাদ হচ্ছে একমাত্র তত্ত্ব যা সামাজিক স্ববিরোধিতা থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় জানে।

উপরোক্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে যে, সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরি লুকাচকে তার সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সংস্কৃতি এবং মননের সংরক্ষক বলে চিহ্নিত করেছে, দিয়েছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। তাঁর সমস্ত মতামত অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্রী হাঙ্গেরির মুখপত্রগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাধীনচেতা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক লুকাচের বক্তব্যে বিতর্কমূলক বহু কৌণিকতা থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরির মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্ব এই বক্তব্যকে শুধু যে নিজদেশে প্রচার করছেন তা নয় বাইরেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি দৃষ্টান্ত হল এই যে, ১৯৭৭ সালে হাঙ্গেরির গণতান্ত্রিক মহাজাগরণের অন্যতম পথিকৃত কবি এন্দ্রে অদির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির সরকার, পার্টি এবং লেখক-লেখিকা সংঘ লুকাচের ১৯৬৭ সালের লেখা প্রচার করেছেন। এতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে:

১. "এলুয়ার ও মায়াকভস্কির মতো অদি বিশ্বকবি হতে পারেন না। কারণ তিনি একান্ত হাঙ্গেরিয় প্রসঙ্গ ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাছাড়াও হাঙ্গেরি একটি ক্ষুদ্র জাতি। তার কি সারা বিশ্বকে জোগাবার মতো সম্ভার থাকতে পারে? উপরন্তু কবিতা জিনিসটারই অনুবাদ হয় না। সুতরাং ভাষান্তরে কী পাওয়া যাবে অদির কবিতাতে?"

২. "যে বিরাট সংকট ইউরোপকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেতর টেনে নামিয়েছিল, তা বহুবিধ পাতালচারী স্রোতের খাত বেয়ে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল কমবেশি সচেতনতা নিয়ে প্রায় সমগ্র বিশ্বের সমগ্র সাহিত্যে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, আদি ব্যাপারটাতে সাড়া দিয়েছিলেন সকলের আগে এবং এই সাড়া ছিল সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাকে এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে কণ্ঠস্বর দিয়েছিলেন অদি সবার উপরে। এ কারণেই অদি বর্তমান যুগের মহৎ গীতিকবি, মানবীয় এবং কাব্যিক উভয় দিক দিয়েই। আমার অভিমত এভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি জাত্যাভিমানী বলে চিহ্নিত হবার ভয়ে ভীত নই।"

৩. "এটিলা জোসেফ তাঁর একটি কবিতা লিখেছেন অদির উদ্দেশ্যে, জয়গান করেছেন অদির বিপ্লবী সত্তার।"

এখানে আন্তর্জাতিকতাবাদী লুকাচের মেজাজ, শৈলী এবং সৌন্দর্যের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে হাঙ্গেরির বিপ্লবের সঙ্গে সূক্ষ্মমত তন্তুতে গ্রথিত হয়ে।

৩

লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের দ্বিতীয় কাজ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের পর থেকে এর অবক্ষয় ও পতন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুত্থানের পরের বছরগুলিতে উপন্যাসের গতিপরিণতির নিরীক্ষা।

প্রধানত তিনটি গ্রন্থ থেকে এই নিরীক্ষার পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা বেরিয়ে আসে। এই গ্রন্থ তিনটি হচ্ছে: উপন্যাসের তত্ত্ব, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। দ্বিতীয়টি ১৯৩৭ সালে এবং তৃতীয়টি ১৯৫৭ সালে।

'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য পাওয়া যাবে:

১. উপন্যাসে বিচারে বিশ্বজিজ্ঞাসা ও মানবজীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আঠারো ও উনিশ শতকের ধ্রুপদী দার্শনিক সূত্রের প্রয়োগ।

২. একালের মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাসের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা।

৩. গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক এবং দান্তে ও শেকসপীয়রের কাজের পরে উপন্যাস কিভাবে ও কেন অগ্রসর হতে পেরেছে একটা স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে।

৪. উপন্যাস ঐতিহাসিক ভাঙ্গা গড়া ভাঙ্গার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

৫. উপন্যাস দেবতার রোষ ও করুণার ঘের থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা মানবমানবীর সার্বভৌমত্ব এবং তার বিপন্নতা ও আনন্দবোধ (দুইই)।

৬. উপন্যাসের প্রথম শিল্পী সার্ভেন্টিস এবং শেষ শিল্পী টলস্টয়। মাঝখানে বালজাক ও গ্যেটে।

৭. উনিশ শতকের ফ্লবেয়ারের L'education sentimental উপন্যাসের তত্ত্বে ও কৃতিত্বে পরশপাথর। বিশেষ করে 'সময়' নামক উপাদানের গুরুত্ব।

৮. আসন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস ও মৃত্যুর অভিমুখে মানব-সমাজ। সুতরাং নৈরাশ্যের যবনিকা।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রয়েছে :

১. উনিশ শতকের শুরুতে নেপোলিয়নের পতনের সময় ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব।

১৮১৫ সালে ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভারলি' উপন্যাসের প্রকাশ।

ঐতিহাসিক সাহিত্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের পার্থক্য।

ছদ্ম-ঐতিহাসিক কল্পকথা ও রোমান্টিক বা কল্পনাবিলাসী উপন্যাসকে সরিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের নায়ক রাজরাজড়া নয়, অন্যান্যেরা। এই নতুন উপন্যাসের জন্ম ফরাসি বিপ্লবে।

২. উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অবক্ষয়ের সূচনা। বিশ শতকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৩. ফ্যাসিবাদবিরোধী পিপল্স্ ফ্রন্টের বিপ্লবী ঐতিহাসিক উপন্যাসও সমাজতান্ত্রিক উপন্যাসের সমান গুরুত্বের অধিকারী।

দৃষ্টান্ত : জার্মেন ঔপন্যাসিক হাইনরিখ মান (১৮৭১-১৯৫০), লিয়ন ফয়েকত্ভাঙ্গের (১৮৮৪-১৯৫৮)।

৪. রোমাঁ রলাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কোলা দ্য ব্রিউর্গঁ'; বেলজিয়ামের ডিকস্টারের উপন্যাস 'অয়েলেনস্পিগেল'; ইতালির এলসান্দ্রো মানঝনির (১৭৮৪-১৮৭৩) একটি মাত্র উপন্যাস 'বাগদত্তা'। এবং লিও টলস্টয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্যেটে।

৫. ফরাসি বিপ্লব যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছিল, তেমনি বিশ শতকের উপন্যাসের উদ্দীপনার উৎস হচ্ছে একটা নতুন গণতন্ত্রের ঊষা।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাশে রয়েছে 'বিপ্লবী গণতন্ত্র'। স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্যে এই বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রকাশ।

৬. চীন, ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি সংগ্রাম মানব সমাজের মুক্তির ঐতিহাসিক মহাস্রোতে এসে মিশছে প্রাচ্যের মায়াবাদী কুহককে কাটিয়ে। সাহিত্যে এর প্রতিফলন কাম্য এবং সেটা ঘটছে প্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের মধ্য দিয়ে।

৭. উপন্যাসের শিল্পরূপের কাঠামো সম্পর্কে বক্তব্য 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থের অনুরূপ। অর্থাৎ মহাকাব্য ও নাটক এবং উপন্যাসের পার্থক্য এবং ঐক্য একটা দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়ার বিকাশ।

৮. টমাস মান ও গোর্কি।

আমাদের দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য।'

এই গ্রন্থে তিনটি নিবন্ধ রয়েছে:

১. আধুনিকতাবাদের মতাদর্শ জেমস জয়েস ও টমাস মান।

২. ফ্রান্‌জ্ কাফকা অথবা টমাস মান।

৩. বিচারক বাস্তবতাবাদ ও সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদ।

এই গ্রন্থে লুকাচের মূল তাগিদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদ ও বিচারক বাস্তবতাবাদের সহযোগিতা এবং আধুনিকতাবাদের অবক্ষয়িতাকে পরিহার করা।

উপরোক্ত মূল তাগিদের সঙ্গে সঙ্গেই লুকাচ সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাকে কল্পনা বিলাস থেকে এবং বিশেষ করে যে কোন ধরনের বৃহৎ ব্যক্তির মোহ থেকে মুক্ত করার জন্যে ডাক দিয়েছেন।

লুকাচ প্রুস্ত, আন্দ্রে জিদ এবং জয়েসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাফকাকেও। অবশ্য এদের প্রত্যেকের শৈলীকে জানিয়েছেন শ্রদ্ধা। লুকাচের একটা বৈশিষ্ট্য এই সব শিল্পীর গুণগুলিকে উড়িয়ে না দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে বলেন যে, প্রুস্ত কিংবা আন্দ্রে জিদ এবং জয়েস কিংবা কাফকার অবক্ষয়ী ভক্তেরা হাজার চেষ্টা করেও এইসব শিল্পীর গুণ-গানে লুকাচকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

লুকাচ 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য'তে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবাদী অবক্ষয়ী সূত্রগুলিকে তীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

এই গ্রন্থেই টমাস মানকে উপস্থাপিত করা হয়েছে বিচারক বাস্তবতাবাদের প্রতিভূ হিসেবে। টমাস মানকে লুকাচ সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদের সহযোগী করেছেন বিশ শতকে। যে বাস্তবতাবাদের গুণগত উত্তরণের দুটি স্তরকে ইতিপূর্বে 'উপন্যাসের তত্ত্ব' এবং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে দেখতে পাওয়া গেছে, তাদের সম্মিলক ছিলেন জার্মেন কবি ও ঔপন্যাসিক গ্যেটে। 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদ' গ্রন্থে টমাস মান হচ্ছেন সম্মিলক।

লুকাচ অবশ্য খুব সুস্পষ্ট করেই বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদই স্থায়ী। বিচারক বাস্তবতাবাদ অস্থায়ী। অস্থায়ী হলেও অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের ঐতিহাসিক স্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন। বুর্জোয়াদের যে অংশ পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের দরুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প অগ্রসর সমাজব্যবস্থার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, তাদের হাত নিজেদের হাতে তুলে নেবে শ্রমিকশ্রেণী। বিচারক বাস্তবতাবাদ বা ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ও বিদ্রোহী বুর্জোয়াদের অবদান।

লুকাচের উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থের রচনাকাল ও রচনার পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এদের ঐক্যকে চেষ্টা করে খুঁজতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু পাঁচশ বছরের উপন্যাসের মূল উপাদানগুলির কোথায় উত্তরণ ঘটেছে সেটা দেখাবার জন্যে লুকাচ সহজ পদ্ধতি নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উপন্যাসের তত্ত্ব গ্রন্থে টলস্টয়ের নিরীক্ষা দিয়ে শেষ করেছেন। যেসব উপকরণ ও গুণের জন্যে উপন্যাস মহাকাব্য ও ধ্রুপদী নাটক থেকে পৃথক, সেগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার টলস্টয়। লুকাচ এই টলস্টয়কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের মূলাধারে স্থাপন করেছেন রোমাঁ রলাঁকে এবং গোর্কিকে তাঁর পাশাপাশি রেখে। এনেছেন টমাস মানকেও। 'সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য' গ্রন্থে টমাস মানকে রলাঁ ও গোর্কির সঙ্গে এনেছেন মনুষ্যত্বের শতদলের শত শত বছর ধরে দুটি একটি করে পাপড়ি খোলার প্রক্রিয়ার ঘোষক হিসেবে।

মনুষ্যত্বের সারসত্তাকে মানবসমাজের দীর্ঘ যাত্রাপথে শিল্পরূপের আধারে স্থাপন করে যুগের পর যুগোত্তীর্ণ করে এসেছেন যে মহান কথাশিল্পীরা, লুকাচ তাঁদের মূল কাজটিকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, যেমনি তাঁদের শৈলী ও সাধনাকে সামনে এনেছেন।

লুকাচ এই দীর্ঘকালের বিশাল মানবযাত্রার পর্যায়ে পর্যায়ে উন্নত থেকে উন্নততর হওয়া অব্যাহত ধারাকে সামগ্রিক ভাবে দেখাতে গিয়ে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী পূর্বসূরীদের সহযোগী রাখতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার স্তরেও। এই জন্যে তাঁকে ভুল বুঝবার একটা অবকাশ হয়তো রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মহলে।

লুকাচ যে এই সঙ্গেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনিবার্য প্রাধান্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বারংবার এবং তিনি যে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন তাঁর প্রথম লেখা বই থেকেই, এই সত্যকে সামনে রাখলে উপরোক্ত ভুল বুঝাবুঝি দূর করা যাবে।

মার্কসবাদী সৌন্দর্যতত্ত্বের একটা মৌল বক্তব্য উপন্যাস সম্পর্কিত লুকাচের গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই মৌল বক্তব্য হচ্ছে, খণ্ড খণ্ড করে সৌন্দর্য বিচার নয়, সামগ্রিক গতিধারা ও মূল গতিমুখই বিচার্য হওয়া উচিত।

এই সামগ্রিকতার দরুন মাঝে মাঝে অপাত্রে মালা দেওয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা ও বিড়ম্বনার সমাধান করে দেয় এই পাত্ররাই। তারা নিজেরাই ঠিকরে বেরিয়ে যায়। তারা প্রমাণ করে দেয় তারা মেকি। সলঝেনিৎসিনের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। লুকাচ সলঝেনিৎসিনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের একজন নুতন কারিগর হিসেবে। এটা ছিল গতানুগতিকতা ভাঙ্গার জন্যে লুকাচের তাগিদের অভিব্যক্তি। সলঝেনিৎসিন নিজেই সমাজতন্ত্রের বিশাল প্রবাহের বাইরে নিজেকে নিয়ে প্রস্থান করায় এবং নিজের প্রকৃত চেহারাটা প্রকাশ করায় লুকাচের দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

লুকাচের কাছ থেকে আমরা এই নিশানা পেয়েছি যে, সামগ্রিক ধারাকে নিয়ে অগ্রসর হলে শিল্পরূপের ক্ষেত্রে যত লোক বাইরে যাবে তার চেয়ে ভিতরে আসবে অনেক বেশি।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে শ্রেণীসংগ্রামের বিন্যাস ও গতিমুখ নির্ধারণে লুকাচ বরাবরই কঠোর পন্থী। এক সময়ে তিনি উগ্র বামপন্থী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এমনকি লেনিনও তাঁকে এই জন্যে তিরস্কার করেছিলেন। এই ঝাঁজটা তাঁর বহু লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সহযাত্রীদের কাউকে পাশ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার তিনি বিরোধী। বিভিন্ন ও বিচিত্র মেজাজের সহযাত্রী চান তিনি। শিল্পরূপ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে এই স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ তাঁর কাছে অপরিহার্য।

স্টালিন সম্পর্কে যেসব বক্তব্য তাঁর 'তরুণ হেগেল' থেকে শুরু করে 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য' গ্রন্থে দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে এসেছে, সেগুলি একত্র করলে সেখানে লুকাচের সহযাত্রীদের প্রতি মনোভাবটি পরিষ্কার বেরিয়ে আসে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, লুকাচ এক সময়ে স্টালিনপন্থী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্টালিনকে ঘিরে ব্যক্তিস্তুতি যেহেতু বিশেষ করে সোভিয়েত সাহিত্যে একটা গতানুগতিকতা ও আত্মতুষ্টি এনেছিল, সেজন্যে শেষ পর্যন্ত স্টালিনের বিরোধিতা করেন তিনি। 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য' গ্রন্থে এই বিরোধিতা প্রকট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থেই লুকাচ বলেছেন, স্টালিনকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি এই বিরোধিতা করছেন না। স্টালিনের যে মর্যাদা প্রাপ্য, তাকে নির্দিষ্ট করার জন্যেই এই বিরোধিতা।

বিপ্লবটাই মূল বিবেচ্য। মার্কস ও লেনিন যেভাবে বিপ্লবের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটাকে তিনি কম্পাসের কাঁটার মতো সামনে রেখেছেন।

৪

হেগেল, গ্যেটে, বালজাক এবং দান্তেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদেও ধরে রাখতে চেয়েছেন বলে লুকাচের বাইরের পরিচয়টা অনেকটা এরকম যে, তিনি প্রধানত হেগেল ও গ্যেটের সৌন্দর্যতত্ত্বেরই ধারক।

লুকাচ তাঁর এই অনুরাগকে কখনও লুকোন নি। বরং ফলাও করে বলেছেন। হেগেল ফরাসি বিপ্লবকে ছেড়ে যখন জার্মান রাজতন্ত্রের প্রবক্তা হলেন, তখন হেগেল ম্লান হয়ে গেলেন তাঁর কাছে। কিন্তু হেগেলের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বাত্মকতা লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মস্ত বড় উপাদান হয়েছে। ইতিহাস হেগেলকে ফেলে দেবে কি করে?

প্রকৃতপক্ষে কার্ল মার্কস তো হেগেলকে ফেলে দেন নি। বিশেষ করে সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

লুকাচ মার্কসবাদী বলেই হেগেলবাদী। বিশেষ করে মার্কসের 'ইকনমিক এণ্ড ফিলসফিক ম্যানাসক্রিপ্টস' গ্রন্থ লুকাচের কাছে গণবিপ্লবী সৌন্দর্যতত্ত্বের কমিউনিস্টি মেনিফেস্টো। মার্কসের ২৬ বছর বয়সের এই লেখায় হেগেলের বেশ কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহৃত। লুকাচের ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে,

মার্কসপন্থী হিসেবে তিনি হেগেলের পরিভাষা ব্যবহারের ছাড়পত্র অবাধভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

লুকাচ যে নীতিনিষ্ঠ মার্কসপন্থী, তার একটা প্রমাণ কার্ল মার্কসের উপরোক্ত 'ম্যানাসক্রিপ্টস' থেকে মানবনীতির সূত্র তুলে নিয়ে লুকাচ তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব' গ্রন্থের মর্মভূমি রচনা করেছেন।

১৯৭৩ সালে পোল্যাণ্ডের অধ্যাপিকা মারিয়া জানিয়ান লুকাচের ওপর যে প্রশস্তি লেখেন তাতে তিনি ভাবলৌকিকতাবাদের প্রতি লুকাচের বাস্তবতাবাদী বিরাগকে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপিকা জানিয়ান বলেছেন, "যে শিল্পকলা নিজের জগৎ নিজেই তৈরি করে, লুকাচের কাছে তার পরিচয় হচ্ছে এই যে তা 'এনথ্রপমরফিক' বা নরত্বের আরোপমূলক। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব' গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে নরত্বের আরোপ তত্ত্বের বক্তব্যকে প্রসারিত করে লুকাচ একটা বড় রকমের কাজ করেছেন। বহু বছর আগে মার্কস এইসব সমস্যার দিকে আঙ্গুলি সংকেত করলেও লুকাচের মতো এত বিস্তারিতভাবে কেউ এর নিরীক্ষা করেননি। লুকাচ এইসব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।" মনুষ্যত্বের সারসত্তাকে অগণিত মানবমানবীর বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের যাত্রাপথের পাথেয় হিসেবে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে লুকাচ নরনারী বা মানবমানবী নির্বিশেষে মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশের মার্কসীয় নির্দেশনাকে নির্দেশক করেছেন।

লুকাচ যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্যক্তিমানবমানবীর বিকাশে সমবেত স্ফূর্তি ও সম্মতির জন্যে তাগিদ দিয়েছেন, সেটা তিনি করেছেন মার্কসবাদী হিসেবে।

লুকাচ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের একজন পুরোগামীর ভূমিকা পালন করে এসেছেন বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশের দশকে সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য লিখতে গিয়ে তিনি এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তা নয়।

বস্তুতপক্ষে তিরিশের দশকে গোর্কির সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই লুকাচ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং তা মস্কো থেকে প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটেনের নাট্যপ্রযোজক জোসেফ ম্যাকলিওড তাঁর 'নতুন সোভিয়েত থিয়েটার' গ্রন্থে ১৯৪৩ সালে লুকাচের এই সূত্রটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন গোর্কির বক্তব্যের পাশাপাশি।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লুকাচ বলেছিলেন, 'বাস্তবতার অবিকল নকলনবিশী এবং মনোময়তা দুইই বস্তুগত ঐতিহাসিক বিকাশের বিরোধিতা করে।'

লুকাচ পঞ্চাশের দশকে একই কথা বলেছেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হচ্ছে নয়া ইতিহাস সৃষ্টির এবং মুক্ত মানবমানবীর স্বচ্ছন্দ সামাজিক বিন্যাসের যাদুদণ্ড।

শলোকভ : ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শতাব্দীর কমিউনিস্ট রূপকার

বিশ্ববিশ্রুত সোভিয়েত ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোকভের প্রায় গোটা শতাব্দিব্যাপী জীবন ও তাঁর অমর সাধনা ও সৃষ্টির মূল্যায়নের লক্ষ্যে আমরা এখানে বিশেষ করে তাঁর দুটি উপন্যাস, শিল্প-রূপচিন্তা ও ব্যক্তিত্ব এবং পরিবেশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিবেদন করছি।

১

প্রথমেই যদি আমরা ব্যক্তিটির এবং তাঁর পরিবেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো তিনি ব্যক্তি হিসাবেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। অবশ্য এই ইতিহাস গণ-ইতিহাস এবং এর নারী ও পুরুষেরা সাধারণ লোক হিসেবেই ঐতিহাসিক কীর্তির অধিকারী। অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন ঘটলো, তখন শলোকভের বয়স মাত্র বারো। রুশভাষী কসাকভূমির সন্তান। ডন নদীর দুই তীর বরাবর বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকা জুড়ে কসাক কৃষিজীবীদের বসতি। এই গ্রামীণ জীবনের শিকড় সমেত কৈশোরেই শলোকভ বেছে নিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষকে। বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত এলাকায় থাকার দরুন এবং স্বভাবসিদ্ধ ঘোড়সওয়ার হিসেবে কসাক পুরুষেরা জারের আমলের সেনাবাহিনীর সৈনিক নিয়োজিত হবার দরুন গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রায়স থেকে দূরে অবস্থান করতো। যদিও পুগাচেভের মতো কসাকের নেতৃত্বে কসাক ও অন্যান্য রুশ চাষীরা বারবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, তবু কসাক সমাজের অচলায়তনকে ভাঙ্গতে পারেনি। অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই প্রথম এই অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন ফেরত কসাক সৈনিক বেশি কৃষকদের একটা অংশ বিপ্লবে ও গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে যোগ দেয়। শলোকভ এদের একজন সৈনিক হিসেবে লড়েছিলেন এবং গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্র জয়ী হবার পরে কসাকভূমিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সব কিছুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ২০ বছর বয়সে শলোকভ কয়েকটি ছোটগল্প লিখে যশস্বী হয়ে ওঠেন। এর পরেই তাঁর ২৩ বছর বয়সে লেখা 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সালের ঘটনাবলিতে জড়িত প্রধানত কসাকদের দিয়ে যে কাহিনী তিনি লেখেন, তাঁর প্রাণবন্ত চিত্রাবলি শলোকভের কল্পনা শক্তির সূক্ষ্মতা ও বিপুলতার পরিচয়ই মুখ্যত বহন করে। কারণ, এই সময়ে তিনি নিতান্তই বালক এবং কসাকভূমিকে চোখে দেখলেও ইউরোপের রণাঙ্গন দেখেননি। কিন্তু এই কল্পনারও সহায়ক ছিল তাঁর পরবর্তীকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতারই কল্পনা মিশ্রিত প্রক্ষেপণ ঘটিয়েছিলেন তিনি প্রথম খণ্ডে। 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের পরবর্তী তিন খণ্ডে অবশ্য এই ভাবে প্রক্ষেপণ ঘটাতে হয়নি। তবে কল্পনা ছাড়া উপন্যাস হয় না। সুতরাং কল্পনাকে আরও শক্তি প্রত্যয়ের উপর দাঁড় করিয়েছেন তিনি পরবর্তী তিনটি খণ্ডে। ১৯১৭-২২ এর ঘটনা লেখবার সময়ে তিনি

কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি এই বয়সেই বিপ্লবের টানা পোড়েনে এবং গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কসাকভূমির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে শরিক হয়েছেন। কসাকভূমিকে ছাড়েননি, লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর বৈপ্লবিক অবস্থানকে প্রচণ্ড মূল্য দিলেও তিনি ডন নদীর কোলঘেঁষা তাঁর গ্রাম ভিশেন্স্কায়াকে ছেড়ে কোথাও যাননি। দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের পুরোপুরিটাই এই ভিশেন্সকয়াকে বারংবার ছুঁয়ে রয়েছে। একটা সমস্যা ছিল কোন ঘটনাকে সরিয়ে রেখে কোন ঘটনা নিয়ে লিখবেন।

১৯৩০ সালে যখন সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বেচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতেই যৌথ কৃষি খামারের প্রবর্তন ঘটলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায়, তখন শলোকভ তাঁর নিজ গ্রামে ও গ্রামাঞ্চলে যৌথ খামারের একজন সংগঠক। তখনও 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড লেখা হয়নি। শলোকভ লেখা শুরু করলেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল'। যৌথ কৃষি খামার গড়ার কাহিনী। এখানে কসাকভূমিতে শ্রেণী সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায়টির কথা লেখা হলো। নিজস্ব জমি, গাভী ও বলদের গোয়াল, ঘোড়ার আশ্রয় এবং ফসলের ভাঁড়ার ও হাঁস-মুগী-ছাগল পালনের জন্য কৃষিজীবী নরনারীর যে ক্ষুধাকে মেটাবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়াত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভূমি বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত কৃষিকে যৌথ কৃষি প্রচেষ্টায় উত্তীর্ণ করার ব্যবস্থা করলো, তার টানা-পোড়েনের পরিপূর্ণ দ্বন্দ্বাত্মক মানবীয় রূপটি শলোকভের উপন্যাসে ফুটে উঠলো। এই উপন্যাসে লেনিনগ্রাদ থেকে আগত শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক ও সংগঠক দেভিদভকে দিয়ে শলোকভ পোড়ো জমিতে চার বলদচালিত লাঙ্গলের চাষ করিয়ে ছাড়লেন। জমিতে লাঙ্গল দেয়া, বীজবোনা, ক্ষেত নিড়ানো এবং ফসল কাটার ব্যাপারগুলো ছিল শলোকভের ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার আয়ত্তাধীন। ১৯৩২ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

এর পরেই তিনি নানা কাজের মধ্যে 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড রচনায় মন দিলেন। ১৯৩৪ সালে গোর্কির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে সোভিয়েত লেখক-লেখিকারা সর্বসম্মতভাবে তাঁদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর একটা বিশেষ দিক কলকারখানা, খনি ও খেতখামারে কর্মীদের নিয়ে গঠিত যে বিপুল পাঠক-পাঠিকা সমাজ শিল্পকলা ও সাহিত্যের ব্যাপারে বেশি বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন, তাদের সঙ্গে লেখক-লেখিকাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন। শলোকভ এ ব্যাপারে আগে থেকেই সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন। সোভিয়েত লেখক-লেখিকা সংঘের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। বিভিন্ন কলকারখানা ও কৃষি খামারের স্থানীয় পাঠচক্রে তিনি তাঁর লেখা পড়ে মতামত নিতেন। প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখকলেখিকাদের বইয়ের উপর আলোচনা করার জন্যও তাঁর ডাক পড়তো দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। যেমন একজন সত্যসন্ধ লেখক হিসেবে, তেমনি কমিউনিস্ট হিসেবেও, এই ডাকে সাড়া দেওয়াটা তাঁর কাছে ছিল অপরিহার্য কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে, তিনি

আমরণ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর মধ্যে কমিউনিস্ট ও লেখক একীভূত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সাহিত্যের উপাদান সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করতে গিয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে এই একীকরণ গভীর স্বচ্ছন্দ প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। এই স্বাচ্ছন্দ্য যে জোরালো ছিল, তা বুঝতে পারা যায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের চুতর্থ খণ্ড আদ্যোপান্ত পড়লে। জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তাঁর কাছে ডন নদীর জলধারার মতো, যাতে তিনি নৌকা বাইতে ভালবাসতেন এবং অবাধে সাঁতরাতেন। এই স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ তাঁর সমস্ত উপন্যাসেই ঘটেছে। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে স্টালিনের নির্দেশ মানা নিয়ে যে দ্বন্দ্বাত্মক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, সেটা একজন কমিউনিস্ট হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয় ও স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছ্যন্দের দরুনই সম্ভব হয়েছে।

শলোকভ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড যখন সম্পূর্ণ করেছেন, তখন হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত রেখে শলোকভ মাতৃভূমিকে রক্ষায় যুদ্ধের সৈনিক লেখক হিসেবে রণাঙ্গনে চলে যান। এই রণাঙ্গনেরই তিনি শুরু করলেন তাঁর তৃতীয় উপন্যাসে 'এঁরা মাতৃভূমির মুক্তিযোদ্ধা।' এই সঙ্গেই তিনি লিখলেন, নাৎসী বাহিনীতে হাতে বন্দী সোভিয়েত সৈনিক ও গণবন্দীদের উপর নৃশংস নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা ও সেখানে অবস্থানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রোজনামচা। সেই রোজনামচা প্রতিদিন সোভিয়েত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রোজনামচা। সেই রোজনামচা প্রতিদিন সোভিয়েত জনগণের মনে দুর্বার দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা এবং নাৎসীদের বিরুদ্ধে নিদারুণ ও তীব্র ঘৃণার বাড়বনাল জ্বালাবার কাজে লাগলো। যুদ্ধের অবসানের পরে তিনি শেষ করলেন তাঁর তৃতীয় উপন্যাস এবং আরও পরে দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। যুদ্ধের সময় গ্রামের বাড়িতে নাৎসীদের বোমা পড়ায় দ্বিতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই বই তাঁকে নতুন করে লিখতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ডন নদীর তীরের নিজগ্রামে এবং এলাকা জুড়ে যুদ্ধের ধ্বংসকে অপসারিত করে পুনর্নির্মাণের যে কাজ শুরু হয়ে যায়, তাতে তিনি হাতে কলমে শরিক হয়েছেন। তাঁর গ্রামীণ এলাকা থেকেই তিনি নির্বাচিত হলেন সর্বোচ্চ সোভিয়েত প্রতিনিধিসভার সদস্য।

শলোকভ চরিত্রের বাইরের এবং অন্তরঙ্গ দিকের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁর নিজের গ্রামে স্বদেশের ও বিদেশের প্রখ্যাত ও অনামী অতিথিদের আদর আপ্যায়ন একান্ত গ্রামীণ সারল্য ও আন্তরিকতার মধ্যে সম্পন্ন করায়। ব্যক্তি ও পরিবেশের ব্যাপারে এখানে আর বিস্তারিত না এগিয়ে সোভিয়েত উপন্যাসেরই অন্যতম পুরোধা কনস্তান্তিন ফেদিন শলোকভের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে কথা লিখেছেন, সেটি হুবহু তুলে দিচ্ছি:

"একথা যদি সত্য হয় যে, শিল্পীর নিজের জীবনের ধারাই জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আহরণের প্রধান প্রবাহ এবং আমিও একথাটাকে সত্য বলে জানি, তাহলে বলতে হবে, শলোকভের জীবনের ধারা রুশ সমাজ বিপ্লবের গভীরতম ও দুর্দান্ততম

স্রোতধারা গুলিরই একটি। কসাকভূমিতে ছাড়া আর কোথায় এত বেশি ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে? কসাকদের প্রাচীন জীবনযাপনের ধারা বিশাল প্রস্তরীভূত তীরভূমির মতো যেকোন তরঙ্গরাশির আঘাতকে ঠেকিয়ে আসছিল। তবু শেষ পর্যন্ত নবজীবনের ধারা তার ওপর আছড়ে পড়ে তাকে পরাভূত করলো।"

শলোকভ কসাকভূমির সন্তান হিসেবেই এই রূপান্তরের মহাকাব্যিক আলেখ্যকে স্বদেশে ও সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের নব রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন।

২

শলোকভের ব্যক্তিত্ব ও পরিবারগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে তাঁর দুটি উপন্যাস 'ধীরে বয়ে চলে ডন' এবং 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেয়া হয়েছে। এই আভাস অবশ্য নিতান্তই আভাস। কারণ, এই দুটি উপন্যাসেই শলোকভ নিজের তো নয়ই, কোনরূপ বিশেষ ছাঁচ থেকে মুক্ত মোটামুটি প্রায় এক ডজন করে নরনারীর প্রেম ও ঘৃণা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত জীবনের ধারা বর্ণনা করেছেন। দুটি উপন্যাসেরই উপসংহার বিয়োগাত্মক। দুটি উপন্যাসেরই শেষে 'সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো'র কোন অবকাশই রাখা হয়নি। ১৯৪০ সালে শলোকভ 'ধীরে বয়ে চলে ডন' শেষ করেছেন, তখন ১৯২২ সালের সমস্ত তিক্ততার স্মৃতি মুছে যাওয়ার কথা। কিন্তু তখনও লিখতে বসে, ডন নদীর কোণে তাতারস্কি গ্রামে যা ঘটেছিল, সেটাই শলোকভ লিখলেন। পঞ্চাশের দশকে বসে শলোকভ 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' এর দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করলেন। প্রতিপক্ষ পরাজিত হলো ঠিক 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসের কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠার মতো। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরাজিত হবার আগে ডন অববাহিকায় গ্রেচিয়ান লগ গ্রামের যৌথ খামার গঠনের দুই নায়ককে হত্যা করে রেখে গেলো। এই রকমই ঘটেছিল বলে শলোকভকে এই ঘটনাই লিখতে হয়েছে।

প্রধানত কসাক নরনারীদের নিয়েই দুটি উপন্যাস। রূপান্তরের দুটি পর্যায়। প্রথম উপন্যাসের কেন্দ্র তাতারস্কি গ্রাম। ঘটনাধারা এর নরনারীকে যেখানে টেনে নিয়ে যাক না কেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপের সীমান্ত হোক, বিপ্লবের নগরী পেত্রোগ্রাদ হোক, অথবা দূরদূরান্তের অথবা গৃহযুদ্ধের হাতবদলের শহর, বন্দর গ্রাম হোক, তাতারস্কি গ্রামের কৃষিজীবী নরনারীর একান্ত ঘরোয়া জীবনে ফিরে এসেছে কাহিনীর সূত্র। এই তাতারস্কি গ্রামে পাশাপাশি দুটি বাড়ির দুটি পরিবারের, বিশেষ করে দুটি চরিত্র গ্রেগর মেলিকভ ও আকসিনিয়া স্তেপানভা বিবাহবন্ধনের বাইরে প্রেমকে অনুসরণ করতে গিয়ে, দুটি পরিবারের সকলের মধ্যে যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে, তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত ঘটলো, গ্রেগরীর সঙ্গে গৃহযুদ্ধের বাইরে কোথাও পালাতে গিয়ে ঘোড়ার উপরেই বসে থাকা অবস্থায় গ্রামবাসীর গুলিতে আকসিনিয়ার মৃত্যু। এরই পাশাপাশি গ্রেগরীর স্ত্রী নাতালিয়া একান্তভাবে স্বামীর ফিরে আসার আশায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গর্ভস্থ গ্রেগরীর সন্তানকে ধাই দিয়ে নষ্ট করিয়ে করুণ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লো। এই ত্রয়ীর আকর্ষণ বিকর্ষণে কোন রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সমস্যা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাও যে আবর্তের সৃষ্টি করেনি তা নয়। গ্রেগরীর বোন দুনিয়া বলশেভিক পার্টিতে

এবং লালফৌজে যোগদানকারী মিখাইল কোশেভয়কে ভালবাসতো। গ্রেগরী যখন সাংঘাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী হয়ে পড়ে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে শরিক হয়েও কসাকভূমির দোটানার মধ্যে পড়ে যেদিকে বেশি সংখ্যক কসাক গিয়েছিল সেদিকেই ঝুঁকলো, তখন স্বভাবতই মিখাইল হয়ে দাঁড়াল তার শত্রু। যে গ্রেগরী আকসিনিয়ার প্রেমে পড়ে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ভুলেছিল, সেই দুনিয়ার ওপর ফরমান জারী করে বসলো সে যেন মিখাইলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। দুনিয়া তার কথা মানে নি। মেলিকভ পরিবারের মা ও বাবার মৃত্যুর পরে এবং বড় ভাই ও ভ্রাতৃবধূরও মৃত্যুর পরে দুনিয়াই মেলিকভ পরিবারের ঘর দুয়ার আগলেছে। সকলের স্নেহের পাত্রী এই ছোট বোনটি যৌবনে পা দিয়ে গ্রেগরীর কথা মানে নি। গ্রেগরীর প্রচণ্ড শাসানির মুখে সে বলেছে, হৃদয় হচ্ছে সবার উপরে। সে অবশ্য রাজনীতির কথা বলেনি। মিখাইল বলেছে। দুনিয়া নাতালিয়ার রেখে যাওয়া যমজ ছেলে আর মেয়েকে আগলেছে। এবং এর মধ্যেই গীর্জায় গিয়ে মিখাইলকে বিয়ে করেছে। একেবারে শেষে যখন ১৯২২ এর মে দিবসের পূর্বাহ্ন গ্রেগরী তাতারস্কি গ্রামে ফিরে এসেছে আকসিনিয়াকে হারাবার পরে একবছর বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, তখনও দেখা যায় লালফৌজের পরিপূর্ণ জয়ের পরেও মিখাইল দুনিয়ার কাছে ফিরে আসতে পারেনি নানা কাজে আটকে থাকায়। দেখা গেল নাতালিয়ার যমজ সন্তানদের মধ্যে মেয়ে পনিয়া ডিপথিরিয়ায় মারা গিয়েছে ছেলেটি রয়েছে দুনিয়ার কাছে। ছেলেটি বুঝলো উজাড় হয়ে যাওয়া লোকটাই তার বাবা গ্রেগরী। এই পর্যন্ত।

সুবৃহৎ উপন্যাস 'ধীরে বয়ে চলে ডন' এর হয়তো নেহাত একপেশে একটা ছক হয়ে গেলো উপরোক্ত মর্মকথাটি। তবু একটা ধারণা দেবার জন্যেই একটা ছক থাকা দরকার। বস্তুতপক্ষে এক ডজন নরনারী ছাড়াও আরও প্রায় শখানেক চরিত্র এসেছে উপন্যাসের পরিধিতে। কেউ বিপ্লবের পক্ষে, কেউ বিপ্লবের বিরুদ্ধে। উপরন্তু শলোকভের রীতি হলো এই যে, যে চরিত্রই আসুক না কেন, তার উপর আলো ফেলবেনই। এই জন্যে বিশাল ও ব্যাপক ক্ষেত্রে দশ বছরের ঘটনার সূত্রে বিভিন্ন চরিত্রের প্রত্যেককে নিয়ে একটা অন্তত গল্প আছে। কোন চরিত্রকে কাগজ কাটা মূর্তি হিসেবে শলোকভ পেশ করতে নারাজ। এখানে পিছন দিকে তাকাবার অবকাশ খুব কমই রয়েছে-সমুদ্রের দিকে ধাবমান ডন নদীর জলস্রোতের মতো সম্মুখপ্রবাহী ঘটনাবলির দরুন। তবু রেল শ্রমিক স্টকম্যান মিস্তিরির কাজে তাতারস্কি গ্রামে বাসা নিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগুনের কণা। সামান্য সময়ই থাকতে পেয়েছিল সে এই গ্রামে। তবু বীজ বুনে দিয়ে গিয়েছিল সে বিপ্লবের, মিখাইল যাকে শেষ পর্যন্ত লালন করলো। স্টকম্যান সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের পরে ফিরে এসেছিল। সে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নিহত হলো। এইরকম আরেকটি চরিত্র বুনচুক। গ্রামের বাইরের। তাকেও মরতে হলো। তার প্রণয়িনী আনা রণক্ষেত্রে মরলো। মৃত্যু মানে শেষ নয়। একটা মানুষ কোথায় গেল তার হদিশ নেই। তবু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাদের নিয়ে কাহিনী, তাদের ওপর বরাবর আলো ফেলতে হয়েছে। গ্রেগরী মেলিকভ এদিক দিয়ে কেন্দ্রিয় চরিত্র। সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের নব রূপান্তরের ধারাকে চিহ্নিত করার জন্য এই চরিত্র নির্বাচন। নব রূপান্তরের ব্যাপারটা কঠিন; সময়

সাপেক্ষ, আয়াসসাধ্য। এটা বোঝাবার জন্যই যেন শলোকভ গ্রেগরীকে নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই নায়ক খানিকটা তৃতীয় পক্ষ ধরনের–কোথাও যে মিশ খাচ্ছে না। গ্রেগরী শেষ পর্যন্ত নিজের গ্রামে ফিরে এলো, যেখানে অবশেষে সমাজতন্ত্রের শক্তি জয়ী হয়েছে। কিন্তু তখনও তাকে অনির্দিষ্ট রাখলেন শলোকভ, এই রকমটা ঘটেছিল বলেই। তিনি অনেক দেখেছিলেন। মানুষকে বদলাবার জন্যে আরও প্রয়াসের ব্যাপক মৌল সাধনার দরকার রয়েছে, এটাই বুঝিয়ে দিলেন। নিজেও বুঝেছিলেন এটা।

এই সত্যটাকেই শলোকভ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে আরেকভাবে নিয়ে এলেন। সেখানে ঘটনা ও কর্মকাণ্ড আলাদা। সম্পূর্ণ নির্মাণমূলক। কামানের গর্জন থেমে গেছে। তবে এখানেও দেখা গেলো, যৌথ কৃষি খামার গড়ে তুলে যখন গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হলো, তখন শুধু যে গা ঢাকা দেয়া জারতন্ত্রী ও বুর্জোয়ারাই বাধা দেবার জন্য মরিয়া হয়ে আঘাত হানার জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছে তাই নয়, সাধারণ কৃষিজীবী নরনারীদের মনেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। লেনিনগ্রাদ থেকে ২৫০০০ কারখানা শ্রমিক যেমন গ্রামে গ্রামে এসে বসেছে গ্রাম্য সোভিয়েত পঞ্চায়েত ও পার্টিকে সাহায্য করতে, তেমনি অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হয়েছে গৃহযুদ্ধের আমলের জারতন্ত্রী সেনানীরা।

লড়াইটা অবশ্য গৃহযুদ্ধের আমলের মতো বহুদূর ব্যাপি নয়। তবু শত্রু অবহেলার পাত্র নয়। কারণ, সাধারণ কৃষিজীবীদের মধ্যে তখনও যৌথ খামারে মিলে যাওয়া নিয়ে দ্বিধা। যেটা অবশ্য সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩০ সালে ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে, সাধারণ কৃষিজীবীদের মন জয় করতে পেরেছিল কমিউনিস্টরা। এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল অনেক ধৈর্য, অনেক বিতর্ক, অনেক আলোচনা, প্রত্যক্ষ কাজ, উৎকৃষ্ট ফল, নতুনতম জীবনের আবহাওয়া দ্বারা। যারা সংগঠক তাদের মধ্যেই বিভিন্ন মেজাজের মানুষ ছিল, বিভিন্ন শিকড়ের মানুষ। এসমস্ত কথাগুলো বিবেচনা করলে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়, সেটা হলো 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসে যবনিকা পড়েছে, কিন্তু লড়াই এর পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

শলোকভের এই 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় ঘটনাস্থল অন্য, পাত্রপাত্রী নায়িকাও অন্য। এখানেও একটি ছোট গ্রামকে ঘিরেই প্রধানত কসাক বাসিন্দাদের কাহিনী লিখেছেন শলোকভ। সেই একই পদ্ধতি। ছোট পরিসরের মধ্যে সাধারণ নরনারীর পূর্ণাঙ্গ চরিত্র চিত্রণ।

'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' (ইংরেজি উপন্যাসের নাম 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্') উপন্যাসের গ্রামের নাম গ্রাচিয়ানিলগ। ডনের অববাহিকার কিছুটা ভিতরের দিকে তৃণভূমি-বেষ্টিত। 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসেও গ্রামটি আছে। গৃহযুদ্ধের সময়ে একটি ঘটনার কথাও আছে। একটি পরিবারের সামান্য আভাস আছে। কিন্তু নতুন উপন্যাসে যখন শলোকভ এই ছায়াঢাকা গ্রামটিকে নিয়ে এসেছেন, তখন এর রূপ আলাদা। বেশ কয়েকটি পরিবারের অনেকগুলি নরনারী। এদের ত্রিমাত্রিক চিত্রাবলি। সামান্য ও অসামান্য এরা। সবাই কৃষিজীবী, গ্রামীণ। তবু এদের কাহিনী বলার জন্যেই দুবছরের মধ্যে শলোকভ প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডটি

লিখলেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত এই বহু প্রতীক্ষিত উপন্যাসটি শেষ হলো শুধুমাত্র গ্রামের পাশে একটি বড় পতিত জমিতে লাঙ্গল দিয়ে যৌথ খামার গড়ার প্রস্তুতি পর্ব দিয়ে।

এখানেই শলোকভের উপন্যাসের একটি দিক সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। শলোকভ গ্রামের কথা বলার সময় স্বভাবতই কৃষিজীবী কসাক পরিবারের নারীদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন তাদের উদগ্র ও সমগ্র রূপে। গ্রামীণ জীবনে ক্ষেতে-খামারে ও বহু কর্মে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই নারীরা। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এদের। স্বামীরা এই সেদিন পর্যন্ত পেশাদারী সৈনিক হিসেবে ঘোড়া নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রবাসে যাওয়ায়, নারীরা গার্হস্থ্য-জীবন সবসময় সবক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারে নি। এই কারণেই দেখা যায়, 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাস একাধিক স্বৈরিণী, যারা রূপচর্চা ও পরিধেয় নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য গৃহস্থালীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যেই এই আচার-আচরণ। মক্ষিরাণীর জায়গা নেই এখানে। গ্রেগরীর প্রণয়িনী পরস্ত্রী আকসিনিয়া এইরকম নারী, যে নিজের রূপ সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তে সচেতন। 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' উপন্যাসেও নারীর এই ছবি। সমাজতন্ত্রের তো সবেমাত্র শুরু। সুতরাং, এই উপন্যাসেও লুশকার মতো মেয়ে বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা মাকর নগলুনভের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে, লেনিনগ্রাদ থেকে আগত দেভিদভকে রূপে ভোলায় এবং ভোলাতে সক্ষম হয়। সৃষ্টি হয় দুই সাথীর মধ্যে একটা ভেদরেখা। দুটো মেজাজ দুই খাতে বয়ে চলে। যে নগলুনভ বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন দেখে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সংগ্রামে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গ্রামে বসে ইংরেজি পড়ে, সে প্রথম খণ্ডেই অদম্য সংগ্রামী হলেও ট্রাজিক বা দুঃখী। দ্বিতীয় খণ্ডে সে এবং দেভিদভ দুজনেই প্রতিবিপ্লবীদের গুলিতে মারা যায়।

অবশ্য দুটি উপন্যাসেই মায়েরা দুঃখিনী হলেও যেন গ্রানাইট পাথরে খোদিত প্রতিকৃতি। অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সংসার-ধারিণী। ধরিত্রীর মতো সহনশীলা। ১৯৩০ সালেও এদের অনেকে জানে না, শুধু জগতে নয়, গ্রামের মধ্যেও কি ঘটছে। তবে এরা প্রত্যেকেই চরিত্রের দিক দিয়ে পৃথক। এদের নিয়েও শলোকভ লিখেছেন ছোট ছোট কাহিনী। ছোট হলেও এরা মাঝে মাঝে গ্রীক ট্রাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই উভয়বিধ নারীর মাঝখানে শলোকভ নতুন সমাজের নারীদেরও দুয়েকটা ছবি এঁকেছেন।

শলোকভের দুটি উপন্যাসেরই একটা দিক দিয়ে বড় রকমের মিল রয়েছে। এই দিকটি হচ্ছে শলাকভের নিসর্গ প্রেম। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযুক্তি। মানুষ ও প্রকৃতির অবিভাজ্যতা যেন মানুষের অবচেতনায় অধিষ্ঠিত। ডন নদীর একটা বৈশিষ্ট্যই যে শুধু এর কোলের বাসিন্দাদের প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যে জড়িয়ে রেখেছে তাই নয়। তৃণভূমিতেও ষড় ঋতুর আবর্তন, বরফে আবৃত প্রান্তর এবং বরফ থেকে মুক্ত বসন্ত মায়ার অঞ্জন পরিয়ে রেখেছে তৃণভূমির বাসিন্দাদের চোখে। অবশ্য শলোকভ তাঁর দুটি উপন্যাসেই প্রকৃতিকে এইভাবে সামনে রাখেন নি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর একটি বড় অভিযোগ এই যে, কামানের গোলা মানুষ ও বৃক্ষরাজিকে খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করে। তৃতীয় উপন্যাসে তিনি এই মর্মন্তুদ চিত্রটিকে বারবার সামনে এনেছেন।

'ধীরে বয়ে চলে ডন' এবং 'পোড়ো জমি উথাল-পাথাল' এর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, প্রথম উপন্যাসে প্রাচীন কসাক গানের ছড়াছড়ি দিয়ে এর রক্ত ও অশ্রুকে একটা উদাসীনতার আবরণ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাসে গান নেই, কিন্তু কৌতুকের ছড়াছড়ি। এতে এক বৃদ্ধ উপন্যাসের কোন কোন অংশের তেল-নুন লাকড়ির আলাপকে নিত্যরসে ভিজিয়ে রেখেছেন।

৩

শলোকভের ব্যক্তিজীবনের ধারা ও পরিবেশ এবং তাঁর দুটি উপন্যাসের উপরোক্ত পরিচিতি তাঁর শিল্পরূপ-চিন্তার পরিচায়ক। তবু আলাদা করে কিছু বলা দরকার। একজন সচেতন কমিউনিস্ট শিল্পী হিসেবে তাঁর চিন্তাকে তিনি পার্টি কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে জানিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষেও তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। এমনি একটি উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত সাহিত্যের দুটি ধারাতেই তিনি লিখেছেন। এই দুটি ধারা হচ্ছে সময় নিয়ে লেখা এবং তাৎক্ষণিক লেখা। তবে এদের মধ্যে প্রথম ধারাটিতে তিনি তাঁর বড় বড় কাজগুলি করেছেন। এই প্রসঙ্গেই অন্যান্য উপলক্ষেও তাঁর বক্তব্য এই যে, নিঠুর গরজী যে সবুর বিহনে ফুল ফোঁটাতে ও বাস ছোটাতে চায় সেটা লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকা কারুরই কাম্য নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি লেখক-লেখিকাদের ঔদাসীন্যের নিন্দা করেছেন। আত্মম্ভরিতা ও আলস্য এক্ষেত্রে তাঁর মতে গর্হিত।

শলোকভের শিল্পরূপ চিন্তার কয়েক ধারা নিম্নরূপ :

১. "কারখানার শ্রমিকেরা কিংবা ক্ষেত-খামারের চাষীরা যেমন নিম্নমানের জিনিসপত্র কিংবা ফসল তৈরি করলে তার চাহিদা থাকে না, তেমনি লেখক-লেখিকারা নিম্নমানের দায়সারা বই লিখলে তার চাহিদা থাকতে পারে না। অর্থাৎ যেকোনো অবস্থাতেই লেখার মানকে অবশ্যই উন্নত রাখতে হবে।"

২. "অসহিষ্ণুতা কিংবা চটজলদি লেখার বিপদ হচ্ছে এই যে কোন ঘটনা এতে খণ্ডিতভাবে বর্ণিত হয়। এটা বসন্তের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। লেখা হলো হয়তো শুধুমাত্র কুঁড়ি ফুল দেখে, কিন্তু লেখা যখন প্রকাশ পেল, তখন বসন্ত পাঠক-পাঠিকাকে ফলও উপহার দিয়ে বসেছে।"

৩. "উপন্যাস রচনার সঙ্গে সৌধ নির্মাণের তুলনা করা যায়। তবে সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে যেখানে নির্মাতার কাজ চুলচেরাভাবে নির্ধারিত করে দেয়া যায়, সেখানে লেখক ও লেখিকার উপর দায়িত্ব পড়ে নিজের উপর ভরসা করে আগ্রসর হওয়ার। তাকেই সৌধ নির্মাণের মালমশলা জোগাড় করে নিতে হয়। সে-ই প্রধান স্থপতি, সে-ই মজুর-মিস্তিরি, সে-ই প্রকৌশলী। আর লেখার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত এমন কাণ্ড ঘটে যে, প্রধান স্থপতিকে পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হয়, রাজমিস্তিরি যা কিছু খাড়া করেছে তাকে ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়তে হয়। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায়, এমন কাজে কোন শেষের সীমারেখা টানা যায় কি?"

৪. "বিলেতের কোন কোন পত্রিকায় আমার 'ধীরে বয়ে চলে ডন' উপন্যাসে নিষ্ঠুরতার ছবির আধিক্যের কথা বলা হয়েছে। এই অভিযোগ মেনে নিয়ে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, যে লেখক সহ্যের উপর পর্দা চাপা দেবার জন্য ঘটনাবলি মনোরম করে সাজায় এবং যার লক্ষ্য থাকে পাঠকপাঠিকার মনে যেন আঘাত না লাগে, আমি তাকে লেখক মনে করি না। দ্বিতীয়ত আমি বলতে চাই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যদি গৃহযুদ্ধের সময় প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য হস্তক্ষেপ না করতো, তাহলে এত রক্ত ও অশ্রুপাত হতো না।"

৫. "প্রত্যেকটি জাতির, সে ছোট হোক আর বড় হোক, নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থাকে। মানুষের আত্মিক সম্পদ এই আত্মিক মূল্যবোধগুলির উপর বিন্যস্ত হয়।"

৬. "আমাদের সোভিয়েত সাহিত্য ও চিরায়ত সাহিত্য যেমন বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত হবে, তেমনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক ও চিরায়ত সাহিত্যকে আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। সাহিত্যের কাজ হবে জনগণকে এমন জীবন-যাপনে সাহায্য করা, যাতে মানুষের জয়জয়কার হয়।"

৭. "প্রত্যেকটি জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে তার মাতৃভাষা।"

৮. "জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর কোথাও সাহিত্যের মতো দ্বন্দ্বমূলক গতিবাদ এত প্রচণ্ডভাবে কাজ করে না।"

৯. "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অভিনবত্ব এই যে, এই বাস্তবতায় এমন একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় যে দৃষ্টিভঙ্গি জনগণকে মানবজাতির প্রগতির জন্য প্রয়াস চালাতে আমন্ত্রণ জানায়, জনগণকে কোটি কোটি মানুষের কাম্য ও লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে, এই প্রয়াসের পথকে আলোকিত করে।"

১০. "আমার একটি বক্তব্য এই যে, চাষীর মতো লেখক-লেখিকারও কোন বছর ভাল যায়, কোন বছর মন্দ যায়। কোন বছর ফসল ভাল ফলে, কোন বছর খারাপ। কোন বছর খরা আসে, কখনও বা আসে ঝড়তুফান। কখনও পোকার দৌরাত্ম্য ঘটে।"

১১. "জনগণের জন্য লিখতে পারাটাই হচ্ছে একটা বড় রকমের সম্মান।"

১২. "সাহিত্য নিত্য নতুন। এখানে যৌবনের চির জয়জয়কার।"

শলোকভের উপরোক্ত চিন্তাধারা যেমন সোভিয়েত সাহিত্যের, তেমনি বিশ্বের সর্বত্র যেখানে মানুষ শান্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র গড়ছে এবং এই জন্য লড়ছে, সেখানে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে, জোগাবে। রালফ ফক্স তাঁর 'উপন্যাস ও জনগণ' গ্রন্থে তিরিশের দশকে লিখেছিলেন, যে স্বাধীনতার আদর্শ ফরাসি বিপ্লবের ধারায় উনিশ শতকের প্রখ্যাত কবি শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই স্বাধীনতার আদর্শ বৃহত্তর পটভূমিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় শলোকভের মতো প্রাণবন্ত কথাশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে। আজ পঞ্চাশ বছর পরে প্রয়াত শলোকভকে সম্বোধন করে আমরা বলতে চাই, শলোকভ গোগোল পুশকিন-দস্তয়েভস্কি-তলস্তয়-

চেকভ-তুর্গেনিভ্-গোকির চিরায়ত ও আধুনিক সৃজনী ধারায় নব নবীনের বার্তাকে স্থাপন করতে পেরেছেন। জয় চিরনবীনের জয়।

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

দুটি দর্শন আজ বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করছে। এরা কমবেশি সাধারণ পাঠকপাঠিকাকেও টানছে। একটি মার্কসবাদ আরেকটি অস্তিত্ববাদ। একটি দর্শন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক মানবমুক্তি সংগ্রামের দায়িত্ববোধের সঙ্গে মুক্তিপ্রয়াসী মানুষের একান্ত হওয়ার দরুন ব্যক্তিগত মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাওয়ার দর্শন-মার্কসবাদ। আরেকটি দর্শন বিদ্রোহী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির একক দায়িত্ববোধের এবং সকল প্রচেষ্টার পথরোধকারী অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কালো দরজা পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালনের দর্শন-অস্তিত্ববাদ। এই দ্বিতীয়ের আবার দুটি উপধারা। একটি সর্বধ্বংসী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মীয় সংঘজীবনে মাথা গুঁজে থাকা। দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের গণসমাবেশে শরিক হয়ে থাকা। ফ্রান্সের ক্রুদ্ধ অস্তিত্ববাদী শিল্পী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে অস্তিত্ববাদের দ্বিতীয় ধারার বাহক হয়ে মার্কসবাদে উপনীত হলেও এবং স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি-আত্মাকে মার্কসবাদের সামগ্রিক সত্যের উপাদান হিসাবে সপ্রামণ করার দাবী করলেও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর মত বদলেছেন কিনা তা এখনও জানা যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব-সূরীদের খুব বেশিদিন সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী নন তিনি। কোন মহৎ শিল্পীরও মৃত্যুর পরে সার্ত্রে তাকে বড়জোর এক পুরুষ পর পর্যন্ত সজীব সাথী বলে মানতে রাজী আছেন। যাঁরা জাঁপল সার্ত্রের 'সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রভাবিত তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহকেও খুব বেশিদিন বরদাশ্‌ত করবেন বলে মনে হয় না। অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই 'বাসি ফুলের মালা' হয়ে গিয়েছেন সম্ভবত; মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে জীর্ণ করে ফেলেছে এই দৃষ্টিতে।

কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে সজীব ও সচল বলেই মনে করবো। মার্কসবাদে দ্ব্যর্থহীনভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা আছে। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে চায়, মানবসমাজের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠিগত সৃজনশীলতা অতীতের আবরণ ভেদ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল উপাদানগুলি রসায়িত ও জারিত হয়ে মৃত্যুকে সবসময় ডিঙ্গিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন বিপ্লবী প্রতিভার মৃত্যু নেই। মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পথের নিশানা। মুক্তিসংগ্রামীর গলায় যে জয়ের মালা দোলে, তা কোনদিন বাসি হতে পারে না। কারণ, মুক্তিসংগ্রামী সে মালা দিয়ে যায় তার উত্তরপূরুষের গলায়। অব্যাহত জীবনস্রোতের মোকাবেলায় এখানেই মৃত্যুকেই মনে করা যেতে পারে অর্থহীন। অমরতার এই দর্শনকে সামনে রেখে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্ব বিচার করতে বসি, তাহলে তাঁকে নিয়ে নিরবধি কাল পর্যন্ত যেতে না পারলেও অনেকদূর যেতে পারব। তবে এক্ষেত্রেও দুটি দিক সামনে আসতে পারে।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাক এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা হিসাবে। এই প্রতিভা কিভাবে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে বাংলা ভাষাভাষীর সংগ্রামী

জীবনের তথাকথিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ শরিকদের সঙ্গী হিসাবে পদ্মা-যমুনা-মেঘনার তরঙ্গধৌত বাংলাদেশের চলমান জীবনের কাজে ও কথায় সঞ্চারিত হয়ে রয়েছেন, সে কথা সব সময় আমাদের মনে না থাকতেও পারে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের হুকুম মতো যেমন এই সঞ্চারকে নাকচ করা সম্ভব নয়, অস্তিত্ববাদীর অধৈর্যেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বাতিল বলে ঘোষিত হতে পারে না। যতদিন 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিগুলির নদীমাতৃক পরিবেশের পদ্মা আর গোরাই নদীর আশেপাশের প্রাকৃতিক জীবন অব্যাহত থাকবে, যতদিন কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ সজীব থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের মানবজীবন প্রবাহ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ মনকে এবং সেই সঙ্গে সে মনের অধিকারী রক্তমাংসের মানবটিকেও নতুন ফুলের মালার মতো করে আঘ্রাণ নিতে চাইব, কারণ ভবিষ্যতে আমাদের জীবন-যাত্রার সাথী রক্তমাংসের মানুষের জীবনসত্তাকে আজকের থেকেও আরও বেশি গভীর করে জানতে চাইব। রবীন্দ্রনাথের সজীব অনুভূতিগুলি আমাদের সংগ্রামী জীবনসত্তার বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদানে একীভূত হয়ে রয়েছে। আমরা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে চলেছি, রবীন্দ্রনাথের সজীব শিল্পীসত্তা বারবার সেকথা মনে করিয়ে দেবে। আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে প্রান্তর পার হতে গিয়ে তাঁকে পাশে পাবো। রবীন্দ্রনাথ বাসিফুলের মালা হবেন না একটি বিশেষ কারণে। সেটি এই যে, ব্যক্তিজীবনে, সে ব্যবহারিক হোক কিংবা শিল্পীসত্তার সৃজনলীলায় হোক, চিরজীবী হবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে কোন 'আতুরতা' বা 'হ্যাংলামি' ছিল না। পৃথিবীকে তিনি ভালবাসতেন অবশ্য। উপনিষদের মন্ত্রে শৈশবে লালিত হয়েও তিনি ধূলার ধরণীকে কিংবা এর মুটে মজুরকে মায়া কিংবা ছায়া মনে করতে শেখেননি। কিন্তু তবু সুন্দর ভুবনে মরতে না চাওয়ার মধ্যে কোন ক্লিন্নতা ছিল না। বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আসক্তিকে তিনি সকৌতুকে হাল্কা করে দিয়েছিলেন তাঁর '১৪০০ সাল' কবিতায়। জীবনের মধ্যাহ্ন 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে আসক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাকে তিনি জীবনসায়াহ্নে 'পৃথিবী' কবিতায় নির্মমভাবে পরিহার করেছিলেন। এই পৃথিবীকে অযথা তাঁর নামযশে ভারাক্রান্ত করার অহমিকাকে তিনি মনে স্থান দেননি। এই কারণেই আমরা ভবিষ্যতেও তাঁকে স্থান দিতে পারবো নিরুদ্বিগ্নচিত্তে। আমাদের মন তাঁর স্মরণীয় উপস্থিতিতে উদ্বেলিত হবে, কণ্টকিত হবে না। স্বচ্ছন্দ এই মৃত্যুহীনতা।

রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক দূর যাবার ব্যাপারে দ্বিতীয় দিকটিকে এবার যাচাই করা যাক।

এখানে আমরা রবীন্দ্রানাথের কাব্যকীর্তির একটি বিশেষ অধ্যায়কে সামনে আনবো। এবং আমরা দেখব এই কাব্যকীর্তি এমন সব নায়ক-নায়িকাকে বাংলা সাহিত্যে স্থাপন করে গিয়েছে যারা মৃত্যুকে নাকচ করে জীবনের গান গাইতে থাকবে দূর ভবিষ্যতেও। দেখতে পাব, মৃত্যুর কালোছায়ার তলায় সংগ্রামী মানুষের জীবন অপঘাতের আবরণে আবৃত হয়েও ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বিপ্লবীর মৃত্যুতে নিষিক্ত হয়ে বিস্তৃততর জীবনে উত্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের বিদ্রোহী নায়ক রঞ্জন এবং 'মুক্তধারা' নাটকের বিদ্রোহী নায়ক

অভিজিত অপগাতে নিহত হলেও চিরজীবী প্রকৃতির মতো মানব মুক্তিসংগ্রামে চিরজীবী। এই দুই বীরের জন্য নাটকে কোন মায়াকান্না নেই। রঞ্জন আর অভিজিত আমাদের সাহিত্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বেঁচে থাকতে এসেছে। এই দুই গণবীর-চরিত রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

(১৯৬৮)

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা : খাদে নিখাদে

১

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং চিন্তায় কাব্যে চারুশিল্পে সঙ্গীতে ও সাধারণভাবে সাহিত্যকর্মে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় অন্তর্বিরোধের প্রকাশ্য ও স্বগত অভিব্যক্তি এবং ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি। পর্যায় থেকে পর্যায়ে এবং একই পর্যায়ের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে নেবার টানাপোড়েনে তিনি সব সময়েই আক্ষেপে আক্ষেপে আকর্ষিত। অস্থিরতা, অসন্তোষ, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও যন্ত্রণায় তাঁর জীবন ও সৃষ্টির প্রশান্তি ও তন্ময়তার বড় রকমের দিকটাও জর্জরিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় সৃষ্টিতে মাধুর্যেরও বাড়াবাড়ি রয়েছে বলে যখন যেটুকু রসদ কাম্য সেটুকুকে তুলে নেবারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। দ্বন্দ্ব সংঘাতের তিক্ততাকে ও হলাহলকে এবং জ্বালাময়ী শিখা ও রক্তাক্ত যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে স্নিগ্ধ ও মধুর রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া কঠিন নয়। তাঁর শুধুমাত্র প্রসন্ন রূপটিকে দেখাবার প্রামাণ্য ব্যাখ্যা রয়েছে ভুরি ভুরি। এদের উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। কিন্তু আমরা একে বলবো রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতসত্তার একদিক। আরেকদিক হচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বের ধারা। প্রধান না হলেও সমকক্ষ।

একটা বিশেষ কারণে এই অন্তর্বিরোধের পরিক্রমা আমাদের কাছে একান্তভাবে কাম্য। বিশ্বব্যাপী যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বাত্মক বৈপ্লবিক গতিধারা নিয়ে একটা শতাব্দীকালের সকল দেশ ও মহাদেশের বহু জাতির বহু বর্ণের বহু ধর্মের সমাজ, জনগণ ও বহু ব্যক্তি আরেকটা শতাব্দী শুরু করতে যাচ্ছে, তাতে শতাব্দীকালের বিশেষ করে সেই শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে চলা দরকার হবে, যাঁরা বৈপ্লবিক দ্বন্দ্বাত্মকতাকে জীবনে বাস্তববাদী সাধনায় সৃষ্টিতে জ্বালানির মতো কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এই রকমই একজন অপরিহার্য শিল্পী। আগামীতেও থাকছেন।

এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে আমরা বর্তমান নিবন্ধে অন্তর্বিরোধের ধারাতে বিপরীত অবস্থান নেবার দুটো দৃষ্টান্তকে রবীন্দ্রপরিক্রমায় সামনে রাখছি। একটির অবস্থান খাদে, আরেকটির নিখাদে। একটির প্রক্ষেপণ কোমল, আরেকটির কঠোর।

২

প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়নের একটি ইংরেজি ভাষ্য 'গার্ডেনার' (মালঞ্চের মালাকর) গ্রন্থের প্রকাশনা। ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হবার এবং এই কাব্যকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতির পরে-পরেই রবীন্দ্রনাথের একটি

বিকল্প ভাবমূর্তিকে কার্যত উপস্থাপিত করে 'গার্ডেনার' বইটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর ভূমিকা লিখেছেন।

বইটির প্রাথমিক কারণ ছিল বোধহয় 'গীতাঞ্জলি' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের তখনকার পঞ্চাশের বেশি বয়সের ৩০ বছরের লেখা কবিতার পরিচয় প্রদান। কিন্তু বাস্তবে যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতে বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ ও সংসারযাত্রার প্রতিফলনের ছবিগুলি গীতাঞ্জলিতে অপ্রধান হয়ে কিংবা কিছু কিছু প্রতীকী ভাবনাতেই শুধু নিবদ্ধ ছিল, সেগুলি সোজাসুজি গার্ডেনারের মারফত সামনে এসেছিল। গীতাঞ্জলিতেও ঈশ্বরসত্তার পাশে পাশে মানবসত্তা গা ঘেঁষে রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরসত্তাই প্রবল ও প্রধান। গার্ডেনারে বিপরীতটাই ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে এখানে পরমেশ্বর অনুপস্থিত। সবার উপরে মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। বইটিকে দুষ্প্রাপ্য হয়তো বলা যাবে না। তবে সাধারণত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্য বিচারে পণ্ডিতদের মহলেও বইটি প্রায় উপেক্ষিত বলেই এর ঐতিহাসিকতা আমাদের চোখের সামনে নেই। এজন্য এর বিষয়সূচীসহ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাখিল করছি এখানে।

বইটির প্রথম সংস্করণের একটি কপি এক অধ্যাপক বন্ধুর মারফত কলকাতার একটি কলেজের গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে সাতদিনের মধ্যেই ফেরত দিয়েছিলাম। সুতরাং স্মৃতি থেকেই কাব্যগ্রন্থটির পরিচয় দিচ্ছি। বইটিতে ৫০টি কবিতা সংকলিত হয়। কবিতাগুলির নাম সংখ্যায়। যেসব বই থেকে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে, সেগুলি কড়ি ও কোমল, মানসী, উৎসর্গ, কল্পনা, চিত্রা, চৈতালি ও ক্ষণিকা। সংকলনের বহু পরিচিত কবিতাগুলি হচ্ছে 'খাঁচার পাখি ও বনের পাখি', 'কস্তুরী মৃগসম', মরণ হে মোর মরণ, যেমন আছ তেমনি এসো, 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা', 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর', দিদি। বইটির একটি দিক আমাদের বিস্মিত করতে পারে। সেটি এই যে, কবির প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে পরিণত জীবনের মুখ পর্যন্ত কাজের পরিচয় দেয়া হলেও বইটিতে কবির প্রথম যৌবনের একটি প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে। স্বভাবতই এতগুলি বই থেকে নির্বাচিত ৫০টি কবিতার মধ্যে সাতটি বইয়ের পর্যায়ক্রমিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় এদের ঐক্যসূত্রকে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের আনন্দ এবং 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের যন্ত্রণায় মধ্যেকার যে তীব্র তারতম্য রবীন্দ্রকাব্যকে নতুনতর উত্তরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার কোন রেশ বইটিতে পাওয়া যায় না। তবে গীতাঞ্জলির পাশে 'গার্ডেনার'কে স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বন্দ্বাত্মক ধারাকে বুঝবার কাজটিকে সহজ করে রেখে গিয়েছেন।

এই প্রায় উপেক্ষিত বইটি তার প্রকাশ-কালে গীতাঞ্জলির পাশে পাশেই যে সাড়া জাগিয়েছিল, তার উল্লেখ সমসাময়িককালের বইপত্রে খোঁজ করলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এর জোরালো আবেদনের দুটো সূত্র মাত্র আমাদের সামনে রয়েছে।

পাবলো নেরুদার ১৯২৪ সালে প্রকাশিত যে বইটি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়কাল পরে নোবেল পুরস্কার পায় সেটি 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান'। এর কুড়ি নম্বর কবিতার মাথায় লেখা রয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৩০নং কবিতা অবলম্বনে। পাবলো নেরুদার বয়স তখন কুড়ি। তাঁর অনুভূতির কথাই আমরা জানতে পেরেছি। বিশ্লেষণের অবকাশই অবশ্য তখন ছিল না। আরেকটি সূত্র হচ্ছে,

বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট সতেরো বছর বয়সে 'গার্ডেনার' পড়ে পুস্তক পরিচয় লিখেছিলেন জার্মানির একটি পত্রিকায়। এই সমালোচনাটিতে ব্রেখ্‌ট আমাদের উপমহাদেশের একটা গভীর রহস্যের উপর থেকে পর্দা সরে যাবার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তববাদী বিপ্লবী মার্কসবাদী ব্রেখ্‌টের প্রস্তুতির কোন কথাবার্তা এতে পাইনি। তবে 'গার্ডেনার' যে এই দুই কবিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি এই দুটো খবর থেকে। 'গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের বিপ্লবাত্মক আঁচটাকে শুধু আন্দাজ করতে পারি।

৩

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধের কড়ি বা নিখাদের দ্বিতীয় উদাহরণটি স্বভাবতই গার্ডেনারের চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর সাংঘাতিক ধরনের দ্বন্দ্বাত্মকতা চাপা পড়ে গিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির নৈসর্গিকতার আবেষ্টনিতে। এটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলি'র ১৪৬নং পত্র।

শিলাইদহ থেকে ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে লেখা এই চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলি পড়ার এবং সেইসঙ্গে রামমোহন ও বেদান্ত প্রণেতাদের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈতের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জানিয়েছেন। চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত রচয়িতাদের ও তাঁদের ব্যাখ্যাকারদের ঈশ্বর ও সৃষ্টিতত্ত্বকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলি পড়ার আগেও বেদান্তের সৃষ্টি সম্পর্কিত মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল তাঁর মনে। রামমোহনের বই পড়ে তাঁর সংশয় কাটেনি। তিনি সৃষ্টি বা বিশ্বপ্রকৃতিকে ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এই অবস্থান থেকে কোনক্রমেই নড়বেন না বলে জানিয়েছেন।

যে বেদ ও উপনিষদের চিন্তাধারাকে চিরন্তন হিসাবে বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বিমুগ্ধ থেকেছেন এবং অপরকে বিমুগ্ধ করতে চেয়েছেন, সেই চিন্তাধারাকে ৩৩ বছর বয়সে তিনি সৃষ্টিকে বড় করার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই খবরটাকে আমাদের নব নব প্রজন্মের দৃষ্টির সামনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টির ধারাকে ব্যক্তিগত ও মর্মগতভাবে বুঝে নেবার জন্য। ছিন্নপত্রাবলি'র ১৪৬নং পত্র তার ব্যতিক্রম নয়। এই পত্র রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈপ্লবিক অগ্রগতিধারার পদ্ধতির স্মারক।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'চিত্রা' কাব্যের কিংবা 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে জানিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, উপনিষদ তাঁর চিন্তার একটি দিকমাত্র। অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাহির সত্য এবং পরিবর্তনও বড় সত্য। কাব্যগ্রন্থের গোড়াতেই এই ভাবে তত্ত্ব দাখিল করতে তিনি পিছপা হননি, ঠিক যেমন ছিন্নপত্রাবলির মতো 'রম্যরচনা' লিখবার সময় তিনি দ্বিধা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের এই বৈপরীত্যকে নিয়ে এগিয়ে চলার ধারাটিকে চাপা দেবার প্রয়াস অবশ্য চলে আসছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের তরফ থেকে। অথচ রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরিভাবে এবং নবনবভাবে আজ এবং আগামীকালে পাবার পথে বৈপরীত্যের

বৈপ্লবিক উপাদানটি অপরিহার্য রয়েছে, থাকবে। এই মুক্তধারাকে মুক্ত রাখা নব প্রজন্মের দায়িত্ব। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্তর্বিরোধ ও দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতি ধারার তত্ত্ব এই দায়িত্ব পালনে নান্দনিকভাবে এবং জীবনপথে সহায়ক হবে।

শরৎচন্দ্র-ঝড়ের খেয়া

১

বিশ শতকের বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে স্থাপন করতে গেলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন জাগে। সারা বিশ শতক ধরেই দেশেদেশে যে ঝড়ের পর ঝড় চলেছে গোটা মানব সমাজ জুড়ে, তার সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পেরেছে তাঁর লেখা?

শরৎচন্দ্র বিশ শতকের প্রথম তিনদশকের লোক। তিনি ভাববাদী ও মাধুর্যের পন্থী হিসেবে পরিচিত বাস্তববাদীদের কাছে। তিনি বরাবর বাংলা উপন্যাসের ধ্রুপদী ধারার লেখক হওয়ায় কালাপাহাড়ী আধুনিকদের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল ধারা নিয়ে চলেছিলেন বলে সাধারণের ধারণা। সুতরাং সারা শতাব্দী জুড়ে লোকজীবনের প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার অস্থিরতা তাঁকে পেছনে ফেলে এসেছে বলে মনে করাটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো এই যে শরৎচন্দ্রকে ঝড়ের খেয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই ঝড়ের খেয়া শুধু বিশ শতকের প্রথম তিনদশকের মধ্যেই নয়, সারা শতাব্দীর।

২

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণ মানব-মানবীর জীবনের মাধুর্যের বহু লৌকিকতা ও বহু মাত্রিকতার মধ্যে যে অস্থির অগ্রসরতা ও ভাঙ্গার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটি তাই বিশেষভাবে পরীক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা অচলার চিন্তার সূত্র ধরে আমরা সরাসরি মহাকাব্যিকতার প্রশ্নে প্রবেশ করতে পারি। অচলা তার স্বামীগৃহ ত্যাগ করে স্বামীর বন্ধু সুরেশের সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল।

এই উপন্যাসটির একেবারে শেষের দিকে প্লেগে আক্রান্ত ও মৃত্যুশয্যাশায়ী সুরেশের বিছানার পাশে বসে অচলা ভাবছে:

"তাহার চারিদিকে জনহীনপুরী মৃত্যুর মত নির্বাক হইয়া আছে। বাহিরে গভীর রাত্রি গভীরতর হইয়া চলিয়াছে, চোখের উপর কালো আকাশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার কি প্রয়োজন ছিল ইহার কি প্রয়োজন ছিল!

এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘিরিয়া এত বড় একটা কদর্য সংগ্রাম চলিয়াছে সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল! দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত হীনতা, সমস্ত স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে। তারপর সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়া যুগ যুগ পড়িয়া রহিবে? ওখানে কি

চিতার দাহচিহ্ন কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে? কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল? কে বাধাইল? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে এই কি এত বড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ কোন মোহ ছিল না? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই?

বহুদিন পূর্বে অনেক যত্ন করিয়া যে মহাভারতখানি শেষ করিয়াছিল আজ তাহারই শেষ সর্বনাশ যেন তাহার মনে ছায়ারাজির মত প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেখানে যেন কত রক্ত ছুটিতেছে, কত অজানা লোক মিলিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিতেছে কত শত সহস্র চিতা জ্বলিতেছে, নিবিতেছে, তাহার ধূমে ধূমে সমস্ত স্বর্গমর্ত্য একেবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।"

শরৎচন্দ্র এখানে যেভাবে মহাভারতের প্রসঙ্গটি এনেছেন, সেটি স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চয়। কিন্তু বিশের দশকের পূর্বাহ্ণের সমসাময়িক জীবনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটিতে মহাকাব্যিক মাত্রায় জীবনদর্শনকে তিনি এনেছেন সচেতন ভাবেই, মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে সাঝুলি গ্রামের প্লেগের মৃত্যুপুরী কয়েকটি মানব মানবীর পরিণতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে কম অর্থপূর্ণ নয়। এই অর্থপূর্ণতার ব্যাপারটা অবশ্যই প্রধানত একালের মানুষের সমস্যার বিন্যাসের মধ্য থেকে উৎসারিত। মহাভারতের সচেতনতা এবং গৃহদাহ উপন্যাসের সচেতনতাকে একই বাটখারায় ওজন করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে অচলার চিন্তা যে মহাভারতীয় পরিমাপের, সেটা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটা ধারণা, তিনি প্রধানত গল্প বলিয়ে এবং তাঁর গল্পের নর নারীদের নিতান্ত মামুলি আকর্ষণ বিকর্ষণের অম্লমধুর অথবা করুণ অশ্রু সজল কাহিনীগুলোই সাধারণ পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করে। অর্থাৎ ধারণা এই যে, শরৎচন্দ্র জীবন ও জগতের গভীরে প্রবেশ করতে চাননি। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই ধারণাটাই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অগভীর এবং ওপর ছোঁয়া। গৃহদাহ উপন্যাসের অচলার উপরোক্ত চিন্তা হচ্ছে প্রমাণ।

উপরন্তু এই গৃহদাহ উপন্যাসটি বিক্ষিপ্ত সৃষ্টি নয়। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস চরিত্রহীন গৃহদাহের একদশক আগেই তৈরি করেছিল মহাকাব্যিক পরিপ্রেক্ষিত। বিশ. এবং তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সমসাময়িক গণজীবনের বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ থেকে উৎসারিত স্বাধীনতা ও জাতীয় এবং ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের বিশাল তড়িৎগামী ধারাগুলোকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এক সাথে শুরু করা দুইপর্বের পাঁচটি করে উপন্যাসে। বিশের দশকের পূর্বাহ্ণে ও কয়েক বছরে তিনি মহাকাব্যিক পরিসর নিয়ে লিখেছিলেন গৃহদাহ উপন্যাসের পাশাপাশি 'শ্রীকান্ত' (২য় ও ৩য় পর্ব), 'পথের দাবী' আর 'দেনা পাওনা'। তিরিশের দশকের পূর্বাহ্ণেও কয়েক বছরে তিনি লিখেছিলেন। 'বিপ্রদাস' 'শেষ প্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব), 'শেষের পরিচয়' এবং 'আগামী কাল'। শেষোক্ত দুটি উপন্যাস ছিল অসমাপ্ত। যে সমগ্র সত্য উন্মোচিত হচ্ছিল তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনে বিভিন্ন শ্রেণীর.নরনারীর বিভিন্ন ধরনের সীমালঙ্ঘী আত্মিক উত্থানের মধ্য দিয়ে, তাদের সবাইকে তিনি একটি কাহিনীর আধারে রাখতে

পারেননি। তাদের নিয়ে আলাদা আলাদা কাহিনী রচনা করতে হয়েছে তাঁকে। রাজনীতি হোক, সমাজনীতি হোক, মনোলোক হোক সমস্ত বিষয়েই একই সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যাগুলির কিনারা করার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে উপন্যাসের শিল্পরূপের মধ্যে বহুসংখ্যক নায়ক নায়িকার যৌথ এবং একক বক্তব্যকে একই মূল্যে প্রকাশ করা। পরিস্থিতির বহুত্বের দরুন সাধারণ তাগিদের মধ্যেও যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধিতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটেছে, তাতে উপন্যাসের শিল্পরূপে পারিপাট্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে, পরিণতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, 'শেষের পরিচয়' এবং 'আগামীকাল' কমবেশি অসমাপ্তই রয়ে গেল এই জন্যে। এইজন্যে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা এবং গভীরভাবে সমস্তকিছুকে দেখবার প্রয়াসও দায়ী। তিনি কোন রকমের গোজামিল বা চমক দিতে চাননি। জটিল বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির মৌলিক কোন প্রশ্ন বা সমাধানকে এড়িয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ নায়ক নায়িকাদের সাধারণ অবচেতন অনুভূতিগুলিকেও ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসের 'সারদা' চরিত্রটি 'সবিতার' মতোই মুখর, যদিও কাহিনীতে 'সবিতার' অবস্থান সূর্যের এবং 'সারদার' অবস্থান চাঁদের। বাংলা উপন্যাসের যে ধ্রুপদী বাস্তববাদী ধারণাকে আধুনিক বাস্তববাদে শরৎচন্দ্র পৌঁছে দিয়েছেন, তারও তাগিদ কাজ করেছে পরিপূর্ণ সত্যকথনে। পরিপূর্ণতার তাগিদ মেটাতে গিয়েই শরৎচন্দ্র একসঙ্গে অনেকগুলি উপন্যাসে হাত দিয়ে একেকটিতে একেকটা বিষয়কে চূড়ান্ত নিতে চেয়েছেন। কোথাও সময় করতে পেরেছেন পারিপাট্য আনতে, কোথাও সময় করতে পারেননি।

• 'আগামীকাল' উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। ১৯৩৫-৩৬ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'আগামীকাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। কাহিনীটা হলো এই যে, অসহযোগ আন্দোলন সবেমাত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কল্যাণ-সংঘ-কর্মীদের নতুন ধরনের কাজ, চিন্তা ও সম্পর্ক এবং একই সঙ্গে প্রেম নিয়ে শরৎচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন প্রস্তাবনাটিকে। এখানে নায়িকা মনিমালা। তার রূপ নেই, যদিও বিদ্যা আর সাহস রয়েছে। বৃত্তটা এখনও মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের। তবে মনে হয়েছে দেশের নিচতলার মানুষের আসার পথ করে দিয়েছেন লেখক। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কিংবা 'চার অধ্যায়' এর মতো ধারালো সংলাপ এসেছে একই সময়ের প্রচণ্ড তাগিদেই নিশ্চয়। 'আগামীকাল' জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তার পূর্বসূরী 'পথের দাবী' এবং সমসাময়িক 'বিপ্রদাস'কে ছাড়িয়ে যাবার একটা প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসের নামও লক্ষণীয়। স্বদেশীয়ানার ব্যাপার নিয়ে লেখা 'জাগরণ' উপন্যাসকে 'আগামীকাল' এর কাছে অত্যন্ত মামুলি মনে হয়। 'আগামীকাল' হয়তো তিরিশের দশকের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা'র মহাকাব্যিকতার ধারায় আরেকটা দিককে সামনে আনতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি বলে আক্ষেপ করার কোন অর্থ হয় না। 'আগামীকাল' তার খণ্ড মুকুরেই একালকে ধরেছে তার সম্ভাবনা সমেত। এখানে আমরা সম্ভাবনাকেই বড় করে দেখবো। এতে একই সঙ্গে আমরা এই উপন্যাসটিকে 'শেষ প্রশ্ন' কিংবা 'দেনা-পাওনার' সঙ্গে একত্রিত করে একালটাকে বুঝতে চেষ্টা করেবা।

৩

শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু লেখা রয়েছে যেগুলি গীতিকাব্যিক নিঃসন্দেহে। ভাববাদের অবকাশ রয়েছে, এমন লেখা তিনি লিখেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বিরাজ বৌ', 'বিলাসী' এবং 'মন্দির' এর নাম করা যেতে পারে। এরা প্রত্যেকেই দুটি হৃদয়ের গদ্যসঙ্গীত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতোই এরা নিদারুণভাবে বিয়োগান্তক। বাংলার বৈষ্ণবকাব্য শরৎচন্দ্রের মনে গভীরভাবে কাজ করেছে জনমানসে এই কাব্যের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী প্রবাহের যুক্তিতে। 'শ্রীকান্ত' চুতর্থ পর্বে 'কমললতাকে' তিনি এঁকেছেন মমতায় অভিষিক্ত করে। তিনি বলেছেন, "আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান ইত্যাদি।" শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির ঐশ্বর্যের একটা অংশ এই গীতি কাব্যিকতা। কিন্তু শরৎচন্দ্র একালের ব্যাপক গণ-অভ্যুদয়ের ধারাগুলিকে তাঁর লেখায় প্রতিফলিত করতে গিয়ে মহাকাব্যিক রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনাতে কিন্তু তাঁর গীতিকাব্যিক উপন্যাস বা গল্পের ধারা প্রতিবন্ধকতা করেনি। এর কারণ 'বিরাজ 'বৌ' 'আলো ও ছায়া' এবং 'মন্দির' এর মতো একান্তভাবে দুটি হৃদয়ের কাহিনীগুলিও ধ্রুপদী বাস্তবতার ছাঁচে ঢালা।

এই বাস্তবতার ছাঁচ তৈরি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে পরিশ্রমসাধ্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে এ ক্ষেত্রে মাধুর্য ও বিদ্রোহের সমন্বয় ঘটাতে সাহায্য করেছেন।

''আলো ও ছায়া' গল্পটির আখ্যানটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার বড়লোকের ছেলে, পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় এম. এ. পাশ করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিল। সে বৃন্দাবন বেড়াতে গিয়ে সেখানে বৈষ্ণবী কন্যা কিশোরী সুরমাকে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে 'কিনে' নিয়ে এসেছিল অর্থাৎ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল। কলকাতার বাসায় দুজনের নিভৃত সংসার। সুরমা বিধবা। অন্তর্বাধার দরুণ তারা স্বামী-স্ত্রী হতে পারল না। সুতরাং যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখতে বের হন।

এই মেয়ে দেখার ব্যাপারটা কল্লোল গোষ্ঠীর যে কোন ডাকসাইটে বাস্তববাদী লেখকের সঙ্গে যেন পাল্লা দেয়ার মত করে লেখা।

মেয়েটি মিত্তির মশাই এর রাধুনির মেয়ে। "যজ্ঞদত্ত বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরনে দেশি কাপড়, কিন্তু অনেক ধোপপড়া সুতাগুলি মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে বেলোয়ারী চুড়ি এবং একজোড়া পাক দেওয়া তামার মত রং এর সোনার বালা। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্যন্ত চিক চিক করিতেছে, ব্রহ্মতালুর উপর শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে।"

এখানে মাধুর্য ও রূঢ়তার মিশ্রণের মধ্যে যে কথাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা গিয়াছে, সেটা সাধারণ সামান্যা নারীর রজনীগন্ধা রূপ। শরৎচন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য একটা সামাজিক বিস্ফোরণের ভিতরকার বারুদটাকে চিহ্নিত করা।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে জাতপাত ভেদ করে একেবারে সামান্য মেয়েদের দিয়েই যেভাবে উচ্চাঙ্গের দর্শনের বক্তব্য পর্যন্ত বলিয়েছেন, তাতে শরৎচন্দ্র বিশ শতকের বাংলার সবচেয়ে বড় বিদ্রোহীদের একজন হয়ে উঠেছেন।

শরৎচন্দ্র উপন্যাসে নিচতলার কোন পুরুষকে পুরোপুরিভাবে মূল বক্তব্যের প্রবক্তা হিসেবে সামনে না আনলেও অসংখ্য নারীকে কাহিনীর প্রধান প্রবক্তা করেছেন। পুরোপুরি উপস্থিত না করার কথাটা আসছে এই জন্যে যে, বহু বিক্ষিপ্ত বক্তব্য এসেছে বিদ্রোহী পুরুষ চরিত্র মারফত। যেমন, দেনা পাওনা উপন্যাসে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক প্রজাদের বিদ্রোহে নায়িকা ষোড়শী'র সহায় পীর সাহেবের চরিত্রটি। এই পীর সাহেব ষোড়শীর প্রধান উপদেষ্টা। প্রথমত: নারী প্রবক্তা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, নারীরা সাধারণভাবে শ্রেণী নির্বিশেষে নির্যাতিত হয়ে এসেছে। সেই হিসেবে শরৎচন্দ্র শ্রেণী নির্বিশেষে নারীর মুখ থেকে জগৎকে বদলাবার মৌল তাগিদ জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, শরৎচন্দ্র এই নারীদের মধ্যেই আবার একেবারে নিচুতলার অথবা অতি সামান্য নারীদের বড় করে এনেছেন। তাদের দিয়ে অথবা তাদের পক্ষ হয়ে নিজে নবজীবনের জন্যে বক্তব্য রেখেছেন। কখনও অত্যন্ত কর্কশভাবে এসেছে এই বক্তব্য। কখনও এসেছে কৌতুক বা বিদ্রূপ বা আয়রনির আশ্রয়ে। চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী ও সাবিত্রীকে দিয়ে শরৎচন্দ্র যে সব কথা বলিয়েছেন, তাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন কিংবা তারও আগেকার পাঠক-পাঠিকাদের সমাজের আঁতে ঘা মেরেছিলেন তিনি। এগুলোকে অনেকের মনে হয়েছিল-"মেয়েলোকের মুখে পণ্ডিতী কথা" দিয়ে এক ধরনের আদিখ্যেতা। কিন্তু তবু 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে নিটোল উপন্যাস আঙ্গিকের দিক দিয়ে, চিন্তার দিক দিয়ে। সেই সময়টা নিস্তরঙ্গ ছিল বলেই শরৎচন্দ্র সমস্ত দিক দিয়ে গুছিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পরে 'পথের দাবী' উপন্যাসটিও গোছানো, যদিও গণঅভ্যুত্থানের মুখে এটি লেখা। কিন্তু আরও পরে বিশের দশকের শেষের দিকে এবং তিরিশের দশকে এত অসংখ্য ঘটনা তাঁর চারদিকে ভিড় করে এসেছিল যে, তিনি গুছিয়ে উঠতে পারেন নি। 'শেষ প্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়', 'বিপ্রদাস', 'আগামীকাল' (আরদ্ধ) উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের নারী প্রবক্তারা তাদের বক্তব্যগুলিকে নিয়ে যেন একটা ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' দিয়েছে কমলকে, 'শেষের পরিচয়' সারদাকে এবং 'আগামীকাল' মণিমালাকে, শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব) দিয়েছে 'কমললতা'কে। এরা ঝড়ের খেয়ার যাত্রী। শরৎচন্দ্রের লেখায় এদের সংখ্যাধিক্য তথাকথিত রক্ষণশীলতাপ্রবণদের তুলনায় অনেক বেশি ভারী।

শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে শরৎচন্দ্র একান্ত বাস্তব একটি চরিত্র হিসেবেই উপস্থিত করেছেন জীবনের সমগ্র সত্যের অংশ হিসেবে। কিন্তু শ্রীকান্ত 'অন্নদা দিদি' থেকে শুরু করে 'অভয়া' হয়ে কমললতাকে দেখেছে, যারা রক্ষণশীলতার গণ্ডির ধরাছোঁয়ার বাইরে বৈপ্লবিক মূল্যবোধের একেকটি ছন্নছাড়া প্রতীক।

শরৎচন্দ্র এদের মধ্যেও নিয়ে এসেছেন মাধুর্যকে, যে মাধুর্যের প্রতীক একদিকে স্বৈরিণী রাজলক্ষ্মী এবং অন্যান্য ঘরণীরা। বস্তুতপক্ষে মাধুর্যকে বিশ শতকের ভাঙ্গা

গড়ার সবচেয়ে অগ্রসর বিপ্লবপন্থীরা তথা মার্কসবাদীরা বাদ দেয়ার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে পুঁজিবাদী সাম্যাজ্যবাদী বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিকরা যতই উল্টো কথা বলুক না কেন, অথবা মার্কসবাদীদের নিজেদের মনেও নানা সময়ে যতই বিভ্রান্ত চিন্তা গজিয়ে থাকুক না কেন, মার্কস যে "সবার উপরে মানুষ সত্য'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই তাত্ত্বিক দিকদর্শন ইদানিং স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। হাঙ্গেরির কমিউনিস্টি তাত্ত্বিক লুকাচ প্রমুখের লেখা একটি দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্রের লেখার মাধুর্যের উপাদানগুলি বৈপ্লবিক নব বিশ্ব প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক উপাদানই থাকছে। এই সঙ্গে যোগ হয়েছে এবং প্রবল হয়েছে কর্কশ উপাদান। এদের প্রবলতা অপরিহার্য। কারণ "গড়ার জন্যে ভাঙ্গা" হলেও ভাঙ্গার প্রেক্ষিতটা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। শরৎচন্দ্রের শেষের দিকের উপন্যাসমালার প্রধান নারী চরিত্রগুলি এই ভাঙ্গনের প্রবক্তা। রজনীগন্ধার মত এই নারী চরিত্রগুলি যেমন একই গুচ্ছের ফুল, তেমনি স্বাতন্ত্র্যেও এরা ঋজু।

৪

শরৎচন্দ্র তার বিলাসী গল্পটিকে যেখানে এনে শেষ করেছিলেন, সেটি প্রথম পর্বের লেখা বলেই বিশেষভাবে অর্থবহ। ভবিষ্যতে কি আসছে তার আভাস। শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "বিলাসীকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু, গৃহস্থ ও সাধ্বী গৃহিণী- অক্ষয় সতীলোক তাহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়তো আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়তো নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' এরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড় লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু'এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।"

শরৎচন্দ্র বিলাসীর লেখক হওয়ার দরুন বক্তব্যকে শিল্পসম্মত রাখার তাগিদে বিদ্রুপের আশ্রয় নিয়েছেন। যেখানে সরাসরি উপন্যাসের চরিত্র কথা বলেছে, সেখানে অচলায়তনের উপর এসেছে সরাসরি হাতুড়ির আঘাত। 'বামুনের মেয়ে'তে ঠাকুরমা ও নাতনী সন্ধ্যার আলাপ একটি দৃষ্টান্ত :

"সন্ধ্যা–কিন্তু যে জিনিসটার এত সম্মান, এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসছে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াটা ভাল?

ঠাকুরমা-কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সেই মরে।"

ঠিক একই কথা 'পথের দাবী'র মহাবিপ্লবী সব্যসাচী বলেছে ভারতীর কথার জবাব দিতে গিয়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, কথাটা বুড়ি ঠাকুরমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসাকে একটা বড় ঘটনা বলে বোঝাতে দ্বিধা করেন নি শরৎচন্দ্র।

চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী সাহিত্যের সত্যের ওপর রায় দিতে পেরেছিল একই ধরনের জোরে। চরিত্রহীন রচয়িতা কিরণবালাকে মোহময়ী হিসেবে অঘটন-ঘটন পটিয়সী করার সঙ্গে সুস্থির যুক্তিতে স্বয়ংসিদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দৃষ্টান্ত:

"কিরণময়ী-বিশ্বচরাচরের যে দিকে খুশী চেয়ে দেখো, ওই এক কথা ঠাকুরপো, সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্যেই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে এর প্রতি অনুপরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল, আরও উন্নত হবে এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে অদৃশ্যে, অন্তরে বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্তন এবং এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায় জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোনমতেই থামতে পারে না।

দিবাকর–তাহলে ত চারিদিকেই মারামারি কাটাকাটি বেধে যেত!

কিরণময়ী–মাঝে মাঝে যায় বৈ কি। কিন্তু মানুষের লোভ দম করার শক্তি, স্বার্থ ত্যাগের শক্তি, সমাজের শাসনশক্তি, এতগুলো বিরুদ্ধ শক্তি আছে বলেই চতুর্দিকে একসঙ্গে আগুন ধরে যেতে পায় না। অথচ, এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল যখন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসনই মানত না। রূপের আকর্ষণে তার সেই দুর্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম একেই শৌখিন কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরি হয়।

দিবাকর–কোথায় পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না আর কোথায় স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণ। যে লোক পশুর প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, সে শুদ্ধ নির্মল পবিত্র প্রণয়ের কতটুকু মর্যাদা বোঝে? এ বস্তু সে পাবে কোথায়? তুমি কিসের সঙ্গে কার তুলনা দিচ্ছ বৌদি।

কিরণময়ী–তুলনা দিইনি ভাই, দুটো যে একই জিনিস, তাই শুধু বলচি। ঠাকুরপো, ইঞ্জিনের যে জিনিসটা তাকে সুমুখে ঠেলে সে জিনিসটাই তাকে পিছনে ঠেলতে পারে, অপরে পারে না। যে ভালবাসতে পারে, সেই কেবল সুন্দর অসুন্দর সব ভালবাসাতেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, অপরে পারে না। গোবিন্দলাল এমনি ভালবাসেছে।"

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর পক্ষেই উপনিষদকে উপন্যাস বলা সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যের বাস্তবতার ওপর আরেকটি কিরণময়ী দিবাকর সংলাপ উল্লেখযোগ্য:

"কিরণময়ী–যা নিজে বোঝ না, তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা করো না। যা চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না। এ সংসারে যে দুচারজন হতভাগ্যের এই নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যকার অধিকার জন্মায়, এগুরুভার তাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কাজে মন দাও, তাতে কাজও হয়ত হয়, অকাজও কমে। অনর্থক ছাতের কোণে মুখ ভারি করে বসে কল্পনা করে লাভ হবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি। গিল্টি দিয়ে তোমার মত আনাড়ীকেই ভোলাতে পারবে, কিন্তু যে লোক পুড়ে পুড়ে সোনার রং চিনেচে, এ দুঃকের কারবারে যার ভরাডুবি হয়ে গেছে, তাকে ফাঁকি দেবে কি করে?

দিবাকর-কল্পনা কি কিছুই নয়? .

কিরণময়ী–কিছুই নয় একথা বলিনে, কিন্তু নিছক কল্পনা গড়তেও যদি বা পারে, প্রাণ দিতে পারে না, বইতে পারে, পথ দেখাতে পারে না। সেই পথ দেখাবার আলোর সন্ধান তুমি যতদিন না পাচ্চ ততদিন তোমার বৃশ্চিক শুধু তোমাকেই দংশন করবে, আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারবে না।"

নৈয়ায়িক স্বামী হারানের কাছ থেকে কিরণময়ী কৈশোরে ও যৌবনের সূচনায় বৈজ্ঞানিক দর্শনের কথা জেনেছিল। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাকে উপগ্রহ করে রাখেননি, তাকে বরং সবিতা করেছেন। কিরণময়ী দিবাকরকে যা শুনিয়েছে, তাতে সে বার বার বলেছে, "আমি একথা ভাবি, আমি ও কথা ভাবি।" কিরণময়ী বিভ্রান্তি ও বির্পযয়ে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগলিনী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র শেষদৃশ্যে মৃত্যুমুখী উপেন্দ্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, কিরণময়ী এমন বুদ্ধিমতী নারী যে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারে না; সে আবার জাগবে। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে জাগিয়ে তুলেছেন তার তিরিশের দশকের উপন্যাসগুলিতে। যেমন 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের কমলের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসের শেষ কথা নায়িকা কমলের। দেশের কাজে উৎসর্গিত রাজেন একটা অগ্নিকাণ্ড থেকে এক দেব বিগ্রহকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আগুনে পুড়ে গিয়ে মরেছে। সবাই হায় হায় করছিল কিন্তু কেউ এগুচ্ছিল না। রাজেনই হলো উদ্ধারকর্তা কিন্তু তাকে মরতে হলো। এই খবর শুনে কমল বলেছে, "অজ্ঞানের বলি এইভাবেই হয়।" অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কমল এর আগে আরও অনেক কথা বলেছে। এটা তারই চূড়ান্ত।

বিশ শতকের বিশের দশকের প্রচণ্ড গণঅভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে যুগযুগান্ত ধরে চাপা পড়ে থাকা কোটি কোটি নরনারী সাময়িকভাবে হলেও যে আত্মপ্রকাশের একটা মাধ্যম পেয়েছিল তাতে নতুন মানবিক সম্পর্ক অথবা সামাজিক, জাগতিক, সাংসারিক বিন্যাসের যে অভ্যাস ও আস্বাদ পাওয়া গিয়েছিল, তাতে কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল কোটি কোটি মন। তিরিশের দশকে চলেছিল এর অনুরণন। বন্যার পর পলিমাটি। চল্লিশের দশকে আসে এ ব্যাপারে আরেকটা প্রচণ্ড প্রকাশের পর্ব যার মধ্যে আগেকার পর্বের ইতিবাচক উপাদানগুলি জায়গা করে নিয়েছিল। বিশের দশকে এরা চেতনার একটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস ঘটাতে পারেনি, অথচ একেবারে নিচতলার মানুষও সমকালীন

প্রশ্নগুলি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল। সুতরাং সেদিন চেতনার তুলনায় অবচেতনা এক্ষেত্রে বেশি উদ্যোগী হয়েছিল। অতি সামান্য ও সামান্যারাও সমসাময়িক প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে যে কথা বলেছে তাতে প্রত্যক্ষ সংযোগ পাওয়া গিয়েছে অবচেতনা ও বাস্তবতার মধ্যে। অবচেতনার স্তর ঠেলে বোধগুলি প্রকাশের ভাষা খুঁজেছে বলে মুখরতার প্রক্রিয়াটা হয়েছে বিস্ফোরণের ধরনের। অনেক ক্ষেত্রেই এরা এইজন্যে আলগা এবং অসংলগ্নভাবে সত্যার্থী সত্যাগ্রহী।

বাংলা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই অবচেতনার বিস্ফোরণকে ভাষা দেবার ব্যাপারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোন' দ্রষ্টব্য। শরৎচন্দ্র মনোশিল্পী ছিলেন বরাবরই। শরৎচন্দ্র মানুষের মনের ফলগুধারার মত শিল্পী হিসেবে যত পরিচিতি, বহিঃসংসার বা বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের শিল্পী হিসেবে ততটা হন নি। বস্তুতপক্ষে মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের কিনারা করতে চেয়েছেন তিনি শুরু থেকেই। তাঁর 'আলো ও ছায়া' গল্পটি এই দিক দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত। তাঁর আগেকার দুঃখ দিয়ে শেষ করা উপন্যাস ও ছোট গল্প মনোদুঃখের কাহিনী। 'চরিত্রহীন' এর আরেকটি দৃষ্টান্ত। মানবাত্মার ঝড়ঝঞ্ঝার যে ধারা শুরু হয়েছিল চরিত্রহীন উপন্যাসে, তার একটা অব্যাহত ধারা 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে রয়েছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসও এক ধরনের মনোময় উপাখ্যান। কিন্তু বিশ ও তিরিশের দশকের শরৎচন্দ্রের লেখায় যে মনস্তত্ত্বের অবতারণা সেটা একটা পরিবর্তিত ঘটনাও বটে। পরিবর্তনটা সমকালীন যুগের এবং যুগান্তর থেকে প্রসারিত আগামী দিনের যে প্রশ্নগুলিতে কোটি কোটি সাধারণ নরনারী জড়িত হয়ে ব্যাক্তিকভাবেও প্রত্যেকে তাতে সাড়া দিচ্ছে, সেই মানসিক ঘটনার চিত্রণ পদ্ধতি।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ধারণাতেই অবশ্য এই পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন। দুটো দৃষ্টান্ত :

১. 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে রাখালরাজ ও সারদার সংলাপ, 'রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে এমন প্রগল্‌ভা করিয়াছিল কিরূপে? সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন নিঃসংকোচে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, কিন্তু এদিন রাত্রিকাল নিরালা গ্রহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন–আজ বুদ্ধি শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোত পথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না।"

২. 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে হরেন্দ্র-কমল সংলাপ :

"হরেন্দ্র– হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনেবাজির মত এ যত চাচ্চি খুলতে তত যাচ্ছে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কূল কিনারা পাচ্চিনে। এ সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে

বললে হয় তো কিছু কিছু বুঝতে পারব। নইলে এভাবে ঘুমন্ত মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসিয়া বলল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

দু জনেরই।”

উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্তকে ফ্রয়েডিয় সূত্রে ফেলা যেতে পারে। বিশের এবং তিরিশের দশকে বাংলা লেখক লেখিকাদের চারদিকে যে ফ্রয়েডির আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব শরৎচন্দ্রের ওপর পড়ে থাকতে পারে। তবে শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রধানত কাজ করেছে বিশের দশকে সাধারণ নর-নারীদের মহাজাগরণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাদের অবচেতন মনে যুগান্তরের প্রশ্নের পর প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। এই সরাসরি যোগাযোগ অবশ্য মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত হয়েছে, গণঅভ্যুদয়ের পরের অবসাদে এবং প্রতিক্রিয়া-শীলদের পাল্টা চালে চাপা পড়েছে সাহিত্যের বিপ্লবী শিল্পরূপ সৃষ্টির তাগিদ। তবে এটা গণ অভ্যুদয়েরই কালান্তরের সূচনা। সুতরাং বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান আবার ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। এর শিল্পরূপের মুক্তধারা আগের চেয়ে আরও প্রসারিত হয়েই চলেছে। পুরানো এবং নতুন বিপ্লবী রূপকারদের যোগসূত্র পেয়েছে নতুনতর চেতনার তাগিদ। শরৎচন্দ্র এই চলমান যোগসূত্রের মধ্যে থাকছেন।

শরৎজিজ্ঞাসার সূত্র

১

শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য লেখার সম্যক ও গভীর বিচারে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় খোঁজখবর, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত টানার কাজে সহায়ক হতে পারে।

১. শরৎচন্দ্রের নিতান্ত ছড়ানো ধরনের উপন্যাসের বর্ণনাবিন্যাসে কিংবা পাত্রপাত্রীর অজস্র সংলাপে যে কখনো অতি-বিস্তারিত ও শিথিল এবং কখনো সংক্ষিপ্ত আঁটবাঁধুনির কথার ব্যবহার আছে, সেগুলোর কোন একটাও প্রক্ষিপ্ত বা আল্‌গা বা অতিরিক্ত নয় যদিও, নেতিনেতি বিচারে শাঁসটুকু নিয়ে বাদবাকী সবই ছিবড়ে বলে বিবেচিত হতে পারে। বিষয় ও চরিত্রচিত্রণে এই সবকথাই সমভাবে চড়াদামী ও দরকারী। কারণ শরৎচন্দ্র নরনারী ও তাদের বাঙ্ময় সংসার সমাজ বা পৃথিবী ও দেশের সামগ্রিক বাস্তববাদী উপন্যাসে লিখেছেন এবং এইসব উপন্যাসে যা কিছু এসেছে তা না এলেই চলতো না। অর্থাৎ এদের কাটছাট করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হতো না। তাঁর ছোটগল্পও এই সামগ্রিক বাস্তববাদী পদ্ধতিতে লেখা। উপন্যাসের বিস্তারিত উপকরণ থেকেই পাওয়া যায় তাঁর বাস্তববাদের পরিধি যে কত বড় সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা।

২. তাঁর নিবন্ধের ধরনের লেখার তো কথাই নেই, উপন্যাসেরও সাধারণ প্রবল ও সর্বময় স্বাবলম্বিতার অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন, তরল ও ঋজু, ললিত ও রূঢ়ের

শৈলী সমাবেশ। তাঁর লেখার একদিক দিয়ে মাধুর্যের যদিও অবধি নেই, তবু কথা ললিতবাণী নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনের অর্থের মধ্যে অর্থ বার করার জাঁতা বসিয়েছেন তিনি তাঁর উচ্ছল ভাবময় উপাখ্যানের পরতে পরতে। সহজ অভিজ্ঞানকে পরিহার না করেও যুক্তির জাল বুনতে কসুর করেননি। তাঁর লেখার ধারার মধ্যে তাই রয়েছে উপস্থাপিত ঘটনা ও সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত পরিষ্কার সিদ্ধান্তের অভাব এবং এই কারণেই দুই তিন চারটি মতের অন্তর্বিরোধ। তবে সত্যের লৌকিক কাব্যিক স্বতঃস্ফূর্ত সন্ধান এবং সত্যের মধ্যে তাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের জটিল আরোহনের আপাতবিরোধী বাক-বিন্যাসময় এমন একটি কৌশল জুড়তে পেরেছেন যে, সংখ্যা দর্শন নিয়ে উচ্চাঙ্গের শুকানো ব্যাখ্যাকে তরল প্রেমালাপ থেকে আলাদা করা যায় না।

৩. তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পের একটার পাশে আরেকটার মধ্যে কিংবা কোন একটি লেখাতেই অভ্যন্তরে বস্তু ও ভাবের উপাদান ও উপকরণের বহুবিধ বৈপরীত্য, বিরোধ ও উৎক্ষেপে তাঁর ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ আকীর্ণ। মাঝে মাঝে মনে হয় এইজন্যেই সুন্দর কুৎসিত প্রিয় এবং অপ্রিয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্টোপাল্টা করেছেন। প্রশ্ন জাগে, সংশয় জাগে, একটি সত্যের অভিমুখে যেতে কি তিনি অপারগ? গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, ঘটনাটা তা নয়। সমস্ত উৎক্ষেপের নিরাকরণ সাধন করে মানুষ তার মনুষ্যত্বের জয়যাত্রাপথে চলবে এই পর্যায় তাঁর অধিকাংশ লেখাতে সক্রিয়। এ এক ধরনের ভবিষ্যৎবাদ। পাঁক নিয়ে লেখাতেও পাঁক দাঁড়াতে পারেনি এই ভবিষ্যৎবাদের মন্থনে। একটা নবজীবন অথবা নবসমাজ ও নবপৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় তাঁর দুঃখ মৃত্যু ও অপঘাত দিয়ে শেষ করা লেখাগুলোও ঘেরা। এই আশাবাদী চিন্তা কখনো এত বেশি খোলাখুলি প্রচারক যে মনে হয় এসে পড়া গেছে এক গরম বিতর্কসভায়। আবার কখনো এই চিন্তাকে জাগানোর ব্যাপারে এত বেশি কুণ্ঠা যে মনে হয়, এ যেন আদিম বিশ্বাসীদের মধ্যে এসে পড়লাম। বিপরীতের মাঝখানে রয়েছে ধ্রুপদী উপন্যাসিকোচিত দুই একটি বিদ্রুপপ্রবণ মনোভাব, যা কখনো নিষ্ঠুর আবার কখনো সহানুভূতিতে আর্দ্র। বিশ্বাস বিদ্রূপের দংশনের দরুন পাঠকগণ সদাসচেতন থেকেছে।

৪. শরৎচন্দ্র এমন একটা যুগান্তরের এমন এক পর্যায়ের কথক যা তাঁর চারদিকে বাঙালি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একবারের জন্যে হলেও পরিবর্তনের চড়া আলোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। তখন পরিবর্তনের ভাঁজ খুলতে যদি বা সময় লাগছে, সর্বস্তরের চাপাপড়া সমস্ত ধরনের চরিত্রের মানুষের মুখ খুলতে বাধেনি। শরৎচন্দ্র বেশি বয়সে বড় বড় লেখা শুরু করার আগে কিংবা অল্পবয়সে লেখা বইগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়ার আগে যে যাযাবর জীবন যাপন করেছিলেন, তাতে তিনি বাঙালি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একেবারে সমাজের নিচতলাগুলোতে বসে তাঁর চিন্তার বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। এই কারণেই যখন তারা একসঙ্গে কথা বলে উঠেছিল, তখন শরৎচন্দ্র অবলিলাক্রমে তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি এদের সমস্ত কথার জন্যে জায়গা করে দিতে প্রস্তুত থাকতে পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ও ছোট গল্পে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের একই সঙ্গে ছড়াছড়ি। বস্তুতপক্ষে একটা গণযুগান্তর তাঁর লেখায় মুখর হয়েছে। এই যুগান্তর বিপ্লবী বিংশ শতাব্দীর সেই পর্বের উন্মোচন, যেখানে পরাধীনেরা

হতে চলেছে স্বাধীন এবং শ্রমজীবীরা হতে চলেছে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্ণধার। তবে একান্তভাবে যে বাঙালি সমাজের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং যে বাঙালি সমাজের বাইরের লোককে নিয়ে তিনি কদাচিৎ মাথা ঘামিয়েছেন, সেখানে তাঁর সমসাময়িককালে যা নিয়ে স্বাধীনতা আর নতুন সমাজ গড়া হচ্ছিল সেই উপকরণগুলি ছিল কাঁচা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র যে যুগান্তর নিয়ে কাজ করেছেন, সেটা বাস্তব উপকরণে সীমিত, যদিও স্বপ্নে বা কল্পনায় অথবা আকাঙ্ক্ষায় সীমাভেদী। বাস্তববাদী ধ্রুপদী উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র হয়তো এই কারণেই মাঝে মাঝে রাশ টেনেছেন আকাঙ্ক্ষার এবং রাশ টানতে গিয়ে যাদের এগিয়ে যেতে দিয়েছেন তাদের কিছুটা পিছনেও টানতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত 'বিপ্রদাস'। তাছাড়া, একেবারে নিচুতলার নরনারী বিপ্লবী টানাপোড়েনের মন্থনে মন্থিত হয়ে মুখের কোন বাঁধন না মেনে বিশেষ করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি তাদের বৈরিতাকে প্রখর জ্বালা দিয়ে প্রকাশ করলেও সংজ্ঞা এসেছে সেইসব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নরনারীর মুখ থেকে যারা তাদের শ্রেণীগত নাড়ি-বন্ধনকে কাটতে পারেনি। তাবে তারা উপরতলা এবং নিচতলার মাঝখানে বেশ নিচুতে, মাঝতলা এবং উপরতলার সঙ্গে এদের যোগ কম। নিচতলার সঙ্গে যোগ বেশি। এই জন্যে এই মাঝতলার কথায় নিচতলার কথা ভিড় করে ঢুকেছে।

৫. শরৎচন্দ্র বাঙালি সমাজের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকলেও এবং তাঁর লেখা বাঙালির মর্মকথা হলেও তিনি কিন্তু তাঁর দৃষ্টিকে এর মধ্যে আটকে রাখেননি। যেহেতু, বিপ্লবী বিশ শতকের স্বাধীনতা আর সাম্যবাদের লক্ষ্য নিয়ে গণঅভ্যুত্থান একটা পৃথিবীজোড়া ঘটনা, সেজন্যে বাঙালি সমাজের পরিবর্তন যুক্ত হয়ে গিয়েছে বিশ্ববিপ্লবী আন্তর্জাতিকতায়। শরৎচন্দ্র এই আন্তর্জাতিকতারও কথক হয়েছেন তাঁর একাধিক লেখায়।

২

প্রথম প্রতিপাদ্যটিকে দৃষ্টান্ত দ্বারা খতিয়ে দেখলে শরৎচন্দ্রের লেখার সমগ্রমুখিতার ধারাটাকে বুঝতে পারা যায়। এ বিষয়ে 'দেনাপাওনা' আর 'দেবদাস' থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দাখিল করে দেখা যাক এরা কতটা বলতে পারে।

'দেনাপাওনা'তে ষোড়শী ভৈরবী এবং জমিদার জীবানন্দের সংঘাত ও প্রণয়ের কাহিনী নিয়ে যে চমকপ্রদ ঘটনাবহুল বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে তার একটা অপেক্ষাকৃত ও নিচু পর্দার ফাঁকে দেখা যায়, যারা সাধারণত ডাকাতি করে খায় এমন দুজন গ্রামীণ মানুষ ষোড়শীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জমিদারের বিরুদ্ধে তার সংঘাতপর্বে। ষোড়শীর চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকারে এই দুটি মানুষ এমন এক সমুন্নত আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে উপন্যাসের বিশালতা পেয়েছে সার্থকতা। ষোড়শীর মনশ্চক্ষে এদের ছবি, "হোক ইহারা অন্ত্যজ, হোক ইহারা দস্যু যতক্ষণ দেখা গেল শুদ্ধ বিস্ময়ে এই হীনবীর্য অপমানিত, অধঃপতিত-বাংলাদেশের এই দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষদিগের দিকে সে চাহিয়া রহিল।"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসটিতে এদের হঠাৎ আনেন নি এবং উপরোক্ত বক্তব্যও আলগাভাবে আসেনি। 'দেনাপাওনা'র কাহিনীটিকে কিছুটা বাড়িয়েছেন তিনি এদের

কথা বসাবার জন্যে। এই দুটি মানুষ যে আদিম ঐতিহাসিক পশ্চাদপদতার কারণে ষোড়শী ভৈরবীকে মাতৃরূপে দেখে যাবে, সেকথাও চাপা দেননি তিনি। এরা একটা প্রাচীন প্রথার সেবায়েত। কিন্তু ষোড়শী এদের মধ্যেই দেখতে পেয়েছে অবক্ষয়ী বাঙালি সমাজের অক্ষয় সত্তাকে।

হয়তো এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে যে, ষোড়শীর চোখ শরৎচন্দ্রের চোখ। এই কথাটাকে মেনে নিয়ে আরও কিছুটা বাড়িয়ে বললে আমরা আমাদের প্রথম প্রতিপাদ্যের সত্যে পৌঁছাতে পারি। বাস্তববাদী উপন্যাসে প্রেমের কাহিনী লিখতে গিয়ে সমগ্রের কথক যে দৃষ্টিতে দেখেন এ হচ্ছে সেই দৃষ্টি। ষোড়শী ও জীবনানন্দের একান্ত দুজনের অন্তরঙ্গতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন না করেই অবশ্য এই দৃষ্টির বিস্তারণ ঘটেছে। একটা আরেকটাকে নাকচ করেনি।

প্রায় একই ধরনে ঘটনা 'দেবদাস' উপন্যাসেও ঘটেছে। চন্দ্রমুখী দেবদাসের প্রেমে পড়ে বেশ্যাবৃত্তির বাইরে একটা নতুন জীবনের ইঙ্গিত পেয়ে কলকাতা ছেড়ে অশ্বত্থঝুরি গ্রামে বাসা বেঁধেছিল অন্ত্যজদের মধ্যে। এখানে থাকতেই সে জানতে পারলো, দেবদাস একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছে। দেবাদাসকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নেবার সঙ্কল্প করে সে আবার কলকাতা রওনা হলো তাকে সেখানে ধরার জন্যে। এই রওনা হবার সময় 'দেবদাস' উপন্যাসের কয়েকটা লাইন:

"গাড়িতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া উঠিবার সময় পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখিতে আসিল, দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর নিজের চোখেও জল ধরে না। ছাই কলিকাতা। দেবদাসের জন্য না হইলে কলিকাতার রাণীগিরি পাইবার জন্যও চন্দ্রমুখী এত ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিত না।"

এখানে প্রশ্ন। এই লাইনটিকে সরিয়ে রেখে কি চন্দ্রমুখীর চরিত্র-বিচার সম্পূর্ণ হয়? শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের পটভূমির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়? এবং সর্বোপরি জিজ্ঞাসা, এই লাইনটিকে সরিয়ে রাখলে কি শরৎচন্দ্রের পরিচয় অসমাপ্ত থাকে না? এই প্রসঙ্গেই 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র তাঁর এই বইটিতে এমন ধরনের নায়ক নায়িকা বেছে নিয়েছেন যারা কণ্ঠিবদল করে বিয়ে করেছে। বাংলাকাব্যে এবং উপন্যাসে এই ধরনের নায়ক নায়িকা প্রধানত বিরহ মিলনের মধুর রসই জুগিয়ে থাকে। শরৎচন্দ্র তাই প্রথানুযায়ী শুরুও করেছিলেন বহু পরিচিত বোষ্টম বোষ্টমীর হৃদয়বৃত্তির কাব্যিক উপাদান নিয়ে। কিন্তু তিনি এখানে এমন একজন বোষ্টমীর কাহিনী লিখলেন, যে নিজের চারধারে একটা নতুন পরিবেশ গড়ে তুলে তার মধ্যে থেকে নিজেকেও নতুন করে গড়ে ফেলেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ লেখায় যে প্রেম ও বাৎসল্যের মধুর ছবি এঁকেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়েছেন, তিনি 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন বৈষ্ণব-ভাবের বিপরীত ভাব। এনেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক কার্যক্রম। এনেছেন শ্রেণীসংগ্রামের একটা কড়া ঝাঁজ।

এই যে ভাবের ঘোরের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বস্তুময়তা এবং এই যে প্রেমের কাহিনীতে সমাজ সংসার দেশ ও পৃথিবী এবং সাধারণ মানুষ নিয়ে টানাহেঁচড়া করা,

এই ঘটনাটা অবশ্য ধ্রুপদী বাস্তববাদী উপন্যাসের বিশিষ্টতা। শরৎচন্দ্রের আগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উপন্যাসে এই ধরনের ঘটনা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সুবিধা হয়েছিল এতে সামগ্রিক জীবসত্যকে উপন্যাসের পরিধির মধ্যে ধরার পদ্ধতি আয়ত্ত করার। ঋণী তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, পূর্বসুরীদের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তিনি তার চেয়ে আরও বেশি কিছু সংগ্রহ করে আরও বেশি রাসায়নিকতা দিয়ে কাহিনী সাজাতে পেরেছেন। এখানে নতুন কাল তাঁকে নতুন উপকরণ ও সম্ভাবনা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের উল্লেখ না করাই সঙ্গত। কারণ, এর প্রথম পর্বের প্রথম অংশে এমন সব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে শ্রীকান্ত চরিত্রের ছাঁচ তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রেমের উপাখ্যান চার পর্বের শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেও প্রথম পর্বের প্রথম অংশের তৈরি ছাঁচের শ্রীকান্ত বারংবার মূল উপন্যাসের বাইরে পা রেখেছে এবং এটা এই কারণেই মূল উপন্যাসকে জখম করে না।

এই জন্যেই যে ধরনের উপন্যাসে প্রেমের উপাখ্যান মূলভিত্তি এবং একটা আবেগের ঘোর যেখানে সমস্ত কাহিনীটাকে ঘিরে থাকতে চায়, তাদেরই রাখা উচিত আমাদের প্রথম বিষয়ের বৃত্তে। এদিক থেকে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। তিনটি চরিত্রের একান্ত ঘরোয়া পরিবেশের সম্পর্ক ও বিকাশ এই উপন্যাসে যে ঝড়ের সৃষ্টি করেছে, তাতে একদিকে ঘর পুড়েছে ঠিকই, কিন্তু বৃহত্তর পটভূমি যে দেশ তার ওপর থেকে একটা যবনিকা উঠে যায়না কি এর ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে?

প্রশ্ন হতে পারে, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস কিংবা এমনকি 'পথের দাবী'তেও মহামারীর শঙ্কা ও আশঙ্কার যে ছবি আছে তা 'গৃহদাহ' উপন্যাসে শুধু সুরেশের মৃত্যুর কারণ হিসেবেই আসতে পারতো, এর ব্যাপক ধ্রুপদী বিস্তারণের প্রয়োজন ছিল কি?

এর উত্তর এখানেই শরৎচন্দ্রের লেখার বিশেষত্ব। তিনি শুধু কয়েকটি মানব মানবীর কাহিনী লেখেননি। তিনি মানব কাহিনী লিখেছেন, নায়ক-নায়িকার মানববৃত্তকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, বস্তুময় ও জনবহুল সংসার পৃথিবী ও দেশের যাবতীয় উপকরণ এই বৃত্তের মধ্যে ভিড় করে ঢুকতে চেয়েছে। শরৎচন্দ্র কখনো অতিমাত্রায় পরিমিতি সচেতেন হয়েছেন, কখনো বা পরিমিতির তোয়াক্কা করেননি। বাহুল্য উঠছে সত্যের তাগিদে।

৩

আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্যটি শিল্পরূপসংক্রান্ত।

শরৎচন্দ্র যখন তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যজগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক এবং যখন পাঠক-পাঠিকারা তিনি যা লিখেছেন তাই নির্বিচারে নিয়েছেন, তখন এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে, শরৎচন্দ্র পাঠক-পাঠিকার মন রেখে কান্নাগদগদ অথবা মিষ্টি মিষ্টি কথা লিখেছেন। অর্থাৎ যে ভাবে লিখলে গরিষ্ঠসংখ্যক পাঠক-পাঠিকা নির্বিচারে তাঁর বইকে নেবে, সেভাবেই চিন্তা করে একটা গড়পড়তা বর্ষার জলস্রোতের মতো সহজ বাকবিন্যাস করেছেন। সমসাময়িক কালেরই শেষের

দিকে যারা শরৎচন্দ্রের ধারা থেকে ভিন্ন ধরনের লেখা লিখেছিলেন তাঁরা জনপ্রিয়তার চাবীকাঠিটা তখন পর্যন্ত হাতে পাননি। একটা লঘু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল এই জনপ্রিয়তার প্রশ্নকে ঘিরে। ভিন্ন ধারার লেখকদের একাংশের তরফ থেকে একটা অভিযোগ উঠেছিল, শরৎচন্দ্র একটা কান্নাগদগদ মিষ্টিমিষ্টি মনরাখা শৈলীর শিল্পী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শৈলীর ঘটনাটা কিন্তু এমন ছিলনা। তাঁর বাক্‌সজ্জা গড়পড়তা কোন ব্যাপার নয়, মনরাখার লেখাও নয়, ললিতবাণীও নয়। তিনি সাহিত্যের সংজ্ঞা বিচারে ছিলেন বিদ্যুৎজ্বালাতে আঘাত দিয়ে চিকিৎসা করার পন্থী। দৃষ্টান্ত 'শেষ প্রশ্ন' এবং 'চরিত্রহীন'।

'শেষ প্রশ্ন' প্রায় শেষের দিকে লেখা, আর 'চরিত্রহীন' প্রায় প্রথম দিকের, যদিও মুসাবিদাটি একবার আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর স্মৃতি ঝালিয়ে মাঝামাঝি সময়ে লেখা এবং ছাপতে দেয়া। দুটি বইএর পেছনেই রয়েছে লেখার শৈলীর সচেতন ব্যবহার।

শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্ন' লিখেছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে সত্যিকার আধুনিক সাহিত্য কি হতে পারে তার পরিচয় দেবার জন্যেও। অন্যান্য কারণ ছাড়াও তিনি 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি লিখেছিলেন সত্য সাহিত্য হিসেবে। বস্তুতপক্ষে দুটি উপন্যাসেই রয়েছে শিল্পরূপ নিয়ে বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যেরই প্রয়োগ রয়েছে দুটি উপন্যাসেই।

শেষ প্রশ্ন একদিন যখন নারী ছিলাম নামের একটি আধুনিক বাস্তববাদী ফরাসি গল্প নিয়ে যে জৈবমানবিক প্রশ্নের খোলা আলোচনা রয়েছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের নির্মিত ও মালমসলার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র গল্পটিকে একটি মানদণ্ড হিসেবে সামনে রেখেছেন। এই গল্পটিকে তিনি নাকচ করে দেননি। এবং এই প্রসঙ্গেই হয়তো আশা প্রকাশ করেছেন, শেষ প্রশ্নে আলোচিত নরনারীর জৈবমানবিক জীবনদর্শনকে তাঁর পাঠকপাঠিকারা খোলাখুলি তর্ক করেই বুঝে নেবেন। তর্ক-জমাবার জন্যে তিনি উপন্যাসটিতে সত্যসন্ধানের উদ্দেশ্যে তর্কের জাঁতা বসিয়েছেন।

তাঁর সত্যের অনুভব ও জ্ঞানকে কোমল কঠোর নির্বিশেষে সমস্ত পাঠক-পাঠিকার মনে সংক্রামিত করার বাকসজ্জার চৌম্বক পদ্ধতিও যে কী নিদারুণ দাহক হতে পারে, তার প্রমাণ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প। এতে তিনি করুণা বা লালিত্যের বাষ্পটুকুকেও থাকতে দেননি।

'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত যে রুক্ষতা সমস্ত কোমলতাকে চেটে খেয়ে ফেললো, এটা শিল্পীর কোন বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতির ফল নয়। এই লেখাগুলো এসেছে সেই একই শৈলী থেকে, যাকে শরৎচন্দ্র স্বরগ্রামের ছাঁচে গান ঢালার মতো সেধে নিয়ে নিরন্তর সাধনার মধ্য দিয়ে তৈরি করেছিলেন। সুখদুঃখ হাসিকান্না সন্তুষ্টি ক্ষোভ ভালবাসা ঘৃণা তৃপ্তি যন্ত্রণা করুণা ও ক্রোধ পূণ্য ও পাপ মিলনবিরহ এবং ভালমন্দ নিয়ে সংসার আর মানুষের চরিত্র ও সম্পর্কের মর্মকথা। এই সাধনাটাই তাঁর কৌশল, যা কড়ি আর কোমলকে ছিঁড়েখুড়ে যেতে দেয়নি দুদিক দুভাগ হয়ে তাঁর ছড়ানো ধরনের লেখায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে, তিনি তাঁর আত্মকথাকে বিচিত্র সুরে স্বরে বর্ণে খাদে ও উদাত্তে নানা লীলায় প্রকাশ করতে সক্ষমতা সম্বন্ধে যত না সচেতন রয়েছেন,

তার চেয়েও বেশি উদ্যোগী থেকেছেন সমসাময়িক বাঙালি সমাজের বহু নরনারীর মুখর হবার সাধনাকে সংহত করে দেখাতে।

শরৎচন্দ্রের এই সাধনা আত্মগত সাধনা ছিল। তাঁর উপরোক্ত সাধনা আত্মবিবরের অভ্যন্তরমুখী ছিল না। চারপর্বের শ্রীকান্ত এবিষয়ের উদাহরণ।

৪

আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য: শরৎচন্দ্রের লেখার বিষয়বস্তু ও ভাবের সজ্জায় যে নানা ধরনের বৈপরীত্য জাঁকিয়ে এবং গাঁজিয়ে উঠেছে, সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে একটি সত্যাভিমুখে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে চলেছেন এবং তাঁর লেখার মধ্যে এই দ্বন্দ্বের নিরাকরণ ঘটেছে একটি নতুন সমাজ ও জগৎ গড়ার ভবিষ্যৎবাদী প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াটা বিষয়বস্তু ও ভাবের বৈপরীত্যে যে কিভাবে শরৎচন্দ্রকে আকীর্ণ করেছে তার একটা দৃষ্টান্ত তাঁর সুন্দরের ধারণা ও বর্ণনা।

প্রেম ও প্রভাবের ক্ষেত্রে চলিত ধারণা অনুসারে কোন ব্যক্তি যে চৌম্বক শক্তির অধিকারী, তা হচ্ছে তার রূপ বা সৌন্দর্য। এই ধারণা থেকে শরৎচন্দ্র মুক্ত নন। রূপবতী এবং রূপবানেরাই যে অঘটন ঘটায় এবং 'রূপ লাগি ঝুরে মন'ই হচ্ছে সেই সাধারণ কাব্যিক চাবিকাঠি যা নিয়ে কলাশিল্পীদের কাজ করতে হয়, এই প্রত্যয়টিকে নিয়ে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করেছেন বলে মনে হয়। 'পথের দাবী'তে' সুমিতা, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিতে সাবিত্রী আর কিরণময়ী, 'শেষের পরিচয়' এ সবিতা আর সারদা, 'শেষ প্রশ্নে' কমলের প্রাথমিক আকর্ষণ হচ্ছে তাদের অনন্যসাধারণ রূপ। এদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক অসামান্যতার প্রধান উপাদান এদের রূপ। এদের রূপের আগুনে পুরুষ পতঙ্গেরা হয় পুড়েছে, নয়তো তার চারদিকে পাক খেয়েছে। শরৎচন্দ্র পুরুষের অনন্যসাধারণ রূপে আকৃষ্ট করিয়েছেন নারীকেও। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিতে সাবিত্রীর প্রণয়ী সতীশ এবং 'শেষ প্রশ্নে' কমলের স্বামী শিবনাথ এমনি অনল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখায় এর বিপরীতটাও জীবনের অপর মেরু হিসেবে সামনে এসেছে। রূপই একমাত্র অস্তিত্ব বা সত্য নয়, কারণ কুরূপ কুশ্রীদের নিয়ে পৃথিবী আর সংসার ঘুরছে। এক্ষেত্রে অবশ্য নারীর তুলনায় পুরুষরাই প্রচলিত সুন্দরের সংজ্ঞার বাইরের মানুষ। তবু এরা আকর্ষণ করে প্রভাব বিস্তার করে। এরা প্রধানত : কর্ম, বুদ্ধি বা বিদ্বৎরূপী। যেমন, শেষ প্রশ্নে অজিত, 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী, 'দত্তা'য় নরেন্দ্রনাথ, 'শেষ প্রশ্নে' রাজেন। এদের অধিকাংশের চেহারা একহারা বা দোহারা ধরনে। এই মেরুতে নায়িকা নারীদের ব্যবহারে মধু ও মাধুর্য। এরা কুশ্রীও হয়ে থাকতে পারে, এদের চেহারার কোন বৈশিষ্ট্যও না থাকতে পারে তবু এরা ঘটনা ঘটাচ্ছে, এরা নায়িকা। শরৎচন্দ্র এদের রূপের বর্ণনা দেবার প্রয়োজন রয়েছে বলে যেন মনেই করেন নি। এদের ব্যবহারে এদের পরিবেশে যে সুষমা, শরৎচন্দ্র তার ছবি এঁকেছেন যত্ন দিয়ে।

সৌন্দর্য বা রূপের মূল্যবাধ ও সংজ্ঞা শরৎচন্দ্রের লেখার উপরোক্ত অবস্থার দরুন কিছুটা গোলমেলে হতে বাধ্য। একটা বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব সাদা চোখেই ধরা পড়ে।

সামঞ্জস্যের আবরণ ফুঁড়ে বিরোধের কাঁটা বেরিয়ে আসে। সুতরাং সংসার, মানুষকে মেলাবেন কি করে এখানে শরৎচন্দ্র?

কিন্তু শরৎচন্দ্র মিলিয়েছেন মানুষকে দুটো মেরুতে তাদের অবস্থানকে সত্য বাস্তব বলে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করেও। একাজ তিনি করেছেন দুটো উপায়ে। প্রথমত: চেষ্টা করেছেন রূপবান ও রূপবতীদের শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন করে তুলতে যাতে রূপ আর টিকতে পারে নি। শেষ প্রশ্নে কমল, চরিত্রহীনের কিরণময়ী, শেষের পরিচয়ে সবিতা সেই জ্বালা হারিয়েছে যা তাদের স্থাপন করেছিল জীবনমঞ্চের কেন্দ্রে। এব্যাপারেও তাঁর বিপরীত সংজ্ঞা যে ধ্বসে পড়েছে তা নয়। কারণ, সাবিত্রী তার রূপ হারায় নি কোন অবস্থাতেই।

দ্বিতীয়ত, বিকার ও বিকৃতি থেকে মুক্ত যে ছবিটি দেশ ও সমাজ এবং মানুষ গড়ে ওঠার বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, সেই মনুষ্যত্বের দুরূহ কষ্টকর দুঃখময় সাধনার ছবিগুলোকে বারংবার কাহিনীর মধ্যমঞ্চে স্থাপন করে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন রূপ অরূপ ও বিরূপের বিরোধিতার মধ্যে মানুষের একটি বাঁচার মতো করে বাঁচার সত্যের প্রক্রিয়াকে সমস্ত দুঃখ ও যন্ত্রণার উপর জয়ী বলে নির্দিষ্ট করতে। এটাই তাঁর বর্তমানময় ভবিষ্যৎবাদ। এই জয়কে শরৎচন্দ্র কখনো অনিবার্য সম্ভাব্য হিসেবে বিস্ত ারিত ব্যবস্থা দ্বারা বোধগম্য করতে চেয়েছেন, কখনো শুধু ইঙ্গিতই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। 'পথের দাবী' উপন্যাস দার্শনিক ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত। আর 'অরক্ষণীয়া' দৃষ্টান্ত কাব্যিক ইঙ্গিতের।

বস্তু ও ভাবের এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখার অনেকটা দিকে যেখানে বৈপরীত্য একেবারে বিপরীত মেরুর, সেটা ঘর ও বাহিরের প্রেক্ষিত। শরৎচন্দ্রের দুই ধরনের উপন্যাসের মাঝখানে দুটো ধরনকে একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলাতে গিয়ে দেখা যায়, জীবনদর্শন আর মূল্যবোধ এখানে ঘর ও বাহিরের উভয়কেই বড় করে বসে আছে। অর্থাৎ একটা বিরোধের সৃষ্টি করে রেখেছে দুটোর মধ্যে। শেষ প্রশ্নের জীবনদর্শনে ঘরোয়া জীবনযাপন অকিঞ্চিৎকর বলে চিহ্নিত হলেও দেখা যায় সমস্ত ব্যাপারটাই পাক খাচ্ছে বৈঠকখানা, রন্ধন কক্ষ বা শয়ন কক্ষে। অপরদিকে শেষের পরিচয় উপন্যাসে রয়েছে ভেঙ্গে যাওয়া ঘরগুলোর তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ার মধ্যে ঘরের জন্যে ক্রন্দন। ঘর বড় না বাহির বড় এই দুই উপাদানের তুলনামূলক মূল্য-বিচার করা শরৎচন্দ্রের দুরূহ সমস্যা ছিল বলে মনে হয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এর একটা আত্মিক সমাধান তিনি দেননি। একটি একান্নবর্তী পরিবারের গৃহস্থালির মধ্যে যারা বাস বেঁধেছে, তাদের জন্যে তিনি যেমন চিন্তিত, তেমনি তিনি এই ধরনের বন্ধনের বাইরে অকূল পৃথিবীতে পদযাত্রীদের সম্পর্কের মধ্যে যে একটা সার্থকতা, তার কথাও ভেবেছেন। দুটো ভাবনাই ঘন হয়ে উঠেছে আষাঢ়ের মেঘের মতো তাঁর মূল্যবোধ।

এখানেও প্রশ্ন এবং সংশয় জাগা স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি ঘর বাহির দুটোকেই বড় করে বসে আছেন, সেহেতু এখানে তিনি মানুষকে একই জীবন দর্শনে মেলাবেন কি ভাবে? কিন্তু তাঁর মিলনসূত্রটি এখানেও ছিঁড়ে যায়নি। এই মিলনসূত্রটি মনুষ্যত্বের সাধনায় জয়ের সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়া। এই বিশ্বাসটিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন ঘর ও

বাহিরের পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসার জন্যে এদের উভয়ের কাছে কখনও একথা অত্যন্ত জোরালো তাগিদ রেখে, কখনো বা বিদ্রুপের সাহায্য নিয়ে প্রচ্ছন্ন তাগিদ বা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা। শরৎচন্দ্রের লেখার তৃতীয় আরেকটি বৈপরীত্য হলো প্রবৃত্তি ও চেতনা, দেহ ও মন বস্তুময় জগৎ ও ভাবময় ধ্যানের জগৎ এবং এদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নরনারীর আচরণের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ।

এখানে প্রধানত প্রবৃত্তি ও চেতনার কথাটাকেই যদি তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যায়, তাহলে প্রাথমিকভাবে মনে হবে, শরৎচন্দ্র উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভিতরে এই সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে ট্রাজেডি নাটকের বিষয়ের মতো নিরাকরণের আয়ত্তের বাইরে স্থাপন করেছেন। একারণেই কি তাঁর কোন কোন উপন্যাস জাত নাটকে রূপান্তরিত হয়ে যায় শুধু শব্দ সজ্জায় সামান্য হেরফের করে? অধিকাংশ লেখার প্রবৃত্তির কাছে যুক্তিকে হার মানিয়েছেন কি তিনি এই কারণেই? একাজটা তিনি করেছেন সম্পূর্ণ ফ্রয়েডিয় ভঙ্গিতে। চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়ে নরনারী ও সন্তান সৃষ্টি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন, সেগুলোর সঙ্গে মিল যদিও পাওয়া যায় বার্ণাড শ-রম্যান এণ্ড সুপারম্যান নাটকের কিছু বক্তব্যের, কিন্তু বার্ণার্ড শ-র মতো প্রবৃত্তির বরাত দিয়ে শরৎচন্দ্র চেতনার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন কি?

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র প্রবৃত্তি ও চেতনাকে পাশাপাশি প্রায় সমান শক্তি জুগিয়ে তাদের আওতার মধ্যে মানবমানবীর জীবন তাড়ানাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা নয়। এখানেও মনুষ্যত্বের সাধনার ঘটনাটাকে তিনি ঘটিয়েছেন। শেষ প্রশ্নে রাজেন চরিত্রটি যত নিরাসক্ত, তার প্রতি শরৎচন্দ্র তত নিরাসক্ত নন। এই রাজেন চরিত্রটি প্রবৃত্তি ও চেতনার সমান্তরাল ধারার একটি আকাঙ্ক্ষিত নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষের সম্ভাব্যতার তাগিদ। এখানেও শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাদ সক্রিয়। অবশ্য ভবিষ্যৎবাদী ইঙ্গিতটা এই উপন্যাসে বৈঠকী আলাপের কথার অপরিমিতিতে কিছুটা অবরুদ্ধ।

ভাব ও বস্তুর বৈপরীত্য বিষয়ে আরেকটি সমস্যারও উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি হচ্ছে শরৎচন্দ্র যে বহু নারীকে তার উপন্যাসে গল্পে এনেছেন, তাদের চরিত্রসম্পর্কীয়। যদিও একটা ধারণার সৃষ্টি হয়ে রয়েছে যে, শরৎচন্দ্র প্রধানত নারী চরিতকার এবং মধুর নারীচরিত্রের আলেখ্যকার, তবু প্রকৃত ঘটনা এই যে, মধুর ও বীভৎস দুই ধরনের নারী চরিত্রই তাঁর লেখার বৃত্তে জায়গা নিয়েছে।

ঘরের এবং ঘরের বাইরের এই দুই ধরনের নারী অথবা মাঝামাঝি নিয়ে তিন ধরনের নারী অথবা তিন ধরনের মিশ্রিত মানবীর কথাকে তিনি ললিতে কঠোরে উচ্চারিত করেছেন।

সুতরাং শরৎচন্দ্রের লেখায় যেমন নারীবন্দনা আছে, তেমনি নারী সম্বন্ধে খটকাও রয়েছে। যেখানে ভালমন্দ সৎ অসৎ সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, সেখানে শরৎচন্দ্রের লেখায় কার দিকে কতটা জোর পড়েছে তা ঠিক করা একটি সমস্যা। এটা স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যেখানে একই চরিত্রে তিন বা ততোধিক ধরনের মানুষের উপাদান মিলেমিশে এক হয়ে রয়েছে, সেখানেই শরৎচন্দ্র কথাকৈবল্যে আটকে

গিয়েছেন, এরকম একটা ধারণা টানা অস্বাভাবিক নয়। শরৎচন্দ্রকে যে মাঝে মাঝে গোঁজামিল দিয়ে হিসাব মেলাতে হয়নি, সে কথা বলা যায় না। সমসাময়িক চোখে যাই ধরা পড়ে থাকুক না কেন, ভবিষ্যতের চোখে অনেক পারিপাট্যও গোঁজামিল বলে ঠেকেছে নিশ্চয়।

কিন্তু এই বৈপরীত্যকে সমগ্র জীবনের নিরন্তর তাগিদে কাটিয়ে সত্যের অভিমুখী করে নারীর যে মূল চরিত্রসত্তা একসঙ্গে লক্ষকোটি নতুন মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া তাকে সামনে আনার জন্যেও শরৎচন্দ্র শ্রমী ছিলেন। এখানেও সেই একই মানুষ্যত্বের সাধনার ভবিষ্যৎবাদ কাজ করেছে।

বাঙালি সমাজে কালের সীমানা তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের বৃত্তে আটকে রাখায় তিনি এমন অনেক কথা তখন নারীর মনুষ্যত্ব নিয়ে তাঁর 'নারীর মূল্য' নিবন্ধে বলেছিলেন, যার একটা বড় অংশ ইংরেজ বুর্জোয়া মিল ও হাবার্ট স্পেন্সারের নারীসাম্য ধারণার বুর্জোয়া ধারায় প্রভাবিত ছিল এবং এই কারণে পরবর্তীকালে নারীর সামগ্রিক সমস্যার কিনারা করার উপযুক্ততা হারিয়েছে। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে সকল নারীর যে মানবিক পূর্ণ মর্যাদাময় মুক্তির ভবিষ্যৎবাণী আছে, তার কথা অথবা নারী সম্বন্ধে সাধারণভাবে মার্কসীয় ভাবধারা সে সময়ে বাঙালি সমাজে আলোচিত হয়নি। সুতরাং, নারীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সামগ্রিক বৈপ্লবিক চিন্তার কাছে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' নিবন্ধের বক্তব্য 'আপটুডেট' নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের একটা বিশেষত্ব এই যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক সমস্যার সমাধানের পথ করেছেন, যদিও সাধারণভাবে ভাব তখন পর্যন্ত পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। 'পথের দাবী' উপন্যাসটিতে এবিষয়ে তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এমন কিছু কথাবার্তা রয়েছে যা বিস্ময়করভাবে মার্কসীয়।

৫

আমাদের চতুর্থ প্রতিপাদ্য, বাঙালি সমাজের এবং বাঙালির দেশ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক গণযুগান্তরের প্রাথমিক পর্ব শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে ভাষা পেয়েছিল।

এখানে একটা বিশেষ বিষয় দ্বারা গণযুগান্তর বলতে সে সময়ে কি ঘটেছিল তা'পরিষ্কার করে নেয়া যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং বিশেষ করে রাশিয়াতে সোভিয়েট বিপ্লব সফল হবার পরে আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণমানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রক্রিয়া প্রধান হয়ে উঠেছিল। যারা অবনত তারা নিতান্ত সাময়িকভাবে হলেও মুক্তির উদ্যোগটাকে এক ঝটকায় নিজেদের হাতে নিয়ে বসেছিল। একসঙ্গে সমস্ত চাপাপড়া স্তরগুলো বেরিয়ে এসেছিল সাময়িকভাবে হলেও মেহনতী মানুষের উপযোগী সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে। এরই অংশ হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুখ্যবোধগুলি নিরীক্ষা করতে চেয়েছিল কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক শক্তির সঞ্চারকে যা সমস্ত নিপীড়িত ও নির্বাসিত মানুষকে শোষণের বিরুদ্ধে একত্র করতে সক্ষম। শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' উপন্যাসে এই বিষয়টি উপস্থিত করেছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি বাংলা উপন্যাসে পথিকৃৎ।

শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'কে কিছুটা আল্‌গাভাবে স্থাপন করেছিলেন বর্মায়। বর্মার তখনকার সমসাময়িক স্বাধীনতাসংগ্রাম তাঁর উপন্যাসের কাঠামোর বাইরে রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে গণযুগান্তর তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল তারই তাগিদে তিনি বর্মার কলকারখানার বাঙালি শ্রমিকদের তাঁর কাহিনীর বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। সব্যসাচী যখন অন্যতমা নায়িকা ভারতীকে জানালেন যে কলকারখানার মন্থরগতিতে নারকীয় অবস্থায় বসবাসকারী শ্রমিকরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে, সেই সময়ে শ্রমিকদের চরিতকথাটিকে তার নিচুস্তরের অবস্থানেই উদঘাটিত করে দেখালেন। দেখালেন শ্রমিকরা কেমন করে কথা বলছে। অজস্র স্থূল ও অশ্লীল কথার মধ্যে শাণিত ইস্পাত কথকের মতো বৈপ্লবিক কথাও বলেছে। কারও চাপিয়ে দেয়া বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি নয়। এই কারণেই তাদের নিয়ে সব্যসাচীর অজস্র কথা বাড়তি হয়নি। বরং তাদেরই কথার ব্যাখ্যা হয়েছে।

'পথের দাবী'তে ফয়ার মাঠে আসন্ন মিটিং বিষয়ে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ভারতীর আলাপে জানতে পারা গেল তখনকার প্রলেতারিয়েতের মুখের কথা। উপন্যাসে সম্ভবত গণযুগান্তরের তাগিদেই এই মুখের কথা 'পথের দাবী'তে জায়গা পেয়েছিল। এই জায়গা দেয়ার কাজটা শরৎচন্দ্র খুব দেখেশুনে করেননি। কারণ 'পথের দাবী'তে যে সব্যসাচী ও তাঁর সাথীদের কথা লিখেছিলেন, কালানুক্রমিকভাবে তাঁদের কর্মসূচিতে বা তত্ত্বে প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী থাকার কথা নয়। আসলে গণযুগান্তর ঘটাবার আগের বিপ্লবী প্রস্তুতি নিয়ে পথের দাবী নায়ক নায়িকার গল্প। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেহেতু 'পথের দাবী' লিখেছেন গণযুগান্তর ঘটার সময়, সেজন্য জাগ্রত প্রলেতারিয়েত ঢুকে পড়লো গল্পের মধ্যে, কথা বলতে চাইলো, কথা বললো।

শ্রীকান্তের যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান ঘটেছে, তার লেখার কালানুক্রমিকতা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, উপমহাদেশের এবং তারই আওতায় বাঙালি সমাজে যে গণযুগান্তরের উদ্ভবের উল্লেখ করা হয়েছে ওপরে, তার প্রতিফলন প্রসারিত হয়েছে পথের দাবীকে ছাপিয়ে।

বিশেষ করে তৃতীয় পর্বের শ্রীকান্তের দূর গ্রামাঞ্চলে রেললাইন পাতবার যে কর্মকাণ্ডটির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে প্রলেতারিয়েত চিত্রটি শরৎচন্দ্রের একটা স্মরণীয় কাজ। এখানে বিষয়টির পরিবেশন ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ পথের দাবীর ধরনের নয়। এই প্রলেতারিয়তের সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে 'পণ্ডিত-মশাই' এর গ্রামীণ দরিদ্রদের। এখানে শ্রমজীবীরা কোন কথা বলছে না শুধু কলেরায় বেঘোরে মরছে। কিন্তু এদের চূড়ান্ত বিপন্ন অবস্থাকে শরৎচন্দ্র টেনে এনেছেন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধকে বিপ্লবী তত্ত্বের মূল বক্তব্য করার জন্যে।

এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তির মাঝখানে রয়েছে শ্রীকান্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে শ্রমিক কারিগরদের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি। কী আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত, মর্যাদাময় ও অর্থপূর্ণ এই মজুর কারিগরদের কথাগুলি। যে গণযুগান্তর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতকে সাধারণভাবে শ্রমজীবীদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কথা বলিয়েছে অথবা বিপ্লবী অবস্থান দিয়েছে, তারই একটি প্রকাশ সাধারণভাবে নির্যাতিতা নারীর বক্তব্যের মধ্যে নতুন সুর। তবে এই নতুন সুরটা নিয়ে কাজ করেছেন

শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরীরা। তাঁর সূরটিকে তুলে নিয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে বলে কয়েই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে সুরটা তুলে নিয়েছেন।

এখানে একথাটা বলতেই হবে, শরৎচন্দ্র গণযুগান্তরের কাছ থেকে পাওয়া নতুন সুরটিকে নিয়ে নিচতলার নারীদের কথা বলাবার জন্যে সাধারণভাবে উদ্যোগী হননি। শেষ প্রশ্নের কমলের কিংবা নীলিমার কথাগুলো নিচতলার মেয়েদের কথাবলার কাজটাকে কিছুটা সাহায্য করেছে হয়তো মাঝতলার মেয়েদের মুখ খুলে দিয়ে। কিন্তু এটা গণযুগান্তরের প্রত্যক্ষ কাজ নয়। শেষের পরিচয় উপন্যাসের সারদার কথাবার্তার মধ্যে কিছু নতুন সুর আছে। তবে এটা তার প্রণয়ী রাখালরাজের, না নিজেরই সেটা বলা শক্ত।

৬

আমাদের পঞ্চম প্রতিপাদ্য, শরৎচন্দ্র একান্তভাবে বাঙালির লেখক হলেও, তিনি তাঁর দৃষ্টি ও হৃদয়কে বাঙালির বাইরে প্রসারিত করেছেন।

অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে 'পথের দাবী' একটা খোলামেলা দৃষ্টান্ত। 'পথের দাবী'তে উপমাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের যে প্রয়াসের কথা আছে, তার পটভূমিটি বিশ্বব্যাপী। এতে রাশিয়া ও চীনের বিপ্লবের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামের যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাটি বেরিয়ে এসেছে, তা পথের দাবী লেখার দশকের জন্যে সীমাবদ্ধ থাকার ঘটনা নয়।

জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের যে ধারণা 'পথের দাবী'তে এত সোচ্চার, তা 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে খুব নিচু সুরে বাঁধা হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৈঠকী আলাপের নানা উল্টোপাল্টা বিষয়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করে রেখেছেন।

কমলের মা বাঙালি, বাবা ইংরেজ। বাবার কাছেই কমলের শিক্ষা। বাবা ইংরেজ ছিলেন চা বাগানের ম্যানেজার। চা বাগানের অত্যাচারী ম্যানেজারদের একজন নয়। কমল রাজেনের সঙ্গে শরিক হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা বরং এক্ষেত্রে কমলের মানসিকতা গড়ে তুলেছিল, প্রতিবন্ধকতা করেনি। কমল এদিক দিয়ে জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার বিপ্লবী সহযোগিতা গড়ে তোলার তাগিদের মুখপাত্রী।

জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার মধ্যে যে মন দেয়া নেয়ার কাজটা শরৎচন্দ্রের যৌবনোত্তর বয়সে বাঙালির জীবনে শুরু হয়েছিল, তাকে এত স্বাভাবিকভাবে সামনে আনতে পারাটা শরৎচন্দ্রের বিভিন্নমুখী বিষয় নিয়ে লেখার দক্ষতার দরুনই নিশ্চয় সম্ভব হয়েছিল। কমল ইংরেজের কন্যা এবং অবৈধ কন্যা। এত বড় অগ্রহণযোগ্য ঘটনাকেও অতি অনায়াসে শরৎচন্দ্র যে ভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করিয়েছেন, তাতে তাঁর জাতীয়তাবোধ যে অসংকীর্ণ এবং আন্তর্জাতিকতার অভিমুখী, সে কথাটাও 'শেষ প্রশ্নে'র একটা মীমাংসার প্রক্রিয়াতে রয়েছে। 'পথের দাবী' এবং

'শেষ প্রশ্নে'র পাশে শরৎচন্দ্রের ছবি গল্পটি রাখলে তাঁর রূপদৃষ্টির বৃত্তিটিকে আরও বাড়িয়ে দেখানো যায়।

ছবির গল্পটি একান্তভাবেই বর্মী। এতে বাথিন আর মাশোয়ের প্রেমের কথা বল্‌তে গিয়ে শরৎচন্দ্র বর্মী মেজাজটিকে নিয়ে কাজ করেছেন।

এই গল্পটি একটি ইশারা। একটি আক্ষেপ। ইশারা আন্তর্জাতিকতা, যার ভিত্তি ন্যায় এবং সমতা। আক্ষেপ, এরকম কাজ আর পাইনি তাঁর কাছ থেকে।

অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও সঙ্গীত এবং সাধারণভাবে সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে একটি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হিসাবে না দেখে একেবারে পৃথক করে করে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে আমাদের যার যার পছন্দমত বেছে নেবার একটা ঝোঁক তাঁর কাজের সামগ্রিকতাকে আড়াল করে দেয় এবং উপকর্ষকে খণ্ডিত করে। অযৌক্তিক হলেও দুঃখের বিষয়, এটাই ঘটেছে বিশেষ করে চল্লিশের দশকে। এই বিভাজন ও তার ঝোঁকের মূলে কি কি কারণ রয়েছে এবং এদের অতিক্রম করার জন্যই বা কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, আমরা এদের এখানে সংক্ষেপে খতিয়ে দেখছি এক এক করে। আমাদের মূল লক্ষ্য নজরুলের অব্যাহত ও অবিভাজ্য সত্তাটিকে প্রতিষ্ঠিত দেখা।

নজরুলের বিভাজনের জন্য হয়তো নজরুল নিজেও কিছুটা দায়ী। তিনি তাঁর দীর্ঘ 'ঝড়' কবিতাটি লিখে বিশের দশকে ঝড়ের বেগে আধুনিকতম ধারার কাব্য থেকে শুরু করে নাটক উপন্যাস ও ছোটগল্প এবং গণসঙ্গীত ও প্রেম ও বিরহ মিলনের গান রচনার সামগ্রিকতা থেকে সরে এসে নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র বিরহ মিলন এবং আধ্যাত্মিক গানের ভুবনটিতে আবদ্ধ করলেন। তিরিশের দশকের প্রায় পুরোটাই তিনি গীতিকাব্যে তন্ময় হয়ে রইলেন এবং বাংলা গানের জগতে নিয়ে এলেন অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি। চল্লিশের দশকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাই তিনি নিজে আর সামগ্রিকতায় ফিরতে পারলেন না।

আমরা প্রগতিবাদীরা কিংবা তাঁর অন্যান্য অনুরাগীরাও তাঁর সমগ্র কাজকে সামনে রাখতে পারিনি। আমরা যারা নজরুলকে শুধুমাত্র প্রেম ও বিরহমিলন ও অধ্যাত্মসঙ্গীত ও সুরসৃষ্টির কবিরূপে বেছে নেয়ার বিরোধিতা করেছি, তারা আবার নজরুলকে কেবলমাত্র গণসঙ্গীতের পুরোধারূপে অথবা 'অগ্নিবীণা' ও 'বিষের বাঁশি' কিংবা 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা' ও 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বহুবিশ্রুত কবিতাকে তাঁর কাব্যসত্তার পরিচয়রূপে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেছি এবং এইক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যিক গুণগত উৎকর্ষ ও প্রয়াসকে জনমানসে তুলে ধরিনি। মার্কসপন্থী পণ্ডিত ও বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত চল্লিশের দশকে তাঁর একটি নিবন্ধে বাংলা কাব্যে চণ্ডীদাসের পরে কয়েক শতাব্দী শেষে আবার সবার উপর মানুষ সত্যকে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করায় কবিরূপে নজরুলকে অভিনন্দিত করেন। আমরা ড. দত্তের এই বক্তব্যে

গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম। স্বভাবতই নজরুলের উদাত্ত গণকণ্ঠকেই আমরা বড় করে দেখেছি। চণ্ডীদাসের মতোই নজরুলের কাব্যেও যে প্রেম ও বিরহমিলনের গানের দিকটাও বড়, সেটা আমরা একধরনের গীতি কবিতার সমঝদারদের এক্তিয়ারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই সমঝদাররাও আলাদা করে একটি নজরুলগীতির ভুবন তৈরি করে নেন এবং আজও তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন যে তাতে নজরুল কাব্যের কাড়ানাকাড়া অচ্ছুত।

এইভাবে আমরা নজরুলের অনুরাগীরা কবিকে ভাগ করে নিয়েছিলাম।

নজরুলের প্রতিপক্ষীয়রা এই সুযোগ ছাড়েনি। তারা ফাঁক খুঁজে আসছিল।

জাতীয় স্বাধীনতা, শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক সংহতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকতা, সাম্য এবং সমাজতন্ত্র এবং ব্যক্তিক ও যৌথ মুক্ত ধর্ম ও কর্মজীবনের লক্ষ্যে নজরুল ছিলেন একরোখা ও আপসহীন সংগ্রামী। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শাসকেরা যেমন তাঁর কাব্যকে পদে পদে খর্ব করার জন্য তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ করেছে, তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানাভাবে তাঁকে হেনস্তা করেছে। এতে অবশ্য নজরুলের বিপ্লবী কাব্যের গতি শ্লথ হয়নি। স্বাধীনতাসংগ্রামী স্বদেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সমাদর করেছেন এবং তিনিও চারণের বেশে জনগণের জীবনের গান গেয়েছেন। বিশের দশকের শেষের দিকে বিশেষ করে গীতিকবিতা রচনা করার দিকে ঝুঁকলেও তিরিশের দশকেও তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টির জনপ্রিয়তা জারি ছিল। কিন্তু চল্লিশের দশকে প্রতিপক্ষীয়রা তাঁর অসুস্থতার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের মধ্যে অনুপস্থিতির সুযোগে বিশেষ করে তাঁর কাব্যের গুণগত উৎকর্ষ ও সামগ্রিকতার উপর আক্রমণ চালায়। এরা তাঁর কবিতার কাজকে হতমান করার জন্য একটা আওয়াজ তোলে যে, নজরুল কাব্যে কিছু কিছু কবিতা নন্দনতাত্ত্বিক মানদণ্ডে টিকলেও সাধারণভাবে তাঁর কাব্যে গুণগত উৎকর্ষের অভাব রয়েছে। এরপরেই ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়াতে বিপ্লবী ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা নজরুল সাময়িকভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। অতঃপর যে সব মহল তাকে একসময় কাফের আখ্যা দিয়েছিল তারাই তাঁকে শুধুমাত্র তাঁদের কবিরূপে বাটোয়ারা করে নেয়ার জন্য তাঁর কোন কোন কবিতার শব্দ পর্যন্ত বদলে দেবার চেষ্টা করে।

চল্লিশের দশকের মহাসন্ধিক্ষণে আমরা প্রগতিবাদীরা ও অন্যান্য অনুরাগীরা আমাদের সাময়িক ঘাটতির দরুন এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারিনি। তবে নজরুলের অথবা আমাদের জীবনে এটা একটা স্থায়ী বিপত্তি হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

পঞ্চাশের দশকেই শুরু হয়েছে নজরুলের কাব্যিক গুণগত উৎকর্ষ ও সামগ্রিকতা বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পালা। প্রথমেই উল্লেখ্য যে, যখন বিপত্তি চরমে পৌঁছেছিল, তখনই নজরুল কাব্যের গুণগত উৎকর্ষ এবং তাঁর সমগ্রসৃষ্টির অবিরত প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা মহল থেকে খোঁজ খবর শুরু হয়ে যায়। এই অনুসন্ধান থেকে বোধহয় সর্বপ্রথম ড. সুশীল কুমার গুপ্ত নজরুল সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাপত্র বই-এর আকারে প্রকাশ করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই

ধারা এরপর পঞ্চাশের দশক থেকে এ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, অধ্যাপক আতাউর রহমান, ড. রফিকুল ইসলাম, জনাব আজহার উদ্দিন খান, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ নজরুল কাব্যের উপর নানাভাবে আলোকপাত করে তাঁর কাব্যিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অবিরত প্রাসঙ্গিকতাকে সামনে এনেছেন। এঁদের পাশাপাশি অথবা কিছুটা আগে থেকে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' এবং 'কল্লোলের কাল' নামের দুটি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে নজরুল কাব্যের অপরিহার্য এবং অবিভাজ্য রূপটিকে সংবেদনশীল মন নিয়ে প্রধানত নান্দনিক দিক দিয়ে সামনে এনেছেন। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নিজস্ব ধারায় নজরুলের নান্দনিক নবমূল্যায়ন করেছেন। নজরুলের সৃষ্টির এই গুণবিচার আরও বহু সংকলন ও গ্রন্থের মাধ্যমে ঘটেছে। উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহকে দৃষ্টান্ত হিসাব রাখা হলো এখানে।

নজরুলের অব্যবহৃত, প্রতিনিয়ত, অবিভাজ্য ও অপরিহার্য কাব্যিক উপস্থিতি অবশ্য পুঁথিপত্র নিবন্ধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই নিবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশে গণঅভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে পঞ্চাশের দশকেই বাংলাভাষায় বৈপ্লবিক গণপ্রতিষ্ঠা নজরুলের সমগ্র সৃষ্টির পুনঃপ্রকাশের দুয়ার উন্মোচিত করে দেয়।

৫২'র পরে তিন দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে এই সূত্রেই একটা বড় ঘটনা, নজরুলের সমগ্র রচনাসম্ভার সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। ড. এনামুল হকের পরিচালনায় ও কবি আব্দুল কাদিরের সম্পাদনায় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পরে বাংলা একাডেমী যথাক্রমে সমগ্র নজরুল রচনাসম্ভার এবং চার খণ্ডে নজরুল রচনাবলি প্রকাশ করেছে। একটা চিরকুটও অবজ্ঞাত হয়নি। আজ আর নজরুলকে নিয়ে হাওয়ার উপর কথা হবার নয়।

এইভাবে কাব্যিক উৎকর্ষের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই হোক অথবা প্রামাণ্যতার দ্বারাই হোক, একটা অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নজরুলকে হতমান কিংবা খণ্ডিত করে দেখানো আর আগেকার মত সহজ থাকছে না।

অবশ্য নজরুলের এই সামগ্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র পুঁথিপত্রের উপর নির্ভরশীল বিচার ও বিতর্কের ঘটনা নয়। উপরোক্ত দুটো প্রয়াস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ও উৎসাহিত হয়েছে নজরুলের উপস্থিতির প্রচ্ছন্ন হলেও অব্যাহত বিশেষ ধারা থেকে। ৪৭' এর পরে দুই বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যখনি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তখনি যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো নজরুল নতুন করে জেগেছেন ও জাগিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমাদের উপমহাদেশ ও বিশ্বের উপর দিয়ে প্রবাহিত যে সব অভাবিত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে এসেছি, তাতে নজরুলের বিশেষ করে বিশের দশকের চাপা পড়া কালের অন্তঃস্রোত বেরিয়ে এলেও কিভাবে তা কার্যকর হতে পেরেছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপের হতে পারে।

নজরুলের বহুধা বিকশিত কাজ যে ঝড়ের মত উঠেছিল এবং ঝড়ের মতো নেমে গিয়েছিল তার একটা বড় কারণ এটা যে, নজরুলের উদাত্ত ও কোমল সমস্ত ধরনের কাজ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটে আমাদের উপমহাদেশে অভূতপূর্ব সার্বিক ও সর্বস্তরের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা শৃঙ্খল ও শোষণমুক্তির

সমস্ত রং-এর ও রূপের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান ধারণার ব্যাঞ্জনা। এই গণঅভ্যুদয় স্থায়ী হয়নি, তাই নজরুলও ভাটার টানে সংক্রামিত হয়েছিলেন। কিন্তু যে বাস্তবতা ও যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান ধারণা নিয়ে বিশের দশকে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল, তারা তিরিশের দশকের দিকে আরও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী নতুন অভ্যুদয় তরঙ্গে এরা আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও উত্থানের পর উত্থান দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীতের ডাক পড়েছে নতুন করে বারংবার।

এইভাবে নজরুলের কাব্যের অন্তঃস্রোতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিশের দশকের কাজের অনন্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ী ভাবের অবদানগুলিকেও অবলম্বন করে। নব নব উত্থানে নজরুল উপস্থিত হয়েছেন তাঁর অনন্য ও সমবায়ী কাজের সমন্বিত ক্ষমতা নিয়ে। আরও সহজ করে কথাটাকে বললে বলা যেতে পারে, নজরুল উপস্থিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও কল্লোল যুগের কবিদের নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে আমরা নজরুলের অনন্য ও সমবায়ী দুটি দিক সম্বন্ধে দুয়েকটা দরকারী কথা বলে নিতে পারি।

বিশের দশকে নজরুলের অনন্যতা ছিল বিশেষ করে এই দিক দিয়ে যে, তিনি তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের ও অন্যান্য সমস্ত রূপাধারের মাধ্যমে বিশের দশকের উপমহাদেশের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের তিনটি প্রধান ধারাকেই সমন্বিতভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন। এই তিনটি ধারা ছিল বাংলার অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়াস, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনেই মন্থিত হয়েছিল উপমহাদেশের সমস্ত রকমের অবনতস্তরের মানুষ–মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নারীসমাজ। এদের সকলের আশাআকাঙ্ক্ষাকে একসঙ্গে বিন্যস্ত করতে পারা বুকের পাটা তাঁর ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'বিদ্রোহী' কবিতা কিংবা 'সর্বহারা' কাব্যের লোকায়ত বহুত্বের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, তিনি তার সৃষ্টিকে কত ভাবে কত খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংঘবদ্ধ গণ অভ্যুত্থানের কবি হিসাবে কাজে নামেন বলেই নজরুল যুগের কাব্য ও সঙ্গীত তথা সাহিত্যকে একা একা রূপ দেবার কথা ভাবেননি। তিনি ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি-র কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। নজরুল তাঁর সমকালীন কবি ও কথাশিল্পীদের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। নজরুল তাঁর উঠতির মুখেও রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কল্লোল যুগের গোকুল নাগ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে অকুণ্ঠভাবে নিয়েছিলেন। আবার তিনি সমসাময়িকদের উপর তাঁর নিজস্ব ধারার প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। এমনকি তিনি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেন। বিশের দশকের এই সমবায়ী ব্যাপারটাও সেই সময় সাহিত্য কৃতিত্বে বিশ্ব ও উপমহাদেশের ক্রান্তিকালের ব্যঞ্জনা জুগিয়েছিল। স্বভাবতই যেহেতু অনেক বেশি বড় পরিমাপের ও গভীরতর মুক্তিসংগ্রাম বিশের দশকের অভ্যুদয়েরই প্রসারিত রূপ, সে জন্য নজরুলের সমবায়ী সত্তাটির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে নতুনতর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

শুধু দল বেঁধে ফিরে আসা নয়, তিরিশ ও চল্লিশের দশক থেকে বাংলা কাব্যে, সঙ্গীতে তথা সমগ্র সাহিত্যে যে নতুন নতুন ছোট বড় কাজ হয়েছে গণউত্থানের পর গণউত্থানকে ভাষা দিয়ে, তাতেও নজরুল সহকারী রয়েছেন। তাঁর একটা বিশেষ কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নজরুল আধুনিকতম কবিতাকেও গণমুখী করে এর চাবিকাঠি তুলে দিয়েছিলেন কল্লোল যুগের সাথীদের হাতে। এই গণমুখী রীতিতে যেমন 'অগ্নিবীণা'র উচ্চভাষিতা ছিল, তেমনি 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোমলতা ছিল। নজরুল শুধুমাত্র একজন সহজিয়া স্বভাবকবির প্রেরণাকেই সম্বল করেননি, তিনি অনেক মাজাঘষাও করেছেন গণমুখী আধুনিক কবিতা লিখতে বসে। বিশের দশকে তাঁর এই সামগ্রিক গণমুখী আধুনিকতা সংক্রামিত হয়েছিল সমসাময়িক কবিদের মধ্যে। উত্তরসুরী সুকান্তের হাতে এই ধারা পৌঁছেছিল তিরিশের দশকের অন্য আরও কয়েকজনের নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও নিজস্ব কাজের মধ্য দিয়ে। সুকান্ত এই গণমুখী আধুনিকতম পরিশীলিত ধারাকে একেবারে যেন জন্মেই অনায়াসে তুলে নিয়ে বিশের দশকের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন। এজন্য আরও বেশি দাপটের প্রয়োজন হয়েছে। সুকান্তও মাজাঘষা কম করেননি। তবে উত্তরাধিকার এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এই উত্তরাধিকারে নজরুল সপ্তর্ষির একটি তারা।

হাল আমলের দুই বাংলার কবিরাই বলবেন এবং দেখবেন, নজরুলের গণমুখী আধুনিকতায় তাঁরা কতটা সংক্রামিত। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কাব্যের কর্মী ও কান্ডারীরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে বলবেন ও দেখবেন, কারণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাব্য তার গণমুখিতার জন্য চিহ্নিত হয়েছে।

মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ

১

দুটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করা দরকার সর্বপ্রথম।

প্রথমত, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ কি সত্যই ব্যক্তিজীবনে কোন অগ্রসর উদ্দেশ্য থাকার বিরোধী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি কি স্বদেশে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোনো মানবিক সামাজিক উত্তরণকে আমল দিতে চাননি?

মার্কসবাদের দৃষ্টিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও লেখাকে ইতিবাচকরূপে গণ্য করতে হলে এই দুটি প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর কারণ এই যে, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্বন্ধে একটা জোর প্রচার, তিনি জীবনের অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণকে অস্বীকার করেছেন, তিনি অবিপ্লবী। অথচ মার্কসবাদের দৃষ্টিতে ইতিবাচকতা দাবি করে জীবনের অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণের অনিবার্যতা। মার্কসবাদ হচ্ছে বিপ্লবী দর্শন। মার্কসবাদ একটি অগ্রসর উদ্দেশ্যভিত্তিক মানবীয় জীবনদর্শন। এই উদ্দেশ্য শোষণমুক্ত মানবসমাজ। সুতরাং কোনভাবেই ব্যক্তিজীবনকে ভেসে চলতে বলতে পারেনা মার্কসবাদ। ইতিহাসে বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের অব্যাহত ধারায় আসে ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্যপ্রবণতা। বিশ্বজগতের একটা বিশেষ গতিধারা আছে। এই

গতিধারা অবিশ্রান্ত বিকাশের দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতির ধারা, পরিমাণগত থেকে গুণাত্মক পরিবর্তনে উত্তরণ। শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরে উত্তীর্ণ হওয়া। সমাজবিপ্লব এই অবিশ্রান্ত উত্তরণেরই অবিশ্রান্ত প্রকাশ। মানবমানবীর অগ্রসর উদ্দেশ্যের সম্মতি আসে এখান থেকেই। নবজাত নক্ষত্র আর নবজাত চরিত্রের মানবমানবীর সত্তার বিকাশের সাযুজ্য রয়েছে এখানে।

মার্কসীয় দর্শনের এই ধারা স্বভাবতই কোন কবিকে ইতিবাচক বলে নির্দিষ্ট করলে তাঁর কবিতার মধ্যে উদ্দেশ্যহীনতা ও উত্তরণহীনতার প্রাধান্যের পরিবর্তে থাকা চাই অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণের প্রবণতা।

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধেও এই বিচার প্রযোজ্য।

জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সংশয়ের ধোঁয়া সৃষ্টি করে রেখেছে মার্কসবাদের বিরোধীরা। এরাই প্রচার করে এসেছে, কবির কোন অগ্রসর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বিপ্লবের প্রয়োজনবোধের বিপরীত জগতে বাস করতেন।

এই ধোঁয়া থেকে জীবনানন্দ দাশকে বের করে আনতে হবে তাঁকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিবাচক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।

২

এখানে প্রথমে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো কবির লেখাতে অগ্রসর উদ্দেশ্যের প্রবণতা উদ্দেশ্যহীনতাকে কিভাবে পিছনে ফেলে এসেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা যাক,

> একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
> আবার কি ফিরে আসবনা এই পৃথিবীতে?
> আবার যেন ফিরে আসি
> কোনো এক শীতের রাতে
> একটা হীন কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
> কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

(কমলালেবু-বনলতা সেন)

এখানে উল্লেখ করা দরকার, 'বনলতা সেন' কাব্যের সেই 'অন্ধকার' কবিতার পরেই এ কবিতাটি, যেখানে কবি বলেছেন, 'কোনোদিন জাগবনা আমি কোনো দিন আর'। 'কমলালেবু' কবিতাটি 'অন্ধকার' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। নেতির বিরুদ্ধে ইতি। 'কমলালেবু' কবিতাটি যে ব্যতিক্রম নয় তার আরও প্রমাণ:

> শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকাল বেলায়
> কোনো এক কবি বসে আছে;
> অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে;
> তবুও সে প্রীত অবহিত হয়ে আছে
> এই পৃথিবীর রোদে—এখানে রাত্রির গন্ধে নক্ষত্রের তরে।

তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ
সুস্থ করে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সমভবিতব্যতার অন্ধকারে দেশ।
মিশে গেলে, জীবনকে সকলের তরে ভাল ক'রে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হতো।

(পৃথিবীতে-অন্যান্য কবিতা)

জীবনানন্দ দাশ নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন মানব বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এবং যে ধারণাকে মার্কসবাদের বিরোধীরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চেষ্টা করবে, উপরোক্ত উদ্ধৃতি তার প্রতিবাদ।

বিচ্ছিন্ন আত্মবোধ যে তাঁর কাছে বরং ধিক্কারই পেয়েছে তারও প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে এখানেই:

প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব সাগরে।

(তোমাকে-বেলা অবেলা কালবেলা)

ব্যক্তির ক্ষয়রোধও মানবকে যে ক্ষয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে না সে সম্বন্ধে দিয়েছেন তিনি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি:

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর ব্যঞ্জনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি যুক্তির
নির্দেশের পথ ধ'রে চলে
হয়তো বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে–হৃদয়ে,
মানব ক্ষয়িত হয়না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।
ইতিহাসে ঢের দিন প্রমাণ করেছে।

(যতদিন পৃথিবীতে-ঐ)

নৈরাশ্যবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ এ ধরনেরও একটা ধারণাকে মার্কসবাদ বিরোধীরা ছড়িয়ে এসেছে। অপরদিকে যেহেতু মার্কসবাদীরা পুরানো জীর্ণ পৃথিবীর খোলস সরিয়ে একটা নতুন পৃথিবী তৈরি করতে চায় ইতিহাসের গতিপরিণতির বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ থেকে উপকরণ নিয়ে এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশের মধ্যে থেকেও কবিতার মধ্যে তারা সংগ্রহ করে আশাবাদকে, সেই কারণে জীবনানন্দ

দাশের কবিতার মধ্যেও তারা নৈরাশ্যের বদলের আশাবাদকে খুঁজবে এটাও স্বাভাবিক। জীবনানন্দ দাশ নিরাশ করেননি মার্কসবাদীদের।

'বনলতা সেন' কাব্যের 'অন্ধকার' কবিতা পড়ে মনটা মুষড়ে যায়, কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থের 'অন্ধকার থেকে' কবিতায় সমস্ত নৈরাশ্য কেটে যায়। 'অন্ধকার থেকে' কবিতা ব্যতিক্রম নয়। তার প্রমাণ :

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে,
জানি, তবু ভোরে, রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ে ঝরা সোনার মতন
সূর্য তারা বীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর প্রবাহ,
আমি মন সচেতন; আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর কর–নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আনো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে,
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকালের নীল কী পাখিজল সূর্যের মতন।

(একটি কবিতা-বেলা অবেলা কালবেলা)

কিংবা,

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার খোপে
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়,
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

(উত্তর প্রবেশ-সাতটি তারার তিমির)

আরও আছে,

আমাদের হাড়ে এক নিধুম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময় স্রোতে চলিতেছি ভেসে,
তা নাহলে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তে-নিরুদ্দেশে।

(কবিতা-সাতটি তারার তিমির)

আরও আছে,

বড় বড় সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে
এখনো নারীর মানে তুমি কত রাধিকা ফুরালো।

(মিতভাষণ-সাতটি তারার তিমির)

আর,

দূরে কাছে কেবলি নগর ঘর ভাঙ্গে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে;
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।
এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানিভুল চিন্তাসংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শাখে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

(পৃথিবীলোক-মহাপৃথিবী)

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিচারে নেমে উপরোক্ত আশাবাদকে আমরা অসংখ্য ঢেউয়ের মতো উদ্বেলিত দেখতে পাবো।

তবু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে জীবনানন্দ দাশের মধ্যে যে দ্বন্দ্বও রয়েছে সেটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে, কারণ জীবনানন্দ দাশও তো একটা ক্রান্তিকালের ইতিহাসের নানা ধারায় প্রসারিত বৈচিত্র্যের একটি বিশেষ সৃষ্টি, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, যদিও আক্ষেপ নেই। সংশয় রয়েছে? আমরা বলবো যাচাই করে নেওয়ার কঠোরতা রয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কোন কোন কবিতায় বলেছেন, 'আমাকে জাগিওনা, আমাকে ঘুমোতে দাও।' কিন্তু জীবন কি কবিকে কোনদিন ঘুমোতে দিয়েছে? দেয়নি, দিতে পারে না, কবিও তা জেনেছিলেন এবং বারংবার বলেছিলেন সেকথা। কোন কোন সময়ে ক্লান্ত হয়ে জৈবিক প্রয়োজন থেকেই যেন ঘুমোতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘুমোতে পেরেছেন কি? ঘুম আসেনি। উদাহরণ :

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে

এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে
ঘুমের সাধ ভালবেসে।

(অবসরের গান-ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আরও,

ঘাসের ভিতরে নীল শাদা ফুলফোটে হেমন্তরাগে;
সময়ের এই স্থির একদিক তবু স্থিরতর নয়;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

(লোকেন বোসের জার্নাল)

স্তিমিত-স্তিমিত আরো করে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

(রিস্টওয়াচ-সাতটি তারার তিমির)

আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি/কাঁচের গেলাসে উজ্জল শফরী; সমুদ্রের দিবালোকে আরক্তিম হাঙ্গরের মতো তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে যা হচ্ছে হতেছে অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত করে। /সৃষ্টির নাড়ির পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়/অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ/তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

(আবহমান-মহাপথিকী)

আরও,

কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্বলে ওঠে রোদে।
উদয় সমাপ্ত হয়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হয়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নবসৃষ্টি মরালের মতো কল-
স্বরে কেন কথা বলি; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশ হংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

(তবু)

এই কবিতাগুলিতে জীবনের উপকরণগুলি পরস্পর বিরোধী। কিন্তু এ যে উপলাহত নদী। উপল না থাকলে নদী শব্দিত হতো না। কিন্তু সময়ের দিকে এগিয়ে চলা তো স্তব্ধ হয়নি। অবশ্য কোন কোন কবিতায় মনে হয় পরস্পর বিরোধিতা কি অচলতা এনেছিল? যেমন,

এখন শীতের রাত্রে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
.... তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা

ঈশার শবোত্থান-বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু করে
হেগেল ও মার্কস; তার ডান আর বাম কান ধরে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো; এমন সময়
দুপকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
ওদের চেয়েও ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম;
.... কোথায় যে আঁচলের খুঁট;
কেবল উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট–
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু ব্লক অথবা রায়ের বোঝা বয়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পারে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে?
তাহলে তা প্রেম নয়, ভেসে গেল ত্রিবেদীর হৃদয়ের জ্ঞান
জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দুদিকের কান
টানে বলে বেঁচে থাকি–ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিল টান।

(অনুপম ত্রিবেদী)

কিন্তু এ কবিতার মূল সুরটি হচ্ছে যেন গভীর বেদনায় ভরা বিজ্ঞানীর কৌতুক। প্রেমের জন্যে আত্মহত্যাকে একটা স্খলন বলেই কবি সব সময় মনে করেছেন। জীবনের দ্বন্দ্বাত্মক মহাস্রোত ধারা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াকে বারংবার কবি যাচাই করে দেখেছেন। তাঁর 'লাশকাটা ঘরে' কবিতাটি একই সুরে লেখা। এই জন্যেই কি দ্বন্দ্বাত্মক গতিবাদের দর্শনকে নিয়ে তিনি কৌতুক করেছেন?

প্রেম সম্বন্ধে এখানে তিনি সাবধানী অভিভাবকের ভূমিকায় নেমেছেন।

কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে এই সাবধানতাও কবির পক্ষে কয়েকটা বিশেষ মুহূর্তের ভাবনার ব্যাপার। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের সুদীর্ঘ প্রেম কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যাবে, প্রেম পদস্খলনের ব্যাপার নয়। প্রেমই জীবনকে ব্যাপ্ত করে আছে। প্রেম একটি স্রোতস্বিনীর মতো বয়ে চলেছে কবির লেখায়–সে হচ্ছে যৌবনের স্রোতস্বিনী, নবজীবনের স্রোতস্বিনী।

ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের
চলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্যের
ডানায় উড্ডীন কলরোল,
আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠছে।

(সময়ের তীরে–বেলা অবেলা কালবেলা)

আরও আছে,

এইখানে স্মৃতি,
এখানে বিস্মৃতি; প্রেম
ক্রমাগত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

(অনেক নদীর জল—বেলা অবেলা কালবেলা)

এখানে যে বৈপরীত্য—এটা জীবনের দ্বন্দ্বাত্মক অগ্র-গতিধারারই প্রকাশ।

বস্তুতপক্ষে, অনুপম ত্রিবেদী কবিতার ডায়ালেকটিক বা বিপরীত পারস্পরিকতা যে সাময়িক বিমূঢ় অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে, তা নিতান্তই সাময়িক। জীবনানন্দ দাশের ডায়ালেকটিক বা বিপরীত পারস্পরিকতা একটা অগ্রসর গতিবাদেরই পরিপোষক।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের সময়ের কাছে কবিতাটি এই দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারারও প্রকাশ, যা লেনিনকে অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে সামনে আনতে দ্বিধা করেননি:

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানবিকতা ভোর?
নাচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎসে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই,
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে— সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে,
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলন সূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?
নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবেনা কি মানুষকে চিনে তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষন্ন হৃদয়,
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

৪

জীবননান্দ দাশের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের অসংখ্য কবিতাতে রাত্রি, তিমির, অন্ধকার যেন কাদার মতো থকথকে হয়ে আছে, যা পার হয়ে যেতে হয় 'পরস্পর' কবিতার রূপকথার রাজ্য পৌঁছতে হলেও। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে রাত্রির প্রাচুর্য কি তাহলে সাদা রং দিয়ে ছবি আঁকার জন্য কালো পটভূমি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ কবিকে জীবনের কোন রঙিন স্বপ্নেরই গীতিকার হয়ে থাকতে দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামানের ছায়ায় লেখা তাঁর কবিতাগুলি পড়ে পড়ে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, কত রূঢ় হতে পারতেন কবি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে সে কথা ভেবে। কবি সমস্ত সত্যের কবি হয়ে চেয়ে সমগ্র জৈবিক অনুভূতিতে এই পৃথিবীকে, দেশকে, নারীকে, বুঝতে চেয়েছেন। সেজন্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' 'পিপাসার গান' অথবা 'বনলতা সেন' এর 'ঘাস' কবিতার মতো কোন কোন কবিতায় মানবদেহের পার্থিবতার বা বস্তুসত্তার বা স্বভাবসত্তার প্রায় শেষ কথাই বলে ফেলেছেন গ্রীক অণুদার্শনিকদের মতো; অণুদার্শনিকের ভাষায় নয়, কবিতার ভাষায়।

কিন্তু এই অন্ধকার অথবা জৈবিকতা অথবা স্বভাবত্ব অথবা অণুকাব্যিকতা কি প্রকৃতপক্ষে আলোর রং নিয়ে জীবনের ছবি আঁকবার জন্যে অন্ধকার পটভূমি নয়?

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'হাওয়ার রাত' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত এমন শক্তিময় কবিতা আমাদের বাংলা কাব্যে বিরল।

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল অসংখ্য নক্ষত্রের রাত।
যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্যা মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন-
মৃত্যুকে দলিত করার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

এই 'হাওয়ার রাত' কবিতার পাশে একই কাব্যগ্রন্থের 'বেড়াল' কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ অন্ধকারকে নিয়ে যে খেলা করেছেন সেটিও এখানে উল্লেখযোগ্য:

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারার অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো
থাবা দিয়ে লুফে আনল সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

তর্ক হতে পারে, এ দুটি কবিতাই প্রকৃতি নিবদ্ধ। তা ঠিক। প্রকৃতি নিবদ্ধতা জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কাব্যের একটি বিশেষত্ব হতে পারে। পাখি সে সিন্ধু সারসই হোক, শকুন হোক, পেঁচা হোক, ডাহুক হোক, শালিক হোক, হাঁস হোক এরা হচ্ছে কবির কাছে জীবনের স্পন্দনের প্রতীক। তবু কোন কোন সময়ে এরা প্রকৃতির বিস্তারকে কবির মানসিক পরিমণ্ডলকে ছাড়িয়ে অসীমতায় স্থাপন করেছে। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের উপরোক্ত দুটি কবিতাতে তারই আভাস।

কিন্তু যেমন, 'বনলতা সেন' কাব্যে, তেমনি 'ঝরাপালক' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই, 'রূপসী বাংলা'তে তো নিশ্চয়ই–মানবীয় পরিমণ্ডলকে প্রধান করে দেখতে চাইলেও আমরা হাতের কাছেই দেখতে পাবো। সে মানবীয় পরিমণ্ডল কোন আত্মনিবদ্ধ কবির ভাবপ্রক্ষেপণের ছায়া নয়, সে হলো ইতিহাসের বিকাশমান মানবসমাজ। আগেই দেখাতে চেষ্টা করেছি, জীবনানন্দ দাশ বিচ্ছিন্নতা ও অমানবিকতার প্রচারণাকে রূঢ় আঘাত করেছেন। এখানে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দাখিল করছি:

গভীর, গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকার্ণো হেক্ষর্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
ইউ,এন,ও-য়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাস কূটবিষ
আরো ঘুম রয়ে গেছে হৃদয়ের জীবনের, নারী
শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য
বেদনা বিমূঢ়তা লাঞ্ছনায় অবতার রয়ে গেছে; রাত
এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে মাঝে বদ্ধ সোক্রোতেস
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায়; বেলজেনের সবচেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্ণা,-রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয় মানুষের মন।
সহসা আকাশ পথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কি রকম সাহসিক চেয়ে দেখে, সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে;–অমর ব্যাথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায়
ইতিহাস পটভূমি অনিকেত না কি? তবু অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
স্বর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায় অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

(পৃথিবী সূর্যকে ঘরে–বেলা অবেলা কালবেলা)

এ কবিতাটিতে মহাবিপ্লবী লেনিনকে কবি কোন সাধকদের মধ্যে রেখেছেন সেটা বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয়। লেনিনকে এর আগের একটি কবিতার স্তবকেও আমরা একইভাবে পেয়েছিলাম।

লেনিনকে জীবনানন্দ দাশ মানব-জীবনের অন্যতম শিল্পী শ্রেষ্ঠ হিসেবেই দেখেছিলেন।

আরেকভাবেও জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি নিবদ্ধতা বিকিরণের মানবিকতায় উৎসাহিত হয়েছে সেটা লক্ষ্য করা যেতে পারে:

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা;
আমার লক্ষ্য ছিলো মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী করে মানুষও মানুষীর মতো করে রাখে।

(সারাৎসার–বেলা অবেলা কালবেলা)

আরেকভাবে :

আশ্চর্য বনের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী,
ছড়ায়েছি খই ধান বহুদিন উঠানের শালিখের তরে
সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেকদিন,–দেখিয়াছি ধূপ জ্বাল, ধর সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে–এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছ তাই–কাঁচা পোকাটিপ তুমি কপালের পরে
পরিয়াছ.... তারপর ঘুমায়েছ, কল্কাপাড় আঁচলটি ঝরে।
পানের বাটার পরে, নোনার মতন নম্র শরীরটি পাতি
নির্জন পালঙ্কে তুমি ঘুমায়েছ।

(রূপসী বাংলা)

৫

এই রূপসী বাংলা শুধু বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণের বাংলা নয়। এ বাংলা ছোট ছোট ঘরের বাংলা, মানবমানবীর বাংলা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাংলা, যেখানে ঝড় আসে। কিশোরীদের নিয়ে রচিত গীতিকবিতার বাংলা। সেই নারীদের বাংলা, যাদের হাত চাল ধুতে ধুতে শিঠে শাদা হয়ে গেছে। এখানে স্বাধীনতারও ডানার ঝাপটা।

আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও,
আমি যে বনের হীরামন

(রূপসী বাংলা)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস পাই না, যদিও মানুষের সমগ্র ইতিহাসে তিনি যেন লিফটে ওঠা নামার মতো অতীতে বর্তমানে ইচ্ছামতো বিচরণ করেছেন। 'ইতিহাস যান' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তবে মানুষের ইতিহাসকে তিনি দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতিধারার ছাঁচে ঢেলেই প্রবাহিত করে দেখেছেন। এর পিছনে বিশ্বজগতের সেই গতিধারাকে ছন্দিত দেখেছেন তিনি যাকে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'প্রকৃতি ডায়ালেকটিক্স বা দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক গতিধারা' গ্রন্থের বক্তব্যের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করা যায়। মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর কবিতা তিনি লেখেননি। অথবা একজন বিঘোষিত বস্তুবাদী হিসেবে তিনি প্রকৃতি ডায়ালেকটিক্সকে সামনে আনেননি। সমাজবিপ্লবের চাবিকাঠি হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি বোঝেনওনি দেখতেও পাননি। কিন্তু মার্কসবাদীরা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে সমাজবিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করবে। কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে লোভ ও নীচতাকে অতিক্রম করে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ। মার্কসবাদীরা যে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চাইছে তার অঙ্গীকার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপস্থিত। কাঁটার ঝোপে ফুলের মতো?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদী রীতির গণকথাশিল্পী ও কমিউনিস্ট রূপে চিহ্নিত আদৃত ও বিতর্কিত।

অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের গণকথাশিল্পী হিসেবে ফরাসি উপন্যাসের কারিগর আঁরি বারবুসে ও লুই আরাগঁ যেমন করে কমিউনিস্ট হয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই ভাবেই কমিউনিস্ট। অতি আধুনিক রীতির কবি পাবলো নেরুদা এবং বার্টোল্ড ব্রেখটের কমিউনিস্ট হবার ধরনটির সঙ্গেও তাঁর মিল রয়েছে।

এঁরা প্রত্যেকেই জনগণের মুক্তিসংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গিত করে প্রায় একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত সংগ্রামী খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন অতি আধুনিক রীতিতে। সামান্য ও অসামান্য নির্বিশেষে এবং বিশেষ করে সামান্য ও সামান্যা মেহনতী মানব-মানবীদের নিমগ্ন মনের সম্ভাবনা, যন্ত্রণা, আনন্দ, মাধুর্য এবং বৈপ্লবিক ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করাই এঁদের অতি আধুনিকতার রীতি। বিশ্ব জুড়ে এই ধারা গড়ে উঠেছে একই সঙ্গে চূড়ান্ত সংকট ও পরিবর্তনময় বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক থেকে। সুতরাং এর মধ্যে ভাব-সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি ভাব-প্রগতিও সক্রিয়। পরিবর্তনবাদী বিদ্রোহী লেখক লেখিকারা মুক্তিসংগ্রামী জনগণের অগ্রপদক্ষেপে শরিক হয়ে আধুনিকতম রীতিকে গণবোধ্য ও গণ-গম্য করে স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে আলো ফেলে। ভাব সংকটের চক্রকে অতিক্রম করে ভাব-প্রগতিকে এরা এগিয়ে নিয়েছেন। বাংলার এই ধারার প্রবর্তক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এই বিপ্লবী বাস্তবতাবাদের অনন্য সাধক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে এ কারণে যে, তিনি বস্তুতপক্ষে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সেই একমাত্র লেখক যিনি বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী ও অন্যান্য সন্নিহিতদের জীবনে প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার রদবদলের সমস্ত প্রকাশ্য ও অন্তঃশীল

অভিঘাতকে চিত্রিত ও ধ্বনিত করেছেন বিশের দশকে বাংলায় সদ্য প্রবর্তিত কাঁচ ও আকাড়া অতি আধুনিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পরিপূর্ণাঙ্গ করে তুলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দারিদ্র্যের জালে আবদ্ধ পদ্মা নদীর একান্তভাবে গায়ে গতরে খেটে খাওয়া জেলেদের মনোবেদনার উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' কিংবা আলোকিত কলকাতা মহানগরীর ছায়াবৃত উপকণ্ঠের বাসিন্দা শ্রমজীবী ও মজুরদের কারখানা জীবন ও ঘরভাঙ্গা ও ঘর বাঁধার একই সঙ্গে যাযাবরী ও সাংসারিকতার উনুন পাতার উপন্যাস 'শহরতলী' কিংবা চাষীর ঘরের কেশবতী নারীর জীবনে দুর্ভিক্ষের হানা এবং তার ন্যাড়া হবার কাহিনী নিয়ে লেখা ছোটগল্প 'নেড়ি'তে রয়েছে এই অতি আধুনিক রীতির রক্তক্ষরা স্বাক্ষর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচেছিলেন ৪৮ বছর। লেখা আরম্ভ করেছিলেন ২০ বছর বয়সে। এর মধ্যে ২৮ বছর একটানা লিখেছিলেন। লেখাকে বৃত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন এবং 'কলমের মজুর' বলে অভিহিত করেছিলেন নিজেকে। প্রায় ৪০টি উপন্যাস ও আড়াইশ ছোটগল্প, একটি কবিতার বই লিখেছিলেন ২৮ বছরের মধ্যে। শ্রমসাধ্য ও অবিশ্রান্ত ছিল তাঁর কাজ। নিজেকে আরাম দেয়া দূরে থাকুক দুঃখই দিয়েছেন তিনি বরং।

তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকজনকে পাওয়া যাবে বাংলায়, যাঁরা সাফল্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সময়টিতে বৈচিত্র্য যেমন যথেষ্ট তেমনি উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক-লেখিকার সংখ্যাও হয়েছে যথেষ্ট। মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশের এবং তিরিশের দশক জুড়ে অবস্থান করেছিলেন এবং এমন কয়েকটি নামী উপন্যাস লিখেছিলেন এই সময়েই যেগুলি অতি আধুনিক রীতিকে এবং সামান্য ও সামান্যাদেরও নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়েছিল বলে এই সব লেখা সত্তরের দশকেও সজীব। তাছাড়া, অতি আধুনিক বাস্তবতাবাদের ভিত্তি তৈরি করেছিল যে, 'কল্লোল' তার লেখকেরা সত্তরের দশকেও সক্রিয় রয়েছেন। দৃষ্টান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু বিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত অতি আধুনিকের গণকথার ধারায় 'চিন্তামণি', 'দর্পণ', 'স্বাধীনতার স্বাদ' এবং হলুদ নদী সবুজ বন ও অন্যান্য উপন্যাস লিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এতে একটা 'কট্টর' ভাব এসে পড়তে বাধ্য। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতো সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি নিয়ে লেখার কট্টরতা বিপজ্জনক। সুতরাং, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটানা একই লক্ষ্য নিয়ে লেখাতে শিল্পরূপের উৎকর্ষের ক্ষতি হয়েছে কিংবা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উঠতে পারে অবশ্যই। ফলাফল বিচার্য নিশ্চয়। এই জন্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতর্কের ঊর্ধ্বে স্থাপন করবো না। কিন্তু তাঁর লেখার বিচারে সার্থক বৈপ্লবিক ইতিবাচকতাই বিচার্য হতে বাধ্য। এই ইতিবাচকতা তাঁর অপরিমেয় অধিকাংশ লেখার অভিধা।

বস্তুতপক্ষে সমস্ত রকমের বিপর্যয় সত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীতে নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ফলপ্রসূতার দিকে এগিয়েছে এবং এই অভ্যুত্থানের যারা লেখকলেখিকা হয়েছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে বিপর্যয়ের মধ্যেও মনুষ্যত্বের অগ্রগতি রেখা আঁকতে

পেরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি এগিয়েছেন অতি আধুনিক হিসেবে।

তাঁর অতি আধুনিকতা, সাম্যবাদ ও গণাত্মকতার বিকাশ এবং তাঁর লেখার সময়ের বিপ্লবী গতিধারা পরস্পরের পরিচায়ক।

২

সঙ্কটে বর্ধিত ও বিপ্লবে উত্তরিত বিশ শতকের বিশের ও তৎপরবর্তী তিন দশকের সমস্ত যন্ত্রণা ও সমৃদ্ধিরই যেহেতু রূপায়ণ ঘটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসে, সেজেন্যে তাঁর রচনাবলি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনা ও আকর্ষণবিকর্ষণ এবং আনন্দ-সমৃদ্ধ আশাবাদ ও দিকদর্শন। এই দুটো ব্যাপার পরস্পরকে নাকচ না করে বরং সমগ্রভাবে গতি সঞ্চারই করেছে। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁকে একাগ্রতা ইতিবাচকতা এবং একাদিক্রমিকতা জুগিয়েছে।

১. এই কথাশিল্পী তাঁর লেখার চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছেন সংগ্রামী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীকে।

২. তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চেতনা-অবচেতনের সূত্রগুলিকে শ্রমজীবী নরনারীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা এবং কর্মের ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রকাশের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৩. গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মজুর কিষাণদের পাশাপাশি তিনি প্রায় একই স্তরের শোষিত ও বঞ্চিত নিম্নমধ্যবিত্ত বিভিন্ন বৃত্তির এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নরনারীর চরিতকথা বলেছেন। তিনি লেখা শুরু করেছিলেন এদের নিয়েই। যত দিন গিয়েছে ততই তাঁর লেখায় গায়ে গতরে খেটে খাওয়ারা প্রাধান্য পেয়েছে, তবে নিম্নমধ্যবিত্তদের কথাও তিনি শেষ পর্যন্ত বলেছেন। এরা নিরালম্ব বলে এদের পরিত্যাগ না করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এদের শ্রমজীবীদের সাথী করে নিয়েছেন সাম্যবাদী বিপ্লবের আয়োজনে।

৪. অসামান্য বীরচরিত–ভিত্তিক মহাকাব্যিক আখ্যান না লিখলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সামান্য ও সামান্যা মানবমানবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাতে বহুবীর-সমন্বিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস এবং এর ফলে এদের আখ্যান লিখতে গিয়ে এক নতুন ধরনের গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস গড়ে উঠেছে তাঁর হাতে।

৫. যে কোনো স্তরের যে কোন বর্ণের নরনারী যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কিংবা ছোটগল্পের বিষয়ের আওতায় এসেছে, তখন তার মুক্ত সত্তাটিকে বুঝতে এবং বুঝাতে চেয়েছেন তিনি। সমস্যা হয়েছে, কাকে ফেলে কাকে রাখবেন। কিন্তু ফেলেননি কাউকে। এইজন্যেই বাইরের চেহারার পার্থক্য দ্বারা রূপ কুরূপ নির্ধারণকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

৬. মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি জীবনাদর্শ ও বিশ্বদর্শন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী মানবমুক্তি সংগ্রামের নেতা, সেজন্যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি হয়েছে তাঁর রাজনীতি। পরাধীনতা থেকে

মুক্তির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যে একটা অন্তঃশীল যোগ তাঁর নিমগ্ন মনে বিরাজ করছিল কৈশোর থেকেই, তাকেও এই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিই প্রকাশ্যে টেনে আনে। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে তিনি শোষণমুক্ত সমাজের জন্য শ্রেণীসংগ্রামে একত্র করতে পেরেছিলেন স্বচ্ছন্দে।

৭. ঘটনাবর্তে বা খেয়ালের বশে তিনি কমিউনিস্ট হননি। বরং জীবনের ধাপে ধাপে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকে ও কমিউনিস্টদের যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিত হবার পরে তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি, যদিও তাঁর মৃত্যুর পূর্বাহ্নে সাথীদের মধ্যে বিভ্রান্তি কাউকে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্ট বৃত্তের বাইরে।

৮. চরম দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় পীড়িত জীবনে উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখাকে জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় করা সত্ত্বেও বিষয়বস্তু ও ভাবনাচিন্তা নির্বাচনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতাচারিতা বিস্ময়জনক। সাময়িকপত্রের কিংবা প্রকাশকের তাগিদেই অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন তিনি, কিন্তু কি নিয়ে লিখবেন সে সম্বন্ধে কেউ কখনও ফরমায়েস দিতে পারেন নি। কিন্তু এই জাতবিদ্রোহী শিল্পী কোন অবস্থাতেই নিজেকে একাকী ও বিচ্ছিন্ন করে নেননি। বরং তিনি বয়সের দিক থেকে যত এগিয়েছেন ততই বেশি বেশি সংঘমনা হয়েছেন।

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্মীয় ভেদবিভেদ কখনও উত্যক্ত করতে পারে নি। ধর্মনিরপক্ষেতাকে তিনি ঠিক সেইভাবে সহজ করে নিয়েছিলেন যেমনভাবে পাখি আকাশে ওড়ে, নৌকা জলে ভাসে।

১০. নব পর্যায়ের প্রয়োজন ও তাগিদে উপন্যাস ও ছোটগল্প কিংবা কবিতাকে অতি আধুনিকতার নানারকম ছাঁচে ঢাললেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পরীতিকে সমস্ত পর্বেই জনগণাত্মক রাখতে চেয়েছেন, ভাষাকে এবং বর্ণনাশৈলীকে প্রধানত গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীর আকাড়া কথাবার্তা ও আচরণে সম্পৃক্ত রেখে।

৩

উপরোক্ত নির্দেশিকাগুলোকে এখানে খুব সংক্ষেপে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

প্রথমেই গায়ে গতরে খেটে খাওয়া নরনারীদের কথা। এবিষয়ে এখানে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও অনুশীলনীয়।

প্রথমত, বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের যে কথা আমাদের এই প্রিয় কথাশিল্পী বলেছেন, বিশের দশকে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল উপমহাদেশে পরাধীনতার অবসানের জন্য বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের খেটে খাওয়া নরনারীর নিচুতলার গহন কন্দর থেকে বেরিয়ে বিপ্লবের পতাকা নিজেদের হাতে নেয়ার ফলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই ঘটনা ছিল সারা বিশ্বব্যাপী ঘটনার অংশ। সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি এই সময়ে আমাদের উপমহাদেশের শ্রমজীবী জনগণের সাফল্য ছিল এই যে, এই উত্থান সাময়িক হলেও গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষ স্বাধীন ও

সমাজ বিপ্লবের মূলশক্তি হিসেবে নিজেদের সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাছাড়া জনগণের উত্থান একটা ঝড়ের মতো প্রশমিত হলেও বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবীরা যে প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটা মুছে যাবার ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে শ্রমজীবীরা বিপ্লবের নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছিল। অতি আধুনিক বাস্তববাদীরা এই প্রতীকে সীমিত না থেকে শ্রমজীবীদের প্রধান চরিত্র করে লিখেছিলেন উপন্যাসে, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে বিষয়টি সীমিত রাখলে দেখা যাবে, কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি ছোটগল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'আকস্মিক', শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' শ্রমজীবী নরনারীর চরিত কথা এঁকেছিল।

এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছেন। তিনি ১৯২৮ সালে প্রথম গল্প লেখার সময় কল্লোলগোষ্ঠী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গী নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীদের নিয়ে যেভাবে লিখেছিলেন সেইভাবেই শুরু করেছিলেন। তিরিশের দশকেই কিন্তু দেখা গেল, শ্রমজীবী মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবাক করে দিয়েছিল অনেককে, যদিও একটা খাটকাও ছিল। এই উপন্যাসের সমসাময়িক আরও চারটি উপন্যাস 'জননী' 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং 'জীবনের জটিলতা' নিম্নমধ্যবিত্তদের পরিধির মধ্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবচেতন-চেতনের ক্রিয়াকলাপগুলোকে বেশ জোরালোভাবে প্রয়োগ করায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'কেও মনে হয়েছিল শ্রমজীবী নরনারীর নিমগ্ন মনের কাজ দেখানোরই একটা প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু তিরিশ দশকের শেষের দিক এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে 'শহরতলী' উপন্যাসের দুই খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গেল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার চুম্বকক্ষেত্রের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন শ্রমজীবী মানুষদের এবং তাদের বিপ্লবী সংগ্রামকে।

চল্লিশের দশকে সরাসরি শ্রমজীবীদের নিয়ে লেখা ছাড়াও যেসব উপন্যাস ও ছোটগল্প তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এলো, সেগুলোতে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন দর্শনকে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লব করার দর্শনের অনুসারী করা হয়েছে। মজুর কিষাণের উত্থানেই সমস্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা। সমস্ত স্তরের শোষিত ও লাঞ্ছিত ও আশাহত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং সংকটগ্রস্ত নরনারীকে তিনি এই অদম্য বিপ্লবী অবিশ্রান্ত গণউত্থানের অভিমুখী করে দিয়েছেন।

'শহরবাসের ইতিকথা' 'ইতিকথার পরের কথা' 'সোনার চেয়ে দামী' কিংবা এমনকি 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জীবন-চিত্র বড় হলেও, জীবনের অর্থ পাবার সংকেত রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষদের ক্রিয়াকলাপেই।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামাজিক ভাঙচুরের উপাদান নিয়ে লেখা উপন্যাস 'চিন্তামণি' ১৯৪৬ সালের নৌ ধর্মঘটের সমর্থনে কলতকাতায় গণঅভ্যুত্থানের উপকরণ নিয়ে লেখা উপন্যাস 'চিহ্ন', ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের মালমসলা নিয়ে লেখা 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের দিকে প্রত্যক্ষভাবে

নির্দেশ রয়েছে। এখানে লক্ষণীয় 'চিন্তামণি' গ্রামীণ পরিবেশের কাহিনী হলেও চাষী কিভাবে শ্রমিক হতে চলেছে তার দিকে ইঙ্গিত করেই দুঃখ জয়ের হদিশ রয়েছে।

খেটে খাওয়া নরনারীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বহু স্তরের মানবমানবী-চরিত্রে বহুলভাবে আনার মধ্যেও যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, তার একটা প্রমাণ নারী সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবোধ সৃষ্টি।

নরনারীকে বিপ্লবের পক্ষপাতী হিসেবে সমমর্যাদা দেবার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিচার্য করেছেন তিনি নারীর পরিশ্রমী সত্তাটিকে। ক্ষেতখামার কিংবা কারখানার শ্রমিকদের অগ্রণীর ভূমিকায় তিনি রেখেছেন নারীকে। 'শহরতলী'তে যশোদা, দর্পণ উপন্যাসে রম্ভা, 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে লক্ষ্মী, 'হারানের নাতজামাই' গল্পে হারানের নাতী এরা মেহনতী নারী হিসেবে মজুর কিষাণদের মতো সমানভাবে খাটিয়ে।

গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষদের বীর হিসেবে সামনে এনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বহু বীর নরনারী সমন্বিত গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস 'দর্পণ' লিখেছেন, তাতে নারীর উপরোক্ত শ্রমিক সত্তার জয়গান গেয়েছেন তিনি। রূপবতী সে, যে সংগ্রামী মেহনতী। যেমন, রূপবান সে, যে রূপবান মেহনতী।

এখানেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার ঘটনাও বিশেষ ব্যাখ্যার দাবীদার নিশ্চয়। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে শ্রমজীবী জনগণের প্রাধান্য ঘটানোর প্রাথমিক কাজ তিনি না করলেও প্রথমত পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই প্রাধান্যের ধারা নিয়ে একাদিক্রমে কাজ করেছেন তিনিই এবং দ্বিতীয়ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবচেতন চেতনের সূত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে খেটে খাওয়া নরনারীর নিমগ্ন মনের শক্তিপুঞ্জের সন্ধান একাদিক্রমে তিনিই করেছেন। সেই মানুষ সমৃদ্ধ, যার মধ্যে পৃথিবীকে বদলে দেবার মানসিক শক্তি অবচেতনের তলায়। সাধারণ শ্রমজীবীরা এই শক্তির অধিকারী। এটা তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁকে অতি বাস্তবতাবাদের নয়া প্রবর্তক বলাটা যথোচিত।

নিমগ্ন মনের শক্তিপুঞ্জের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমে তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীকে উপন্যাস ও ছোটগল্পের বৃত্তে টেনেছিলেন। এর কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রথমে এদের সঙ্গেই ছিল। বাস্তবতাবাদীর উচিত প্রত্যক্ষকেই চিত্রিত করা, এই ঔচিত্যবোধও নিশ্চয় তাঁর মনে কাজ করেছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ যত বেশি শ্রমজীবীদের সঙ্গে বেড়েছে, এর ফল হয়েছে এই যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দিকে তাঁর যে ঝোঁকের জন্য তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের মতো ভাবলৌকিক বাস্তবচিত্র এঁকেছেন, সেই ঝোঁককে অ-ভাবলৌকিক 'চিন্তামণি' উপন্যাসে নিয়োজিত করেছেন।

এখানে তাহলে আমরা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নে দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ১. আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খেটে খাওয়া নরনারী চরিত্রকে প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী করেছেন। ২. খেটে খাওয়া নরনারীর বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামকে ক্রমাগত উজ্জীবিত রেখেছেন বলে নিম্নবিত্তের মনের গহনে সন্ধান

করতে গিয়েও 'পদ্মা নদীর মাঝির' লেখক অবচেতনায় আচ্ছন্ন হলেও চেতনায় উত্তরিত হবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত হননি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবক্ষয়ী প্রয়োগের রেওয়াজকে কখনও কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেননি। নরনারীর যৌনজীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে অবচেতনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সত্যচিত্র দিতে চেয়েছেন তাঁর বহু উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে। চল্লিশের দশকেও 'চুতষ্কোণ' উপন্যাসে দিবারাত্রির কাব্য-সংক্রান্ত যৌনমানসের ছবি এঁকেছেন। তবে সেখানেও অবক্ষয়ীরা যেভাবে যৌনতাকে সর্বময় করে সমগ্র জীবনসত্যকে খণ্ডিত করতে চেয়েছে সেরকম কিছু করেন নি তিনি। 'দিবারাত্রির কাব্য' কিংবা 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য যৌনতা নয়। উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ মানব-মানবী চরিত্র, বহু চরিত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্রকথা। সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা ছাড়া অন্য কিছু যখন বলতে চান নি, তখন তাঁর কট্টর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেটাও তিনি এনেছেন বিপ্লবের বিপুলতাকে দেখাবার জন্যে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের মধ্যে অবস্থান করে তাঁর নরনারীর চরিত্রগুলিকে লেখার পরিধিতে টেনে নিয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেকের মুক্ত সত্তাটিকে বুঝতে গিয়ে অনুপম মাধুর্যের ছবি যেমন পেয়েছেন, তেমনি জৈবিক আকাঙ্ক্ষাও পেয়েছেন। এই মুক্ত সত্তাই বাস্তবজীবনে এবং বিপ্লবের সংগ্রামের উন্মোচনে জৈবিকতায় আবদ্ধ থাকাকে ইচ্ছা নাম দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি। বিপ্লবের কাছ থেকে সে পেয়েছে বিপুলতর ইচ্ছা। এই কারণেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পে যৌনতা বা জৈবিকতা ক্লেদসৃষ্টির ফুরসুত পায়নি।

৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট থেকেও অবক্ষয়ীদের ফাঁদে পা দেননি, তার মূলে ছিল তাঁর খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও সম্ভাবনাময় শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংযোগ। কিন্তু এখানে আরও একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। মার্কসবাদ লেনিনবাদকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের কথা লিখতে লিখতে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের ভাবের ঘোরের কারবারী একদিন কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন। তাঁর এই কমিউনিস্ট হওয়াটা তাঁর জীবনতৃষ্ণা এবং শ্রমজীবী দর্শনের অবধারিত সিদ্ধান্ত। তিনি খেটে খাওয়া মানুষের লেখক এবং কমিউনিস্ট পার্টি খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির কথা সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলে, এই জন্যে তাঁর কমিউনিস্ট না হয়ে উপায় ছিল না।

কমিউনিস্ট হয়েছিলেন বলেই অবশ্য একদিকে যেমন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবক্ষয়ীরা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারে নি, তেমনি তিনি নিম্নবিত্তদের সহস্র জ্বালাযন্ত্রণা ও সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে নিরালম্বভাবে থাকতে না দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট হয়ে আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে থেকে ছিলেন বলে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবের অন্যতম অতি-আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন চূড়ান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস লিখবার সময় নির্মল বাতাসের মতো প্রাকৃতিকভাবে অপরিহার্য জীবনের উপকরণরূপে সামনে এনেছিলেন। 'ময়না দ্বীপে' হিন্দু মুসলমানেরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান খাড়া করবে না, এটা ছিল একটা বক্তব্য। এই প্রাকৃতিক সামাজিক ব্যাপারটাকে আমরা 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে পাই কমিউনিস্টের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তায় বিন্যস্ত।

দেশ ভাগ হবার পরে 'ছিন্নমূল' মানুষ নিয়ে তিনি যে 'সার্বজনীন' উপন্যাসটি লিখলেন কিংবা কৃষক অভ্যুত্থানের গল্প লিখলেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে একজন কমিউনিস্টের সংস্কারমুক্ত সূর্যোজ্জ্বল মন।

মার্কসবাদ লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানোর তাগিদ এই কমিউনিস্ট অতি আধুনিক লেখকের মনে জাগ্রত ছিল ৪৭ সালের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে।

তাঁর আন্তর্জাতিকতা অবশ্যই আকাশচারী ছিল না কোন দিক দিয়েই। তিনি যেমন কমিউনিস্ট হয়েছিলেন খেটে খাওয়া মানুষের কথা লিখতে গিয়ে তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারায় যুক্ত থেকে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং লেখায় খোলাখুলি নিয়ে আসেন। এই স্বাধীনচেতা ও জাত বিদ্রোহী মানুষটি প্রগতি লেখক সংঘের প্রবক্তা এবং বামপন্থী আন্দোলনের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়ান। অবক্ষয়ীরা, প্রতিক্রিয়ার তল্পীবাহকেরা এবং কিছু কিছু সংগ্রাম বিমুখ সাহিত্যানুরাগী এই ব্যাপারটাকে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারে কাজে লাগিয়েছে। তারা বলেছে, 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য' যিনি লিখেছেন তিনি যে এমন বই আর লিখলেন না, তার কারণ রাজনীতি। অর্থাৎ কমিউনিস্ট রাজনীতি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'পদ্মা নদীর মাঝি'র লেখক রাজনীতি বর্জিত কোনদিনই ছিলেন না। প্রথমদিকে তাঁর মনে রাজনীতি ছিল অন্তঃশীল। যে শ্রমজীবী নরনারীর মনোভূমিকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের উত্থান এবং দৃষ্টিগোচর হওয়াটা সম্ভব ছিল বিশের এবং তিরিশের দশকে রাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থানের জন্যেই। তিরিশের দশকের শেষের দিকে শরতলীতে যে ধর্মঘটের তরঙ্গ উঠেছিল, তার মর্ম ছিল রাজনৈতিক। ১৯৪৩ সনে লেখা 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি পড়লে বুঝতে পারা যায়, রাজনীতি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন। এর মধ্যে দুটি দিকই প্রবল। 'প্রতিবিম্ব' বইটির লেখক কমিউনিস্টদের কাছ থেকে চেয়েছেন বেশি স্বাদেশিকতা। এখানে একটা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল এটা পাচ্ছেন না বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই

কমিউনিস্ট মহিলাকর্মীর যে মর্যাদাপূর্ণ ছবি তিনি এতে এঁকেছেন, তা একজন গুণগ্রাহী ছাড়া অন্য কারও কাছে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এটা সত্য নয় যে, ১৯৪৪ সনে কমিউনিস্ট হবার আগে তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি রাজনীতির গভীর খোঁজই রাখতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার পরে তাঁর লেখায় বস্তু-সত্য বাড়লো। 'দর্পণ' এর প্রমাণ। 'দর্পণ' উপন্যাসে তিনি দেখালেন, কমিউনিস্টরা স্বদেশের নিচুতলার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই লড়াই করে, কমিউনিস্টরা আকাশচারী নয়। এই প্রত্যয় প্রত্যক্ষ বাস্তব রাজনীতিতে তাঁর বেশি বেশি করে জড়িত হওয়ার দরুন ক্রমাগত বেড়েছে বলেই 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্প বেরিয়ে এসেছে ইস্তাহারকে নাটকীয়তা দিয়ে। লেখক ইস্তাহার নিয়ে গল্প লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করেননি।

৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যেমন লিখবার জন্য দেশ, বিশ্ব ও জনগণের কাছ থেকে উপকরণ নিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন তিনি কঠোর পরিশ্রম। নেবার দিক থেকে যেমন তিনি ছিলেন নম্র, দেবার ব্যাপারেও ছিলেন বিনত। যে লেখক আটাশ বছর খেটে খাওয়া নরনারীকে নিয়ে একটানা লিখে গেলেন দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা এবং অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে, তিনি নিশ্চয় খুবই একগুয়ে ছিলেন। কিন্তু নিজেকে কোনদিন তো একাকী কিংবা বিচ্ছিন্ন মনে করলেন না। এই চূড়ান্ত সংবেদনশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী লেখক লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বড় লেখক হবেন। এই কারণেই তিনি বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে মন না বসিয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করলেন উপন্যাস ও ছোটগল্পে এবং কবিতায়। খ্যাতি অর্জন করলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই 'প্রথম লেখাটি লিখে'। একটা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তিনি চড়া অতি আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও অতি আধুনিকতার বিরোধীরা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত মহলের প্রিয়। তারাশঙ্কর তখন 'দুই পুরুষ', 'ধাত্রী দেবতা' ও 'গণদেবতা' লিখেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী', 'অপারাজিত' লিখেছেন। বাংলা উপন্যাস নতুনভাবে জমজমাট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত আত্মসচেতন থেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। চল্লিশের দশকের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পীকে দেখা গেল, লেখার স্বাতন্ত্র্যকে বেশি বেশি করে পরিস্ফুট করতে।

কিন্তু কোন পর্বেই বিচ্ছিন্ন ও আত্মনিবদ্ধ হবার উপায় তাঁর ছিল না তাঁর লেখার কুশীলব নির্বাচনের দরুন। বিপ্লবী জনগণের যেমন একক ও ছিঁড়ে ফুড়ে একাকার হলে সর্বনাশ, বিপ্লবী লেখক লেখিকারও তেমনি বিচ্ছিন্ন ও আত্মনিবদ্ধ হলে সর্বনাশ। আত্মম্ভরিতা ছিল তাঁর কাছে অকল্পনীয়।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসকে যখন অতি আধুনিকতাবাদীরা তুলো ধুনো করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ প্রশ্নকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতা লিখেছেন, এই জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন তাঁর কবিতা না লিখলেও চলবে, কারণ যা চাই তা সুকান্ত দিয়েছেন।

৬

'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'দর্পণ', ও 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের অতি আধুনিকতাবাদী লেখক যদি একটা নিজস্ব কথকী ধারা ঠিক করে নিতেন, তাহলে তা অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতো না। কারণ, বাংলায় এবং অন্যত্র অনেকেই তা করেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গণকথাশিল্পী হবার জন্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাকে জনগণাত্মক রাখতে চেয়েছেন এবং এই কারণেই শুধু সংলাপ নয় বর্ণনাও হয়েছে জনগণাত্মক।

অবশ্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষাকে জনগণাত্মক করার প্রাথমিক কৃতিত্ব তাঁদের যাঁরা বিশের দশকের শুরুতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে ছিলেন খেটে খাওয়া পরিবেশ ও মনের কথাকে বাস্তবানুগ, সত্যসন্ধ এবং সোচ্চার করে খুলে বলার জন্যে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রদূত। বীরভূম ও বর্ধমানের শ্রমজীবী মানুষকে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছেন। রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাঁর এই ভাষা প্রয়োগ দ্বারা শ্রমজীবী-চিত্তকে প্রকাশ করার চেষ্টায়। কিন্তু বিশের দশকের গণউত্থান প্রশমিত হবার পরে একদিকে যেমন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে ভাটা পড়ে, তেমনি এক অঞ্চলের সুশিক্ষিত মানুষের চলতি ভাষা অতি আধুনিক রীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। তিরিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে একটি ছোটগল্পে আনুপূর্বক পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহার করে একটি চমক আনলেন। এরপর 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে সংলাপে এই ভাষার ব্যবহার দ্বারা পদ্মানদী ও তার দুপারের বাসিন্দাদের মুখরিত করে দিলেন।

বিশের দশকে যেটা পরীক্ষার স্তরে রয়ে গিয়েছিল, সেটাকে স্থায়ী করেছিলেন তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরের দশকে 'চিন্তামণি' উপন্যাসে পত্র রচনায় চব্বিশ পরগণার গ্রামীণ ভাষা ব্যবহার করে ব্যাপারটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিলেন। 'চিন্তামণি'তে যেহেতু পত্রই হলো ঘটনাবলির যোগসূত্র, সেজন্য সমস্ত বর্ণনাটাতেও একটা গ্রামীণতা এসে গেলো।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে উত্তরকালে ছোটগল্পগুলোতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনায় ও সংলাপে কলকাতা মহানগরীর শহরতলি ও চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার একটা আদল করালেন। এই ভাষাটা এমন যে, কথাগুলি শহরমুখী গ্রামীণ নরনারীর মনের অচেতন স্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন। 'ইতিকথার পরের কথা'ই হোক অথবা 'হারানের নাতজামাই' এর মতো ছোটগল্প হোক, এর বর্ণনাতেও ভাষা জনগণাত্মক। একটা ব্যাপার ঘটাচ্ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত। উপন্যাস ও গল্পকে বর্ণনাতেও খেটে খাওয়া মানুষের নিকটস্থ করে তুলছিলেন। শব্দে শুধু নয়, পদ ব্যবহারেরও চেষ্টা ছিল তাঁর বহুকালের লিখিত সাহিত্য ও জনগণের ব্যবধানকে পুরোপুরি ভেঙ্গে দেবার। আঞ্চলিকতাকে ছাপিয়ে সমস্ত খেটে খাওয়া

মানুষের মধ্যে যাতে ভাবের আদান প্রদান হতে পারে এজন্য তিনি একটা অশিক্ষিত চলতি ভাষার প্রচলন করছিলেন। আরও একটা ঘটনা এখানে লক্ষণীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খেটে খাওয়া মানুষের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বও বড় ছিল বলেই তাদের আঞ্চলিক ভাষা বড় ছিল। যখন মনে হয়েছে, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার না করেও শ্রমজীবী মানুষকে, অথবা তার সঙ্গী নিম্নবিত্ত শোষিত বঞ্চিত সামান্য মানবমানবীকে বড় করে প্রকাশ করা যায়, তখন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেননি তিনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'পদ্মা নদীর মাঝি' এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' একই সময়ে পূর্ব বাংলা নিয়ে লেখা হলেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেননি।

কিন্তু বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পকে জনগণাত্মক করে তোলার জন্যে এর ভাষা ও শিল্পগত গঠনে একটা সহজ আদলের প্রবর্তন করার ব্যাপারে তিনি ক্রমাগত এগিয়ে আসছিলেন।

সহজ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে সমস্যায় প্রবেশ, এই যে ইচ্ছাকৃত শিল্পরূপগত ধরনের অতি আধুনিকতার ভাংচুর, এর জন্যেও তাঁকে পরের দিকের লেখার কঠোর বা 'কট্টর' হতে হয়েছে।

পরের দিকের উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রাসাদগুণের ও স্বাচ্ছন্দ্যের আপেক্ষিক অভাবের মূলে রয়েছে এই জনগণাত্মক শৈলী তৈরির অসম্পূর্ণতা। মহিমাময় এই অসম্পূর্ণতা উত্তরসুরীদের জন্যে নতুনের ভিত্তি।

৭

আরও যা লিখতে চেয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তা লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু যা লিখে রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের বাংলার শিল্পরূপে প্রাধান্যের তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে পৌঁছবার সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের বিশ্বব্যাপী সমাবেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামনের সারিতে রয়েছেন তাঁর মৃত্যুভেদী লেখাগুলোকে নিয়ে। বাংলা এমন একজন লেখককে বিশ্বসমাবেশের সামনের সারিতে দিতে পেরেছে বলে নন্দিত।

বিশ্বের সকল ভাষার মানবমানবীরা সর্বাত্মক মুক্তির সাম্যবাদী সমাজের জন্যে প্রয়াসে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে বুঝবার প্রয়োজনে যে শিল্পরূপের বিবরণ চায়, তাতে বাংলার সুদৃঢ় যোগ রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রামাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার আদরও তাই বাড়তেই থাকবে। যেভাবে গোর্কির আদর বাড়ছে কিংবা ব্রেখট, নেরুদা, বারবুসে কিংবা লুই আরাগঁ এবং এমন সব কমিউনিস্ট গণকথাশিল্পীরই আদর বাড়ছে সেইভাবেই।

শ্রমজীবী নরনারীর হাতে এগিয়ে চলার লাল পতাকা। দেশে দেশে নতুন নতুন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কাজ করছেন। কোন কাজ সম্পূর্ণ কোন কাজ অসম্পূর্ণ। খেটে খাওয়া মানুষেরা সম্পূর্ণ করে নেবে। কারণ, শ্রমজীবী মানুষই সমস্ত শিল্পসুষমার

সৃষ্টির মূলে। বহুকাল এ কাজ খেটে খাওয়া মানুষ করেছে সমাজের মধ্যে চাপা পড়ে অন্তঃশীল থেকে। আজ বোঝাপড়া করছে তারা প্রকাশ্যভাবে, কারণ বিশ্বের দখল নেয়া হলো বলে তারা ঘোষণা জারী করে দিয়েছে।

অন্তঃশীল ও প্রকাশ্যের বিস্ফোরিত সম্মেলনের অতি আধুনিক গণকথাশিল্পী কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর স্মারকসঙ্গী।

বিপ্লবী নয়া ধ্রুপদী গণ-কথাশিল্পী সত্যেন সেন

আমাদের উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে জনগণের অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানে যাঁরা নিরন্তর বর্তমান শতকের প্রায় গোড়া থেকে আশির দশক পর্যন্ত একটার পর একটা ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্রতী ও উদ্যোগী থেকেছেন, সত্যেন সেন সেই কর্মীদেরই একজন। তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ববাংলা তথা আজকের বাংলাদেশ। তাঁর বহুমুখী কাজের মধ্যে একটি, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঝড়ের বেগে বাংলা ভাষার নয়া ধ্রুপদী ধারার উপন্যাস ও গণচরিত্রের আলেখ্যমালার সৃষ্টি।

পদ্মা আর ধলেশ্বরীর বিপুল জলধারায় আলিঙ্গিত ঐতিহাসিক বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে একটি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পরিবারে জন্ম। কৈশোর থেকেই আরব্ধ বিপ্লবী জীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায় কখনও খরবেগে এবং কখনও বা শান্ত পদক্ষেপে পেরিয়ে পশ্চিম বাংলার শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীতে '৮১ সালে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যু। ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্রামের জন্য পৌঁছেছিলেন দৃষ্টিহীন ও অসুস্থ অবস্থায় বড়বোনের হেফাজতে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর প্রিয় কোপাই নদীটিও শীর্ণা, জলহীনা।

আমরা বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সত্যেন সেনের বিশেষ করে লেখক রূপের একটা আন্দাজ করে সামনে রাখতে চাই। তবে আমরা মনে করি, এই দিকটিকে বুঝবার জন্যও তাঁর বিপ্লবী জীবনের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার একটা ছক প্রথমেই থাকা দরকার। এর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ধ্রুপদী ধারার সমৃদ্ধির একটা ছবি পেতে পারি। সুতরাং এই ছকটি দিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষাটি উপস্থিত করছি। প্রসঙ্গক্রমে ক্রিস্টোফার কডওয়েলের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়, "বিজ্ঞান ও উপন্যাসের জন্য চাই অভিজ্ঞতা।" শেখ সাদী তো কবিতা লিখবার জন্যও দুটো জীবনকাল চেয়েছিলেন। একটা অভিজ্ঞতা জমা করার জন্য; অপরটা, তাকে কাব্যে রূপ দেখার জন্য। সত্যেন সেনের সমস্যা ছিল, 'এত অভিজ্ঞতাকে শিল্পরূপের ছাঁচে রাখতে সময় পাবো তো?"

বাংলার অগ্নিযুগের একটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন ছেলেবেলাতেই। তিরিশের দশকের শুরুতে পলাতক জীবন। তারপর ধরা পড়ে সাত বছর জেল ও অন্তরীণে কাটিয়েছিলেন। আটত্রিশ সালে কারামুক্তির পরে ঢাকা জেলা কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসেবে কৃষক সমিতির কাজে গোটা চল্লিশের দশকটাই ব্যয় করেন। ইতিপূর্বে জেলখানা থেকে বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। কিন্তু সমিতির কাজ সারাক্ষণের হওয়ায় কোন শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেননি। পারিবারিক সূত্রে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত তার মজ্জার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রচর্চা ছিল ফল্গধারা, কৃষক আন্দোলনের কাজে লাগতে পারে ভেবেই তিনি গণসঙ্গীত লেখা শুরু করেন। '৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর লেখা গান ঢাকা জেলার কৃষকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর দুয়েকটি গান এই সময় কলকাতাতেও গাওয়া হয়েছে।

'৪৭ সালে বাংলা ভাগ হলে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে পূর্ব বাংলায় তথা বাংলাদেশে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থচক্রের আগ্রাসী শাসন ও শোষণ কায়েমের ডামাডোলের মধ্যে গণসংগঠনগুলিকে বাঁচাবার জন্য ঢাকা শহরে জেলা পার্টির তরফ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তখন পার্টির অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন অথবা আত্মগোপন করেছেন। বছরখানেক পর নিজেও আত্মগোপন থাকা অবস্থায় '৪৯ সালের শুরুতে গ্রেপ্তার হয়ে যান। '৫৩ সালের শুরুতে মুক্তি পেয়ে ঢাকা শহরেই থাকেন। এই সময় '৫৩-'৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়ী হবার মুখে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য টীম অফিস খুলে কাজ শুরু করে। '৫৪-তেই পাকিস্তানের শাসকচক্র আধা সামরিক শাসন জারী করে বিজয়ী যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রীসভাকে অপসারিত করে ব্যাপক হামলা শুরু করলে যাঁরা সারা পূর্ব বাংলায় গ্রেপ্তার হন তাঁদের মধ্যে সত্যেন সেনও ছিলেন অন্যতম। '৫৫তে জেল থেকে বেরিয়ে এসে সত্যেন সেন তিনবছর সংবাদ কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। এই সময় তিনি তেভাগা ও হাজং আন্দোলনের উৎস সন্ধানে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের উত্তরে ও পশ্চিমে কয়েকটি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং বীর সংগ্রামী কৃষক নারী পুরুষদের আলেখ্য রচনা করে সংবাদ কাগজে প্রকাশ করেন। এই লেখাই বই আকারে 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' নামে আত্মপ্রকাশ করে। তখন সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী চলছিল। সত্যেন সেন লেখেন 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। '৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতায় এলে যাঁদের সর্বপ্রথম সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়, সত্যেন সেন তাঁদের একজন। '৬৩-তে বেরিয়ে আবার '৬৫তে কারারুদ্ধ হয়ে '৬৮ পর্যন্ত জেলখানায়। এই সময় জেলের ভিতর ও বাইরে তাঁর বড় কাজ ছিল একটির পর একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস অথবা আলেখ্যমালা রচনা। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের ভাষায় 'জেলখানা ছিল তাঁর বই লেখার কারখানা।' '৬৮ সালে জেলখানা থেকে বেরিয়ে সত্যেন সেন ঢাকা শহরের কয়েকটি তরুণ তরুণীদের নিয়ে স্থাপন করেন গণনাট্য ও গণসঙ্গীতের সাহায্যে বাংলাদেশের গণঅভ্যুদয়কে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

ইতোমধ্যে তিনি দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাতে বসেছেন। এই অবস্থাতেই একটার পর একটা বই লিখছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় উদীচীর তরুণকর্মীরা তাঁকে ঢাকা শহর থেকে বার করে বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে সমস্ত রকমের বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কলকাতা পৌঁছে দেন। মস্কোতে হাসপাতালে আফগানিস্তানের বিপ্লবী নেত্রী আনাহিতা, ভারতের হাজেরা বেগম এবং আরও অন্যান্যের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট নেতা

মোজেস বোটেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই হাসপাতালে তিনি পেয়ে যান মেক্সিকোর এক বিপ্লবী দম্পতিকে, লাওসের এক মুক্তিযোদ্ধাকে। সত্যেন সেনের কথার বিষয়বস্তুর জগতে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সংহতির একটা জানালা খুলে যায়। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে এসে উদীচী করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থাতেও মস্কোর সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের আলেখ্য লিখতে শুরু করেন সংবাদ পত্রিকাতে। মস্কোতে চোখের ব্যাপারে কোন কিনারা হয়নি। কারণ তার চোখের অবস্থা কয়েক বছর আগেই চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। ফিরেছিলেন অবশ্য শারীরিক দিক থেকে অনেক শক্তি নিয়ে, তাছাড়া একদিকে আন্তর্জাতিক সঙ্গীদের কথা, অন্যদিকে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কথা লেখার জল্পনা কল্পনা তাকে চাঙ্গা করে দিয়েছিল। কিন্তু '৭২ এর শেষের দিকেই এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, তাঁকে বিশ্রাম নেবার জন্য শান্তিনিকেতনে যাত্রা করতে হয়। এখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি রোধ করা যায় না। বাংলাদেশে ফিরতে না পারার এই কয়েকটা বছরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি কয়েকখানা বই নিজে অথবা স্বেচ্ছাসেবিকাদের সাহায্যে লিখেছেন। মন ভরেনি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও তিনি বন্ধুদের কাঁধে হাত রেখে শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি সাঁওতাল পল্লীতে নতুন লেখার উপাদান খুঁজেছেন। জোগাড়ও করেছেন নিশ্চয়ই তাঁর চিরাচরিত রীতিতে ভ্রাম্যমানের ঝুলিতে। সম্ভাবনা ছিল, এই দিকটা সত্যেন সেনের গণসাহিত্য সৃষ্টির নয়া ধ্রুপদী ধারায় বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই নূতনভাবে উদ্ভাসিত হতো। কিন্তু মৃত্যু সে সুযোগ তাঁকে দেয়নি। তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তাকে প্রচুরই বলা যায়। আমরা এখন সরাসরি সে কথাতেই যাব।

২

আমরা সত্যেন সেনের তিরিশটিরও বেশি বই এর মধ্য থেকে কুড়িটি বই নিচ্ছি তাঁর বহুমুখি গণকথার মূল কাজ হিসেবে। বইগুলির নাম, ১. কুমারজীব, ২. পুরুষমেধ, ৩. অভিশপ্ত নগরী, ৪. পাপের সন্তান, ৫. আলবেরুনী, ৬. মসলার যুদ্ধ, ৭. মহাবিদ্রোহের কাহিনী, ৮. অপরাজেয়, ৯. অভিযাত্রী, ১০. মেহনতি মানুষ, ১১. বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম, ১২. গ্রাম বাংলার পথে পথে, ১৩. রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ, ১৪. মনোরমা মাসীমা, ১৫. সীমান্ত সূর্য গফ্ফার খান, ১৬. ভোরের বিহঙ্গী, ১৭. মা, ১৮. সেয়ানা, ১৯. পদচিহ্ন, ২০. উত্তরণ।

এই কুড়িটি বই এর মধ্যে দুটি–'অভিশপ্ত নগরী', ও 'পাপের সন্তান'-এ বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্টের কাহিনীমালা' থেকে আবেগপ্রাণ পুরুষ ও নারী চরিত্র নিয়ে আসা হয়েছে প্রাচীন যুগের বিশ্বাস ও হতাশ্বাসের ছন্দাত্মক ভাব সংঘাতের চিত্রে। বাদবাকী ১৮টি বইয়ে আমাদের উপমহাদেশের আদি কিংবা মধ্যযুগের জনজীবন ও দর্শনচিন্তার প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্বাস ও যুক্তির ব্যাপ্তি ও ঘাত সংঘাতের পর আধুনিক কালের পূর্বাহ্নে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে পরিণত হবার ন্যাক্কারজনক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে স্থানীয় অথবা কেন্দ্রিয় প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রক্তাক্ত

উদ্বোধন এবং আরও পরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পরশাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য অগ্নিযুগ থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক মজুর, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একই সঙ্গে স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্যায়ের পর পর্যায়ে অভ্যুদয়ের পর অভ্যুদয়ের আলেখ্যমালা আঁকা হয়েছে। 'কুমারজীব' 'পুরুষমেধ', 'অভিশপ্ত নগরী', 'পাপের সন্তান' ও 'আলবেরুনী' আমাদের তালিকার এই প্রথম পাঁচটি বই ঐতিহাসিক উপন্যাস, পরবর্তী তিনটি বই 'মসলার যুদ্ধ, 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' ও 'অপরাজেয়' ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের আলেখ্যমালা। এরপরের পাঁচটি 'অভিযাত্রী', 'মেহনতি মানুষ', 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম,' গ্রাম বাংলার পথে পথে', ও রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' সমসাময়িক চরিত্র ও সংগ্রামের অসংখ্য আলেখ্য গাঁথা কাহিনীর অগ্নিমালা। এর পরের দুটি বই 'মনোরমা মাসীমা' ও 'সীমান্ত সূর্য গফ্ফার খান।' এরা একেকটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনী, সর্বশেষ পাঁচটি, অর্থাৎ 'ভোরের বিহঙ্গী', 'মা', 'সেয়ানা', 'পদচিহ্ন', ও 'উত্তরণ' সাম্প্রতিক বা অতি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক রদবদলের মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বলয়ের ভিতরের ও বাইরের বহু জটখোলার প্রয়াসে ও চিন্তাভাবনায় নিয়োজিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ ঘরের নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অথবা পারিবারিক অথবা বৃহত্তর সমাজ ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ভাঙ্গাগড়া নিয়ে লেখা বহুচরিত্রভিত্তিক সমসাময়িক উপন্যাস। চরিত্রচিত্রের বলয়ের মধ্যে জাহাজের সারেং খালাসীও স্থান করে নিয়েছে।

আমাদের এই পর্যালোচনাটিকে উপক্রমণিকারূপে উপস্থিত করছি বলে আমরা উপরোক্ত কুড়িটি বই-এর ঢালাও পরিচিতিতেই সীমিত থাকছি। তাঁর যেসব বই আমাদের উপস্থাপিত কুড়িটির বাইরে রয়েছে, গণসাহিত্যের এক্তিয়ারে তারা আসে না বলেই তাদের টানিনি। অবশ্য দুষ্প্রাপ্য দুয়েকটি বই অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন দুয়েকটি গণকথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বক্তব্য উপস্থাপনে যাতে কোন অস্পষ্টতা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এদের আপাততঃ আলোচনার বাইরে রেখেছি। শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করা যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলে রাখা যেতে পারে। গোকুলনাগের 'পথিক' উপন্যাসটিকে সত্যেন সেন ও তাঁর সমসাময়িক জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়েছে এই নিবন্ধ লিখতে বসে। কিন্তু গোকুল নাগ ও তাঁর 'পথিককে' আপাততঃ স্থগিত রেখে দিয়েছি। কারণটা খুব পরিষ্কার। পথিক উপন্যাসটিকে খুঁজে বার করে মিলিয়ে দেখা প্রায় অসম্ভব। পাঠক পাঠিকারা খুঁজে দেখে মেলাবার চেষ্টা করতে পারেন।

৩

এবার আমরা পরবর্তী জরুরি বিষয়ে আসি। আমরা তাঁর কুড়িটি বই-এর যে মর্ম উপস্থিত করেছি, তাতে গণসাহিত্যের মূল নায়ক জনগণের কথাটাই কয়েক কথায় বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁকে যে নয়া ধ্রুপদীধারার গণকথা শিল্পীরূপে প্রথমেই চিহ্নিত করে নিয়েছি তাঁর কোন ব্যাখ্যা দেইনি। এই নয়া ধ্রুপদীশৈলীর ব্যাপারটা নিম্নরূপ।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও তাঁরই ধারায় বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রাম তথা গণঅভ্যুদয় বাংলার লেখক-লেখিকাদের কাছে এমন ধরনের লেখার তাগিদ ও প্রত্যাশা উপস্থাপিত করেছে, যা শুধু নতুন ও নতুনতর সমসাময়িক বিষয়বস্তুতে নয়, রচনাশৈলীতেও একটা হেরফের নিয়ে এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশের লেখক-লেখিকারা এই উভয়বিধ দাবী পূরণ করেছেন। এই সত্যেই দেখা গিয়েছে সাধারণভাবে সমগ্র বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্যিক অথবা সমকালীন বিভিন্ন শৈলীর যে ধারাকে ভাষা আন্দোলনের পরে আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, তার পাশাপাশি একশ বছর আগেকার ধ্রুপদী ধারা নতুনভাবে পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বহুজনের অধিগম্য বস্তুনিষ্ঠ বুনিয়াদী ধারার প্রবর্তন ঘটেছিল, যার ধারা বিশ শতকের বিশের দশকের আধুনিকতাপন্থীদের কলম থেকেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসেছে বহুজনীনতার তাগিদে। মাঝখানে এবং বিশেষ করে চল্লিশের দশকে ও তার পরবর্তীকালে সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকীয় ধ্রুপদী ধারা গৌণ বলে গণ্য, তবে বাংলাদেশে কোটি কোটি শ্রমজীবী তথা কৃষিজীবীদের নব বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক জাতীয় অভ্যুদয় এবং তার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের প্রগাঢ় একাত্মতার যে প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল ধারায় ঘটেছে তাতে প্রাথমিক অগ্রাধিকার পেয়েছে ধ্রুপদী রীতি। অবশ্য ধ্রুপদী রীতির এই পুনঃপ্রসার আধুনিকতার অভিনবত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বরং সহযোগী রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কারণ যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অভ্যুদয় সাহিত্যে বহুজনীন রীতিকে প্রবল করেছে, তার তরফ থেকে গুণগত উত্তরণ ও অভিনবত্বের তাগিদ রয়েছে ভাষা ও সাহিত্যে, বিপুল সংখ্যক পাঠক পাঠিকার কাছে একেবারে দূরতম গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছবার জন্যই ধ্রুপদী রীতিকে বেশ কিছুটা পিছোতে হয়েছে। সাধুভাষার ধরনের বদলে চলতিভাষার ধরন নিলেও তার বাকবিন্যাস উনিশ শতকীয়। সত্যেন সেন বিশিষ্ট ধ্রুপদী গদ্য রীতিতেই তাঁর সাম্প্রতিকতম বইগুলি লিখেছেন। কিছুটা সেকেলে রসে পরিগণিত হয়ে পড়ার ঝুঁকিও তিনি নিয়েছেন। অবশ্য সাহিত্য যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে ও প্রচলিতের ভাঙ্গাগড়ার অগ্রগতিধারাকে শুধুমাত্র প্রতিফলিত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, তাকে যে মুক্তি ও আবেগকে সমন্বিত করে মূল্যবোধকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ এবং দুরূহ বৈপ্লবিক গতিধারাতেও শরিক করে তোলার কাজটুকু করতে হয়, একথা মার্কসবাদী সত্যেন সেনের ভাল করেই জানা ছিল। বস্তুতপক্ষে বহুজনের অধিগম্য রীতি তাঁর কাছে বিপুল ও ব্যাপক গণমানসকে ধর্ম নিরপেক্ষ যুক্তিসিদ্ধ বৈপ্লবিক মূল্যবোধ দিয়ে সমৃদ্ধ করার উপায় স্বরূপ ছিল। 'আলবেরুনী' উপন্যাসটি এর দৃষ্টান্ত। আমরা সত্যেন সেনের যে কুড়িটি বই-এর সারসূত্র উপস্থিত করেছি, তাদের অধিকাংশেই আদি থেকে একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমাদের উপমহাদেশীয় অঞ্চলের মেহনতি জনগণ ও মুক্তিসংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন প্রশ্নে মতামত ব্যক্ত করার সংলাপ পুনর্জাগরিত হয়েছে, বিভিন্ন প্রশ্নে তর্ক-বিতর্কের বিষয়গুলি জীবনের জটিল সমস্যাগুলির কথা সামনে রেখেছে। বিপুল সংখ্যক পাঠক-পাঠিকাকে আধুনিকতম প্রশ্ন সম্বন্ধে সজাগ

করার প্রয়োগ যথাসাধ্য শরিক হবার জন্য সত্যেন সেন শৈলীর দিক থেকে আধুনিকতা থেকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছেন।

গণসঙ্গীত লেখা ছেড়ে দিলেও সত্যেন সেন যে চল্লিশের দশকের প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকে পঠিত টুকরো টাকরা 'মেয়েটি গান করে' ধরনের গল্প না লিখে বড় বড় পরিকল্পনা তৈরি করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ও কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলেন, তার একটা দিক তাঁর নয়া ধ্রুপদী শৈলী নিয়ে কাজ করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। সেটা হচ্ছে, উপন্যাস ও কাহিনী রচনা শুরু করেন তিনি একজন 'অপ্রত্যাশিত' কথা সাহিত্যিক হিসেবে, শৈলীগত দিক দিয়ে নিজের তৈরি কোন রীতিতে আবদ্ধ না হয়ে।

বাংলাদেশের আরেকজন নয়া ধ্রুপদী কথাশিল্পী তাঁর উপন্যাস লেখার জীবন শুরু করেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তিনি হলেন 'সংশপ্তক' উপন্যাসের রচয়িতা শহীদুল্লা কায়সার। তিনি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। শহীদুল্লা কায়সার উপন্যাস লিখতে শুরু করেন চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে জেলখানায় বসে ১৯৫৯-'৬০ সালে। শহীদুল্লা ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এত গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে, তার লেখার হাতটা 'সংবাদ' কাগজের রাজনৈতিক ভাষ্যের বাইরে আসার সুযোগ পায়নি। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। আত্মগোপন করে থেকে '৫২-এর অভ্যুত্থানের সময় এর অন্যতম পরিচালকের কাজ করেন। অভ্যুত্থানের পর গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁকে হুলিয়া এড়িয়ে চলতে সাহায্য করার অভিযোগে সেই সময়ে তাঁর ছোটভাই জহীর রায়হানও গ্রেপ্তার হন। জহির রায়হান কয়েক বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাকা লেখক হিসেবে নাম করে ফেলেন। শহীদুল্লা কায়সার এতে খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। তার কথাবার্তা এই সময় এই ছিল যে, ভাই লিখছে, সেই লিখুক। সত্যেন সেনের মতোই বৃহৎ পরিমাপের লেখক রূপটি অন্তরঙ্গ মহলেও প্রকাশ পায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার স্থির করলেন যে তাঁরা উপন্যাস লিখবেন বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রেখে। তখন তাঁরা ঝড় বইয়ে দিলেন। রীতি একই। নয়া ধ্রুপদী শৈলীতে গণবিপ্লবী আলেখ্য রচনা।

১৯৫৮ থেকে '৬৩র কারাবাসের সময় দু'জনের দেখা হয়েছে, মত বিনিময় হয়েছে। পরস্পরকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা। জেলখানায় ডজন খানেক এক্সারসাইজবুক ভরে ফেলেছেন অসংখ্য নারী পুরুষ চরিত্রের সংলাপ আর টানা বর্ণনা দিয়ে। ষাটের দশকে সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার বাংলা ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির বলিষ্ঠ ও ব্যাপক প্রয়াসের মধ্যেই যেদিকটাতে শওকত ওসমানের কাজ সত্ত্বেও ঘাটতি হচ্ছিল সেটা পূরণ করে দিলেন। দেখা গেল ব্যাপক সংখ্যক পাঠক পাঠিকা তাদের বইগুলিকে সাগ্রাহে নিচ্ছেন। নবীন কমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতা ও ভাষ্যকার শহীদুল্লা কায়সার যে পরিকল্পনাগুলি করেছিলেন সেগুলিকেও কাজের চাপে বাস্তবায়িত করতে পারেননি। তবে সত্যেন সেন দৃষ্টিশক্তি হারাতে চলেছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়ায় লেখার কাজই বসে বসে করেছেন। দু'জনেরই শৈলীর পরিবর্তন করেননি।

আমরা অবশ্য আগেও উল্লেখ করেছি। এবং আবারও বলছি যে, নয়া ধ্রুপদী ধারার এই কাজ কোন রকম গোঁড়ামির ব্যাপার নয়। অন্যান্য শৈলীর সহযোগী হিসেবেই এই কাজ। অন্যান্য শৈলীতেও গণকথা সাহিত্যে সার্থক কাজ হয়েছে। বিশেষ করে যে অবচেতন মনের ব্যাপার নিয়ে সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার তেমন কিছু করেননি, তাতে বেশ কিছু সার্থক পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশিষ্ট কথাশিল্পীরা ষাটের দশকেই শুরু করেন। ধ্রুপদী শৈলীতেও বড় কাজ আরও হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই সব কাজের কথা বর্তমান নিরীক্ষায় আনা সম্ভব নয়।

সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি

বাংলা ছোটগল্পের জগতে চল্লিশের দশকে বিস্ময়কে সৃষ্টি করেছিলেন এক তরুণ লেখক-ঢাকার ছেলে সোমেন চন্দ। অবশ্য সময় পান নি তিনি তাঁর প্রতিভার পুরো পরিচয় দিতে। ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়–৮ই মার্চ ১৯৪২ সালে। জন্ম হয়েছিল দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে, ১৯২০ সালে। ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে আর ঢাকা শহরে তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছিল। গ্রামীণ ও নাগরিক দরিদ্র নিম্নবিত্ত মেহনতী মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তখনই। মেট্রিক পাশ করে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণ সোমেন চন্দের কর্মীজীবন শুরু হয়েছিল কিন্তু এই সময়েই। তখন উপমহাদেশে বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে নুতন গণ অভ্যুদয়ের আয়োজন চলছে। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গোপনভাবে কাজ করছে। সোমেন এই পার্টির সংস্পর্শে এলেন এবং শুরু হলো তাঁর বিপ্লবী কর্মীজীবন। শুরু হলো দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সংগঠকরূপে কাজ। কলেজে পড়া হলো না, চাকরী করা হলো না। কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, বিশ্রাম তিনি করলেন না। একদিকে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজ, সঙ্গে সঙ্গে গণমুখী ছোট গল্প লেখার কাজ করে গেলেন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সালের শুরু পর্যন্ত–এই তিন বছরে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন, যেগুলি 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ' নামে প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি ছোটগল্প অবশ্য পাওয়া যায় নি। এছাড়া তিনি একটি উপন্যাস এবং কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছিলেন। শিল্পী হিসেবে তিনি নিখাদ নিষ্ঠাবান মেহনতী ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। লিখবার সময় অল্পই পেতেন। ১৯৪০-'৪১ সালে ঢাকায় রেল শ্রমিকদের ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইউনিয়নের সমস্ত দায়িত্ব পড়েছিল এই তরুণেরই কাঁধে। কারণ, এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করায় কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল। তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন। ইউনিয়নের কাজে শ্রমিকদের সঙ্গে লাইনে অফিসে বস্তিতে সংযোগ রাখবার ভার পড়েছিল সোমেন চন্দের উপর। এই কাজের মধ্য দিয়ে কারখানার মেহনতী মানুষের–সংগ্রামী মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলেই অবশ্য তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মেহনতী মানুষের ছবি

জেগেছিল সহজে। বস্তুতপক্ষে এখানেই ঘটেছিল লেখক হিসেবেও তাঁর শিক্ষানবীশীর উত্তরণ-রূপদক্ষতায়।

রেল শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের মধ্যেই সোমেন চন্দ শুধু যে তাঁর লেখার বাস্তব জীবনের উপাদান পেয়েছিলেন তা নয়, ঢাকায় একটি সাহিত্য সংস্থার সংগঠক হিসেবে লেখার লক্ষ্যমাত্রাটিকে নির্ধারিত করতে পেরেছিলেন। এই সংস্থার নাম ছিল প্রগতি লেখক সংঘ। ঢাকায় এই সংঘ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে, সমগ্র উপমহাদেশের প্রগতি লেখক সংঘের শাখা নামে ঢাকার কয়েকজন তরুণ লেখককে নিয়ে।

সমগ্র উপমহাদেশের প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাজ্জাদ জহীর। বাংলা সাহিত্যের প্রগতি আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সে সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল লেখক লেখিকাই এই সংঘের লক্ষ্য ও কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার চূড়ান্ত রূপ ফ্যাসিবাদের শোষণ থেকে মুক্তি ছিল লক্ষ্য-স্বাধীনতা ও জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। প্রগতি লেখক সংঘের কর্মসূচি ও সংগ্রামের একটি উৎস ফরাসি লেখক রোঁমা রোলাঁ এবং আঁরি বারবুসের নেতৃত্বে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে গঠিত সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ-লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়েলিজম এণ্ড ওয়ার। এই সময়েই আমাদের উপমহাদেশে এবং বিশেষ করে তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম অসহযোগ ও খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র বিপ্লব-প্রায়স ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের স্তর থেকে গণবিপ্লবের স্তরে উঠে আসছিল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল জনগণের ব্যাপক শ্রেণী সংগঠনগুলির ঐক্যের এবং সুসংগঠিত জনচেতনার। এই দ্বিতীয় প্রয়োজনে সহায়তা করার দায়িত্ব বর্তেছিল প্রগতিমনা লেখক লেখিকাদের উপর। সুতরাং তিরিশের দশকে লেখক লেখিকারা যে প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শ নির্দিষ্ট করেন, তাতে এসেছিল স্বদেশ ও নিজ অঞ্চলের জনগণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গভীর সংযোগ স্থাপনের তাগিদ।

প্রগতি লেখক সংঘের লেখক লেখিকারা এই ভাবে বাংলা গণমুখী সাহিত্যের ধারা পত্তন করেন। কর্মী এবং লেখক লেখিকাদের মধ্যে যে ব্যবধানের রেখা ছিল ইতঃপূর্বে, সেটাকে দূর করার চেষ্টাও শুরু হয়। এ সময়ে স্পেনে সমাজতন্ত্রমুখী ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী স্পেনের সামরিক বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্ব নিয়োজিত করে। অন্যদিকে বিশ্বের প্রগতিবাদী লেখক শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে রক্ষা করার জন্য 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড' গঠন করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই রণক্ষেত্রেই রালফ ফকস্ ও ক্রিস্টফার কডওয়েলের মতো আরও অনেক লেখকশিল্পী প্রাণোৎসর্গ করেন। প্রগতিমনা লেখক লেখিকাদের যে মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে, এসত্য তিরিশের দশকের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যের শিল্পীদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সোমেন চন্দ এই চেতনায় লালিত হন। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন চন্দ প্রগতি লেখক সংঘের উপরোক্ত সমস্ত অভিজ্ঞতায় নিজেকে সজ্জিত করেন।

ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছিল একটা সন্ধিক্ষণে। শাখা স্থাপনের প্রস্তুতির মূলে ছিলেন কয়েকজন তরুণ লেখক যাঁরা ভাবছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণমুখী ঘোষণাপত্র অনুযায়ী অবিলম্বে কিছু করা দরকার। যাঁরা এই প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়সী ছিলেন সতীশ পাকড়াশী (অগ্নিদিনের বর্মার লেখক), বাংলার অগ্নিযুগের পথিকৃৎদের একজন, যাঁর বয়স সে সময়ে পয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে। সোমেনের দুই সমবয়সী বন্ধু একেবারে গোড়ার দিকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। একজন কিরণশংকর সেনগুপ্ত সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অতি আধুনিক কবিতা লিখে নাম করেছিলেন, তাঁর কবিতার বই 'স্বপ্ন কামনা' তখন প্রকাশনার পথে-ভূমিকা লিখে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। অপারজন অমৃতকুমার দত্ত। তাঁর বাবা ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের স্বনামধন্য বাংলার শিক্ষক সুকুমার দত্ত। অমৃতকুমার দত্ত অবশ্য সেই বয়সেই একটা ব্যাংকের চাকরীতে ঢুকে ছিলেন। তাঁর ঝোঁক ছিল গণকবিতা লেখার দিকে। তিনি সে সময়ের প্রখ্যাত ইটালিয়ান উপন্যাস 'ফন্টামারা'র বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এদের সঙ্গে একত্র হয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, যাঁর বয়স তখন ২৭। পুরানো ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশণ্ডী মহল্লায় প্রগতি পাঠাগার ছিল সংঘের প্রথম কেন্দ্র। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সম্মেলন নাম দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘের উদ্বোধন হয়। গেন্ডারিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই এবং এর অব্যবহিত পরেই যাঁরা প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগীদের মধ্যে আসেন তাঁদের মধ্যে একজন ফরিদপুরের অচ্যুত গোস্বামী, যিনি তখন ঢাকা নিবাসী ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত বই 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর বয়স ছিল তখন ২২/২৩। অচ্যুত গোস্বামীর বড় ভাই দর্শনশাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক নৃপেন গোস্বামী প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নিবন্ধকার হিসেবে। ১৯৪০ সালে সংঘের প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন সরলানন্দ সেন, যিনি এক সময়ে সন্ন্যাসী ছিলেন। নাম ছিল সরলানন্দ স্বামী। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সন্ন্যাস ছেড়ে গৃহী হন। সরলানন্দ সেন সেই সময়ে চীনের গণবিপ্লবের আখ্যান লিখতে শুরু করেন এবং প্রথম মাও সে তুং, চ্যু তে, পেং তে হুয়েই এর জীবনীকার হিসেবে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকেই খ্যাতি লাভ করেন। আরেকজন ছিলেন জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, যাঁর বয়স ছিল তখন ২৬/২৭। তিনি তরুণ বয়সে বিপ্লবীদলে ঢোকেন। ১৯৩২ সালে ঢাকায় ট্রেন ডাকাতি রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে ৬ বছর সাজাখাটার পরে ১৯৩৮ সালে যক্ষ্মারোগ নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। জেলখানায় তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। তিনি বিজয় সেনগুপ্ত নামে বিভিন্ন প্রগতিশীল কাগজে লিখতে শুরু করেন। তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা সাহিত্যে জার্মান বিপ্লবী কবি ও নাট্যকার বার্টোল্ড ব্রেখটের উপর কয়েকটি ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখেন। জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ছিলেন ঢাকার রেলশ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রস্তুতি পর্বে সোমেন চন্দ যেমন প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ছিলেন, তেমনি ১৯৪০ সালে যখন সংঘ জমজমাট হয়ে উঠলো, তখনও সোমেন চন্দ ছিলেন তাঁর ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকগুলির সবচেয়ে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত সদস্য। আগামী বৈঠকে কারা লেখা পড়বে-এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে নির্ধারিত বৈঠকে দেখা যেতো, সোমেনের উপর লেখার ভার থাকলে তিনি ঠিক লেখা নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্বটি নিখুঁতভাবে পালন করতেন বলে প্রায় বৈঠকেই তাঁর উপর ভরসা করা হতো এবং তাঁকে লেখা আনতে বলা হত। এই তাগিদ একদিক দিয়ে তাঁর দিক থেকেও খুব কাজের হয়েছিল। দুবছরের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লিখেছিলেন, যেগুলি অধিকাংশই বৈঠকে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ লেখাই প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকে পড়া।

সংঘের বৈঠকে সদস্যদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া লেখা নিয়ে ১৯৪০ সালে একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করা হয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা অতিক্রমণের অর্থে নামকরণ হয় 'ক্রান্তি'। যথাসময়ে ক্রান্তি (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয় ঢাকার একটি ছাপাখানা থেকে। ছাপাখান থেকে বই বার করে আনার ব্যাপারে সোমেন চন্দ দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিলে। সোমেনের 'বনস্পতি' গল্পটি এই ক্রান্তিতেই প্রকাশিত হয়। সোমেন প্রায় শ'খানেক 'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যান এবং সেখানকার প্রগতি লেখক লেখিকাদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর প্রচারে বন্দোবস্ত করেন। এই সময়েই তিনি পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি দিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে সোমেনের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই এই গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হলে সাহিত্য রসিক মহলে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা নতুন বিন্যাসের তাগিদ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের একদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি এবং আরেকদিকে জার্মানি, ইটালি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মধ্যে যুদ্ধ বাধলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ভাগবাটোয়ারার যুদ্ধ। এজন্য এই যুদ্ধকে আমাদের উপমহাদেশের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে এতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। হিটলারের নাৎসী বা ফ্যাসিবাদী জার্মানি এবং চেম্বারলেন চার্চিলের বনেদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন এতে জড়িয়ে পড়েছিল তাদের অন্তবিরোধ মেটাতে না পেরে, যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য তিরিশের দশকে বিশ্ববাসীর কাছে গোপন ছিল না। হিটলার সমেত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরা পাল্লা দিয়ে সজ্জিত হচ্ছিল এবং একে অপরকে সাহায্যও করছিল মার্কিন ডলারের নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যস্থতায় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা এবং ইউরোপের যে কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভ্যুদয়কে ঠেকানো এবং এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিনষ্ট করে দেয়া। ১৯৩৮-'৩৯ সালে স্পেনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে এরা এদের ক্রীড়নক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মারফৎ উৎখাত করেছিল। এরাই চীনে

চিয়াংকাইশেকের দোসর হয়ে কমিউনিস্ট উচ্ছেদের অভিযান চালায়। এদের প্রধান রাগ কেন্দ্রিভূত ছিল সাম্রাজ্যবাদের কাঠামো ভেঙ্গে প্রথম বেরিয়ে আসা স্বাধীনতা ও সাম্যের পতাকাবাহী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রভুত্ব ভাগাভাগিতে বনাতে না পেরে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে। এর পরে হিটলারের জার্মানির ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনী প্রায় সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ দখল করার পরে মনে করে এদের যথেষ্ট শক্তি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার বাহিনী অতর্কিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বিশ্বযুদ্ধের বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। আমাদের উপমহাদেশের প্রগতিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে স্বভাবতই একটা চিন্তা আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়াবার। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে। প্রগতিবাদীদের অধিকাংশই ঠিক করেন যে, এই যুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা নেয়া যেতে পারে না। এখন আর এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং হিটলারের কর্তৃত্বাধীন জার্মানির সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ নেই। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্যই হিটলারের বাহিনীকে পরাজিত করা দরকার। প্রয়োজন সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের। ১৯৪১ সাল শেষ হবার আগেই চীনের একটা বিরাট অংশ দখলকারী জাপান হিটলার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ইন্দোচীন ও বার্মাকে দখল করে সমগ্র এশিয়াকে কজা করতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী হিটলারের জার্মানি, ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির ইটালি এবং ফ্যাসিবাদী জাপানের সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করাটা প্রগতিবাদীদের কাছে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে সামনে আসে।

এই পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের প্রগতি লেখক লেখিকারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে গণমত ও গণআন্দোলন গঠনে অবতীর্ণ হন।

এই সূত্রেই ঢাকায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে স্থাপিত হয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। ঢাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং এর নাম দেন 'সোভিয়েত মেলা'। সোমেন ছিলেন এই আয়োজনের সবচেয়ে খাটিয়ে কর্মী। সোমেন ছিলেন জনগণের কাছে 'চিত্র পরিচায়কদের' একজন। এই তরুণ পরিচায়ক যখন গল্প বলার ভঙ্গীতে লেনিনের দেশের কথা বলতেন, তাঁর চারদিকেই বেশি ভিড় হত।

এর পরই ঢাকায় আটই মার্চ একটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন ডাকা হয় সুতাকল শ্রমিকদের সহায়তায়। এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের

পরিচালকরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দ অবশ্য লাল পতাকাটি হাত থেকে ছাড়েন নি। এখানেই সমাপ্ত হয় সোমেন চন্দের অক্লান্ত কর্মী ও শিল্পী জীবনের।

কিন্তু মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই সোমেন আরও উজ্জ্বল হয়ে জেগে ওঠেন তাঁর বৈপ্লবিক সাধনার জন্যে, তাঁর বৈপ্লবিক লেখার জন্যে।

এদিক দিয়ে সোমেন চন্দ সেই মর্যাদাই পেয়েছিলেন, যা কয়েক বছর পরে অভিষিক্ত করেছিল সুকান্তকে। সোমেন চন্দ ও সুকান্ত এই কারণে যমজের মতো তুলনীয়। সুকান্তের কবিতার কাজ আর সোমেন চন্দের ছোটগল্পের কাজের মিলটা এই যে, দুজনেই তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতার গণবৈপ্লবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা সুস্পষ্ট রূপদাতা। প্রবীণ প্রবীণারা যেখানে এসে অনেকে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সাময়িকভাবে, সেখানে এই দুই বয়ঃকনিষ্ঠ শিল্পীর পদক্ষেপ অল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও ছিল অসংশয়। নিষ্ঠা ও কুশলতা এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীও নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল দু'জনেরই এই বয়সে।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রথম বই 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৯৪৩ সালে। এর প্রকাশক ছিল ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ–অর্থাৎ তাঁর সাথী লেখকেরা। দ্বিতীয় বই বনস্পতি ও অন্যান্য গল্প প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে এক বছর পরে। এর ভূমিকা লিখেছিলেন গোপাল হালদার। এই সময়েই শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী লীলা রায় সোমেনের 'সংকেত' গল্পের এবং অশোক মিত্র সোমেনের 'ইঁদুর' গল্পের যে ইংরেজি অনুবাদ করেন, তা ছাপা হলে বাংলার বাইরে সোমেন সম্বন্ধে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

সোমেন চন্দের স্মরণে কলকাতা থেকে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ 'প্রাচীর' নাম দিয়ে যে সংকলনিকা প্রকাশ করেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ ও নবীন প্রগতিবাদী লেখক লেখিকাদের অনেকেই প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। গণবৈপ্লবিক ধারায় শিল্পসম্মত গল্প লেখার অন্যতম প্রবর্তক রূপে চল্লিশের দশকে সোমেনের নাম দেশে এবং দেশের বাইরে চিহ্নিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে মাত্র চার বছরের সাধনার ফসলরূপে সোমেন যে কয়েকটি গল্প লিখে রেখে যেতে পেরেছিলেন তাতেই তিনি মৃত্যুর পরে ঢাকা এবং কলকাতার প্রগতি লেখক লেখিকাদের সমচিন্তার সেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। '৪৭ সাল পর্যন্ত প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ (প্রগতি লেখক সংঘের এই নাম হয়েছিল ১৯৪৪ সালে) যে কয়েকটি 'ক্রান্তি' সংকলন বার করে এবং মাসিক প্রতিরোধ নামে যে পত্রিকা বার করে, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই বাংলা সাহিত্যের তখনকার এবং এখনকার অনেক প্রথিতযশা লেখকই লেখা দিয়েছিলেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা ক্রান্তিতে এবং একটি কবিতা প্রতিরোধে প্রকাশিত হয়।

চল্লিশের দশকে ঢাকায় প্রগতি সাহিত্যের প্রসার ও সাধনায় যে নবতরঙ্গ আসে, তাতে সোমেন-স্মৃতি ছিল মর্মকেন্দ্র। স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের আদর্শের পতাকাবাহী সোমেন যে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং

সোমেনের লেখার শিল্পরূপের ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলার উদ্দেশ্যে ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ যে কর্মসূচি নেয়, তা বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে প্রগতিশীল লেখার দিকে টেনে নিয়ে আসে। অন্যান্য আরও কয়েকজনের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নুরুদ্দিন, সানাউল হক এবং শিক্ষাবিদ নাট্যকার কবীর চৌধুরীর লেখার সূচনা বলতে গেলে এই স্মরণ উৎসেই যুক্ত হয়েছিল। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও এই স্মরণ উৎসের যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের ৮ই মার্চ সোমেন চন্দের প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আজিত গুহ। তিনি বাংলাদেশের প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ সোমেনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই প্রতিরোধ নাম দিয়ে যে মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি বার করেছিল তাতেই প্রথম সোমেনের 'দাঙ্গা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই প্রতিরোধ প্রকাশিত হতো জি ঘোষের গলির মুখে একটি দালানের তেতালায় অবস্থিত প্রগতি লেখক সংঘের দফতর থেকে। এই সময়ে সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, অজিত কুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অসিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল কয়েকজন অধ্যাপক ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখকে নিয়ে এই 'প্রতিরোধ' কে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়ে ওঠে প্রগতি লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী। এদের একজন ছিলেন সে সময়ে ঢাকার গণসঙ্গীতের প্রবর্তক সাধন দাশগুপ্ত। সাধন দাশগুপ্ত নিজে গান লিখতেন এবং গাইতেন। তিনি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সুরে সোমেন চন্দের উপর একটি গান লিখেছিলেন। এই গানটি তখনকার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং শ্রমিক কৃষক সমাবেশে গাওয়া হতো। সত্যেন সেন এই সময়েই তাঁর প্রখ্যাত গণসঙ্গীতগুলি লেখা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে বাংলাদেশের যে ঔপনিবেশিক সামরিক স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ জারী হয় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের ভাষা সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল সাহিত্যকে ধ্বংস করার জন্য যে নির্যাতন চলে, তার কোপে পড়ে প্রগতি লেখক সংঘ তার সংগঠনকে ধরে রাখতে পারেনি। এই অবস্থায় সোমেন চন্দের স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে আড়ালে চলে যায়। তবে ১৯৬৭-'৬৮-'৬৯ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অভ্যূদয়ের যে সূচনা হয়, তার মধ্য দিয়ে সোমেন চন্দের স্মৃতি আবার বিশেষ করে তরুণ সংগ্রামী লেখক লেখিকাদের সামনে আসে। শুরু হয় নুতন করে হারিয়ে যাওয়া সোমেন চন্দের ছোটগল্প সংগ্রহ। সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পের নাট্যরূপ দেন মোজাম্মেল হোসেন মন্টু এবং বাংলা একাডেমীতে ও পল্টন ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে বাংলাদেশের নামকরা চলচ্চিত্র ও নাট্যকুশলীরা এই নাটক উপস্থিত করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে স্বাভাবতই বাংলাদেশের সাহিত্যের নব প্রগতিক মূল্যায়নের তাগিদে সোমেন চন্দের ছোটগল্প সম্বন্ধে নতুন করে কৌতুহল জেগেছে।

বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বাংলা ছোটগল্পের জগতে একটা নব সন্ধিক্ষণ এসেছে। বাংলা ছোটগল্প একটা বৈপ্লবিক উত্তরণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যা সত্তরের দশকের জীবন সত্যকে গণমুখী শিল্পরূপ প্রকাশ করবে। সোমেন চন্দের লেখা

এদিক দিয়ে গণমুখী গল্প লেখার শিল্প শৈলীর দৃষ্টান্তরূপে কাজ করবে। বিশেষ করে মেহনতী মানুষকে পুরোভাগে রেখে জীবনের বৈপ্লবিক উন্মোচনের জন্য সাম্য ও স্বাধীনতার যে তাগিদ দেখা দিয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শিল্পরূপেও মর্মকেন্দ্র করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেই পটভূমিতে সোমেন চন্দকে নিয়ে আবার একটা আলোড়ন আসা স্বাভাবিক।

বাংলা সাহিত্যের যে পরিমণ্ডলটি ছিল সে সময়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকের শেষের দিকে, তাতে একটা নুতন গণধারা এনেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা নতুন আয়োজন। বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি ও পুর্ণ অধিকারের দাবী যেমন দ্ব্যর্থহীন উল্লেখ আদায় করছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ে তেমনি শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে একটা সংগঠনেরও তাগিদ এসেছিল শ্রমিক কৃষকদের নিজেদের তাগিদে। এর বাস্তব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর সম্ভাবনার আধো আলো আধো ছায়াও বাংলা সাহিত্যে পেয়েছিল অভিব্যক্তি।

বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের গণমানবিক অভিব্যক্তির কথা আমরা জানি। কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা এ সময়ের তারাশঙ্করের লেখা এখানে ছোটগল্পরূপে আদর্শ। এর তুলনায় তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের গণমানবিকতা হয়েছিল ভিন্নতর। বিশের দশকে যা অভিহিত হয়েছিল আধুনিক বলে, তিরিশের দশকে তার উত্তরণ হয়েছিল প্রগতিতে। এই উত্তরণের প্রধান পার্থক্য-রেখাটি ছিল এই যে, 'আধুনিকতার' উদ্ভবের মূলে রাজনৈতিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান থাকলেও তা সমস্ত আধুনিকতায় প্রধান্য বিস্তার করতে পারেনি, নরনারীর বিদ্রোহ স্থান পেয়েছিল প্রধানত দেহাত্মিকভাবে। প্রগতির উদ্ভবের মূলে যে রাজনৈতিক বিপ্লবের আয়োজনটি ছিল তা' প্রগতির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, নরনারীর বিদ্রোহ ছিল দেহাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রাষ্ট্রীক।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, আধুনিকই প্রগতিতে উত্তরিত হয়েছিল এবং আধুনিকের বেশ কিছু উপকরণ প্রগতিতে জায়গা করে নিয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে, প্রগতির মধ্যে ছিল আধুনিকের দ্বন্দ্ব-ঐকাত্মিক বিন্যাস। বাংলা সাহিত্যের বিশ ও তিরিশের দশকের গণমানবমানবী নিয়ে লেখার শিল্পশৈলী অথবা বিষয়বস্তুতে এজন্য পাওয়া যেতে পারে উপকরণের মিশ্রণ। এই মিশ্রণ থেকে প্রগতির একটা পরিষ্কার গুণগত পার্থক্য নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রগতির সচেতন কারিগররা চেষ্টা করেন—রাজনৈতিক ও শিল্পশৈলীগত উপকরণ ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই। সোমেন চন্দের স্থান এই সচেতন পার্থক্য নির্দেশক কারিগরদের মধ্যে গণনীয়।

সোমেন চন্দকে এ ধরনের লেখার ব্যাপারে পথিকৃৎ বলে যদি চিহ্নিত করতে চাই, তাহলে দেখবো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকে প্রগতির ধারাকে যে গুণগত পার্থক্যে উন্নীত করেছেন, তার সূচনা হয়েছিল সোমেন চন্দের লেখায়। ব্যাপক গণজীবনের গতিধারা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং মানবমানবীর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বিদ্যুতাণুযন্ত্রের মতো ধরতে পারার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন সোমেন চন্দ, কারণ তাঁর পা ছিল মাটিতে। গ্রাম বাংলার মানুষকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ঢাকা শহরে পড়াশোনা করলেও ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে

আসতেন গ্রামে। সেখানে দেখেছিলেন গ্রামের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি তাঁর 'স্বপ্ন' এবং 'গান' নামের দুটি গল্পে যেসব গ্রামীণ চরিত্র-ছবি দিয়েছেন, তাতে এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। ১৯৪০ সালে ঢাকা শহরে রেল শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে নেমে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন কলকারখানার শ্রমিকদের অন্তর্জীবনকে। শ্রমিকদের মধ্যে তিনি সম্ভবত তাঁর চেনা গ্রামীণ মানুষের দেখাও পেয়েছিলেন যা তখন কৃষি থেকে শিল্পে এসে ঢালাই হতে শুরু হয়েছে প্রধানত সংগঠনের ছাঁচে। 'সংকেত' গল্পটিতে রয়েছে এর পরিচয়।

সে সময়ে অবশ্য সবচেয়ে বড় এবং সর্বাত্মক যে ঘটনাটা ঘটছিল সেটা বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সংগ্রাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক যুবতীদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী দেখেছিলেন তিনি অন্তরঙ্গভাবেই। তিরিশের দশকের দ্বিতায়ার্ধে নিম্নবিত্ত কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে গণবিপ্লবের আয়োজনের তাগিদে কমিউনিস্ট পার্টি সংস্পর্শে এসে নতুন পথে চলতে থাকেন। সোমেনও তাই করেন। এই নতুন চিন্তার সেদিনকার আধো আলোয় আলোকিত পথে যারা চলতে শুরু করেছিলেন, তাদের অন্তর্জগতের বিন্যাসটিকেও সোমেন গভীর সহানুভূতি নিয়ে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে প্রেমকে তিনি প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করেন নি। এর প্রমাণ 'একটি রাত' গল্পটি। মহাকাব্যিক ধরনের গল্প 'বনস্পতির'মূল ছাঁচটিতে শতাব্দির পর শতাব্দি পর্বগুলিতে তিনি প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুত প্রেম সোমেন চন্দের ছোটগল্পের একটি মূল উপাদান। অতি সাধারণও কিছু অসাধারণ, চাপা এবং খোলা, অন্তর্মুখী এই প্রেমের চরিত্র। কিন্তু এ প্রেম হচ্ছে প্রধানত তাদের, যাদের মুখ সামগ্রিক জীবনের দিকে। এদের সবাই যে জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নয়। তবুও প্রেম এদের কাউকে বিবরগামী বা গামিনী করে নি।

সোমেন চন্দ তার কাহিনী এবং চরিত্র নিয়েছিলেন জীবন থেকে। সুতরাং সে সময়ে তার চারপাশে ঘটনামূলক ছোট বড় সবকিছুর জন্যেই তাঁর চোখ খোলা থাকতো। সে সময়ে ঢাকায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের মধ্যে কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বিষ খেয়ে বসে, এ নিয়ে সোমেনের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। 'দাঙ্গা' গল্পটি এই উৎকণ্ঠার ফল। নিজেকেও তিনি তাঁর এই গল্পের বাইরে রাখেননি। তিনি যে সাইকেলে চড়ে দাঙ্গাদুর্গত শহরে ঘুরে বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ নিতেন, তার মধ্যদিয়েই সরেজমিনে দাঙ্গার চেহারাটাকে দেখেছিলেন। নায়ককেও এই সূত্রে আমরা সাইকেল আরোহীর চেহারায় পাই।

খোলাখুলি রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক গল্পের পাশাপাশি সোমেন যে কয়েকটি তথাকথিত অরাজনৈতিক গল্প লিখেছিলেন, সেগুলিও তাঁর সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে থেকে লেখা ছিল না। নিপীড়িত ও ব্যথিত মানুষের জন্যে যে বোধ তাঁকে কমিউনিস্ট করেছিল, সেই সব বোধ তাঁকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাদামাটা গল্প লিখতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'সত্যবতীর বিদায়' গল্পটিকে এই ধারায় ফেলা যেতে পারে।

সাধারণ ও সাদামাটা মানুষের অন্তরাত্মার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি মানুষের আত্মজৈবিক অথবা জৈব আত্মিক যে উপাদানগুলির খোঁজ পেয়েছিলেন, সেগুলিই

সংগ্রামী চরিত্রে নতুনভাবে দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় বিন্যস্ত এবং এইভাবে নবগুণে উত্তরিত হয়, এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন বলেই সম্ভবত তিনি শ্রমিক ইউনিয়ন কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে গল্প লিখেছেন, তাতে বিপ্লবী চরিত্রগুলি রক্ত মাংসে তৈরি গোটা গোটা মানুষ। সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখতেন সোমেন ঠিকই কিন্তু সাম্যবাদ যারা আনছে তাদের উপর তিনি তাঁর স্বপ্নকে আরোপ করেন নি, তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বপ্নকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন। এদিক দিয়ে সোমেন চন্দকে বাংলা ছোটগল্পের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের একজন পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা

সাহিত্য আর প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ যে পরস্পরের পরম মিত্র হতে পারে সে কথা মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়ে প্রথম দিনগুলিতে একটা প্রমাণ নিয়ে সামনে এসেছিল। ১৯৪২ সালে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগ দেয়ার পথে তরুণ গল্প লেখক সোমেন চন্দ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হয়, তখন সেই রক্তাক্ত মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাংলা সাহিত্য আর রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। পরের বছর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত সোমেন স্মৃতি সভায় যোগ দিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী, উদীয়মান গল্প লেখক। তখনও তিনি ছাত্র। তবে আসল যোগটা ঘটলো প্রগতিশীল সাহিত্য আর মার্কসীয় রাজনীতির মধ্যে।

মুনীর চৌধুরী গুছিয়ে বক্তব্য বলতে অল্প বয়সে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যুক্তিবাদী হিসেবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকেই আঘাত করতেন প্রধানত। কবিতা তিনি কদাচিৎ লিখতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গদ্যে। ভলটেয়ারের ধাঁচ ছিল তার মধ্যে। আমাদের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পর্কের সূত্রটি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর এই ধর্মীয় গোঁড়ামী-বিরোধী মুখরতার দরুন। তখন সেই যুগ চলছে যার কবি সুকান্ত। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করার নিশানা লাল নিশান। তবে ঢাকায় আমরা যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুতরাং আমাদের লাল নিশানের রাজনীতি ছিল এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাজনীতি। আর মুনীর চৌধুরী এই সংগ্রামের রাজনীতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শরীক হয়েছিলেন তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক অসাম্প্রদায়িকতার প্রবণতা নিয়ে। মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' নাটকের নায়ক তিনি নিজেই। এই নাটকের জন্ম হয়েছিল আমাদের সাধারণ রাজনৈতিক সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা থেকে। মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়িকে বুঝতে হলে এই 'মানুষ' নাটকটি পড়তে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছিলেন মুনীর চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যের একজন সেরা ছাত্র হিসেবে। অধ্যাপনা তাঁর জন্যে ছিল নির্দিষ্ট হয়ে। কিন্তু প্রগতিশীল সক্রিয় রাজনীতি তাঁকে টানছিল। সারা সময়ের কমিউনিস্ট কর্মী হবার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। বস্তুতপক্ষে আমরা যদি চাপ দিতাম তাহলে সরদার ফজলুল করিমের মতো মুনীর চৌধুরীও অধ্যাপনা ছেড়ে দিতেন। আমরাই হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম।

তিনি যদি অধ্যাপনা করেন এবং কমিউনিস্ট হিসেবে কাজ করেন তাহলে লাল নিশানের রাজনীতির পক্ষে তা সহায়ক হবে এরকম একটা কথা ছিল আমাদের মনে। আমরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম।

পরবর্তীকালে তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন রাজনীতিবর্জিতভাবে শিক্ষক জীবনকে চূড়ান্ত গুরুত্ব এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য দিয়ে, তার জন্যে আংশিকভাবে দায়ী আমরা ও তাঁর সাথীরা যারা প্রধানত প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেছি। এ ব্যাপারটা ঘটবার আগে সমস্ত মিলিয়ে মুনীর চৌধুরী সাহিত্য আর রাজনীতির মধ্যে যে সম্মেলন সাধন করেছিলেন, তার মধ্যে থেকে গিয়েছিল অনির্দেশ্যতা। তিনি নিজেও একটা পরিষ্কার ফয়সালা করে নেননি। আমরাও বিশেষ করে যারা তাঁর সাহিত্যিক সতীর্থ ছিলাম তারাও ফয়সালা করে দেইনি। এই অবস্থাতেই মুনীর চৌধুরী ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার এই সময়েই শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির অগ্নিপরীক্ষা। মুসলিম লীগ শাসনের সমস্ত রোষ পড়েছিল কমিউনিস্টদের উপর। দু'টি ঘটনার কথা মনে আছে। মুনীর চৌধুরী সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দুরূহ দায়িত্বে শরীক হয়েছিলেন।

সেটা বোধহয় ১৯৪৮ সালের মে মাস। আমাদের কয়েকজন কমরেড তখন আত্মগোপন করেছেন। আমরা কয়েকজন বাইয়ে খোলাখুলি পার্টি অফিস চালচ্ছি। ঠিক হলো আমরা এক সঙ্গে বসবো। নারায়ণগঞ্জ থেকে অদূরে লক্ষ্যা নদীর অপর পাড়ে একটি গ্রামে আমরা দু'দিন আলোচনায় বসেছিলাম। সেখানে মুনীর চৌধুরী ছিলেন একজন উচ্ছল প্রাণবন্ত সঙ্গী হিসেবে। মুনীর চৌধুরীর একটা গুণ ছিল এটাই। অত্যন্ত সঙ্গীণ মুহূর্তে এবং বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে তিনি সহজ হতে পারতেন। গ্রামে থাকার সেই দু'টি দিনের কথা কোনদিন ভুলব না। মনে পড়ে সকাল বেলায় যখন নৌকোয় লক্ষ্যা পেরিয়ে আসি, তখন নদীতে খুব ঢেউ ছিল। আমরা একটা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে কিভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবো সে সম্বন্ধে একটা সাহসী পরিকল্পনা নিয়েই ফিরেছিলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল '৪৮ সনেরই ৩০শে জুন। এর দিন সাতেক আগে আমরা ঠিক করেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য রাখবো জনসাধারণের সামনে খোলাখুলি। ৩০শে জুন দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সদরঘাট পার্কে জনসভার জন্য। সাতদিন ধরেই আমরা বিকেলে লালঝাণ্ডা নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মোড়ের সভা মারফত ৩০শে জুনের সভার বিষয়টিকে সবাইকে জানাচ্ছিলাম। কিছুটা গেরিলা পদ্ধতিতে আমাদের যাতায়াত করতে হতো লাল নিশান নিয়ে। যে কোন মুহূর্তে আমাদের উপর হামলা হতে পারতো। এই রকম বিকেলে আমরা তিন চার জন একটা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ঢাকার একটি জনাকীর্ণ মহল্লার দিকে যাত্রা করলাম। মুনীরও আমাদের মধ্যে ছিলেন। লাল ঝাণ্ডাটা মাঝে মাঝে হাত বদল হচ্ছিল। মুনীর চৌধুরীকে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দেখতে বেশ ভাল লাগতো। ওর জামাকাপড় ছিল খুব সাধারণ। মুখচ্ছবিতে ছিল প্রতিভার বিচ্ছুরণ। মাঝখানে একসময় হঠাৎ সে

আমার হাতে নিশানটা তুলে দিয়ে একটা রিক্সায় চেপে বসে বললো 'একেবারে মনে ছিল না, রেডিওতে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে'।

তিরস্কারের দৃষ্টি পড়েছিল তার মুখের উপর। তবে যেতে দিতে হয়েছিল। স্বভাবতই দিন কয়েক দেখা না হবার ফলে উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম জনসভার দিন কাকে পাবো, কাকে পাবো না ভেবে। মুনীর চৌধুরী কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তটিতে। বিরাট হামলার ঝুঁকি নিয়ে আমরা সদরঘাট পার্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মুনীর চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। আমরা আমাদের বক্তব্য বলেছিলাম। সভার শেষের দিকে মুসলিম লীগের লোকেরা আমাদের সভা ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমরা পার্টি অফিসে চলে আসার পর যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রচণ্ড হামলার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তার মধ্যে মুনীর চৌধুরীও একজন ছিলেন।

এর পরে '৪৯ সালে দেখা হলো কারাগারে, এই সময়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, আমাদের সর্বশেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং এই কারণেই সমস্ত সাথীর কাছ থেকে ষোল আনা সংগ্রাম আদায় ছিল আমাদের চাহিদা। সুতরাং মুনীর চৌধুরীর কাছ থেকেও চেয়েছিলাম অন্য কিছু নয়, সাহিত্য নয়, অধ্যাপনা নয়, শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম। এখানেই আমাদের ভুল হয়েছিল, তাঁরও ভুল হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী তখন কিছুটা অধ্যাপনার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, তাঁর কাছে সাহিত্য বোধহয় বৈপ্লবিক রাজনীতি থেকে একচুল আল্‌গা হয়ে গিয়েছে। এক চুল পার্থক্যই সে সময়ে পারস্পরিক চিন্তার ব্যবধানের বিস্ফোরণ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমরা সেই মুহূর্তে মনে করেছিলাম, তাহলে তাঁকে আর রাখা অনাবশ্যক, তিনিও মনে করেছিলেন তাহলে থাকা অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি আর জেলখানায় পড়ে থাকার মধ্যে কিছু দেখলেন না। কর্তৃপক্ষ একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা মুনীর চৌধুরীকে ছেড়ে দিল এই মনে করে তিনি আর রাজনীতি করবেন না। কিন্তু আমাদের, মুনীর চৌধুরীর নিজের এবং কর্তৃপক্ষের হিসেবে গোড়াতেই ভুল হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরে মুনীর চৌধুরী গ্রেফতার হলেন। কারাগারে আটক থাকলেন, ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত। এই জেলে থাকার সময়েই মুনীর চৌধুরী তাঁর 'কবর' নাটকটি লেখেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে একটি নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকা জেলে দু'নম্বর খাঁচায় আটক কমিউনিস্ট বন্দীরা। তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক লিখে দিতে। যেহেতু আমার সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর একটা বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বরাবরই, সেজন্য সকলের হয়ে আমি পুরানা হাজত হতে গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিলাম মুনীর চৌধুরীকে নাটক লিখে দেবার জন্যে। মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা জেলের দেওয়ানী নামক ছোট ঘরটিতে আটক থাকতেন।

এই 'কবর' নাকটটি আবার প্রমাণ করে সাহিত্য আর বৈপ্লবিক রাজনীতিকে একত্র করার জন্যে যে চেষ্টা একজন বিপ্লবী লেখককে করতে হয়, এতে মুনীর চৌধুরী কত সাবলিল ছিলেন। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে তিনি অনায়াসে সাঁতরাতে পারতেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি এরপর মাত্র দু'মাস বাইরে ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে নাকচ করে সামরিক গভর্ণরের শাসন জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এই সময়ে প্রায় পাঁচ মাস আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তিনি জেল থেকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় বাংলায় এম.এ পরীক্ষা দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ঘরে গিয়ে বসতেন। ইংরেজির ছাত্র অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বাংলা ভাষা আন্দোলনে জেল খাটার সময় প্রগতিশীল রাজনীতি, মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য বাংলাকেই অনেক ভেবে চিন্তে নির্বাচন করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে ঢুকলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর পরে আমরা সবাই, তিনি নিজে এবং কর্তৃপক্ষীয়েরাও ধরে নিয়েছিল মুনীর চৌধুরী প্রগতিশীল রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। মুনীর চৌধুরী ভাষাবিদ, মুনীর চৌধুরী শিক্ষাবিদ, মুনীর চৌধুরী বাগ্মী, এই হয়েছিল তাঁর পরিচয়। কিন্তু কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী যে মরে যায়নি এর প্রমাণ তাঁর নানা কাজের মধ্যে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসতো। কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার জন্যে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে অর্ন্তদ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারেনি বলে বাংলাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান শুধু বাগ্মী মুনীর চৌধুরী রূপেই খ্যাতি পেয়েছিলেন। আর কিছু নয়। কিন্তু আমরাও অবিচার করেছলাম শুধু বাইরেরটা দেখে। মনে পড়ে ১৯৬৫ সালে একবার চলচ্চিত্র উৎসবের একটি আলোচনা সভায় মুনীর চৌধুরী ছিলেন সভাপতি। আমাকে মূল বক্তব্য উপস্থিত করতে বলা হয়েছিল। এখানে শিল্পকলা আর বৈপ্লবিক রাজনীতির গভীর সর্ম্পকের প্রয়োজনটিকে সামনে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। বিপ্লবী মানবতা কথাটা নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমার চেয়ে অনেক ভাল করে যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন তাঁর সভাপতির ভাষণে। এই ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ঘষা লাগালেই আগুন জ্বলে উঠত। একটা জায়গা ছিল মুনীর চৌধুরীর সত্তার, যেখানে কমিউনিস্ট মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্ট হিসেবে বারবার মাথা তুলেছেন বিদ্রোহের লাল নিশান হাতে। এইখানেই ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিরাট সম্ভাবনার অধিকারী মুনীর চৌধুরীর দুর্নিবার ভবিষ্যৎ। এই কারণে পরের দিকে তাঁর কথা উঠলে অনেক সময় মনে হয়েছে, তাঁকে আবার সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতির ক্ষেত্রে যৌবনের মতো ফিরে পাবো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও প্রগতিবাদী চিন্তাধারার শত্রুরা তাঁর এই ভবিষ্যৎকে তাদের হায়নার চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছিল বলেই কমিউনিস্ট বিপ্লবী প্রগতিবাদী লেখক মুনীর চৌধুরীকে তারা হত্যা করেছে। এখন রক্তের সাগর থেকে কমরেড মুনীর চৌধুরীকে তুলে আনতে গিয়ে আমরা যারা সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতিকে নবগুণাত্মকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, তাদের বিপ্লবী অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারটাকে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিপ্লবীদের পরস্পরের হাতে হাত রেখে দুর্গম পথে অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে শিখতে হবে। মনে মন রেখে চলতে শিখতে হবে। অতর্কিতে হাত ছুটে

গেলেও আবার হাতে হাত রাখতে পারা যাবে সানন্দে। তা না হলে মুনীর চৌধুরীকে ফিরে পেয়ে কি শিখলাম?

শহীদুল্লা কায়সার কত বিদ্রোহ অগ্নিশিখা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে স্বাধীনতার দাবীতে গণবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই অভ্যুদয়কে সামনে রেখে সুকান্ত লিখেছিলেন, এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ, দিকে দিকে উঠে অবাধ্যতারই ঢেউ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধেও অবাক পৃথিবীকে আবারও অবাক করে এত বিদ্রোহ অগ্নিশিখার ঘটনা ঘটেছে নূতন রূপে। এই বিদ্রোহের আলেখ্য রচয়িতা লেখক, লেখিকা, কবি, শিল্পী যাঁরা, তাঁদের একজন শহীদুল্লা কায়সার। '৪৭-এ সুকান্তের সমবয়সী। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হলেন। রেখে গেলেন আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লববাদী জীবনে রক্তাক্ত স্বাক্ষর। দাখিল করে গেলেন বহু বহুবর্ণিল নারী ও পুরুষের ব্যক্তি চরিত্রের একক, দ্বৈত ও সমবেত বিদ্রোহাগ্নির অমর আলেখ্য লিপিকা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কাহিনী রচয়িতা রচয়িত্রী নক্ষত্রপুঞ্জের একটি আগ্নেয় তারা তিনি। আমরা এখানে তাঁর বৈশিষ্ট্যটিকে খানিকটা খুঁটিয়ে দেখছি।

১

শহীদুল্লা কায়সার '৪৮ থেকে '৭১ মধ্যে ৮ বছর জেলে কাটিয়েছেন এবং বাদবাকী সময়েও সদাসক্রিয় কমিউনিস্ট রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাঁর ৪৫ বছরের জীবনে কৈশোরেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রগতিবাদী চিন্তা ও কাজের অনুসারী হয়েছেন। কলেজ জীবন কলকাতায়, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ঢাকায়। নাগরিক আদব কায়দা তিনি রপ্ত করেছিলেন। অন্যদিকে নোয়াখালি তথা পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের আকাড়া পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন। নাড়ির যোগ ছিল তাঁর গ্রাম্য নারী পুরুষের সঙ্গে লোকভাষায় ও আচার ব্যবহারে। সুতরাং সব মিলিয়ে ধ্রুপদী, আধুনিক ও লোকায়ত, এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিহার।

বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আলেম ও মাদ্রাসা আলিয়ার অধ্যাপক। জননী ছিলেন সুযোগ্য ধর্মানুরাগিণী। পবিত্র কোরান শহীদুল্লা কায়সারের কৈশোরেই আয়ত্তে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মা যেন আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুযোগ ছেলের সামনে স্থাপন করেছিলেন, তেমনি শহীদুল্লা নিজেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত সমস্ত ধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত স্বাধীনতার আধুনিকতম লক্ষ্য ও কার্যক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মৈত্রীর অপরিহার্যতাকে শৈশব কৈশোরেই নির্দেশিত করে নিয়েছিলেন। যৌবনে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বিশ্বশ্রমজীবী আন্তর্জাতিকতার চেতনার সহায় ও সঙ্গী হলো কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

উপরোক্ত আত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতি এবং তার বিস্তারণের তাগিদ ও প্রবণতা নিয়ে শহীদুল্লা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং জনগণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ব্যাপক ও গভীরভাবে। এই পর্যায়েই তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প এবং চরিত্রালেখ্য ও রেখাচিত্র কবিতা লেখার ব্যাপারটা ঘটেছিল তিনি ছিলেন বিশেষ করে অর্থনীতির ছাত্র এবং নিবন্ধ রচনা ও উপস্থিত বক্তৃতাই ছিল তাঁর বক্তব্য দাখিলের মাধ্যম। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে অনুজ জহির রায়হানের গল্প ও উপন্যাস লেখায় উৎসাহ দিতেন এই আশায় যে জহির সাহিত্যের দিকে কাজ করবেন। জহির বড় ভাই এর এই প্রত্যাশা পূরণও করেছেন। কিন্তু শহীদুল্লা নিজেও লিখতে শুরু করেন। '৪৮ সালে জেলে ঢুকে নতুন অভিজ্ঞতার অভিনবত্বের আলোয় ডায়েরীতে বিভিন্ন মন্তব্য এবং কয়েকটি কথাচিত্র ও এমনকি কবিতার পঙ্ক্তি রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির মালমসলা নিয়ে কাজ করতে করতে অজান্তেই এগিয়ে এলেন পুরোদমে উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখার দিকে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলের বাইরে প্রবাহ নামের একটি সাহিত্য পত্রিকার সাথে নিজেকে জড়ালেন। যদিও সম্পাদকীয় বক্তব্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখলেন। '৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হবার পরে যখন অন্যান্য সাথীরা জেলখানায় নারকেল খেজুর গাছের চারা খেদমত দীর্ঘ কারাবাসের মেয়াদ কাটাবার পরিকল্পনা করছেন, কিছুটা কৌতুক করে তিনি শহীদুল্লা ঠিক করলেন গল্প উপন্যাস লিখবে। এবং লিখলেন। এই সময়েই যখন তাঁর ইতঃপূর্বেকার একটা মামলার সাজা শেষ হয়ে গেলো এবং জাঙ্গিয়া কোর্তা পরিয়ে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে রাখা হলো তখন তিনি দুর্দমনীয়ই হয়ে উঠলেন। এই মেয়াদ পার হাবার পরেও তিনটি বই এর খসড়া রচনা শেষ করে রাখলেন। এরা হলো 'রাজবন্দীর রোজনামচা' 'সংশপ্তক' ও 'সারেং-বৌ'। '৬২ তে বাইরে এসে প্রধানত এই তিনটি বই ছাপাখানার জন্য মেজেঘষে তৈরি করলেন। একটার পর একটা বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শহীদুল্লা কায়সার চিহ্নিত হলেন বাংলাদেশের একজন সেরা ঔপন্যাসিক হিসেবে। '৭১ সালের মধ্যে তিনি লিখলেন উপন্যাস 'চন্দ্রভানের কন্যা' এবং রেখে গেলেন অসমাপ্ত উপন্যাস 'কবে পোহাবে বিভাবরী'।

আমরা যে ঝড়ের মতো বিবরণীটি পেশ করলাম, উপরোক্ত বই তিনটি তেমনি ঝড়ের বেগে লিখেছিলেন শহীদুল্লা। তবে এরই মধ্যে 'সংশপ্তক' উপন্যাসের মতো ধ্রুপদী কাঠামোর বনস্পতিকে আশ্রয় করে অপরাজিতা লতার ফুল ফোটানোর মতো বেশ কয়েকটা গীতিকবিতা লিখেছিলেন শহীদুল্লা। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি বড় বইগুলির ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা গুল্মের ঝোপ আর ফুলের ঝাড়ের মতো থোকা থোকা করে মৃত্তিকাশ্রয়ী ছোট গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ সপ্তকের একটি কবিতার ভাষায় বলা যেতে পারে, কবিতাগুলি আকাশে উঠে গিয়েছে তাদের ভাবলৌকিকতা নিয়ে এবং ছোটগল্পগুলি মাটিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের বাস্তবতাবাদ নিয়ে। এছাড়া ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী হিসেবে 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দে' সেই সময়ে পাকিস্তানের চৌহদ্দির বাইরে যাবার একটিমাত্র সুযোগকে সংবাদসাহিত্যে শ্রমজীবী

জনগণ ও স্বাধীনতার আন্তর্জাতিকতার মাত্রা রচনার কাজে লাগিয়েছেন। লিখেছেন 'রিপোর্টাজ' বা সাহিত্যের ধারার ঘটনার বিবরণ।

২

উপরোক্ত পরিক্রমাকে সামনে রেখে এবার আমরা শহীদুল্লার উপন্যাস ও ছোটগল্পের এবং আখ্যানের নায়ক নায়িকাদের কথায় যেতে পারি। কারণ শহীদুল্লার মতোই তাঁর নায়ক নায়িকারাও বিখ্যাত হয়েছে। তারা বরং বেশি বিখ্যাত। আমরা এখানে দেখবো, শহীদুল্লা নিজেকেই শুধু বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায় একটি আগ্নেয় তারা হিসেবে একজন দিশারীরূপে দাখিল করেছেন তা নয়, তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের কিরণময়ী, শৈবালিনী কিংবা দামিনীর মতো চিরঞ্জীব নায়িকাদের পাশে, অথবা পরবর্তীকালের দুর্গা অথবা রম্ভার পাশে স্থাপন করলেন 'সারেং বৌ' এর নবিতুন, 'সংশপ্তকের' হুরমতি ও রাবু, 'চন্দ্রভানের কন্যা' সকিনা, ছোটগল্প 'অনমিতা' ও 'অনিরুদ্ধার' নূরজাহান ও খালেদাকে। বাংলা কথাসাহিত্যের নামী নামী নায়কদের পাশে তিনি রাখলেন 'সংশপ্তক' উপন্যাসের জাহেদ, 'সারেং বৌ এর কদম আলি, এবং রাজবন্দীর রোজনামচার ২৫ চরিত্রকে। এরা শহীদুল্লা কায়সারের জীবনবৃত্তের মধ্যে আসা নারী পুরুষদের মাত্র কয়েকজন। এরা অমর জনগণের কয়েকজন প্রতিনিধি। এরা সাহিত্যের ধারায় চলেছেন চলমান জনগণের সঙ্গে। থাকছে, থাকবে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে সাধারণভাবে সকল ভাষার সকল দেশের সকল জনগণের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য একটা সংজ্ঞার উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সহিত' থেকে অর্থাৎ সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এখানে সাহিত্যকে আমরা দেখব অগণিত চরিত্রের মধ্য থেকে অবয়ব তৈরি করে নিয়ে চলার সাথী হিসেবে। লেখক লেখিকাদের বাঁচার ব্যাপাঁরে এটা একটা উপাদান। নবিতুন বেঁচে থেকে শহীদুল্লাকে বাঁচাবে। যেমন চিন্তামণি বেঁচে থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচিয়ে রাখবে।

প্রকৃতপক্ষে মাত্র বারো তেরো বছরের মধ্যে লেখা 'সংশপ্তক' থেকে 'সারেং বৌ' ও 'রাজবন্দীর রোজনামচা' হয়ে 'চন্দ্রভানের কন্যা'র পরে অসমাপ্ত 'কবে পোহাবে বিভাবরী'র নায়ক নায়িকারা সেই বিদ্রোহী অবাধ্য অগ্নিশিখাদের কয়েকটি, যারা সমবেত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে পৌঁছে দিল '৭১ এর বিজয়ে। এটাও অমরতার দাবীদার উপাদান। শহীদুল্লার সমস্ত বিদ্রোহী নারী পুরুষ চরিত্রই বেরিয়ে এসেছে বাস্তবতার মধ্যেকার অনিবার্য সম্ভাব্যতা থেকে। শহীদুল্লা ইচ্ছাচারিতা থেকে এদের উদ্ভব হয়নি। শহীদুল্লার কৃতিত্ব হচ্ছে এদের উদ্ভবকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে চিহ্নিত করতে পারা। আমরা শুরুতেই শহীদুল্লার যে প্রস্তুতির উল্লেখ করেছি, তা এই চিহ্নিতকরণের ব্যাপারটাকে সাহায্য করেছে। এই সংগে খুঁটিনাটি আরও কিছু প্রস্তুতির কথা বলার দরকার হতে পারে। আহমেদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা এবং বাংলা একাডেমী ও বেগম পান্না কায়সারের সহযোগিতায় এবং অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েনের সম্পাদনায় প্রকাশিত শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলিতে ইতঃপূর্বে অপ্রকাশিত কয়েকটি ছোটগল্প এবং দিনলিপি থেকে শহীদুল্লার প্রস্তুতির উপরোক্ত খুটিনাটি বেরিয়ে এসেছে। জানতে পারা

গিয়েছে 'সারেং বৌ' রচয়িতার বাস্তববাদিতার ব্যাপ্তিকে আরও ভালভাবে। জানতে পারা গিয়েছে, অর্থনীতির সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করেই তিনি সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ অস্থিমজ্জা রক্তমাংসে স্নায়ুশিরায় তৈরি মানুষকে গভীরভাবে জেনেছিলেন সাহিত্যের জগতে ডুব দিয়ে।

৩

শহীদুল্লার উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য আলেখ্যের নায়ক-নায়িকাদের প্রাণবন্ত উদ্ভবের দিকটাকে আমরা এবার আরেকভাবে দেখবো, লেখককে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের কথাই প্রথমে ধরা যাক, তাদের সঙ্গী হয়েছে কারাগার, তাদের যাঁচাই হয়েছে পাষাণপুরীতে। একজন মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে শহীদুল্লাকেও কারাগারে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। এই জেলজীবনে তিনি যে সাহিত্যসৃষ্টির অভিনব প্রয়াসে ব্রতী হবার মতো মনের জোর খাটাতে শিখেছেন তা নয়, এখানে যাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের এত গভীরভাবে দেখতে পেয়েছেন যেটা বাইরে মেলামেশার মধ্যে পাননি। রাজনৈতিক বন্দী-সাথীদের তো কথাই নেই, যে সাধারণ মানুষদের তিনি বাইরে দেখবার এবং বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন, তারা এখানে নিকটতম সান্নিধ্যে আসার দরুন একেকটা নবাবিষ্কৃত জগতের মতো মনে হয়েছে তাঁর কাছে। মানবচরিত্রের সঙ্গে এই পরিচয় তাঁকে জেলখানায় বিভিন্ন জনকে নিয়ে এমন লেখায় উৎসাহিত করেছে, যা শতাব্দী কালের সমস্তদিক দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলা কারা-সাহিত্যের নূতন ধরনের সংযোজন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী' এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতিয়া চৌধুরীর 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা', সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' ও আব্দুস শহীদের জেলজীবনের কথার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের কারাগারের গল্পগুলি এবং 'রাজবন্দীর রোজনামচা' একটা অভিনব মাত্রা যোগ করেছে। একজন ধ্রুপদী কথাশিল্পীর প্রবণতা নিয়ে শহীদুল্লা জেলখানায় কাছে থেকে দেখা নারী পুরুষের বিশিষ্ট চরিত-কায়াকে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর এই পদ্ধতি হচ্ছে মানব মানবীর চরিত্রের আবেগঘন ঝড় ঝঞ্ঝার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা। বিশেষ করে বিদ্রোহী ও বিদ্রোহিনী চরিত্র তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং তিনি তাঁদের আলেখ্যই বিশেষ করে আঁকতে চেয়েছেন। তাদের জবানবন্দী শুনেছেন এবং সেখান থেকে বিদ্রোহের সূত্র ধরে তাদের শিকড়ের অথবা উৎসের সন্ধানে চলে গিয়েছেন বাইরের জগতে, বাইরের জগতের নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জেলখানার অভিজ্ঞতাকে মিলিয়েছেন। নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন তিনি এই পদ্ধতিতে তাঁর পরিচিত বাইরের জগৎটাকে। জেলখানায় পাওয়া সূত্র নিয়ে এবং সারেং অধ্যুষিত নোয়াখালি চট্টগ্রামের ছেলে হিসেবে সাগর এবং ডাঙ্গার খোঁজখবর যা রাখতেন তার ভিত্তিতে জেলে বসে 'সারেং বৌ' লিখে ফেলেন। এখানে শুধু উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে 'সারেং বৌ' এর নায়ক কদম আলি বিনাদোষে তিনবছর জেল খেটেছে বর্ণিত কাহিনীর বলয়ের মধ্যেই। হয়তো এমনই কোন কারাগারের সাথীর কাছে পেয়েছেন নবিতুনের কাহিনীর সূত্র।

অবশ্য বাইরের জগৎ সম্বন্ধে শহীদুল্লার নিজ অভিজ্ঞতা অজান্তেও তাঁর আধুনিক বৈদগ্ধের মধ্যেও জমেছিল। জেলখানা তাঁর চোখ পুরোপুরি খুলে দিয়েছিল, হৃদয়কে পুরোপুরি উন্মোচিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর একটা জনমুখিতা ও বিদ্রোহ প্রবণতা বাইরেই গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গেই 'সংশপ্তক' উপন্যাসের পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির সমগ্র কাহিনী ও কুশীলব জেলখানার বাইরের। এর শেষ পরিচ্ছেদে জেলখানার অবতারণা থাকলেও উপন্যাসের অভিজ্ঞতার বাইরে সে তখনও । এই পরিচ্ছেদে দেখা গেল, মুক্তিসংগ্রামী জাহেদ ধরা পড়েছে, সে জেলে চলেছে। তিরিশের দশেকের শেষের দিক থেকে পঞ্চাশের দশকের শুরু পর্যন্ত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ এবং দেশবিভাগ ও তার পরের কিছু সময়ের বিভিন্ন নারী ও পুরুষের জীবন কথায় জেলখানার ব্যাপারটা আসেনি। তবে জেলে বসে শহীদুল্লা স্মৃতিমন্থন করে যা লিখলেন, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, বাইরেও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নরনারী চরিত্রকে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহী ও বিদ্রোহিনীদের লক্ষ্য করেছিলেন এবং কথাবার্তা শুনেছিলেন বলেই ষাটের দশকের শুরুতে সময় পেয়ে পরিচিত সংগ্রামী চরিত্রদের উপন্যাসে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারলেন। বাইরে বেরিয়ে মাজাঘষা করে প্রকাশ করলেও খসড়াটা সত্যকে পুরোপুরি আধারিত করেছিল।

তবে এখানেও একটা কথা বলা যেতে পারে। জেলখানা শহীদুল্লা কায়সারের লেখার ভিতরের ও বাইরের সংযোজকের কাজ করেছে। 'রাজবন্দীর রোজনামচা'তে জেলখানার এই সংযোজক ভূমিকাকে অতীশ কিংবা কালামের জীবনবৃত্তের আখ্যান বর্ণনায় যেন সহযোগী সঙ্গীতের মতো পাওয়া যায়। এখানে জেলখানা যেন কষ্টি পাথরের কাজ করেছে রাজবন্দীদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যাটিকেও বুঝে নেবার ব্যাপারে। শহীদুল্লার বিদ্রোহীরা অবাধ্য অগ্নিশিখা হলেও স্নায়ু মজ্জাসমন্বিত মানুষ।

৪

এবার সমন্বিত শিল্পরূপ সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা।

শহীদুল্লা কায়সার তাঁর সমস্ত লেখাতেই এমনকি আকাড়া পুরুষ ও নারীদের অত্যন্ত রূঢ় ও অপভাষী কাহিনীর পরিবেশনেও একটা সুস্থ শালীনতায় সুস্থিত হতে চেয়েছেন। অপরাধজগতেও তিনি চৈতন্য ও সুষমার সন্ধানী। এর মূল রয়েছে সম্ভবত শহীদুল্লার মার্কসীয় বৈদগ্ধের বিশেষ ধারা। তিনি কোথাও হাল ছেড়ে দেননি অপরাধীদের ক্লিন্ন পরিবেশেও। এই প্রসঙ্গেই চোখের সামনে শহীদুল্লার মার্জিত ও প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বটিকে স্থাপন করলে আমরা দেখতে পাবো, তিনি ছিলেন দুর্দান্ত আশাবাদী এবং এই আশাবাদের উৎস ছিল মুক্তিসংগ্রামের ক্রমাগত বিস্তৃত ও গভীরতর হবার ইতিহাসসম্মত প্রক্রিয়া। তিনি যেমন কাড়া ও আকাড়া নারী ও পুরুষ চরিত্রসমূহকে তাদের সমস্ত রকমের স্বতঃস্ফূর্ততা সমেত তাঁর লেখার আধারিত করেছেন, তেমনি তাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যনির্ণয়ের তর্ক বিতর্কের এবং বিচার বিবেচনার সহস্রধার ভাবনাচিন্তার আবহের সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ করেছেন। ব্যাপরটা যেন একটা সংগ্রামী চেতনার চুম্বকক্ষেত্র রচনার মতো। এতে জোরাজুরি নেই,

সম্ভাব্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ আছে। ‘পল্টু’ গল্পে যেখানে যে লোকটি বরাবর চুরি করে জেলে আসতো, সে শেষবার জেলে এলো খুলনা ডকইয়ার্ডের শ্রমিকদের ধর্মঘটে উস্কানি প্রদানের অভিযোগে। এই ব্যাপরটাকে লেখক প্রথমদিকে কোন রকমের আভাসেও সামনে আনেননি। শহীদুল্লার বৈদগ্ধ্যে বিশেষ দিকটি আরও একভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসের নামটির কথা এই প্রসঙ্গে পাড়া যেতে পারে, এখানেও উল্লেখ্য সংগ্রামী চেতনার বিশিষ্ট উপস্থাপন। একটি ধ্রুপদী গণঅভ্যুদয়মূলক উপন্যাসকে একটি প্রতীকে চিহ্নিত করেছেন, যার মূলমর্ম মরণপণ মুক্তিসংগ্রাম। প্রয়াত প্রখ্যাত প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ কাজী আব্দুল ওদুদ সম্পাদিত ‘ব্যবহারিক শব্দকোষ’ এ দেখা যায় ‘সংশপ্তক’ মহাভারতে বর্ণিত অমিতবিক্রম সেনাদল বিশেষ আমরা এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ইহাই ছিল ইহাদের প্রতিজ্ঞা।

যেসব নারী ও পুরুষের চরিত্রকে শহীদুল্লা তাঁর বিভিন্ন ধরনের আলেখ্যের মাধ্যমে ব্যাপক পাঠক-পাঠিকা সমাজের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন, তাদের উপর নিজের চিন্তাধারাকে চাপিয়ে দেবার জন্য কোন জোরাজুরি তিনি যে করেননি তার প্রমাণ ‘অনমিতা’ গল্পের নূরজাহান চরিত্র। সে তো রাজবন্দীদের বলয়ে এসেছিল, কিন্তু সে তার বিদ্রোহের ধারায় কোন রাজনৈতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যোগ করেনি। চন্দ্রভানের কন্যা সকিনা সামন্ততান্ত্রিক বর্বরতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের পতাকা সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরলেও আশেপাশে সে সময়ে মুক্তি সংগ্রামী গণঅভ্যুদয় ঘটেছে, তাতে শরিক হয়নি। সে যতটা বিদ্রোহ করেছে, শহীদুল্লাহ তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন, যদিও শুধুমাত্র এই বিদ্রোহ যে বুর্জোয়াদের অন্ধগলিতে অবরুদ্ধ হবে তার আভাস দিয়ে নিয়েছেন।

আবার ‘অনিরুদ্ধ’ গল্পে খালেদা যে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামী দয়িতের পক্ষ নিতে গিয়ে অরাজনৈতিকতার অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করলো, উড়িয়ে দিলো আকাশছোঁয়া বিদ্রোহের পতাকা, সেই আখ্যানকে একটি বাস্তব সম্মত প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থিত করে শহীদুল্লাহ তাঁর বিপ্লবী বৈদগ্ধ্যের মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দাখিল করেছেন।

তাঁর তর্কবিতর্কের তথ্যতত্ত্বসমন্বিত উপন্যাস ‘সংশপ্তক’ অথবা, আবেগের ঝড়ের দোলায় দোলানো ‘সারেং বৌ’ ও ‘রাজবন্দীর রোজনামচা’ এবং প্রায় এমিল জোলার বাস্তবতাবাদী পদ্ধতিতে রচিত ‘চন্দ্রভানের কন্যা’তে শহীদুল্লা এই মাত্রাজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন, পেয়েছেন।

ব্যাপারটা ভদ্রতা নয়, বিপ্লবী নির্দিষ্টতার ধারারক্ষা।

অগণিত বিদ্রোহের অব্যাহত অগ্নিশিখারা যেমন বাস্তব, তেমনি সম্মিলিত ভাবে নির্দিষ্ট বিশ্ব শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির লক্ষ্যের অভিমুখে তাদের এগিয়ে চলার ইতিহাস সম্মত প্রক্রিয়াও বাস্তব। শহীদুল্লা এই প্রেক্ষিতকে একটি কবিতায় অপূর্ব সংযত ব্যঞ্জনা দিয়ে সামনে রেখেছেন মুক্তিসংগ্রামের শহীদদের সম্মুখে স্থাপন করে।

কবিতাটির নাম চারিদিকে ফুলের মেলা:

চারিদিকে ফুলের মেলা
কত কত ফুল

সবচেয়ে বড় ফুল আমার মায়ের মুখ।
কত কত স্বপ্ন
কবির স্বপ্ন, কবিতার স্বপ্ন
সবচেয়ে বড় স্বপ্ন শহীদের চোখ।
টেলিপ্রিন্টার খবরের কাগজ
জননেতা পণ্ডিত পুঁথির
কত কত কথা
সবচেয়ে বড় কথা আমাদের শহীদের শপথ।
ভালবাসা
প্রেয়সীর আলিঙ্গন
কত গান কত প্রেম
সবচেয়ে বড় প্রেম শহীদের খুন।
শত শত হাতে মশাল জ্বলে
শত শত হাত দাঁড় টানে
শত শত হাতে কাস্তে শাবল চলে
সবচেয়ে দুর্বার টান শহীদের হাত।

সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ

একালের উপমহাদেশ অগ্নি-আখরে

সাম্যবাদী কবি মখদুম মহীউদ্দিন

১

জন্ম ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯০৮। মৃত্যু ২৫শে আগস্ট, ১৯৬৯।

ভারতসহ সারা উপমহাদেশে 'লাল মখদুম' নামে যার পরিচয়, সেই বিপ্লবী জনগণ–কবি মখদুম মহীউদ্দিনের সংগ্রাম সাধনা ও সৃষ্টিকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে স্মরণ করছি। আমাদের সামনে রয়েছে গত চল্লিশ বছরের লাল পতাকা নিয়ে মেহনতী মানুষের লড়াই-এর ইতিহাসে মখদুম মহীউদ্দিনের সদাসক্রিয় ভূমিকার কথা। রয়েছে তাঁর কাব্যসমগ্র 'বিসাতে রাক্‌স্' (নৃত্য বিচিত্রা বা নাচের গালিচা)।

এই কাব্য সমগ্রই এখানে আলোচ্য।

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ ছিল মখদুম মহীউদ্দিনের মূল কর্মকেন্দ্র। ১৯৬৬ সালে এখানে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালিত হয় এবং এই সময়ে তাঁর কাব্য 'বিসাতে রাক্‌স্' নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ১৯৭৬ সালে হায়দ্রাবাদ থেকেই তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

গালিব, ইকবাল থেকে শুরু করে অধুনা ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো বরেণ্য কবিরা যে ভাষায় স্বদেশ ও বিশ্বের মানবতা নিয়ে বিপ্লবাত্মক কবিতা লিখেছেন, সেই ভাষাতেই 'বিসাতে রাক্‌স্' চড়াপর্দায় লেখা। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজ্যের একালের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দুভাষী কবি মখদুম মহীউদ্দিন লেখা শুরু করেছিলেন তার নিকটতম লোকায়ত ও নৈসর্গিক পরিবেশের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ নিয়ে। এই মুগ্ধভাবকে বারবার পাওয়া গেছে তাঁর চল্লিশ বছরের কাব্যে। সারসত্তার অগ্নিক্ষরা নবনব বিন্যাস ঘটেছে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চেতনায়। 'বিসাতে রাক্‌স্' কাব্যসমগ্রে রয়েছে তারই বিচিত্র চলচ্ছবি। দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, শ্রমিক কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম, সাম্যবাদী ভাবাদর্শ এবং সকল মুক্তি-সংগ্রাম জাতি ও মেহনতী মানব মানবীর আন্তর্জাতিকতাবোধে উন্মথিত এই কাব্য।

২

অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ থেকে আদবী ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'বিসাতে রাক্‌স্' কাব্য-সমগ্রের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯৬৬ সালে কবির জয়ন্তীতে প্রদত্ত যীনাত সাজেদার অনুপম ঘরোয়া ধরনের ভাষণটি ছাড়া রয়েছে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজবাহাদুর গৌড় এবং আদবী ট্রাস্টের আবেদ আলী খানের লেখা ভূমিকা।

এঁদের বক্তব্যের একেকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

আবেদ আলী খান লিখেছেন, "বিসাতে রাক্‌স্ যেমন মখদুমের কাব্যসমগ্র তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই হায়দ্রাবাদের রাজনৈতিক চেতনার আয়না। এই আয়নাতে সামন্তবাদী

আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ার জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনার বিস্তারিত ঐতিহাসিক রূপটিও প্রতিফলিত।"

যীনাত সাজেদা লিখেছেন, "আসল কথা, ওর কণ্ঠস্বরে যাদু রয়েছে। রয়েছে গভীর ধ্রুপদভিত্তিক, উদাত্ত, উচ্চকিত আওয়াজ। ও যখন গজল গায়, তখন নিজেই হয়ে যায় সঙ্গীত। মনে হয় ও যেন অমাবস্যায় দীপকের মতো জ্বলে উঠলো। কিন্তু যেইমাত্র ভাল বলা হলো, অমনি দুষ্টুমি শুরু হয়ে যাবে। আপনি ফরমায়েস করলেন সুর করে গজল গাইতে, ও লেগে যাবে গদ্য পড়তে।"

রাজবাহাদুর গৌড় লিখেছেন, "কী ভালই যে হতো যদি আজ মখদুম বেঁচে থাকতো এবং নিজের চোখে দেখতো, 'নৃত্যবিচিত্রা' বা নাচের গালিচা কত বেশি বিস্তারিত। যে ভিয়েতনামের দুর্যোগের দিনের কথা ও লিখেছিল, সেই দেশ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কব্জি মুচড়ে দিয়েছে। এইভাবে এ্যাঙ্গোলা ও প্যালেস্টাইনের কথা বলা চলে। তবে অধ্যাপক আবদুল ওয়াহিদ তো স্বীকার করতেই চান না যে মখদুম বেঁচে নেই :

বিসাতে রাক্‌সের স্রষ্টা নতুন প্রভাতের তারা
যৌবন ও কবিতার অনুরাগী, শ্রমজীবীর প্রেমিক
মখদুম মনে হয় আত্মগোপন করেছে।
মখদুমেরই কবিতার পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলবো,
"তুমি আজ নেই।
কিন্তু তোমার দুচোখের চাহনি বেঁচে আছে।"

উপর্যুক্ত তিনটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মখদুমের সংগ্রামী ও মৃত্যুহীন সত্তার পরিচয় প্রদানে গভীর আন্তরিকতার প্রকাশটি লক্ষণীয়।

সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জীটি নিম্নরূপ :

১৯০৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি মেদকে মখদুমের জন্ম। ১৯২৯ সালে সিঙ্গারেড্ডি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩০ সালে হায়দ্রাবাদে জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯৩৩ সালে প্রথম কবিতা 'হলদে চাদর' লেখা। ১৯৩৫ সালে মখদুমের লেখা 'চেতনার নখর' নাটক হায়দ্রাবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত। এই বছরেই মখদুমের লেখা নিবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্য' আদারাহ্ উর্দু আদবিয়াত কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৭ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রী লাভ। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর কবিতা 'মুসাফির'। এই বছরে সিটি কলেজে উর্দুর অধ্যাপক নিযুক্ত। ১৯৪১ সালে অধ্যাপকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব সময়ের সদস্য-কর্মী। ১৯৪৪ সালে প্রথম কবিতা সংকলন 'সুর্খ্ সোয়েরা' (রক্তিম প্রভাত) প্রকাশিত। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কবিতা সংকলন–'গুলেতর' (তাজাফুল)। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এই সময়ে সরোজিনী নাইডু গান্ধীজীর সঙ্গে মখদুমের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ আমার ছেলে।' ১৯৪৬ সালে নিখিল হায়দ্রাবাদে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি

এবং সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার। জামিনে মুক্তি। এই সময়ে যখন কমিউনিস্টদের ধরপাকড় শুরু হয় তখন মখদুম শাহ-আবাদ থেকে শোলাপুরে চলে যান এবং ওখানে আত্মগোপন করেন। ১৯৪৮ সালে কোলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং হায়দ্রাবাদে ফেরার পরে সেখানে আত্মগোপন করেন। তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহে শরিক হন। ১৯৫১ সালে গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে মুক্তি পান এবং হায়দ্রাবাদ শহরকেন্দ্র থেকে এসেমব্লি নির্বাচনে প্রার্থী হন। এই আসনে পরাজিত হলেও হজুরনগর থেকে নির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সফর করেন। ১৯৫৬ সালে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ১৯৬৯ সালে সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান। ১৯৬৯ সালে দিল্লীতে থাকার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত ও দিল্লীতে মৃত্যু। হায়দ্রাবাদে মরদেহ সমাহিত।

৩

বৈপ্লবিক স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গিত-প্রাণ মখদুম মহীউদ্দিন যে একই সঙ্গে নিপীড়িত ও শ্রমিক কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামকে জীবনের প্রধান কার্যক্রম করেছিলেন, তার একটা আভাস উপর্যুক্ত চুম্বকে পাওয়া যায়। তবে তেলেঙ্গানাতেই হোক অথবা নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগঠনের হরতাল ও বন্ধের বিশাল আয়োজনে হোক, তাঁর উপস্থিতিটাই যে কি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতো তার সামান্য পরিচয়ই এই চুম্বকে দেয়া সম্ভবপর হয়েছে। মখদুম মহীউদ্দিন ছিলেন একজন প্রিয়তম জনগণনেতা। তিনি সাম্যবাদী আদর্শে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং মেহনতী মানব-মানবীদের 'একজন' হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে সারা উপমহাদেশের সর্বদেশের সর্বভাষার স্বাধীনতাসংগ্রামী তাঁদের ভালবাসার মানুষ মখদুম মহীউদ্দিনকে স্মরণের মণিকোঠায় রাখছেন স্বাভাবিকভাবেই।

উপমহাদেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আদর ও ভালবাসা পেয়ে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে যে নেতারা ধন্য হয়েছেন মখদুম তাঁদের একজন। কৃষক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ও কবিতা—এদের কোন্‌টা এই ভালবাসার কারণ, সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে আসে না, কারণ তাঁর কবিতা ছিল তাঁর কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এদের কোনটাকে ছাড়া কোনটাকে পুরোপুরি পরিমাপের মধ্যে আনা যায় না। তবে বিশেষ করে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন তাঁর 'ইয়ে জং হ্যায় জঙ্গে আজাদী' (এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ) কবিতাটি উপমহাদেশের গণসঙ্গীতের আসরে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন মখদুমের সবচেয়ে বড় পরিচয় হয় এই যে, তিনি সাম্যবাদের চারণ কবি।

ওখানেও অবশ্য তিনি একক ছিলেন না। একক হবার কিংবা থাকবার কিংবা সেইভাবে উপরে উঠবার মেজাজই ছিল না মখদুম মহীউদ্দীনের। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপক গণ সংগঠনের প্রস্তুতিপর্বে এবং পরে চল্লিশের দশকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে উপমহাদেশে প্রগতি লেখক লেখিকা ও শিল্পীদের সংঘ এবং এরই সহযোগী হিসেবে গণনাট্য সংঘের বিপ্লবাত্মক প্রসারে

সকল ভাষার কাব্যে ও সাধারণভাবে সমস্ত শিল্পরূপে যে গণযুগের সূচনা হয় কমরেড সাজ্জাদ জহীরের নেতৃত্বে, তাতে উর্দু কবিতা এবং অন্যান্য শিল্পরূপে একদল লেখক লেখিকার উদ্ভব হয় যারা তাঁদের সাধনাকে সম্মিলিত করেছিলেন বিপ্লবী ঐকতানে। মজায তাঁর ভাবলৌকিকতা ছেড়ে এসে এতে যোগ দেন। ছোটগল্প লেখক হিসেবে যোগ দেন কৃষ্ণচন্দর। অন্যান্যদের মধ্যে মখদুম মহীউদ্দিন নিজেকে তিরিশের দশকেই প্রস্তুত করেছিলেন। চল্লিশের দশকের পরে যারা নিরন্তর সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও গণযুগের বিপ্লবী ধারাকে প্রসারিত করে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের অবিচ্ছেদ্য প্রিয় সাথী মখদুম মহীউদ্দিন।

'বিসাতে রাক্স' কাব্যসমগ্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ১১৩টি কবিতাতে রয়েছে এর পরিচয়-ধারা। কখনও মধুর, কখনও রাগী, কখনও কোমলে কঠোরে মিশ্রিত। মেহনতী মানুষের সংগ্রাম ও অভ্যুত্থান দ্বারা সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছবার সাধনাতে এর ঘটনা।

৪

'বিসাতে রাক্স' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল 'সুর্খ সোয়েরা' এবং 'গুলেতর' গ্রন্থদ্বয়ের সমস্ত কবিতা। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও বারটি কবিতা যোগ হয়েছে। সম্ভবত এগুলি কবির সবশেষের লেখা। উর্দু কাব্যে মোটামুটি কয়েক রকমের পদ্ধতি—নজম্, গজল, কিতা, মহাকাব্য। মখদুমের কোনো মহাকাব্যিক কবিতা নেই। তিনি বাকি তিন ধরনের রীতিতে কাজ করেছেন। এর মধ্যে নজ্ম্ হচ্ছে আধুনিক ব্যক্তি ভাবনার প্রযোজনা। কয়েকটি গদ্য কবিতাও রয়েছে মুক্ত ছন্দের ব্যবহারের পাশাপাশি।

এই সব মিলিয়ে যে মখদুমের কাজ, তাকে মোটামুটি চার দশক অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা যায়। কোন ভাগ কোন ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উপ-মহাদেশের ঘটনাধারা এবং এই সঙ্গে বিশ্ব ঘটনা-প্রবাহের উত্তরণগুলিকে অধ্যায়গতভাবে যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি বর্তমান শতাব্দীর মূল বিশ্ব-বিপ্লবের অবিচ্ছিন্ন দুর্বার ধারাটিও সামনে আসে।

মখদুম-কাব্যের চার পর্বকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথম পর্বের একেবারে শুরুতে অন্ধ্ররাজ্য তথা দাক্ষিণাত্যের পর্বত, সমুদ্র, অবারিত শস্যভূমি, ক্ষেতের আল, নদীনালা, মেঘমালা, সূর্য, চাঁদ, তারা, দিবারাত্রির মালা নবযুবাকে দিয়েছে সুন্দরের ধারণা। এই পর্বে নিজেকে পর্বতের মতো নিঃসঙ্গ ভাবুক মনে করে সঙ্গে সঙ্গেই কবি আপন করে নিয়েছেন রম্য গ্রাম লোকালয়ের সহজ সরল খেটে খাওয়া সকল ধর্মের মানুষগুলিকে। 'তুর' (পর্বত) এবং 'তেলেঙ্গানা' (তেলেঙ্গানার সরলা গ্রামীণ মেয়েরা) কবিতা দুটি এই প্রাথমিক পর্যায়ের দৃষ্টান্ত।

তবে মখদুম একেবারে কাঁচা বয়সে কাঁচা কবিতা লিখতে বসেননি। প্রথম থেকেই ভাবনাগুলি গুছানো। মুগ্ধভাবের পাশাপাশি যৌবনের প্রবল আবেগ এবং এক ধরনের অবরুদ্ধ ক্রোধ ও উত্তেজনা কাজ করেছে। এর পরিচয় রয়েছে 'বাঘী' (বিদ্রোহী) কবিতায়। এই কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, "আমি হুঙ্কার, আমি বজ্র, আমি জ্ঞান, আমি পারদ, আমি আত্ম-আরাধক, আমি নিজে-জাগা, আমি নিজ-শোভন" ইত্যাদি।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার যেন সহোদরা এই কবিতাটি। এই ধরনের বিদ্রোহাত্মক ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সরলমনা গ্রামীণ খেটে খাওয়া লোকসমাজের জন্যে সুস্থিত সহানুভূতির সংযোগ ছিল বলে তিরিশের দশকের স্বদেশ ও বিশ্বের ঝড়ো হাওয়া মখদুমকে প্রায় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েই বিপ্লবের পথে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করে দিয়েছিল। প্রথম পর্বেই তাই দেখা যায়, চাঁদ, তারা, সকাল সন্ধ্যা, ফুল এবং শাশ্বতী প্রিয়ার ধ্যান-ধারণাকে ছিঁড়ে ফেলে না দিয়েও কবি এসে দাঁড়িয়েছেন জীর্ণতা ও পরাধীনতা এবং মৃত্যু ও নিষ্ঠুরতার অসহনীয় পরিবেশে। স্বভাবতই ভাঙ্গার প্রয়োজনকে সামনে এনেছেন। ভাঙ্গার কথা বলেছেন বলেই প্রতিকূল নিষ্ঠুর অসহনীয় পরিবেশে আশার কথাও শুনিয়েছেন দুঃখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীটাকে নতুন করে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে এবং বিশেষ করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে এবং ভারত, ভিয়েতনাম, চীন ও অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রয়াসী ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশকে দমন করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধানোর চেষ্টা করে চলেছিল। এর বিরুদ্ধে আরি বারবুসে ও রোমাঁ রোলার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী লেখক-লেখিকা ও শিল্পীদের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল একই সময়ে।

সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে আমাদের উপমহাদেশের লেখক-লেখিকা ও শিল্পীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন প্রগতি লেখকসংঘ গঠনের মাধ্যমে। মখদুম মহীউদ্দিন স্পষ্টতই এই প্রতিরোধের অংশীদার হয়েছিলেন। মহাকালের মঞ্চে প্রাণের বৈচিত্র্যময় নৃত্যকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের প্রতিরোধের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন মখদুম। মৃত্যুবাহী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জানিয়েছিলেন তিনি 'জং' (যুদ্ধ), 'মওতকা গীত' (মৃত্যুর গান) এবং 'ধুঁয়া' (ধোঁয়া) প্রভৃতি কবিতায়।

এই সমস্ত কবিতাই যেমন বিশ্বসচেতন, তেমনি যে স্বদেশের মাটির কাছাকাছি ছিলেন কবি, তার সম্বন্ধেও সজ্ঞান।

'ধুঁয়া' কবিতাটির তিনটি পঙক্তি লক্ষণীয় :

> হাঁ, এ দৃশ্যও আমার পাপী চোখ দেখেছে
> চাষীর রক্তের ধারায় ধনিকের বাণিজ্য তরণী ভেসে ভেসে চলেছে
> বিচারের যে মৃতদেহ পুড়ছে তার ধোঁয়া চারিদিকে পুঞ্জীভূত।

এই প্রথম পর্বের শেষের দিকে মখদুম একই সঙ্গে স্বদেশসচেতন ও বিশ্বসচেতন যে-সব কবিতা-লেখেন, তার দুটি দৃষ্টান্ত 'আযাদী ওয়াতান' (মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে) এবং 'জাহানে নও' (নতুন পৃথিবী) কবিতা :

১. মাতৃভূমির স্বাধীনতার দীপশিখা কখনও নিভতে পারে না।
২. এমন বিশ্ব হোক যেখানে অভিনব সমাজ থাকবে
   এমন বিশ্ব হোক যখানে ভ্রাতৃত্বই হবে বাণী
   এমন বিশ্ব হোক যেখানে আসবে নতুন প্রভাত নতুন সন্ধ্যা

বস্তুতপক্ষে দুর্গত, লাঞ্ছিত, শোষিত, শৃঙ্খলিত মাতৃভূমি বা প্রাচ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়োজনবোধ থেকে এসেছিল

তাঁর বিশ্বচেতনা। এর পরবর্তী পর্বেও এই ধারাটি প্রবলভাবে কাজ করেছে। 'মাশরিক' (প্রাচ্য) কবিতাটি এর উদাহরণ। এতে বিষণ্নতা আছে, আবার জয়ের জ্বলন্ত আশ্বাসবাণী রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে মখদুম যখন কমিউনিস্ট হয়েছেন, তার পরক্ষণেই শুরু হয়েছে নাৎসী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের যুদ্ধ। মখদুমই ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ও ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করে লিখেছেন মৃত্যুহীন কবিতা 'ইয়ে জং হ্যায় জঙ্গে আজাদী'।

লিখেছেন,

এই যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ
স্বাধীনতার পতাকাতলে এই যুদ্ধ।
সেই যুদ্ধ কেমন
যাতে শত্রু বিপর্যস্ত না হয়?
সেই পৃথিবীই বা কেমন পৃথিবী হবে
যে পৃথিবীতে স্বরাজ হবে না?
সেই স্বাধীনতাই বা কেমন স্বাধীনতা হবে
যেখানে মজুরের রাজত্ব হবে না?

এই কবিতাতেই মখদুমের আন্তর্জাতিকতার অবস্থান লক্ষণীয়,

সারা জগৎ সে তো আমাদেরই
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
আমরা আফ্রিকী, আমেরিকী
আমরা স্বদেশের জন্যে উৎসর্গিত প্রাণ চীনা
আমরা পীড়নবিরোধী লালফৌজ
লৌহ মুখ, লৌহকায়।
আমাদের এই যুদ্ধ
স্বাধীনতার জন্যে উত্তাল উদ্দাম মানুষের।
এ যুদ্ধ শোষিতের লাঞ্ছিতের
কৃষকের এবং মজুরের।

সোভিয়েত ভূমির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই পর্বেই মখদুম লেখেন 'স্তালিন'। তিনচারটি দীর্ঘতম কবিতার অন্যতম এই 'স্তালিন'।

পাশাপাশি লেখেন তিনি 'কায়ুরের শহীদেরা'। ১৯৪৩ সালে মালাবারের যে চারজন কৃষক নেতাকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন, এদের সালাম জানিয়ে মখদুম বলেন, কায়ুরের শহীদেরা লেনিন ও স্তালিনের সন্ততি। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে লেখেন আবেগী কবিতা 'বাঙ্গালী'।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে দেশপ্রেমিকদের ঐক্যকে তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ঐক্যের প্রয়োজনে একীভূত করে নেন।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মখদুম-কাব্যে একটি বিশেষ সংযোজন রয়েছে, যার ভাষা ও সুর দুই-ই ক্রন্দন ক্ষোভ এবং ভাঙ্গার শপথে পুঞ্জীভূত। শত্রু হচ্ছে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ।

'জুল্‌ফ্‌ চলেপা (বিস্রস্ত জটা), 'ইনকিলব' (বিপ্লব), 'আন্ধেরা' (অন্ধকার), 'হাবেলি' (প্রাসাদ) প্রভৃতি কবিতায় যেমন দুঃখ পুঞ্জীভূত, তেমনি মুক্তির শপথও উচ্চকিত। 'জুল্‌ফ্‌ চলেপা' কবিতার শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি–

স্বাধীনতার শপথ অক্ষয় হোক, জীবন চির জয়ী হোক
লাল পতাকা আরও উঁচু হোক
বিদ্রোহের জয় হোক।

মখদুমকাব্যের তৃতীয় পর্ব ১৯৪৭ সালে আমাদের উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমিতে স্বাধীনতার আক্ষরিক অর্থে পাওয়া এবং বাস্তব রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হওয়ার পটভূমিতে রচিত। এখানে কবির কাজ এবং লেখার নতুন বিন্যাস শুরু হয়েছে। 'চাঁদ তারোঁকা বান', 'কয়েদ', 'তেলেঙ্গানা' এই পর্বের প্রধান কয়েকটি কবিতা।

চাঁদ তারোঁকা বান' কবিতার বিষয়বস্তুটি শিরোনামার নিচে লেখা–

'স্বাধীনতার আগে, পরে এবং সামনে ভবিষ্যতে।' মাধুর্যে, শক্তি ও সংযমে এবং বাক্‌ ব্যবহারে মখদুমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এটি।

প্রথমে স্বাধীনতার তৃষ্ণা :

মোমের মতো জ্বলছিল প্রিয় শহীদদের দেহ
রাত-ভর ঝলমল করেছে দেশ-প্রভাতের দীপশিখা
রাত-ভর জগমগ করেছে চাঁদ তারাদের কানন
তৃষ্ণা ছিল কিন্তু তৃষ্ণাতে জাগরূক ছিল
প্রতীক্ষমান নরনারী
তৃষ্ণার্ত চোখের খালি কৌটাগুলোকে হাতে নিয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়,

প্রভাত এক শোকপুরী হয়ে গেল
কাঁটাবনে ঢেকে গেল ভূমিতল

রক্তের বন্যা পেরিয়ে তৃতীয় অধ্যায়,

রাত্রির তলানির অন্ধকার রয়ে গেছে
প্রভাতের আলোকিত ভাবও আছে
বন্ধুরা হাতে হাত রাখো
চলো লক্ষ্যে ভালবাসার
যেখানে আছে প্রিয়জন সব
নিজের নিজের কাঁধে নিজের নিজের হাড়িকাঠ নিয়ে চলো।

'কয়েদ' কবিতাটি কারাগারে বসে লেখা–

আমার দুঃখ, আমার জীবনের সর্বস্ব

কারাগারেই নজরানা হলো
কারাভাঙ্গা দেশের স্বাধীনতার জন্যে নজরানা হলো না।

'তেলেঙ্গানা' কবিতায় মখদুম লিখলেন পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও স্বৈরাচারের পতনের কথা :

কালো রাত্রিতে বিদ্রোহী জনতা বজ্র কাঁধে নিয়ে
উঠেছে হাতে তরবারি নিয়ে লক্ষ লক্ষ জ্যোতির্ময়
পর্বত ও কান্তারের সন্তানেরা, ক্ষেতখামারের সন্তানেরা
ঝলসে উঠেছে কাস্তে, লাফিয়ে উঠছে কোদাল
প্রাসাদেরা ভিতসমেত ধ্বসে যাচ্ছে।

এই পর্বে ১৯৪৯ সালে চীন গণপ্রজাতন্ত্রের উদ্ভবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন আরও অনেকের মতো মখদুমও। উচ্ছল আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তিনি 'নয়াচীন' কবিতায়। সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভালবাসা জানিয়েছিলেন 'মাস্কো' কবিতায়। লিখেছিলেন :

সাতই নভেম্বরের জ্যোতি থেকে আমরা পথ দেখেছি
আমরাও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে তোর হাতে হাত রেখেছি
বিশ্বের জনতার সঙ্গে মিলেমিশে জীবন সঙ্গীত রচনা করেছি
তোর গান থেকে তোর কাজ থেকে চারদিকে দীপ জ্বেলেছি।
ভারতের দুঃখী জনতার সালাম নাও মাস্কো।

মখদুম কাব্যের চতুর্থ পর্ব হচ্ছে ষাটের দশক। এই পর্বে তাঁর লেখা –

সাম্রাজ্যবাদের নতুনতর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ ও বিশ্বের জনগণের বৈপ্লবিক প্রতিরোধ ও শপথে গরীয়ান।

লুমুম্বার হত্যার পরে 'লেখা চুপ না রহো' (চুপ থেকো না), 'সব কা খোয়াব' (সকলের স্বপ্ন), ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা 'দুররায়ে মওত', 'মার্টিন লুথার কিং' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছ ষাটের দশকের মর্ম।

সাম্র্যাজ্যবাদী আগ্রাসন সম্বন্ধে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের জন্যে সাবধানবাণী :

সেই হাত এখনও সক্রিয় রয়েছে
যে হাত কাউকে বা বিষ খাইয়েছে
কাউকে বা ক্রুশে চড়িয়েছে
সেই হাত যা সিনাই উপত্যকায়, ভিয়েতনামে থাবা বসিয়েছে।

এই চতুর্থ পর্বেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ–বিরোধীদের মধ্যেই এখনও যে অনৈক্য রয়ে গিয়েছে, তার জন্যে যন্ত্রণা। 'ফরিয়াদ' কবিতাটি দৃষ্টান্ত। বিপ্লবের পথের সাথীদের মধ্যে অনৈক্য মখদুমের একটা হৃদয়বিদারক দুঃখ।

তবে দুঃখ কখনও মখদুমকে মেহনতী মানুষের মুক্তির পথে দাখিল হবার ব্যাপারে নিবৃত্ত করে নি।

বস্তুতপক্ষে প্রকৃতি ও জনগণকে তিনি কখনও মাধুর্য ও নতুন সৃষ্টি ও আশাবাদ থেকে বিভক্ত দেখেন নি। তিনি যে দুঃখী মানুষের সঙ্গে একেবারে নিচতলায় অবস্থান করে মানবজীবনের গভীর ও সমৃদ্ধ অর্থময়তাকে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর মূল কাব্যিক প্রতীক নির্বাচন। সেটি হচ্ছে জীবন-নৃত্য। নৃত্য বা রাক্স্ নিয়ে আলাদা কবিতাও লিখেছেন। আবার এছাড়া এই শব্দটিকে তিনি সুযোগ পেলেই ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকটি কবিতায়।

এই নৃত্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি চার পঙক্তির নামহীন কবিতায় :

এই নাচ অগ্নিশিখার নাচ, তবে হে বন্ধু
হৃদয়ের সরোদে অগ্নিশিখার নাচই সৌভাগ্য।

'রাকস' নামের কবিতায় লিখেছেন মখদুম :

বিধাতা তুই নাচের গালিচাকে আরও প্রসারিত করে দে।
খন্তার আওয়াজ সফল হোক,
পাহাড়-খোদাইকারকে জিতিয়ে দে।

৫

ছ'শ বছরের উর্দু কবিতায় কিংবা হাজার বছরের ফারসি কবিতার কয়েকটি বহু ব্যবহৃত প্রতীক ব্যবহার করেছেন মার্কসবাদী মখদুম, যিনি তার সমস্ত কবিতাতে, যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার। এখানে একটা বিশেষ প্রতীক লক্ষণীয়, যার মধ্যে তিনি ভরে দিয়েছেন আমাদের শতাব্দীর বিপ্লবী সারবস্তুকে। পাহাড় খোদাইকার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের মহাকাব্যিক বীর ফরহাদ যে প্রিয়তমা শিরীকে পাওয়ার জন্য পাহাড় কেটে ঝর্ণা এনেছিল। মখদুমের কাছে ফরহাদ হচ্ছে শ্রমজীবীদের প্রতীক। পাহাড় কাটার খন্তা শ্রমজীবীর হাতের যন্ত্র। শ্রমের সঙ্গে প্রেমকে যুক্ত করেছেন কবি। তিনি তাঁর সমগ্র কাব্যকে উৎসর্গ করেছেন, "শ্রম ও প্রেমের উদ্দেশ্যে"। ফরহাদ সম্বন্ধে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নাজিম হিকমতেরও।

শহীদ জাকী আনোয়ার

১

উর্দু ছোটগল্প ও উপন্যাসের বিশিষ্ট প্রগতিবাদী লেখক অধ্যাপক জাকী আনোয়ার ১৯৭৯-এর এপ্রিলে জামসেদপুরের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। জামসেদপুরের বাসিন্দা ও করিম সিটি কলেজের উর্দু বিভাগের অধ্যক্ষ জাকী আনোয়ার শহরের দুই সম্প্রদায়ের বসতির মাঝামাঝি জায়গায় বাসা নিয়েছিলেন। তাঁর বাসাটাই ছিল অসাম্প্রদায়িকদের একটা মিলনকেন্দ্র। এবারকার দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি অনশন করেছিলেন এবং সঙ্গিন এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যেতে রাজী হন নি। দাঙ্গার সময় কুঁয়ো থেকে জল তুলে প্রতিবেশীদের ঘরের আগুন নিভিয়েছিলেন। সেদিন রাত জেগে তিনি একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন। যাতে এক জায়গায়

বলেছিলেন, "তিনি ক্রুশে পেরেক ঠোকার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।" এর পরে কোন এক সময় উন্মত্ত দাঙ্গাবাজেরা তাঁকে হত্যা করে।

শহীদের রক্ত যে মুছে যাবার নয়, এই সত্যবাণীকে জাগ্রত রাখবে জাকী আনোয়ারের অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাবলিও। মানবতাবাদী, প্রগতিবাদী লেখক নিজে অমর হতে চান কিংবা না চান, তার প্রধান লক্ষ্য থাকে অগণিত সাধারণ ও অসাধারণ মানব-মানবীকে অমর করার দিকে। বিশেষ করে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচয়িতাদের এখানেই সার্থকতা ও অসার্থকতার কষ্টিপাথর। বিশেষ করে আনোয়ারও তাই করে গিয়েছেন। তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখে গিয়েছেন যেখানে সামান্য–অসামান্যদের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি বুকের রক্ত দিয়ে।

এখানে তাঁর লেখা তিনটি উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাখিল করে লেখক এবং তাঁর কাহিনীর চরিত্রাবলিকে স্মরণ করছি।

উপন্যাস তিনটির নাম 'ফরেবি আরজু', 'শিকস্ত্ হি শিকস্ত্' ও 'যহর'। বাংলা করলে হবে 'বাসনার ছলনা,' 'পরাজয় শুধুই পরাজয়' এবং 'বিষ'। প্রথমটি আকৃতিতে ছোট, দ্বিতীয়টি মাঝারি, তৃতীয়টি রীতিমতো বড়ো।

২

'ফরেবি আরজু' উপন্যাস পুরোপুরি-আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ছবি। শাহেদ একটা বিদেশী প্রসাধনী দ্রব্যের সংস্থার প্রচার বিভাগে চারশ' টাকা মাইনের কর্মচারী। তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে বনভোজনে গিয়েছিল। সেখানে কাছেই একটা গাছতলায় তরুণীদের একটা দল ছিল। এদের মধ্যে ছিল মমতাজ, ধনীর কন্যা। সেখানে দেখা এবং কথা কাটাকাটি। মমতাজ প্রেমে পড়েছিল। মমতাজ লালিত হয়েছিল সুরক্ষিত সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে। তার জীবনধারণের ধারা গড়ে উঠেছিল সেই ছাঁচে। তবে মনটা বাইরে যেতো ছুটির ফাঁকে জীবনের বৈচিত্র্যের স্বাদের খোঁজে। শাহেদকে সে খুঁজে বের করলো। ভাবলো, একটি নামকরা ফার্মের উদীয়মান কর্মচারী। টেলিফোনে আলাপ হতে হতে শেষে শাহেদ একেবারে মমতাজের বাসায় হাজিরা দিতে লাগলো। কিন্তু এর পরে যখন বিয়ের কথাটা উঠলো, তখন শাহেদের আর্থিক সঙ্গতির কথা তার অজানা থাকে নি। শাহেদকে মমতাজের মুখেই শুনতে হলো যে, চারশ টাকা মাইনের কর্মচারীর সঙ্গে মমতাজের বিয়ে হতে পারে না। মমতাজদের বাড়ি থেকে ফিরে শাহেদ মদ খেয়ে বাইজী মেহেরের ঘরে গিয়ে বসে, গান শুনে দুঃখ ভুলতে।

মেহের আরা বাইজীর মেয়ে এবং নিজেও গায়িকা–বাইজী। সে একটা জঘন্য পরিবেশে বড় হয়েছে, কিন্তু সে তার অসামাজিক বিপন্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে একটা সুস্থ পারিবারিক নীড়ের সন্ধানী। এই অবস্থায় ব্যাপারটার একটা ছোটগল্প সুলভ যবনিকা এখানেই পড়তে পারতো। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতার বিস্তারের তাগিদে সেটা ঘটতে পারে নি, বিশেষ করে জাকী আনোয়ারের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি একমাত্র নায়ক ও দুই নায়িকাকে টানাপোড়েনের আক্ষেপ বিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত টেনে নিয়েছে। এই জন্যেই প্রধানত যেটা ঘটতে থাকে সেটা এই যে, মমতাজ শাহেদকে

ফেলে দিয়েও ফেলে দিতে পারছে না। শাহেদেরও মন পড়ে আছে মমতাজের দিকে। বারবার প্রত্যাখ্যানের ঘা খেয়ে মেহেরকে আশ্রয় করেও তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। মমতাজকে ভুলতে গিয়ে শাহেদ নতুন করে মদ ধরে লিভার নষ্ট করে মৃতপ্রায় হয়ে মেহেরের কাছে গিয়ে উঠলো এবং বেঁচে উঠে মেহেরকে নিয়ে ঘর বাঁধলো।

তবু সমস্ত ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি হলো না। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে মমতাজের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য দিয়ে। সে হেরে গেলো বলে কান্না?

'দিল' ও 'দিমাগের' দ্বন্দ্ব তথা হৃদয় ও বাস্তববুদ্ধির দ্বন্দ্বের নিরসন সহজে হবার নয়, সে কথাটা বলার জন্যেই এই কান্না? এই ত্রয়ীর টানাপোড়েনের মধ্যে সে-রকম সক্রিয় কোনো চতুর্থ ব্যক্তিকে আনা হয়নি বোধ হয় এর জন্যেই। মানুষ যে নিজের অন্তরের সঙ্গে লড়াই করতে করতেও ক্ষতবিক্ষত, সেই সত্যটিকে উপন্যাসের রচয়িতা সামনে আনতে চেয়েছেন। সম্ভবত এই জন্যেই একটা মামুলি যোগ বিয়োগের অঙ্কের মতো একটি কাহিনীও পেয়েছে গুণগত উত্তরণের প্রসাদগুণ।

অবশ্য শুধুমাত্র এই উপন্যাসটিকে সামনে রাখলে জাকী আনোয়ারের শিল্পরূপের কাজের ধারাকে পুরোপুরি বুঝতে পারা যাবে না।

অপর দুটি উপন্যাসে লেখককে এবং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীরভাবে পাওয়া যায়।

৩

'শিকস্ত্ হি শিকস্ত্' উপন্যাসের কাহিনীটি 'ফরেবি আরজু' থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের। এর প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে গ্রামে। প্রধানত তাঁতিদের কর্মকেন্দ্র এই গ্রাম। বস্ত্রব্যবসায়ীরও বাস এই গ্রামে। দরিদ্র তাঁতি, ধনী ব্যবসায়ী। একটি শাড়ি দিয়ে উপন্যাসের শুরু। কুশলী তাঁতি ফিরোজ হোসেন তার মেয়ে শাকিলাকে বিয়ের সময় দেবে বলে অসুস্থতা সত্ত্বেও কষ্ট করে চমৎকার একটা শাড়ি বুনেছিল। সেই শাড়ি শহরে একটা প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়েছিল শুধু 'শ্রেষ্ঠ' পুরস্কার পাওয়ার জন্যে, বিক্রির জন্যে নয়। শহরের অভিজাত ধনী বিলাসিনী বিধবা বেগম আশরাফ জেদ ধরলো, এ শাড়ি তার চাই। যে ব্যবসায়ী শহরে শাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে শাকিলার বাবার কাছে বেগম আশরাফের প্রস্তাব পেশ করে ধমক খেলো। কিন্তু শাকিলার বাবার অসুখ বেড়ে গেল। তখন শাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। শাকিলা গিয়ে তাঁতে বসলো পরিবারকে রক্ষা করার জন্যে। বিক্রির জন্যে শাড়ি পৌঁছে দিতে লাগলো সে ধনী ব্যবসায়ী করিম বখ্সের কাছে। করিম বখ্সের কন্যা আঞ্জুমান আরা শহরে পড়ে। তাদের বাড়িতে থাকে কর্মচারী ও বন্ধুপুত্র নবীন যুবা আকরাম। ভাবী জামাই। লেখাপড়া অবশ্য কিছুই করে নি। শাকিলা তাকে ভালবেসেছে। কিন্তু কাউকে কখনও জানায়নি। আঞ্জুমান আরা শহরের স্কুলের পড়া শেষ করলেও ঠিক করেছিল আকরামকেই সে বিয়ে করবে এবং গড়েপিটে ঠিক করে নেবে। কিন্তু আবির্ভাব হলো এক ডাক্তারের। নাম আরশাদ আলী। আঞ্জুমান আরার ওপর তার চোখ পড়লো। ধনী ব্যবসায়ীর শিক্ষিতা কন্যা তার কাছে লোভনীয়। অন্য নারীতেও আসক্ত হতে তার

বাঁধে না। ছলনায় সিদ্ধহস্ত আঞ্জুমান আরার মন হরণ করলো সে। আকরামের সঙ্গে আঞ্জুমানের বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে গেলো। ডাক্তার আরশাদ আলী আঞ্জুমানকে বিয়ে করলো।

কিন্তু ইতিমধ্যে মাঝপথে আরেকটি ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। শাকিলা যখন আকরামকে নিয়ে শহরে গিয়েছিল বেগম আশরফের কাছে তার দাবির শাড়িটি বিক্রি করার জন্য, তখন তার কাছে ছিল শাকিলার বাবার চিকিৎসক ডাক্তার আরশাদ আলীর একটা ব্যবস্থাপত্র। এই ব্যবস্থাপত্রে ডাক্তারের নাম দেখে বেগম আশরাফের পূর্বকথা মনে পড়ে গেলো। যুবক ডাক্তারকে সে ভালবেসেছিল। কিন্তু এক প্রৌঢ় ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বাঁচে নি। বেগম আশরাফ ভাবলো, এবার সন্ধান নেয়া যাক ডাক্তারের। সে শাকিলাদের গ্রামে এলো তার বাবাকে দেখবার অছিলায়। তখন শুরু হলো ডাক্তারের একটা সমান্তরাল জীবন। শহরে একটা। গ্রামে আরেকটা। আঞ্জুমান তালাকের আবেদন করলো। শাকিলার বাবা মারা গেল। আকরাম নিজেকে নির্বাসিত করলো একটা দূর গ্রামে। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে সে মারা গেলো। তার পাশে শেষ দিন পর্যন্ত ছিল শাকিলা আর বন্ধু জগদীশ। আকরামের কবরের পাশে বসে শাকিলার বক্তব্য : "এটা শুধু তোমার পরাজয় নয়, তোমার পরাজয়ের মধ্যেই আমারও পরজয়, নিছক পরাজয়।"

এদিকে অবশ্য বেগম আশরাফ আরশাদ আলীকে তার দায় থেকে মুক্ত করে দিল। ডাক্তার আঞ্জুমানকে এসে ধরলো বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন ফিরিয়ে নিতে। রাজী হলো আঞ্জুমান।

তবু যেন সবকিছু মিটেও মিটতে চায় না।

আঞ্জুমান ডাক্তারের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার আগে শাকিলার সঙ্গে দেখা করে বললো, তার অনুরোধ তাকে তার মৃত্যুর পরে যেন আকরামের কবরের পায়ের দিকে কবর দেয়া হয়। একথা সে আর সবাইকে বলে যাবে। আঞ্জুমান আরা যখন একথা বলতে বলতে কাঁদছে, তখন শাকিলার হাসি পাচ্ছিল। সে ভাবছিল, এই মহিলার মৃত্যু হলে তাকে সবাই এনে আকরামের কবরের পায়ের দিকে কবর দেবে। কিন্তু তার মতো সহায় সম্বলহীন মেয়ের মৃত্যু হলে ঐ বিশাল কবরস্থনে তার জায়গা হবে কোথায়!

কে জানে?

'শিকস্ত্ হি শিকস্ত্' উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধনী ও নির্ধনের তথা শ্রমজীবীদের সম্পর্ককে তেল আর জলের সম্পর্কের মতো করে দেখানো হয়েছে।

'ফরেবি আরজু'তে শাহেদ আর মমতাজের ট্রাজেডির মূলে ধনী ও নির্ধনের ব্যাপারটা থাকলেও শাহেদ যাকে বিয়ে করলো তার অর্থের অভাব ছিল না। সেই জন্যই এদিক দিয়ে অন্তত ধনী ও নির্ধনের মধ্যেকার তিক্ততাটাকে লঘু করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'শিকস্ত্ হি শিকস্ত্' উপন্যাসে ধনী ও নির্ধনের তিক্ততার সম্পর্ককে জোরালো করেই বারবার দেখানো হয়েছে।

একজন গরীব তাঁতির মেয়ে যে নিজেও তাঁতে কাপড় বুনে সংসার চালায় সে একজন গরীব শ্রমজীবীর মর্যাদাকে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে শাকিলাই যে উপন্যাসটির নায়িকা, সেকথা বুঝতে পারা যায়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মনের গহনের চাপা আগুনের মতো প্রেম আর আত্মমর্যাদার চিন্তাধারার অবিশ্রান্ত প্রবাহের চিত্রণ থেকে।

মেয়ের জন্য মনুপ্রাণ ঢেলে একটা শাড়ি বুনে শেষ পর্যন্ত সেটাকে কেন মেয়ের জন্য রাখা গেল না সেই প্রশ্নের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলেছে শেষ পর্যন্ত শাকিলার মনেই। কিন্তু শাকিলা তাঁতে কাজ করা একান্ত সাধারণ মেয়ে। একথাটা জাকী আনোয়ার ভোলেন নি। এজন্যই তিনি শাকিলাকে দিয়ে কোন তত্ত্বের অবতারণা করান নি। আরেকটা কথাও এখানে মনে রাখা যেতে পারে; জাকী আনোয়ার ধর্মনিরপেক্ষতার সত্যকে 'ফরেবি আরজুর' মতো 'শিকস্ত্ হি শিকস্তে'ও অবলম্বন করেছেন আধুনিক মনস্তত্ত্বের ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের মারফত। এ ব্যাপারেও তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেন নি।

এদিক দিয়েই আমাদের আলোচ্য তৃতীয় উপাখ্যান 'যহর'কে আমরা জাকী আনোয়ারের চিন্তাধারার প্রকাশ্য ঘোষণার শিল্পরূপের কাজ বলে মনে করতে পারি।

৪

'যহর' বা 'বিষ' উপন্যাস নাগরিক কাহিনী। তবে এর কাহিনীর বিস্তার নাগরিক জীবনের ভিত্তিতে লেখা 'ফরেবি আরজু'র চেয়ে অনেক বড়। সবদিক দিয়ে এর মধ্যেও 'শিকস্ত্ হি শিকস্তের' মতো প্লটের মধ্যে প্লট। তবে আরও জটিল। এই উপন্যাসে কোন সরলা গ্রামীণ শাকিলা নেই। আছে রমা। একটি ছিন্নমূল মেয়ে। তবে সুশিক্ষিতা।

এর কাহিনী আগাগোড়া নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে ভরা। নরেশ তরুণ যুবা। শহরের এক শেঠজীর দপ্তরের কেরানি। একটা রেস্তোঁরায় মদ খেতে গিয়ে আবিষ্কার করলো সুন্দরী তরুণী রমাকে। একটা সিনেমা থেকে তাকে গুণ্ডারা ভুলিয়ে এনেছে। মেয়েটি দিশেহারা। নরেশ তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। নিজের বাসায় তুললো বোন হিসেবে। বললো, এইভাবেই থাকা যাবে। রমা নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে নারাজ। নরেশ নিজের কাহিনী বললো। আরেকটা শহরে সে থাকতো, কলেজে পড়তো। তখন গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন চলছে। শহরে মেথরদের ধর্মঘট। একজন ধর্মঘটীর সঙ্গে নরেশ হরিজন পল্লীতে গিয়ে রাধিয়া নাম্নী এক তরুণীর প্রেমে পড়লো। তাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করলো। কিন্তু নরেশের বাবা রাজী হলেন না। সাংঘাতিকভাবে আপত্তি করলেন। নরেশ সবকিছু ছেড়েছুড়ে আরেকটা শহরে এসে বাসা বেঁধেছে। একটা চাকরী নিয়েছে। মদও খাচ্ছে। নরেশ তার এই কাহিনী রমাকে শোনালো। কিন্তু ব্যাপারটা এক তরফা হয়েই রইল। রমা রহস্যের যবনিকার আড়ালেই রয়ে গেল। তবে তার আচরণ হলো বোনের মতোই। অথবা বলা যেতে পারে প্রিয় বান্ধবীর মতো।

নরেশ তখন আরেকটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে রয়েছে। শেঠজীর একমাত্র মেয়ে লতা তার প্রেমে পড়েছে। নরেশও একটা আকর্ষণে জড়িয়ে পড়েছে। শেঠজী এবং তার একান্ত বয়স্য প্রাণশঙ্কর ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখছিল না। শেঠজী বুঝতেই

পারছিল না তার মেয়ে লতা তারই কর্মচারী একটা উড়নচণ্ডী যুবকের সঙ্গে কি করে মাখামাখি করতে পারে। প্রাণশঙ্কর ভাবছিল তার নিজের দিকটা। শেঠজীর মন ভিজিয়ে লতাকে সে যদি বিয়ে করতে পারে তাহলে রাজকন্যা ও রাজ্য দুই-ই পাবে। ঘটনাচক্রে প্রাণশঙ্কর নরেশের বাসায় গিয়ে রমাকে আবিষ্কার করে। রমাকে একটা চাকরি করে দেবে বলে শেঠজীর দপ্তরে নিয়ে যায়। একদিন শেঠজী রমার সর্বনাশ করে। কিন্তু লতা আর নরেশ তখন আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সুতরাং শেঠজীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাণশঙ্কর নরেশকে মোটর দুর্ঘটনায় ফেলে মারবার চেষ্টা করে। দারুণভাবে আহত নরেশ হাসপাতালে। সেখানে সে ভাল হলেও তার যে সৌন্দর্যে লতা আকৃষ্ট হয়েছিল, সেটা আর ছিল না। মুখের জখমটাই খুব বেশি ছিল। শুরু হয় বিকর্ষণের পালা। নরেশ আবার শহর ছেড়ে দূর দূরান্তে চলে যায়। সেই রাধিয়া খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়া শিখে নার্সের কাজ নিয়েছে। অবশেষে নরেশ যে হাসপাতালে ভর্তি হয়, সেখানে বদলি হয়ে এসেছিল। নরেশ তাকে চিনতে না পারলেও সে চিনেছিল। রমার সঙ্গে সখ্য হয়েছিল। নরেশ যখন দেশান্তরি হলো, তখন রাধিয়া রমার সঙ্গে থাকতে লাগলো।

নরেশ যে শহরে গিয়ে বাসা নিয়েছিল, সেখানে তার নিজের চিকিৎসার সূত্রে মুসলমান ডাক্তার নৌসাদ ও তার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হয়। সেখানেই একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনাও শুনতে পায়। তার এই নবপরিচিতেরা ইনকিলাবী বা বিপ্লববাদী। এদের মধ্যে একজন রমার নিদারুণ বিপর্যয়ের কথা নরেশের কাছে শুনে প্রস্তাব দেয় যে, এই রমাকেই সে বিয়ে করতে রাজী। তাতে মেয়েটা বেঁচে যাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কালো ছায়া থেকে। সে এসে রমাকে খুঁজে বের করে। কিন্তু রমা তখন প্রতিহিংসার জন্যে তৈরি। সে ছলনাময় শেঠজীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে একটি উদ্দেশ্যে। শেঠজী আর প্রাণশঙ্করকে সে হত্যা করবে। করলোও তাই। শেঠজীকে বিষ খাওয়ালো। প্রাণশঙ্করের বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। তারপর ধরা দিল। বিচারকক্ষে সে বিষ খেয়ে মরলো। মরার আগে যে জবানবন্দী সে দেয়, তাতে বলে যায় যে, এই বিষাক্ত সমাজব্যবস্থায় সে বাঁচতে পারলো না।

উপন্যাসের এই কাহিনীর সংক্ষিপ্তসারকে আপাতদৃষ্টিতে একটা স্থূল রোমাঞ্চকর প্লট বলে মনে হবে। কিন্তু উপন্যাসের বিন্যাসে এবং জাকী আনোয়ারের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগের দরুণ স্থূলতার কোনো অবকাশই থাকে নি।

রমার মনের গহনের চিন্তাস্রোতের গতি ও ব্যাপ্তি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। ধনবাদী সমাজব্যবস্থাতে যে বিষ রয়েছে এবং যাতে মানবিক মূল্যবোধগুলি জর্জরিত, তার প্রতি লেখক একজন বিপ্লববাদী হিসেবে ধিক্কার হেনেছেন। তবে এখানেও যতটা চরিত্রাবলি এবং ঘটনার মাধ্যমে বলা যেতে পারে, ততটাই বলেছেন। জাকী আনোয়ার নিজে কোথাও কোনো মন্তব্য করেন নি। তবে কাহিনীর নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে তিনি একটা প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এটা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। 'বিষ' উপন্যাসে তিনি হিন্দু, খৃস্টান, মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে জড়ো করেছেন। শুধু মনের গহনের ক্ষোভেই নয়, সমগ্র জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও

মনুষ্যত্বের যাচাই এ সমস্ত ধর্মের মানুষ তথা নরনারীর মুক্তির পথ যে একটাই, সে কথাটা সুতোর মতো খুলে খুলে কাহিনীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

'শিকস্ত্ হি শিকস্ত্' উপন্যাসে যে তিক্ততা আছে তাকে 'যহরে'র তিক্ততা বহুমাত্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে ঐক্যের আবেদন রয়েছে, তাতে তিক্ততা অনেকটা ধুয়ে গিয়ে মানবতার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা দর্শনীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এই মানবিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থাকে জাকী আনোয়ার নিজ জীবনে প্রয়োগ করেছেন এবং এই জন্যে প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠিত হননি। শিল্প ও শিল্পরূপের এই একাত্মতা কি নিষ্ফলা হতে পারে?

জোশ মলিহাবাদী : দু'জনের একজন

১

আমাদের উপমহাদেশের দু'জন প্রবীণতম কবি জোশ মলিহাবাদী এবং ফিরাক গোরখপুরী ৮২'-র শুরুতে এক সপ্তাহের মধ্যে মারা গেলেন। একজন ৮৭ বছর বয়সে, আরেকজন ৮৫ বছর বয়সে। জোশের জন্ম ১৮৯৪ সালে। ফিরাকের জন্ম ১৮৯৬ সালে। দু'জনেই উর্দু ভাষাতে কবিতা লিখেছেন। উর্দু কাব্যের রীতি অনুযায়ী এঁরা নিজেদের নামকরণ করে নিয়েছিলেন যাঁর যাঁর মেজাজ অনুসারে। জোশ হচ্ছে উদ্দীপনা, ফিরাক বিরহ। দু'জনই যথাক্রমে এঁদের জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশের মলিহাবাদ ও গোরখপুরকে নিজেদের কবিনামে যুক্ত করেছিলেন। জোশ মলিহাবাদীর আসল নাম শব্বীর হাসান খান। ফিরাক গোরখপুরীর আসল নাম রঘুপতি সহায়।

এঁরা দু'জনেই বিশের দশকে ভরা-যৌবনে মাতৃভূমির পরাধীনতা মোচনের সংগ্রামে নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে দু'জনই মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার অনুরাগী হয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ কাব্যিক মেজাজ নিয়ে। জোশ জন্মেছিলেন অভিজাত জায়গীরদার পরিবারে। ফিরাক জন্মেছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে। দু'জনেরই পারিবারিক সূত্রে ফার্সি ভাষার চর্চায় এবং উর্দু কবিতায় হাতে খড়ি হয়েছিল। দু'জনেই পেশায় পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছিলেন। জোশ জায়গীদারির সংস্পর্শ ত্যাগ করে কবিতা ও সাহিত্যকে প্রধান অবলম্বন করেছিলেন। ফিরাক তখনকার আমলের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের পাওয়া আই সি এসের চাকরিতে না গিয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

২

দু'জনের অমিলটাও লক্ষণীয়। মেজাজ এবং পদ্ধতি শুধু এঁদের কবিতাকে স্বতন্ত্র করে নি, এঁদের জীবনযাপনের ধারাকেও স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করেছে। আমাদের উপমহাদেশের বিশ শতকের রাষ্ট্রনৈতিক আবর্তন ও বিবর্তনের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন জোশ। অশান্ত ও অস্থির তাঁর জীবনযাত্রা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে জীবিকার সমস্যায় পড়েছেন বারবার। হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে সভাকবির

চাকরি পেয়েছিলেন। থাকতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। ভারত সরকারের উর্দু মুখপত্র 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদনার ভার পেয়েছিলেন উপমহাদেশ ভাগ হবার পরে। কয়েক বছর চালিয়ে ছেড়ে চলে গেছেন পাকিস্তানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ব্যবস্থা করতে। সেখানে একঘরে হয়ে রইলেন। 'স্মৃতির মিছিল' (ইয়াদোঁকি বরাত') নাম দিয়ে যে জীবন স্মৃতি লিখলেন, তা ভারতে ১৯৭২ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হ'ল এবং পাকিস্তানে তা নিষিদ্ধ হ'ল। তাঁর শেষ দিনগুলি অবশ্য কাটল পাকিস্তানেই। এই প্রচণ্ড আলোড়নময় সমগ্র জীবনের পূর্ণ বিকাশ রয়েছে তাঁর কবিতার ধারায় এবং ভাষায়। এদিক দিয়ে জোশকে বহির্মুখী কবি বলা যায়।

জোশ প্রথম যৌবনে হাফেজ এবং ওমর খৈয়ামের বিদ্রোহী কাব্যে ও চিত্তে কায়মনোবাক্যে শরিক হয়েছিলেন। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের একটা পর্যায়ে তিনি জার্মান দার্শনিক নীট্সের 'অতিমানব' তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। কিন্তু বিশের দশকে কংগ্রেস ও খেলাফতের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়, তাকে তিনি কবিতার ভাষা দেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ধারায়। গণ-সমাবেশে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা ও আবৃত্তির ছাঁচে ঢালা হয়ে যায় তার লেখার ধারা। এই উদাত্ত রীতি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কবিতায় প্রাধান্য বজায় রাখে। কোন বিশেষ বিষয়ে দীর্ঘ কবিতাই হোক অথবা চার পঙ্‌ক্তির রুবাইয়াত হোক, তিনি কোথাও কোনো ভাব ও বস্তুকে রেখে ঢেকে ইঙ্গিতে ইশারায় বলবার চেষ্টা করেন নি। যে-ফার্সি কাব্যের সঙ্গে উর্দু কাব্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তার ভাষায় জোশের প্রচণ্ড দখল ছিল। কিন্তু তিনি উপমহাদেশের উত্তরখণ্ডের, বিশেষ করে, যুক্তপ্রদেশের জনগণের কথ্য ভাষায় যতটুকু ফার্সি রয়েছে তাকেই প্রধানত তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো তাত্ত্বিক কবিতায় এর ব্যতিক্রম ঘটলেও জোশ জনতাকে ছাড়েন নি। এজন্যে অবশ্য 'মেঠো কবিতা' তিনি অনেক লিখেছেন, এবং এই কারণে কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিদ্বজ্জনের মধ্যে 'অকবির' খ্যাতি কুড়িয়েছেন। এইজন্য অনুশোচনায় একেবারেই যে তিনি দগ্ধ হন নি, তা নয়। 'ইয়েতিরাফে অজন' (হীনতা স্বীকার) নামের একটি অসম্ভব রকমের উঁচু দরের দীর্ঘ কবিতায় বলেছেন যে, তিনি গভীর সুরে গভীর কথা বলতে পারেন নি, কিন্তু এর পরেও তিনি এই বলে শেষ করেছেন :

> চিন্তায় পারদর্শী নই, কবিতায় অদ্বিতীয় চারণও হতে পারিনি।
> যদি কিছু হয়ে থাকি তবে ভবিষ্যতের কবির দূত হয়েছি আমি।

এতে তাঁর যে গর্ব ছিল, সেকথাও বারবার প্রকাশ পেয়েছে। একটি দুই পঙ্‌ক্তির কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> কাজ আমার পরিবর্তন আনা,
> নাম আমার যৌবন
> আমার রণধ্বনি
> বিপ্লব আর বিপ্লব আর বিপ্লব।

একটি চার পঙ্‌ক্তির রুবাইয়াতে তিনি লিখেছেন :

> গোলামি থেকে বিদ্রোহ শতগুণ শ্রেয়।

(সাও বার গোলামি সে বগায়োত বেহতর)

জোশ মলিহাবাদীকে বহু সময়ে শুনতে হয়েছে যে, তিনি বড় বেশি ভাবের ঘোরে থাকেন, বড় বেশি রোমান্টিক তিনি। জোশ নিজের পক্ষে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পক্ষে টেনেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, কারণ রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক। জোশ মোটা দাগের কথা বলতে অভ্যস্ত হলেও একথাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, আসল প্রয়োজন হচ্ছে উচ্চদৃষ্টি, উঁচুভাব, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারা, মহৎ ভাব ও আদর্শের জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে লড়া।

ফিরাক গোরখপুরীর সঙ্গে এখানেই তাঁর অন্তরের মিল। ফিরাক ও জোশের কবিতা একইভাবে উঁচু ভাবের স্বরগ্রামে বাঁধা, যদিও জোশকে যদি কামারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে ফিরাক মণিকার। দু'জনেই ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। জোশ ছিলেন মুসলিম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। ফিরাক ছিলেন হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। দু'জনে ছিলেন পরম বন্ধু। পকিস্তান থেকে যখন জোশের মৃত্যুর খবর আসে, তখন ফিরাক হাসপাতালে। ফিরাক এখবর শুনলেন পায়চারি করতে করতে। বললেন, "জোশ, আমিও আসছি।"চলেও গেলেন দু'দিন পরে।

কিন্তু এঁদের দু'জনের কেউ কি চলে যাবার?

৩

বর্তমান নিবন্ধে আমরা জোশকেই বিশেষ করে বুঝতে চেষ্টা করবো। জোশ মলিহাবাদীর একটি কাব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর লেখার একটা সাক্ষাৎ পরিচয় দাখিল করছি। কাজী নজরুল ইসলামকে পাশে রাখলে জোশকে অনেকগুলি বিষয়ে একেবারে এক ধরনেরই মনে হবে। নজরুলের কতকগুলি বিশেষত্ব ধরে সেইভাবে জোশকে সামনে রাখছি।

জোশ ছিলেন নজরুলের মতোই মহাজাগরণের চারণ কবি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতি ঘৃণায় গনগন করছিলেন তিনি। বিশের দশকের শুরুতে চারণ কবির মতোই তিনি লিখেছিলেন, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ফরজন্দোঁকে নাম' (ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বংশধরদের প্রতি)। গণসমাবেশে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। লাখ লাখ লিফলেট ছাপিয়ে এই কবিতা সারা দেশে ছড়ানো হয়েছিল। এর একটি স্ত বক নিম্নরূপ :

> সময় একটা নতুন বিষয় নিয়ে কাহিনী লিখবে।
> এর লাল লেখনের জন্য তোমাদের রক্ত দিতে হবে।
> সময়ের রায়কে টলানো যাবে না।
> মৃত্যুকে পিছিয়ে দেয়া যেতে পারে,
> কিন্তু সময়ের রায় বদলাবে না।

এই সময়ে তিনি লিখেছিলেন 'শিকস্তে জিন্দান' (কারা টুটছে) কবিতা। এর সঙ্গে নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' যেন একবৃন্তে দুটো রক্তকরবী।

ষষ্ঠ জর্জের অভিষেক উপলক্ষে জোশ ব্যঙ্গের সুরে 'হিন্দুস্তানের অগ্রগতির' জন্যে রাজভক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে যে কবিতাটি লেখেন, তার একটি পঙ্ক্তি :

হে সাম্রাজ্যের পিদিমের-শিখা,
আঁধি আসছে, আঁধি, আঁধি।
(আঁধিয়া আনে কো হ্যায় আয়ে
বাদশাহী কা চিরাগ)

তিনি এতে আরো বলেছেন:

আমার রাজভক্তরা, গোলামের গোলামরা
ইতিমধ্যেই কবরে যাবার জন্যে তৈরি। যে স্রোত
তোমাকে ভাসিয়ে নেবার জন্যে আসছে,
তাকে আমরা ঠেকাতে পারব না।

এরপরের চারটি পঙ্ক্তি। সাংঘাতিক পঙ্ক্তি :

আমরা রাজভক্তেরা দুরন্ত গতিতে ধাবমান
নদীর স্রোতকে হটাতে পারব না।
নবযুবাদের আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখতে পারব না।
শীগ্‌গীর সজাগ হন। প্রচণ্ড ঝড় এলো বলে,
কণা কণা আগুনে সমস্ত কিছু বদলে গেলো বলে।

১৯৪৭ সালে যেভাবে স্বাধীনতা এল এবং যাদের হাতে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ প্রকৃতপক্ষে বর্তালো, তাদের প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা জানিয়ে তিনি লিখলেন, 'মাতমে আজাদী' (স্বাধীনতার শোক)। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্যে জাগিয়েছিলেন জনগণের সুপ্ত দেশপ্রেমকে। মাতৃভূমির জন্য প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর অনন্ত ভালবাসা। তাঁর এই ধরনের কবিতার সঙ্গে নজরুলের কবিতার মিল পাওয়া যায়।

মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার' এর সঙ্গে। 'ওয়াতান' বা মাতৃভূমি কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি :

চোখ খুলেই যাকে দেখলাম সে তোর আকাশ
যে শব্দ প্রথম কানে এলো সে তোর ডাক
যে বাতাস দোলনাটাকে দোলালো সে তোর হাওয়া
যে প্রভাত-সমীরণ দোলনায় এসে
চুমো খেলো, সেও তোর
যে কথা আধো আধো স্বরে বললাম সেও
তোর ভাষাতেই।

আমাদের উপমহাদেশ যখন ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেলো, তখন তাঁর লেখা 'সুনী জিন্নত' (পরিত্যক্ত স্বর্গ) কবিতায় মাতৃভূমি এক বিষাদময় রূপ নিয়েছে। এখানে ভালবাসা শেষ হয়ে যায় নি। বরং আরো প্রগাঢ় হয়েছে।

এরপরে বলা যায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য'র কথা।

এই প্রসঙ্গে জোশের 'ইনসানিয়াত কা কোরাস' (মানব সম্পদের সমবেত সঙ্গীত) নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারা যায়, এই দুই সমসাময়িক কবি সারা উপমহাদেশের দুস্তর পথ সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মানবতারই যে শেষ পর্যন্ত জয় হবে সে কথা বলেছিলেন। জোশের এই 'কোরাস' কবিতার একটি স্তবক নিম্নরূপ :

এখনও মুক্তির লক্ষ্যস্থলের নিশানা পাওয়া যায়নি
এখনও দিনের ঠুনকো ফানুসে রাতের পাকা বসতি
এখনও হৃদয় জীবনের হিসেব করে উঠতে পারেনি।
এখনও বিশ্ব রহস্যের ঠিকানা পাওয়া যায়নি
এখনও রহস্যের যে সন্ধান দেবে সে চোখে পড়েনি
দুর্বার বেগে এগিয়ে চলো, দুর্দম বেগে এগিয়ে চলো।

এর পরের দু'টি পঙ্ক্তি হচ্ছে :

তোমারই সন্ধানে বেরিয়েছে বিশ্বের ওপর অধিকার
আকাশের ওপর আধিপত্য, পৃথিবীর ওপর এক্তিয়ার।

জোশ অবশ্য 'মানুষ' সম্বন্ধে তাঁর আদর্শবাদী চিন্তায় অনেক অভিজ্ঞতাকেও স্থান দিয়েছেন। তাঁর 'আদমি' বা 'মানুষ' কবিতাটিতে একই সঙ্গে মানুষের দু'মুখো আচরণের কথা বিস্তারিতভাবেই কিছু খেদের সঙ্গে বলেছেন।

দুটি পঙ্ক্তি :

মানুষ আনন্দ করতেও বাধ্য
আবার চোখের জল ফেলতেও বাধ্য।

এগুলো তো মিষ্টি কথা। কটু কথাও বলেছেন অসততার দিক সম্বন্ধে। ভয়ঙ্কর কটু কথা।

তবু সবার উপরে মানুষ সত্য। মাঝে মাঝে প্রেমিকার জন্য না করে সাধারণভাবে মানুষের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করার ব্যাপারটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, নরনারীর প্রেমের ব্যাপারটাকে ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সমান স্তরে স্থাপন করেছেন তিনি।

তবে মানবসমাজের মুক্তির লড়াই-এর প্রশ্নটা প্রেম ও সৌন্দর্যের গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। এই জন্যেই তিনি 'বর্ষী হুয়ী আঁখে' কবিতাতে লিখেছেন :

এখন কামনা বাসনা নিয়ে হৃদয় স্পন্দিত হবে না।
হৃদয় স্পন্দিত হলে মানুষের জন্যে স্পন্দিত হবে।

মানুষের মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় বাঁধা তাঁর কাছে ছিল সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের দাপট ও কপটতা।

জোশের 'আয়ে শরিকে জিন্দগী' এবং 'দীনে আদমিয়াত' এই ঘোরতর অনাচারটাকে আঙ্গুল দিয়ে বারবার নানাভাবে নানাসাজে দেখিয়েছেন।

'আয়ে শরিকে জিন্দগী' জোশের শ্রেষ্ঠতম কবিতার একটি। এতে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, "আমি সুরাসক্ত বলে তুমি কান্নাকাটি করো। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মধ্বজীরা যেসব আনাচার করে সেগুলো নিয়ে তো কোনো উচ্চবাচ্য করো না।"

'দীনে আদমিয়াত' (মানবধর্ম) কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

এ মুসলমান, ও হিন্দু, এ খৃস্টান, সে ইহুদী
এ এতে বাঁধা পড়ে আছে, ও ওতে কয়েদী।
শেখ আর পণ্ডিতরাও আমাদেরকে কি বোকাই না বানিয়েছে
আমাদের ছোট ছোট সংকীর্ণ গর্তে বসিয়ে দিয়েছে।
কেউ সংস্কৃতির সন্তান, কেউ ধর্মের সন্তান
সমুদ্রের যারা বাসিন্দা তারা বুদবুদের মধ্যে আটকা পড়েছে
হিন্দুস্তান কি করবে, আল্লাও এটা মঞ্জুর করেছেন
চা হিন্দু, দুধ মুসলিম, নারকেল শিখ, কুল জৈনের
নিজের জাতির মানুষের প্রতি এই বিদ্বেষে কি উপকারটা হতে পারে
টুকরো টুকরো হয়ে বেঁচে কি উপকারটা হতে পারে।

একটি চার পঙ্‌ক্তির কবিতাতে একথাটা কবি আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে বলেছেন :

কোনোটা খড়গ্ কোনোটা উলঙ্গ তরবারি
কোনোটা ধীর সমীর তো কোনোটা ঝড়ের হাওয়া,
মানুষ কোথায়? সে কোন চক্রমণ্ডলে গুম হয়েছে?
এখানে তো দেখছি কেউ হিন্দু, কেউ-বা মুসলমান।

ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভক্ত হওয়াতে জোশের বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবু তিনি নতুন আশায় বুক বেঁধেছেন। সাম্যবাদী সমাজ সমস্ত দুঃখ দৈন্য ও বৈষম্যকে দূর করে দেবে, দূর করে দেবে দাসত্ব ও পরাধীনতাকে।

'নিজামে নও' (নবব্যবস্থা) কবিতাটির অনেকটা তরজমা করে দিচ্ছি :

ওরে মানুষ এই কালো রাতগুলোর সঙ্গে খেলে যা
আজ যে তোর পায়ে অন্ধকারের বেড়ি, তাতে কি এসে যায়?
আগামীকাল এই উঁচু আর নীচুর অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচে যাবে।
আজ মানব-জগতের এই যে বৈষম্য, এতে কি এসে যায়?
বিপ্লব হাতের মুঠোয় তেজস্ক্রিয়-ধাতু নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে তাই
দুঃখের মেঘ জগতের কুণ্ডলের ওপর হানা দিচ্ছে, তাতে কি এসে যায়?
আগামী কাল রক্তের ফোঁটাগুলো হীরের মতো দামী হবে
আজ তোর গায়ের রক্ত জলের থেকেও সস্তা, তাতে কি এসে যায়?
আগুন ধেয়ে আসছে লঙ্কার দিকে এগিয়ে এগিয়ে

আজ রাবণের প্রাসাদে সীতা বন্দিনী, তাতে কি এসে যায়?
জানোয়ার, যে জানোয়ার সেও আগামী শুভ চিন্তা করবে।
আজ যে মানুষের শত্রু মানুষ, তাতে কি এসে যায়?
জোশের বিচার বুদ্ধিকে ভবিষ্যতের আত্মা মেনে নেবে,
আজ যে তার নামে না-মুসলমান হওয়ার অপবাদ,
এতে কি এসে যায়?

এতক্ষণ যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেগুলি জোশের বিপ্লবী চিন্তার রঙে কিভাবে রাঙানো সেটা দেখানোই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে মূল কাব্যের যে ঐশ্বর্য শব্দপদচয়নে ও রূপকল্প বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে রূপদক্ষ হিসেবেও যে জোশ কত বড়, তার খানিকটা আভাসও দেয়া গিয়েছে।

এখানে এই রূপের কারিগরের একটি চার পঙ্ক্তির প্রেমের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে রাখছি, এতেও রূপদক্ষতার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

একি আলুলায়িত অন্তহীন মালা, না কুন্তল,
একি প্রভাত সমীরের হিন্দোল, না কুন্তল
ওগো আমার যৌবনের প্রাণস্বরূপা! তোমার রূপালি রং-এর কাঁধে
ওকি রাত্রির পেঁজা পেঁজা অন্ধকার, না কুন্তল?

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ : উদয়াস্তরাগে

১

আমাদের উপমহাদেশে রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম ও কাব্যিক রূপকল্পের মেলবন্ধনের অনুপম শিল্পী ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। 'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা' তথা 'শামে শহরে ইয়ারা' ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এর আগে তাঁর পাঁচটি কবিতার বই : নক্‌শে ফরিয়াদী, দস্তে সবা, জিন্দানামা, দস্তে তহে সং ও সরে ওয়াদী সিনা। এদের প্রত্যেকেরই নামের মধ্যে ছোঁয়ানো আছে লাঞ্ছনা ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মধ্যে আশা আনন্দ যন্ত্রণারা। ভোরের হাতছানি এদের ভরে রেখেছে দুরন্ত আশাবাদে। প্রভাত আর প্রভাতী হাওয়ারা এদের মধ্যে প্রবল। কিন্তু শেষ বইটির নামে শুধু সন্ধ্যা নয়, এর মূল উপস্থাপনেও জীবনসন্ধ্যা ও বিদায়ের সুর প্রবল। প্রবল হচ্ছে শ্রান্তি ক্লান্তি। বক্তব্যের ধারা যেন 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো হে বন্ধুরা, হে দেশবাসী, হে বিশ্ববাসী'। এর প্রধান রং তাই অস্তরাগ। নামটিতে প্রকাশ পেয়েছে অস্তরাগ। এই কবিতার বইটির মধ্যে প্রথমাংশের সন্ধ্যার কবিতা ছাড়াও আর দুটি অংশ রয়েছে যাদের মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কাজ সঞ্চিত করা হয়েছে, যারা পরিপূর্ণ দিনের আলোয় উদ্ভাসিত, যারা পঞ্চাশের দশকে লেখা। কিন্তু শেষের দিকের কবিতাগুলি দিয়ে বই শুরু হওয়ায় অস্তরাগ এদের আবৃত করে। তবে আরো একটি দিক রয়েছে প্রথমাংশেই। সেটি এই যে, এখানেও সন্ধ্যার তারাটির মুখে মৃদু হাসি। কবি করেছেন বসন্ত বন্দনাও। সারাজীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে নতুন প্রান্ত থেকে

হিসাবের খাতা খুলতে চেয়েছেন। এ কারণেই বইটিতে রয়েছে উদয়াস্তরাগ। ফয়েজকে আমরা এখানে পাই উদয়াস্তরাগে।

ফয়েজের শেষ বইটি সম্বন্ধে আমাদের এই আলোচনার শেষে প্রথমাংশের কয়েকটি কবিতার তর্জমা করে সংযোজিত করছি 'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা' কাব্যের উদয়াস্তরাগকে বুঝবার উদ্দেশ্য। এছাড়া আরও কারণ রয়েছে। অস্তরাগে উদয়ের রং লেগেছে বস্তুসত্তার দিক থেকেও। রং লেগেছে কর্মবিরতির সুরে নতুন করে কর্মের আহ্বানের। রং লেগেছে যৌবনেরও।

ফয়েজ তাঁর নিজের বাছাই করা এই শেষ কবিতার বইটির মুখবন্ধে কবি ইকবালের ফার্সি ভাষায় লেখা দুটি পঙ্‌ক্তি গাড়ির হেডলাইটের মতো স্থাপন করেছেন। এই দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

> একথা কোনো মতেই ভেবো না যে সাকীর কাজ সাঙ্গ হয়েছে,
> আজও আঙ্গুরলতার কোষে কোষে জমা আছে হাজার হাজার ফোঁটা
> মদিরা পিয়াসীর অপেক্ষাতে।

বইটিতে আরো ব্যাপার ঘটেছে যার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার হাতে এসে হাত রেখেছে প্রভাত। বইটিতে তিনটি ভূমিকা রয়েছে। একটিতে ফয়েজ তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জীবনকথা শুনিয়েছেন। জানিয়েছেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও গণমুক্তি সংগ্রামে ছাত্রজীবনে কাদের হাত ধরে সামনে এলেন এবং কিভাবেইবা কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এলেন অধ্যাপক জীবনে। কৈশোরে তিনি লালিত হয়েছিলেন তিনটি লড়াই তথা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, খেলাফত আন্দোলন ও ভগৎ সিংদের বিপ্লব আন্দোলনের আবহাওয়ায়। অমৃতসরে অধ্যাপকের কাজ করার সময় অধ্যাপক মাহমুদ-উজ জাফর ও তাঁর স্ত্রী ড. রশিদ জাহানের কাছে তাঁর শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার হাতেখড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যুক্ত করলেন নিজেকে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে। ইত্যাদি। অপর দুটি ভূমিকা লিখেছেন তাঁর দুই বহুকালের বন্ধু ব্যক্তি। যাঁরা তাঁকে ছাত্রাবস্থায় ও জীবনের প্রথম দিকের উঠতি কবি হিসেবে দেখেছিলেন। সুতরাং এই তিনটি ভূমিকাই প্রকৃতপক্ষে ফয়েজের জীবন প্রভাতের রং এনে দিয়েছে বইটিতে। কিছুটা মধ্যাহ্নেরও বর্ণবিভা এসেছে এই সূত্রে।

মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কবিতাগুলি সম্বন্ধে এখানে বলা যায় যে, এরা মধ্যাহ্নের সঙ্গে যোগসূত্র। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে কয়েকটি অনুবাদ। তৃতীয় অংশে রয়েছে কয়েকটি কবিতা ও গান। পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা কয়েকটি কবিতাও রয়েছে যাদের শেষোক্তের মধ্যে ফেলা যায়। বইটির এই পরিচিতিতে এবার আমরা এক এক করে তিনটি অংশের উপর আলো ফেলতে পারি।

২.

বইটির প্রথমাংশের 'হে প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা' নাম দিয়ে লেখা কবিতা এবং সেই সঙ্গে আরও কুড়িটি কবিতা রচিত হয়েছে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে। আমরা এখানে স্মরণ করবো, ফয়েজ প্রয়াত হয়েছেন ১৯৮৪ সালের ২৭শে

নভেম্বর। [শেষের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিদেশে কাজেকর্মে হলেও নির্বাসিত জীবনে।] তবে স্বাভাবিকভাবে 'হে প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা' ও তার সঙ্গী লেখাগুলি হচ্ছে ফয়েজের খাটাখাটনি করে তৈরি করা। এদের মধ্যে আঙ্গিক ও রূপকল্প প্রয়োগেও তিনি নতুনত্বের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। এদের মধ্যে যেমন একটা লেখার ব্যাপারে পরিসমাপ্তির রেশ রয়েছে তেমনি বেশ কিছু অভিনব কাজও রয়েছে। নিজের আসন্ন মৃত্যু অথবা সাজ্জাদ জহীরের মৃত্যু তাঁকে পরিসমাপ্তির দিক সম্বন্ধে চিন্তা করিয়েছে। আবার আমীর খসরুর পাঁচশত বছর পূর্তি উপলক্ষে লেখা খসরু রীতিতে শুরু করা 'মেরি আরজ শুনো' কবিতাতে শতাব্দির পর শতাব্দিকে কয়েকটা মাত্র পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করে দেখিয়েছেন, সবেমাত্র তো খসরুর অন্বিষ্ট রহস্যের উদ্‌ঘাটন ঘটলো।

সুতরাং শুরুতেই যবনিকা টানবার যদিও চেষ্টা করেছেন নিজের কাব্য পরিক্রমায়, তবু শেষ পর্যন্ত অনুপম 'বসন্ত এসেছে' কবিতার মধ্য দিয়ে সরাসরি অথবা ঢাকা থেকে ফিরে ('ঢাকা সে ওয়াপসী পর') কবিতাটিতে 'বলি বলি করে বলা হয় নি'র মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত আগামীর ইশারাকে তিনি ধ্বনিত ও রণিত করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। একেবারে শুরুর চার পঙ্‌ক্তির কবিতাটির কথা, সেটি নিম্নরূপ :

> কামিজের কিছু সুতো বেঁচেছে মোড়লের থাবা থেকে
> শুধেছি তা দিয়ে মদিরার চড়া দাম পানাগারে,
> যদি-বা কোনো মতে ছাড়িয়েছি প্রেয়সীর হাত থেকে হৃদয়কে
> ব্যাপৃত করেছি তাকে দেশ ও বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে।

কিন্তু এই শেষের দিকেও 'আজ আবার কোন বাণীকে খুঁজে ফিরছে কল্পনা'র মতো কবিতা এসেছে, যাকে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কিংবা নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতার সংহত ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাছাড়া সাজ্জাদ জহীরের মৃত্যুর পরে যে শোকনামা তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে পনের বছর আগে হাসান নাসিরের হত্যার পরে কিংবা ফিরোজ মনসুরের মৃত্যুর পরে লেখা কবিতার অনাহত অব্যাহত সংগ্রাম আগামীর জন্যে উদ্যত রয়েছে।

হয়তো মাতৃভূমি ও বিশ্বের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের নির্দিষ্ট বহু ঘটনাকে ভিত্তি করে তিনি যেমন আগেকার পাঁচটি বইতে তার রোজেনবার্গ দম্পতি সম্পর্কিত কবিতার মতো বহু লেখা লিখেছেন, বিস্তারিতভাবে তেমনি কাজ 'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা'র প্রথমাংশে করেন নি। কিন্তু নির্দিষ্টকেও তিনি রেখেছেন। খোঁজ করলে নির্দিষ্টকে পাওয়া যাবে শেষ বইটিতে বেশ কয়েক জায়গায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'ঢাকা থেকে ফিরে' কবিতাটির কথা। তিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে ঢাকায় এসেছিলেন। সেই ঘটনাই রয়েছে এই লেখাটির মূলে। '৭৪ সালে তাজিকিস্তানের দু'শাম্বেতে বসে তিনি 'ঢাকা থেকে ফিরে' লিখেছিলেন। এর প্রধান উদ্দিষ্ট ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বর্তমান প্রবন্ধ লেখককে তিনি সেখানে এই কবিতাটি দিয়ে বলেছিলেন শেখ সাহেবের হাতে দিতে। প্রবন্ধ লেখক জামিল শরাফীর হাত দিয়ে

কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। জামিল শরাফী এর অনুবাদও করেছেন। ফয়েজের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজের কবিতায়' এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখার দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৭৬ সালে লেনিনগ্রাদে বসে রচিত 'লেনিনগ্রাদের কবরখানা'কে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

ঠাণ্ডা হিম পাথরের খণ্ডে খণ্ডে
ফ্যাকাসে হল্‌দে পাথরের খণ্ডে খণ্ডে
গরম রক্তের মতো তরতাজা লাল
ফুলের তোড়া থরে থরে লালে লাল

নাম নেই কারও কোনো গোরের গায়েই
তবে গোরে গোরে ওরা যারা
শুয়ে আছে চিরনিদ্রায়
ওদের ভোলে নি কেউ সে কথাটি রক্ত রাঙা
ফুলের তোড়ায় প্রতি তোড়াতেই লেখা আছে
নামে নামে নিবেদক নিবেদিতাদের।

গোরে গোরে শুয়ে আছে যারা তারা
রক্ষা করেছিল মাতৃভূমি, তারপর
শয্যা নিয়েছিল ভূমিতলে দলে দলে সারে সারে
গায়ে টেনে যার যার রক্তের চাদর।
আর ওরা পুত্রেরা শুয়ে আছে
চিরনিদ্রায় তাই
রাশি রাশি দুঃখের মালা
গলায় জড়িয়ে জেগে
রয়েছেন বসে সেই থেকে
মা জননী।

এই ধরনের বিষয়ের উল্লেখের পাশাপাশি এমন কয়েকটি কবিতার কথা বলা যেতে পারে যেগুলিতে ফয়েজ তাঁর পূর্ববর্তী পাঁচটি বই-এর বেশ কয়েকটি ধারাকে প্রয়োগ করেছেন। উপমহাদেশের সাময়িকভাবে দীর্ণ-বিদীর্ণ মানসকে সামনে রেখে লেখা 'পা থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো' একটি দৃষ্টান্ত। এই কবিতাটির তর্জমা সংযোজনে দ্রষ্টব্য।

বস্তুতপক্ষে ফয়েজের 'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা'র বেশ কিছু কবিতা নক্‌শে ফরিয়াদী থেকে শুরু করে 'সরে ওয়াদী সিনা'র শ'চারেক কবিতাকে তরতাজা ফুলের মতো আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। বিষাদ শুধু সন্ধ্যায় নয়, প্রভাতেও ছিল, পরেও ছিল। কিন্তু সেখানে অদম্য অপরাজেয় মুক্তিসংগ্রাম ফয়েজকে আগামী বিশ্ব ও মাতৃভূমির জনগণের কবি রূপে সঞ্চারিত করে রেখেছে। তাঁর 'উৎসর্গ' নামে কবিতাটির মতো তিনি আগামীতে উৎসর্গিত। 'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা'ও তার স্মারক।

এর বেশি এখানে বইটির প্রথমাংশ সম্বন্ধে বলা সম্ভব নয়। এটি তো পরিচিতি মাত্র। আমরা এবার অন্য দুটি অংশে যাবো।

২

বইটির দ্বিতীয় অংশে যে চারটি অনুবাদ রয়েছে; তাদের তিনটি নাজিম হিকমতের কবিতার ও একটি এক তাজিক কবির কাজের উর্দু তর্জমা। নাজিম হিকমতের কবিতা তিনটির নাম : 'জেলখানার চিঠি', 'ভেরের নামে', 'ওগো মাতৃভূমি'।

এখানে ফয়েজ যে অনুবাদ উপস্থিত করেছেন, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, দুই সমমনা কবি কত ঘরোয়া, কত সহজ ও কত আন্তরিকভাবে একই পথের পথিক। পথটি মুক্তি সংগ্রামের। নাজিম হিকমতের স্ত্রী ছিলেন রুশ মেয়ে। নাম ভেরা। 'ভেরার নামে' কবিতাটি নিম্নরূপ :

সে বললো, এসো
সে বললো, থামো
হাসো, সে বললো
মরে যাও, সে বললো
আমি এলাম
আমি থামলাম
আমি হাসলাম
এবং মরেও গেলাম।

'ওগো মাতৃভূমি'র বিষয়বস্তু নিম্নরূপ। নির্বাসিত কবি বলছেন, তিনি যে তুরস্কে তৈরি মাথার টুপি, পায়ের জুতা এবং কামিজ পরে নির্বাসনে এসেছিলেন, তারা ছিল তুরস্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তারা ছিঁড়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে, দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়েছে দীর্ঘ নির্বাসনে। তবে মাতৃভূমি থেকে বিদায়ের সময় মাথার চুলে তিনি যে ঝলক্ এনেছিলেন, তা এখনও তার চুলে উড়ছে বর্ণিত হয়ে। এখানে শুধু দৃষ্টান্ত দেয়া গেল।

৩

'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় অংশের ব্যাপারটা হচ্ছে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান।

বিশেষ করে দুটি কবিতা রয়েছে এখানে যাদের কথা আমরা যে শুনি নি শুধু তাই নয়, এই কবিতা দুটির বিষয়বস্তু আমাদের ফয়েজ সম্পর্কিত ধারণার দিক দিয়ে অপ্রত্যাশিত। প্রথমটি ন্যায় ও সত্যের জন্য মৃত্যুপণ মহান সংগ্রামে উৎসর্গিত মহাবীর ইমাম হোসেনের জীবনান্তের মহাকাব্যিক ধারার চিত্রায়ন। এমন গম্ভীর ও উদাত্ত ভাষা ফয়েজ ইতিপূর্বে খুব কমই ব্যবহার করেছেন তাঁর অন্যান্য মর্সিয়াতে। এর আবেদন নজরুলের ভাষায় বলা যায়, "ক্রন্দন নয় বন্ধন নয় শিকল ঝনঝনা, এ যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা।"

দ্বিতীয় কবিতাটি রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বন্দীদের মামলা পরিচালনা করেছিলেন অভিযুক্তদের কৌসুলি হিসাবে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অভিযুক্তরা তাঁকে একটি অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন। এই অভিনন্দন ছিল কবিতার আকারে। রচনা করেছিলেন অভিযুক্তদেরই একজন হিসাবে ফয়েজ। সেই কবিতাটির কথা কেউ শুনেছি বলে মনে হয় না। এই কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের জনগণের প্রথমদিকের গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের ঐতিহাসিক দলিল। বিষয়বস্তুটি সেভাবেই বিন্যস্ত। ফয়েজ এখানে সমস্ত বন্দীর পক্ষ হয়ে বলেছেন, সুতরাং এতে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতি ও রূপকল্পকে প্রাধান্য না দিয়ে একটি সংঘকণ্ঠকে ধ্বনিত করেছেন।

'প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা' বইটির তৃতীয় অংশে ফয়েজের লেখা কয়েকটি গানও সংকলিত হয়েছে। এরা ফিলমের জন্য লেখা গান। জাগরণী গান। একটি গান ঢাকায় নির্মিত কার্দারের 'জাগো হুয়া সোয়েরা'তে গাওয়া হয়েছিল। ফয়েজ তখন কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ফিলম্‌টির মূল কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস। গানটি হচ্ছে একটি গীত। বইটিতে বেশ কয়েকটি গজল রয়েছে। এরা অবশ্য প্রথমাংশেই বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

পাঞ্জাবি ভাষায় যে কয়েকটি কবিতা রয়েছে, উর্দু অক্ষরে হলেও এবং উর্দুর সঙ্গে সাযুজ্য থাকলেও এরা অপরিচিত আঞ্চলিকতায় এবং ভঙ্গীতে ও রূপকল্পে সাধা। সুতরাং এদের পরিচয় দিতে পারছি না এখানে।

পরিশিষ্ট

হে প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা

হে সন্ধ্যা করুণাময়ী হও
হে প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা করো করুণা।
পীড়নের নরক দ্বিপ্রহরে
স্বৈরাচার ও নিপীড়ন জ্বালা
পীড়ন জ্বালা যন্ত্রণার দ্বিপ্রহরে
নরকের কোরা দাগ কেটে কেটে বসিয়েছে
সর্বশরীরে ক্ষত বাঁকা বাঁকা
ধনুকের মতো বাঁকা বাঁকা
সর্বাঙ্গে জখম হাঁ করা মুখছেঁড়া দাগ।
হে সন্ধ্যা, দেখো খুঁজে পেতে
দেখো কোনো শিকড় বাকড় নিশ্চয়
আঁচলে তোমার আছে তাই খুঁজে পেতে নিয়ে
ছেঁড়া কোনো চাদরের ফালিতে জড়িয়ে
শরীরে আমার বেঁধে দাও দাগে দাগে
যন্ত্রণা যেখানে একেবারে দুঃসহ।
হে সন্ধ্যা করুণাময়ী হও

হে প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা করো করুণা।
হিংসা ও দ্বেষের দ্বিপ্রহরে নরক মরুভূমি
নিষ্ঠুর জ্বলন্ত চক্ষু হিংসার কিরীচে কিরীচে
কণ্টকিত জর্জরিত শোকে দুঃখে
ভয়াবহ স্তব্ধ রাজপথ
চিৎকারে বিদীর্ণ ভয়াবহ বধ্যভূমি
পেরিয়ে আসছি পায়দল
পাগুলো গিয়েছে ঝলসে,
ফোস্কাগুলো গলে গেছে
জবজবে দুটো পায়ে, রাস্তা চলা দায়।
পায়ের তলায় তাই হে সন্ধ্যা তোমার মেঘমালার
মখমল পেতে দাও দূর করো
গভীর নিদারুণ যন্ত্রণা হে সন্ধ্যা করুণা করো।
ওগো চাঁদ শিল্পী রজনীর
ওগো বন্ধু যত ভগ্ন হৃদয়ের
এসো এসো তুমিও আমার কণ্ঠে কণ্ঠে মেলাও, বলো
হে সন্ধ্যা করুণা করো।
হে সন্ধ্যা করুণা করো।

পা থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো

কী আর করার ছিল আমার
আর কোন পথ ছিল চলার
সারাটা পথেই তো কাঁটা ছড়ানো হয়েছে আগাগোড়া,
কত যে শতাব্দী ধরে চলে আসা
বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের পথগুলি
গিয়েছে ছিঁড়েখুঁড়ে সবই
কাঁটায় ভরে গেছে আগাগোড়া
এগিয়েছি যেদিকেই তাই
রক্তাক্ত হয়েছে পা দুটো।

যারা দেখেছে এই রক্ত তারা
বলেছে, এ আবার কী রকম সাজ
এইভাবে মেহেদীর রং-এ
পা দুটোকে রাঙিয়েছ কেন?
বলেছে অনুযোগ দিয়ে তারা কেন অনুরাগের
আকালে এহেন চর্চা অনুরাগ নিয়ে?
বলেছে তারা ধুয়ে ফেলো পা থেকে রক্ত

বুক বাঁধো, জেনো এইসব পথ যদি
রুদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তবু
এদেরই জঠর থেকে শত শত পথ আরও
একদিন বেরিয়ে আসবেই।
তারই অপেক্ষাতে ততদিন
ভাঙ্গুক তোমার বক্ষ জুড়ে
শত শত ছুরি বিঁধে বিঁধে
বিঁধুক ভাঙ্গুক।

হে আমার হৃদয়, হে যাত্রী

হে আমার হৃদয়, হে যাত্রী
আবার হয়েছে বড়কর্তাদের হুকুম
তুমি আমি নির্বাসিত মাতৃভূমি থেকে
আবার ফিরতে হবে আমাদের
পথে পথে ডেকে ডেকে যেতে হবে
নগর ছাড়িয়ে আরও নগরের অভিমুখে
কোথাও যদি পাওয়া যায় খোঁজ
কোনো বন্ধুর দূতের
তারই সন্ধানে ধরে ধরে
জনে জনে অপরিচিতদের
জিজ্ঞাসা করতে হবে
আপন ঘরের ঠিকানাটা।
অজানা পথের মোড় ছেড়ে ছেড়ে
যেতে হবে দিবা আর রাত্রিকে পেরিয়ে
কোথাও দুটো কথা যদি কেউ বলে
কখনো অন্য কেউ।
কী যে অবস্থাটা হে হৃদয় হে যাত্রী
পুরোপুরি বুঝতে পারি নে দুঃখের
এই রাত এত কঠিন।
যদি কোনো এস্‌পার ওস্‌পার
হয়ে যেতো এরি মধ্যে
তবে সেটা সৌভাগ্যই হতো
আহা একটা হিসাব নিকাশ যদি
হয়ে যেতো তাহলে কি
মৃত্যু মন্দ হতো?

সাজ্জাদ জহীরের মৃত্যুতে

আর বেড়াবো না গালাগলি করে কথা কয়ে ফুলবাগে
আর চলবো না হাত ধরাধরি করে বধ্যভূমিতেও

আর শোনাবো না ইতিবৃত্ত প্রণয়ের একে অপরকে ডেকে
আর মুছবো না মর্মব্যথা একে অপরের হৃদয়ের রক্ত নিংড়ে

আর করবো না কবিতার শব্দপদ নিয়ে মাজাঘষা মিলেমিশে
আর ঝরাবো না অশ্রু মাতৃভূমির দুঃখে মিলেমিশে

আর শুনবো না শিকলের ঝংকার সুরকরা এক সাথে
আর করবো না রাতভোর পেয়ালা ছলকে ছলকে এক সাথে

কোমল কল্পনা কত এসেছে ভাবনায় সে কথা মনে করে
হরিণচোখ কত বিভোর করেছিল আমাদের সে কথা মনে এনে

আসর পিয়াসী আসরে যে মরমিয়া খুশি ছিল তার নামে
কারাগৃহে বন্ধনের দিন আর যন্ত্রণাকে মনে ফের নিয়ে এসে

ভোরের হাওয়া আসে আজ কত যে কথা বয়ে সাথে সাথে
ঊষার উদয়ের খবরে মাখা তার মৃদু হাসিটি নিয়ে ঠোঁটে

জ্যোতির উদয় হয় ঝলমল আকাশের যেই ভিতে
পান্থশালার রাজা বসে সিংহাসনে তার যেখানেতে

সেখানে এলো দেখো ভোরের ক্ষণ সাকী সামনে তাকে রেখে
সাঙ্গ হোক পালা পেয়ালা বিলোবার ভরাবার ডেকে ডেকে

সরিয়ে নাও সাকী সুরার পাত্রগুলো নাও চাদরও গুটিয়ে
হে বন্ধুরা আসরের সঙ্গে সঙ্গে বাতিগুলো ফেলো নিভিয়ে

হে বন্ধুরা তুলে নাও হাতে হাতে পেয়ালাগুলি শেষ বিদায়ের
পান শেষে ভাঙ্গো পেয়ালাগুলি সব ছুঁড়ে ফেলে।

(১৯৭৩)

মিনতি শুন মোর
(আমির খসরুকে নিবেদিত)

'মিনতি শুন মোর হে পীর
যে আমার হাত ধরেছিলে'

'কিন্তু কারে পীর বলি মাগো

কে সে মোর মরমিয়া'

'রাখো রাখো নৌকা এই ভিতে
নদীর কিনারে'

'হায় আজো এলো না কেন কেউ
মন্দিরে আমার'

এই মতো মিনতি জানিয়ে কতো
ব্যাকুল প্রশ্ন করে করে কখনো-বা
কতো নদীর ঘাটে নৌকা রেখে
মনোসাধ জানিয়ে ডেকে ডেকে কখনো-বা
দূরের পথের দিকে শুধু চেয়ে থেকে
কতো শত বর্ষ চলে গেলো তোমার
অবশেষে মর্মোদ্ধার হলো রহস্যের

মিনতি করেছিলে তুমি যাকে লক্ষ্য করে
যে তোমার হাত ধরেছিল
নদীর যে ঘাটে ভিড়েছিল নৌকা তোমার
যার কাছে চেয়েছিলে দুঃখের উপশম
যে তোমার মন্দিরে এলো না কোনোদিন
সে যে তুমি ছিলে
সে যে তুমি ছিলে

(১৯৭৫)

আমার বেদনা ভাষা পায় যখন

আমার বেদনা থাকে সাড়াশব্দহারা গান হয়ে
আমার সত্তা থাকে চিহ্নপরিচয়হারা ধূলিকণা হয়ে

কিন্তু এই বেদনাই যখন নিজেকে জানাবার ভাষা পেয়ে যায়
তখনই আমার সত্তা নামচিহ্ন পরিচয় পেয়ে যায়

আমার সত্তা যেইমাত্র নিজ নামচিহ্ন ধরে
নিমিষে এ বিশ্বের রহস্য সে উদ্ধার করে

এ বিশ্বের রহস্যকে যে মুহূর্তে জেনে যাই আমি
আমার মৌনীকণ্ঠ সে মুহূর্তে নির্ঘোষে ভরে যায়

আমাতে অর্পিত হয় ভার সারা জগতের মঙ্গলের
মুঠোয় বৈভব পেয়ে যাই স্বর্গ ও মর্ত্যের।

আজ আবার একটি বাণীকে খুঁজে ফিরছে কল্পনা

আজ আবার একটি বাণীকে খুঁজে ফিরছে কল্পনা
মধুভরা কোন বাণীকে, বিষে ভরা কোন বাণীকে
বুকে বাসা বেঁধে থাকা কোন বাণীকে
প্রচণ্ড নির্ঘোষে উচ্চারিত কোন বাণীকে
প্রেমের আবেশ মাখা কোন বাণীকে যাতে চোখে আসে উদ্বেলতা
চোখে চোখে দেখা হায় চুম্বনের ওষ্ঠের মতো
উদ্দীপ্ত বাণী সে যেন সোনালী জলের ঢেউ রাশি রাশি
প্রিয়সঙ্গ আনন্দের মতো অবারিত।
অথবা কল্পনা সে যেন ঘৃণাভরা বাণীতে খুঁজছে বিধ্বংসী
অভিশাপ সম কোন তরবারি যার
আঘাতে সমূলে ধ্বংস করা যেতে পারে
জালিমের অত্যাচারী রাজত্বকে চিরতরে।
এই বাণী যেন কোন ঘনঘোর শ্মশানের রাত তাকে
ঠোঁটের উপর যদি রাখি তবে
বিষে নীল হয়ে যাবে ঠোঁট।
সমস্ত সুর আজ স্তব্ধ
সমস্ত তার বাঁধা রাগ রাগিণীতে
বেদনার ভারে ছিঁড়ে গেছে।
তবু ছেঁড়া কামিজের মতো মজনুর এই ছেঁড়া তারগুলো
আবার ফিরছে খুঁজে আজ আনন্দের লহরীকে
শোন তাই হওয়ার ঝটকায়
জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে লোকালয়ে লোকালয়ে।
কোনো গান না শুনে কি
বাজনার কোনো সাড়া না পেয়ে কি
দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়?
দুঃখের নিনাদ তাই আজ সত্য বাস্তব
শহীদের প্রাণডালি ঘিরে কলরোল সত্য বাস্তব
প্রলয়ের শিঙ্গাধ্বনি শেষ বিচারের ডাক সত্য বাস্তব
একটা প্রলয় হয়ে যাক তবে।

(জুলাই, ১৯৭৭)

বসন্ত এসেছে

বসন্ত এসেছে তাই যেন মৃত্যুলোক ভেঙ্গে
বেরিয়ে এসেছে একবার আবার

সেই সব স্বপ্ন খেয়ানেরা
সেই সব যৌবনের দিনগুলি যারা
মুছে গিয়েছিল কতবার
তোমার অধর থেকে তারপর প্রতিবারই
পেয়েছিল ফিরে
নতুন করে প্রাণ,
সেই গোলাপেরা ফুলদল সবই
হয়েছে কুসুমিত নিকষিত যারা তোমার
কতশত স্মৃতির কস্তুরিতে
সুরভিত যারা রক্তধারা তোমার
উপাসকদের হৃদয়ের,
উপচে পড়ছে এই সঙ্গে যন্ত্রণাও
অজস্র
বন্ধুদের মণ্ডলীর বিষাদেরা
মদিরা ও মধুর আসরের পিপাসাও থরে থরে
মর্মভেদী উদ্বেগের ধূলিজাল
তোমার আমার
সমস্ত জিজ্ঞাসা আর সমস্ত উত্তর,
বসন্ত এসেছে তাই খুলে গেছে
সমস্ত হিসাবেরই খাতা
নতুন প্রান্ত থেকে হাট করে।

(১৯৭৫)

পারভেজ শাহেদী প্রসঙ্গ

১

স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্যে আমাদের উপমহাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের নিরন্তর লোক-অভ্যুদয় উর্দু কাব্যে শৈলী ও বিষয়বস্তুর যে রূপান্তর ঘটিয়েছে, তার পুরোধা কর্মীশিল্পীদের একজন পারভেজ শাহেদী। জন্ম ১৯১০, মৃত্যু ১৯৬৮ সাল।

তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ। প্রথমটি 'রাকসে হায়াত' (জীবননৃত্য) বেরিয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। দ্বিতীয়টি 'তসলিসে হায়াত (জীবন-ত্রয়ী) প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর কিছুদিন পর। এই দ্বিতীয় সংকলনের ভূমিকা কবির নিজের করা। ভূমিকাতে কবির স্বাক্ষর রয়েছে ১৯৬৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখের। তাঁর মৃত্যু ৫ই মে। এই বই প্রকাশের ঘটনা অনেকটা সুকান্তের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের মতো। পারভেজ শাহেদী সম্ভবত সুকান্তের মতো তাঁর বইটিকে অবাঁধানো অবস্থায় দেখে গিয়েছেন।

চল্লিশের দশকে যখন পারভেজ শাহেদীর কবিতার কোনো বই বেরোয়নি, তখনই তিনি এসেছেন আধুনিক উর্দু কাব্যের সামনের সারিতে। উর্দু কাব্যের বাইরেও তিনি

পরিচিত ও আদৃত হয়েছেন। তবে প্রথম বই 'জীবননৃত্য' যেমন-তেমন করে প্রকাশিত হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা ছিল। সেই জন্যে কবি খুব যত্ন করে প্রধানত ১৯৫৫ সালের পরে লেখা নজম্ ও গজল (কবিতা ও গান) এবং সেই সঙ্গে আগেকার বই থেকে কিছু নজম্ ও গজল নিয়ে 'তস্‌লিসে হায়াত' সংকলনটি তৈরি করেন। প্রাণমন ঢেলে ভূমিকা লিখেছিলেন তাঁর কাব্যদৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে। 'তসলিসে হায়াত'কে তাই পারভেজ শাহেদীর জীবন ও কাব্যের প্রতিভূ বলা যেতে পারে। 'তস্‌লিসে হায়াত' গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে এই নামের একটি দীর্ঘ ধ্রুপদী কবিতার নামে। এই কবিতাটি তাঁর শিশু কন্যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা পারভেজ শাহেদীর জীবনদর্শন। কন্যা এবং তার বাবা ও মাকে যে জীবনত্রয়ী, তার বিকাশকে কবি দেখেছেন বিশ্বভুবনের ত্রয়িত্বের অবিশ্রান্ত প্রসার ও বিকাশে। পদ্ধতির দিক থেকে এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দেব'র মিল রয়েছে। তবে মর্ম ভিন্ন।

'তস্‌লিসে হায়াত' থেকে উপাদান নিয়ে কমরেড কবি পারভেজ শাহেদীকে স্মরণ করছি।

২

'পারভেজ শাহেদী' হচ্ছে কবিতা লেখার জন্যে নিজের দেয়া নাম। পারিবারিক নাম সৈয়দ একরাম হোসেন। পাটনা নগরীতে জন্ম। পরিবারটি ছিল একদিকে অভিজাত, আবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন। পারভেজ শাহেদী ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এইজন্য আদর পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। বাড়িতেই লেখাপড়া শুরু করেন। আরবি এবং ফার্সিতে পাকা হয়ে ওঠেন। কবিতা লিখতে এবং কবি সমাজে কবিতা পড়তে ছেলেবেলা থেকেই উৎসাহ ও শিক্ষা পেয়েছিলেন ধ্রুপদী ও গজল কাব্যের ওস্তাদের কাছে। এইভাবেই লিখতেন কবিতা। ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর পাটনার কলেজে ভর্তি হয়ে আই.এ, বি.এ এবং সর্বশেষে ফার্সি ও উর্দুতে এম.এ পাশ করেন। আইনের পাঠও শেষ করেছিলেন। বি.এ. পড়বার সময় দেশে গণঅভ্যুত্থান এবং বিশ্বের নানা জায়গায় যে নতুন ভাবনা চিন্তার হাওয়া এসেছিল, তাতে সাড়া দিয়েছিলেন পারভেজ শাহেদী এবং এই জন্যে কবিতায় নতুন রীতির এবং বিষয়বস্তুর খোঁজ করছিলেন। লিখতেও শুরু করেছিলেন নতুন ভাবে। ১৯৩৫ সালে একটা মানসিক আঘাত পেয়ে তিনি পাটনা ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এখানে নতুন জীবন যাপন করার চেষ্টা করলেন অতীতের সবকিছু মুছে ফেলে দেবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে। একটা মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা নিয়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা। তারপর থেকেই শিক্ষকতার লাইনে। হেড মাস্টার হলেন। ১৯৩৮ সালে বি.টি পাশ করলেন। ১৯৪১ সালে মেদিনীপুর কলেজের উর্দুর অধ্যাপক। সেখানেই রইলেন ৪৬ সাল পর্যন্ত। এই মেদিনীপুরেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয়ে বক্সা বন্দী শিবিরে। দেড় বছর জেলে কাটাবার পর আবার হেড মাস্টারের চাকরি। প্রথম দুই বছর খুবই সঙ্গীন আর্থিক অবস্থা। এরপর

একটা বড় রকমের হাইস্কুলে হেড মাস্টারির নিশ্চিত জীবিকা। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ বিভাগের অধ্যাপক। এখানেই মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করেছেন।

৫৮ বছর বয়সে পারভেজ শাহেদী তাঁর 'জীবন-ত্রয়ী' (তস্‌লিসে হায়াত) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এই পরিচয়টি দাখিল করেছেন তাঁকে বুঝবার সুবিধা করে দেবার জন্যে। এটা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বের দিক। এই সঙ্গেই তাঁর বিশেষ কবিচিত্তের একটা কৈফিয়ত দাখিল করেছেন। এই কৈফিয়তটি নিম্নরূপ :

"আমি কে? আমি কি? আমি নিজের করে নিজেকে চিনতে পেরেছি যে আমি আমার বন্ধু ও বৈরিদের কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করে বোঝাবো?

আমি এখনও এমন একটা বিশ্বকে যাচাই করে নিজে দেখে উঠতে পারি নি যে, এই যাচাই-এ আমি অন্যকে নেমন্তন্ন করবো এবং তাতে যোগ দিতে অন্যকে পরামর্শ দেব। তবে নিজেকে চিনবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও সফল হইনি, হতাশও হই নি। আমি সেই সব ভাগ্যবানদের একজন নই, যারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষার জগতে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে তার অন্ধকার পাতাল কক্ষগুলোও উঁকি দিয়ে দেখে অনায়াসে স্বস্থানে ফিরে এসে সেগুলোর কথা লিখতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে আমার নিজের এমন ক্ষমতা নেই যে, নিজের অনুভবে আশ্রিত আমার অস্তি ত্বকেই আমার অস্তিত্ব বলে ধরে নেব। আমি অবশ্য আমার অস্তিত্বকে প্রমাণিত করার ইচ্ছা রাখি। বলা বাহুল্য সেটা শুধু ইন্দ্রিয়বীক্ষণ দ্বারা ঘটবার নয়। আমার বাইরের যে জগৎ, তার সাহায্যেরও দরকার রয়েছে। আমি মনে করি, দুনিয়াটাকে বুঝতে না পারলে মনের রহস্যের জগৎকে নিয়ে ধ্যানধারণা সফল হতে পারে না। কম-সে-কম এটাই আমার চিন্তা।

নিজেকে চিনবার প্রচেষ্টার এই পদ্ধতি আমাকে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। এ কারণে, সমসাময়িককালে, যখন আমার বন্ধু এবং বৈরীদের কোনো কোনো মহলে 'পরহিত ব্রত' সাহিত্যের ক্ষেত্রে হানিকর বলে চিহ্নিত হচ্ছে, তখন আমি এই হিতৈষণার প্রাণ-দায়ী প্রেরণারই প্রবক্তা। চিন্তার স্বাধীনতার নামে যেসব দাবি-দাওয়া করা হয়, আমার দিক থেকে আমিও সেই স্বাধীনতা চাই।

আমার জীবন হোক কিংবা কাব্য হোক, আমি দুটোরই সাহায্যে নিজেকে চিনবার চেষ্টা করে এসেছি। যা চেয়েছি তা পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও পরাজয় স্বীকারে আমি রাজি হই নি। আমি শুধু জীবনের অপরিচিত ও অচেনা কোনা-খন্দকগুলোর ব্যাখ্যার অধিকারী হতে চাই নি। বারংবার দেখা দুনিয়ার কাছ থেকেও নতুনভাবে ব্যাখ্যা পাবার সন্ধানে রয়েছি। যদি শুধু নিজের হৃদয়ের আর্শিতেই নিজেকে না দেখে অন্যের চোখে উঁকি দিয়ে নিজের চেহারাটাকে দেখতে পারি, তবে তার চাইতে আর ভাল কি হতে পারে?"

এরপরে পারভেজ শাহেদী তাঁর কাব্যকে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করেছেন 'রিক্তের সম্পদ' বলে। তিনি বইটিকে উৎসর্গ

করেছেন "সেই আওয়াম বা সাধারণ জনগণের নামে–যাদের 'ঘাম' হিসেবে চিহ্নিত বিত্তবান লোকেরা তাদের দরবারে ঢুকতেই দেয় না।"

কিন্তু পারভেজ শাহেদী কি তাঁর নগ্নতা ও আতিশয্য-বিরহিত কোমলতা নিয়ে শরিক হতে পেরেছেন এই বিপ্লবের শতাব্দীর জনগণের বিশালতা ও গভীরতার কবি হিসেবে?

'তস্‌লিসে হায়াত' কাব্যের লেখাগুলি এবং এই লেখাগুলির ক্রমপ্রসারমান বৈপ্লবিকতা হচ্ছে এর উত্তর। এই কাব্য আজ এবং আগামীকালের কাব্য।

৩

'তস্‌লিসে হায়াত' বা জীবনত্রয়ী বইখানিতে তিনটি কালক্রমিক বিভাগ রয়েছে :

১. ১৯৫০ সালের আগে, ২. ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত, ৩. ১৯৫৫ সালের পরে। প্রত্যেকটি বিভাগের দুটি অংশ। প্রথম গজল বা গান, তারপরে কবিতা বা নজম্‌।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গানেরই হোক অথবা কবিতারই হোক, একটা সংযোগ সূত্র লতিয়ে উঠেছে ফুল ফুটিয়ে। সেটা হচ্ছে প্রিয়ার বিরহের দুঃখ থেকে বিশ্বের বিরহের উত্তরিত চেতনা। কৃষণ চন্দর উর্দু 'দোষ' গল্পেও একে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সূত্রটা হচ্ছে, 'গমে জানান সে গমে জাহান'। এ কথাটাকেই পারভেজ শাহেদী কাব্যে প্রয়োগ করেছেন, বোধকরি প্রায় একশবার। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম সাম্যবাদী সমাজ গড়ার সংগ্রামে উত্তরিত হয়েছে। এই উত্তরণে পারভেজ শাহেদীও স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী সমাজকে আলাদা আলাদা পর্ব হিসেবে দেখেন নি, যেমন প্রিয়তমার প্রেমকে এবং গণ-মানুষের জন্যে আত্মোৎসর্গের ভাবকে তিনি আলাদা করেন নি। প্রকৃতিকে মানুষ থেকে আলাদা করেন নি। বিপ্লব এনেছে এদের দুইয়েরই বিন্যাসে গুণগতভাবে নবনব উত্তরণ।

এখানে সাগরের দিকে ধেয়ে চলা একটা নদীপ্রবাহের মতো গতিময়তা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। পারভেজ শাহেদী এই গতির স্রষ্টা ও রচয়িতা এবং এর নির্দিষ্টতার কারিগর হিসেবে সামনে চেয়েছেন মানুষকে। তাঁর কাছে আদম এবং ঈভ যে স্বর্গচ্যুত হয়েছিল সেটা ভালই হয়েছিল। মর্ত্যে শুরু হয়েছিল গম আর যব নিয়ে আদম ও ঈভের এবং তাদের সন্তানদের সংসার। এই সংসারই মানবসমাজ। বহু বিপর্যয় কাটিয়ে সাম্যবাদী সমাজের দিকে দৃঢ়পদে মানুষ বিচক্ষণতা ও কল্পনা এবং সংহতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দুর্দমনীয় গতিতে এ ব্যাপারটা ঘটছে। এটাই হচ্ছে পারভেজ শাহেদীর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'জীবননৃত্য' এবং 'জীবনত্রয়ী'র সঞ্চালক প্রেরণা। মানুষের সর্বাত্মক মুক্তির প্রেরণা।

এখানেই পারভেজ শাহেদী কমিউনিস্ট জীবনদর্শন বা মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী গতিধারার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনকে গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন।

কবিজীবনের শুরু থেকেই মানবতার অবিশ্রান্ত যাত্রা ও তার গণ্ডী ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলার এবং অচলায়তনের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত বিদ্রোহের ভাবধারা নিয়ে কাজ করার দরুন পরবর্তীকালে আপন করে নেয়া মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী গতিধারার দর্শনকে কাব্যে প্রয়োগ করেছেন তিনি একান্ত স্বচ্ছন্দে।

উর্দু ধ্রুপদী কাব্যের ইউসুফ জুলেখা এবং শিঁরী ফরহাদ পারভেজ শাহেদীর কাছে অতীতের প্রতীক না হয়ে এই জন্যেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতীক হয়েছে। এরা মূর্তিমন্ত বিদ্রোহ। পারভেজ শাহেদী তাঁর কবিতা, গজল-গান এবং গজল দর্শনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন মুক্তি ও সাম্যের লড়াইকে। তাঁর কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তাঁর এই নতুন রূপসৃষ্টির পরিচায়ক :

আমি আমার হৃদয়ের অস্থিরতাকে
ভরে দিয়েছি যন্ত্রশিল্পের বুকের মধ্যে।
আমি লোহা আর ইস্পাতকে
গজলগায়ক করেছি।

অথবা অন্য দুটি পঙ্‌ক্তি, যেখানে তিনি বলেছেন, নির্বিশেষকে নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তঁদের বিপরীত উপাদান নিয়ে তিনি কাজ করতে চান :

গম আর যবের পৃথিবীতে
আমি ফুল বুনবার কাজ নিয়েছি।

নিবন্ধের শেষে পারভেজ শাহেদীর একটি গজলের যে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তর্জমা করে দাখিল করেছি, তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে, 'তস্‌লিসে হায়াত' এবং 'রাক্‌সে হায়াত' এর কবির বিদ্রোহটা কি ধরনের।

'৫০ থেকে ৫৫ সালের মধ্যে লেখা একটি গজলের দুটি পঙ্‌ক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। "কালের বিপ্লবের ঝুমুরের শব্দে, যারা ভয় পায় তাদের কি করে বোঝাবো ক্রমবিকাশের নৃত্যের অর্থ কি?"

কোনো কোনো সময়ে অবশ্য মনে হয়, বসন্ত ঋতু, বুনো গোলাপ, সাদা গোলাপ, রাঙা ফুলের বড় বেশি ছড়াছড়ি। শেষের পর্যায়ের একটি কবিতার নাম 'ওরে কলম, ফুল ফোটা'। ফুল কিন্তু তার বাস্তবতাবাদের মুখোমুখি হবার সহায়ক হয়েছে। ফুল এবং বসন্ত ঋতু তাঁর কাছে আশাবাদের প্রতীক। কিন্তু এখানেও তিনি স্বপ্নচারী নন।

'তস্‌লিসে হায়াত' নামের মূল কবিতাটিতে তিনি শিশুকন্যাকে সম্বোধন করে বলেছেন,

ফুলের বাগান যখন আগুনে আর ধোঁয়ায় ঢেকে যায়
তখন ফুলের মুখ থেকেও বারুদের গন্ধ আসে।

৪

'তস্‌লিসে হায়াত' কাব্যগ্রন্থের তিনটি পর্বেই রয়েছে মূর্ত জীবন, সংগ্রাম, জয়, পরাজয়, নবনব উত্থানের বাস্তবতা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫০ সালের আগের তিনটি কবিতা–'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,' 'হিমালয় কন্যা' (গঙ্গা) এবং 'ষড়যন্ত্র' (কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একদিন)। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বাধীনতার জন্যে আত্মোৎসর্গ ও যুক্তিনিষ্ঠার প্রতীক। 'হিমালয় কন্যা' কবিতায় গঙ্গা নদী পরাধীনতার বদলে জর্জরিত শ্রীহীনা। তাই ডাক রয়েছে এই কবিতায় বিদ্রোহের। 'ষড়যন্ত্র' কবিতাতে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের যোগসাজশের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জানিয়েছেন কবি। এই পর্যায়ের আরেকটি কবিতা আছে 'জিয়াফত' বা ভোজসভা। এ কবিতায় রয়েছে গণবিমুখ আত্মবিক্রয়কারী লেখক ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ। 'আগামীর বীণা' কবিতাটির তর্জমা পরিশিষ্ট অংশে যুক্ত হয়েছে। এই ভাবেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে মূর্ত ও বাস্তব জীবন ও লড়াই-এর কথা বলেছেন কবি। দ্বিতীয় পর্বে 'দাওয়াত' (আমন্ত্রণ) কবিতাটিতে রয়েছে পাকিস্তানের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা এবং জনগণের প্রতি মমতা। এই পর্বেই রয়েছে 'তজ্জাদ' (সংঘাত)। এতে রয়েছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পদে পদে মোকাবিলার কথা। তৃতীয় পর্বের দুটি কবিতা 'আমি ও আমরা' এবং 'বন্দী গান'। এই দুটি কবিতার তর্জমা করে পেশ করেছি পরিশিষ্ট অংশে। এই দুটি কবিতা পড়লে সহজেই বুঝতে পারা যাবে পারভেজ শাহেদী মূর্ত ও বাস্তবের কত বড় একজন প্রবক্তা। এই তৃতীয় পর্বেই রয়েছে পারভেজ শাহেদীর বিপ্লবী কাব্যের প্রধান উপাদান। ধর্মীয় গোঁড়ামির এবং বিভেদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও তীব্রতম ঘৃণা। এ প্রসঙ্গে 'ব্যাঙ্ক' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

> এই সব আরাধনার আলয়গুলো
> এরা সবই ব্যাঙ্ক। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর
> দোহাই দিয়ে বলছি।
> বাঁকে বাঁকে এদের রাষ্ট্রনীতির খবরদারি।
> এখানে তোমাকে রোজ চেকের মতো ভাঙ্গানো হয়
> এখা তোমাকেও রোজ তেমনি করে
> ভাঙ্গানো হয় চেকের মতো।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার পারভেজ শাহেদীর সীমাহীন ক্ষোভ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই জ্বালাময়। পারভেজ শাহেদী মূলত সেই গণঐক্যের কবি, যা কমিউনিজমের সাম্যবাদী মানবসমাজের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংহতির সঞ্চালক শক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তথাকথিত অস্তিত্ববাদী দর্শনের একাকিত্বের ও বিচ্ছিন্নতার কোনো আবেদন পারভেজ শাহেদীর ওপর আঁচড় কাটতে পারে নি। পারভেজ শাহেদী ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ ও স্বাধীনচেতা। কিন্তু জীবনের শুরুতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব এবং পরবর্তী পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সাহচার্য তাঁকে 'সকলের জন্য এক এবং একের জন্যে সকলে'র আদর্শ সমাজের লক্ষ্যে নিয়োজিত করেছিল। তাঁর গজল এবং মনন দুইয়ের মধ্যে রয়েছে বহুত্বের মধ্যে একের এবং

একের মধ্যে বহুত্বের বিকাশের সার্থকতার তাগিদ। বিপ্লবের সংগ্রামীদের অনৈক্য তাঁর হৃদয়কে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে দিত :

চোখের জল থেকে বয়ে যাচ্ছে কত অসংখ্য নদী।
কত ভালই না হতো যদি এদের কেউ বলে দিতো
সামনে মোহনা কোথায়।

পরিশিষ্ট

আমি ও আমরা

প্রতিবেশীদের ঘরে আগুন লেগেছে
আমার ঘর ভরা তার ধোঁয়ায়।
প্রতিবেশী জানাচ্ছে আর্তি
আমার অন্তর বাহির কেঁপে উঠছে
দুঃখে জর্জরিত হয়ে।
আমার হৃদয়ের আশেপাশে এখন
কোটি কোটি হৃদয়ের বাসা
আমি একা কিংবা আমি কোটি কোটি
পৃথিবীটা আমার ঘরের আঙ্গিনা।

দুনিয়ার দুঃখ ঠোঁট টিপে হাসছে
আমার চোখে চোখ রেখে
কোটি কোটি চোখে চোখ রেখে
আঁধার নিশুতির ভোর হওয়াকে দেখছে।

আমার হৃদয়ের বিশাল বিশ্বে
আছে আমার নিজের দুঃখ
পরের দুঃখও
আমি যখন থেকে আমাকে আমরা বানিয়েছি
নিজেকে হারিয়েছি, নিজেকে পেয়েছিও!

আগামীর বীণা

কত না মূর্তি যাদের এখনও খোদাই করা হয় নি,
পাথরের মধ্যে ছটফট করছে তারা!

কত না অফোটা গোলাপ ফুলের কুঁড়ি
বুলবুলকে করে তুলছে উদ্বিগ্ন!
কত না অদেখা আলোর রশ্মি

এখনও পর্দার আড়ালে মুচকি মুচকি হাসছে।

কত গীতমালাতে এখনও
হয়নি সুর তোলা
হৃদয়ের তারে তারা লেপ্‌টে রয়েছে।
কত প্রদীপ আজও জ্বালা হয় নি
রাত আসতেই যারা উঠবে ঝলমলিয়ে।

আগামীর বীণার তারে
কে ছোঁয়ালো আঙ্গুল?
মুহূর্তেরা তা নইলে গুনগুনিয়ে উঠছে কেন?

বন্দী গান

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মাকে সম্বোধন করে)

তোমার শতবার্ষিকী স্বদেশবাসীদের জন্যে শুভ হোক
এই আলোকবর্ণী ফুলমেলার উদ্যানের শুভ হোক
কুসুমকুঞ্জের জন্যে হিম ও শিলামুক্ত আকাশ শুভ হোক
বাংলার চঞ্চল স্ফুলিঙ্গদের অভ্যুদয়ের শুভ হোক।

কিন্তু হে ঠাকুর মনে রেখো তোমার প্রশস্তিবাণীও রাজনীতি
যেমন লোভ ও লালসার বরপুত্রদের ফুলের ডালিতেও রাজনীতি
তোমার গানের তাঁবু যে দড়ি দিয়ে মাটির সঙ্গে বাঁধা
তাকে ওরা কেটে দেয়
পৃথিবীর ধুলোর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটাকে
ওরা মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেয়।
তোমার গানের মাটির মর্ম থেকে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়
তোমার ঘরোয়া আলাপে ওরা অধরা রং চড়ায়
ওরা অপার্থিব রং চড়ায় বর্ণ ও গন্ধের মেঠো পৃথিবীতে।

অথচ তোমার কণ্ঠ ছিল পার্থিব
তোমার গলার স্বর ছিল পার্থিব
তোমার বীণা ছিল পার্থিব,
এই বীণায় তোমার যে আঘাত তাও পার্থিব ছিল
তোমার মেজাজও ছিল পার্থিব
তোমার কল্পনাও ছিল পার্থিব
তোমার গানও ছিল পার্থিব
তোমার আকাশে ডানা ছড়ানো ছিল পার্থিব
তোমার আকাশের জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর গর্ভ থেকে
মাটির মানুষের অভ্যুদয় ছিল

তোমার কাব্যের বিষয়বস্তু।
বিশ্বপরিচয় নিয়ে তোমার ধ্যানে
তারাদল বিঁধে বিঁধে রয়েছে।
তোমার পায়ে এসে ঢেউয়ের মতো ভেঙ্গে পড়েছে
নভোমণ্ডলের দৃশ্যমালা!
প্রকৃতি তোমারে ইশারা দিয়েছে
মহাশূন্যের বাইরে থেকেও।
দশ দিগন্ত যুগিয়েছে তোমাকে রহস্যের রূপকল্প।
তবু তোমার পথ চলা ছিল পার্থিব
তোমার চলার পথ ছিল পার্থিব।

তোমার অনুভবগুলি ভরপুর ছিল
শৈশবের সারল্যে।
প্রত্যেকটি কবিতার পরতে পরতে উন্মুখ ছিল
যৌবনের অস্থিরতা।
সমস্ত গানে প্রকাশিত ছিল প্রবীণের সুসম জ্ঞান।
সমকালীন ছিল গুঞ্জরিত জীবন, চিন্তা, রূপ।
তুমি সমবয়সী ছিলে সমস্ত গোলাপের
তুমি সমবয়সী ছিলে সমস্ত ফুলরাশির
সমবয়সী ছিলে তুমি
মানব মনের বীণার সকল সুরের।

তুমি প্রাচ্যের বীণা হাতে তুলে নিয়ে
কী অপূর্ব 'পূরবী' বাজালে
তাতে তুললে কালের ঝঙ্কার
বাজালে আমাদের রাগিণী
আলোর নামে বাজালে
জীবনের নামে বাজালে
বাজালে সেই সুর যার প্রয়োজন ছিল
চিন্তার জন্যে দৃষ্টির জন্যে।
এইভাবে প্রাচ্যের সঙ্গীতে
ভরে দিলে প্রতীচ্যের সুর
কালের হৃদয়ের সমস্ত স্পন্দনকে যেন টেনে নিলে তুমি।

জালিয়ানওয়ালাবাগে সদর্পে অনুষ্ঠিত
ধ্বংস ও হত্যার বিরুদ্ধেই হোক
অথবা ফিরিঙ্গি ব্যাধের শিকার ধরার ছলাকলার
বিরুদ্ধেই হোক,
অথবা ফ্যাসিবাদীদের দানবীয় চালের

নির্লজ্জ জল্লাদির বিরুদ্ধেই হোক,
অথবা সামন্ত রাজসভার মাথাভারি
মন্থর পীড়নের বিরুদ্ধেই হোক,
প্রত্যেকটা লড়াইয়ে
নির্ভয় থেকেছে তোমার মানুষের প্রতি প্রীতি
তোমার বাঁশরী স্তব্ধ হয়নি ঝড়ের গর্জনের মধ্যেও।

স্বদেশের ললাটে যে দীপ্ত মহিমার নক্ষত্রপুঞ্জ,
ওরা তোমার গানের ইন্ধন
ওরা কবিতার স্ফুলিঙ্গ
ওরা আলোকিত ইশারা
ওরা আলোকিত অর্থময়তা
ওরা তোমার হৃদয়ের অংশ
ওরা তোমার ভাবনার টুকরো
যেখানেই স্বদেশের স্বাধীনতার চিন্তার উদয়
সেখানেই তোমার মুক্তা ছড়ানো ওষ্ঠপুটের উল্লেখ।

কিন্তু আজও ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
লোভ লালসার বরপুত্রেরা।
ওরা আজও পর্যন্ত দাবিয়ে রাখছে তোমার ঘণ্টাধ্বনিকে।
ওদের পর্যালোচনা-গ্রন্থ তোমার গানের কারাগার।
ওদের কাছে তোমার সমসাথীরা অবাঞ্ছিত বিদ্রোহী।
আজ এটা স্বাধীনতার মৌসুম
স্বদেশকে আজ হতে হবে কর্ষিত।
তোমার গানকেও আজ বেরিয়ে আসতে হবে কারাগার থেকে।

গজলের কয়েক পঙ্‌ক্তি

খেতে খামারে আজ চাই গোলাজাত করা আংরা,
চাষির শিরায় শিরায় রক্ত আরও গরম হওয়া চাই।

ফরহাদ কি করে খুন হলো তা যারা বুঝেছে তারা আজকে
বাদশা খসরুর মতলবগুলোকে খতম করুক।

মজুরের কপালের ঘামের বিন্দুরা আজও ঘোলাটে।
খাটুনির চারিদিতে নিশির ঘোর আজ আলো নিয়ে আয়।
তোর গলার শিরাগুলোতে যৌবনের রক্তধারা, ওরে পারভেজ
শহীদের নামের দায় মেটা।

সাজ্জাদ জহীর : জীবনপঞ্জী ও দুটি বই

১

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ উপমহাদেশে সকল ভাষাভাষী জনগণের সম্মিলিত জাতীয় মুক্তির অভ্যুদয়ে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রসার সাধনে, কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার কাজে এবং প্রগতিবাদী লেখক-লেখিকাদের সমবায়ী প্রয়াসে সাজ্জাদ জহীরের বহুমুখী অবদান রয়েছে। তিনি অবশ্য প্রধানত ১৯৩৫ থেকে সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত প্রগতি সাহিত্যের কর্ণধার হিসেবে পরিচিত। তিনি একাধারে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রেমচাঁদের মতো দিকপাল প্রবীণদের গণমুখী সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী নবীন লেখক-লেখিকাদের দলবাঁধা প্রয়াসের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি এই ঐক্যের ধারাকে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশিয় তাঁবেদার কয়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভ্যুদয়ে শরিক করে বিপর্যয়ের অগ্নিপরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ করেছিলেন।

১৯৭৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যু তাঁর এই কর্মধারায় ছেদ ঘটিয়েছে।

সাজ্জাদ জহীরের সমবায়ী কাজের ধারাটি অবশ্য অব্যাহত রয়েছে কোথাও উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং কোথাও ফল্গুধারা হয়ে। উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ধারায় অবিশ্রান্ত বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিনব সৃষ্টির বিচিত্র প্রয়াসের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং পার্থক্যবোধের মধ্যেও যে শ্রমজীবী ঐক্যের ধারাটি কাজ করে আসছে, তার মধ্যে সাজ্জাদ জহীরের উপস্থিতি সক্রিয়। এই সঙ্গেই রয়েছে তার মাতৃভাষা উর্দুতে সংখ্যায় কম হলেও দারুণ শক্তিশালী কলমে লেখা বইগুলি। রয়েছে মেহনতী জনগণের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া তাঁর কর্ম ও চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগের সূত্রগুলি।

আমরা সাজ্জাদ জহীরের এই ত্রিবিধ অব্যাহত উপস্থিতিকে চোখের সামনে রেখে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনধারা এবং কিছুটা বিশদ ও বিশেষভাবে প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি ও চিন্তাভাবনার একটি পর্যালোচনা এখানে পেশ করছি।

আমরা সাজ্জাদ জহীরের সমগ্র রচনাবলি থেকে দুটি মাত্র বই বেছে নিয়েছি তাঁর লেখার কাজের পরিচয় দেবার জন্য। এই বই দুটির একটি 'লণ্ডন কি এক রাত' (লণ্ডনে এক রাত্রি)। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই এবং একমাত্র উপন্যাস। দ্বিতীয় বইটি 'মজামিনে সাজ্জদ জহীর' (সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধাবলি)। এতে রয়েছে ১৯৭২ পর্যন্ত তাঁর শেষ দশ বছরের লেখাগুলি। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৭৯ সালে ভারতের 'উত্তর প্রদেশ উর্দু আকাডেমি' বেগম রাজিয়া সাজ্জাদ জহীরের সহযোগিতায় এই সংকলন প্রকাশ করেছেন।

২

প্রথমে আমরা খুব সংক্ষেপে সাজ্জাদ জহীরের জীবনকথাটি পেশ করে নিচ্ছি।

১৯০৫ সালে ভারতের যুক্ত প্রদেশের একটি বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত অভিজাত পরিবারে লক্ষ্ণৌতে সাজ্জাদ জহীরের জন্ম হয়। ১৯২৬ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ইংল্যান্ড ও পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী প্রগতিবাদী শ্রমজীবী আন্দোলনে জড়িত হন। একদিকে যেমন তিনি ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণী এবং বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে মার্কসবাদী দর্শনে প্রভাবিত হয়ে আমাদের উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মজুর কৃষকের অংশগ্রহণকে অভিনন্দিত করে একে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে আসার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন তেমনি মাতৃভূমি ও বিশ্বের সংগ্রামী জনগণের কথা দল বেঁধে লেখার জন্য প্রবাসী স্বদেশবাসী ও স্বদেশবাসিনীদের নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেন এবং লণ্ডনে একটি প্রগতি লেখক সংঘ গড়ার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেন। ১৯৩৫ সালে দেশে ফিরে এসে একদিকে যেমন জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসের তদানীন্তন বামপন্থীদের সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন, তেমনি পাশাপাশি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের এবং তার সংঘ গঠনের কাজে প্রবৃত্ত হন। '৩৬ ও '৩৮ সালে পর পর দুটি তদানীন্তন মধ্যভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন অনুষ্ঠান ছিল তাঁর একটা বড় কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তদানীন্তন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির একজন উদ্যোগী সদস্য হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রসার করার কর্মীরূপে পার্টির বিভিন্ন গণফ্রন্টের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রমে শরিক হন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণী ও গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সলে সাজ্জাদ জহীর ঢাকায় ছাত্র ফেডারেশনের প্রারম্ভিক সম্মেলনে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এবং লাল কুটির সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৪০-৪২ সালে তিনি একজন শীর্ষ স্থানীয় কমিউনিস্ট জাতীয় সংগ্রামীরূপে কারারুদ্ধ ছিলেন।

ইতোমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার পরে '৪১ সালে হিটলার সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে পদানত করে মদমত্ত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে, ফলে যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। বৃটেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করে। ভারতে ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং কমিউনিস্টরা কারামুক্ত হন। সাজ্জাদ জহীরও জেল থেকে ছাড়া পান। পরিবর্তিত পরিস্থিতে বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় মুখপত্র চালাবার ভার যাদের উপর ন্যস্ত করা হয়, সাজ্জাদ জহীর এবং তাঁর বন্ধু ও সাথী স্থানীয় আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী, বুদ্ধিজীবী ও কবি ছিলেন তাঁদের কয়েকজন। এই সময়ে সাজ্জাদ জহীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অকমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জাতীয় মুক্তির একটা ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমে সমস্ত মুক্তিসংগ্রামীকে একত্র করার জন্য কথাবার্তা চালান। তাঁর কাজ ছিল প্রধানত জাতীয় ঐক্যের অন্যতম অপরিহার্য রক্ষাকবচ সাম্প্রদায়িক সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। ভাষার প্রশ্নে বহুভাষী দেশের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কসীয়

তত্ত্বের প্রয়োগের তাগিদ নিয়ে এই সময় যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে গিয়ে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের একজন ছিলেন।

'৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান গঠিত হলে সেখানকার নাগরিক হবার কোনো প্রশ্নই তাঁর ক্ষেত্রে ওঠে নি। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে হলো। সদ্য গঠিত পাকিস্তানে বসবাসের অন্তর্ভুক্ত কমিউনিস্টদের নিয়ে যখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সমেত 'পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হলো, তখন সাংঘাতিক বিপর্যয়কর ও জটিল পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য পাকিস্তানের কমিউনিস্টরা সাজ্জাদ জহীরকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। সাজ্জাদ জহীর এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি বস্তুতপক্ষে আত্মগোপন করে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির হাল ধরেন। ১৯৫১ সালে গ্রেপ্তার হয়ে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় কবি ফয়েজ আহমদ ও অন্যান্য আরও কয়েকজনের সাথে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার দায়ে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হলেন। চার বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে ভারতে এসে বিশেষ করে প্রগতি সাহিত্য প্রসার সাধন ও শ্রমজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের মার্কসীয় প্রশিক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এর পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের কাজই তাঁর বড় কাজ। সাজ্জাদ জহীরের জীবনের দুটি দিকের মেলবন্ধন উপরোক্ত বিবরণ থেকে বেরিয়ে আসে। এই মেলবন্ধনের প্রধান যোগসাধক মেহনতী জনগণ। স্বদেশেই হোক অথবা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে হোক তাঁর কাছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রয়াসে এবং সাহিত্যের ঐতিহ্যিক মানবিক সম্পদের বৈপ্লবিক উত্তরণ সাধনে মেহনতী জনগণকেই তিনি মূল সঞ্চালক বলে মার্কসবাদী দর্শন অনুসারে নির্দেশিত করে নিয়েছিলেন। মেহনতী জনগণের বৈপ্লবিক 'আত্মিক' ও সামাজিক-রাজনৈতিক কারিকাশক্তিই তাঁর উপন্যাস থেকে শুরু করে আলেখ্য ও প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখার জন্য অবশ্য তিনি তেমন একটা সময় করে নিতে পারেন নি। কুশলী লেখক ছিলেন বলে তিনি বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ভাষার নবপ্রজন্মের দুর্দান্ত প্রগতিবাদী লেখক-লেখিকাদের গুরুস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু সময় কোথায়? তাই বেঁচে থাকা পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে ছয়টি বই পাওয়া গিয়েছে। এরা হচ্ছে 'লণ্ডন কি এক রাত', 'রোশনাই', 'জিবর এ হাফিজ', 'নকুশ-এ-জিন্দা', 'আঙ্গারা', ও 'পিস্‌লা নীলম্'। বাংলা করলে এদের নাম হতে পারে, 'লণ্ডনে এক রাত্রি', 'আলোকসম্পাত', 'হাফিজ প্রসঙ্গ', 'জেলখানার চিঠি', 'আঙরা' এবং 'তরলমণি'। শেষ দশ বছরের লেখাগুলি তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। এদের কয়েকটিকে নিয়েই সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে 'সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধাবলি'। আরও লেখা নিশ্চই রয়েছে। যেমন, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের একটি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ইত্যাদি। উপরোক্ত সমস্ত লেখার উপরই আলোকপাত করা দরকার। আপাতত আমরা দুটি বই নিয়ে এই জহীরকে বুঝবো।

৩

'লণ্ডন কি এক রাত' (লণ্ডনে এক রাত্রি) উপন্যাসটি বিশ্ব উপন্যাসের আধুনিক শৈলীতে রচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপে উপন্যাসের শিল্পরূপের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে, লণ্ডনে ছাত্র থাকার সময় সাজ্জাদ সেখান থেকে পাঠ নিয়েছিলেন। উপন্যাসটি লিখেছিলেনও তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা হিসাবেই। কিন্তু এই সময়েও মেহনতী জনগণের প্রভাব যে ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির ভূমিকাতে। সাজ্জাদ জহীরের নিজেরই লেখা এই ভূমিকাটি তর্জমা করে পুরোপুরিভাবে তুলে দিচ্ছি এখানে :

"এই উপন্যাসটিকে উপন্যাস কিংবা গল্প নাম দেয়া মুস্কিল। ইউরোপে প্রবাসী ভারতবর্ষীয় ছাত্রছাত্রীদের জীবনযাপনের একটা দিক সম্বন্ধে জানতে চাইলে অবশ্য এই বই পড়তে পারেন।

এই বইটির বেশির ভাগই লণ্ডনে, প্যারিসে কিংবা দেশে ফিরে আসার পথে জাহাজে বসে লেখা। এরপরে দু'বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। মুসাবিদাটি ছাপাতে দেবার আগে পড়ে দেখে ছাপতে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি। ইউরোপে কয়েকটা বছর ছাত্র হিসাবে বসবাস করার পরে পড়ার পাঠ চুকিয়ে বিদায় হবার সময় একশ' দেড়শ' পৃষ্ঠা কিছু লিখে ফেলা একটা ব্যাপার। আর দেশে ফিরে এসে আড়াই বছর মজুর কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনে শরিক হয়ে কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মিলিত হয়ে কোটি কোটি হৃদয়ের স্পন্দন শোনা ভিন্ন ব্যাপার।

আজ আর আমি এই ধরনের বই লিখতে পারবো না এবং আমার মনে হয় এই ধরনের বই লেখার প্রয়োজনও নেই।"

সাজ্জাদ জহীরকে বুঝবার ব্যাপারে এই ভূমিকাটিকে স্বাগত জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি এই জন্যে যে তিনি দ্বিধা জয় করে বইটি ছাপতে চেয়েছিলেন। ৫০ বছর পরেও এই উপন্যাসটি বিষয়বস্তু ও কারিগরিতে উভয়ত বড় রকমের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সম্প্রতি উর্দুভাষী একজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাকে বইটির কথা বলেছিলাম, তিনি বইটি নিয়ে ঝড়ের বেগে রাত জেগে একদিনের মধ্যে পড়ে ফেলে ফেরত দেবার সময় বললেন, "এ হচ্ছে মৌলিক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির লেখা কাহিনী। এর মধ্যে শুকনো তাত্ত্বিক বিতর্ক এবং আজকের ছেলে ছোকরাদের ভাষায় জ্ঞান দেবার চেষ্টার ছড়াছড়ি। কিন্তু এ সবকিছুই এমন হৃদয়গ্রাহী করে যুবাযুবতীদের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখা যে, আজকের তরুণ তরুণীরা যারা ছাপার অক্ষর এড়িয়ে শুধু চোখ আর কানের সাহায্যে জগৎটাকে চাখতে চায়, তারাও এই বই একবার শুরু করলে বলবে, বড় তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে গেল। আরও অনেক কথা শোনা হলো না।"

এই সাথীর দুঃখ এই যে, সাজ্জাদ জহীরকে তিনি কলকাতায় মজদুরদের বৈঠকে নিয়ে আলাপ করিয়েছিলেন, কিন্তু এই বইটি পড়ে দেখেন নি। এই বইটিতে মেহনতী জনগণের তরফ থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য ও অভ্যুত্থানের

আবেদন রয়েছে, এতে কায়েমী স্বার্থবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী বৃহৎ সম্পদের মালিকদের মুখোশ ছেদ হয়েছে, সে সব কিছুই তো '৮৬ সালের সমসাময়িক।

অবশ্য দুঃখের বিষয় সাজ্জাদ জহীরের এই উপন্যাসটি তিনদশক আগে বাংলায় অনুবাদিত হলেও (অনুবাদক নেয়ামাল বাসার), বাংলাভাষী পাঠক পাঠিকারা আজও এই উপন্যাসটির খবর তেমন পান নি। অথচ এই উপন্যাসটিতে আমাদের উপমহাদেশের পরাধীনতার আমলের আক্ষেপ, আর্তনাদ ও মুক্তির বাসনার যেভাবে মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছিল, তেমন ধরনের শুধু বিলাত ফেরত বিশিষ্ট লেখকদের সার্থক উপন্যাসে নয়, সাধারণভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারাতেও খুব কমই লেখা হয়েছে। উপন্যাসটির অবশ্য পৃষ্ঠা সংখ্যা দেড়শতও নয়। স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্যের আধুনিক শিল্পরূপ ভাবনার যেসব নিদর্শন আমাদের সামনে রয়েছে, সাজ্জাদ জহীরের উপন্যাসটি তারই অনুরূপ, সুতরাং সাধারণভাবেই ছিমছাম। গোপাল হালদারও প্রায় একই সময়ে একই শৈলীতে 'একদা' লিখেছিলেন। তবে তিনি পরবর্তীকালে আরও দুটি খণ্ড যোগ করেছিলেন। আমাদের আক্ষেপ সাজ্জাদ জহীর 'লণ্ডনে একরাত্রি'র পর আর কোনো দিনরাত্রির কথা লিখে গেলেন না। আমরাও তো বলিনি তাঁকে লিখতে।

যাই হোক উপন্যাসটির সারমর্ম হচ্ছে নিম্নরূপ :

লণ্ডন নগরীর ব্লুমসবারী এলাকার গায়ে শীতার্ত কুয়াশা ঘেরা সন্ধ্যা থেকে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নঈম নামে এক ভারতীয় ছাত্রের ডেরার বসবার ঘরে একদল নানাভাষাভাষী ভারতীয় বন্ধুস্থানীয় ছাত্র ও তাদের ইংরেজ অথবা স্বদেশিনী বান্ধবীরা একজন দু'জন করে মিলন সন্ধ্যা যাপনের জন্য এসে একত্রিত হলো, নাচগান করলো, কথাবার্তা বললো, হালকা ধরনের খানাপিনা করলো এবং তারপর যখন গ্রামোফোন রেকর্ডের গান বাজনা ও নাচের সঙ্গীতকে ছাড়িয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় এত উঁচু পর্যায়ে উঠল যে ইংরেজ ল্যাণ্ডলেডী এসে নঈমকে ডেকে নিয়ে হৈ চৈ বন্ধ অথবা পরদিন ডেরা ছাড়ার নোটিশ দিলেন, তখন অতিথিরা মাঝরাতে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হতে শুরু করল। কখনো জোড়ায়, কখনো বা একা নিশীথ নগরীর প্রায় নির্জন হলেও আলোকিত পথে বেরিয়ে আসার এই প্রক্রিয়াটা নঈমের সংসার চৌহদ্দির বাইরে ঘটেছে। এইভাবে উপন্যাসের লেখক তাঁর নায়ক নায়িকার গতিবিধির পরিসর বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিয়েছেন। অবশ্য নঈমের ঘরে জমা হওয়ার পথেও তিনি লণ্ডন নগরীর পাতাল রেলের ধারের পার্ক কিংবা ক্যাফেকে ব্যবহার করেছেন। যাই হোক, নঈমের ঘর ছেড়ে অতিথিদের নিষ্ক্রমণ পর্বে একটা ছেদ ঘটলো। শীলা নামের যে মেয়েটি এই সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম তার বন্ধু রাও-এর সূত্রে নঈমের ঘরে একাকিনী ঢুকেছিল, সে ভোর পর্যন্ত থেকে গেলো এক রাজনীতি করা বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে তার প্রেমের গল্প শোনাতে। এই ছাত্র বন্ধুটি দেশে ফিরে গিয়ে বেশ কিছুদিন কোনো চিঠি দেয় নি। শীলার শেষ প্রশ্ন, সেকি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছে? শীলাও অবশ্য এই প্রশ্নের সদুত্তর না নিয়েই জানালা খুলে দেখলো ভোরের আলো দেখা দিয়েছে আকাশে এবং সেও পথে বেরিয়ে গেলো।

সন্ধ্যা শুরু হয়েছিল আজম নামের এক ছাত্রের পাতাল রেল স্টেশনের গায়ে পার্কের ধারে জবিন নাম্নী বান্ধবীর জন্য আকুল প্রতীক্ষার মধ্যে সামনে দেয়ালে একটা খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা, 'ভারতে আবার গুলি চলছে'-র সংবাদ নিয়ে। এই সংবাদ কাফেতে কিংবা নঈমের ঘরে আলাপচারিতার মধ্যেও একটা যন্ত্রণার চাপা আর্তনাদের মতো প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই জমায়েতের ব্যাপারটাকে যদি কোনো একটি বস্তু ঘনীভূত করে থাকে, তবে সেটা হচ্ছে যুবা যুবতীদের জোড়ায় জোড়ায় পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মান অভিমান কলহ-সন্ধি। আহসান কিংবা রাও-এর মতো চরিত্র এই কাহিনীর বলয়ের মধ্যে এসেছে যারা ভালবাসার ধার ধারে না। তবে প্রেমই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শক্তি এবং কয়েকজন নায়ক-নায়িকার হৃদয় তোলপাড়ের ব্যাপরটা বেরিয়ে এসেছে, লণ্ডনের এই রাত্রির কোনো ঘটনাতে নয়, সুইজারল্যাণ্ডের কোনো পর্বতকান্তারে কবে কি ঘটেছিল তার বর্ণনে। বস্তুতপক্ষে প্রেমিকের প্রতীক্ষার তিতিক্ষা দিয়ে এই উপন্যাস শুরু এবং প্রেমিকের প্রতীক্ষার তিতিক্ষা দিয়ে এই উপন্যাসের শেষ।

কিন্তু এই প্রেম যে গাঁজিয়ে যাবে দেহসর্বস্বতায়, সে উপায় সেদিনকার ঘটনায় ছিল না। তাই দেখা যায়, জমায়েতের মধ্যে চপলা প্রজাতির মেয়েও আছে, তার আকর্ষণ রয়েছে। আবার দেখা গেছে, যে মেয়ে মাঝরাত পর্যন্ত নাচের সঙ্গিনী হলো, সে প্রেমিকের সঙ্গে মাঝরাতে রাস্তায় বেরিয়ে একসঙ্গে বসে কোথাও চা খাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে তার বন্ধুর জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা ডেলি ওয়ার্কার-এর একটি কপি সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার প্রথম বাসে বসে রাত্রির প্রেমিকাকে হতবাক করে দিয়ে নিজের বাসায় চলে যায়। যে শীলা শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়াতে নঈমের মনের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে নঈমের প্রতি শীলা আকৃষ্ট হয়েছে, সেও তার রাজনৈতিক প্রশ্নটি উত্থাপন করে রাত শেষ হতেই নঈমকে হতাশ করে চলে যায়।

তবু যে কথাটা হয়তো দেশে ফিরে সাজ্জাদ জহীরের মনে হয়েছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জনগণের অভ্যুদয়ের মধ্যে, সেটা এই যে, তাঁর উপন্যাসটিতে লণ্ডনের রাত্রিতে এতগুলি যুবা-যুবতী কোনো সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে পথে নামলো না। এই কথাটা মনে হওয়াতেই তিনি মনে করেছিলেন যে, এ ধরনের বৈকঠী উপন্যাস লিখবার কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না।

আমরা সাজ্জাদ জহীরের আক্ষেপকে স্বাভাবিক বলে মনে করলেও উপন্যাসটিকে বাস্তবসম্মত বড় রকমের কাজ বলে অভিহিত করতে চাই। 'ভারতে আবার গুলি চলেছে'-এর সংবাদটিকে অবলম্বন করেই শুধু নয়, আরও বিভিন্ন প্রশ্নের সূত্রে লণ্ডন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও প্রবাসী ছাত্র ছাত্রীদের এবং তাদের সমর্থক বিশেষ করে বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণীর চোখের সামনে পরাধীন ভারতবর্ষের কোটি কোটি বাসিন্দার দুঃসহ জীবনের ছবি বারবার দুলে দুলে গিয়েছে। একটা বড় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে প্রবাসী ছাত্রদের একটা বড় অংশ। আমরা পড়ছি কিসের জন্য? বিদেশী শাসক ও শোষকদের অধীনে চাকুরী জুটিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আখের গুছিয়ে পরিতুষ্ট থাকার জন্যই নয় কি? আমাদের স্বদেশের সমস্যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা কালা আদমিদের নিকৃষ্ট জীব বলেই মনে করে।

অথচ ভারতবর্ষের ভিতরকার কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীগুলি পৃথক পৃথকভাবে প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ছে, উচ্ছিষ্ট পেলে ধন্য মনে করছে নিজেদের, মর্মান্তিকভাবে দুর্ভাগ্যজনক জাতপাত, ধর্ম ও বর্ণগত বিভেদ ও অনৈক্যের মধ্যে দেশবাসীকে নিয়োজিত রাখতে চেষ্টা করছে। ছাত্রেরা এতে গভীরভাবে পীড়িত বোধ করছে। আবার হাজার হাজার মাইল দূরে হলেও জনগণ যে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, এটা সকলের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। 'লণ্ডনে একরাত্রি' উপন্যাসের এই আর্তিকে আমরা তাই বৈপ্লবিক আর্তি বলেই চিহ্নিত করতে পারি। এই সঙ্গেই যোগ করা যেতে পারে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তো বটেই, ভারতবর্ষের সার্বিক জীবন বিন্যাসে মজুর কৃষক ও বিপ্লবী সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের অপরিহার্য উদ্ভবের আবাহনী রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসের আরেকটি দিকও রয়েছে আমাদের কাছে। সাজ্জাদ জহীর যে গভীর দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার মূলমর্ম এই উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪

'সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধাবলি'তে সংকলিত তাঁর শেষের দিকের লেখাগুলিতে আমরা পাই একটি সামগ্রিক, সুদূরপ্রসারী ও অন্তরঙ্গ নিরীক্ষাকে। এই বইটিকে আমরা সমবায়ী সাজ্জাদ জহীর ও তাঁর সাথীদের ধ্যানধারণার হিসাব নিকাশ বলে অভিহিত করতে পারি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বিশেষ পরিস্থিতিতে সাজ্জাদ জহীর মার্কসীয় মতাদর্শকে ভিত্তি হিসাবে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে তার আলোকে সাহিত্য প্রগতি-চিন্তা ও তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সৃজনশীলতাকে আনুপূর্বিক ও সার্বিকভাবে উপস্থিত করেছেন। বইটি তাই যেমন একদিক দিয়ে সমসাময়িক তেমনি কিছুটা ঐতিহাসিক।

বইটিতে নিম্নোক্ত ১৪টি প্রবন্ধ রয়েছে। যথা : ১. উর্দু কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে. ২. উর্দু গদ্য সাহিত্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব, ৩. প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, ৪. সাহিত্য ও জীবন, ৫. মহান প্রগতিবাদী কবি গালিব, ৬. হালির কাব্যকৃতির গুরুত্বময় ভূমিকা, ৭. আমীর খসরু দহলবী ও তাঁর কাব্যকৃতি, ৮. গোয়েটে ও শিলারের দেশে কয়েকটা দিন, ৯. শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা, ১০. কবিতা ও সঙ্গীত, ১১. উর্দু কাব্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ১২. শৈল্পিক সৃষ্টিতে অনুধাবন ও রূপায়ণ, ১৩. সর্দার জাফরীর নূতন কাব্যগ্রন্থ 'আরও স্বপ্ন চাই, ১৪. ওহীদ আখতারের কাব্যকৃতি।

আমরা এই ১৪টি প্রবন্ধের সারমর্মকে তিনভাগে উপস্থিত করছি। এই তিনটি ভাগ হলো, ১. প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ধারা বর্ণনার ভিত্তিতে নীতি, আদর্শ ও সৃষ্টির বিশ্লেষণ, ২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যে মার্কসীয় তথা সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট জীবনদর্শনের প্রয়োগ, ৩. ঐতিহাসিক মানবিক বৈপ্লবিক উপকরণ ও উপাদান ও তাদের সংযুক্তি।

আমরা প্রথমভাগে যে পাঁচটি প্রবন্ধকে আন্তর্ভুক্ত করেছি তা হলো, ১. উর্দু কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে ,২. উর্দু গদ্য সাহিত্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব, ৩. প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, ৫. ওহীদ আখতারের কাব্যকৃতি।

দ্বিতীয় ভাগে থাকছে : ১. সাহিত্য ও জীবন ২. গোয়েটে ও শিলারের দেশে কয়েকটা দিন, ৩. শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা, ৪. কবিতা ও সঙ্গীত, ৫. শৈল্পিক সৃষ্টিতে অনুধাবন ও রূপায়ণ।

তৃতীয় ভাগে থাকছে : ১. মহান প্রগতিবাদী কবি গালিব, ২. হালির কাব্যকৃতির গুরুত্বময় ভূমিকা, ৩. আমীর খসরু দহলবীর কাব্যকৃতি, ৪. উর্দু কাব্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

বিস্তারিত পর্যালোচনা বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। সেজন্য একটা সাধারণ ধারণাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আমরা এক এক করে বিভাগ অনুযায়ী ১৪টি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রায় গাণিতিক পদ্ধতিতেই পেশ করছি।

৫

আমাদের প্রথম ভাগের দুটি লেখা 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর' ও 'উর্দু গদ্য সাহিত্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব' মূলত প্রগতিবাদীদের সাহিত্যকৃতির সংগঠন ও সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

১৯৩৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিরিশ বছরের এই ইতিবৃত্ত দাখিল করতে গিয়ে সাজ্জাদ জহীর এই আন্দোলনের সঙ্গে উপমহাদেশের প্রথিতযশা লেখকেরা গোড়া থেকেই নিজেদের কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৩৬ সালে প্রথম সম্মেলনে প্রেমচাঁদ, জোশ মলিহাবাদী এবং সুমিত্রানন্দন পন্থের মতো সাহিত্যের দিকপালরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। প্রেমচাঁদ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে 'মহাজনী' বা অর্থ ও মুনাফাখোরীর শাসন ও শোষণ বলে ধিক্কৃত ও চিহ্নিত করেছিলেন। দু'বছর পরে '৩৮ সালে দ্বিতীয় সম্মেলনে উপস্থিত না হতে পারলেও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বাণী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে; "আমি জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে না গিয়ে খানিকটা আল্‌গা থেকে যে ভুল করেছি, সেই ভুল তোমরা করো না। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। অহমিকার খোলস ভেঙ্গে বৃক্ষের বাকল ছিঁড়ে ফুলের মঞ্জরির মতো বেরিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে তোমাদের লেখা একাত্ম হোক।" সাজ্জাদ জহীর সেদিন রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছাবাণীটি পেয়ে কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালে পৌঁছে তিনি তাঁর আট পৃষ্ঠার প্রবন্ধটির মধ্যে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের পুরো বক্তব্য অনুবাদ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জটিল ও সমস্যাপীড়িত জীবনে আজও অন্ধকার পথে মশালের মতো দিশারী' (মশালে-রাহ্)।

'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর'-এ সাজ্জাদ জহীর আরও কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ দাখিল করেছেন। তিনি প্রথমেই দেখিয়েছেন যে, তিরিশের দশকের শুরুর দিকে আমাদের উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়

মুক্তিসংগ্রাম যে নতুন মোড় নেয়, তার মূলে ছিল মজুর ও কৃষক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাম মোর্চার উদ্ভব। এই সময়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে একই সঙ্গে নতুন গণবিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনা ও উদ্বেগজনক ফ্যাসিস্ট শক্তির বিন্যাস ঘটেছে। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল হওয়ার দরুন বিশ্বের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমর্থনে জনমত গড়ে উঠেছে। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের অগ্রফলক ফ্যাসিবাদ ইউরোপে মাথা তুলেছে, তেমনি তার বিরুদ্ধে গণ ঐক্যজোট গঠিত হয়েছে এবং জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীন মুক্তিযুদ্ধে ব্রতী হয়েছে। এই পটভূমিতেই ইংল্যান্ড এবং সেই সময়ের ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনে উৎসাহিত। ছাত্রছাত্রীদের এই রাজনৈতিক অবস্থান সাহিত্যেও নতুন অবস্থান নিয়ে আসে। ১৯৩৫ সালের শুরুতে ইংল্যান্ডে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন প্রবাসী বুদ্ধিজীবী একজন সহানুভূতিশীল চীনা রেস্তোঁরা মালিকের সৌজন্যে তাঁর রেস্তোঁরায় বসে ভারতীয় প্রগতি সাহিত্যসংঘ নাম দিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ড. মুলুকরাজ আনন্দ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ড. মুহম্মদ দীন তাসের, ড. জ্যোতি ঘোষ ও সাজ্জাদ জহীর।

প্রধানত ইতিবৃত্তমূলক দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উর্দু গদ্য সাহিত্যে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব'-এও কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যেগুলি উর্দু সাহিত্যে নতুন দিগন্ত আনার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সমগ্র প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে অগ্রসর করেছে। এরকম একটি তথ্য এই যে, মওলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পাদিত 'আল-হেলাল' পত্রিকায় কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর উর্দু অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন মওলানা আব্দুর রাজ্জাক মলিহাবাদী।

সাজ্জাদ জহীর তাঁর প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন, রুশ বিপ্লবের প্রভাবে উর্দু গদ্যে মার্কসীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিশের দশকে যেসব বই লেখা হয় তারা সাধারণভাবে উর্দু সমালোচনা সাহিত্যেও মার্কসীয় ভাবধারার প্রসার ঘটায়। উপমহাদেশের প্রগতি সাহিত্য সংঘের সূচনাকালেই বিশেষ করে আখতার হোসেন রায়পুরী এ বিষয়ে পথিকৃতের কাজ করেন। এই সময়ে লাহোর থেকে প্রকাশিত 'আদবে লতিফ' (মনোরম সাহিত্য) নামের পত্রিকায় কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ মার্কসীয় ধারার ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৮ সালে উদীয়মান কবি সর্দার জাফরী, কবি মাজাম ও পরবর্তী কালের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও গ্রন্থকার সিব্‌তে হাসানের সম্পাদনায় লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র 'নয়া আদব' বা 'নতুন সাহিত্য' মার্কসীয় ভাবধারার ভিত্তিতে সাহিত্যে নতুন চিন্তার তরঙ্গ নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে সাজ্জাদ জহীর তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "এই মাসিকপত্রটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুতপক্ষে প্রগতিবাদী সাহিত্যে মার্কসবাদের অনুরাগীদের একটা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। মজনুঁ গোরখপুরী ও এহেতেশাম হুসেনের গোড়ার দিকের মার্কসীয় প্রভাবের লেখাগুলি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। উর্দু কাব্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব তো ইতিপূর্বেই পড়েছিল, এবার গল্প উপন্যাসও এই আন্দোলনে শরিক হয়। এই দিকটা সর্বপ্রথমে

সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী ও রসসমৃদ্ধ রূপ নেয় কৃষণ চন্দরের ছোট গল্পে। এই সময় সাদাত হাসান মান্টো (মার্কসবাদে দীক্ষিত না হলেও), রাজিন্দর সিং বেদী, আহমদ নদীম কাসমী, ইসমত চুঘতাই ও হায়াত উল্লাহ আনসারীর গদ্যরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবতাবাদ ও মানবতাবাদ স্বাধীনতাপ্রিয়তার বলিষ্ঠ চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত করে। এই চিন্তাধারা ছিল সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট জীবন দর্শনে ভরপুর।"

সাজ্জাদ জহীর এরপর লিখেছেন, "১৯৪২ সালে ও পরের কয়েকটি বছর বোম্বাই থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'কৌমি জং' ও 'নয়া জামানা' যদিও রাজনৈতিক কাগজ ছিল, তবু এর সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখক হিসাবে ছিলেন প্রধানত প্রগতি সাহিত্যের কর্মীরা। এঁদের সঙ্গে ছিলেন সর্দার জাফরী, সিব্‌তে হাসান, কৈফি আজমী, জেড্ আনসারী, আবদুল্লাহ মালিক, কলিমুল্লাহ্, মোহাম্মদ মেহেদী, সাজ্জাদ জহীর।"

সাজ্জাদ জহীর লিখেছেন যে, পাকিস্তানে মার্কসবাদের ধ্যানধারণা পোষণ খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ালেও সেখানে কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে উর্দু ভাষায়।

আমাদের প্রথমভাগে বাকী থাকছে তিনটি প্রবন্ধ। প্রগতি সাহিত্যের ইতিবৃত্তের ধারাকে মূলত সমালোচনামূলক 'উর্দু কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে', 'সর্দার জাফরীর নতুন কাব্যগ্রন্থ আরো স্বপ্ন চাই' এবং 'ওহীদ আখতারের কাব্যকৃতি'। মুক্তিসংগ্রামী জনগণের তরফ থেকে অথবা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের চিন্তাচেতনার লক্ষ্য ও আদর্শের তরফ থেকে উর্দুভাষী গণসচেতন কবিদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং তাঁরা তার কতখানি পূরণ করতে পেরেছেন সে সম্বন্ধে মূল্যায়নমূলক এই প্রবন্ধ তিনটিতে একদিকে যেমন দ্ব্যর্থহীনভাবে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে, তেমনি আরেকদিকে সার্থক সৃষ্টি যাঁরা যেখানে যা কিছু করেছেন, তার প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিরিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত উপমহাদেশের প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়া এবং পুনর্বিন্যাসের প্রয়াসের মধ্যে চূড়ান্ত দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারা সাধারণভাবেই কাব্যের ললিত বাণীকে বাস্তবসম্মত রাখার জন্য কঠিন সাধনা করতে হয়েছে অথবা কঠোর বাস্তবের মধ্যেই কোমল সুর সৃষ্টি করতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রগতিবাদী কবি বিভিন্ন মেজাজ, বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন রূপাধার নিয়ে একদিকে যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে অগ্রসর করে নিতে পেরেছেন, আনতে পেরেছেন অভূতপূর্ব সার্থকতা, তেমনি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনও নি, গতানুগতিক নূতন সাজে সাজিয়েছেন মাত্র। মতান্তর হয়েছে, ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, সমবায়ী ধারায় ভাঙ্গন ধরেছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎকণ্ঠা বড় হয়ে পড়েছে। উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাতেও প্রগতি সাহিত্যের ধারায় আশাবাদ ও আক্ষেপ যেভাবে দেখা দিয়েছে, তারই আলোকে উর্দু কাব্যের পর পর সমসাময়িক দুই প্রজন্মের রূপকারদের লেখার কৃতিত্ব ও সার্থকতাকে সাজ্জাদ জহীর ছোট ছোট প্রবন্ধেই দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন।

'উর্দু কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে' প্রবন্ধে তিনি যেমন, 'গজল' রচনায় ফয়েজ আহমদ ফয়েজেরও গতানুগতিকতার উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি, তেমনি 'নজম' বা বিষয়ভিত্তিক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতাকে সামনে

এনেছেন গভীর গর্ববোধের সঙ্গে। এই ধরনের কবিতায় আধুনিক রীতির ছন্দ ও শব্দপদ বিন্যাসের ভাংচুর করে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কারাগারে বসে লেখা 'মুলাকাত' বা সাক্ষাৎকে কয়েক শতাব্দীর উর্দু কাব্যের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র বিকাশের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি। প্রেম ও বিরহের যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন বিশ্বপ্রকৃতির আবহে প্রগতিবাদের আশার সুনিশ্চিত পথবিন্যাস দেখেছেন তিনি এই কবিতাটিতে। প্রগতিবাদী কবিরা যে তাদের সংগ্রামী গণকাব্যকে কত গভীরভাবে জনগণের সাথে যুক্ত রেখেছেন, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি মখদুম মহীউদ্দিনের মতো দুর্দান্ত গণকবি ও গণসঙ্গীতকারের লেখাগুলি থেকে নিবিড় অনুভবঘন আলেখ্যের উল্লেখ দিয়ে।

সাজ্জাদ জহীর এরপরের প্রবন্ধে প্রগতিবাদী কাব্য তথা সাহিত্যের সমবায়ী গণমুখী উচ্চকণ্ঠী ধারার সার্থক উত্তরণকে সামনে রেখেছেন সরদার জাফরীর মতো একজন পথিকৃৎ প্রগতিবাদী কবির নূতনতর কাব্যগ্রন্থ 'আরও স্বপ্ন চাই' কে অভিনন্দিত করে। এই কাব্যগ্রন্থেই জাফরীর ষাটের দশকের নবতম একটি কবিতাকে সমবায়ী কবিদের মধ্যে আড়াল আবডাল সৃষ্টিতে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে। সাজ্জাদ জহীর তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন উচ্চকণ্ঠের সমবায়ী ধারাকে উৎসাহিত করে। এই সূত্রে তিনি সর্দার জাফরীর কাব্যের বলিষ্ঠ গণমুখী বৈপ্লবিকতার প্রশংসা করেছেন দুটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। প্রধামত তিনি লিখেছেন, "জাফরী কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন ইকবাল ও জোশের ধারায়। এটাই বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের প্রধান ধারা উর্দু কাব্যে। তবে এই তিরিশের দশকেই এবং তারপরে যখন উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এলো তখন তাতে কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সংহতি উর্দু কাব্যে বামপন্থী ধারার প্রবর্তন করলো। জাফরী এই কাব্যধারার প্রধান বাহক।" জাফরীর ঘোষণাপন্থী কাব্য সম্বন্ধে সাজ্জাদ জহীরের দ্বিতীয় মন্তব্যটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি সর্দার জাফরীর কাব্যকৃতিকে মেক্সিকোর বিশ্ব বিশ্রুত সুবৃহৎ প্রাচীর চিত্রাবলির সঙ্গে তুলনীয় বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

আধুনিক কবিদের একক পরীক্ষা নিরীক্ষাকেও সাজ্জাদ জহীর যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন নি, তার প্রমাণ প্রবন্ধ–'ওহীদ আখতারের কাব্যকৃতি'। ওহীদ আখতারের 'পাথরের গান' কবিতায় বইটির অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিক ঝোঁকের ব্যাপারটাকে উড়িয়ে না দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তিনি। জাড্য ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে ওহীদ আখতারের ধিক্কারকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এই সঙ্গেই অবশ্য তিনি প্রগতিবাদীদের সম্পর্কে ওহীদ আখতারের মনগড়া সহনশীলতার অভাবের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন।

৬

'প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থের যে কয়েকটি লেখাকে আমরা তত্ত্বের ভাগে রেখেছি, সেগুলি হলো, ১. জীবন ও সাহিত্য, ২. গোয়েটে ও শিলারের দেশে কয়েকটা দিন, ৩. শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা, ৪. কবিতা ও সঙ্গীত, ৫. শৈল্পিক সৃষ্টির অনুধাবন ও রূপায়ণ।